প্রবন্ধের বর্ণমালানুক্রমিক সূচী।

প্রথম খণ্ড।

—:*:—

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
প্রণয়ে (কবিতা)	শ্রীমতী সু--ঘোষ	২১৯
প্রবাদ-প্রসঙ্গ	শ্রীবিমলাচরণ লাহা	১১২
	ফ	
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১২৬, ২১২, ২৬৯
	ব	
বন্ধু (গল্প)	সম্পাদক	১০২
বরণ (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৩৭৬
বিদায় (কবিতা)	শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু	৩৩৯
বিদ্যা (কবিতা)	শ্রীঅঘোরনাথ বসু	৮৫
বিসর্জ্জন (গল্প)	সম্পাদক	৪৩০
বৌদ্ধ উপাখ্যান	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	৮১
ব্যর্থ প্রেম (গল্প)	সম্পাদক	৬২
	ভ	
ভয় ও ভরসা (কবিতা)	শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ	৩৫৮
ভারতীয় শিল্প	সম্পাদক	২৩
ভাষাতত্ত্ব	শ্রীঅমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	২৬৩
	ম	
মদনের বিবাহ (কবিতা)	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩
মদন মহল	শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত	৩৭৭
মন্দারে মধুসূদন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত	৩৯০
মনসা মঙ্গল	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	১২১
মরুভূমে (গল্প)	শ্রীগুরুদাস সরকার	১৩৪, ২০৪
মহেশপুরের সূর্য্য রাজা	শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়	৩৮৫
মানব-প্রহেলিকা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৮১, ৩৫২
মির্জানগরের ধ্বংসাবশেষ	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	৫১
মুগ্ধ (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৫১
মেঘের আর্ত্তনাদ	শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী	৩২৯
ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতীকার	শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩০, ১৮৪

য়

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

ভ

চিত্রসূচী।

Positivism বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ।

যে কয়জন মনীষী বাঙ্গালী কোম্‌তের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "দেখ, যে শাস্ত্র গত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ইচ্ছা হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করি।

"Ecstatic philanthropy কথাটা জান কি? শব্দটি হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সৃষ্টি। উহার অর্থ করা যাইতে পারে, পরোপকারে আনন্দ-বিহ্বলতা। স্পেন্সার কোম্‌তের গ্রন্থাদি পড়িতেন না; কোম্‌তের দার্শনিক মতসমূহ তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে যে দার্শনিক প্রস্থান (School of Philosophy) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু দুই চারিজন কোম্‌তের ভক্তের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল; যথা, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক লুইস এবং উহাঁর চিরসঙ্গিনী (যদিও অবৈধরূপে) প্রসিদ্ধ উপন্যাসরচয়িত্রী জর্জ্জ ইলিয়ট ওরফে কুকারী ইভান্স এবং বোধহয় কোম্‌তের দর্শনের অনুবাদিকা কুমারী মার্টিনো। ইহাঁরা কয়েকজনে মিলিয়া এক্স্ (X) ক্লব নামক একটি গোষ্ঠিতে মিলিত হইতেন। দশ জনের অধিক সভ্য হইবে না এই নিমিত্ত উহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। বোধ হয়, হাক্সলিও উহাঁর মধ্যে ছিলেন। হাক্সলিও কোম্‌তকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; তাঁহার নামের উল্লেখ হইলেই বদ্‌খৎ দর্শনশাস্ত্র ও ততোধিক নিকৃষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্র (Bad philosophy and worse science) এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু এ প্রকার মতভেদ সত্ত্বেও সভ্যাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র মনোমালিন্য ছিল না। লুইস কোম্‌তের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন; জর্জ্জ ইলিয়ট ততদূর না হউন, কোম্‌তকে উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রধান জ্যোতিঃ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লুইস আপনার দর্শনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, কোম্‌তের প্রণালী পূর্ব্বতন দর্শনকারদিগের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দর্শনকারদিগের মধ্যে চিরকালই একপ্রকার ঢেঁকির কচ্‌কচি চলিয়া আসিতেছে, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং; জর্ম্মান্ দর্শনকারেরা স্কটল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানবেত্তাদিগকে হেয় জ্ঞান করেন, ইহাঁরা আবার উহাঁদিগকে দুর্ব্বোধ্য স্বপ্নভাষী (Dreamy) বলিয়া সিকায় তুলিয়া রাখিতে চাহেন। কোম্‌ৎ যখন তাঁহার নিজের ধরণে

দর্শন গঠন করিতে বসিলেন, তখন অনেকেই মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, দেখা যাউক ইনিই বা কি করেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার দর্শনের ছয় খণ্ড শেষ করিলেন, তখন তাঁহার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া লুইস যে একটি প্রশংসা-সূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেটি আমার বড়ই মিষ্ট লাগে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে কোম্‌তের কৃতকার্য্যতা stupendous, অত্যাশ্চর্য্য—ভাবিলে মুণ্ড ঘুরিয়া যায়। লুইসকে মিল তত একটা উচ্চদরের দার্শনিক মনে করেন না, কিন্তু কোম্‌তের দর্শন সম্বন্ধে মিল ও লুইসের বিশেষ বিভিন্ন মত নাই। পরে কোম্‌ৎ যখন তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন উহার কতকটা আভাস হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বোধ হয় লুইস প্রভৃতির নিকটই পাইয়া থাকিবেন। তিনি নিজে কোম্‌ৎ বড় পড়িতেন না। ফেডরিক হ্যারিসন স্পেন্সারকে এক স্থলে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সর্ব্বদা যে Great unknown এর উল্লেখ করিয়া থাকেন সে বস্তু যাহাই হউক না কেন,কোম্‌ৎ কিন্তু স্পেন্সারের পক্ষে একটি Great unknown অর্থাৎ বিরাট বিপুল অজ্ঞেয় ব্রহ্ম (ব্রহ্ম=বৃহ+মন্=বৃহৎ)। Religion কাহাকে বলে, এ বিষয়ে কোম্‌ৎ ও স্পেন্সারে অনৈক্য। কোম্‌ৎ বলেন, Religion শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একতাপাদন, পাঁচটাকে একটা করিয়া বাঁধা; পৃথিবীর তাবৎ পূর্ব্বতন Religion এর ইহাই উদ্দেশ্য ও ইহাই কার্য্যকারিতা। এই একতাপাদন দুই প্রকার। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পাঁচটা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তিকে একটা সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তির বশীভূত করিয়া রাখা। দ্বিতীয়তঃ, পাঁচজন বিভিন্ন ব্যক্তির একটা মতের অনুবর্ত্তী হওয়া। যাহার দ্বারা এই দুই প্রকার কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহারই নাম Religion। ইহা কোম্‌তের অর্থ। স্পেন্সার বলেন—তাহা নহে; মানুষের বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলির তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে যাইয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হয়, কিন্তু তাহার পর আর বুঝিতে পারে না; জ্ঞানের এলাকার বাহিরে এক প্রকাণ্ড অজ্ঞেয় পারাবার বিস্তারিত রহিয়াছে; বুদ্ধি যতই অগ্রসর হউক না কেন, কতক দুর গিয়া ঠেকিয়া যায়; কিন্তু বুদ্ধি কতকটা চুলবুলে, ঠেকিয়াও স্থির থাকিতে পারে না; সেই অজ্ঞেয় পারাবারকে স্পষ্টরূপে আকলন করিতে না পারিয়াও কল্পনাপ্রয়োগ করিতে থাকে। এটি মানবচিত্তের একটি অনিবার্য্য বৃত্তি। স্পেন্সার বলেন, সেই সমস্ত কল্পনার নাম Religion। এই নিমিত্ত স্পেন্সার যখন বুঝিলেন যে, কোম্‌তের Religion এর তাৎপর্য্য

কেবল নরজাতির হিতসাধন করা এবং কায়মনোবাক্যে ঐকান্তিক আগ্রহ-সহকারে অনন্যকর্ম্মা হইয়া পরোপকারব্রতে ব্রতী হওয়া তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে Religion বল কেন? ইহাকে বরং Ecstatic philanthropy আনন্দবিহ্বল পরোপকারব্রত এই সংজ্ঞা দাও।

এইরূপে উক্ত নামটির সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহা হউক ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু বোধ হয় যে, কোম্‌ৎ Religion শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

মদনের বিবাহ।

(স্কট কর্ত্তৃক অনূদিত ফরাসী হইতে)

(১)

কল্পনা আসি' কহিল মদনে
"বিয়ে যদি তুমি কর
আছে দু'টি নারী,—'যুক্তি' 'মূঢ়তা'
সুন্দরী তা'রা বড়!"

(২)

স্বীকৃত মদন; বিবাহ করিল
একবারে দু'টি নারী;
সংসার-কাযে রহিল 'যুক্তি'
'মূঢ়তা' বিলাসচারী!

(৩)

উল্লাসে সুখে কেটে যায় দিন
নাহি কারো অভিযোগ;
যুক্তি-গর্ভে 'বিশ্বাস হ'ল,
মূঢ়তা-গর্ভে 'ভোগ'!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পাষাণের কথা।

(১১)

বৃদ্ধের শুশ্রূষায় সৈনিক ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। উভয়ে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর-মধ্যে বাস করিতেন ও পরস্পরের সাহায্যে দিনযাপন করিতেন। বৃদ্ধের শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিয়া যুবা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ও নির্জ্জন, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে বৃদ্ধকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি যথাসাধ্য বৃদ্ধের সেবা করিতেন, কুটীর মার্জ্জন, পুষ্প ও ফল আহরণ, ভগ্ন-স্তূপের চতুঃপার্শ্ব মার্জ্জন ইত্যাদি সমুদায় কার্য্যভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসরমত বৃদ্ধ আগন্তুককে প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করাইতেন, তথাগতের কথা, সদ্ধর্ম্মের কথা, প্রাচীন রাজগণের কথা প্রতিদিনই আবৃত্তি করিতেন। বুদ্ধ-কথা শুনিয়া যুবকের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইত। তরুণ শাক্যরাজকুমার কিরূপে নাগরিকের দুঃখদর্শনে ব্যথিত হইয়া সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার জীবন ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয়িত হইয়াছিল এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে হেমন্তের দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইত। বৃদ্ধ স্তূপগাত্রের ও বেষ্টনীর স্তম্ভসমূহের লেখমালা পাঠ করিয়া স্তূপনির্ম্মাণের কথার কিয়দংশ অবগত হইয়াছিলেন। সময় সময় দুইজনে অগরাজু ও তাঁহার নাগরিকগণের কথাও হইত। বৃদ্ধ প্রিয়দর্শী ও দেবপুত্র কণিষ্ক প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক রাজগণের সম্বন্ধে যাহা জানিতেন আগন্তুককে তাহা শ্রবণ করাইতেন। অভিধর্ম্মের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাসের কথা যুবক অধিক মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। গুপ্তরাজবংশের আধিপত্যকালে আত্মবিচ্ছেদে ও সাহায্যাভাবে সদ্ধর্ম্মের কিরূপে অবনতি হইয়াছিল তাহা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আত্মহারা হইয়া যাইতেন; যুবকও অতিশয় মনোযোগের সহিত সে কথা শ্রবণ করিতেন। শকসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর কিরূপে ধীরে ধীরে সদ্ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে তৎকালে বৃদ্ধের সমকক্ষ আর কেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৃদ্ধ, বোধ হয়, আর্য্যাবর্ত্তের নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সদ্ধর্ম্মের অবনতির কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সদ্ধর্ম্মের শাখাভেদ ও শাখাসমূহের মধ্যে কলহ, হীনযান মহাযানের দ্বন্দ্ব কোন্ বিষয়ে, কোন্ ভুক্তিতে, কোন্ নগরে, কোন্ সময়ে, কি ভাবে হইয়াছিল, তাহা

বৃদ্ধের জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করিতেছিল। সময় বুঝিয়া কূটবুদ্ধি, ভীরু, কাপুরুষ ব্রাহ্মণগণ কিরূপে ধীরে ধীরে উত্তরাপথের নানাদেশে শীর্ষ উত্তোলন করিতেছিল বৃদ্ধ তাহা অবগত ছিলেন। লিচ্ছবীবংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সদ্ধর্ম্মের কতদূর অনিষ্টসাধন করিয়াছিলেন বৃদ্ধ তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতেন। কিরূপে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ উত্তরাপথে পুনরায় মুখ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিরূপে ব্রাহ্মণগণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা সত্বেও উত্তরাপথবাসিগণ রাজভয়ে পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের পদানত হইয়াছিল, আত্মবিচ্ছেদে দুর্ব্বল বৌদ্ধসঙ্ঘ কিরূপে ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পাতিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে করিতে বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেন। অবশেষে কুমার গুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্তের রাজত্বকালে কিরূপে ব্রাহ্মণগণ রাজবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনা-দিগকে ভিক্ষু ও শ্রমণগণের সমকক্ষ বলিয়া পরিচয় দিতেন সে কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধের সহবাসে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী যুবকও ব্রাহ্মণদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। উভয়ে এইরূপে আমাদিগের নিকট দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক দিন প্রভাতে যুবক বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের বিচ্ছেদের সময় সন্নিকট হইয়াছে; স্থবির শীঘ্রই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতনের অন্বেষণে মহাযাত্রা করিবেন, যুবকের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে দিন আসিল; বৃদ্ধের দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড বহু চেষ্টা করিয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শ্বাস আহরণে অসমর্থ হইল, জীর্ণ পঞ্জর যথাসাধ্য চেষ্টা করি-য়াও হৃৎপিণ্ডের সহায়তা করিতে সমর্থ হইল না; ধীরে ধীরে বৃদ্ধের ক্লান্ত দেহ সুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিল। যুবক শূন্য হৃদয়ে শূন্য দেহের পার্শ্বে বসিয়া মহা-শূন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দিনাতিপাত করিলেন। শূন্যভারা-ক্রান্ত হৃদয়ে বৃদ্ধের লঘুভার দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে জীর্ণ পর্ণকুটীরের জীর্ণ দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া যুবক স্তূপসন্নিধান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর বহুদিন মনুষ্য দেখি নাই। স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্মে প্রবল বায়ু জীর্ণ কুটীরের আচ্ছাদনতৃণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, বর্ষার পর বর্ষা আসিয়া কুটীরের প্রাচীন কাষ্ঠদণ্ড-গুলিকে প্রাচীনতর করিয়াছে, বসন্তে কুটীরের জীর্ণপঞ্জর শ্যামল তৃণে ও নবীন

লতিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, পুনরায় গ্রীষ্মে তৃণ, পত্র, পুষ্প শুষ্ক হইয়া ধূলিতে পরিণত হইয়াছে। স্তূপের যে স্তম্ভগুলি তখনও পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল মনুষ্যহস্তে মার্জ্জনার অভাবে সেগুলি পিচ্ছিল শৈবালময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ে বুদ্ধের সমাধির উপরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কালক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃক্ষটি দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হইলে তাহার চতুঃ-পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। নিদাঘে দ্বিপ্রহরে নানাবিধ মৃগ আসিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত, ও সন্ধ্যাগমে পুনরায় নিবিড় বনমধ্যে প্রস্থান করিত। তবে বৃক্ষের আকারবৃদ্ধির সহিত আর একটি ঘটনা ঘটিতেছিল, তাহাতে আমাদিগের বিশেষ উপকার হয় নাই। বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাসমূহের ভারে নানাস্থানে দণ্ডায়মান প্রাচীন স্তূপবেষ্ট-নীর স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ পতিত হইতেছিল, বৃক্ষকাণ্ডের স্থূলতাবৃদ্ধির সহিত মূল-গুলির সংখ্যা ও অবয়বৃদ্ধি হইতেছিল এবং তাহার ফলে বহুপ্রাচীন পরিক্রম-ণের পথের পাষাণখণ্ডগুলি স্থানচ্যুত ও উৎপাটিত হইতেছিল। কতকাল ধরিয়া অশ্বত্থবৃক্ষ ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত ছিল তাহা বলিতে আমি অক্ষম। কিন্তু সে বহুকাল হইবে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মানবের আকার আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। সময়ের প্রারম্ভ হইতে সেই সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম সর্ব্বদা সেই কথাই চিন্তা করিতাম। হরিদ্বর্ণ, শৈবালসমাচ্ছাদিত রক্ত প্রস্তরকণমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বদাই প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা হইত। সকলেই পুনরায় মানবদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত, এইরূপ ভাবে দীর্ঘ কাল অতি-বাহিত হইল। মানবের চিরপরিচিত পদশব্দ আমাদিগের আর কর্ণগোচর হইল না।

কোন কোনও দিন দ্বিপ্রহরে পিপাসিত মৃগসমূহ জলান্বেষণে আসিয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত, ইহাদিগের পদচিহ্ন বর্ষা ব্যতীত অপর সময়ে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষতলে দৃষ্ট হইত। এক দিন প্রভাতে দীর্ঘাকার, ক্ষীণদেহ একটি ব্যাঘ্র বৃক্ষতলে ক্লান্তি দূর করিতেছিল এবং সময়ে সময়ে উৎকর্ণ হইয়া বনমধ্য হইতে আগত পদশব্দ লক্ষ্য করিতেছিল। অল্পক্ষণপরে বহু দূরে হস্তি-পদশব্দ শ্রুত হইল। সেই পদশব্দ বনবাসী স্বাধীন করিযূথের আহারান্বেষণে যথেচ্ছ পাদচারণের শব্দ নহে, মনুষ্যকর্ত্তৃক চালিত হস্তীর ধীর—সমভাবে পাদক্ষেপণের শব্দ। শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে শার্দ্দূল অস্থির হইয়া উঠিল।

তখন তাহার দ্রুতবেগে পলায়নের ক্ষমতা নাই; অনুমান হইল, বহুক্ষণ হইতে এবং বহুদূর হইতে কেহ যেন তাহাকে তাড়না করিয়া আনিয়াছে। বহু কষ্টে ব্যাঘ্রটি নিকটবর্ত্তী বেতসকুঞ্জে আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং তাহার পরক্ষণেই বন-মধ্য হইতে লৌহবর্ম্মাবৃত একটি বৃহৎ হস্তী নির্গত হইল। তাহার স্কন্ধে হস্তি-পক ও পৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে জনৈক বৃদ্ধ ও একটি বালক। আঘ্রাণে ব্যাঘ্রের অবস্থান অবগত হইয়া লৌহমণ্ডিত হস্তী ধীরে ধীরে বেতসবনের সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইল। বেতস লতার একটি অঙ্গুলি ঈষৎ কম্পিত হইল। অমনই বালকের হস্তনিক্ষিপ্ত শর ব্যাঘ্রের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইল। আর্ত্ত চীৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া এক লম্ফে ব্যাঘ্র বেতসকুঞ্জ উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে পতিত হইল ও মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। হস্তিপক হস্তীকে উপবেশন করিতে আদেশ করিল; কিন্তু বেত্রলতায় আচ্ছাদিত স্তূপবেষ্টনীর ভগ্ন স্তম্ভে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হস্তী উপবেশন করিতে পারিল না,—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উপবেশন করিল। বৃদ্ধ ও বালক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মৃত ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিলেন। উল্লাসে বালক শার্দ্দূলের দীর্ঘ দেহ হস্তীর নিকট আনয়ন করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে নিষেধ করি-লেন। বালকের উল্লাস প্রশমিত হইল না; ব্যাঘ্রের দেহ লইয়া বালক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। তাহার জীবনে এই প্রথম শার্দ্দূলহনন। সে দেখিতেছিল, তাহার শর ব্যাঘ্রের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়াছে। বৃদ্ধ তখন পশ্চাৎপদ হইয়া বেতসকুঞ্জে বারণের পদস্খলনের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বেতসলতায় আচ্ছাদিত হইয়া প্রাচীন স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ লুক্কায়িত ছিল। সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ভগ্ন পাষাণের অগ্রভাগ উপ-বেশনকালে হস্তীর পশ্চাৎদেশে বিদ্ধ হওয়ায় যাতনায় হস্তী উপবেশন করিতে পারে নাই। তিনি শূলের দণ্ডে বেতসলতা অপসৃত করিয়া পাষাণখণ্ড দর্শন করিলেন। বৃদ্ধের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় শূলহস্তে বেতসকুঞ্জমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। হর্ষোৎফুল্ল বালক পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছিল; সে আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। বালক বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতল হইতে বেতসকুঞ্জে দৌড়াইয়া আসিল, পিতার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের ভাব দর্শন করিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই ভাবে দিন অতীত হইল। বালক ব্যাঘ্র লইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল, গুরু-

ভার বর্ম্মে পীড়িত হইয়া হস্তীও অসুস্থতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে আলোকের অভাব অনুভূত হইলে বৃদ্ধের চিন্তার অবসান হইল। বেতস-কুঞ্জ হইতে অশ্বত্থবৃক্ষতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধ হস্তিপককে হস্তীর বর্ম্ম মোচন করিতে আদেশ করিলেন ও তাহার পৃষ্ঠের আস্তরণ বৃক্ষতলে বিস্তৃত করিতে কহিলেন। আদেশ শ্রবণে হস্তিপক বিস্মিত হইল, কিন্তু নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিল। বৃক্ষতলে কঠিন আস্তরণে পিতা ও পুত্র উপবেশন করিলেন। হস্তিপক হস্তী লইয়া জলান্বেষণে গেল। হস্তিপক প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সন্ধ্যা-কালে সকলে বনমধ্য হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে চারিটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন ও কাষ্ঠস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রামের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে হস্তী ও চতুঃপার্শ্বে অগ্নি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মনুষ্যত্রয় রজনী অতিবাহিত করিলেন। নিশাচর মৃগ-সমূহ রজনীতে জলান্বেষণে আসিয়া অগ্নির ভয়ে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রভাতে হস্তী সজ্জিত করিয়া পিতাপুত্র বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিলেন। তৎপূর্ব্বে দিবালোকে হস্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ইন্ধন অগ্নিকুণ্ডসমূহের চতুঃপার্শ্বে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, কুণ্ডচতুষ্টয় সমভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল ও তাহার ধূম বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছিল। অশ্বত্থবৃক্ষের সান্নিধ্য পরিত্যাগকালে পিতাপুত্রে কথোপকথন হইতেছিল যে, অগ্নি সন্ধ্যাকাল অবধি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে, অশুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলনহেতু ধূমের স্তম্ভ বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইবে, দূরে নগরে ও শিবিরে বনমধ্যস্থ ধূম দৃষ্ট হইলে লোক আসিবে।

অগ্নিকুণ্ডসমূহ দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল, প্রভাতেও অঙ্গার-রাশি হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া আকাশে পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। প্রথম প্রহর অতীত হইলে ধূম লক্ষ্য করিয়া হস্তীর পর হস্তী বহুসংখ্যক মনুষ্য বহন করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসিতে আরম্ভ করিল। কয়েকজন মনুষ্য ব্যাঘ্রের ত্বকচ্ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠে প্রস্থান করিল; কিন্তু অপর সকলে বৃক্ষশাখা ও পত্রের সাহায্যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে অগ্নিকর্ত্তৃক পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ চতুঃপার্শ্বস্থ বেতসকুঞ্জসমূহ ছেদনে সচেষ্ট হইল। সুবর্ণবর্ণ উষ্ণীষ পরিহিত জনৈক যুবক, সম্ভবতঃ কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, অন্যান্য সকলের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। ক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শত হস্ত পরিমিত ভূমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিষ্কৃত হইল। প্রতিদিন দিবসের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রমজীবিগণ পরিশ্রম করিয়া ধীরে ধীরে স্তূপবেষ্টনীর চতুঃ-

পার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড পরিষ্কৃত করিল, তোরণ ও বেষ্টনীর যে কয়েকটি স্তম্ভ তখনও পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল সেগুলি ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইল। অবশেষে শ্রমজীবিগণ কণিষ্ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পাষাণাবৃত পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পাষাণাচ্ছাদিত থাকায় পথে দীর্ঘাকার বৃক্ষাদি জন্মে নাই, তবে স্থানে স্থানে পাষাণ উন্মূলিত করিয়া বৃহৎ অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি বনমধ্যে আসিলে বোধ হইত যে, এই ভীষণ গহনে অতীতে কোন কালে একটি প্রশস্ত বর্ত্ম ছিল। সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই কণিষ্ক-নির্ম্মিত রাজপথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। প্রাচীন নগরোপকণ্ঠে প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীর স্রোতের গতিপরিবর্ত্তনহেতু রাজপথ স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কণিষ্কের সময়ে নদীর উপরিভাগে যে স্থানে রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল সে স্থান হইতে নদী বহু দূরে অপসৃত হইয়াছিল; অন্যান্য পার্ব্বত্য নদীর সহিত যুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র নদী বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল; রাজপথের আচ্ছাদনের পাষাণ স্রোতোবেগে উভয়পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; কণিষ্কের নামযুক্ত পাষাণখণ্ডসমূহ নূতন নদীর উভয় তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বালুকাস্তরে প্রোথিত হইয়া শকরাজের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল। নূতন নদীর উপরিভাগে পাষাণ-নির্ম্মিত নূতন দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইল; কণিষ্কের ক্ষুদ্র সেতু সংস্কৃত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল; নূতন নদীপারে নূতন রাজপথ পুরাতন রাজপথে আসিয়া মিলিত হইল ও পুরাতন রাজ-পথ উত্তরে প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমে বিদিশা পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইল।

ইহার পর একদিন বৃদ্ধ আসিলেন। শুনিলাম, বৃদ্ধকে সকলে রাজসম্বোধন করিল। শুনিলাম, বৃদ্ধের নাম যশোধর্ম্ম দেব; তিনি গান্ধার ও কীর হইতে সমতট ও প্রাগজ্যোতিষের অধীশ্বর। আরও শুনিলাম, সামান্য সৈনিকপদ হইতে সৌভাগ্যবলে বৃদ্ধ রাজপদবী লাভ করিয়াছেন; প্রাচীন রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে; কান্যকুব্জে গুপ্তবংশের কেহ নাই; অনুগাঙ্গপ্রদেশে ও মগধে গুপ্তরাজগণ যশোধর্ম্ম দেবের অনুগ্রহপ্রার্থী। বৃদ্ধ আসিয়া একে একে তোরণের সমস্ত স্তম্ভগুলি পরীক্ষা করিয়া শ্রমজীবিগণকে মৃত্তিকা খননে নিযুক্ত করিলেন। বহু শতাব্দী পরে প্রাচীন পরিক্রমণের পথ সূর্য্যালোক দর্শন করিল; ক্রমে স্তূপের অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি নয়নগোচর হইল। ধীরে ধীরে বহুযত্নে শ্রমজীবিগণ পাষাণের উপর পাষাণ রক্ষা করিয়া মণ্ডলাকারে পাষাণসজ্জা করিল। আমি উৎসুকনেত্রে দেখিতেছিলাম; ভরসা করিয়াছিলাম যে,

ইহারা গর্ভগৃহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে ও তথাগতের শরীর-নিধান উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বোধ হয় মনুষ্যলোকে সে কথা বহুদিন লুপ্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে বিদেশীয় যাত্রিদলকে ভণ্ড শ্রমণগণ স্বরচিত উপাখ্যান শ্রবণ করাইত ও বলিত, কণিষ্ক রাজার তনুত্যাগের দিন ইন্দ্রদেবতা আসিয়া মস্তকে শরীর-নিধান বহন করিয়া তুষিত স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন ও ব্রহ্মা তাহার উপর ছত্র ধারণ করিয়া গিয়াছেন। নিরীহ, ধর্ম্মপ্রাণ, সরলস্বভাব বিদেশীয়গণ শ্রমণগণের মিথ্যা বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সেই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, তোমরাও সেই বৃত্তান্তে আস্থা স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া থাক। আমি যাহা ভরষা করিয়াছিলাম, তাহা হইল না; ক্ষুদ্র বৃহৎ পাষাণখণ্ডসমূহ লইয়া স্তূপ নির্ম্মিত হইল। নির্ম্মাণকালে সর্ব্ববিধ পাষাণ এমন কি ভগ্ন মূর্ত্তিসমূহও স্তূপের উপবিভাগে সজ্জিত হইয়াছিল। কণিষ্কনির্ম্মিত রাজপথ আচ্ছাদনের দুই একখণ্ড প্রস্তরও তাহার মধ্যে ছিল। এই নিমিত্তই তোমরা কণিষ্কের নামাঙ্কিত পাষাণ স্তূপের অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার পিণ্ডমধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলে। স্তূপ সংস্কৃত হইল বটে, কিন্তু বেষ্টনী বা তোরণ-সমূহের সংস্কার হইল না। স্তূপের চারিটি তোরণের সম্মুখে হরিদ্রাবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত পিষ্টকাকৃতি চারিটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। ক্রমে নানাবিধ মূর্ত্তি নগর হইতে আসিতে লাগিল এবং স্তূপের পার্শ্বে নানা স্থানে ক্ষুদ্র মন্দিরসমূহে স্থাপিত হইতে লাগিল।

শ্রমজীবিগণ বহুদিন সংস্কার ও নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। যশোধর্ম্ম একজন সামান্য পদাতিক সৈন্য ছিলেন; স্কন্দ গুপ্তের অধীনে তরুণ বয়সে যুদ্ধব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। তরুণ সৈনিক বৃদ্ধ সম্রাটের পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘকালব্যাপী হূনযুদ্ধে বহু স্থানে অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শত শত যুদ্ধে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রাণরক্ষা করিয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠানের মহাযুদ্ধে সম্রাট নিহত হইলে তিনি বন-বাসে গমন করিয়াছিলেন। তখন বুঝিলাম বৃদ্ধ কে; বেতসকুঞ্জে ভগ্ন পাষাণস্তম্ভ কেন তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল; মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া—একমাত্র পুত্রের আহ্বানে বধির হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কি নিমিত্ত বেতস-বনে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই স্তম্ভপার্শ্বে বৃদ্ধ স্থবির সমাহিত। পর্ণকুটীরের পল্লবিত দণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বেতস-লতা কুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল তাহা বৃদ্ধ দর্শনমাত্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

জীবনদাতা বৃদ্ধ স্থবিরের কথা সহসা মনে উদিত হইয়া বৃদ্ধকে পাষাণবৎ নিশ্চল করিয়াছিল। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর লোকালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুবক তাঁহার জীবনদাতার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বহুকালপরে—জীবনের শেষ সীমায় দণ্ডায়মান হইয়া রক্তবর্ণ পাষাণের স্তম্ভদর্শনে সম্রাটের মনে পরমোপকারী বৌদ্ধ স্থবিরের কথা পুনরায় উদিত হইয়াছিল। বুঝিলাম, বৃদ্ধ সম্রাট গুরুর আদেশে স্তূপ সংস্কার করিতেছেন, সদ্ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সম্রাট এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সসাগরাধরণীর সম্রাট অজস্র অর্থব্যয়ে অগরাজুর স্তূপ পুনঃ নির্ম্মাণ করিতেছেন। শুনিলাম, সমুদ্র গুপ্তের বিশাল সম্রাজ্যে বহির্দ্দেশস্থ দেশসমূহ যশোধর্ম্মের বাহুবলে জিত হইয়াছিল, হিমমণ্ডিত উত্তর দেশীয় পর্ব্বতে, বালুকাতপ্ত উত্তরমরুদেশে, খস ও হূণগণ যশোধর্ম্মের ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে। শুনিলাম,আর্য্যাবর্ত্তে হূনাধিকার লুপ্ত হইয়াছে; বহু রক্তপাতে অর্জ্জিত তোরমানের সম্রাজ্য তোরমানের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; লৌহিত্যতীরে প্রাগজ্যোতিষের রক্তপিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্ম্মের নামে কম্পিত হইয়া থাকে ও গোপনে অন্ধকার রজনীতে পশুহত্যা করিয়া রক্তপিপাসা শান্ত করিয়া থাকে। শুনিলাম, পূর্ব্বসমুদ্রতীরে হরিদ্বর্ণ তালীবনবেষ্টিত মহেন্দ্রগিরিশীর্ষে যশোধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে; তুষারমণ্ডিত হিমগিরি হইতে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি যশোধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে; আর্য্যাবর্ত্তে সমুদ্র গুপ্তের পরবর্ত্তীকালে কেহ আর এতাদৃশ বিশাল সম্রাজ্যের অধীশ্বর হয় নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধৰ্ম্ম।

(সংস্কৃত হইতে)

পথে পান্থ মিত্র হয় ভ্রমণ-সময়,
বিদেশে স্বদেশী, গৃহে স্বজননিচয়;
ধৰ্ম্ম কিন্তু মিত্র রহে জন্ম জন্মান্তরে
সর্ব্বকাল সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র বিচরে।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু—কবিশেখর।

য়ুরোপ ভ্রমণ।

লুসার্ণ।

সুইট্‌জার্লণ্ড কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত; প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভাবে শাসিত; আবার সবগুলি মিলিয়া এই সমগ্র দেশের প্রজাসভা গঠিত। ফলতঃ গোটাকয়েক স্থুল বিষয় (শুল্ক সৈন্যবল প্রভৃতি) ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে এই সব প্রদেশ স্বস্বপ্রধান। এই প্রদেশগুলি ক্যাণ্টন নামে অভিহিত। চারিটি ক্যাণ্টনের মধ্যে স্থিত বিশাল হ্রদের—যাহার ইংরেজি নাম লুসার্ণ হ্রদ এবং দেশীয় নাম চারি ক্যাণ্টনের হ্রদ—উপর লুসার্ণ নগর অতি মনোরম। হ্রদ হইতে খরস্রোতা রয়েস্ নামক নদী নির্গত হইয়াছে। এই নদীর উৎপত্তি-স্থানে ও তাহার দুই পার্শ্বে এই নগর।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের প্রায় সকল হ্রদই অতি সুন্দর; কিন্তু বোধ হয় লুসার্ণ হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা প্রায় ২৪।২৫ মাইল দীর্ঘ ও ১।১॥০ মাইল প্রশস্ত; জলের বর্ণ গাঢ় হরিৎ, কিন্তু অতি পরিষ্কার, নৌকার উপর হইতে ৩০।৪০ ফুট নিম্নে মৎস্য সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার পর আবার চতুঃপার্শ্বে অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ সকল দণ্ডায়মান; কেহ বা (পিলাটুস্) একেবারে বৃক্ষতৃণহীন তুষারমণ্ডিত, কেহ বা (রিগি) বৃক্ষচ্ছায়া-সমাকুল এবং হোটেলবৃন্দপরিশোভিত। মধ্যে মধ্যে দুই একটি দ্বীপ রহিয়াছে; একটি দ্বীপের উপর পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। বাস্তবিকই এই হ্রদ নয়নমনোমুগ্ধকর।

লুসার্ণ ষ্টেশনে নামিলেই সম্মুখে হ্রদ দৃষ্টিগোচর হয়। হ্রদের পার্শ্বেই প্রস্তর-নির্ম্মিত রয়েসের প্রকাণ্ড সেতু। অপর কূলে হ্রদের তীর দিয়া প্রায় ১॥০ মাইল দীর্ঘ পথ; দুই পার্শ্বে বাদামগাছ। এই পথ বড় মনোরম। পথের অপর পার্শ্বে অতি প্রশস্ত রাস্তা—তাহাতে নানারূপ যানাদি চলিতেছে এবং রাস্তার উপর অনেক সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য ও বাগান দেখা যাইতেছে। একধারে এইরূপ হরিৎ বর্ণ হ্রদ, অপরধারে এইরূপ বাড়ী ও বাগান দেখিতে কিরূপ সুন্দর তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বাটীগুলির অধিকাংশই হোটেল এবং খেলাধূলার আড্ডা ক্লাবগৃহ (Kursaal) প্রভৃতি।

লুসার্ণ।

Art Press

Engraved by Cari Halftone Co., Calcutta.

পূর্ব্বকথিত সেতুর ঠিক মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড তাপমান যন্ত্র বসান। এই সেতু ভিন্ন রয়েসের উপর আরও ৫।৬টি সেতু আছে। তাহার মধ্যে দুইটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, এবং আচ্ছাদিত। এই দুইটি সেতুর ভিতরের দিকে গাত্রে ও ছাতে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত। যদিও চিত্রগুলি এখন মলিন হইয়া আসিয়াছে, তথাপি দেখিতে মন্দ নহে। প্রথম কাষ্ঠ-সেতুর মধ্যস্থলে জলমধ্যে একটি কাষ্ঠময় গোলঘর দেখা যায়। এই ঘরে নাকি ম্যুনিসিপাল কাগজ পত্র সংরক্ষিত। অতি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন লুসার্ণে দেখিবার জিনিস দুইটি ঃ—

(১) সিংহমূর্ত্তি—সুইস সৈন্য প্রাচীন ফরাসীস্ রাজাদিগের শরীররক্ষী ছিল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রায় ৮০০ প্রভুভক্ত সুইস সৈন্য রাজাকে রক্ষা করিতে গিয়া হত হয়েন। তাঁহাদের স্মরণার্থ এই মনুমেণ্ট। একটি পাহাড়ের গাত্রে গুহা নির্ম্মিত, সেই গুহায় প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ এক সিংহ শূলবিদ্ধ অবস্থায় পতিত, হস্তপদদ্বারা পদ্ম (ফ্রান্সের রাজশ্রী) সংরক্ষণে সচেষ্ট। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ঐ পাহাড় হইতেই ক্ষোদিত, অন্যত্র গঠিত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত নহে।

(২) গ্লেসিয়ার গার্ডেন—এই স্থানে বহু পুরাতনকালে গ্লেসিয়ার বা তুষারবাহু হইতে কিরূপে পাতর খসিয়া শিলা বাহির হইত তাহা দেখা যায়। কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই স্থানে ৩টি Glacier mills আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে এখন জল দিয়া তুষারবাহুর স্বরূপ দেখান হয়। তদ্ভিন্ন এই স্থলে আল্পস পর্ব্বতের সর্ব্ববিধ প্রাণী ও বৃক্ষাদি দেখান হয়, পশুপক্ষীগুলি অবশ্য সবই মৃত—stuffed; তদ্ভিন্ন আল্পসের উপর যাত্রীদিগের জন্য যে সকল কুটীর নির্ম্মিত (chalet) আছে তাহারও একটি এই স্থানে রহিয়াছে। সেই চতুর্দ্দিকে প্রায় উন্মুক্ত—সামান্য তৃণমণ্ডিত একটি সামান্য কুঁড়ে দেখিয়া সন্ধ্যাগমশঙ্কাকুল পথহারা পথিকের মনে কি সুখেরই উদয় হয়! এইরূপ কুটীর পাহাড়ের উপর অনেক স্থানেই আছে; না থাকিলে পাহাড়ে রাত্রিবাস করিলে সে রাত্রির আর অবসান নাই।

লুসার্ণ হইতে এক দিন রিগিশৃঙ্গে গিয়াছিলাম। হ্রদের উপর দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা এক ছোট ষ্টীমারে যাইয়া ভিট্‌স্নাউ (Vitznau) নামক স্থানে নামিতে হয়। এই স্থান হইতে পার্ব্বত্য Rack and pinion রেলওয়ে। ব্যাপারটা চমৎকার। সব রেলপথে যেমন দুইখানা রেল পাতা থাকে তাহা ত আছেই, তদ্ভিন্ন মধ্যে আর একখানা রেল, তাহাতে কাঁটা কাঁটা মত খাঁজ আছে। গাড়ির সাধারণ চাকা ভিন্ন মধ্যে আর একখানা ছোট চাকা; সেই

ছোট চাকাখানা মাঝের রেলের কাঁটায় জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে,—পাছে গড়াইয়া পড়ে। একখানামাত্র গাড়ি, দুইটা কামরা, ২৪ জনের স্থান হয়। এঞ্জিন পশ্চাতে থাকে, গাড়ীখানা ঠেলিয়া উঠে। সম্মুখে একজন লোক কোদালী হস্তে বসিয়া পথের বরফ কাটিতে কাটিতে যায়। লাইন অত্যন্ত খাড়া, Gradient প্রায়। in 4. গাড়িতে বসিতে কিছু কষ্ট হয়। এইরূপ ভাবে প্রায় সার্দ্ধ চারি মাইল যাইতে হয়। শেষের ১।৷০ মাইল একেবারে বরফে আবৃত।

ভিট্‌স্নাউ ছাড়িয়া একটু উঠিলেই বামে লুসার্ণ হ্রদের শোভা নয়নগোচর হয়। প্রত্যেক সেকেণ্ডে হ্রদ সরিয়া যাইতেছে ও নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইতেছে! ভিট্‌স্নাউ ছাড়িয়া মিনিট পনের পরেই দেখি, লাইনের ধারে ধারে গাঁজলার মত কি রহিয়াছে, ক্রমে বুঝিলাম ইহাই তুষার। শৃঙ্গোপরি যখন উঠিলাম তখন দেখি, চতুর্দ্দিক একেবারে তুষারমণ্ডিত। প্রথমে হোটেলে ঢুকিয়া কিছু খাইয়া লইলাম,তাহার পর হোটেল হইতে পার্ব্বত্য যষ্টি (Alpen-stock) সংগ্রহ করিয়া স্থানদর্শনে বাহির হইলাম। হোটেল শৃঙ্গের উপর অবস্থিত; তবে একেবারে সর্ব্বোচ্চ স্থানে নহে। সর্ব্বোচ্চ স্থলে একটি কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মিত; তাহারই উপর দাঁড়াইয়া বিখ্যাত Ponorama দেখিতে হয়। যখন হোটেল হইতে বহির্গত হইলাম তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বরফ পড়িতেছে; ভাবিলাম, এত চেষ্টা বৃথা হইল, আমার ভাগ্যে Ponorama দর্শন নাই। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় কিছুক্ষণ পরেই বরফ পড়া থামিল ও কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। প্রায় কুড়ি মিনিট আকাশ বেশ পরিষ্কার রহিল। চতুর্দ্দিকে তুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী, নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন হ্রদ, কোথাও বা শস্যক্ষেত্র, কোথাও বা শুধু গাছপালা, কোথা বা পিপিলিকাশ্রেণীবৎ রেলগাড়ি চলিতেছে: কোনও পাহাড় হয় ত একেবারে তৃণহীন,শুধু বরফ,কোনও পাহাড় বা বৃক্ষলতাসুশোভিত অথচ বরফমণ্ডিত। চারি শত মাইলব্যাপী এই দৃশ্যের সম্যক বর্ণনা করা বা সে চিত্র চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত করা চিত্রশিল্পীর পক্ষেও সহজসাধ্য নহে, আমি ত কোন্ ছার। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও মন ভক্তিরসাপ্লুত হয়। মিনিট কতক পরে খুব বরফ পড়িতে লাগিল। আমি Alpenstock এর ফলা দিয়া সেই মঞ্চের উপর N. K. B. ক্ষোদিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। হোটেল অতি নিকটে; পথ হারাইবার কোনই ভয় নাই; আর একটু গা ঝাড়া দিলেই বরফ সব

পড়িয়া যায়, ঠাণ্ডা লাগিবার কোনও আশঙ্কা নাই। বরফ লইয়া পিণ্ড—Snowball করা প্রভৃতি যাহা সব পড়া ছিল, খেদ মিটান গেল। কিছুক্ষণ পরে হোটেলে ফিরিলাম। তথা হইতে বাটীতে ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে Picture Postcard পাঠান গেল। যখন গাড়ির সময় হইল তখন বরফ আরও বেগে পড়িতেছে ও আকাশ প্রায় কুজ্‌ঝটিকা মণ্ডিত। যদিও হোটেলের নিম্নেই রেলের ষ্টেশন (কুটীর মাত্র) এবং পথও সরল তবুও সেই সময়ে ছাতা ঘুরিতে হইয়াছিল।

পুনরায় সেই পথে লুসার্ণে ফিরিয়া আসিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, হ্রদের ধারে এক স্থানে এক কাষ্ঠময় Weird মূর্ত্তি ঠিক জলের ধারে অবস্থিত আছে। শুনিলাম, যীশুর মূর্ত্তি। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যত গির্জ্জার ঘড়ি সব এক কাঁটা—বড় কাঁটাটা নাই। বোধ হয়, ইহারা তত বেশী ব্যস্ত নহে। য়ুরোপের অন্যদেশবাসীরা সদাই ব্যস্ত, পাছে এক মিনিট সময় বৃথা ক্ষেপণ হয়। সুইট্‌-জারল্যাণ্ডবাসীরা নাকি প্রধানতঃ কৃষিজীবী; তাই ইহাদের অত ব্যস্ততা নাই।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড কৃষিপ্রধানদেশ শুনিয়া হয় ত অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। এ দেশের সাধারণ লোকের কৃষিই একমাত্র ব্যবসায়। যেখানে সেখানেই দেখা যায়, বড় বড় শস্য-ক্ষেত্র না হয় ঘাসের জমী। ঘাস খুব বড় বড়। পাহাড়ের গাত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজ ক্ষেত্র, দেখিতে খুব সুন্দর। তদ্ভিন্ন এ দেশের গরু খুব বৃহদাকার এবং খুব মূল্যবান্‌। শুনিলাম, দেড়মাস বয়সের গোবৎস ১২০০ হইতে ১৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এ দেশের লোকের অবস্থা খুব সচ্ছল নহে, অন্য য়ুরোপী দেশের তুলনায় ইহারা খুব দরিদ্র, তবে হোটেলের কৃপায় ধনী ইংরাজ—বিশেষতঃ মার্কিণ যাত্রীর পয়সায় অনেক লোক প্রতিপালিত হয়।

এ দেশের আর এক অদ্ভুত ব্যাপার সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জাতীয় কোনও ভাষা নাই। কতক লোকের মাতৃভাষা জার্ম্মান, কতকের ফরাসীস্‌ এবং কতকের ইতালিয়। একজন সুইস্‌ ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, কতকগুলি আদিম নিবাসী নাকি পর্ব্বতে বাস করে, তাহাদের একটি বিভিন্ন ভাষা আছে।

অন্য য়ুরোপীর দেশের ন্যায় এ দেশেও শিক্ষা সাধারণ ও অবৈতনিক। মেয়েদের ৮ বৎসর বয়স হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতে হয়। সকালে আটটা হইতে বারটা ও অপরাহ্নে দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত স্কুল বসে।

এই গরিব দেশে আয়কর শতকরা ৮।০ আনা দিতে হয়; আর আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ২॥/১৫মাত্র।

উকিলের অবস্থা এ দেশে বড় ভাল নহে। রাজধানীর কথা জানি না, কিন্তু অন্যান্য সহরে কোথাও বাৎসরিক ১০০০ পাউণ্ডের বেশী আয়ের উকিল নাই। তবে বলা উচিত, লোকসংখ্যার অনুপাতে মোকর্দ্দমার সংখ্যায় ইঁহারা আমাদিগকে হাঁরাইয়াছেন।

রিগি হইতে ফিরিবার সময় ষ্টীমবোটে এক মার্কিণ ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি আমার নিকট ভারতবর্ষের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং বিনিময়ে আমাকে মার্কিণ রাজনীতির কথা কিছু বুঝাইয়া দিলেন।

লুসার্ণ হইতে Interlaken (ইণ্টারলাকেন) নামক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। লুসার্ণ হইতে রেলে ও ষ্টীমবোটে প্রায় ৫ ঘণ্টার রাস্তা। মানুষ কি রকম ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক তাহা এই দিন যথেষ্ট উপলব্ধ হইয়াছিল। যখন লুসার্ণ হইতে যাত্রা করি তখন খুব ঠাণ্ডা, সবেমাত্র বরফ পড়া বন্ধ হইয়া Sleet পড়িতেছে (Sleet যতক্ষণ আকাশে থাকে ততক্ষণ বরফ, মাটীতে পড়ে জল)। এ দেশের সব রেলে গরম করার যন্ত্র ও তাপমান যন্ত্র থাকে। গাড়িতে আমি একা, কাযেই নির্ব্বিবাদে গরম করা যন্ত্রটি খুলিয়া দিলাম। ট্রেণ মৃদু মন্দ গতিতে পাহাড়ের উপর উঠিতেছে; ঝুপ্ ঝুপ করিয়া বরফ পড়িতেছে; হঠাৎ অসহনায় গরম বোধ হইল। চাহিয়া দেখি, তাপ মাত্র ২০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্। কষ্ট এত অধিক হইতে লাগিল যে, কল বন্ধ করিয়া কোট খুলিয়াও তাহার নিবৃত্তি হয় না! ষ্টেশনে অনেক আকার ইঙ্গিতে তৃষ্ণা জানাইয়া দুই গেলাস সেই কন্‌কনে জল পান করিয়া তবে ধড়ে প্রাণ আইসে। বলা উচিৎ, সেই ঠাণ্ডায় শীতল জল পান করা দেখিয়া ষ্টেশনের লোকগুলা বিস্ময়ে চাহিয়া ছিল।

সুস্থ হইয়া পথের শোভা দেখিতে লাগিলাম। তখনও পাহাড়ের উপর রেল উঠিতেছে, দুই ধারে কেবল পাহাড়, বরফ, পাইনগাছের সারি ও অসংখ্য ঝরণা। পাইনগাছের একরকম সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। মাটীর উপর দিয়া কোথাও কোথাও পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে। পাহাড়ে যায়গা, মধ্যে মধ্যে জল বেশ স্তরে স্তরে নামিতেছে, দেখিতে বড় সুন্দর।

পথের ধারে Lungern নামক ক্ষুদ্র গ্রামের বড় চমৎকার শোভা। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত, একটি বাটির ন্যায় (Cupshaped) স্থান, মধ্য দিয়া

Art Press

লুসার্ণ।

Engraved by Carl Halftone Co., Calcutta.

ক্ষুদ্র একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, প্রায় সব বাটীরই খোলার চাল,—সমস্ত বরফে মণ্ডিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রগুলি তুষারাবৃত, দেখিতে বড়ই সুন্দর। গ্রামে মাত্র দুইটি একটু বড় গোছের বাড়ী দেখিলাম, বলা বাহুল্য দুইটিই হোটেল।

Lungern এর কাছে লাইন অত্যন্ত খাড়া এবং ট্রেণ পূর্ব্ববর্ণিত Rack and pinion systemএ চলে। ইহার পরের ষ্টেশন ব্রুনিগ এই লাইনের সর্ব্বোচ্চ স্থান। তথায় দেখিলাম, লাইনের উপর প্রায় ২।৩ হাত বরফ জমিয়াছে। দুইজন মজুর ষ্টেশনের সম্মুখ ভাগ কোদালী দিয়া পরিষ্কার করিতেছে।

এই স্থান হইতে লাইন নামিয়া Brienz (ব্রিয়েন্স) গিয়াছে। তথায় ষ্টীমবোটে চড়িতে হয়। হ্রদের নাম Brienzer See (ব্রিয়েন্সের জি) অর্থাৎ ব্রিয়েঞ্জের হ্রদ (ঠিক বাঙ্গালা ব্যাকরণের সম্বন্ধ পদ)। ইহারও তিন পার্শ্বে পাহাড়—পাহাড়ের গাত্রে অসংখ্য ঝরণা, কোন কোনটি বা হ্রদে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেক পথে জমিয়া গিয়াছে, নিম্নের দিকে চিহ্নমাত্র নাই। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এই হ্রদের এক ষ্টেশনে (Oberried) একটি যুবক নামিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তাহার প্রণয়িনী ঘাটে উপস্থিত। ইহাদের মিলনদৃশ্য দেখিয়া তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রই অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গলাগলি রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, যেন পৃথিবীতে তাহারা দুইজন ব্যতীত অন্য প্রাণী নাই।

Brienzer Seeর পার্শ্বেই Thuner See (থুনের জি) নামক আর একটি হ্রদ। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে Interlaken (ইণ্টারলাকেন হ্রদমধ্য স্থান) অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে আল্পসের প্রসিদ্ধ শিখর Junfrau বা য়ুং ফ্রাউ খুব নিকট; দেখিলে মনে হয় যেন গ্রামের Guardian angelএর ন্যায় গ্রামখানি য়ুং ফ্রাউয়ের অধিকারন্যস্ত। এই জন্য এবং স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া Interlaken খুব প্রসিদ্ধ। আমি এই স্থানে দুই দিন বাস করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম, গুটি দুইতিন বিদ্যালয়, একটি হাঁসপাতাল, গুটি ৪।৫ রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন এবং রাশিকৃত হোটেল। অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম, বোধ হয় ৫।৬ সহস্র মাত্র। স্থানটি আমি যখন গিয়াছিলাম তখন খুবই নিরালা ও শান্ত ছিল, Seasonএর সময় অবশ্য অসংখ্য যাত্রীবর্গের কলনিনাদে মুখরিত হইয়া উঠে।

একটা কথা বলিয়া রাখি, সুইট্জারল্যাণ্ডের রেল পার্ব্বত্য প্রদেশের, কাযেই Tunnel বা সুড়ঙ্গ অসংখ্য। ১ মাইল ১॥০ মাইল সুড়ঙ্গ সুইট্জারল্যাণ্ডের যে অংশে আমি ঘুরিয়াছিলাম, তাহাতে শতাধিক পার হইয়াছি, তদপেক্ষা ছোটর ত "লেখা যোকা নাই।"

Inteɪlaken হইতে ফিরিয়া লুসার্ণের পথে লুগানো যাইলাম। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ St Gotehard's Tunnel (সেণ্ট গট্হার্ট সুড়ঙ্গ) এর ভিতর দিয়া রেল আসিল। এই সুড়ঙ্গটি সওয়া নয় মাইল লম্বা। ট্রেণে পার হইতে ১৯ মিনিট লাগিল। সুড়ঙ্গের ভিতর বায়ু বিশুদ্ধ বোধ হইল। বলিয়া রাখা উচিত যে, Sim plon Tunnel এই সুড়ঙ্গ অপেক্ষাও তিন মাইল অধিক দীর্ঘ। পথে উইলিয়ম টেলের গ্রাম এল্টডর্ফ (Altdorf) দেখিলাম।

লুগানোতে মাত্র এক রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। তথায় কিছু দেখি নাই। লুগানোও একটি হ্রদের ধারে অবস্থিত, এই হ্রদের নাম Lago di Lagand বা লুগানোর হ্রদ। লুগানো যদিও সুইটজারল্যাণ্ড দেশে এই হ্রদটি ইটালির অন্তর্ব্বর্ত্তী। হ্রদটি যে সুইস্ নহে তাহা জলের বর্ণেও প্রতীয়মান হয়; জল আমাদের দেশের জলের ন্যায়, সবুজ নহে। এই হ্রদের উপর ষ্টীমারে ইটালি দেশস্থ Customs Examination হইল। এই আমার সপ্তম Custom পরিক্ষা। কোনও বারে কিছু লাগে নাই কিন্তু এবার ছাড়িল না। সঙ্গে হল্যাণ্ডে ক্রীত ত্রিশটি চুরুট ছিল, তাহার জন্য ৭ ফ্রাঙ্ক ১০ সান্তিম (৪।৵০) আদায় করিল! এত করিয়া বলিলাম যে, চুরুটের দাম অত নহে, না হয় চুরুট জলে ফেলিয়া দিতেছি; কিছুতেই কিছু হইল না, টাকা গনিয়া দিতে হইল। তখন নিছাক বাঙ্গলা ভাষায় গালাগালি দিয়া মনের ঝাল ঝাড়িলাম, লোকটি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যখন এই ব্যাপারে Customs Office এর সহিত কলহ করিতেছিলাম, তখন একটি সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক দোভাষীর কার্য্য করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোলমাল চুকিলে তাঁহার সহিত আলাপ হইল, তিনি ইংরাজ ও ডাক্তার; ইটালিতে নিকটবর্ত্তী এক স্থানে বসবাস করেন। লোকটি অতিশয় ভদ্র, নাম এলিয়ট; বলিলেন তাঁহার মাতামহ মাদ্রাজে জজ ছিলেন।

এই হ্রদের চতুঃপার্শ্বও পাহাড়-মণ্ডিত, তবে বরফ নাই। অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহ পাহাড়ের গাত্রে দেখা যায়।

ষ্টীমবোটে Porlezza (পরলেসা) পর্য্যন্ত যাইলাম। তথা হইতে Menaggio (মেনাজিয়ো) পর্য্যন্ত ছোট রেল; ষ্টীম ট্র্যামওয়ে বলিলেও চলে। এই মেনাজিওতে ডাক্তার এলিয়ট বাস করেন। কিন্তু তিনি ট্রেণ পৌঁছিলে বাটী না যাইয়া অগ্রে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আমার গন্তব্য ষ্টীমবোটে তুলিয়া দিলেন, তাহার পর আমার জিনিষ পত্র উঠিলে করমর্দ্দন করিয়া টুপি তুলিয়া বিদায় লইলেন।

এই মেনাজিও Lago di Como বা কমো হ্রদের ধারে অবস্থিত। এই স্থান হইতে ষ্টীমারে কমো যাইলাম।

ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে কমো রেলওয়ে ষ্টেশন প্রায় ১ মাইল; ভাষা জানি না, গাড়ি ভাড়া করা বড় মুস্কিল, যাহা হউক অনেক কষ্টে ১৷৹ ফ্রাঙ্ক দিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, ট্রেণ আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওয়েটিং রুমে থাকিতে হইবে, প্ল্যাটফরমে যাইবার নিয়ম নাই। কি করি, বসিবারও স্থান নাই, দাঁড়াইয়া সময় কাটাইতে হইল।

ট্রেণের ঘণ্টা পড়িলে ভিতরে যাইতে দিল। শুনিলাম, প্ল্যাটফরমের পার্শ্বস্থ লাইনে গাড়ি আসিবে না, নামিয়া দুই লাইনের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; পরে ট্রেণ আসিলে তাহাতে চড়িয়া সন্ধ্যা ৫ টায় মিলানো পৌঁছিলাম (ইংরাজি মিলান Milan)

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

অদৃষ্ট-চক্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়।

"শুনেছ, দিদি, তোমার নূতন ঠাকুর জামাই যে উপস্থিত?"

"সত্য? বল কি?"

"সেজ ঠাকুরপোর সহিত এক গাড়ীতে আসিয়াছে। সেজ ঠাকুরপো সেই কথা বলিবার ছল করিয়া আসিয়া সেজ বৌয়ের দরবারে হাজির।"

"ছিঃ-ছিঃ। দশ দিন বিবাহ হয় নাই, ইহারই মধ্যে শ্বশুরবাড়ী আসা!"

"কর্ত্তার সে দিন জ্বর হইয়াছিল, সেই সংবাদ পাইয়া নাকি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে।"

"হাঁ। ছলের কখন অভাব হয় না। রাধিকাও জল ফেলিয়া দিয়া জল আনিবার ছল করিয়া যমুনায় যাইতেন। এ বাড়ীর সবই নূতন। সেজ ছেলেটি ত লজ্জার মাথা খাইয়াছেন।"

"এ ভাল। বড় ঠাকুরজামাই যেমন 'কালে ভদ্রে' আইসেন—ইনি তেমনই যখন তখন আসিলে 'হরে দরে হাঁটুজল' দাঁড়াইবে। আর এক কথা, দিদি, জামাই 'নেটি পেটি' হওয়া ভাল।"

"বড়র কি হয় দেখ। 'এইত কলির সন্ধ্যা বইত নয়—পরেই বা কি হয়?' এইবার 'ঘর লাগা' হইয়াছেন; এখন দেখ, আবার কি হয়। বড় চালাক আবার বড় ধরা পড়েন।"

সরোজার সহিত যতীশচন্দ্রের বিবাহের এক সপ্তাহ পরে পিতার আদেশে শ্বশুরকে দেখিবার জন্য যতীশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেই বিষয় লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে তাঁহার প্রথমা ও মধ্যমা পুত্রবধূদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

বিরজা স্বামীর পরীক্ষার পরই শ্বশুরালয়ে যাইয়া ভগিনীর বিবাহের জন্য পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। পরদিন সে আবার পতিগৃহে যাইবে।

সে ঘরে তোরঙ্গ গুছান শেষ করিয়া দালানে আসিলেই জ্যেষ্ঠা বধূ বলিলেন, "শুনেছ, ঠাকুরঝি, হাল আইনে তোমাদের পুরাতন ব্যবস্থা আর চলিবে না।"

বিরজা হাসিয়া বলিল, "কি বড় বৌদিদি? তোমার কি সোজা কথা বলিতে নাই?

"কি করি বল, ঠাকুঝি, আমরা বাঁকা মানুষ ঠাকুর জামাইয়ের মত সোজা কথা কোথায় পাইব?"

মধ্যমা বলিলেন, "তুমি শুন নাই?"

বিরজা বলিল, "কি?"

"নূতন ঠাকুর জামাই যে উপস্থিত!"

বিরজা বিস্মিত ভাবে ভ্রাতৃজায়ায় দিকে চাহিল।

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, কেমন, ঠাকুরঝি,—এ ব্যবস্থা নূতন কি না? আমাদের এক ঠাকুর জামাই ত বিদেশে বিদেশেই ঘুরেন, আর একজন পড়ার ছুতা করিয়া এ পাড়া মাড়ান না; এবার আবার আর এক রকম দেখা গেল। বলে—

'কালে কালে দেখ্‌ব কত!
দেখে দেখে হ'লাম হত।'

কি বল?"

বিরজা বলিল, "তা, বড় বৌদিদি, নূতন রকম দেখাই ত ভাল। এখনই হত হইবে কেন? বালাই!"

যখন তিনজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন তাহার সেজ বৌ-দিদির সঙ্গে সরোজা ঘাট হইতে ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া বড় বধূ বলিলেন, "সরোজা, আহ্লাদে যে আর মাটীতে পা পড়ে না!"

সরোজা সহসা এ মন্তব্যের কারণ অবগত ছিল না—বুঝিতেও পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি, বড় বৌদিদি?"

বড় বধূ বলিলেন, "বাহিরে যাইয়া দেখ।"

সরোজা ও সেজবৌ চলিয়া গেলে বড় বধূ মধ্যমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা দেখ, ভাই, যদি এবার সরোজা হইতে সেজবৌয়ের অপবাদ ঘুচে। আমার ত বোধ হয় এবার তাহার দোসর জুটিল।"

মধ্যমা হাসিলেন।

বিরজার মুখে কিন্তু একটু ভাবনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সরোজার বিবাহের রাত্রিতে গৃহে বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে তাহার মুখে যে

চিন্তার ছায়াপাত হইয়াছিল—আজ যেন তাহা একটু নিবিড় হইয়া উঠিল। বিবাহ-সভায় বরাসনে আসীন বরকে দেখিয়া বিরজার মনে হইয়াছিল—সে পূর্ব্বে যতীশকে দেখিয়াছে। কোথায় দেখিয়াছে—কবে দেখিয়াছে—সে কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না। স্মৃতি যখন সহসা আমাদের সঙ্গে এইরূপ লুকাচুরী খেলে তখন একটা অব্যক্ত চাঞ্চল্যে মন ব্যথিত হয়। বিরজার যখন তাহাই হইতেছিল তখন সহসা মেঘান্ধকার নিশায় বিদ্যুদ্বিকাশে প্রকৃতির মূর্ত্তি যেমন মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট দেখা যায় অমূল্যচরণকে দেখিয়া তেমনই তাহার স্মৃতিতে পূর্ব্বকথা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, এক দিন ভাদ্রের অপরাহ্নে নৌকা-যাত্রী একদল যুবকের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য সে ঘাট হইতে দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল। যতীশচন্দ্র সেই দলে ছিল—অমূল্যচরণও ছিল, অমূল্যচরণ নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচে দূরবীক্ষণ দিয়া স্নানের ঘাটে কুলাঙ্গনাদিগকে দেখিতেছিল। সেই কুলাঙ্গারকে দেখিয়া সে দিন বিরজা ভাবিয়াছিল—ইহাদিগকে আপনার অন্ধকার অতলতলে লইয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী পৃথিবীর পাপভার লাঘব করেন না কেন? আজ তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায়—লজ্জায়—ক্রোধে তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে চাঞ্চল্য দূর হইয়া গেল—দারুণ আশঙ্কায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যাহার করে তাহার মাতৃহীনা ভগিনীর কর অর্পিত হইবে—সে ত ইহারই বন্ধু! ইহাই কি তাহার স্নেহের পুত্তল সরোজার ললাট-লিখন? তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই যাইয়া পিতাকে সকল কথা বলে। কিন্তু সে সহজেই বুঝিল, এখন বিবাহ-সভায় বর উপস্থিত; এখন বাগ্‌দত্তা ভগিনীর বিবাহ ভঙ্গ করা অসম্ভব। সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। বিরজা আর ভগিনীর বিবাহের উৎসবে অবারিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা।

সেই দুশ্চিন্তা লইয়া বিরজা এ কয় দিন কাটাইয়াছে। ব্রজেন্দ্রকে এ কথা বলিয়া সে তাহার মতামত জানিবার জন্য ব্যস্ত। ব্রজেন্দ্রের মতামতে কি হইবে তাহা সে জানে না; কিন্তু সে তাহাতে এ কথা না জানাইতে পারিলে তাহার হৃদয়ের ভার কমিতেছে না। যখন হৃদয়ের বেদনাভার নিতান্তই দুর্ব্বহ হইয়া উঠে তখন মানুষ, যেন সহজাত সংস্কারবশে, জগদতীত কোন মহাশক্তিকে সে বেদনার কথা জানাইতে প্রবৃত্ত হয়—দেবতার চরণে আপনার বেদনা জানাইয়াই সে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে। বিরজা তেমনই

তাহার যৌবনের স্বপ্ন—তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব—তাহার হৃদয়ের দেবতা—তাহার বাঞ্ছিত—তাহার উপাসিত স্বামীকে এ দুশ্চিন্তার কথা বলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সে কথা বলিবার অবসর পায় নাই। সরোজার বিবাহের পরদিন—বর ও বরযাত্রীদিগের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজেন্দ্র গৃহে ফিরিয়াছিল। সে জানিত, তাহার জননী সংসারে একমাত্র সম্বল পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাই সে কখনও গৃহ ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সে ফিরিয়া গিয়াছিল। বিরজা তাহার দুশ্চিন্তার—আশঙ্কার কথা স্বামীকে জানাইতে পারে নাই। এ কয় দিন তাহার মনের কথা মনে থাকিয়া মনকেই ব্যথিত করিতেছিল। অতর্কিত আশঙ্কার তীব্রতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বিরজার মনে আশার সঞ্চারও যে না হইয়াছিল এমন নহে। সে বহুবার মনকে বুঝাইতে চাহিয়াছে—হয় ত সে ভ্রান্ত। কবে দূর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য সে যুবকদিগকে দেখিয়াছিল—(সে ত একবারের অধিক তাহাদিগের দিকে চাহে নাই।) সুতরাং তাহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। আশার ও আশঙ্কার ছায়ালোক এ কয় দিন তাহার হৃদয়ে খেলা করিয়াছে। আজ যতীশ উপস্থিত। যতীশ যখন জলযোগের জন্য অন্তঃপুরে আসিল—তখন বিরজা আবার ভাল করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিল। এ মুখ সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। হৃদয়ে আশার আর অবকাশ রহিল না—আশঙ্কা তথায় স্থায়ী হইয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যায় ব্রজেন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিল; পরদিন পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবে। বিরজা জানিত, ব্রজেন্দ্র আসিবে। যে কথা তাহার মনে গুরু ভারের মত ছিল তাহা স্বামীকে বলিবার জন্য প্রবল ব্যাকুলতা আজ তাহার স্বামীসন্দর্শনব্যাকুলতাকে যেন দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছিল। সে যখন শুনিল, ব্রজেন্দ্র আসিয়াছে তখন সে যেন আকূলে কূল পাইল।

তাহার পর রাত্রিতে স্বামীস্ত্রীতে যখন সাক্ষাৎ হইল তখন বিরজার আবার ভাবনা উপস্থিত হইল—কেমন করিয়া কথাটা আরম্ভ করে। ব্রজেন্দ্র দেখিল; বিরজার প্রফুল্ল মুখে একটু ভাবনায় অন্ধকার লাগিয়া রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ? পিত্রালয় হইতে যাইতে হইলেই বুঝি দুঃখানুভব হয়?"

বিরজা বলিল, "তাহা তোমরা কি বুঝিবে?"

"কেন শাশুড়ীকে বুঝি বড় ভয় করে?"

"কাহারও কাহারও করে সত্য; কিন্তু আমার সে ভয়ের কারণমাত্র নাই। বরং এতদিন যে মাতৃস্নেহ লাভে বঞ্চিতা ছিলাম, এখন তাহাই লাভ করিয়াছি।"

"তবে ভাবনা কিসের?"

"তোমাকে একটা কথা বলিব।"

"কি?"

তখন বিরজা সেই ভাদ্র মাসের অপরাহ্নে স্নানের ঘাটে নৌকারোহী-দিগের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথা বলিল, তাহার সন্দেহের—তাহার আশঙ্কার সকল কথা স্বামীকে বলিল।

সে কথা শুনিতে শুনিতে ব্রজেন্দ্রের মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষা কি মানুষের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তনই করিতে পারে না?

বিরজার কথা শেষ হইলে বিস্ময় ও বিরক্তি গোপন করিয়া ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তবে দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বেই 'শুভদৃষ্টি' হইয়াছিল!"

বিরজা বলিল, "তুমি রঙ্গ রাখ। আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।"

"ভাবনার কথাই বটে।"

"এখন উপায় কি?"

"চারি হাত এক হইয়াছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে নবীনচন্দ্র তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়াছেন—

'—হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হ'বে ভাবিয়া এবে?'

এখন ভরসা সরোজার অদৃষ্ট।"

বিরজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

ব্রজেন্দ্র বলিল, "তবে আশঙ্কার অবকাশও যেমন আছে—আশার অবকাশও তেমনই আছে। যতীশ তরুণ যুবক। ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়াছে। সে কুসঙ্গের কুপ্রভাব তাহার হৃদয় মলিন করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। একদিকে অধ্যয়ন, অন্যদিকে প্রেম এই দুই পুণ্য প্রভাবে তাহার হৃদয় অবশ্যই পাপকে পরিহার করিবে।"

তাহার পর পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল, "বিশেষ তোমরা যখন অঘটনও ঘটাইতে পার—তখন আর ভয় কেন?"

বিরজা উৎকর্ণ হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল। স্বামীর কথায় তাহার

আশঙ্কা প্রশমিত হইল ; সে আশার আশ্রয় হইল। স্বামীর কথাতেই তাহার বিশ্বাস। জগতে যে প্রেমে এইরূপ বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না—তাহার মত দুর্ভাগ্য আর নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

পতিগৃহে।

"মা তুমি এত সকালে উঠিয়া কায করিতে আসিলে কেন ?"

প্রভাতে দিবালোক কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিরজার শ্বাশুড়ী স্নান করিয়া ঠাকুর ঘর মুছিয়া—সে ঘরের বাসনগুলি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিরজাও স্নান করিয়া আসিয়াছে—দালানে কুটনা কুটিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মা, তুমি এত সকালে উঠিয়া কায করিতে আসিলে কেন ?"

বিরজা কোন উত্তর দিল না, কুটনা কুটিতে বসিল।

বিরজা মাতৃহীনা—শ্বাশুড়ীর কন্যা নাই। উভয়ের মধ্যে স্নেহসম্বন্ধ এমন নিবিড় ও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছিল যে, শ্বাশুড়ী যেন পুত্রবধূতে কন্যা ও পুত্রবধূ যেন শ্বাশুড়ীতে জননী লাভ করিয়াছিলেন। উভয়ের এই সুমধুর স্নেহসম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রের আনন্দের আর অন্ত ছিল না। সে এতদিন অধ্যয়ন লইয়া স্বেচ্ছায় আপনাকে সংসারের সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। আজ যেন তাহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। আর আজ যখন সে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে তখন সে দেখিতেছে—ফাল্গুনে প্রকৃতি যেমন আপনার কুসুমসুষমা—ভ্রমর-গুঞ্জন—মেঘমুক্ত আকাশ—পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া বসন্তের জন্য অপেক্ষা করে সংসার তেমনই তাহার সুধাপূর্ণ ভাণ্ড লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জননীর স্নেহে সে অভ্যস্ত—জননীর স্নেহের সে ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই। পত্নীর প্রেমে সে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছিল। আর শ্বাশুড়ীবধূতে এই নিবিড় স্নেহে যেন তাহার সুখপাত্র ছাপাইয়া পড়িতেছিল। সংসারের প্রবেশ পথেই সংসারের এমন মোহন মূর্ত্তি দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

আজ বিরজাকে কায করিতে প্রবৃত্তা দেখিয়া শ্বাশুড়ী আবার বলিলেন, "যাও, মা, আমি কুটনা কুটিতেছি। তুমি যাও—চুল শুকাইয়া লও।"

বিরজা বলিল, "মা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব কেন?"

"মা আমার, আমি আর কয় দিন আছি? সংসার তোমার; সব তোমাকেই করিতে হইবে। তখন যে, মা, কাযে আর অবসর পাইবে না! আমার সংসারে আর ত লোকও নাই। তখন সংসারের কায—ছেলেদের লালন-পালন—কত কায পাইবে। যে কয় দিন আমি আছি, তোমার গায়ে কেন আঁচ লাগিবে, মা?"

এই সময় ব্রজেন্দ্র স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিল। মা'র কথা শুনিয়া সে দ্বারদেশ হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, মা?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিরজা ঘোমটা টানিয়া দিল।

শ্বাশুড়ী তাঁহার নিকট পুত্রবধূকে মস্তকে অবগুণ্ঠন দিতে দিতেন না; বলিতেন, "তুমি আমাকে লজ্জা করিতে পাইবে না।" মা বলিলেন, "এই দেখ্, দুষ্ট মেয়ে আমার কথা শুনে না,—রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে উঠিয়া স্নান করিয়া আমার কায করিতে চাহে।"

ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বড় ত অন্যায়! মা, এখন হইতে তুমি বেলায় উঠিতে আরম্ভ কর—তাহা হইলেই ঠিক হইবে।"

ব্রজেন্দ্র চলিয়া গেল।

মা বিরজাকে বলিলেন, "মা, তুমি যেমন করিয়া সব কায করিতেছ, তাহাতে আমার আর কোন কাযই থাকে না। যতদিন তোমার ছেলেদের লইয়া নূতন কায না পাইতেছি ততদিন তুমি এত কায করিলে আমি কি লইয়া থাকি?"

বিরজা লজ্জায় মুখ নত করিল।

মা বলিলেন, "কর্ত্তার বড় ইচ্ছা ছিল—তোমাকে ঘরে আনিবেন। তাঁহার অদৃষ্টে নাই—তাই তোমাকে ঘরে আনিয়া যাইতে পারে নাই।" মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল।

বাস্তবিক বিরজার আগমনে ব্রজেন্দ্রের গৃহ যেন আনন্দালোকে সমুজ্জল ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সংসারে কোথাও দুঃখের চিহ্নমাত্র ছিল না—বুঝি সম্ভাবনাও ছিল না। সংসারে সুখ দুর্ল্লভ—সেই দুর্ল্লভ সুখভোগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

সেই দিন আহারান্তে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বিরজা দেখিল, ব্রজেন্দ্র তখনও সে কক্ষে আইসে নাই। কক্ষমধ্যে উত্তাপাতিশয্যে সে একখানি মাদুর লইয়া সম্মুখে মুক্ত ছাতে গেল—তথায় মাদুরখানি বিছাইয়া তাহাতে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিল। বৈশাখ মাস। দিবাভাগে রৌদ্রতাপে তপ্ত নগরীর বায়ু যেন অগ্নির মত বোধ হয়। সন্ধ্যার পর গৃহাদি সঞ্চিত তাপ বিকীর্ণ করিতে থাকে। কেবল যে দিন 'কাল বৈশাখী'র কাল মেঘ পশ্চিম গগনে দিনান্তশোভা মুছিয়া প্রকৃতির মুখ অন্ধকার করিয়া দেয়—প্রবল পবন ধূলির ধ্বজা উড়াইয়া অট্টহাস্যে বহিয়া যায়—বিদ্যুদালোকবিচ্ছিন্ন মেঘের হৃদয় হইতে বারি ঝরিয়া দীর্ণ ধরাবক্ষে পতিত হয় সে দিন সন্ধ্যার পর ধৌতধূলি জলকণসঙ্গশীতল সমীরণের স্পর্শ সুখদ বোধ হয়। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু পরুষ পবনে মেঘমালা স্থির থাকিতে পারে নাই—বারিবর্ষণ হয় নাই। আজ আকাশের প্রান্তে প্রান্তে কেবল মেঘের আভাস—লঘু মেঘে শীর্ণ বিদ্যুতের বিকাশ রোগীর শীর্ণ অধরে হাসির মত দেখাইতেছে; গগনমধ্যভাগে মেঘলেশ নাই—সহস্র তারকার দীপ্ত দীপ্তি। এতক্ষণ বাতাস যেন নিশ্চল ছিল। ক্রমে ধরাতলোত্থিত—গৃহাদি-বিকীর্ণ তাপ সরাইয়া দিয়া নৈশ পবন প্রবাহিত হইল;—তাহার স্পর্শে বিরজার বসন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এ দিকে খণ্ড শশী চক্রবাল হইতে উঠিয়া মধ্যগগনে উপনীত হইল।

তাপতপ্ত দীর্ঘ দিবসের পর স্নিগ্ধ পবনের সুখদস্পর্শে বিরজার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ততক্ষণে ব্রজেন্দ্র শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যায় পত্নীকে দেখিতে না পাইয়া সে কক্ষদ্বারে আসিয়া দেখিল, মুক্ত ছাতে মাদুর বিছাইয়া বিরজা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইল—মুগ্ধনেত্রে পত্নীর জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। সে মুখে কি স্নিগ্ধ প্রফুল্ল ভাব! নয়নযুগল মুদিত, যেন অসীম সৌন্দর্য্য ও সৌরভ লইয়া কমল-কোরক দিবালোকাবকাশে ফুটিয়া উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! কয়গাছি চূর্ণ কুন্তল কবরীবন্ধন মুক্ত হইয়া কপালে আসিয়াছে—কেহ স্বেদজড়িত হইয়া কপালে বদ্ধ—কেহ পবন হিল্লোলে বিকম্পিত। ব্রজেন্দ্র মুগ্ধনেত্রে পত্নীকে দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে পত্নীর পার্শ্বে বসিল; তাহার পর ধীরে ধীরে পত্নীর অধর চুম্বন করিল। সুখসুপ্তা পত্নীকে জাগাইবার ইচ্ছা ব্রজেন্দ্রের ছিল না। কিন্তু বিরজা স্বামীর আগমন-

প্রতীক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার নিদ্রা গাঢ় হয় নাই, অধরে অধরস্পর্শে, মুখে তপ্ত শ্বাসস্পর্শে সে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া বিরজা চক্ষু মেলিল না—আপনার অধরে স্বামীর অধর স্পর্শে সে সুখানুভূতি কি মধুর! সেই অনুভূতিতে তাহার শিরায় শিরায় যেন পুলকপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল—তাহার হৃদয় যেন উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ব্রজেন্দ্র উঠিবার উদ্যোগ করিলে সে নয়ন মেলিল। ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমাও নাই ?"

বিরজা বলিল, "হাঁ। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন ?"

"একজন পুরাতন বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিন চারি বৎসর পরে সাক্ষাৎ—কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল।"

"তিনি কলিকাতায় থাকেন না ?"

"না। বিহারে কলেজে অধ্যাপক। ইনি এফ. এ. পরীক্ষায় একজন পরীক্ষক ; ছেলেদের প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করেন।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল, "যতীশ ভায়ার কাগজ ইহাঁর নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।"

বিরজা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "যতীশ পাশ হইয়াছে ?"

ব্রজেন্দ্র বলিল, "না। আমি পূর্ব্বেই ইহাঁকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আজ ইনি আমাকে বলিয়া যাইলেন—যতীশ পাশ হইতে পারে নাই।"

বিরজার মুখ গম্ভীর হইল। তাহার আশঙ্কা হইল—লোক বলিবে সরোজার অদৃষ্টেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। এমন অকারণ—অন্যায় উক্তি লোক করে তাহা সে জানিত।

কিন্তু বিরজা ব্রজেন্দ্রের আশঙ্কার ও উদ্বেগের স্বরূপ জানিত না। শ্বশুরালয়ে বিরজার নিকট যতীশচন্দ্রের সহচরদিগের কথা শুনিয়া আসিয়া সে তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ লইতেছিল।

বাহিরে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচিতের সংখ্যা অধিক ছিল না। সে অধ্যয়ন লইয়া ব্যস্ত থাকিত—গৃহই তাহার জীবনের কেন্দ্র ছিল। কাযেই সে সহজে সে সংবাদ পায় নাই। কিন্তু ক্রমে যে সংবাদ সে জানিতে পারিয়াছিল, তাহাতে তাহার আশঙ্কা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে জানিতে পারিয়াছিল—যতীশচন্দ্র পাঠে যেরূপ অমনোযোগী তাহাতে তাহার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের

নির্দ্দিষ্ট অধ্যয়নে আর অধিক অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। বিশেষ সে যে সঙ্গে মিশিয়াছিল—তাহাতে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ—তরুণ যুবকের পক্ষে বিপথগামী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। অমূল্যচরণ তাহার যশোলাভযাত্রার নৌকার কর্ণধার। তাহাকে বিপথগামী করাই অমূল্যচরণের স্বার্থ। ভদ্রসমাজে এক দল লোক দেখা যায়—তাহারা পয়োমুখ বিষকুম্ভের সহিত উপমেয়, তাহারা বংশ-পরিচয়গুণে ও আদব কায়দায় সমাজের সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়—সমাজে তাহাদের গতায়াত কেবল অপরের সর্ব্বনাশসংসাধন করিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সমাজে তাহাদের মত ভীষণ জীব আর নাই। অমূল্যচরণ সেই দলের একজন। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় যতীশচন্দ্রের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। সে বিপথগামী হইলে ভগিনীর দুঃখে বিরজা কত দুঃখ পাইবে ভাবিয়া ব্রজেন্দ্র চিন্তিত হইয়াছিল।

যতীশচন্দ্রকে সাবধান করিয়া পিচ্ছিল পথ হইতে ফিরাইবার কোন উপায় আছে কি না ব্রজেন্দ্র তাহা ভাবিতেছিল। কিন্তু সে বিরজাকে সব কথা বলে নাই। যাহাকে সত্য সত্য ভালবাসা যায় তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে দুশ্চিন্তার—যাতনার বেদনা হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই মানুষ কত সময় দারুণ বেদনায়—যাতনায় স্বেচ্ছায় আপনাকে স্বজনগণের সহানুভূতি হইতেও বঞ্চিত করে।

জীবন ও মৃত্যু।

যেখানেই হাসিভরা মুখ,
যেখানেই হৃদিভরা স্নেহ।
হে জীবন, তুমি সেই খানে
রচিয়াছ আপনার গেহ॥

অকরুণ নির্ম্মমতাভরা,
যেখানেই ঘোর অন্ধকার।
হে মরণ, তুমি সেই খানে
নিজ রাজ্য করেছ বিস্তার॥

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার।

ম্যালেরিয়ার দ্বারা বঙ্গদেশের কি ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ম্যালেরিয়া যে বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। এই ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহাও বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। মানুষের চেষ্টায় আপাতঃ অসম্ভব বহু কার্য্য সম্ভব হইয়াছে। ম্যালেরিয়া দূর করাও মানবচেষ্টার অতিরিক্ত কার্য্য হইবে না। এ বিষয়ে যাহাতে লোকের চেষ্টা জন্মে, সে বিষয়ে আমাদিগকে প্রথম যত্ন লইতে হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়া থাকেন—

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ”।

আগে কার্য্যটি একান্ত আবশ্যক বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা জন্মান আবশ্যক, পরে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সজ্জনগণের মধ্যে তদ্বিষয়ে আলোচনা, তাহার পরেই অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আলোচনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা প্রথম আবশ্যক।

সুবিধার জন্য আমাদের ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় আলোচনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাউক ঃ—

(১) কি প্রকারে দেশকে ম্যালেরিয়া-শূন্য করা যাইতে পারে?

(২) দেশমধ্যে ম্যালেরিয়া থাকিলেও কি প্রকারে উহার অনিষ্টকারিতার হ্রাস করা যাইতে পারে?

ম্যালেরিয়াকে যে দেশ হইতে বিতাড়িত করা একেবারে অসম্ভব নহে, কলিকাতার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণ হইবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইলেও কলিকাতায় এই রোগের প্রকোপ অতি সামান্য। মানুষের চেষ্টায় দেশের স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হইতে পারে, কলিকাতাই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, একবিধ মশকের দ্বারাই ম্যালেরিয়ার বীজ সহজে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐ

মশকগুলিকে ধ্বংস করিতে পারিলেই, কিম্বা তাহাদের বংশবিস্তারের পথ বন্ধ করিতে পারিলেই, দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইতে পারে। এই জন্যই আমেরিকা ও ইটালির ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানসমূহের মশকগুলিকে বিনাশ করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা হইতেছে। আমাদের ডোবা, পয়ঃনালি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ গর্ত্তগুলি বর্ষাকালে অতি অল্পমাত্র জলসঞ্চয় করিয়া মশকবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। মশকগুলি জলে তাহাদের ডিম পাড়ে; ডিম্ব ফুটিয়া যে ছানা বাহির হয়, তাহারা একেবারে মশকে পরিণত হয় না, তাহারা এক প্রকার পক্ষহীন জলজ কীটের ন্যায় জলেই বাস করিতে থাকে। সেগুলি আকারে মশকের অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও প্রায় তদনুরূপই স্থূল। আমরা দেখিয়াছি, একটি পুরাতন হাঁড়িতে কিঞ্চিৎ জল জমিয়া তথায় দুই শতেরও অধিক ঐরূপ মশকের শাবক কিলবিল করিয়া নড়িতেছিল। এক গণ্ডুষ পরিমিত জল ধরে এমন একটি গর্ত্তে পাঁচ সাতটি মশকশাবককে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ঐ স্থান হইতে কতকগুলি মশকশাবক ও জল লইয়া একটি কাঁচের গ্লাস অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া, গ্লাসের মুখটি নেকড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বাঁধিয়া দিলে, কেমন করিয়া মশকশাবকগণের পক্ষ ও পদগুলি উৎপন্ন হইয়া উহারা মশকে পরিণত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। বড় পুষ্করিণীতে যে সকল মশকের ডিম ফুটিয়া শাবক উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায়ই মৎস্যাদি জলচর জীবের দ্বারা ভক্ষিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মশকসকলের বিনাশসাধনের জন্য খানা, ডোবা ও গর্ত্ত প্রভৃতির বিলোপসাধন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

আমেরিকা ও ইটালীতে মশক বিনাশের জন্য নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাদের অনেকগুলিকে আমাদের দেশে চলিত করিতে হইবেঃ—

(১) মশক-শিকার-সমিতি করিয়া বহুসংখ্যক লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া—খন্তা, কোদাল ও লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া গ্রামের বা নগরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মশক-শিকারে বাহির হয়। কোন স্থানে ছোট গর্ত্তে একটুকু জল জমিয়া কতকগুলি মশক জন্মিয়াছে দেখিলেই, তাহারা দুই কোদাল মাটী দিয়া সে গর্ত্ত বুজাইয়া দেয়। কোন পতিত হাঁড়িতে জল জমিয়াছে দেখিলেই, সেটিকে তাহারা ভাঙ্গিয়া দেয়। রাস্তার কোন স্থান নীচু ও কর্দ্দমাক্ত দেখিলেই তাহারা সে স্থান মাটী দিয়া সমান করিয়া দেয়। পয়ঃনালীর জল

যাহাতে কোন অব্যবহার্য্য পুষ্করিণী, নদী বা মাঠে গিয়া পতিত হয়, তাহারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন যে, পল্লীগ্রামে ছোট ছোট খানা, পয়ঃনালী বা গর্ত্তে জল জমিয়া যেরূপ দারুণ দুর্গন্ধময়, কৃষ্ণবর্ণ ও কীটসঙ্কুল জল প্রস্তুত হয়, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল কখনই সেরূপ কদর্য্য হইয়া উঠিতে পারে না। কারণ, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে মৎস্যাদি থাকিয়া, কীট প্রভৃতিকে ধ্বংশ করিয়া তথাকার জলের পবিত্রতা অনেক পরিমাণে রক্ষা করে। অতএব যে সকল পুষ্করিণীতে গ্রীষ্মকালে জল থাকে না এবং যাহাতে মৎস্যাদি নাই, তাহাদের স্বত্বাধিকারিগণ যাহাতে আইনতঃ বা অন্য উপায়ে—হয় উহাদের সংস্কার করিতে নহে ত উহাদিগকে ভরাট করিতে বাধ্য হয়েন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে প্রণালীতে দেশের রেলপথসমূহ ও এক নগর হইতে অন্য নগর সংযোগকারী রাস্তাসমূহ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা একান্ত ভ্রান্ত। উহার দ্বারা রেলপথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক ডোবার সৃষ্টি হইয়াছেমাত্র। দেশে রেল ও রাস্তা হইয়া কায নাই বলা চলে না। রাস্তা প্রস্তুত করিবার মাটী উহার উভয় পার্শ্বের বহু স্থান হইতে অল্প অল্প করিয়া না লইয়া এক এক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে লওয়া শ্রেয়স্কর; তদ্বারা সেই সেই স্থানে এক একটি বড় খাল বা দীর্ঘিকা হইয়া যাইবে। এরূপ ভাবে মাটী সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা সম্ভবতঃ ঐ প্রকারে পথ নির্ম্মাণ করাতে যে জমী লাভ হইবে তাহা এবং ঐ সকল পুষ্করিণীর মাছ হইতে উঠিয়া যাইবে; এবং তদ্বারা দেশের স্বাস্থ্যেরও যে উন্নতি হইবে তাহাও নিতান্ত কম লাভ নহে।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, ডোবাগুলির ন্যায় ধানের জমিগুলিও বৎসরের কয়েক মাস ধরিয়া জলাশয়ে পরিণত থাকে, তবে সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি না করিয়া ডোবাগুলির বিপক্ষে আমরা এত গোলমাল করিতেছি কেন? ধানের জমিগুলি যে ম্যালেরিয়া-বিস্তারের পক্ষে কতকটা সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের ন্যায়, ইটালিরও যে সকল স্থানে চাষ ভাল হয়, সেই সকল স্থানেই ম্যালেরিয়া অধিক। তবে ধানের জমিগুলি অপেক্ষা, ডোবা বা অপ্রশস্ত জলাশয়গুলি যে অধিক অনিষ্টকর, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। ডোবা বা অপ্রশস্ত জলাশয়গুলি শুকাইয়া গেলে, তাহার সরস মৃত্তিকায় ওকড়া, জেঁয়াতে-পাতা, শুযুনি, কলমি, হীঞ্চা, কুলেখাড়া, কচু ও কয়েক জাতীয় ঘাস ও অন্য কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিয়া

থাকে। শুকাইবার সময় উক্ত পুষ্করিণীর জলজ উদ্ভিদ ও পানাগুলি শুকাইয়া মরিয়া যায়। বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে গ্রীষ্মকালজাত উদ্ভিদগুলি জলমগ্ন হয়, কিন্তু জলমগ্ন হইয়া তাহারা বাঁচিতে পারে না, মরিয়া যায়। এই সকল উদ্ভিদ ও পূর্ব্ব বৎসরের শুষ্ক শৈবাল প্রভৃতি সমস্তই সেই ডোবার জলে পচিতে থাকে। এইরূপে পচিত উদ্ভিদযুক্ত ডোবাই মশক ও বিবিধ দূষিত বীজাণু-জনয়নের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী। কিন্তু ধানের জমীগুলিতে প্রধানতঃ ধান্য জন্মিয়া থাকে, অন্য উদ্ভিদগুলিকে কৃষকরা নিড়াইয়া ফেলে। ধান কাটিয়া লইবার পর জমীতে সামন্য মাত্রই উদ্ভিজ্জ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; আর ধানের জমীগুলি ডোবা অপেক্ষা অগভীর হওয়ায় এবং তাহারা প্রচুর আলো ও বাতাস পাওয়ায় শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই কারণে ধানের জমীর জল ডোবার জলের মত খারাপ হইয়া উঠে না। ডোবাগুলির আর একটি অসুবিধা এই যে, তাহারা প্রায়ই বাঁশঝাড় ও অন্যান্য বৃক্ষের দ্বারা আবৃত থাকে; ঐ সকল বৃক্ষের পাতা ডোবার জলে পতিত হয় এবং উহাতে আলোক ও বাতাস পৌঁছিতে পারে না। সূর্য্যের আলোক অনেকবিধ জীবাণুর জীবন নাশ করিয়া থাকে। অন্ধকার, পচা উদ্ভিদ বা জৈব পদার্থের অবশেষযুক্ত স্থান যে জীবাণুর জন্মের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ঐ সকল কারণে ডোবাগুলির সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রার্থনীয়;

(১) কোনও লোক, যে জলাশয়ে সংবৎসর জল থাকে না এবং সংবৎসর মাছ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কোন জলাশয় রাখিতে পারিবে না, হয়—তাহাকে গভীর করিয়া কাটাইয়া দিতে হইবে, না হয়—ভরাট করিয়া দিতে হইবে। রেলের পথ বা অন্য পথের ধারে ধারে যে সকল ডোবা আছে, তাহাদের কতকগুলিকে গভীর করিয়া সেই মাটির দ্বারা অপর কতকগুলিকে ভরাট করিতে হইবে। সেইরূপ পল্লীগ্রামের মধ্যে কতকগুলি অপ্রশস্ত ডোবা কাটাইয়া অন্য গুলিকে সেই মাটির দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে।

(২) ডোবা ও পুষ্করিণীগুলির চারি ধারে দশ হাতের মধ্যে যাহাতে কেহ কোন প্রকার বৃক্ষাদি রাখিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ, ঐ সকল গাছের পাতা পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া উহাকে অস্বাস্থ্যকর করে।

আমাদের দেশের বাগান ও জঙ্গলগুলিরও সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি বর্দ্ধমান, নদীয়া ও চব্বিশপরগণার অনেক বাগান দেখিয়াছি। উহাদের অবস্থা প্রকৃতই শোচনীয়। বাগানগুলি দিবাভাগেও নিবিড় অন্ধকারে

আবৃত থাকে; সূর্য্যালোক ও বায়ু তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বাগানে প্রবেশ করিলে মনে যে একটা শান্তির ভাব আইসে, এই সকল বাগানে প্রবেশ করিলে তাহার কিছুই আইসে না, মনে কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর বা আতঙ্কের ভাব আইসে। এই সকল বাগানের উপর বৃষ্টিপাত হইলে আলো ও বাতাসের অভাবে উহাদের তলদেশস্থ জল শীঘ্র শুকাইতে পারে না; ক্রমশঃ মৃত্তিকা নরম হইয়া তদুপরি গবাদি পশুর চলাফেরার জন্য ঐ স্থান বহুসংখ্যক ছোট ছোট গর্ত্তে আচ্ছন্ন হইয়া মশক-জনয়নের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বাগানের তলদেশ ঐরূপ সোঁতা থাকায় উহাতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল জন্মিয়া পূর্ব্বোক্ত অসুবিধাকে আরও পরিবর্দ্ধিত করে। এক একটি বাগানে ঐরূপ অপর্য্যাপ্ত সংখ্যক বৃক্ষ থাকায় উদ্যানস্বামীর যে বিশেষ লাভ হয় তাহা নহে, বরং তাঁহার কিছু ক্ষতিই হয়। একটি সুস্থ গাছ যে বহুসংখ্যক অসুস্থ বৃক্ষের অপেক্ষা অধিক ফলদান করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতেই পারে না। বৃক্ষের তলদেশ বহুদিন সোঁতা হইয়া থাকায়, সেই জলে বৃক্ষগুলির যে কোনরূপ উপকার হইবে তাহা ভাবা ভুল। কারণ, বড় গাছগুলি নিম্নদেশে শিকড় বিস্তার করিয়া তথা হইতে রস আকর্ষণ করে—জমীর উপরিদেশ হইতে নহে। বরং জমীর উপরিদেশ অধিক জলসিক্ত থাকিলে জমীর নিম্নদেশে সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং তত্রস্থ শিকড়গুলি বায়ুর অভাবে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

বাগানগুলির সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, জঙ্গলগুলির সম্বন্ধেও প্রায় তাহার সকলগুলিই খাটে। সমস্ত জঙ্গল সাফ করিতে না পারিলেও, উহার মাঝে মাঝে কিছু কিছু কাটিয়া দিলে অনেক উপকার হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে আরও পর্য্যবেক্ষণ হওয়া আবশ্যক। কতকগুলি জঙ্গল আমাদের উপকারী ও অপর কতকগুলি অপকারী হইতে পারে। কোন্ কোন্ জঙ্গল কোন্ কোন্ জাতীয় পতঙ্গ বা জীবের উপকার বা অপকার করে, তাহার নির্ণয় করিতে হইবে। আমাদের দেশের জঙ্গলকারী উদ্ভিদসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান:—কচু, কালকাসিন্দা, আশশ্যাওড়া, ভাট, গোয়ালে-লতা, ছাগল-বাটিলতা ও কলমী জাতীয় কয়েকবিধ লতা। কচুগাছ ও কলাগাছের জঙ্গল যে মশকবৃদ্ধির সহায়তা করে, তাহা পল্লীগ্রামের লোক মাত্রেই অবগত আছে; ঐ সকল গাছের কাণ্ড ও ব্যালনার মধ্যস্থ গর্ত্তে জল সঞ্চিত হইয়া মশকজনয়নের

সহায়তা করে। আশশ্যেওড়ার পাতায় তীব্র গন্ধ আছে; কালকাসিন্দার জঙ্গল খুব ঘনসন্নিবিষ্ট দেখা গিয়াছে; লতার ঝোপের তলদেশ খুব সেঁতা ও অন্ধকারময় বলিয়া মশক উৎপাদন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র; তুলসী গাছের পাতা ও ফুলের গন্ধ বেশ তীব্র, ঐ গাছে কখনও মশক দেখি নাই; পল্লীগ্রামের অন্য আগাছা ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে তুলসীর জঙ্গল বসান যায় কি না তাহা পরীক্ষনীয়। অপেক্ষাকৃত বড় গাছের মধ্যে দেবদারু, নোনা, ধল-আকড়া, স্যেয়াকুল ও বৈঁচি সহজে জঙ্গল উৎপাদন করিয়া থাকে। দেবদারুর জঙ্গল খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। এই সমুদায় জঙ্গলের শতকরা বিশ হইতে পঞ্চাশ ভাগ উদ্ভিদ কাটিয়া বাদ দিলে দেশের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইবে। শীতকালে গ্রামে খেজুর রসের বাহিন যত বাড়ে ততই মঙ্গল, কারণ রস জ্বাল দিবার জন্য শিউলীরা অনেক আগাছা কাটিয়া ফেলে। বর্দ্ধমান জিলার এক ভদ্রলোক আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পাথুরে কয়লার আমদানির পর হইতে দেশে ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি হইয়াছে; কারণ, তাহার পর হইতে দেশে জঙ্গলবৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে গরীব লোকরা জঙ্গল কাটিয়া কাঠ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত, এখন কয়লার আবির্ভাবে তাহা আর ঘটিয়া উঠে না, কাযেই ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার কথা যে কতকটা ঠিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েক জিলায় চড়ক সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্বে ফুল নামক একটি উৎসব হয়, উহাতে গাজনের সন্ন্যাসিগণ ও গ্রামের যুবকরা পূর্ব্বরাত্রিতে গৃহস্থের প্রাঙ্গণ প্রভৃতি হইতে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক কাঠাদি আহরণ করিয়া একস্থানে উহাতে অগ্নি সংযোগ করে ও উহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করতঃ উৎসব করিয়া থাকে। যদি গ্রামের যুবকগণ এই উৎসব উপলক্ষে গৃহস্থের উপকারী দ্রব্যাদি নষ্ট না করিয়া উৎসবের পনর কুড়ি দিন পূর্ব্বে গ্রামের জঙ্গলগুলিকে অল্পাধিক পরিমাণে কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি শুকাইয়া উৎসবস্থানে সংগৃহীত হইয়া উৎসবাগ্নি দীপ্ত করিতে পারে; উহা উৎসব ও দেশের স্বাস্থ্যবিধানকার্য্যে সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশের গৃহ, প্রাঙ্গণ ও পথগুলিরও উন্নতিবিধান করিতে হইবে। ঐ সকল স্থান যাহাতে সেঁতা না থাকে, আমাদিগকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সেঁতা স্থান শুধু যে মশক উৎপাদনের পক্ষে সহায়তা করে, তাহা নহে, সেঁতা স্থানে বাসকারীর শরীর সহজেই বিবিধ রোগের বিষের দ্বারা

আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেঁতা স্থান কি প্রকারে আমাদের শরীরের অপকার করে, তাহা এই প্রবন্ধের শেষার্দ্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, সেঁতা স্থানগুলিকে শুষ্ক করিতে হইলে, সেগুলি যাহাতে প্রচুর মাত্রায় আলোক ও বাতাস পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাটী, প্রাচীর ও উদ্ভিদসকল কোন স্থানে সমকরূপ আলো ও বায়ু প্রাপ্তির পক্ষে বিপক্ষতা করিয়া থাকে। বৃক্ষাদিজনিত অসুবিধা লোক ইচ্ছা করিলে সহজেই দূর করিতে পারে। কিন্তু কোনও পল্লীর বাড়ীঘরের গুরুতর রকম পরিবর্ত্তন অত সহজে হইতে পারে না। এ বিষয়ের কতক পরিবর্ত্তন, লোককে বুঝাইতে পারিলে এখনই হইতে পারে। অন্ততঃ যাহারা নূতন বাড়ীঘর প্রস্তুত করিবে, তাহারা যাহাতে নূতন মতে চলে, তাহার চেষ্টা হওয়া উচিৎ। উঠান ও পথ-গুলিকে আর এক উপায়ে শুষ্ক করা যাইতে পারে—উহাদের উপর মাটী ফেলিয়া উহাদের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া। আমাদের বাটীর উঠান প্রভৃতি প্রতি বৎসর একটু একটু করিয়া ক্ষইয়া যাইতেছে, প্রতি বার বৃষ্টির সময় জলের কোঁটাগুলি আমাদের উঠান খুঁড়িয়া পুষ্করিণী নদী প্রভৃতিতে লইয়া ফেলিতেছে। তাহাতে নিম্ন স্থানগুলি উচ্চ হইলেও উচ্চ স্থানগুলি নিম্ন হইয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ অথবা একশত বৎসরের মধ্যে আমাদের উঠানগুলি যে ঠিক কতকটা নীচু হইয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না; কিন্তু উহা যে কোন কোন ক্ষেত্রে এক ফুটেরও অধিক হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝান যাইবে। যে কোন পল্লীগ্রামের পুরাতন বৃক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার তলদেশে অনেক শিকড় মৃত্তিকার উপরে জাগিয়াছে দেখা যাইবে। আমি কোন কোন স্থলে এই শিকড় দুই ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি; ঐ সকল শিকড় যে আদৌ মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাল-ক্রমে সেই সকল মৃত্তিকা বৃষ্টির দ্বারা ধৌত হইয়া পড়াতে শিকড় কোন্ স্থানে কতটা জাগিয়াছে তাহা এবং ঐ সকল বৃক্ষের বয়স নির্ণয় করিতে পারিলে বঙ্গদেশের কোন্ স্থানের জমী কতটা ধুইয়া গিয়াছে এবং কোন্ প্রকৃতির জমীই বা কতটা ধুইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করিয়া অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, যে বসত বাটী এক শত বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে উহার উঠান নামিয়া যাওয়ার দরুণ, অন্য কোন কারণ ব্যতিরেকেও সেঁতা ও অস্বাস্থ্যকর হইবে। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য, অন্য স্থান হইতে মাটী আনয়ন

করিয়া নিজ নিজ প্রাঙ্গণ প্রভৃতিকে চতুঃপার্শ্বস্থ জমী অপেক্ষা এক বা দুই ফুট মাত্রায় উচ্চ করিয়া তুলা। আমি দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামের কোন কোন গৃহস্থ কোন পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া উহার মাটী কোথায় ফেলিবেন, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া উক্তরূপ সংস্কারকার্য্য হইতে বিরত থাকেন। তাঁহার প্রতিবাসিগণের ঐরূপ পুষ্করিণী খননের মাটী আগ্রহ করিয়া নিজ নিজ উঠানে ফেলিয়া উঠানগুলিকে উচ্চ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার মতে পল্লীগ্রামে দুই প্রকার পুষ্করিণী থাকা উচিত, কতকগুলির চারিদিকে পাড় থাকিবে এবং আর কতকগুলির থাকিবে না। যে সকল পুষ্করিণীর জল ব্যবহৃত হইবে, তাহাদের পাড় থাকা আবশ্যক, নচেৎ ময়লা স্থান ধোয়া-জল আসিয়া তাহার উপর পড়িবে। পল্লীর ধোয়ানি জল যাহাতে কোন অব্যবহার্য্যজল জলাশয়ে বা মাঠে আসিয়া পড়িতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা থাকা উচিত ; সে পক্ষে কোনরূপ বাধা থাকিলে পল্লীর মধ্যেই জল জমিয়া বসিতে থাকিবে ও পল্লীকে সেঁতা ও অস্বাস্থ্যকর করিবে।

আমাদের পল্লীগ্রামের গৃহনির্ম্মাণপ্রণালীর কতকটা উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতল গৃহ যে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। কৃষকদিগের জন্য স্বল্প ব্যয়ে বংশ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারা যায় কি না, তাহা আলোচনার যোগ্য। অন্ততঃ গৃহগুলির মেঝে যাহাতে উচ্চ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখককে সম্ভব ও আপাততঃ অসম্ভব সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতে হইবে। কি উপায়ে দেশের স্বাস্থ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে অনেক নগর নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে, অস্মদ্দেশে ছোট সহর ও পল্লীগুলি সেরূপ প্রণালীতে গঠিত হইতে পারে কি না তাহা বিবেচ্য। আমাদের সুস্বাদু-সলিলা নদীগুলির জল যাহাতে দেশের দূরবর্ত্তী পল্লীসমূহের লোকেরও ব্যবহারে আইসে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ডে অনেক পল্লীর জল শতাধিক মাইল দূর হইতে নলে আনীত হয়। দেশে এই সকল সংস্কার আরব্ধ হইলে যাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভের সম্ভাবনা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ইঞ্জিনিয়ারগণ আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বাক সম্প্রদায়! আশা করি, তাঁহারা এ বিষয়ে একটু বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবেন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পুরাণকথা।

সূর্য্যবংশে মনুর ধারান্তরদ্বয় ও তৎসংক্রান্ত কতিপয় কাহিনী।

(বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ ১—৪ অধ্যায়।)

রেবত আনর্ত্তদেশে কুশস্থলী নামে পুরীনির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র ককুদ্মী ভগিনী রেবতীর বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া কাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন ইহা জানিবার জন্য ভগিনী রেবতীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। যখন তিনি তথায় উপস্থিত হয়েন তখন ব্রহ্মলোকে হাহাহুহু গন্ধর্ব্বের গান হইতেছে। গান থামিলেই পিতামহসমীপে আগমন-কারণ নিবেদন করিবেন ভাবিয়া তিনি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গান থামিলে ব্রহ্মা ককুদ্মীকে তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ককুদ্মী যখন বলিলেন, রেবতীর বিবাহযোগ্য পাত্রানুসন্ধানে আসিয়াছেন তখন ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এই যে ব্রহ্মলোকে এতটুকু অপেক্ষা করিয়াছ তাহাতে মর্ত্ত্যলোকে যুগদ্বয় অতীত হইয়া গেল, তৃতীয় যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। তুমি মর্ত্ত্যে ফিরিয়া গিয়া তোমার আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমার কুশস্থলী আর নাই তাহা এখন দ্বারকাপুরী হইয়া গিয়াছে। যাও তুমি মর্ত্ত্যে ফিরিয়া যাইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হও ও বসুদেবপুত্র বলরামকে ভগিনী সম্প্রদান কর।" ককুদ্মী মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মকথিত সমস্তই সত্য দেখিলেন ও বলরামকে রেবতী সম্প্রদাম করিয়া আপনি তপশ্চর্য্যায় লোকালয় ত্যাগ করিলে। কথিত আছে, ককুদ্মীর নাকি একশত ভ্রাতা ছিলেন, ককুদ্মী

যখন ব্রহ্মলোকে তখন তাঁহাদিগের পুরী কুশস্থলী পুণ্যজনক নামক দানবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় ও ককুদ্মীর ভ্রাতৃগণ কে কোথায় পলায়ন করেন তাহার সন্ধান থাকে না। এইরূপে মনুর এই ধারাটি নষ্ট হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ধারা।

১। মনু
২। নেদিষ্ট
৩। নাভাগ
৪। ভলন্দন
৫। বৎসপ্রি
৬। পাংশু
৭। প্রজানি
৮। খনিত্র
৯। চক্ষুপ
১০। বিংশ
১১। বিবিংশ
১২। খনিত্র
১৩। অতিবিভূতি
১৪। করন্ধম
১৫। অবিক্ষি
১৬। মরুত্ত
১৭। নরিষ্যন্ত
১৮। দম
১৯। রাজ্যবর্দ্ধন
২০। সুধৃতি
২১। নর
২২। কেবল
২৩। ধুন্ধুমৎ
২৪। বেগবৎ
২৫। বুধ
২৬। তৃণবিন্দু, ইলবিলা (কন্যা)
২৭। বিশাল
২৮। হেমচন্দ্র
২৯। সুচন্দ্র
৩০। ধূম্রাশ্ব
৩১। সৃঞ্জয়
৩২। সহদেব
৩৩। কৃশাশ্ব
৩৪। সোমদত্ত
৩৫। জনমেজয়
৩৬। সুমতি

এই বংশের নাম বৈশালক রাজবংশ। এই বংশের মরুত্ত (১৬) একজন অত্যধিক যজ্ঞকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারই যজ্ঞে ঘৃত ভোজন করিয়া অগ্নির উদরাময় হয়।

এই বংশের তৃণবিন্দুকে (২৬) অলম্বুষা অপ্সরা হৃদয় দান করেন ও তাঁহারই গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশাল (২৭) নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশালই (২৭) প্রসিদ্ধ বিশালপুরীর প্রতিষ্ঠাতা। (Basarh in Mazuffer-pur)

এই বংশের তৃতীয় নৃপতি নাভাগ ক্ষত্রধর্ম্মচ্যুত হইয়া বৈশ্য হয়েন বলিয়া কথিত আছে। অথচ নাভাগের সন্ততিগণ ক্ষত্রিয় নৃপতি বলিয়া উল্লিখিত। বিষ্ণুপুরাণের এই কথাটি বুঝিতে পারিলাম না।

সূর্য্যবংশে ইক্ষ্বাকুর দ্বিতীয় পুত্র

নিমির ধারা।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ ৫ম অধ্যায়।)

১। ইক্ষ্বাকু
২। নিমি বা বিদেহ
৩। জনক বা বৈদেহ বা মিথি
৪। উদার বসু
৫। নন্দিবর্ধন
৬। বৃষকেতু
৭। দেবরাত
৮। বৃহদুক্থ
৯। মহাবীর্য্য
১০। সত্যধৃতি
১১। ধৃষ্টকেতু
১২। হর্যশ্ব
১৩। মরু
১৪। প্রতিবন্ধক
১৫। কৃতরথ
১৬। কৃতি
১৭। বিবুধ
১৮। মহাধৃতি
১৯। কৃতিরাত
২০। মহারোমন্
২১। স্বুবর্ণরোমন্
২১। হ্রস্বরোমন্
২৩। সীরধ্বজ, কুশধ্বজ
সীতা (কন্যা) ভানুমৎ ২৪।
২৫। শতদ্যুম্ন
২৬। শুচি
২৭। ক্ষেমারি
২৮। অনেনস্
২৯। মীনরথ
৩০। সত্যরথ
৩১। সাত্যরথী
৩২। উপগু

ইঁহাদিগকে মৈথিল-ভূপতি বলে। বিষ্ণুপুরাণ "প্রাচুর্য্যেন তেষামাত্ম-বিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি" বলিয়া এই বংশে ভবিষ্যত অনেক রাজার সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন।

জনক রাজার সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ যাহা জানি বিষ্ণুপুরাণের এই বংশবর্ণনায় কিন্তু তাহার বড়ই বিপরীত্য দেখিতে পাই। ইহাতে জনক ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন তৃতীয় ভূপতি, আর আমাদের সাধারণ বোধলভ্য সীতাপিতা সীরধ্বজ (জনক) অধস্তন ত্রয়োবিংশ নৃপতি। সুতরাং বিষ্ণু-পুরাণের মতে বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে, সীতার পিতার নাম ছিল সীর-ধ্বজ, জনক তাহার পূর্ব্বপুরুষনামসূচক উপাধিমাত্র।

নিমির নামান্তর বিদেহ তাই তদধিষ্ঠিত দেশ বিদেহ দেশ। নামান্তর মিথি; তাই তদধিষ্ঠিত প্রদেশ মিথিলা প্রদেশ। পিতাপুত্রের নামানুযায়ী একই প্রদেশের এইরূপে দুই বিভিন্ন নাম প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে।

রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিকুক্ষির ধারা। সীরধ্বজও তদ্বংশীয় নিমির ধারা। উভয়ই মূলতঃ এক বংশীয় অথচ উভয় বংশে একবংশতানিবন্ধন আদান-প্রদানের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। রামচন্দ্র সীরধ্বজের কন্যা সীতাকে ও রামচন্দ্রের ভ্রাতৃগণ সীরধ্বজভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যাগণকে বিবাহ করেন।

মনুর অপরাপর পুত্রগণের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পৃষধ্র গুরু ও গো হত্যা করায় শূদ্র হইয়া যায়েন। নবম পুত্রের ধারারা পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম কারূষ ক্ষত্রিয়। তৃতীয় পুত্রের ধারারা ধার্ষ্টক ক্ষত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

ঈশার পুনরাবির্ভাব

(ব্যালজাক)

ব্রাবাণ্ট দেশীয় ইতিহাসের কোনও অনির্দ্দিষ্ট যুগে কাদোর্যাঁ দ্বীপ হইতে তৎসন্নিহিত ফ্লাণ্ডাস উপকূল পর্য্যন্ত একখানিমাত্র খেয়া নৌকা যাতায়াত করিত। পরবর্ত্তী সময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মবিষয়ক আখ্যায়িকায় সুপ্রসিদ্ধ মিডলবর্গ নগরী সেই সময়ে দুই তিন শত গৃহবিশিষ্ট একটি গণ্ডগ্রামমাত্র ছিল। ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত অষ্টেণ্ড তখনও একটি অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর। তাহার উপকণ্ঠে একটি বিরলবসতি পল্লীতে অল্পসংখ্যক জালিক ও পণ্যজীবী এবং অবাধলুণ্ঠনরত জলদস্যুগণ বাস করিত। গ্রামের গৃহসংখ্যা সার্দ্ধ তিন-শতের অনধিক। ইহার মধ্যে অধিকাংশই সামান্য পর্ণশালা ও পোতভগ্নাংশবিনির্ম্মিত দারুময় কুটীরসমষ্টি। স্বল্পায়তন হইলেও গ্রামখানি উচ্চ সভ্যতার উপকরণবর্জ্জিত ছিল না। অনুমান বিংশতি সংখ্যক ইষ্টকনির্ম্মিত আবাসগৃহ পল্লীশোভা বর্দ্ধন করিত। এতদ্ব্যতীত শাসনকর্ত্তা, নগরপাল, স্বেচ্ছাসৈন্য, গ্রাম্যসমিতি, দেবালয়, মঠ ও বধ্যমঞ্চ প্রভৃতি সমস্তই গ্রামবাসিগণের আভ্যন্তরিক উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সে সময়ে কোন্ নরপতি এতদ্দেশীয় রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পরবর্ণিত কাহিনীটি ফ্লাণ্ডার্স দেশীয় কথক-গণের ধর্ম্মবিষয়ক উপকথাসুলভ অতিপ্রাকৃত ঘটনাসমাবেশে ও অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট; কিন্তু কবিত্বের দিক্ দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, পরস্পরবিরোধী বৃত্তান্ত-বাহুল্য সত্ত্বেও ইহা কল্পনাবৈচিত্র্যে ও ভাব সরসতায় মহীয়ান্।

যুগে যুগে গ্রাম্য কথকবৃন্দ ও পিতামহীস্থানীয়া বৃদ্ধাগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হওয়ায় এই কাহিনীটি কালবশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগস্থ স্থপতিগণের স্ব স্ব শিল্পরুচি অনুসারে সংস্কৃত কোন ভগ্নদশাপন্ন প্রাচীন অট্টালিকার ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতকায় এই কবিজনমনোরঞ্জন উপাখ্যানটি প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং সাল ও তারিখ অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক সমালোচকগণের হতাশার কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুসংস্কারাপন্ন ফ্লেমিস্ জাতি অপেক্ষা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বা চিত্তদৃঢ়তায় ন্যূন না হইলেও বর্ত্ত-মান লেখক এই কাহিনীর সত্যতায় সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান্। বর্ণনামূলক বৈষম্যের সমন্বয় দুঃসাধ্য বলিয়া গল্পটি অত্যন্ত সরল ভাবে আখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে 'রোমান্স' বা কবি-ত্বের গন্ধটুকু নষ্ট হইয়া গেলেও অন্য কোনও উপায়ে এই গ্রাম্য আখ্যায়িকার লালিত্য রক্ষা করিয়া পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপর ছিল না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিচিত্র-কল্পনাকুসুমশোভিত পল্লীকথা ইতিহাস কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেও ধর্ম্ম-নৈতিক জগতে চির-

কাল সমাদৃত হইবে। সুধীগণ স্বেচ্ছানুসারে গল্পের অর্থোদ্ধার করুন তাহাতে আমাদিগের কিছুই বলিবার নাই; তবে এই মাত্র অনুরোধ যে, সাহিত্যামোদী পাঠকপাঠিকাগণ যেন নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু মাত্র গ্রহণ করেন।

* • * * * *

এইবার শেষ খেয়া। নৌকা প্রায় ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে। প্রস্তরাবদ্ধ লৌহ শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার পূর্ব্বে খেয়া ঘাটের ক্ষুদ্রাকৃতি আরোহণমঞ্চ হইতে দীর্ঘসূত্রী আরোহিগণকে সতর্ক করণোদ্দেশ্যে নৌকাধ্যক্ষ তিন বার বংশীধনি করিলেন।

অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছিল। অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের ক্ষীণালোকে ফ্রাগুাসের উপকূলরেখা আর দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল না। উপকূলপ্রান্তে ও ক্ষেত্রবেষ্টিত আইল-পথে ভ্রমণরত আরোহিবৃন্দ ক্রমেই অদৃশ্যপ্রায় হইতেছিল।

নৌকা আরোহীতে পরিপূর্ণ। নাবিকগণকে উদ্দেশ করিয়া সকলেই বলিতেছিল, "আর তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছ? সত্বর নৌকা ছাড়িয়া দাও।" এই সময়ে জনৈক পান্থ-সহসা 'জেটীর' সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে কর্ণধার কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল; কারণ, সে তাঁহাকে জেটী অভিমুখে অগ্রসর হইতে বা কাহারও সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিতে দেখে নাই। এই অপরিচিত পথিক যেন হঠাৎ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন। কর্ণধার মনে স্থির করিল, বোধ হয় এ ব্যক্তি কোনও সামান্য কৃষক, নৌকারোহণের অপেক্ষায় মাঠে ঘুমাইতেছিল, পরে অধ্যক্ষের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইয়াছে, অথবা সে কোনও দস্যু তস্কর কিম্বা পুলিস বা শুল্ক বিভাগের কোনও ছদ্মবেশী কর্ম্মচারী।

আগন্তুক জেটী বা আরোহণমঞ্চে উপস্থিত হইবামাত্র নৌকাপ্রান্তে দণ্ডায়মান সাত জন স্ত্রীপুরুষ ব্যগ্রভাবে কাষ্ঠাসন কয়খানি অধিকার করিয়া লইলেন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত একত্র বসিতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবহার ধনিগণের অভিজাত সংস্কারের আকস্মিক অভিব্যক্তি মাত্র। এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, আরোহিসপ্তকের মধ্যে অন্ততঃ চারিজন ফ্রাগুার্স দেশে উচ্চতম কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম আরোহী একজন তরুণবয়স্ক যোদ্ধ পুরুষ। তাঁহার সহিত দুইটি সুন্দর শিকারী কুক্কুর ছিল। যুবকের কেশপাশ দীর্ঘ। মণিখচিত Spurs শিঞ্জিত করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে স্বীয় গুম্ফবিন্যাস করিতেছিলেন এবং অন্যান্য আরোহিগণের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ইঁহারই সান্নিধ্যে কোনও যৌবনোন্মত্তা ধনিকন্যা উপ-বিষ্টা। তিনি তাঁহার পালিত শ্যেন পক্ষীটিকে স্বীয় মণিবন্ধে বসাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সুন্দরী তাঁহার মাতা এবং তাঁহাদিগের নিকট আত্মীয় জনৈক উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক ব্যতীত অপর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন না। এই কয়জন পরস্পরের সহিত এরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যেন তাঁহারা অন্যান্য আরোহিগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

যাহা হউক ইহাঁদিগেরই পার্শ্বভাগে উপবিষ্ট অপর একজন আরোহীর প্রভাবপ্রতিপত্তি স্বদেশে ইহাঁদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে অল্প ছিল না। ইনি একজন স্থূলকায় ব্রুজ-বাসী শ্রেষ্ঠী। তাঁহার সশস্ত্র ভৃত্য পার্শ্বস্থিত দুইটি মুদ্রাধার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। তন্নিকটে সমাসীন লুভে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক ও তাঁহার সহকারী পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সকল পরস্পরবিরোধী আরোহিগণের কাষ্ঠাসন ও নৌকার গলুইয়ের মধ্যে কেবল দাঁড়ীদিগের বসিবার স্থানমাত্র ব্যবধান ছিল।

নবাগত আরোহী দৃষ্টিমাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, নৌকার পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার স্থান হইবে না। সুতরাং তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া গলুইয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় কেবল দরিদ্র লোকরা বসিয়া ছিল। তাঁহার অনাবৃত মস্তক, পরিপাট্যহীন বেশভূষা এবং অস্ত্র ও অর্থাধার বিরহিত কটিদেশ দেখিয়া লোক তাঁহাকে কোনও ধর্ম্মভীরু নম্রস্বভাব গ্রাম্য 'মণ্ডল' বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

দরিদ্র আরোহিগণ আগন্তুককে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল দেখিয়া পূর্ব্বকথিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অস্ফুট স্বরে নানারূপ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। কষ্টসহিষ্ণুতা ও দৈহিক পরিশ্রমে চিরাভ্যস্ত জনৈক বৃদ্ধ সৈনিক নবাগত ব্যক্তিটিকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং নৌকার শেষপ্রান্তে আশ্রয় লইল এবং যাহাতে হঠাৎ নৌকান্দোলনে স্থানচ্যুত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে মৎস্যকণ্টকবৎ স্নায়ুসন্নদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডে তাহার পদদ্বয় সংলগ্ন করিয়া রাখিল। অতঃপর নগরের শ্রমজীবিদলের একটি তরুণবয়স্কা পুত্রবতী রমণী আগন্তুককে স্থান দিবার উদ্দেশ্যে তাহার ক্রোড়স্থ শিশুটিকে লইয়া কিয়দ্দূরে সরিয়া গেল। নিম্নশ্রেণীর আরোহিগণের এই স্বাভাবিক নম্র ব্যবহারে তোষামোদ বা তাচ্ছিল্যের চিহ্নমাত্র ছিল না। এই অকপট সহৃদয়তা চিরকৃতজ্ঞ দরিদ্রহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসমাত্র। স্বভাবসরল দরিদ্র লোকরা তাহাদিগের চরিত্রগত দোষগুণ কিছুই প্রচ্ছন্ন রাখিতে জানে না।

আগন্তুক মহত্ত্বব্যঞ্জক কমনীয় ভঙ্গিসহকারে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন; এবং সেই অল্পবয়স্কা রমণী ও বৃদ্ধ সৈনিকের মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। জনৈকা শীর্ণকায়া বৃদ্ধা ভিখারিণী গলুইপ্রান্তস্থিত রজ্জুকুণ্ডলীর উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহার সম্বল কেবল একটি শূন্যপ্রায় ভিক্ষাপাত্র। কয়েকখানি জীর্ণ বস্ত্রের দ্বারা সে কোনও প্রকারে নিজের লজ্জা নিবারণ করিতেছিল। দাঁড়ীদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ নাবিক রমণীর পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া তাহাকে নৌকায় স্থান দিয়াছিল। হতভাগিনী সে সময়ে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই। তখন সে ধনযৌবনশালিনী, রূপবতী, সর্ব্বসমাদৃতা। দাঁড়ী তাহাকে দয়া করিয়া নৌকায় গ্রহণ করায় বৃদ্ধা বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিয়াছিল, "টমাস্, আজ তুমি আমার বড়ই উপকার করিলে। তোমার শুভকামনায় অদ্য সান্ধ্য প্রার্থনার সময় নিশ্চয়ই দুইটি মাঙ্গলিক স্তোত্র আবৃত্তি করিব।"

অধ্যক্ষ পুনরায় বংশীধ্বনি করিলেন। তিনি বাহির হইয়া দেখিলেন, সেই নিস্তব্ধ

উপকূলে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া শৃঙ্খল উন্মোচন করিলেন এবং ত্বরিতে নৌকাপ্রান্তে উপনীত হইয়া স্বহস্তে কর্ণদণ্ড ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তরীখানি উন্মুক্ত সমুদ্রপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার পর আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অধ্যক্ষ নাবিকগণের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমারা প্রাণপণে দাড় টান, আজ সমুদ্র দানবের মুখে সর্ব্বগ্রাসী হাসি। এখনই যেন নৌকার হালে ঝড়ের বেগ বুঝিতে পারিতেছি।" তাহারা সাগরোর্ম্মির কল্লোলে চিরাভ্যস্ত, তাহারাই কেবল এই ভাষার মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম। অধ্যক্ষের ইঙ্গিত পাইয়া নাবিকগণ সবেগে তালে তালে ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তরীখানিও মৃদুগতিশীল অশ্বের আকস্মিক প্রধাবনের ন্যায় পূর্ব্বগতি পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রবক্ষে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সম্ভ্রান্ত আরোহিগণ নৌচালনরত নাবিকগণের উজ্জ্বল নেত্র, রৌদ্রদগ্ধ মুখাবয়ব, বঙ্কিম বাহুভঙ্গি, স্ফীত মাংসপেশী ও ঐকাসঞ্চালিত দেহযষ্টি দর্শনে মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, কেবল তাঁহাদিগকেই সত্বর পরপারে লইয়া যাইবার জন্য নাবিকরা এরূপ শ্রম স্বীকার করিতেছে। উহাদিগের শারীরিক কষ্ট দেখিয়া সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, ঐ সকল হৃদয়হীন অভিজাতনন্দন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহাদের শ্রম ও উৎকণ্ঠাজনিত বিকৃত মুখভঙ্গি পরস্পরকে দেখাইতেছিলেন। এ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিতেও তাঁহাদের কুণ্ঠা হইতেছিল না।

কিন্তু নৌকার অপর প্রান্তে উপবিষ্ট নিম্নশ্রেণীস্থ আরোহীরা স্নেহব্যঞ্জক দৃষ্টিতে মৌন ভাবে নাবিকগণের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল; শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত থাকায় তজ্জনিত ক্লেশ, অবসাদ ও অধীরতা তাহাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ অধিকাংশ সময়ে মুক্ত বাতাসে জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া তাহারা আকাশের লক্ষণ দেখিবামাত্র স্ব স্ব বিপদের কথা বুঝিতে পারিতেছিল। সেই জন্য লঘুতা বা পরিহাসলিপ্সা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সন্তানবতী তরুণী তাহার শিশুটিকে ঘুম পাড়াইবার জন্য অনুচ্চ স্বরে কোন পুরাতন ধর্ম্মগাথা গাহিতে গাহিতে তাহাকে ক্রোড়ে দোলাইতেছিল। বৃদ্ধ সৈনিক কৃষক আরোহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি আমরা কোন প্রকারে পরপারে পৌঁছিতে পারি, ভগবান আমাদিগের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া জানিও।" বৃদ্ধা ভিক্ষুক বলিল, "সৃষ্টি, প্রলয় সবই ত ভগবানের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এবার বোধ হয় তিনি আমাদিগকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইবেন। তোমরা কি ঐ আলো দেখিতে পাইতেছ না?" এই বলিয়া সে মস্তক ফিরাইয়া অস্তমিতপ্রায় তপনের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল। রক্তপাটল মেঘরাশি যেন সহসা ঘণীকৃত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলাভ হইয়া উঠিল; বোধ হইল যেন এইবার তাহা ভীষণ বাত্যাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিবে। সমুদ্র হইতে আর্ত্তনাদের ন্যায় এক প্রকার কল্লোলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দটি কতকটা ক্রুদ্ধ শ্বাপদের গর্জ্জনের ন্যায়। শুনিলে বোধ হয়, কোন মতেই উহার ক্রোধশান্তি হইবে না।

যাহা হউক, অষ্টেণ্ড নগরী আর অধিক দূরে ছিল না। সেই সময় আকাশ ও সমুদ্রে যে একটি অপূর্ব্ব চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা তুলিকার সাহায্যে অঙ্কিত করা কোন রূপেই সম্ভবপর নহে। মানবরচনায় প্রায়শঃ বৈপরীত্যের সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে চিত্রকররা প্রকৃতি দেবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল দৃশ্যগুলি স্ব স্ব শিল্পকলার জন্য নিয়োজিত করিয়া থাকেন। সাধারণ দৃশ্যগুলিতে যে সুমহান কবিত্ব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা এই শ্রেণীর শিল্পিরা কখনও স্ব স্ব শিল্পসাহায্যে প্রকটিত করিতে সাহসী হয়েন না। অপিচ মানবের হৃদয়বেগ নিস্তব্ধতা ও ঝটিকাসঙ্ঘাত প্রভৃতি বিষম ব্যাপারের দ্বারা সমভাবেই আলোড়িত হইয়া থাকে। নৌকারোহিগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য আকাশ ও সমুদ্রের বিচিত্রবর্ণসমাবেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষণিক ভূষ্ণীম্ভাব শুধু বিপদের পূর্ব্বাভাসপ্রসূত কিম্বা কেবল সন্ধ্যাকালীন বিষাদভাবপ্রণোদিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বাস্তবিক দিবাবসানে যখন প্রকৃতি দেবী নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করেন, যখন দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ শ্রুত হয় না তখন মনে স্বভাবতঃই এক প্রকার বৈমনাস্য বা বৈরাগ্য ভাবের আবির্ভাব হয়।

সমুদ্রজলে এক প্রকার ঈষৎ শ্বেতাভ দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা সত্বরই আম্রস্নাস্তিতে পরিণত হইয়া গেল। আকাশের অধিকাংশই ধূসরবর্ণে সমাবৃত। কেবল পশ্চিমাশার কিয়দংশ যেন রক্তোর্ম্মিমালায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। পূর্ব্বাকাশে সুক্ষ্ম তুলিকাঙ্কিত রেখার ন্যায় কয়েকটি দীপ্তিময় কিরণলেখা কয়েকখণ্ড মেঘকর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই মেঘগুলি লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের কুঞ্চিত ললাটত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। আকাশ ও সমুদ্রের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রায় সমুদায় স্থানই এইরূপ ধূসরাভ অপরিস্ফুট বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হইতেছিল এবং অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণ রক্তিমাভা যেন অশুভ উজ্জ্বলতার সহিত দীপ্তি পাইতেছিল। বাস্তবিক প্রকৃতি দেবীর এরূপ আকৃতি দেখিলে কাহার মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়? চলিত কথায় যে সকল অতিশয়োক্তি ব্যবহৃত হয়, লিখিত ভাষায় তাহা উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইলে বলা যাইতে পারে যে, আকাশ যেন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল এবং কালস্রোতঃ ভীষণ বেগে ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। হঠাৎ পশ্চিমাকাশে ঝটিকার আবির্ভাব সূচিত হইল। নৌকাধ্যক্ষ প্রতিক্ষণেই সতর্কভাবে সমুদ্রের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলেন। দিক্‌বলয়প্রান্তে জলোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব দর্শনমাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে সতর্কতাসূচক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই চীৎকার শ্রবণমাত্র নাবিকরা ক্ষেপণী ত্যাগ করিল।

আগন্তুকের পার্শ্ববর্ত্তিনী নবীনা তাহার শিশু পুত্রটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাতর স্বরে কহিল, "আজ এ বিপদে কে আমার শিশুটিকে রক্ষা করিবে?" আগন্তুক কহিলেন, "কেন, তুমিই তোমার সন্তানকে রক্ষা করিবে।" অপরিচিতের এই সান্ত্বনা বাক্য জননী-হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া যেন স্বতঃই আশার সঞ্চার করিয়া দিল। ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জন ও আরোহিগণের আর্ত্তনাদ সত্ত্বেও সেই সুমিষ্ট আশ্বাসবাণী তরুণীর কর্ণকুহরে সদাই ধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী মহাজন তাঁহার স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ মুদ্রাধারের উপর নতজানু হইয়া প্রার্থনা

করিতে লাগিলেন, "দোহাই মা এন্টোয়ার্পের চির রক্ষয়িত্রী কুমারী দেবী, এ যাত্রা যদি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাই, তাহা হইলে তোমার একটি স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিব এবং সুবৃহৎ মধুপবর্ত্তিকায় তোমার মন্দির আলোকিত করিব।" শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কুমারী দেবী নৌকার উপর যেরূপ জাগ্রত ভাবে অধিষ্ঠিতা, এন্টোয়ার্পের মন্দিরের ভিতরেও তাঁহার অবস্থা তদ্রূপ জানিবেন।" কে যেন সমুদ্রের দিক হইতে বলিল, "দেবী স্বর্গে বিরাজমানা।" আরোহীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা কে বলিল?" শ্রেষ্ঠীর ভৃত্য কহিল, "সয়তান এন্টোয়ার্পের কুমারী দেবীকে পরিহাস করিতেছে।"

ইহাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া নৌকাধ্যক্ষ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "'দেবী দয়াময়ী' বলিয়া আর বৃথা চীৎকার করিতে হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে সেঁউতি লইয়া জল সেচিতে থাক।" তিনি নাবিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা আর মুহূর্ত্তমাত্র অবসর পাইয়াছি। যে সয়তান এখনও তোমাদিগকে ছাড়িয়া আছে, তাহার নামে শপথ করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, অদ্য আমাদিগকে স্ব স্ব রক্ষাকর্ত্তা হইতে হইবে, সম্মুখস্থ অপরিসর সাগরাংশ কিরূপ ভীষণ বিপদসঙ্কুল তাহা আমি ত্রিশবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে সম্যক অবগত আছি।" এই বলিয়া নৌকাধ্যক্ষ হাইল ধারণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে আকাশ, সমুদ্র ও নৌকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। টমাস নিম্নস্বরে বলিল, "অধ্যক্ষ সকল বিষয় লইয়াই ব্যঙ্গ করিয়া থাকে।"

যোদ্ধৃবেশধারী যুবাপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া ধনিকন্যা সাহঙ্কারে বলিলেন, "ভগবানের কি ইহাই অভিপ্রেত যে, আমরা এই সকল ইতর ব্যক্তিগণের সহিত একত্র প্রাণ বিসর্জ্জন করিব!" যুবক বলিলেন, "না, তাহা কখনই হইতে পারে না। সুন্দরী, আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করুন।" এই বলিয়া যুবক যুবতীর কটিদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি বিশেষ সন্তরণপটু, এ কথা বোধ হয় আপনি অবগত নহেন। আপনার সুদীর্ঘ কেশদাম ধারণ পূর্ব্বক এই দুস্তর জলরাশি অতিক্রম করিয়া আমি অনায়াসে আপনার সহিত নিরাপদে উপকূলে উপনীত হইতে পারিব। কিন্তু আমি কেবল আপনাকেই রক্ষা করিতে পারি।" যুবতী একবার জননীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। যুবক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রণয়িণীর অন্তরে ঈষৎ মাতৃভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। যুবতীর মাতা সে সময় নতজানু হইয়া ধর্ম্মযাজকের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। ধর্ম্মযাজক কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিতেছিলেন না। যুবক সুন্দরীকে প্রবোধ দানের জন্য অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভগবানের যাহা অভিপ্রেত, তাহাতে আপনার বশ্যতা স্বীকার করা উচিত। তিনি যদি আপনার মাতাঠাকুরাণীকে নিজ সন্নিধানে ডাকিয়া লয়েন তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আমাদের ন্যায় তরুণ তরুণীর জন্য কিন্তু এই জগতই উপযুক্ত স্থান।" যুবতীর মাতা বৃদ্ধা কপেলমণ্ডী সাতটি মহালের ষোল আনা মালিক। এতদ্ব্যতীত গেভার নামক স্থানেও তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল।

এই আসন্ন প্রলয়ের মধ্যে জীবন রক্ষার আশায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যুবতী শঠের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে, এই সৌম্যমূর্ত্তি যুবক শুধু শীকারের অন্বেষণে বিভিন্ন উপাসনা-মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন অর্থ-শালিনী যুবতীর মনোহরণ কিম্বা কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ সংগ্রহ করা। ধর্ম্মযাজক মহাশয় এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সমুদ্রতরঙ্গগুলিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও তাহাদিগকে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন, আর্ত্ত আরোহিগণকে সান্ত্বনাদান বা তাহাদিগকে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক এই হতভাগ্য ধর্ম্মযাজকের মনে ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত উপদেশ-বাণীর সহিত কামকলুষিত ঐহিক চিন্তা ও আক্ষেপ সতত যুগপৎ উদিত হইতেছিল।

সে যাহা হউক, উচ্চ শ্রেণীর আরোহিগণের ভাবভঙ্গির সহিত নৌকার সম্মুখভাগে উপবিষ্ট সাধারণ ব্যক্তিগণের ব্যবহারের বিশেষ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছিল।

ভঙ্গুর নৌকাখানি যতবার মগ্নপ্রায় হইতেছিল পূর্ব্বকথিত দরিদ্রা রমণী ততবার আপন সন্তানটিকে সবলে বক্ষে চপিয়া ধরিতেছিল। আগন্তুকের আশ্বাসবাণীতে তাহার হৃদয়ে প্রকৃতই আশার সঞ্চার হইয়াছিল এবং সে যতই আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, ততই তাহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতেছিল। এ বিশ্বাস দুর্ব্বলচিত্ত অবলার অন্ধ বিশ্বাস নহে; ইহা মাতৃহৃদয়ের সর্ব্ববিস্তারী অটল বিশ্বাস। অপরিচিতের স্নেহ-প্রেমপূর্ণ বাক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রমণী সেই আশ্বাসপূর্ণ দৈব বাণীর সফলতার জন্য স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। ঝটিকার প্রকোপ দেখিয়াও তাহার আর বিন্দুমাত্র ভয় হইতে-ছিল না।

নৌকার পার্শ্বদেশ দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সৈনিক তাহার অপূর্ব্ব সহযাত্রীটিকে কৌতুহলপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার সমস্ত জীবন মৌন আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় যাপিত হইলেও সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকামাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই আসন্ন বিপদে আগন্তুকের ন্যায় স্থির ও অবিচলিত ভাব ধারণের উদ্দেশ্যে সে তাহার সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াছিল। স্বকীয় শৌর্য্যের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া সে অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির সহিত আত্মশক্তির সমীকরণে সমর্থ হইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার প্রবুদ্ধ কল্পনাশক্তিও যেন আকস্মিক ধর্ম্মোন্মাদনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়া-ছিল। অভিযানকালে প্রতিভাগৌরবে মহিয়ান্ প্রতাপশালী অধিনায়কের প্রতি সৈনিক-যেরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, এই বিকলাঙ্গ বৃদ্ধের হৃদয়েও আগন্তুকের প্রতি তদ্রূপ প্রবল অনুরাগ ও অসীম আস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছিল। অনাথা ভিখারিণী মৃদু স্বরে বলিতেছিল, "আমার ন্যায় পাপিয়সী এ জগতে আর নাই। আমি যে ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহাতে কি আমার যৌবনাকৃত পাপের এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? কেন আমার দুর্ম্মতি হইয়াছিল? কেন আমি বিলাসিতায় মুগ্ধ হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম? বাস্তবিকই আমার পাপের অন্ত নাই। আমি যাজকগণের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া দেবতার ধনের অপব্যয় করিয়াছি। আমার মোহের ফাঁদে কত দরিদ্র-

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব শৌণ্ডিকালয়ে বা কুসীদজীবির গৃহে স্থান পাইয়াছে! কেন আমি পাপে রত হইয়াছিলাম? হে ভগবান্! এই দুঃসময় জগতেই যেন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিতে পারি। হে দয়াময়ী কুমারীদেবী! এ পাপীয়সীর প্রতি দয়া করুন।"

সৈনিক বলিল "মা, এরূপ অধীর হইও না। ঈশ্বর লম্বার্ড দেশীয় মহাজন নহেন যে, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। যদিচ কর্ত্তব্য ব্যপদেশে মধ্যে মধ্যে নরহত্যা করিয়াছি, তথাপি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও মুক্তিসম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

বৃদ্ধা বলিল, "ঐ ধর্ম্মযাজকের পবিত্র সান্নিধ্যে উপবিষ্টা রমণীগণ কতই সুখী, প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহাদিগের কোনও ভাবনা নাই। এ সময়ে যদি কোন ধর্ম্মযাজক আমাকে পাপক্ষমার আশ্বাস দিতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার কথায় নির্ভর করিতে পারিতাম।"

আগন্তুক বৃদ্ধার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন; তাঁহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে অনুতাপদগ্ধা পাপিনীর সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মা ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইবে।" বৃদ্ধা আন্তরিক ভক্তিসহকারে উত্তর করিল, "আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে আমি নিশ্চয়ই নগ্নপদে লরেটো তীর্থে যাইয়া মাঙ্গলিক ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিব।"

ইতর প্রাণীরা সৃষ্টিবিপর্য্যয়ে যেরূপ সহজাত সংস্কারবশে প্রকৃতিপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই অশিক্ষিত কৃষক ও তাহার পুত্রও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরলতার সহিত ভগবদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া মৌনভাবে তাহাদিগের অদৃষ্টফলের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নৌকার যে অংশে সভ্যতাভিমানী, শিক্ষাদৃপ্ত, ধনগর্ব্বিত, লম্পট ও ভ্রষ্টাচারী আরোহিগণ বসিয়াছিল, সেই দিক হইতেই কেবল ভীষণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছিল। উচ্চশিক্ষা, শিল্পকলা ও স্বাধীন চিন্তা মনুষ্যসমাজে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে ইহারা যেন তাহারই মূর্ত্তিমান আদর্শস্বরূপ। সংশয়, মৃত্যুভীতি ও পরস্পরবিরোধী বৃত্তিনিচয়ের সংঘর্ষে তাহাদিগের চিত্ত সদাই আলোড়িত হইতেছিল।

নৌবিদ্যাবিশারদ কর্ণধার সবিশেষ নৈপুণ্যসহকারে নৌকাখানিকে অষ্টেণ্ড নগরের পুরোভাগে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঝটিকাবেগে প্রহৃত হইয়া উহা পুনরায় সমুদ্রাভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল। তরঙ্গতাড়িত জলোচ্ছ্বাসোদ্ভিন্ন তরীখানি তটসান্নিধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য প্রধানরূপী জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ ভীতিবিহ্বল যাত্রীবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসবলে বলীয়ান হইয়া যদি তোমরা আমার অনুগামী হইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে।" এই বলিয়া তিনি উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি দলিত করিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্দৃষ্টে তরুণী আর দ্বিধামাত্র না করিয়া

তৎক্ষণাৎ তাহার শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া আগন্তুকের অনুগামিনী হইল। বৃদ্ধ সৈনিকও কাওয়াজকালীন ক্ষিপ্রতার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া পরুষ ভাষায়, কহিল "যদি নরকবাসে যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার তথাপি ইহাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিব না।" এই বলিয়া সে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বীরোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত নিয়মিত পাদক্ষেপে সেই মহিমময় পুরুষের পশ্চাদ্‌গামী হইল। ঐশ্বরিক শক্তিমত্তায় আস্থাবতী সেই বৃদ্ধা স্বৈরিণীও স্বচ্ছন্দে সাগরোর্ম্মি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কৃষকরা পিতাপুত্রে মনে করিল যে, অপর আরোহীরা যখন জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিতেছে তখন তাহারাই বা পারিবে না কেন? এই ভাবিয়া কালবিলম্ব না করিয়া উভয়ে দ্রুতপদে সহযাত্রিগণের অনুসরণ করিল। তথাপি স্ব স্ব বিপৎচিন্তায় নিবিষ্ট থাকায় কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ছিল না। এইরূপে তাহারা কোন প্রকারে তীরে পৌঁছিতে সমর্থ হইল।

টমাসও ইহাদিগের পন্থা অনুসরণ করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায় সে জলে পড়িয়া গেল। অবশেষে বারত্রয় চেষ্টা করিয়া সেও অপর সকলের ন্যায় হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। স্বাবলম্বী নির্ভীক নৌকাধ্যক্ষ পাটাতনের তলদেশ জলৌকার ন্যায় আঁকড়িয়া রহিল। এইরূপ বিপদেও নৌকা ত্যাগ করা সে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না। শ্রেষ্ঠী মহাজনের বিশ্বাসের অভাব ছিল না, কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সযত্নসঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলী দুইটি সঙ্গে লওয়ায় সেগুলি তাহাকে সমুদ্রের অতল জলে টানিয়া লইল। কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ প্রতারকের কথায় নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা আস্থাস্থাপন করিতেছে দেখিয়া বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক তাহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া নিজ বিদ্যাবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ধনিদুহিতাও বাহুপাশাবদ্ধ প্রণয়ীর কলুষ আকর্ষণে অতলস্পর্শ সমুদ্রসলিলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পাপ কুসংস্কার ও মিথ্যা বাহ্যিক আচারঅনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত ধর্ম্মযাজক মহাশয়ও তাঁহার শিষ্যা কপোলমণ্ডী উভয়েই নৌকাচ্যুত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইলেন। আরোহিগণের মধ্যে কেবল পূর্ব্ববর্ণিত কয়জন নরনারী সাগরোর্ম্মির বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস ও ঝটিকার হুহুঙ্কার শব্দ উপেক্ষা করিয়া শুষ্কপদে সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রয়াণ করিতেছিল, তাহাদিকের সম্মুখ ভাগে সুবৃহৎ তরঙ্গসমূহ—সর্ব্বক্ষণই বিচূর্ণিত হইতেছিল। দ্বিধাভিন্ন মহাসমুদ্র যেন কোনও অপ্রতিহত শক্তিপ্রভাবে তাহাদিগের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছিল। ঘনাচ্ছন্ন কুহেলিকান্ধকার ভেদ করিয়া কোনও মৎস্যজীবীর কুটীরগবাক্ষস্থিত ক্ষীণালোক তীরোপান্তে এই সকল তরীভ্রষ্ট আরোহিগণের গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করিতেছিল।

তীরাভিমুখে গমনকালে তাহারা প্রত্যেকেই শুনিতে পাইতেছিল, যেন তাহাদিগের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর সমুদ্রগর্জ্জন ভেদ করিয়া পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছিল, আর ভয় নাই. সাহসে ভর করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হও। কিন্তু যখন তাহারা ধীবর-কুটীরে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সেই অপূর্ব্ব পথ-

প্রদর্শকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তখন তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঝটিকাতাড়িত তরীখানি সমুদ্রতীরবর্ত্তী শৈলখণ্ডের সানুদেশে নিপতিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ চূর্ণিত হইয়াছিল। দুঃসাহসী নৌকাধ্যক্ষ কিন্তু তখনও পাটাতনের কাষ্ঠ-খণ্ডটি ছাড়িল না, মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় উহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল। জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ তীর হইতে অবতরণ করিয়া নৌকাচ্যুত অধ্যক্ষ্যকে উঠাইয়া ধরিলেন এবং তরঙ্গাভিঘাতে নিষ্পেষিত তাঁহার শক্তিহীন দেহ বেলাভূমে আনায়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, কিন্তু কদাপি আর এরূপ আচরণ করিও না। তোমার দৃষ্টান্তের ফল অতি বিষময় জানিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় স্কন্দে স্থাপনপূর্ব্বক কুটীরসন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এইস্থানে নাবিকেরা 'কৃপামন্দির' নামক একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শুনিয়াছি, তথায় বালুকাতটে ঈশ্বরপদচিহ্ন দর্শনের জন্য বহুকাল ধরিয়া দেশবিদেশ হইতে লোকসমাগম হইত। পরে ফরাসীজাতি কর্ত্তৃক বেলজিয়ম অধিকারকালে মঠের সন্ন্যাসিগণ সেই পূত স্মরণচিহ্ন লইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। মর্ত্তভূমে ঈশার শেষ আবির্ভাবের ইহাই একমাত্র নিদর্শন।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

মির্জ্জানগরের ধ্বংসাবশেষ।

ভারতবর্ষে যে কতশত প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এখন সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত ভ্রান্তিমূলক কিম্বদন্তী বিজড়িত হইয়া ইতিহাস বিকৃত করিয়া দিয়াছে। বঙ্গদেশে এমন অনেক স্থান আছে, যাহার নাম ইতিহাসে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। আমরা আজ পাঠকগণের নিকট সেইরূপ একটি স্থান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

মির্জানগর যশোহর জিলার একটি গ্রাম। ই, বি, এস্, রেলওয়ের যশোহর ষ্টেশন হইতে এই স্থান নয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই মির্জানগরের কিয়দংশ লইয়াই এক্ষণে ত্রিমোহিনী হইয়াছে। ত্রিমোহিনী মির্জানগর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত।

মির্জারনগরে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকের নিকট ইহা "নবাববাড়ী" বলিয়া পরিচিত। অনেক ভ্রান্তি-মূলক আখ্যান এই "নবাববাড়ী" নামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও ইহার সহিত অতীত ইতিহাসের যথেষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এইরূপ ভগ্ন বাটী মির্জা-নগরের অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে দুই দিকে দুইটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ; মধ্যস্থলে এক উচ্চ প্রাচীর দণ্ডায়মান হইয়া ঐ দুইটি প্রাঙ্গণকে বিভক্ত করিয়া দিতেছে। উত্তরদিকের প্রাঙ্গণের উত্তরে এবং দক্ষিণদিকের প্রাঙ্গণের দক্ষিণে আবার ঐরূপ প্রাচীর আছে। উক্ত দুইটি প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে দুই সারি খিলান করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ এখনও বর্ত্তমান। উত্তরদিকের প্রাঙ্গণের পশ্চিমে তিনটি বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট অট্টালিকা। স্থানীয় লোকরা ইহাকে শয়নগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই অট্টালিকার প্রায় সকল অংশই ভগ্ন; কেবল তিনটি গম্বুজ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বর্ণিত অট্টালিকার সম্মুখভাগে ইমারতি-কার্য্যখচিত একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা আছে। কথিত আছে, এক সময় এই চৌবাচ্চা স্নানার্থ ব্যবহৃত হইত। *

অদূরবর্ত্তী ভদ্রানদী হইতে কলসাহায্যে নির্ম্মল বারি উত্তোলিত করিয়া এই চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হইত। এই চৌবাচ্চার নিম্নদেশে এক ভূগর্ভ-প্রবাহিত পয়ঃপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। অপরিস্কৃত জল এই পয়ঃ-প্রণালী দিয়া বহির্গত হইত।

ভদ্রানদী এক্ষণে পঙ্কপূর্ণ ও জলশূন্য কিন্তু এক সময় ইহা নীল বারিরাশি বক্ষে লইয়া প্রবলবেগে প্রাসাদের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। † নদী এক্ষণে প্রাসাদের নিম্নে না বহিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত নবাববাড়ীর দক্ষিণদিকের প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে কতিপয় মুসলমান মস্‌জেদের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং, এই স্থানে

* "In front of this, and within the courtyard, is a large masonry reservoir, which is said to have been a bath"— Westand.

† Statistical Account of Bengal.

কোনও মুসলমান যে এক সময়ে অবস্থান করিতেন, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

নবাববাড়ীর অৰ্দ্ধক্রোশ দূরে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশিষ্ট অংশবিশেষ দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামের লোক ইহাকে "কিল্লাবাড়ী" আখ্যা প্রদান করিয়াছে। এই দুর্গ উচ্চে আট বা দশ ফিট্, এবং পরিধিতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ হইবে। ইহার দক্ষিণদিকে "মোতি-ঝিল" নামে যে একটি জলাশয় আছে, সেই জলাশয় হইতে মৃত্তিকা উত্তোলিত করিয়া এই দুর্গ সংগঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ "কিল্লাবাড়ী" পূর্ব্বে প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল; কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই।

দুর্গে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে; দেখিলে বোধ হয় যেন এই দ্বার পূর্ব্বে কোনও সময়ে বিশেষ সুরক্ষিত ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে তিনটি কামান পড়িয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট্ মিঃ বোফোর্ট (Beaufort) তাহাদের দুইটিকে স্থানান্তরিত করেন। তৃতীয়টি এখনও নিকবর্ত্তী মাঠে পতিত রহিয়াছে। ইহা একটি আশ্চর্য্য জিনিষ। সার জেমস্ ওয়েষ্ট্ল্যাণ্ড্ তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক—যশোহর জিলার রিপোর্টে এই কামান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহরে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"There is, according to the natives, some magic power in it which makes it refuse to be moved. Three hundred convicts and one elephant were at one time tried, but failed, to raise it from its place. * * * * * It is an iron gun, about five feet long, and composed of three or four concentric layers of metal."

দুর্গে প্রবেশদ্বারের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হয়। গ্রাম্যলোক এই স্থানটিকে কয়েদীখানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

এই সকল কক্ষের দুইটিতে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ কূপ আছে। হতভাগ্য অপরাধীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার নিমিত্ত এই সকল কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। যাহাতে তাহারা কোনও প্রকারে কূপ হইতে উত্থিত হইয়া পলায়ন করিতে না পারে, সেই জন্য কূপের উপরিভাগস্থ রক্ষ চুন ও বালি দিয়া বন্ধ করা হইত।

ত্রিমোহিনী বাজারের নিকট আর একটি উল্লেখযোগ্য ভগ্ন বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে তত্রত্য লোক "ইমামবাড়ী" অর্থাৎ প্রার্থনালয় বলিয়া থাকে। মুসলমান ভজনস্থান প্রায়ই বিবিধ কারুকার্য্যময় প্রাচীরবিশেষ। উক্ত ইমামবাড়ীও এই প্রকারের। আরাধনার জন্য বোধ হয় ঐ প্রাচীরের সম্মুখে এক মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কোনও চিহ্ন এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ণিত প্রাচীর এক উচ্চ মৃৎ-স্তূপের উপর অবস্থিত। এই প্রাচীর এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বোধ হয় একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রাচীরের উপর কোনও আচ্ছাদন নাই, কোনও দিন ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ।

মির্জানগরে যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে, কোনও সময় এই স্থানে এক পরাক্রান্ত মুসলমান বাস করিতেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী এই যে, কিশোর খাঁ নামে মুর্শিদাবাদের এক নবাব মির্জানগরে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতেন।

কিশোর খাঁ একজন পরাক্রান্ত ও অত্যাচারী জমীদার ছিলেন, এতদ্ভিন্ন স্থানীয় লোক আর অধিক কিছুই অবগত নহে। তাহারা কিশোর খাঁর নাম উল্লিখিত ধ্বংসাবশিষ্ট "নবাববাড়ী," "কিল্লাবাড়ী" ও "ইমামবাড়ীর" সহিত বিজড়িত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে মাত্র এক অপূর্ব্ব, অসম্বদ্ধ ও জটিল উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সে সকল গল্পের কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা বা সত্যতা নাই।

মির্জানগর এখন একটি সামান্য গ্রাম হইলেও প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে একজন ইংরাজ কর্ত্তৃক যশোহর জিলার তিনটি বৃহৎ নগরের মধ্যে অন্যতমরূপে ('one of the three largest towns in the district') পরিগণিত হইয়াছে। বোধ হয়, পূর্ব্বে মির্জানগর আয়তনে বৃহৎ ছিল।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে হিদায়তুল্লা ও রহমতুল্লা নামক দুই ব্যক্তি যশোহরের তৎকালীন কালেক্টরের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন :—

"আমাদের প্রপিতামহ নুরুউল্লা খাঁ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মভ্রাতা ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক বঙ্গদেশের নবাবনাজিমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবনাজিমগণের আবাসস্থান মির্জানগরে তিনি

অবস্থান করিতেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মির্ খালিলৃও নাজিমপদে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—একজনের নাম দায়িমুল্লা, আর একজনের নাম করিমুল্লা। তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া নবাবীপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই জন্য কলহ করিয়া পরস্পরকে নিহত করেন। সেই সময় সুজা খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়া আইসেন এবং মুর্শিদাবাদে গদী স্থাপিত করেন। সম্রাটের আদেশে আমরা দুইজন তথায় আহুত হই। কিন্তু আমাদের ভরণপোষণের জন্য কিছুই করা হয় না, সুতরাং আমরা মির্জানগরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলি। যে রাজা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নিকট জমীদারী পাইয়াছিলেন তিনি এতদিন আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতেন। তিনি নিঃস্ব হইয়াছেন—এক্ষণে আপনারাই আমাদের আশ্রয়স্থল।" * কালেক্টরের অনুরোধে এবং আবেদনকারীদ্বয়ের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গবর্মেণ্ট্ হিদায়ৎ ও রহমৎকে ১০০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন উক্ত বৃত্তি ভোগ করিতে পায়েন নাই। তাঁহার কিয়ৎকাল পরেই প্রাণত্যাগ করেন।

এখন দেখা যাউক্, উল্লিখিত আবেদনপত্র হইতে কোনও ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না।

ঔরঙ্গজেব তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতাকে বঙ্গদেশের নবাবনাজিমপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার নাম নুরুউল্লা নহে—ফিদৈ খাঁ। তিনি ১৬৭৭ হইতে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং, আবেদন পত্রে যে লিখিত আছে, নুরুউল্লা ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মভ্রাতা ছিলেন ইহা সত্য কি না সন্দেহ; থাকিলেও তিনি কোন দিন বঙ্গদেশের নবাব-নাজিম ছিলেন না।

আমরা দেখিতে পাই যে, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে যখন ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন শোভা সিংহ নামে একজন হিন্দু জমীদার এবং রহিম খাঁ নামে উড়িষ্যা হইতে আগত পাঠানসর্দ্দার বঙ্গদেশে এক বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করিয়া বর্দ্ধমান, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জিলার বিভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকেন। তখন বঙ্গের নবাব ঢাকায় ছিলেন। তিনি যশোহরের ফৌজদার নুরুউল্লাকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ করেন।

---

* Report on the District of Jessore. (1874).

নুরুউল্লা তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হুগলি গমন করেন এবং এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক বিদ্রোহী সেনার আগমনের অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যদল হুগলি আক্রমন করিলে নুরুউল্লা ভীত হইয়া রজনীযোগে নৌকারোহনে যশোহরে পলায়ন করেন। এই নুরুউল্লা যে আবেদন পত্রে উল্লিখিত নুরুউল্লা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং মির্জানগরই যশোহরের ফৌজদারের আবাসস্থান ছিল। সম্ভবতঃ তিনি বর্ণিত "নবাব বাড়ীতে" বাস করিতেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ "কিল্লাবাড়ীতে" অবস্থান করিত। আবেদন পত্রে যে সুজাখাঁর উল্লেখ আছে, তিনি ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নবাব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি 'সুজাখাঁ' নহেন 'সুজাউদ্দিন'। সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দিন বঙ্গদেশের নবাব হয়েন। বঙ্গদেশের ফৌজদারগণের লোপ একশত বৎসর মাত্র হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ের মধ্যেই তাঁহাদের কথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

যে কিশোর খাঁর কথা এদেশে প্রচলিত, তিনি একজন ভয়ানক দুর্দ্দান্ত জমীদার ছিলেন।

বর্লিনে মুদ্রিত 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে' মির্জানগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মির্জানগর যশোহরের ফৌজদারের আবাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মির্জানগরের দক্ষিণে নুরুউল্লানগর ও পূর্ব্বে নুরুউল্লাপুর নামে দুইটি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয়, এই দুই গ্রাম যশোহরের ফৌজদার নুরউল্লার নামে ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। *

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

* Statistical Account of Bengal vol ii P. 208

অঞ্জলি।

বন-উপবনে চয়ন করিয়া
আনিয়াছি পূজা উপচার,—
প্রভাতের মৃদু পরশে বিবশ
কুসুম—স্নিগ্ধ সুকুমার।
আমিত চাহি না গাঁথি' চারুহার
কণ্ঠে তাহার দিতে উপহার।
শুধু—সযতনে এই ফুলরাশি
ঢেলে দিয়ে যা'ব পথে তা'র,
—এই টুকু চাহি অধিকার।

এই পথে যবে যা'বে সে চলিয়া
দলিয়া চরণে ফুলদল,
বুঝিবে কি—আছে ঝরা বনফুলে
কা'র হৃদয়ের পরিমল!
চলিতে চলিতে যদি কভু ভুলে'
দুটি ফুল এর লয় হাতে তুলে,'
দেখে যদি চাহি'—শিশির-সলিলে
মিশি' আছে কা'র আঁখিধার,
—সার্থক হবে ফুলভার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

নবীন প্রসঙ্গ। *

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। মাঝে মাঝে আমি প্রায়ই নবীন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে আসিতাম। নবীন বাবু আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সে স্নেহ অকৃত্রিম আন্তরিকতাপরিপূর্ণ। তাহাতে মহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে ব্যবধান-পার্থক্য ছিল না। সে স্নেহকে সৌহার্দ্দের নামান্তর বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার সহিত সকল কথাই হইত।

সে দিনও কোনও এক পর্ব্বদিন। আদালত বন্ধ। সকালের ট্রেনে রাণাঘাটে উপস্থিত হইয়া নবীন বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, তিনি বাহিরের বারাণ্ডায় একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান ভাবে নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিতেছেন। পার্শ্বে তাঁহার পত্নী। আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, নবীন বাবু বলিলেন, "কাহাকে দেখিয়া পলাইতেছ? গিরিজাকে দেখিয়া লজ্জা!—গিরিজাও একটি ছোট খাটো কবি। গিরিজার কবিতা দেখ নাই? বেশ মিষ্ট লেখে।" নবীন বাবুর স্ত্রী সসঙ্কোচে দাঁড়াইলেন।

তাহার পর নবীন বাবু বলিলেন, "ঘরের ভিতর চল। আজ তোমাকে আমার নূতন কাব্যের কয়েক পৃষ্ঠা শুনাইব।" আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম। নবীন বাবু একখানি টেব্‌লের সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"আমার 'রৈবতক' পড়িয়াছ কি?" আমি উত্তর করিলাম, " 'রৈবতক' বাহির হইলেই আমি এক কাপি পিপল্‌স্‌ লাইব্রেরী হইতে কিনিয়াছিলাম। সে আজ ৪।৫ বৎসরের কথা।" নবীন বাবু বলিলেন, " 'রৈবতক' তোমার কেমন লাগিয়াছিল?" আমি উত্তর করিলাম, "পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমার কাছে দুর্ব্বোধ ঠেকিয়াছিল। আপনার 'পলাসীর' মত 'রৈবতক' হয় নাই।" নবীন বাবু হো-হো করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি 'রৈবতকের' উদ্দেশ্য বুঝ নাই। আমি 'রৈবতকে' প্রকৃত কৃষ্ণ-চরিত্র যাহা, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তোমরা বা সাধারণে কৃষ্ণকে

* প্রথম প্রসঙ্গ গত পৌষ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্রূর, কুচক্রী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া জান। মহাভারত পড়িয়াছ ত? কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত। কৃষ্ণই খণ্ড ভারতকে মহাভারতে পরিণত এবং একছত্র সম্রাটের অধীন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি 'রৈবতকে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্য লীলা বর্ণনা করিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আপনার 'রৈবতকের' কৃষ্ণ দ্বিতীয় বিস্‌মার্ক। সেইরূপ রাজনীতিবিশারদ ও সুচতুর।" নবীন বাবু বলিলেন, "কৃষ্ণ চরিত্রের এক দিক দেখিয়া তুমি ওরূপ বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণ বাস্তবিকই আদর্শ পুরুষ। তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে পারি, সেরূপ যোগ্যতা আমার নাই। তবে কৃষ্ণচরিত্র আমি যেরূপ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা আমার পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। ইহাই আমার শ্লাঘা।" বাস্তবিক এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু এবং নবীন বাবুর মধ্যে কে অগ্রণী, তাহার বিচার একবার হইয়াছিল। কিন্তু সুমীমাংসা হয় নাই। কারণ তখন বঙ্কিম বাবু জীবিত ছিলেন না।

'রৈবতক'-প্রসঙ্গ এই স্থানেই শেষ হইল। তাহার পর নবীন বাবু তাঁহার নূতন মহাকাব্য (যাহা তখন পাণ্ডুলিপির আকারে ছিল) 'কুরুক্ষেত্রের' কথা পাড়িলেন। পাণ্ডুলিপির খাতাটি দেখিলাম, অতি বৃহৎ। নবীন বাবু বলিলেন, "এই 'কুরুক্ষেত্রে' আমি কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কৃষ্ণের মহত্ত্ব কোথায়, কিসে তিনি বড়—কিসে তিনি আদর্শ মানব তাহার পরিচয় 'কুরুক্ষেত্রে' পাইবে। ছাপা হইলেই তোমাকে তৎক্ষণাৎ 'কুরুক্ষেত্র' পাঠাইয়া দিব।" আরম্ভ কেমন হইয়াছে পড়িতেছি, শুন। বলিয়া পড়িলেন ;

নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল নির্ম্মল আকাশ,
শরতের শেষ মেঘে ঊর্দ্ধে তরঙ্গিত—
নীরব, নিস্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জ্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্ব চরাচরে।
দুই প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,
তরঙ্গিত বেলা যেন রণ-পয়োধির। ইত্যাদি

পাঠান্তে আমার মুখের দিকে, চাহিয়া তিনি বলিলেন "কেমন, 'মেঘনাদের' চেয়ে 'কুরুক্ষেত্রের' আরম্ভ grand হয় নাই কি?" বাস্তবিকই 'কুরুক্ষেত্রের' আরম্ভশ্লোকগুলি বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইল। আমি দুই দিক রক্ষা করিয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ, এরূপ বর্ণনা আর কোনও কাব্যে দেখি নাই।" এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি। নবীন বাবুর পাঠভঙ্গী আমার কাণে একটু বিসদৃশ লাগিত। বোধ হয়, তাহার কারণ, উচ্চারণে তিনি জন্মভূমির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি হেমবাবুর পাঠ-ভঙ্গীর নিন্দা করিতেন! যাউক সে কথা।

নবীন বাবু আরম্ভ অংশ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "'কুরুক্ষেত্রের' পঞ্চদশ সর্গে —যে স্থানে আমি বীরের শোক বর্ণনা করিয়াছি, পড়িতেছি, শুন।" তিনি উক্ত সর্গের অধিকাংশ পড়িয়া শুনাইলেন; আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর কোন কাব্যে কোন কবি বীরের শোক এমন করিয়া চিত্রিত করেন নাই। বল দেখি, অর্জ্জুনের শোকচিত্র বীরের অনু-রূপই অঙ্কিত হইয়াছে কি না।" আমি শেষ কথায় সায় দিয়া বলিলাম, "হাঁ। বীরের শোক রমণীসুলভ হা-হুতাশ-ক্রন্দন হইলে চিত্রটি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "'কুরুক্ষেত্র' কত দিনে ছাপা হইবে?" নবীন বাবু বলিলেন, "আমার একটি ভাগিনেয় জেদ করিয়া এতদিন ছাপা বন্ধ রাখিয়াছিল। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য নানা কারুকার্য্যে খচিত করিয়া মুদ্রিত করিবে। কিন্তু তাহার অকালমৃত্যুতে সকল আশায় ছাই পড়িয়াছে। অতঃপর 'কুরুক্ষেত্র' যেমন তেমন করিয়াই ছাপাইব।" বলিতে বলিতে নবীন বাবুব দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। নবীন বাবু ভাগিনেয়টিকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের স্মৃতি চিরদিন 'কুরুক্ষেত্রের' সহিত জড়িত থাকিবে।

এমন সময়ে আমাদের আহারের আহ্বান আসিল। আহারান্তে মধ্যাহ্ন বিশ্রামে কাটিল। অপরাহ্ণে আবার সাহিত্য-কথা। এবার 'পলাসীর যুদ্ধের' কথা উঠিল। 'পলাসী'-প্রসঙ্গে নবীন বাবু বলিলেন—"'পলাসী' পুস্তকাকারে প্রথম আরম্ভ করি নাই। একটি সুদীর্ঘ কবিতার হিসাবে প্রথম লিখিয়া-ছিলাম। তখন আমি যশোহরের ডেপুটী। বয়স বোধ হয়, উনিশ কি কুড়ি তাহার বেশি নহে। 'পলাসীর' এখন যাহা দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ কাটোয়া—বৃটিশ শিবির—তাহাই 'পলাসীর' আরম্ভ ছিল। পরে কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধুর

অনুরোধে উহা কাব্যাকারে পরিণত করি।" নবীন বাবু বলিলেন, "ইহার প্রথম সর্গের প্রায় অধিকাংশ যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট (তাঁহার নাম নবীন বাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম মনে নাই) ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া অনুবাদের খাতাটি আমাকে দেখিতে দিলেন। ইংরাজের অনুবাদ—বোধ হয় নবীন বাবু শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—যথাযথ এবং সুন্দর হইয়াছে দেখিলাম। ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া বোধ হইল যেন বায়রণের Childe Harold পড়িতেছি। লেখকের হস্তাক্ষরও যেন মুক্তা বর্ষিয়া গিয়াছে।

'পলাসীর যুদ্ধ' প্রসঙ্গে নবীন বাবু বলিলেন "এই 'পলাসী' লিখিয়া আমার ক্ষতি-লাভ দুই-ই হইয়াছে।" আমি বলিলাম "সে কি রকম?" নবীন বাবু বলিলেন, " 'পলাসীর' যুদ্ধে যেমন আমার কবিযশের প্রতিষ্ঠা, তেমনই রাজকার্য্যে Promotion বন্ধ। ইহার বহুদিন পূর্ব্বেই আমি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিতাম। কিন্তু 'পলাসীর যুদ্ধ' লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছি।" ইহার কিছুদিন পরেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিবার জন্য নবীন বাবুর নিকট বিদায় লইলাম। বিদায় দিবার সময় নবীন বাবু বলিলেন,—"বোধ হয় এই সপ্তাহে হীরেন, রবি ও সুরেশ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। তুমি আসিয়া যোগ দিলে বড়ই আহ্লাদিত হইব।" আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ব্যর্থ প্রেম।

চারিদিন ছুটীর পর আফিস খুলিয়াছে—কাযের বড় ভিড়। আমি ডাক খুলিয়া চিঠিগুলি বাছিয়া—ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য আবশ্যক মন্তব্য লিখিতেছি এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল—একজন ইংরাজ মহিলা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন—ম্যানেজার অত্যন্ত ব্যস্ত; তাই তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আনিতে উপদেশ দিয়া আমি একখানা চিঠির উপর মন্তব্য লিখিতে প্রবৃত্ত লইলাম।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহিলাটি বলিলেন, "আমি এই ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টার মিষ্টার ঘোষের সংবাদ লইবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

শুনিয়া আমি মুখ তুলিলাম।

রমণীর দৃষ্টি আমার মুখে পতিত হইল। তাঁহার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। বোধ হইল, তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল—তিনি যেন অবলম্বনের জন্য সম্মুখস্থ চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগ চাপিয়া ধরিলেন।

আমি তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম।

তিনি আমাকে ধন্যবাদ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি মিষ্টার ঘোষের—?"

আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার একমাত্র সন্তান।"

আগন্তুকের নয়নে আনন্দালোক সমুজ্জলভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, "আমি মিষ্টার ঘোষের সংবাদ জানিতে আসিয়াছি। আমি এ দেশে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই। সৌভাগ্য ক্রমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "দুই বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

রমণী বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম।"—কিন্তু তাঁহার পাণ্ডুবর্ণাভ মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল। তাঁহার শরীর যেন আবার কাঁপিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "আমি কি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি?"

রমণী বলিলেন, "আমি আপনাকে কিছু বলিতে চাহি। আপনার পিতা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন। আপনার সহিত কখন কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারে?" রমণীর কণ্ঠস্বর বাষ্পভারাক্রান্ত।

আমি বলিলাম, "আপনি আমার পিতার বন্ধু—আমার মাতৃস্থানীয়া। আপনি যখন বলিবেন, আমি যাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি আজ সন্ধ্যার সময়ই যাইতে পারি।"

আপনার ঠিকানা বলিয়া রমণী বিদায় লইলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা রহস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রৌঢ়া রমণীর—মুখ দেখিলে মনে হয়, সে মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে,—তাঁহার ব্যবহারে বিনয় ও বিষাদ পরিস্ফুট। এই অপরিচিতা কে?

২

সমস্ত দিন আমি নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। আজ এই বিদেশিনীর কথায় আমার পিতৃদেবের রহস্যময় জীবনের রহস্য যেন একান্তই দুর্ব্বোধ বোধ হইতে লাগিল।

আমার পিতামহ সুদূর পঞ্জাবে চাকরী করিতেন। পিতৃদেব তাঁহার মধ্যম পুত্র। পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতামহ পুনরায় বিবাহ করেন। বিমাতার সহিত বনিবনাও না হওয়ায় পিতা পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। তখন তিনি বালক। কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তিনি যে কিরূপে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে মাতুলালয়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু তিনি যাহা করিবেন স্থির করিতেন তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না।

মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া তিনি লিখাপড়া করিতে লাগিলেন ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তিনি এফ্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তিন বৎসর ডাক্তারী পড়িলে তাঁহার মাতুল তাঁহার বিবাহ দিলেন। এ বিবাহে পিতার সম্মতি ছিল না—বিবাহ সুখেরও হয় নাই। পিতা পরান্নপালিত—পরাশ্রয়স্থ; তাঁহার শ্বশুর অত্যন্ত ধনশালী—ধনগর্ব্বে আপনাকে সমাজে প্রধান মনে করেন। তিনি দরিদ্র জামাতাকে দরিদ্রকে ধনীরা যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন সেইরূপ উপদেশ দিতেন—তাহাতে জামাতার আত্মসম্মান আহত হইত।

দুই বৎসর পরে ডাক্তার হইয়াই পিতা—শ্বশুরের অসম্মতি উপেক্ষা করিয়া

পত্নীকে পিতৃগৃহ হইতে আনিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিলেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল। এমন সময় সংবাদ আসিল, পিতামহের মৃত্যু হইয়াছে। পিতার বিমাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যা লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের নিকট আশ্রয় পাইলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আয়ের অল্পতার বিষয় পিতার অগোচর ছিল না। তিনি কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রণোদনে সামান্য আয়ের অধিকাংশই পিতার বিধবার ও পুত্র-কন্যাগণের আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পাঠাইতে লাগিলেন। সংসারে টানাটানি হইতে লাগিল। এরূপ অসচ্ছলতায় অনভ্যস্তা কন্যার নিকট এ বিষয় অবগত হইয়া শ্বশুর জামাতার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন। শ্বশুরজামা-তায় বিচ্ছেদ হইয়া গেল। তখন আমার বয়স দুই মাস।

স্বপুত্র পত্নীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া পিতা কোন বন্ধুর সাহায্যে নির্ভর করিয়া য়ুরোপযাত্রা করিলেন।

মাতামহ পিতার এ ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া কন্যাকে নিজগৃহে রাখিবার প্রস্তাব করিলেন—মাও সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

সাত বৎসর পরে পিতা দেশে ফিরিলেন; ফিরিয়া বাসা করিয়া আমাকে আনিতে পাঠাইলেন। পিতামহ ও মা বিপদ গণিলেন। পিতার স্বভাব তাঁহারা অবগত ছিলেন। তিনি যখন পুত্রকে মাতৃ অঙ্কচ্যুত করিয়া লইতে উদ্যত—তখন কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।

আমি পিতার নিকট আসিলাম। বৃহৎ গৃহের শূন্যতা আমার বালক-হৃদয়কে পীড়িত করিত। মা'র কথা মনে করিলেই আমার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত। কয়দিন আমাকে নিকটে রাখিয়া পিতা বুঝিলেন, ছেলে "মানুষ" করিবার যোগ্যতা পুরুষের নাই। তিনি মানব প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ না করিয়া আমাকে বোর্ডিংস্কুলে পাঠাইলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠি-লাম। প্রতি রবিবারে পিতার নিকট যাইতাম; তাঁহার গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখভাব দেখিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া ভীত হইতাম; কিন্তু বুঝিতে পারিতাম, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

দুই মাস পরে আমি যখন নূতন জীবনে কেবল অভ্যস্ত হইতেছিলাম তখন একদিন পিতা ও মাতামহ স্কুলে যাইয়া আমাকে লইয়া আসিলেন। আমি বিসূচিকারোগাক্রান্তা জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে নীত হইলাম।

জননীর মৃত্যুর পর পিতা কয় মাসের জন্য য়ুরোপ যাইলেন—ফিরিয়া আমাকে আবার আপনার নিকটে আনিলেন। এবার তিনি প্রকৃতির সহিত

সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। তিনি একাধারে জনক ও জননী হইয়া মাতৃহীন পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশার বাড়িতে লাগিল—অবসর অল্প হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু তিনি আমার আহার হইতে পাঠ পর্য্যন্ত সব স্বয়ং দেখিতেন। ক্রমে আমাকে না হইলে তাঁহার চলিত না।

দশ বৎসর কাটিয়া গেল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। পিতার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমাজে তিনি সম্মানিত হইলেও সমাদৃত নহেন। তিনি সমাজে মিসিতেন না।

তাঁহার জীবনে যেন কোন সুখ ছিল না; কেবল ব্যবসায় লইয়া তিনি বিব্রত থাকিতেন; তাহাতেই অত্যন্ত মনোযোগ দিতেন।

এই সময় বাঙ্গালার মরা গাঙ্গে ভাবের ভরা জোয়ার আসিল।—দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা পূর্ব্ব হইতে বিদেশী ব্যবসায়ী ও স্বদেশী অর্থনীতিবিশারদগণের উপদেশে এত দিন প্রধূমিত হইতেছিল একণে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; যাহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অংশমাত্রে নিবদ্ধ ছিল তাহা সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যেমন প্রবল বন্যায় কূল ছাপাইলে জল উচ্চ—শুষ্ক ভূমিখণ্ডেও ছড়াইয়া পড়ে তেমনই এই ভাব সমাজে সকলকেই স্পর্শ করিল। সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন পিতৃদেবও স্থির থাকিতে পারিলেন না।

দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিচার অপেক্ষা উৎসাহের মাত্রাধিক্য লক্ষিত হইল। পিতা বলিলেন—অর্থ ব্যতীত শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না, বৃহৎ অনুষ্ঠান একের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তিনি আমাকে ব্যাঙ্কের কায শিখিবার জন্য, যুরোপে পাঠাইলেন—স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আমি দুই বৎসর বিদেশে কায শিখিয়া স্বদেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় টেলিগ্রাম পাইলাম, পিতা পীড়িত। দেশে ফিরিয়া দেখিলাম পিতা মৃত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কে সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষরূপে কায করিতে লাগিলাম। এখনও সেই কার্য্যেই নিযুক্ত আছি।

৩

যথাসম্ভব সত্বর কায শেষ করিয়া আফিস হইতে বাহির হইলাম। যখন গন্তব্য গৃহে উপনীত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হোটেলে সন্ধান করিলে কর্ম্মচারী আমাকে অধ্যক্ষের নিকট লইয়া যাইলেন। অধ্যক্ষ আমার

নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "মহিলাটি অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল—শরীর বলশূন্য। ডাক্তার বলিলেন, সামান্য উত্তেজনায় যখন তখন মৃত্যু হইতে পারে। আজ খানিকটা ঘুরিয়া তিনি বড় অসুস্থ হইয়াছেন। ডাক্তার ঔষধ দিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াছেন—কাহারও নিষেধ শুনিবেন না। দেখিবেন, যেন কোন কারণে তাঁহাকে ব্যস্ত করিবেন না।"

একজন ভৃত্য আমাকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষদ্বারে লইয়া গেল। দ্বার ভেজান ছিল; আমি আঘাত করিলে প্রশ্ন হইল "কে?"

আমি নাম বলিতে উত্তর আসিল, "ভিতরে আইস।" বোধ হইল, যিনি উত্তর দিলেন, তিনি হাঁফাইতেছেন।

আমি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—রমণী একখানি কৌচে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার মুখ যেন রক্তলেশশূন্য, তিনি হাঁফাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কাতর স্বরে বলিলেন, "উপবেশন কর।"

পার্শ্বে একজন শুশ্রূষাকারিণী বসিয়া ছিলেন; আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম—রোগিণীর কপালে হাত দিয়া দেখিলাম কপাল ঘর্ম্মাক্ত। সে দিন আর কোন কথা হইল না; রাত্রি অধিক হইলে আমি গৃহে ফিরিলাম।

৪

পরদিন আফিসে অল্পক্ষণ কায করিয়াই ছুটী লইয়া বাহির হইলাম। হোটেলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, মহিলাটি অনেকটা সুস্থ তবে গত রজনীর যন্ত্রণার চিহ্ন তাঁহার মুখে স্বপ্রকাশ। তিনি আমাকে বলিলেন, "বৎস, উপবেশন কর।"—তাহার পরই বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে, আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া তাই এরূপ সম্বোধন করিলাম—রাগ করিবে না ত?"

আমি বলিলাম, "আপনি আমাকে 'আপনি' বলিলেই বরং আমি দুঃখিত হইতাম। আমাদের দেশে পিতার বন্ধু পিতৃস্থানীয়—বান্ধবী মাতৃস্থানীয়া।"

তিনি হাসিলেন, পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে সে ক্ষীণ হাসি শরতের বর্ষণলঘু মেঘে বিদ্যুদ্বিকাশের মত দেখাইল। তিনি বলিলেন, "আমি তাহা জানি—তোমাদের সুমধুর সাহিত্য যে পাঠ করিয়াছে সে কি তাহা না জানিয়া থাকিতে পারে?"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "কল্য রাত্রিতে বড় ভয় হইয়াছিল—বুঝি তোমার সহিত আর দেখা হইল না—বুঝি যে জন্য ব্যস্ত হইয়া ভারতে আসিলাম সে কায অসম্পন্ন রাখিয়া—তোমাকে আত্মপরিচয় না দিয়া—আমার

উত্তরাধিকী করিবার পূর্ব্বেই মহাযাত্রা করিতে হইল।" আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, "তুমি বিস্মিত হইতেছ? জগতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে, বৎস? আমি মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি—ইহা আমার পরম আনন্দের বিষয়।"

আমি বলিলাম, "উষ্ণপ্রধান স্থানের জলবায়ু বোধ হয় আপনার ভগ্ন-স্বাস্থ্য দেহে সহ্য হইতেছে না।"

তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষকে আমার কল্পনা নন্দনের সৌন্দর্য্যসম্পদে সুন্দর করিয়াছিল। এক দিন আমি আশা করিয়াছিলাম, ভারতে আসিয়া বাস করিব। সে আশা সফল হয় নাই—কিন্তু ভারতে মৃত্যু আমার নিয়তি। আমি ভারতে মরিতে আসিয়াছি। তোমার পিতার নিকট যখন ভারতের বর্ণনা শুনিতাম—মেঘলেশহীন সুনীল গগন, সমুজ্জ্বল দিবালোক, বিচিত্রবর্ণ বিহগ, দীপ্তিময়ী তারকা, অমলধবল জ্যোৎস্না, পত্রবহুল পাদপ—এ সকলের কথা যখন শুনিতাম তখন আমি মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার বর্ণনায় অতি সাধারণ দ্রব্যও সুন্দর বোধ হইত। তাঁহার স্বদেশের সৌন্দর্য্য যে তাঁহার বর্ণনায় আমাকে মুগ্ধ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। এ দেশ কবির দেশ—এ দেশ ভাবের দেশ—এ দেশ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। আমি সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া—আপনার দুর্ব্বলতার কথা ভুলিয়া কিছু অধিক ঘুরিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই জন্যই অসুস্থ হইয়াছিলাম। এ দেশ আমার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল—কিন্তু এ ক্ষীণবল দেহে তাহা সহ্য হয় নাই। যে নদীর স্রোত বদ্ধ হইয়া গিয়াছে সে কি বন্যার বেগ সহ্য করিতে পারে?"

বলিতে বলিতে তিনি কেমন অন্যমনস্ক ও উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, এখন বিশ্রাম ব্যতীত অসুখ সারিবে না; বিদায় চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। কখন যে সব শেষ হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে।"

আমি "আবার আসিব" বলিয়া বিদায় লইয়া গৃহে আসিলাম, গৃহে গৃহিণীকে সকল কথা বলিলাম। তিনি আমার বুদ্ধিতে বহুবিধ দোষারোপ করিয়া বলিলেন—যিনি আমার সন্ধানে—আমাকে উত্তরাধিকারী করিতে

বিলাত হইতে আসিয়াছেন তাঁহাকে হোটেলে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে দেওয়া অন্যায়। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন—তাঁহাকে আজই গৃহে আনিতে হইবে।

অগত্যা আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার হোটেলে উপনীত হইলাম। গৃহিণীর প্রস্তাব শুনিয়া মহিলাটির নয়নে আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর আমি তাঁহাকে লইয়া গৃহে আসিলাম।

৫

প্রভাতে আমি গাড়ীবারান্দার ছাতে আমার অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় আমার স্ত্রীর সঙ্গে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন বসন্তে আমার গৃহপ্রাঙ্গণস্থ উপবন কুসুমবাহুল্যে সুন্দর। প্রভাতের স্নিগ্ধ রবিকরে বিকশিত ফুলগুলি মৃদু পবনান্দোলনে হেলিতেছে—দুলিতেছে। দেখিয়া তিনি যেন আনন্দে অধীর হইলেন; বলিলেন, "এই কুসুমবাহুল্য—এ সৌন্দর্য্য—এই মায়াপুরীর আভাস—এই কবির দেশেরই উপযুক্ত।" তাঁহার সতৃষ্ণ নয়ন যেন সেই সৌন্দর্য্য সাগ্রহে পান করিতে লাগিল। সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা সকলের নাই—সকলে তাহার অনুশীলন করিতে জানে না।

তাহার পর তিনি আমাদের সঙ্গে গৃহ দেখিতে লাগিলেন। এ ঘর ও ঘর দেখিয়া ক্রমে আমরা বৈঠকখানায় উপনীত হইলাম। কক্ষের প্রাচীরে পিতৃদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি বিলম্বিত ছিল। কক্ষে প্রবেশ করিলেই সেখানির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল। আমার স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া একখানি সোফায় শায়িত করিলেন। তখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—তিনি সংজ্ঞাহীন।

আমি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলাম। ডাক্তার যখন আসিলেন তখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন; কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার ভয় পাইলেন; বলিলেন, "যখন তখন মৃত্যু ঘটিতে পারে।"

রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। প্রভাতেও তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সমস্ত দিন তিনি রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি আমার স্ত্রীকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"আমি অপরিচিতা—কোন্ বিদেশ হইতে আসিয়া তোমাদের কত কষ্ট দিতেছি!"

এই ভাবে দুই দিন কাটিল।

৬

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার মহা-যাত্রার আর বিলম্ব নাই। আমাকে পরপারে লইয়া যাইতে তরণী আসিয়াছে। আমি যে জন্য তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি তাহা বলি—শুন,—

"তোমার পিতা যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তুমি শিশু। তিনি কলেজে আমার ভ্রাতার সতীর্থ ছিলেন। আমার পিতার নাম তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ; তিনি আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী এভান্স। তিনি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া ক্রমে ব্যবসায় এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহার চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি আমার জননীর জন্মভূমি ইংলণ্ডে আইসেন। ইংলণ্ডে আসিবার অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমরা ইংলণ্ডেই বাস করিতে থাকি। আমার ভ্রাতা ডাক্তারী পড়িতেন। তাঁহার সহিত তোমার পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহে আসিতেন। তাঁহার আননে সর্ব্বদাই যে বিষাদগাম্ভীর্য্য দেখা যাইত তাহা সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত—যেন তিনি জীবনব্যাপী দারুণ তৃষ্ণায় তৃষিত। তাহাতে তাঁহার প্রতি স্বতঃই সহানুভূতির সঞ্চার হইত। মনে হইত, তাঁহার জীবনে কোন দুর্জ্জের রহস্য আছে। তাহাতে স্বতঃই তাঁহার দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইত।

"ক্রমে আমাদের পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিত। তিনি সময় সময় বলিতেন,—'বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই বিদেশে আমি স্বজন লাভ করিয়াছি!' বলিয়া তিনি সেনষ্টনের কবিতার আবৃত্তি করিতেন—

যে কেহ জীবন-পথে করেছে ভ্রমণ
যে দিকে কর্ম্মের স্রোত লয়ে গেছে কাযে,
ত্যজে দীর্ঘশ্বাস যবে করে সে স্মরণ,
মধুর স্বাগতভাষ পান্থশালা-মাঝে।

"তাঁহার কবিতার আবৃত্তি করিবার এমন মধুর ভঙ্গী ছিল যে, তাহা সহজেই শ্রোতাকে মুগ্ধ করিত।

"এই সময় একবার আমরা ফ্রান্সে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক দিন অপরাহ্নে আমার ভ্রাতা, তোমার পিতা ও আমি বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে উপনীত হইলাম। আমার ভ্রাতা নৌকা ভাড়া করিয়া নদীতে বেড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি সাগ্রহে সম্মতি দিলাম। আমরা কিছুদূর

যাইবার পর আকাশে মেঘসঞ্চার হইতে লাগিল। মাঝিরা নৌকা ফিরাইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনে মেঘের উপর মেঘ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। অস্তগমনোন্মুখ তপনের কিরণে সেই গাঢ় ধূসর মেঘমালার অর্দ্ধাংশ রক্তপাটল বর্ণে রঞ্জিত হইল—যেন দিগন্তে ধূমরাশি ভেদ করিয়া অগ্নির রক্তশিখা উত্থিত হইতেছে। আকাশের এই প্রলয়মূর্ত্তি দেখিয়া নাবিকগণ ভীত হইল; তাহারা বুঝিল এখনই প্রবল ঝটিকা আবদ্ধ হইবে। হইলও তাহাই। পশ্চিম দিক হইতে প্রবল বাত্যা উঠিল। নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কর্ণধার সাবধান হইয়া দাঁড় ধরিল। বাত্যার দ্বিতীয় আঘাতে নৌকা ঘুরিয়া গেল। নাবিকগণ বলিল, "সাবধান—নৌকা উল্টাইয়া যাইবে।" নৌকা টলিয়া উঠিল। আমরা তরঙ্গভরঙ্গভীষণ নদীর জলে লাফাইয়া পড়িলাম। আমি সন্তরণ জানি না। নিশ্চয় মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমি চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম। জীবনের মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে অজস্রসুখসম্ভাবনারম্য জীবন ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা কি যাতনার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। সেই বিপদকালে আমার ভ্রাতাও আত্মজীবন রক্ষার চেষ্টায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু তোমার পিতা আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া সেই সলিল-সমাধি হইতে আমার উদ্ধারচেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন। তিনি আসিয়া আমার তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গায়িত কেশপাশ ধরিয়া আমাকে কূলের দিকে লইয়া চলিলেন। আমরা যখন কূলের নিকট পৌঁছিলাম—তখন ভয়ে ও শ্রান্তিতে আমি অবসন্ন। তিনি আমাকে বহন করিয়া কূলে উঠিলেন। মৃত্যু ও জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে—সেই নিবিড় আলিঙ্গনে আমার তরুণ হৃদয়ে যে প্রগাঢ় প্রশংসার ভাব জাগিয়া উঠিল তাহার পরিণতি কিসে—গতি কোথায়?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন—

"আমরা ইংলণ্ডে ফিরিলাম। কয় মাস কাটিয়া গেল। এক দিন সন্ধ্যায় আমরা সকলে আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে সমবেত হইলাম। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তোমার পিতা ভারতের—বাঙ্গালার বাসন্তী শোভার বর্ণনা করিতেছিলেন। বসন্তের সুষমাদৃশ্য যেন আমি প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, 'কি সুন্দর দেশ!' আমার ভ্রাতা বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মিষ্টার ঘোষ আর এক বৎসর পরে আপনি দেশে ফিরিবেন ভাবিতেছেন।

দেখিতেছি, আপনার একক প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিবে না—আমার ভগিনী-টিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।' সহসা তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'আমি দেখিতেছি, আমি আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়াছি। আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয়। আমি বিবাহিত—আমার একটি পুত্রও বর্ত্তমান।' তাহার পর তিনি বলিলেন, 'আর য়ুরোপের প্রফুল্ল কুসুম ভারতে ম্লান হইয়া যাইবে। এলিজাবেথের কর-লাভের জন্য ইংলণ্ডে বহু গুণী ও বহু ধনী ব্যাকুল হইবেন।' আমি হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব যাতনা অনুভব করিলাম এবং কিছুক্ষণ পরে পার্শ্বের কক্ষে যাইয়া একখানি আরাম কেদারায় শয়ন করিলাম। আমার নিকট জগৎ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি শুনিলাম, যাইবার সময় তিনি আমার ভ্রাতাকে বলিলেন, 'মিষ্টার এভান্স, আমার পক্ষে বোধ হয় আর আপনার গৃহে না আসাই সঙ্গত।' ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' তিনি বলি-লেন, 'আপনি যাহা বলিবেন, তাহা যদি সত্য হয়, যদি আপনার ভগিনীর হৃদয়ে অনুরাগের আভাস লাগিয়া থাকে—তবে আমার পক্ষে আর এ গৃহে না আসাই ভাল।' ভ্রাতা বলিলেন, 'পাগল হইয়াছেন! প্রেম যৌবনের স্বপ্ন। লোক কি কেবল একবারই স্বপ্ন দেখে?' তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'দেখিবেন, আপনার এ মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।'

"তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আসিল। কিন্তু তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, তিনি আমাদের বন্ধুত্বে জীবনে যে সুখের স্বাদ পাইয়াছেন—তাহা পূর্ব্বে কখনও পায়েন নাই। আমি বুঝিতাম, তিনি হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতেছেন। কিন্তু সে জয়ে তাঁহার আনন্দ নাই। তাহার পর তিনি স্বদেশযাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার জীবনের ইতিহাস আমি সবই শুনিয়াছি। যে বন্ধুত্ব হৃদয়ভাব গোপন করিতে পারে না—তখন আমাদের মধ্যে সেই বন্ধুত্ব সংস্থাপিত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

"তিনি দেশে ফিরিবার পর প্রতি সপ্তাহে আমি তাঁহার পত্র পাইতাম। আমি অসীম আগ্রহে সেই পত্রের প্রতীক্ষা করিতাম। কিছু দিন পরে আমি তোমার জননীর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম; সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাইলাম, তিনি আসিতেছেন।"

তিনি চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি বিশ্রাম করুন, আগামী কল্য আর সব বলিলেন।"

তিনি বলিলে, "না। না। তাহা হইবে না। আমার ভয় হইতেছে, পাছে তোমাকে সব কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু ঘটে।"

তিনি বলিলেন—

"তিনি আসিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার মুখে স্বাভাবিক গম্ভীর বিষাদের ভাব নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি অবিবেচনার আবেগে আবার ইংলণ্ডে আসিয়াছি। আমার পত্নীর সহিত আমার সম্বন্ধের বিষয় তুমি অবগত আছ। তাঁহার মৃত্যুতে আমি আঁপনাকে মুক্ত মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি ভ্রান্ত। জীবন যেমন একবারের—সুখের হউক আর দুঃখের হউক তাহার পুনরাবৃত্তি নাই—বিবাহেরও তেমনই পুনরাবৃত্তি নাই। তুমি আমার হৃদয়ের ভাব জান। পত্নীর মৃত্যুতে আপনাকে মুক্ত মনে করিয়া পুনরায় বিবাহ করিলে আমি সমাজের নিকট হেয় না হইতে পারি—কিন্তু আমার আপনার নিকট হেয় হইব—মনুষ্যত্বের ও তোমার অপমান করিব। আমার ভাগ্যে সুখভোগ নাই। আমি কঠোরকর্ত্তব্যকারাগারে ফিরিয়া চলিলাম। তুমি কেন স্বেচ্ছায় আপনাকে সকল সুখ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে?'—আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধার—ভক্তির যে ভিত্তি সংস্থাপিত হইল তাহা কিছুতেই বিচলিত হইতে পারে না। আমি ভাবিলাম,—প্রেমও জীবনে একবার বিকশিত হয়—আর নহে।

"তাহার পর তিনি দেশে ফিরিলেন। সে আজ কত দিনের কথা! আমি প্রতি সপ্তাহে তাঁহার পত্র পাইতাম, কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। সে পত্রে আমি তাঁহার বিষয় সব জানিতে পারিতাম। ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠা, তোমার য়ুরোপগমন আমি সব জানিতাম।

"তাহার পর এক সপ্তাহে পত্র গেল না।"

তিনি আবার নীরব হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দেখিলাম, আমার স্ত্রীর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন প্রবল চেষ্টায় আপনার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া আবার বলিলেন,—

"আমার মন বলিল—বিস্মৃতি বা ভ্রমহেতু নিয়মে এ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তথাপি আমি আশা করিতে লাগিলাম।

"প্রতীক্ষার দারুণ যন্ত্রণার কণ্টকশয়নে আমি আর এক সপ্তাহকাল কাটাইলাম। পত্র আসিল না।

"বলিবার আর কি আছে? আমার ও দিন ফুরাইয়া আসিল। চিকিৎসকগণ যখন বলিলেন, আর অধিক দিন নাই; তখন আমার মনে প্রবল বাসনা জন্মিল—আমি ভারতবর্ষে মরিব।—সেই বাসনার দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনায় আমি ভারতে আসিয়াছি। আমি ভারতবর্ষে মরিতে আসিয়াছি। আমার শেষ ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করিয়াছেন। আমি যে ভারতে আসিয়াছি, আমি যে এই গৃহে—তোমার নিকট মরিতেছি ইহা আমার পরম সুখ—চরম সৌভাগ্য। আমি বিদেশ হইতে স্বদেশে—স্বজনের নিকট আসিয়াছি।"

তাঁহার মুখে রোগযাতনার চিহ্ন লুপ্ত হইল—সে মুখে স্নিগ্ধ প্রফুল্লতা বিকশিত হইল।

আমি বলিলাম, "আমার অদৃষ্ট আমার প্রতি বিমাতার মত দুষ্ট ব্যবহার করিতেছেন। আমি শৈশবে মাতৃহীন—আর এই যৌবনে আপনার মাতৃস্নেহও কি আমি সম্ভোগ করিতে পারিব না?"

তিনি আমার মস্তকে তাঁহার করতল সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন, "বৎস, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়।" তিনি তাঁহার হাতব্যাগটি আনিতে বলিলেন।

ব্যাগ হইতে একখানি দলিলের নকল লইয়া আমাকে দিয়া তিনি বলিলেন, "বৎস, জননীর দান বলিয়া ইহা গ্রহণ করিও।" সেখানি কুমারী এভান্সের উইলের নকল। সে উইলে তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার বন্ধুপুত্রকে দিয়াছেন।

৭

দুই দিন পরে বিহগবিরাবিত উষায় আমার পত্নীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া পূর্ব্বগগনে দিবালোকবিকাশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্থির—নিশ্চল হইয়া গেল;—তাঁহার শেষ শ্বাস তাঁহার জীবন-দেবতার জন্মভূমি ও মৃত্যুস্থান ভারতবর্ষের বায়ুতে মিশাইয়া গেল। যে বিদেশকে তিনি স্বদেশ মনে করিয়াছিলেন সেই বিদেশে—যে নিঃসম্পর্কীয়দিগকে তিনি একান্ত আপনার মনে করিয়াছিলেন তাহারাই দুইজন তাঁহার সমাধিশয়নে অশ্রু বর্ষণ করিল।

* * * * *

হায় প্রেম, তোমার মত অঘটন ঘটাইতে আর কে পারে?

সমালোচনা।

পতিব্রতা। *

নব্য বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারচেষ্টার ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই; কিন্তু লিখিবার সময় হয় নাই—এমন কথা বলা যায় না। সে বিবরণ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। যাঁহারা এই স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা আর জীবিত নাই। বিদ্যাসাগর মদনমোহন প্রভৃতি যে সকল কৃতী বাঙ্গালীর চেষ্টায় বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহারা মৃত। বিটন ও কুমারী কার্পেণ্টার প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয়ের আন্তরিক চেষ্টায় এই অনুষ্ঠানে প্রবল শক্তিসঞ্চার হইয়াছিল তাঁহারা মরণের মহানিদ্রায় নিদ্রিত। তখন যখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সহানুভূতিলাভচেষ্টায় বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছিল—যখন বালিকাবিদ্যালয়ের যানাঙ্গে লিখিত থাকিত—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—সে সময়ের ইতিহাস বাঙ্গালার যুগান্তরের ইতিহাস। তাহার পর এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রদত্ত বেগ শ্লথ হইতে না হইতে নবোৎসাহদৃপ্ত নবীন সম্প্রদায় এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'বামাবোধিনী' এই নব্য সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান, 'নবনারী' এই সময়ের রচনা। তখন পরলোকগত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় বিদ্যালয়লব্ধ শিক্ষার ফল স্বদেশে মহিলা-দিগের মধ্যে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে পুস্তিকারচনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে বহু পাঠকের অপরিচিত। কিন্তু শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেজবৌ'—আজিও সেই সময়ের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যদি আপনার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন, তবে এই অনুষ্ঠানে ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তাহার পর যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা প্রমুখ সভা স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। 'সখার' প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণ সেন, সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর প্রভৃতি উৎসাহী যুবকগণ এই সকল অনুষ্ঠানে বিশেষ

* শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত; ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৲ টাকা, রাজসংস্করণ ১।০ টাকা।

সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল সভার বিলোপের কারণ অনুসন্ধান-যোগ্য। ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহের অভাব ইহাদিগের বিলোপের কারণ হয় তবে তাহা একান্তই দুঃখের বিষয়। আর যদি কলোপযোগী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের অভাবেই তাহাদের বিলোপ ঘটিয়া থাকে তবে আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলে ভাল হয়। এই সকল সভা জিলায় জিলায় শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র—শক্তিকেন্দ্র ছিল।

তাহার পর 'রায়পরিবার' প্রভৃতি কতকগুলি উপন্যাস "স্ত্রীপাঠ্য" বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল উপন্যাসের সকলগুলিই যে বিশেষ-ভাবে স্ত্রীপাঠ্য এখন বোধ হয় না।

সংপ্রতি মধুসূদনের চরিতকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পতিব্রতা' নামক যে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সকল দেশের পুরাণকথায় ও প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল চিত্র ও চরিত্র চিত্রিত ও অঙ্কিত দেখা যায় সে সকল হইতে জাতীয় জীবনের আভাস ও জাতীয় আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের মহিলাসমাজে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিশেষ আদরণীয় ও বিশেষভাবে আচরণীয় ছিল। হিন্দু শাস্ত্রকার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেই রমণীর শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

(মনুসংহিতা)

হিন্দু কবি রমণীর সবই পতির জন্য এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলাহি চারুতা।"

(কুমার সম্ভব)

যে সীতা রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন ও যে সাবিত্রীর পতিপ্রেমে মৃত্যুও পরাজিত হইয়াছিল সেই সীতা ও সাবিত্রীই হিন্দু-মহিলার আদর্শ।

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারত ললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা?

আলোচ্য গ্রন্থে ভারতের পুরাণ কথায় কীর্ত্তিতকীর্ত্তি ছয় জন মহিলার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে; যথা,—সতী, সুনীতি, গান্ধারী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা।

বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু অভাবের মধ্যে স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের অভাব একটী প্রধান। হিন্দু আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদের মহিলাগণ যাহা হইতে আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারেন, এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃতই বিরল। এই অভাব, কিয়ৎপরিমাণে, 'মোচনের জন্যই আমি পতিব্রতারচনায় প্রণোদিত হইয়াছি।"

লেখক মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের চারুচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারুচিত্রেরও পরিচয় এই পুস্তকে দিয়াছেন। বসন্তাগমে কৈলাসের শোভাবর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—"অবিরাম তুষারপাতে কৈলাসের তরুলতাগণ পত্রপুষ্পহীন ও শোভাশূন্য হইয়াছিল, ঋতুরাজের ঐন্দ্রজালিকস্পর্শ তাহাদিগকে আপাদমস্তক নবকিশলয়ে সুশোভিত করিল। গিরিবর, শুভ্র তুষারবাস পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামল শৈবালবসন পরিধান করিলেন। শ্বেত, লোহিত, পাটল বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি, গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত হইয়া, তাঁহার কণ্ঠ, বক্ষঃ এবং পাদদেশ মণ্ডিত করিল। বিগলিত তুষাররাশি হইতে শত শত নির্ঝর উৎপন্ন হইয়া অবিরাম ঝর ঝর নিনাদে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইল।

* * *

ঋতুরাজের আগমনে কৈলাসের তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেই আবার নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন জীবন লাভ করিল।"

গ্রন্থের ভাষা সরস ; সরল। গ্রন্থের চিত্রসম্পদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগের সমাপ্তি ও উত্তরভাগের প্রচার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

সংগ্রহ।

সমাজ-তত্ত্ব।

নর ও নারী।

কিছু দিন পূর্ব্বে মিষ্টার গেট বিলাতের সোসাইটী অব আর্টস্ সভায় ভারতে নর ও নারীর অনুপাত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নর ও নারীর অনুপাত স্ত্রীজাতির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, অনেকে এইরূপই অনুমান করিয়া থাকেন। মিষ্টার গেট তাঁহার বক্তৃতায় এ কথার কোনও আলোচনা করেন নাই। পুরুষের জন্ম সম্বন্ধে তিনি ডার্ব্বিনের মত সমর্থনেরই প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথার আলোচনা মাত্র করিলাম।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। ঐ অঞ্চলে বালিকা অপেক্ষা অধিক বালকই জন্মিয়া থাকে সত্য, কিন্তু শারীরিক গঠনসম্পর্কিত কারণে অনেক বালক শৈশবেই পঞ্চত্ব পায়। তদ্ভিন্ন পুরুষদিগকে দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শরীরকে অধিকতর বিপন্ন করিতে হয়, সেই জন্য নারী অপেক্ষা নরগণের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। এই দুই কারণের সমবায়ে য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই নারীর সংখ্যা অধিক। পক্ষান্তরে ভারতে ও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নারী অপেক্ষা নরের সংখ্যাই অধিক। য়ুরোপে যে অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ জন্মিয়া থাকে, ভারতেও প্রায় সেই অনুপাতেই স্ত্রী ও পুরুষ জন্মে। তবে য়ুরোপে স্ত্রীজাতির জীবিত থাকিবার অবস্থা যত অনুকূল, ভারতে তত নহে।

স্ত্রী ও পুরুষ।

অতঃপর শ্রীযুত গেট মহাশয় ভারতে স্ত্রীজাতির জীবনধারণের প্রতিকূল অবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে কেহ কন্যা চাহে না। কিছুকাল পূর্ব্বেই ভারতের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু কন্যা হত্যা করিবার প্রথা ছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই এই কুপ্রথার আতিশয্য দৃষ্ট হইত। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীযুত গেটের জনৈক বন্ধুর গোচর হইয়াছিল। কোনও দেশীয় রাজার দরবারে তাঁহার উক্ত বন্ধু রাজার ভগিনীর বিবাহে ব্যয়সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উক্ত বিবাহে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত উপস্থিত হয়। সেই জন্য উক্ত বন্ধু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, ইতঃপূর্ব্বে ঐরূপ কন্যার বিবাহে কিরূপ ব্যয় হইয়াছে? উত্তরে তিনি শুনিলেন, ঐরূপ কন্যার বিবাহের কোনও নজীরই নাই। ঐ বালিকার পূর্ব্বে ঐ বংশে অন্য কোনও বালিকাকেই জীবিত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুত গেটের নিকট জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোক গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন বালকমাত্র ছিলেন সেই সময় তিনি তাঁহারই এক শিশু ভগিনীর প্রাণনাশকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক খুড়ীর সাত কন্যা জন্মে; ঐ সাতটি কন্যাকেই নিহত করা হইয়াছিল। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে আর ঐরূপ প্রথা প্রচলিত নাই; কিন্তু এখনও শিশু বালিকার জীবন রক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

অবস্থার প্রতিকূলতা।

বালিকা-বিবাহে অশুভ ফলের কথার আলোচনা করিয়া দেশীয় রাজ্যের আদম সুমারীর জনৈক অধ্যক্ষ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন;—"এই সমস্ত শৈশবপারণীতা বালিকা বিবাহের পুষ্পশয্যা হইতে অবিলম্বে চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষয়কাশ ও জরায়ুর পীড়া নির্দ্দয়ভাবে ইহাদের মধ্যে অন্তকের প্রভাব প্রকাশ করে।"

য়ুরোপ হইতে ভারতে স্ত্রীপুরুষের অনুপাতের পার্থক্যসাধনে উপযুক্ত কারণ যথেষ্ট বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, এ দেশে স্ত্রীলোকরা শুদ্ধান্তে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন না,—সেই জন্য তাঁহাদের গণনায় ভুল হয়। সেই ভ্রম এই পার্থিক্যের অন্যতম কারণ।

অন্যান্য কারণ।

শেষোক্ত কথার প্রতিকূলে শ্রীযুক্ত গেট বলিয়াছেন, অবরোধপ্রথাসম্ভূত গণনায় ভ্রান্তিই যদি স্ত্রীপুরুষের সংখ্যানুপাতের কারণ হইত, তাহা হইলে মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া আদম সুমারীতে প্রকাশ পাইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কিন্তু ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই হিন্দুদিগের তুলনায় মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতি সংখ্যায় অল্প। সুতরাং দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা প্রকাশ করিতে চাহে না, সেই জন্য স্ত্রীজাতির সংখ্যা আদম সুমারীতে অল্প বলিয়া প্রকাশ পায় এ কথা সত্য নহে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদম সুমারী যত নির্ভুল করিবার চেষ্টা হইয়াছে সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির সংখ্যার হিসাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্য অনেকে অনুমান করিয়াই লইয়াছেন যে, স্ত্রীলোকগণনায় ভ্রমপ্রমাদই হইয়া থাকে। কিন্তু এ অনুমান সত্য নহে। কারণ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীপুরুষের অনুপাত যেরূপ ছিল এবার আবার উভয় জাতির সেইরূপ অনুপাতই দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত গেট বলেন, সময় সময় স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার অনুপাতের তারতম্য হইয়া থাকে। কোন সময় স্ত্রীজাতি অধিক ও কোন সময়ে পুরুষ অধিক জন্মে। ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহা যে ঘটিয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা স্ত্রীপুরুষের সংখ্যানুপাতবিপর্য্যয়ের একটি কারণ। আর একটি কারণ স্ত্রীপুরুষ ভেদে মৃত্যুহারের তারতম্য। ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অল্পই মরিয়া থাকে। ইহার কারণ স্ত্রীজাতিরা প্রায় এক ভাবেই থাকে, পুরুষের ন্যায় তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় না। আর এক কারণ এই যে, দুর্ভিক্ষের সময় স্ত্রীলোকরা বিনাশ্রমে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে, উহারা সন্তানদিগের খাদ্যাদিও বণ্টন করিয়া দেয়, রন্ধন কার্য্য করে, আর জঙ্গল হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিয়া থাকে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীজাতির যে সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষই তাহার কারণ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। উত্তর ভারতে প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপই তাহার কারণ। ঐ দুই রোগে নারীর মৃত্যুই অধিক।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার তারতম্যের কথা শ্রীযুক্ত গেট আলোচনা করেন নাই। তবে তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ঐ অঞ্চলেই পূর্ব্বে শিশু কন্যা হত্যা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ অঞ্চলে কন্যাহত্যার প্রভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে। শিশু কন্যাদিগের জীবনরক্ষাবিষয়ে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ এখন অবহেলা করেন না, ইহাও যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও আর এক পুরুষ না যাইলে ঐ প্রভাব ক্ষুন্ন হইবে না। ঐ প্রদেশে কন্যা অপেক্ষা পুত্রই অধিক জন্মে। ডার্ব্বিন বলিয়াছেন যে, যে অঞ্চলে শিশু কন্যা হত্যা করিবার প্রথা প্রচলিত সেই অঞ্চলে লোকের স্বভাবতঃই কন্যা অল্প হইতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেই জন্য লোকের অধিক পুত্র জন্মে। ইহাতে ডার্ব্বিনের মতই সমর্থিত হইতেছে।

ডার্ব্বিনের সমর্থন।

বাঙ্গালায় কস্মিন কালেও কন্যাহত্যা রূপ মহাপাতক অনুষ্ঠিত হইত না। পূর্ব্বকালে কন্যার বিবাহের জন্য লোককে এখনকার মত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না।

আমাদের কথা। তখন কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে ঘর ও বর পাওয়া কঠিন ছিল, সেই জন্য অনেক কুলীনকুমারীকে আমরণ অনূঢ়া থাকিতে হইত, অনেককে তাঁহাদের পিতামাতা মুমূর্ষু বরকে ধরিয়া সাতপাক ঘুরাইয়া কৌলিন্যের কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া আপনাদের আভিজাত্য রক্ষা করিতেন। খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে কন্যার সংখ্যাই অধিক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের ঘরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যাই অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। বৈদ্যের ঘরে কন্যার সংখ্যা অধিক ইহা আদমসুমারীর রিপোর্টেই প্রকাশ। কায়স্থের ঘরে কন্যা ও পুত্র প্রায় সমান। ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যার সংখ্যা সামান্য অল্প ইহাই আদমসুমারীর হিসাব। কিন্তু উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে অনেক লোক এ দেশে অবস্থিতি করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগকে বাদ দিলে ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যার সংখ্যা অধিক হইবেই। যাহা হউক, ইদানীং বাঙ্গালায় পরোক্ষভাবে কন্যাহত্যা আরব্ধ হইয়াছে। এখন কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মণ কায়স্থকে অত্যন্ত অধিক হারে বরপণ দিতে হয়। কন্যার বিবাহে অনেককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। সেই জন্য অনেকে কন্যাকে তাদৃশ যত্নসহকারে লালনপালন করেন না। বাঙ্গালা যাহাতে শিশুকন্যার শ্মশানে পরিণত না হয় সে দিকে সামজিকদিগের দৃষ্টি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শিল্প।

তাজমহলের স্থপতি।

কোন প্রসিদ্ধ লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়—জগতে অধিকাংশ-স্থলেই দেখা যায়, প্রসিদ্ধ গৃহের স্থপতির নাম অবগত হওয়া যায় না। যে তাজমহল্ "মর্ম্মরে রচিত পূত প্রেমের স্বপন"—যে সমাধি রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির পরও সাহজাহানের প্রেতস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে সেই সমাধি-সৌধের স্থপতির নামও জানা যায় না।

পূর্ব্বমত। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন কোন সমালোচক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাজ কোন ভিনিসীয় স্থপতির কল্পনা। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মতও অনুমানমাত্রের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। তাজের স্থাপত্যে ভিনিসীয় স্থাপত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন নাই—ভিনিসীয় স্থাপত্যের বিশেষত্বও বর্ত্তমান নাই। তবে সমসাময়িক সৌধে তাজের স্থাপত্যের অনুরূপ নিদর্শন না পাইয়া তাঁহারা অনুমানমাত্রে নির্ভর করিয়া এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু আর একদল শিল্পসমালোচক এই মতে আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই।

মতান্তর। তাঁহারা বলেন, তাজের স্থাপত্য সর্ব্বতোভাবে প্রাচ্য—ইহা প্রাচ্য স্থপতির কল্পনা। এই মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মিষ্টার হ্যাভেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'নাইন্‌টিস্থ সেঞ্চুরী' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে

পূর্ব্বপ্রচলিত মতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কিছু দিন এ সম্বন্ধে আর উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা হয় নাই। সংপ্রতি মিষ্টার হাইরাপিয়েট 'পাইওনিয়ার' ও "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সংবাদপত্রদ্বয়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আবার আর এক মতের প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন, তাজের কল্পনা আরমেনীয়ান স্থপতির—তাজে আরমেনীয়ান স্থাপত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, তাজের আদর্শ স্যারাসিনিক বা প্রাচ্য হইলেও ইহা আরমেনীয়ান শিল্প। পারস্যের আরমেনীয়ানগণ যে মোগল সম্রাট্‌ কর্ত্তৃক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এমন নহে। ভারতে মোগল আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আরমেনীয়া হইতে আরমেনীয়ানগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সাহ আব্বাসের রাজত্বকালে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে পারস্য হইতে আরমেনীয়ানগণের ভারতে আগমন আরব্ধ হয়। আগ্রার প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে একজন আরমেনীয়ানের সমাধিপ্রস্তর বিদ্যমান—তাহা ১৬১১ খৃষ্টাব্দের। ফিলিপ বুরবঁ ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভারতে আসিয়া একজন আরমেনীয়ান রমণীকে বিবাহ করেন। তিনি সম্রাটের শুদ্ধান্তের চিকিৎসক ছিলেন। এই ঘটনা ও আকবরের বেগম মিরিয়মের কথায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে—তৎকালে ভারতে বহু আরমেনীয়ানের বসতি ছিল।

নূতন মত।

এই প্রসঙ্গে লেখক একটি অবান্তর কথার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা আলোচনার যোগ্য। তিনি বলেন, যে স্থান হইলে আগ্রা, দিল্লী ও এলহাবাদে যাইবার সুরঙ্গপথ বাহির হইয়াছে সেই স্থানে যে সমাধি বর্ত্তমান—তাহাও আরমেনীয়ান স্থপতির। আবুল ফজল ও বদৌনী রাজনৈতিক কারণে এই গুপ্ত পথের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু যাহারা জন্মভূমিতে আরাক্স নদীর সুরঙ্গপথ দেখিয়াছে তাহারাই যে এই পথের স্থপতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবান্তর কথা।

লেখক যে নূতন মতের প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী সংগ্রহের স্বল্প পরিসরে তাহার বিচার হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি যুক্তির উপর স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মতপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। তাজে তিনি কিরূপে আরমেনীয়ান শিল্পপ্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। ভারতীয় শিল্পীরা অন্য দেশের আদর্শও আত্মসাৎ করিয়া ভারতীয় স্থাপত্যের অঙ্গীভূত করিতে বিশেষ পটু। স্থাপত্যসমালোচক ফার্গুসন এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—ভারতে স্থপতি বিদ্যা আজও সজীব—সবল। সজীব ও সবল শিল্পের বিশেষত্ব এই যে, তাহা সহজেই বিদেশীয় আদর্শ হইতে আবশ্যক উপাদান আহরণ করিয়া আপনার শিল্পাদর্শের উন্নতি করিতে পারে। সুতরাং ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে বিদেশীয় আদর্শ হইতে সৌন্দর্য্যসমাহরণ অসম্ভব নহে।

তাজমহল।

বৌদ্ধ উপাখ্যান।

সিংহের দীক্ষা।
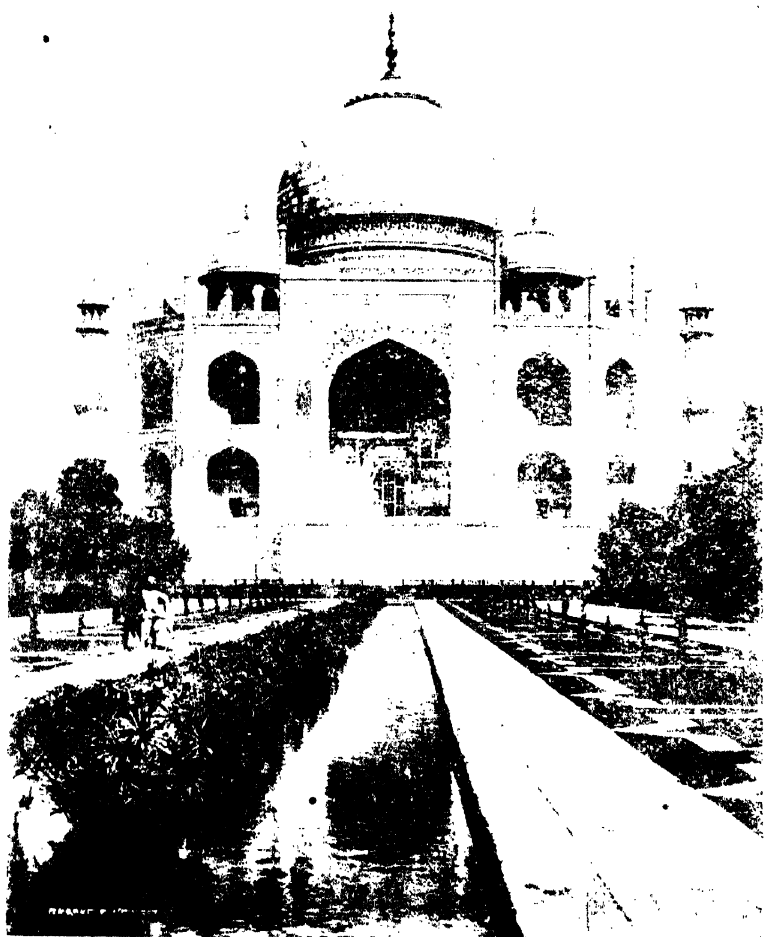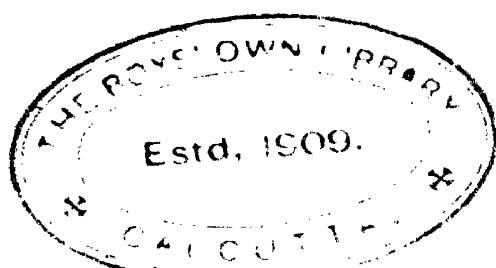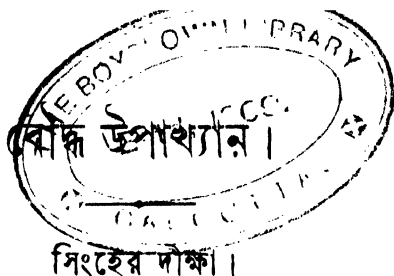
একদা রাজগৃহ নগরে কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তি সভাস্থলে সমবেত হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছিলেন। সেই সময়ে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি উক্ত সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধ, তাঁহার ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সুখ্যাতির কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তথাগত প্রকৃতই বুদ্ধ; আমি অবশ্যই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিগ্রন্থ-গুরু জ্ঞাতপুত্রের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন পুরঃসর কহিলেন, "দেব, আমি বুদ্ধদেব নামক শ্রমণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক হইয়াছি। আপনি যদ্যপি অনুমতি দান করেন তাহা হইলে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করি।"

জ্ঞাতপুত্র বলিলেন, "সিংহ, আমরা কর্ম্মের ফলাফল স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ তাহার অনুমোদন করেন না। সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার আবশ্যকতা কি? গৌতম কর্ম্মরাহিত্যই শিক্ষা-দান করেন এবং এই মন্ত্রেই সকল শিষ্যকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া সিংহ বুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনলাভের অভীপ্সা পরিত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বোক্তরূপে পুনরায় বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রশংসার কথা শুনিয়া সিংহের হৃদয়ে বুদ্ধদর্শনকামনা বলবতী হইল; কিন্তু নিগ্রন্থগুরু জ্ঞাতপুত্র আবার তাহাতে আপত্তি করিলেন; সুতরাং, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

তৃতীয় বার সিংহ গৌতমের যশ ও সুখ্যাতির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, গৌতম অবশ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন নতুবা গ্রামবাসী সকলেই তাহার ধর্ম্মের প্রশংসা করে কেন? এইবার আমি জ্ঞাতপুত্রের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই তাঁহার নিকট গমন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "দেব, আমি শুনিয়াছি, আপনি কর্ম্মের ফলাফলের উপর আস্থা স্থাপন করেন না এবং কর্ম্মরাহিত্যই প্রচার করেন ও

ও তদ্ধর্ম্মে শিষ্যগণকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। আপনি বলেন, জীব কোন প্রকার কার্য্যের ফলাফলের ভাগী নহে; কারণ, সকল বস্তুর অনিত্যতা ও নির্ব্বাণই আপনার মতে মুখ্য পদার্থ। আমি এতদ্‌সম্বন্ধে আপনার উপদেশ লাভ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আমার বাসনা পূর্ণ হইলে জীবন সার্থক বিবেচনা করিব।"

শাক্যমুনি সিংহের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "সিংহ, আমি তোমার সত্যানুসন্ধান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। প্রত্যুত আমি যে কর্ম্মের ফলাফল স্বীকার করি না এরূপ নহে। তবে যে সমুদায় কার্য্য করিলে, কিম্বা যাহার আলোচনা করিলে অথবা চিন্তা করিলে মনের হীন প্রবৃত্তিসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে, আমি সেই সকল কার্য্য অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি ও তৎসমুদায় নিবারণার্থে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া থাকি। আমি স্বার্থ ও মোহ দূরীকরণার্থ লোককে শিক্ষাদান করিয়া থাকি। যাহাতে পাপপ্রবৃত্তি মন হইতে একেবারে দূরীভূত হয় ও তদ্‌পরিবর্ত্তে সত্য, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বর্দ্ধিত হয়, তদ্‌বিষয়ে আমি লোককে উপদেশ দান করিয়া থাকি। যে সমুদায় কার্য্যের আলোচনা অথবা চিন্তা করিলে মানসিক সৎপ্রবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, আমি তৎসমুদায়ের যথেষ্ট পোষকতা করিয়া থাকি এবং সেই ধর্ম্মেই আমি শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করি। এই প্রকার উপদেশ প্রতিপালন করিলে মনের কুপ্রবৃত্তি নিচয় ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং নরনারীগণ নির্ব্বাণের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।"

সিংহ তথাগতের সুমধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিতকলেবর হইলেন এবং পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "দেব, আর একটি সন্দেহ এখনও আমার অন্তঃকরণে জাগরুক রহিয়াছে। আপনি সেইটির নিরাকরণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

ভগবান সুগত বলিলেন, "তাহাই হইবে। তোমার মনোগত ভাব নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কর, আমি তোমার সংশয় দূরীভূত করিতেছি।"

সিংহ তখন বলিতে লাগিলেন, "দেব, আমি একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। আমাকে রাজ-আজ্ঞানুসারে তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী দেশমধ্যে প্রচলিত করিতে হয় ও সময়ে সময়ে শত্রুহস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যখন করুণা ও মুদিতা আপনার ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তখন

আপনি কি দোষী ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধানের অনুমোদন করেন? স্ত্রী পুত্র পরিবার সম্পত্তি ও দেশরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কি আপনি ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন? নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ব্যক্তিগণ নিরপরাধ ব্যক্তির উপর উৎপীড়ন করিবে এবং দুর্ব্বল ও অসহায় ব্যক্তিগণ প্রাণরক্ষার্থ অত্যাচারীর বশ্যতা স্বীকার করিবে ইহা দর্শন করিয়াও অকাতরে সহ্য করা কি কোনও সবল ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য? ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধেও কি কখন প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে?"

ভগবান উত্তর করিলেন, "তথাগত বলিয়া থাকেন যে, কেবল দোষী ব্যক্তিই দণ্ডিত হইবে ও নিরপরাধ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমাদৃত হইবে। কিন্তু তথাপি সর্ব্ব জীবে দয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই উভয়বিধ নিয়ম পরস্পরবিরোধী; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ, দোষী ব্যক্তিগণ যে দণ্ড লাভ করিয়া থাকে তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত কুকার্য্যই তাহার একমাত্র মূলীভূত কারণ, নতুবা তাহারা অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় সমাদর লাভ করিতে পারে।" বুদ্ধদেব আরও বলিতে লাগিলেন, "যে যুদ্ধে কেবলমাত্র রাজ্য বা আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃবর্গের প্রাণবিনাশ করা হয়, তাহা কোনরূপেই ন্যায়সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে দেশমধ্যে শান্তিস্থাপন ও আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হওয়া ন্যায়ানুমোদিত। যে ব্যক্তি যুদ্ধবিগ্রহের কারণ, তিনিই প্রকৃত অপরাধী। তথাগত স্বার্থত্যাগই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ব্বলকে সবল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতে দেখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করা তিনি উচিত বিবেচনা করেন না। যাহারা স্বার্থের নিমিত্ত সংগ্রামে নিযুক্ত হয়, তাহারা কখনই যুদ্ধের সুফল প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু যাহারা ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তাহারাই যথার্থ জয়শ্রী লাভ করে। মানবগণ সর্ব্বদাই জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বার্থের নিমিত্ত ন্যায় ও সত্য-পথ অতিক্রম করা অবিধেয়। যদি কোন ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে গমন করে, তাহা হইলেও তাহার মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি সে ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হয়, তাহা হইলে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ করে, তাহার পার্থিব পদার্থের অসারত্ব স্মরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি যতই গৌরব অথবা জয় লাভ করুক না কেন, কালচক্রে পরমুহূর্ত্তেই তাহার দেহ ধূলিসাৎ হইতে পারে। কিন্তু যদি সে অন্তঃকরণ

হইতে হিংসানল দূরীভূত করিয়া পদদলিত শত্রুকে স্বহস্তে উত্তোলিত করিয়া তাহার সহিত পুনরায় সখ্যস্থাপন করে, তাহা হইলেই যে প্রকৃত জয়ী। কারণ, আত্মজয়ীই যথার্থ জয়ী। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত ব্যক্তি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়বিজয়ীই প্রকৃত বীর। যিনি মোহের বশীভূত নহেন, জীবন-সংগ্রামে তাঁহার কখনই পতন নাই। সিংহ, বীরবিক্রমে এই সত্য প্রচার কর, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, ইহাতে তথাগতের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।"

সিংহ আনন্দে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেব, আপনিই প্রকৃত মহৎ। আপনিই সত্য পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনিই যথার্থ বুদ্ধ ও তথাগত। আপনিই একমাত্র লোকগুরু ও শিক্ষাদাতা। আপনিই নরনারীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন। আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করিতে অনুমতি করুন।"

তথাগত কহিলেন, "সিংহ, তুমি যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা তুমি প্রথমে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ। কারণ, পূর্ব্বাপর বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া তোমার ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।"

এই কথা শুনিয়া ভগবানের প্রতি সিংহের ভক্তি এবং বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। তিনি বলিলেন, "দেব যদি অন্য কোন ব্যক্তি আমাকে অদ্য শিষ্যরূপে লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ দেশমধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিতেন যে, সেনাপতি সিংহ আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, আপনি শিষ্যত্বে যোগদান করিতে আমাকে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতেছেন। এক্ষণে আমি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আপনি দয়াপরবশ হইয়া অনতিবিলম্বে আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।"

তথাগত বলিলেন, "বহুকালাবধি তোমার গৃহে নিগ্রন্থসেবা হইয়া থাকে। অতএব ভবিষ্যতেও যখন নিগ্রন্থগণ তোমার গৃহে ভিক্ষার্থ আগমন করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে যথোচিত ভিক্ষাদান করিয়া পরিতুষ্ট করিবে।"

সিংহের অন্তঃকরণ ইহাতে আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "দেব, আমি শুনিয়াছি, শ্রমণ গৌতম না কি বলিয়া থাকেন, কেবলমাত্র আমাকেই

ভিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য; আমার শিষ্যগণই কেবল ভিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, নিগ্রর্ন্থদিগকে ভিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত আপনি আমাকে উপদেশ দান করিতেছেন!" ভগবান তাঁহার সহিত বাক্যালাপে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘভুক্ত করিলেন।

সিংহের সহিত তাঁহার সৈন্যদলের জনৈক অধিনায়ক উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি তথাগত ও সিংহের কথোপকথন আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহার অন্তঃকরণ একেবারে সংশয়শূন্য হয় নাই। সেই ব্যক্তি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, "দেব, লোকের নিকট শুনা যায় যে, গৌতম আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আপনি যদ্যপি অনুকম্পা করিয়া আপনার অভিমত জ্ঞাপন করেন, তবে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হই।"

তথাগত তখন কহিতে লাগিলেন,—"অহম—ইহার অস্তিত্ব নাই। যে ব্যক্তি বলেন আত্মাই 'অহম' এবং সেই 'অহমই' আমাদিগের চিন্তা ও কার্য্যের কর্ত্তা তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক। কিন্তু চিত্তের অস্তিত্ব আছে এবং সেই চিত্তই আত্মা।" প্রাগুক্ত সেনানায়ক তখন বুদ্ধের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইল এবং সেই সঙ্গে তাহার সংশয়ও নিরাকৃত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

বিদ্যা।

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদ)

কাঞ্চন-কেয়ুর, চারু চন্দ্রোজ্জ্বল হার,
কুসুম-সজ্জিত দিব্য চিকুরের ভার,
স্নানাবগাহন আর স্নিগ্ধ বিলেপন,
না পারে নরের শোভা করিতে বর্দ্ধন।
বিদ্যা একা কৃতিকুলে অলঙ্কৃত করে,
যতই মার্জ্জিত হয় তত কীর্ত্তি ধরে।
সকল ভূষণ হয় ব্যবহারে ক্ষীণ,
বিদ্যা ব্যবহারে কিন্তু বাড়ে দিন দিন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

Positivism বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমি প্রশ্ন করিলাম,--"কোম্‌তের Religion কিছু narrow হইল না ?"

উত্তর হইল—"না। দেখ না, ধর্ম্মমাত্রেই ঈশ্বরপ্রেমপ্রধান, আর সব গৌণ। বৌদ্ধধর্ম্মে দয়াবৃত্তি প্রধান। কোম্‌ৎও সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মাংস খাওয়া আবশ্যক, কিন্তু পশুহত্যায় নিষ্ঠুরতা পরিহার করা চাহি।

"সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দর্শনকার কাণ্ট আমাদিগের মনোবৃত্তিদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা বুদ্ধিবৃত্তি (Intellect), সুখদুঃখজ্ঞান (Feeling), চিকীর্ষা বা যত্ন (Volition)। আজ দুই শত বৎসরাধিক হইল এই বিভাগটি প্রায় সর্ব্বজনপরিগৃহীত হইয়াছে। কোম্‌ৎও ইহা পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই কয় বিভাগের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এ স্থলে করা যাইতে পা.র। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য মোটের উপর দুই প্রকার বলিলে বলা যায়--সাদৃশ্যজ্ঞান (Synthetic) ও বৈসদৃশ্যজ্ঞান (Analytic); ইহা ব্যতীত কাল ও দেশ (Time and Space) এই দুই বিষয়ের অনুভবও, বোধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির সামিল ধরিতে হইবে।—সুখদুঃখজ্ঞান নানাবিধ। একটি একটি সুখদুঃখজ্ঞানের সঙ্গে একটি একটি মনোবৃত্তি সংশ্লিষ্ট আছে, যেমন কাম (Sexual Instinct), ক্রোধ (Instinct of Destruction), লোভ অর্থাৎ সঞ্চয়বাসনা; ইহা ব্যতীত অহঙ্কার (Pride), যশোলিপ্সা (Vanity), ভক্তি (Veneration), স্নেহ বা প্রীতি (Affection), ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে কোম্‌ৎ ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—চিকীর্ষা বা যত্ন তিনি তিন ভাবে দর্শন করেন,—সাবধানতা বা অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান (Prudence), সাহস বা নির্ভীকতা (Courage), অধ্যবসায় (Perseverence) এই তিনের আবার এক সমবেত নাম Character বা চরিত্র।

"এই সমস্ত মনোবৃত্তিকে একতাপন্ন করিবার জন্যই যখন যে ধর্ম্ম উদিত হইয়াছিল সেই ধর্ম্ম চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন যে সকল ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, অধিকাংশই দেবভক্তির উপর নির্ভর করিয়া সেই বিষয় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

"প্রাথমিক অবস্থায় আমাদিগের অবিকশিত বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আমাদিগের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন কতকগুলি ব্যক্তির কল্পনা করিয়া আসিয়াছে; এবং তাহাদিগকে ভয় করিয়াই হউক কিম্বা তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই হউক, আমরা কায করিতে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি একজনে দাঁড়াইয়াছে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এবং প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্ম সেই একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র একজন কুত্রাপি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে নাই; ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানরা Angel এবং হিন্দুরা অনেক দেবদেবী বরাবর বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন; কেবল একজনকে সর্ব্বোপরিস্থ পদ দিয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর, বা পরব্রহ্ম বা নারায়ণ ইত্যাদি নানা আকারে চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া আসিয়াছেন। পরব্রহ্ম একেবারে আকাশের মত অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, একটি অপরিসীম পদার্থরূপে চিন্তিত হয়েন।

"মনোবৃত্তিসমূহের একতাপত্তি বলিতে কি বুঝিলে? যখন যে মনোবৃত্তি মনে প্রবল হয়, যদি আমরা তাহাকেই তখন প্রসর দিই, তাহা হইলে শুধু যে আমাদিগের নিজের মনের শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে, মনুষ্যসমাজ একেবারে উচ্ছিন্ন হয়। মনে কর, উপস্থিত অপত্যস্নেহবশতঃ আপনার সন্তানকে এক্ষণে লালন করিলাম, কিঞ্চিৎ পরে কোনও কারণবশতঃ তাহার উপর ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে তাহার প্রাণসংহার করিলাম। যদি সকল বৃত্তিসম্বন্ধে এই ভাবে চলা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজের যে কি ভীষণ অবস্থা দাঁড়ায় তাহা বুঝিতে বড় ক্লেশ পাইতে হয় না। এই জন্যই মনোবৃত্তিদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য। কোম্‌ৎ বলেন যে, পরিণামে পরের প্রতি স্নেহ আমাদের যে একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সেই সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে; ইহাকে দয়া বলে, করুণা বলে, উপচিকীর্ষা বলে, বিশ্বসংগ্রাহী স্নেহও বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের মনোমধ্যে এইরূপ একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি যে আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা উচিত নহে। কতকগুলি একদেশদর্শী দর্শনকার সেই সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরোপচিকীর্ষা আমাদিগের স্বার্থানুসন্ধান হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেটা যে ঠিক নহে তাহা, বোধ হয়, সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা যতই স্বার্থপর হই না,

পরের কষ্ট উপস্থিতপ্রায় দেখিলে আপনা হইতেই আমাদিগের মনোমধ্যে একটা চাঞ্চল্য—হুটফটানি—আইসে। একজন যদি রাস্তায় চলিতে চলিতে গাড়ির সম্মুখে পড়ে, আমাদের আপনা হইতেই শরীরের মধ্যে এই রকম একটা ভাব আইসে যেন সেই গাড়ির সম্মুখভাগ হইতে পার্শ্বে দাঁড়াই। একজন বাজিকর দড়ির উপর বাঁশ লইয়া যখন বাজি দেখায় তখন যদি দেখি যে, সে পড় পড় হইয়াছে, তখন আমরা আপনাদের শরীরকেই এমন ভাবে নাড়াচাড়া করি যাহাতে দুই দিকের ভার সমান হইয়া বাজিকর' সামলাইয়া যায়, যদি বাজিকর দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে আপনা হইতেই আমাদের দেহ বামদিকে হেলে। এইটি স্বভাবসিদ্ধ পরদুঃখে দুঃখানুভব। এবং ইহা এই অপূর্ণ অবস্থা হইতেই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া এক্ষণকার বিশাল বিপুল বিশ্ব-সংগ্রাহী স্নেহে পরিণত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে জন হাউয়ার্ড কয়েদি-দিগের ক্লেশনিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া কয়েদখানায় সংক্রামক রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন; ইহারই প্রভাবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসি ধর্ম্মযাজক প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; ইহারই প্রভাবে কত স্থানে কতপ্রকার পরোপচিকীর্ষাগর্ভ বহুব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান সমুদিত হইতেছে। সে সমস্ত যে কেবল লোকের নিকট বাহবা পাইবার জন্য তাহা নহে। অ্যাডাম স্মিথ নামক মনোবিজ্ঞান-বেত্তার Moral Sentiments নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে পরোপকারিতাবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধতাসম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির আলোচনা করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিবার কথা নহে। কোম্‌ৎ বলেন, এই স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিটি অতি দুর্ব্বল। স্বার্থপরতা-মিশ্রিত বৃত্তিগুলিই সমধিক প্রবল। এই নিমিত্ত উপচিকীর্ষাবৃত্তি মনুষ্যসমাজে অদ্যাপি প্রার্থনীয়-মত প্রবলতা লাভ করে নাই, এখনও নিতান্ত ক্ষীণ অবস্থাতেই রহিয়াছে; যে স্থলে স্বার্থের সহিত ইহার সংঘর্ষ হয়, সে স্থলে প্রায়ই স্বার্থ ইহাকে দাবিয়া রাখে। কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, শারীরবিধান শাস্ত্রে (Physiology) একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের যে যে ক্রিয়াশক্তি আছে, অভ্যাসদ্বারা সে সমস্তই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করা যায়। চলিত কথাতেও বলে, আহার, নিদ্রা ইত্যাদি যত বাড়াও ততই বাড়িবে। কেবল অভ্যাস হইতেই এই বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। মাংসপেশীচালনা অভ্যাস কর, উহার বলবৃদ্ধি হইবে; বুদ্ধির চালনা অভ্যাস কর, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে;

সেইরূপ উপচিকীর্ষাবৃত্তিচালনা অভ্যাস করিলে উহা অবশ্যই ক্রমশঃ বলবত্তর হইতে থাকিবে। যেমন অভ্যাস বৃত্তিবিশেষকে বলবত্তর করে, তেমনই অনভ্যাস উহাকে ক্ষীণতর করে। কোম্‌ৎ বলেন, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন মনোবৃত্তিপ্রবণতা (Tendency) মনুষ্যসমাজকে পরস্পর বিশ্লিষ্ট করে, সেইগুলিকে অনভ্যাসদ্বারা যতদূর সম্ভব ক্ষীণতর করিতে হইবে। আর যে সকল বৃত্তি সমাজকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করে, সেইগুলিকে অভ্যাসদ্বারা প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে। যশোলিপ্সা একটি সংশ্লেষক বৃত্তি। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি স্নেহ, ভক্তিও সংশ্লেষক বৃত্তি। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য সংশ্লেষক-বৃত্তিই উপচিকীর্ষা, অথচ এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, অতএব বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অভ্যাসের দ্বারা ইহার বলবৃদ্ধি করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে ইহাই সমাজের একমাত্র বন্ধনস্বরূপ হইবে এরূপ আশা করা যায়, এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল প্রাচীন ধর্ম্মই স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে এইটি বাড়াইবার দিকেই প্রবণতা দেখাইয়াছে। অবশ্য ইতিহাসে ইহাও দেখা যায় যে, ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর তামসিক অনুষ্ঠান সময়ে সময়ে ধর্ম্মের নামে সম্পাদিত হইয়াছে, যথা ক্রুশযুদ্ধ (Crusade), নাস্তিক পোড়ান, ডাইনী পোড়ান, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে কাটাকাটি, মুসলমানের জেহাদ, হিন্দুর সতীদাহ। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কবি ও শিল্পী।

কবি, শিল্পী—স্বভাবের দু'টি চিত্রকর
সৌন্দর্য্য সৃজন লাগি' দু'জনে তৎপর।
শিল্পী যবে লয়ে ব্যস্ত বাহ্য অবয়ব,
খুঁজে কবি অন্তরের অমূল্য বিভব।
যে চিত্র আলেখ্যপটে করিয়া যতন
আঁকে শিল্পী,—প্রাণহীন রমে দু'নয়ন।
হরে মন হিয়া-পটে সজীব যে ছবি,
গোপনে অঙ্কিত করে ভাবমুগ্ধ কবি।
শিল্পীর তুলিকা বর্ণ পার্থিব সকল,
অপার্থিব বর্ণতুলি কবির সম্বল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

'অচলায়তনের' আলোচনা।

('অচলায়তন' ও 'জীবনস্মৃতি'।)

প্রায় এক বৎসরের 'আর্য্যাবর্ত্ত' আমার হাতে এক সঙ্গে আসিয়াছে, এবং অল্পদিন হইল সে সকলের মধ্যে কোন কোন সংখ্যা পাঠ করিয়াছি। রবীন্দ্র-নাথের 'অচলায়তন' সম্বন্ধে অধ্যাপক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচনা, তদুত্তরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পত্র এবং 'অচলায়তন' সম্বন্ধে বৃদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য বড়ই কুতূহলের সহিত পাঠ করিলাম। উক্ত 'অচলায়তন' সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

অচলায়তনে দুইটি কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। প্রথম কথা এই যে, অর্থ না বুঝিয়া কতগুলি অবোধ্যশব্দযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না, উহাতে একান্তই বৃথা সময় নষ্ট হয়। এই কথাটা কবি এমনই পরিহাস-রসিকতার সহিত বলিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে কবির বিপক্ষগণও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। কবির স্বকপোলকল্পিত "তটতট তোটয়" প্রভৃতি অবোধ্য শ্লোকগুলি পরিহাসের পক্ষে অতি চমৎকার রচনা; কিন্তু এই পরিহাসের সহিত তাঁহার অন্য একটি মতের সহিত সম্মুখ-সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে।

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' "জীবনস্মৃতি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি 'ভূর্ভুবঃস্ব' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম, কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোন বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয়, তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই একটা ছেলে মানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যা-

লয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিষটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব এক নাড়া দিয়াছে।"

ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র—

"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটী জানিতেন—সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড় বড় কাণ ভরাট করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমা খরচ খতাইয়া বিচার করেন, তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আইসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট বাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্ব্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রী মন্ত্রের কোন তাৎপর্য্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার এক দিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধান মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মত এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময় তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"

রবীন্দ্রনাথের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার মহাপঞ্চকও বলিতে পারেন যে "অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর পৌঁছায় না।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতিতে" যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য ও তাহা প্রত্যক্ষ বস্তু; আর 'অচলায়তনে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা কাল্পনিক জিনিষ। প্রথমটি প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্বের সত্যতা প্রকাশ করিতেছে; দ্বিতীয়টি একটা বিশেষ-মত সমর্থনের জন্য কল্পনার জয়ধ্বনি করিতেছে। প্রথমটার সাক্ষী রবীন্দ্রনাথের হৃদয়, দ্বিতীয়টার পক্ষে কোনও বিশ্বাসী সাক্ষী নাই। কারণ, যাহারা অবোধ্য মন্ত্র যপ করিয়া দেখে

নাই, উহার ফলাফল জানে না তাহারা কিরূপে সাক্ষ্য দিবে ? অথচ তাহাদের দলে পড়িয়াই রবীন্দ্রনাথ আপনার হৃদয়কে সরাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন। মুক্ত গগনের কবিপক্ষী কেন যে দাঁড়ে বসিতে, এমন কি পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, কে বলিবে ?

'অচলায়তনে' দ্বিতীয় কথা, সমস্ত ঘর দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরের আলো ও হাওয়া হইতে বঞ্চিত হওয়ার চেষ্টা। এরূপ অচলায়তন বর্ত্তমান সময়ে নির্জ্জল কাল্পনিক, কোনও দিন যে কোনও দেশে ছিল, বিশেষতঃ এ দেশে যে ছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কে না জানে, হিন্দু-সমাজ কত সমাজকে, কত ধর্ম্মকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছেন এবং হজম করিয়াছেন ? কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আজ সে কথা তুলিব না। বর্ত্তমানে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাকৃলা, বিক্রমপুর, কোথায় এমন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কয়জন আছেন যাঁহারা আপনাদের বুদ্ধিমান্ সন্তানগুলিকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন না ? ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক জিলার শ্রেষ্ঠ জমীদার ; ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্র বড় বড় উকিল ও ডাক্তার, যে সকল ভাগ্য-বান্ বাঙ্গালী প্রধান বিচারালয়ের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। আবার নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে ব্রাহ্মণ পাচক, ব্রাহ্মণ কনষ্টবল, ব্রাহ্মণ দ্বারবান ও ব্রাহ্মণ পানিপাঁড়ে। এ দেশে অচলায়তন কোথায় রহিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথের দাদাঠাকুর আসিয়া তাহা ভাঙ্গিবেন ? তাঁহার কল্পনার বাড়ী ঘর 'কল্পনার দাদাঠাকুর' ভাঙ্গিতে পারেন, ইহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই। রবীন্দ্রনাথ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়াছেন। যাহারা হিন্দু সমাজের একান্ত বিদ্বেষী, যে কোনরূপে সমাজকে নিন্দিত করিতে পারিলে যাহারা তৃপ্তিলাভ করে, 'অচলায়তন' তাহাদেরই প্রীতিজনক হইয়াছে। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু তাহারা উহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। আর যাহারা গোঁড়াও নহে, হিন্দু-বিদ্বেষীও নহে, তাহারা এরূপ একটা অস্তিত্বশূন্য কল্পিত ব্যক্তির কুশপুত্তল দাহ করিতে দেখিয়া বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

পরিষদের প্রতি নিবেদন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গদেশের সাহিত্য ও ঐতিহাসিক চর্চ্চার উন্নতি-কল্পে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন; কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, এ চেষ্টা পর্য্যাপ্ত নহে। সাহিত্য পরিষদের নিকট বাঙ্গালী আরও অধিক প্রত্যাশা করিতেছে। সহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এ বিষয়ে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন ও বিশিষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। মফস্বলবাসী সাহিত্যসেবিগণ অল্পবিস্তরভাবে তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী। কেহ বা সাহিত্য পরিষদ হইতে যাহা হইতেছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করেন; কেহ বা অতৃপ্ত হইয়াও স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন বা অবসরের অভাবে নীরব রহেন। সভ্যের তালিকায় সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া পরিষৎ পরিতুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে পরিষদের আত্মশ্লাঘার কারণ অপেক্ষা বাঙ্গালীর জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধির অধিক-তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সাহিত্য পরিষদ বঙ্গদেশীয় সাহিতসেবা সমিতির মধ্যে প্রথম এবং একক বলিয়া সভ্যগণের মতান্তর-প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ হয়।

তাই বলিয়া সাহিত্য পরিষদকে আর এ ভাবে থাকিলে চলিবে না; আর কেবলমাত্র সহরের গণ্ডীতে বৈকালিক অবসরের সদ্ব্যবহারার্থ সভা-সমিতি করিয়া মুদ্রিত বিবরণী রক্ষায় গুরুতর মনোযোগ দিলে হইবে না; সাহিত্য পরিষদকে বাহিরের—মফস্বলের নানা কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া, কায করিতে হইবে। বঙ্গদেশ বলিতে কলিকাতা বুঝায় না; রাজধানীর পরিবর্ত্তনে কলিকাতা হাহাকার করিলেও বোধ হয় বঙ্গমাতার মুখশ্রী মলিন হইবে না; বঙ্গমাতা চিরদিনই পল্লীর লতাবিতানে, বনস্থলীর অন্তরালে বাস করেন। সহরে বসিয়া বঙ্গদেশের যে ইতিহাস লিখা যায়, তাহার ত্রুটি হয় নাই। বঙ্গের ইতিহাস পল্লীর ইতিহাস। যে দিন পল্লীর ইতিবৃত্তের সমষ্টি লইয়া বঙ্গের প্রত্যেক জিলা-বিভাগের স্বতন্ত্র ইতিহাস প্রণীত হইবে, সেই দিন সেই সকল ইতিহাসের সাহায্যে সহরে বসিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের বিরাট ইতিহাস প্রণয়ণের সময় আসিবে; তৎপূর্ব্বে নহে।

সুতরাং এক্ষণে ঐতিহাসিকদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রকৃতরূপে কায করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে পল্লীতে ঘুরিয়া, পল্লীতে মিশিয়া, পল্লীতে বসিয়া বঙ্গেতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে ; সহরে বসিয়া স্মারকলিপিবিশেষের ভ্রান্ত পাঠোদ্ধারের সমন্বয়জন্য অনর্থক কল্পনাবহুল নিবন্ধ রচনা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া স্বয়ং দেখিয়া পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। পঞ্জাবে বসিয়া পত্রের সাহায্যে বঙ্গেতিহাস রচনা চলিবে না ; পরের চক্ষুতে দেখিয়া, পরপ্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের স্তম্ভপূরণ পূর্ব্বক নিজের বিজ্ঞাপনী নিজেই বাহির করিয়া খ্যাতি-লাভের চেষ্টা করিলে হইবে না। আমরা নিজের দেশে প্রতিপত্তির জন্য পরের দেশের স্বল্পার্থলভ্য উপাধি লাভে সচেষ্ট, আর উপাধিবর্জ্জিত বিদেশীয় মহাত্মগণ আমাদেরই দেশে থাকিয়া শাসনদণ্ডপরিচালনারূপ গুরুতর কার্য্যে বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে আমাদের মধ্যে ঘুরিয়া যে সকল সরকারী বিবরণী বা ইতিহাস রচনা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্য গবেষণা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়! নিজের দেশের দ্বারে দ্বারে যে ইতিহাসের উপাদান পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছে তৎপ্রতি আমরা লক্ষ্য রাখি না। সাহিত্য পরিষদকে বঙ্গদেশীয় ঐতিহাসিকগণের অভিভাবক হইয়া তাঁহাদের এই সকল ভ্রান্ত প্রণালীর সংশোধন করাইতে হইবে। কখনও সমালোচনার কশাঘাতে, কখনও উৎসাহবাণীর মধুর নাদে তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী সংস্কৃত এবং হৃদয় আশ্বস্ত করিয়া—তাঁহাদিগকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইতে হইবে। নতুবা সকল আশা বিফল হইবে। দূরে বসিয়া নানা স্থানের প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথি, পুরাতন লবণাক্ত ইষ্টক, ভূগর্ভোত্থিত ভগ্ন দেববিগ্রহ ও কীর্ত্তিচিহ্নের ক্ষীণ নিদর্শনমালা সংগ্রহ করিলেই কর্ত্তব্যের অবসান হইবে না। গল্প বা কিম্বদন্তীর সূত্র ধরিয়া গ্রামের কোণে, প্রান্তরের মধ্যে বা অরণ্যের বক্ষে উপনীত হইয়া, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষসমূহ যে স্থানে স্তূপীকৃত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে তাহা পরিদর্শন, পরীক্ষা, প্রয়োজনানুসারে খনন করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এ কথাগুলি আমার কল্পনাপ্রসূত নহে ; বাস্তবিকই অনেক স্থলে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ভাবে অনেক স্তূপ রহিয়াছে, সে সকলের ভিতর খনন করিলে বা অন্য চেষ্টায় অনুসন্ধান করিলে এমন অনেক নূতন তথ্য, চিহ্ন বা প্রাচীন লিপি ও মুদ্রাদি পাওয়া যাইতে পারে, যাহা ঐতিহাসিকের পরম আদরের দ্রব্য। সারনাথের

স্তূপসান্নিধ্যে খনন দ্বারা যত প্রাচীন কীর্ত্তির আবিষ্কার হইয়াছে, যথায় তথায় সেরূপ বিশিষ্ট কীর্ত্তিচিহ্নাবলী পাওয়া না যাইতেও পারে, কিন্তু তবুও পল্লীর পার্শ্বে ইষ্টকস্তূপ, জঙ্গলে প্রাচীরের পরিচয়, পুষ্করিণী বা সমাধি খননকালে প্রাপ্ত দেবমূর্ত্তি, বঙ্গের কোণে রাজমহলের পাহাড়ের প্রস্তরসমূহ যে একেবারেই উপেক্ষিত হইবার তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

দৃষ্টান্তস্থলে দুই একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক সংবাদ দিবার জন্য এই নিবেদন উপস্থিত করিলাম। আমি কয়েক বৎসরাবধি যশোহর-খুলনার ইতিহাস সম্বন্ধীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতেছি। গৃহে বসিয়া সরকারী বিবরণীর ভাষান্তরিত ভাবসংগ্রহ করা অপেক্ষা আমি নানা স্থানে ঘুরিয়া স্বয়ং দ্রষ্টব্য পদার্থ ও কীর্ত্তিলেখা পর্য্যবেক্ষণ করা অধিকতর কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। আমাদের এই দুইটি জিলা সুন্দর মন্দির, বিরাট হর্ম্ম্য, বা অপরাপর অসাধারণ স্থাপত্য-সম্পদের অধিকারী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে না বটে, কিন্তু অপর পক্ষে যশোহর-খুলনা নানাভাবে উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে এমন কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল যে, বঙ্গের অস্তিত্বের সঙ্গে এই দুইটি স্থানের প্রতিপত্তি অপ্রতিহত রহিবে। এই সেই স্থান যথায় পাঠান-সেনানী খাঁ জাহানালির বিশাল দরবার গৃহ, অসংখ্য মসজিদ, সমাধিগৃহ ও সুবিস্তীর্ণ জলাশয়সমূহ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; এই সেই স্থান যথায় প্রতাপাদিত্যের বিজয়দুন্দুভিতে ক্ষীণ দেহে অমিত বল ও অজ্ঞানিত স্থানে মহাবীরের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল, যথায় সমগ্র দেশে ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মন্দির, স্তম্ভ বা চৈত্য অপেক্ষা স্বাধীনতা-রক্ষার উদ্দেশ্যে যোজনবিস্তৃত পরিখাবেষ্টিত দুর্গ-প্রাচীরের অধিকতর প্রয়োজন হইয়াছিল; এবং যথায় এখনও জনপদের ভিতরে বা সুন্দর-বনের জঙ্গলে সে সকল কীর্ত্তিরেখা, ভগ্নদুর্গ এবং লৌহ বা প্রস্তরময় গোলা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। এই সেই দেশ যথায় রাজা সীতারাম সৈন্যগণকে খনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া জনগণের জলকষ্ট দেশান্তরিত করিয়াছিলেন এবং যথায় এখনও অসংখ্য মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সত্যসত্যই তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্য দিতেছে। আবার এই সেই দেশ যাহা মাইকেল মধু, কিন্নর মধু ও মধুবর্ষী কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্পর্শে সুপবিত্র হইয়াছে। প্রতাপ ও সীতারামের রণক্রীড়াক্ষেত্রে কিছু না থাকিলেও গৌরবচিহ্ন মুছিয়া যায় নাই।

কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও আছে, যথেষ্ট আছে। প্রস্তরবিহীন প্রদেশে ইষ্টকলার

অট্টালিকায় লবণসমুদ্রের জলীয় বাষ্প অপরিমিত আধিপত্যের বিস্তার করিয়া ধ্বংসের আরম্ভ করিলেও এখনও কীর্ত্তিচিহ্ন যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধ-হিন্দু যুগ ও পাঠান-মোগল যুগ—সকল যুগেরই কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। কোথাও মৃত্তিকানিম্নে, কোথাও দেবপ্রতিমায়, অনেক চিহ্ন এখনও আছে, তাহা পরিদর্শিত ও পরীক্ষিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু অক্লান্ত দেহ ও একাগ্র হৃদয় লইয়া, উন্মুক্ত অর্থকোষ ও উন্নত বিজ্ঞানপ্রণালী লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। প্রতাপাদিত্য বা সীতারাম, মুকুন্দরাম বা খাঁ জাহানালির কীর্ত্তিস্থানের ত কথাই নাই, অন্য যে কতগুলি স্থানে রাশীকৃত ইষ্টকের অন্তরালে কত কি লুকায়িত রহিয়াছে, তাহারও সন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। কয়েকটি সংবাদ ও সন্ধান আমি দিতেছি। আশা করি, সাহিত্য পরিষৎ স্বীয় কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবেন। হয় ত কোন কোন স্থানে খনন করিয়া দেখা অনর্থকও হইতে পারে, কিন্তু যখন অনর্থক কিম্বা সার্থক, উভয়ই অনিশ্চিত, তখন চেষ্টা না করাই অসঙ্গত। হয় ত সকল স্থানে উপ-যুক্ত ব্যবস্থা করা পরিষদের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে। কিন্তু যখন এইরূপ সংবাদ দেওয়াই আমার সাধ্য, তখন কর্ত্তব্য বোধে আমি তাহাই করিয়া আশান্বিত রহিলাম। সাহিত্য পরিষৎ আবশ্যক বোধ করিলে, এ সকল কার্য্যে স্থানীয় জমীদার বা রাজন্যবর্গের এবং সর্ব্বোপরি সাম্রাজ্যাধিপতি ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন। আশা করি, পরিষদের প্রতিপত্তি ও কার্য্যদক্ষতা নিজবলে বা পরবলে আমার প্রার্থনা-নুযায়ী কার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

যশোহর-খুলনার মধ্যে এরূপ কীর্ত্তিস্থান অনেক আছে। আমি এ স্থলে প্রধান প্রধান কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিব। ইহার সবগুলিই এক্ষণে ইষ্টকস্তূপ বা মাটীর ঢিপির মত দেখা যাইতেছে। ইহাদের প্রত্যেক স্থানেই কিছু আছে। কোনও স্থানে দৈবাৎ ঐতিহাসিক উপকরণ—পাওয়া না যাইলেও ইষ্টকাদি মালমসলা যথেষ্ট পাওয়া যাইবে, এবং ব্যয়ের অধিকাংশও তদ্দারা সমাহিত হইতে পারে।—

(১) ভরতের দেউল।—খুলনা হইতে সাতক্ষীরা যাইবার যে রাস্তা দৌলতপুর দিয়া গিয়াছে, ঐ রাস্তায় দৌলতপুর হইতে ১৩ মাইল হাঁটিলে (অন্য যানের বন্দোবস্ত একপ্রকার অসম্ভব, তবে খুলনা হইতে

অনেক ঘুরিয়া নৌকাপথেও যাওয়া যায়) ভরতভয়না গ্রামে ভদ্রানদীর কূলে একটি প্রকাণ্ড উচ্চ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ডিম্বাকারে প্রায় সহস্র ফুট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা পূর্ব্বে আরও অধিক ছিল, কয়েকবার ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে বসিয়া যাইবার পর ইহা এখনও ১০০ একশত ফুটের অধিক উচ্চ আছে। ইহার উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অনতিদূরে পূর্ব্বে দক্ষিণে মৃতপ্রায়া ভদ্রানদী, এবং অপর কয়েক দিকে যে পরিখা ছিল তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। এই স্তূপকে সাধারণ লোকে ভরতের বা "ভরত রাজার দেউল" বলে। দেউল শব্দে মন্দির বুঝায়। এ কোন্ ভরত বা তিনি কখন্ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিছুই স্থির হয় নাই। যে ২।১টি অসম্বন্ধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাও ঐতিহাসিককে কোন তত্ত্বনিরূপণে সহায়তা করে না। যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে ভরত ব্রাহ্মণ ছিলেন। উপরোক্ত স্তূপকে ব্রাহ্মণ নৃপতি ভরতের মন্দিরমালার ভগ্নাবশেষ ধরিলে তাঁহার বসতবাটীর স্থাননির্দ্দেশ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। দেড় মাইল দূরবর্ত্তী গৌরীঘোনা গ্রামে উক্ত ভদ্রা নদীর একটি সুন্দর বাঁকের মুখে একটি বিস্তৃত বাটির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থান খনন করিলেই ইষ্টক পাওয়া যায়। এই স্থানটি রূপচাঁদ কুণ্ডুর বাড়ীর নিকটে ও তাঁহার জমার অধীন। তথায় দুইখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে। একখানি পাতর কোন সিংহাসন বা প্রকাণ্ড স্তম্ভের পাদপীট হইতে পারে; অপরখানি একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত কুম্ভীরের ভিন্নাংশ। প্রথম খানি ২'—২" × ১'—১০॥০" এবং দ্বিতীয় খানি ৫'—৬" × ১'—৫" ইঞ্চ। এগুলি রাজমহলের পাতর বলিয়া বোধ হয়। বাগেরহাটে খাঁ জাহানালির দরবার গৃহেও এইরূপ পাতরের ৬০টি স্তম্ভ আছে। দেউলের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে আর একটি বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে, উহাকে "ডালিঝাড়া" বলে। তথায়ও যথেষ্ট ইষ্টক আছে। ইহা উক্ত রাজার কোন কর্ম্মচারীর আরাম বাটীকার ভগ্নাবশেষ হওয়া অসম্ভব নহে। দেউলের সন্নিকটে ও উপরে অনেক প্রাচীন ইষ্টক আছে। বহু ইষ্টক প্রায় দেড় ফুট লম্বা, দশ ইঞ্চ প্রশস্ত এবং দেড় ইঞ্চ মাত্র পুরু হইবে। দুই এক জন লোক খনন করিয়া শুধু ইষ্টকই পাইয়াছেন। নিকটবর্ত্তী একজন ব্রাহ্মণ এই স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর ইষ্টক লইয়া স্বীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্তূপ খনন করিতে পারিলে অন্ততঃ ৩।৪টি মন্দির ও প্রাচীরাদির সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে।

(২) বেনাপোলের রাজবাড়ী। ই, বি, এস, রেলপথের বেনা-পোল ষ্টেশনের অনতিদূরে কাগজপুকুরিয়া গ্রামে এক প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ জমীদার রাজা রামচন্দ্র খাঁর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রত্যেক দিকে প্রায় সিকি মাইল। রামচন্দ্রের বাড়ী পরিখা ও পুষ্করিণী বেষ্টিত ছিল—এখন জঙ্গলাকীর্ণ ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে। রামচন্দ্র সম্বন্ধে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার লিখিয়াছেন ঃ—

"সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান।"

ইনি সুবিখ্যাত হরিদাস সাধুর (যবন হরিদাস) প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে ক্রোধরক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সে কথা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। রামচন্দ্র বলদৃপ্ত হইয়া নবাব সরকারে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া নবাবের সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে উৎসন্ন করে।

"স্ত্রী পুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন ধরিয়া।"

কিন্তু নিকটবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণ লোকের মুখে প্রচারিত তাঁহার পরিণাম-সম্বন্ধীয় প্রবাদ অন্যরূপ। শুনা যায়, নবাবের সৈন্য আসিবার প্রাক্কালে রামচন্দ্র স্ত্রী পুত্র ও ধনরত্নসহ একটি গুপ্ত দ্বার দিয়া মৃত্তিকার নিম্নস্থ এক গুপ্ত গৃহে লুক্কায়িত থাকেন। উক্ত গুপ্ত দ্বার বাহির হইতে বন্ধ ছিল এবং শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য উক্ত দ্বারের চাবি লইয়া কালু নামক তাঁহার এক পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য বাহিরে লুকাইয়া ছিল। নবাবের সৈন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও না পাইয়া ভাবিল, রামচন্দ্র ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা ফিরিয়া যাইবার সময় সহসা কালু তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। সে একটি পুষ্করিণীর উপর আলম্বিত বৃক্ষশাখায় বসিয়া ছিল। নবাব-সৈন্য দ্বারা তীরবিদ্ধ হইয়া কালু সেই পুষ্করিণীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। গুপ্ত দ্বারের চাবিও সেই পুষ্করিণীতে পতিত হয়। এইরূপে রামচন্দ্র ভূগর্ভে ধনরত্নসহ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। এখন তাঁহার বিস্তৃত বাটী স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। গুপ্ত গৃহের উপরিভাগ এখনও "পাটনাচের জমী" বলিয়া কথিত হয়; "কালুর পুকুর" এখনও আছে; বেষ্টন-পরিখার সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে, পূর্ব্বদিকে তাহাতে শীতকালেও জল থাকে,—হয়ত কেহ পক্কোদ্ধার

করিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে মন্দির ও বাস্তু গৃহমালার ধ্বংসস্তূপমাত্র রহিয়াছে। রামচন্দ্র নিকটবর্ত্তী স্থানের জলকষ্ট নিবারণজন্য প্রায় এক শত পুষ্করিণী খনন করান। তাহার অনেকগুলি প্রকাণ্ড দীঘি। এই বিস্তৃত কীর্ত্তিস্থানের এক কোণে বাবু কুঞ্জেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে বাস করিতেছেন এবং অপর এক কোণে এক মুসলমান ফকির নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এই রাজবাড়ীর স্তূপসমূহ খনন করিলে অপরিমিত ধনরত্ন পাওয়া যাইবে।

(৩) পাতালভেদী রাজার বাড়ী। যশোহর জিলার নবগঙ্গা নদীর তীরে সিঙ্গিয়াহাড়িগড়া গ্রামের সন্নিকটে নয়াবাড়ী মৌজার অন্তর্গত প্রান্তরমধ্যে একটি বিস্তৃত চতুষ্কোণ স্থানে অনেকগুলি ঢিপি আছে। স্থানটি ৮৩৩ ফুট দীর্ঘ ও ৭৬২ ফুট প্রশস্ত, উহার চতুঃপার্শ্বে ৯০ ফুট বিস্তৃত একটি পরিখা আছে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে এক্ষণে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে পরিখায় জল থাকে। এই স্থানটির মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্রায়তন পুষ্করিণী, রাজপথ, প্রাচীর ও বহুসংখ্যক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের চিহ্ন দেখা যায়। খনন করিলে অধিকাংশ স্থানেই ইষ্টক পাওয়া যায়। একটু দূরে নবগঙ্গা নদী স্থানটির তিন দিক এবং নালের গঙ্গা বা যদুখালি উহার পশ্চিম দিক ঘিরিয়া আছে। উক্ত বাড়ী হইতে ৩৫ ফুট বিস্তৃত একটি রাস্তা কয়েক শত ফুট মাত্র দূরে পূর্ব্বমুখে নবগঙ্গার কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রাস্তার মোহানার একটু দক্ষিণে রামচরণ গজী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর পার্শ্বে নবগঙ্গার কূলে একটি ইষ্টকের খিলানের মুখ দেখা যায়। প্রবাদ, উক্ত দুর্গ হইতে একটি সুড়ঙ্গ পূর্ব্বমুখী হইয়া নবগঙ্গার গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজার গৃহ ভূগর্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে "পাতালভেদী রাজা" বলে। রাজার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই। এই মাত্র শুনা যায়, তিনি একজন শৌণ্ডিতকুলোদ্ভব প্রতাপান্বিত জমীদার ছিলেন। উক্ত স্থানটি এক্ষণে নড়াইলের জমীদার বাবুদিগের জমীদারীর অন্তর্গত। এ স্থানে যাইতে হইলে খুলনা হইতে মাগুরার ষ্টীমারে সিঙ্গিয়া ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন সিঙ্গিয়া নহে।

(৪) সোণাবিবি রূপাবিবির বাড়ী। খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমা হইতে ৪ মাইল দূরে প্রাচীন ভৈরব নদের খাতের সন্নিকটে বাগমারা গ্রামের অপর পারে বিখ্যাত "ষাটগুম্বজ" নামক হর্ম্ম্যের অনতিদূরে।

জঙ্গলের মধ্যে বহুদূরবিস্তৃত ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। প্রবাদ, এই স্থানে প্রসিদ্ধ খাঁ জাহানালির সোণাবিবি ও রূপাবিবি নাম্নী দুইটি উপপত্নী বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রকৃত নাম এরূপ না হইতে পারে। সম্ভবতঃ খাঁ জাহানালির ভালবাসার তারতম্য সূচনার জন্য তাঁহাদের এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। যাহা হউক এই স্থানেই খাঁ জাহান স্বয়ং বাস করিতেন। এই স্থানে বহুসংখ্যক ইষ্টকের ঢিপি জঙ্গলমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। একটি প্রস্তরের স্তম্ভ এ স্থানে পড়িয়া আছে। স্থানটি যে চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও পরিখা-বেষ্টিত ছিল তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। নদীর দিকে যে বাড়ীর সিংহদ্বার ছিল, তাহাও বুঝা যায়। পূর্ব্বদিকে গড়ের মধ্যেই "বিষপুকুরিয়া" নামক পুষ্করিণী—এখনও জলপূর্ণ আছে; লোক বলে, সোণাবিবি সপত্নীবিদ্রোহে বিষপান করিয়া এই পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া মরিয়াছিলেন। বাগেরহাট বা পুরাতন খলিফাতাবাদে যে টাকশাল ছিল, ইহারই সন্নিকটে কেহ কেহ তাহারও স্থান নির্দ্দেশ করেন। এই স্থান খনন করিলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। খুলনা হইতে আলাইপুর পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইয়া তথা হইতে নৌকাযোগে ৩।৪ ঘণ্টায় বাগেরহাট যাওয়া যায়। *

(৫) আগরা ও আগরঝাড়ার স্তূপ—খুলনা জিলায় সুবিখ্যাত কপিলমুনি হইতে এক মাইল দূরে আগরা নামক স্থানে ২।৩টি স্তূপ আছে। উহার মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী ছিল; একটি খনন করিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ঘরগুলির প্রাচীর ও জানালা খনিত স্থানে অবতরণ করিলে দেখা গিয়াছিল। তালা হইতে তিন চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি প্রান্তরমধ্যে আগরঝাড়ার স্তূপ দেখা যায়। এই স্থানে দুইটি বাড়ী ছিল বলিয়া বোধ হয়; উহাদিগকে বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ী বলে। শুধু এই স্থানে নহে, চুকনগর নামক স্থান হইতে দক্ষিণে চাঁদখালি পর্য্যন্ত ২০।২৫ মাইলের মধ্যে অনেক স্থানে এইরূপ ঢিপি দেখা যায়। পূর্ব্বে এক সময়ে এই সকল স্থানে সমৃদ্ধ পল্লী ছিল, এবং এই সকল স্থানে সঙ্গতিপন্ন লোকের ইষ্টক-নির্ম্মিত বাসগৃহ বা মন্দির মসজিদাদি ছিল। ইহার মধ্যে বড় দুই একটি খনন করিয়া দেখা যাইতে পারে।

(৬) বিজয়তলা।—যশোহর জিলার ভৈরব নদের কূলে তপন-ভাগ (বা তপোবনভাগ) নামক গ্রামে বিজয়তলা বলিয়া একটি স্থান আছে।

* কলিকাতা হইতে ষ্টীমারেও বাগেরহাট যাওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক।

বট জাতীয় "অচিন" নামক এক প্রকার বিশাল বৃক্ষের ৮।১০টি এই বিস্তৃত স্থানটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; তন্নিম্নে স্থান বন্যবৃক্ষে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে একখানি পর্ণকুটীরে প্রত্যহ দেবীর পূজা হয় এবং বৎসরের মধ্যে বিজয়া দশমীর দিন মহাসমারোহে মহাপূজা হইয়া থাকে। বিজয়তলার জমী নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা স্বল্প উচ্চ। প্রবাদ, ইহার সন্নিকটে বিজয় সেন রাজার রাজধানী ছিল। তিনি এই স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিজয়তলায় দেখা যায়। অনেক স্থান খনন করিলে ইষ্টক পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী সেখহাটি গ্রাম বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। তথায় কামার পাড়ার উত্তরে চট্টোপাধ্যায়দিগের বাড়ীর সন্নিকটে—"হুদকণ্ঠ" নামক পুষ্করিণীতে এক সময়ে এক অষ্টভুজ গণেশমূর্ত্তি পাওয়া যায়। যাঁহারা সে গণেশমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। ঐ গণেশমূর্ত্তি নড়াইলের কোন এক জমীদার বাবু নড়াইলে লইয়া যায়েন। এক্ষণে উহা এক বৈটকখানার দেওয়ালে ইষ্টকগ্রথিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। বহু শত বৎসরপূর্ব্বে এতদঞ্চলে গণেশের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এক্ষণে আর সে পদ্ধতি নাই। উক্ত পুষ্করিণীর পশ্চিম-উত্তরাংশে আরও এক ব্যক্তি পুকরিণী কাটাইতে গিয়া একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি ও একটি গণেশমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। আপাততঃ তাহা কোথায় আছে সন্ধান পাই নাই। খুলনা জিলায় সেনহাটি গ্রামেও একটি বিজয়তলা ছিল; সে স্থানও অতি পুরাতন, এবং তথায়ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সেটিও কোন বিজয় সেনের কীর্ত্তিচিহ্ন হওয়া বিচিত্র নহে। কেহ কি বলিয়া দিতে পারেন, ইনি কোন্ বিজয় সেন?

আমি আপাততঃ এই কয়েকটি মাত্র স্থানের সংবাদ দিলাম। শুধু সাহিত্য পরিষদকেই সংবাদ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা এই জাতীয় ঐতিহাসিক ব্যাপারে কিছুমাত্র উৎসাহশীল আমি তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা পরিষদের পক্ষ হইতে এ সকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহাদের সন্ধানফল প্রকাশ করিতে পারেন; এবং যাঁহাদের সহিত পরিষদের এখনও কোন সম্বন্ধ সংস্থাপনের সুযোগ হয় নাই এই সকল স্থান পরিদর্শন করিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকেও সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

।

১

ফাল্গুনের অপরাহ্ন। পবনে সামান্য শীতের আভাস ; রবিকর উপভোগ-যোগ্য মধুর ;বৃক্ষের হিমরিক্ত শাখায় নবপল্লবের অনতিনিবিড় হরিৎশোভা—ক্বচিৎ নবোদ্গত কোরকের বিকাশ। এই অপরাহ্নে য়ুরোপপ্রত্যাগত ডাক্তার—এস, কে, ব্যানার্জ্জি ওরফে সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার বসিবার ঘরে টেব্‌লের সম্মুখে বসিয়া একখানি চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক পত্র পাঠ করিতেছিল। সুরেন্দ্রকুমার মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের একমাত্র পুত্র—অল্পবয়সে মাতৃহীন। সে যখন ডাক্তারী পড়িতেছিল তখনই তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সে পিতার যাহা কিছু ছিল লইয়া বিলাতে যাইয়া ডাক্তার হইয়া আসিয়াছে। উপার্জ্জন কেবল আরব্ধ হইতেছে এই অবস্থায় সে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে যখন পশারের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছিল তখন সহসা ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি অতর্কিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন—অপুত্রক মাতুলের মৃত্যুতে সে দরিদ্র হইতে ধনীতে পরিণত হইল। এখনও সে পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করে নাই ; তিনটি কক্ষই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কেন না—সে অকৃতদার। "লিলি" নামক জাপানী কুক্কুর ও একটি কেনারী পাখীকে সে স্নেহ ভাগ করিয়া দিয়াছিল।

সুরেন্দ্রকুমার অধ্যয়ন করিতেছে এমন সময় তাহার সোপানে পদশব্দ শ্রুত হইল। এক একবারে দুই দুই ধাপ অতিক্রম করিয়া সুরেন্দ্রকুমারের ব্যারিষ্টার বন্ধু অমিয়নাথ কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশশব্দে সুপ্ত সারমেয় জাগিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল—পিঞ্জরে গীতরত কেনারী গান বন্ধ করিল। অমিয়নাথ কুক্কুরটির একটি কর্ণ ধরিয়া টানিয়া দিল—কুক্কুর অনুচ্চ কাতর স্বরে ডাকিয়া উঠিল। অমিয়নাথ তাহাকে ছাড়িয়া কেনারীর খাঁচা দোলাইয়া দিল—খাঁচার বাটি হইতে খানিকটা জল উছলিয়া বাহিরে পড়িল। সুরেন্দ্রকুমার বন্ধুর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতেছিল, আর তাহার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

অমিয়নাথ বন্ধুর চেয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "চল, বেড়াইতে যাই।"

সুরেন্দ্রকুমার বলিল, "কেন? আজ ভ্রমণে তোমার এত উৎসাহ কেন?"

"বাহিরে চল; ইডেন গার্ডেনে বেড়াইয়া আসি; দেখিবে, বাসন্তী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

সুরেন্দ্রকুমার বলিল, "তুমি সহসা কবি হইলে কেন? এ ত বাহিরের বাসন্তী শোভা নহে; এ যে দেখিতেছি, অন্তরে বাসন্তী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! ব্যাপার কি?"

"ঠিক ধরিয়াছ—এ অন্তরে বাসন্তী সৌন্দর্য্যই বটে। আজ আমার হৃদয়ে অকাল বসন্তসমাগম।"

"কেন? এ অঘটন ঘটিল কখন্—ঘটাইল কে? কুমারী রমা মিত্রের সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল না কি?"

"আরে ছোঃ! আমি যাহাকে লাভ করিয়াছি তাহার সঙ্গে কুমারী মিত্রের তুলনা! 'পদনখে পড়ি' তা'র আছে কতগুলা।' বল দেখি সে কে?"

"আমি ত কিছু ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

"তাহা পারিবে কেন? মরা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তোমার বুদ্ধিটিও সেই দলে গিয়াছে।—কুমারী চারুশীলা দাস।—এখন বুঝিলে?"

সহসা সুরেন্দ্রকুমারের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহার হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, মরা ঘাঁটাই আমার ব্যবসা—মরা ঘাঁটাই আমার নিয়তি।—এ সম্বন্ধ কবে স্থির হইল?"

অমিয়নাথ বলিল, "আজ। আমি সংবাদ লইয়া প্রথমে তোমাকে বলিতে আসিলাম।"

"ভাল। বিবাহ কবে?"

"যত সত্বর সম্ভব। এখন চল, পথে আমার ভগিনীপতিকে সংবাদ দিয়া বেড়াইতে যাই।"

"আমার আজ যাইবার উপায় নাই। রোগী দেখিতে যাইতে হইবে।"

"তবে আর কি হইবে। আমি যাই।"—বলিয়া অমিয়নাথ একটা চুরুট ধরাইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্য তাহাকে একান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

২

বন্ধুর গৃহ হইতে রাজপথে আসিয়া অমিয়নাথ ভাবিল—ব্যাপারটা কি? আমার বিবাহের কথায় সুরেন্দ্রের মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল কেন? সে

অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে সহজেই সে ভাব গোপন করিল বটে, কিন্তু আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। আমার বোধ হয়, সে চারুকে ভালবাসে। অমিয়নাথ মনে মনে হাসিল—তবে যে সুরেন্দ্র বলে নারীর প্রতি প্রেম কোন কোন মানুষের একটা দুর্ব্বোধ্য দুর্ব্বলতা—ব্যাধি—কেবল বন্ধুত্বই মানুষের স্বাভাবিক স্বর্গীয় বৃত্তি সে সুরেন্দ্রও চারুকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই! না পারিবারই কথা। কবি কীটস বলিয়াছেন—"যাহা সুন্দর তাহা চির দিনই আনন্দের।" বড় ঠিক কথা। সে দিন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভসম্ভাবনায় অমিয়নাথ প্রফুল্ল—উদার। সে বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইল না—তাহার জন্য দুঃখিত হইল।

সে মনে মনে চারুশীলার চারু সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে করিতে চলিল।

৩

অমিয়নাথ চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রকুমার ভাবিতে লাগিল। আজ শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ কালের কত কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। শৈশব হইতে উভয়ে পরিচয়—এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, একত্র ভ্রমণ। শৈশবে এ উহাকে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা জানাইত। তাহার পর বাল্যে ও যৌবনে সে বন্ধুত্ব ম্লান হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ। সুরেন্দ্রকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

ক্রমে অন্ধকার কুন্তলে শুকতারার মাণিক পরিয়া সন্ধ্যা সমুদিতা হইল। তাহার ধূসর আঁচল ধরার উপর লুটাইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রকুমার ভাবিতে লাগিল। সে যেন চিন্তাসমুদ্রের কূল পাইতেছিল না।

রাত্রি হইল। ভৃত্য কক্ষে আলোক দিয়া গেল। সুরেন্দ্রকুমার ভাবিতে লাগিল। শেষে সে ভাবিল—অমিয়নাথ কুমারী দাসকে বিবাহ করিতে পাইবে না। সে কিসে আমা অপেক্ষা প্রার্থনীয় পাত্র? আমরা উভয়েই ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার কেবল অতিক্রম করিয়াছি। তাহার স্কন্ধে বৃহৎ পরিবারের ভার ন্যস্ত; বিশেষ তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুতে সে পরিবারের আয়ের পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আমার কেহ নাই; অথচ আমি ধনী—উপার্জ্জনের জন্য আমার আগ্রহ নাই। তবে কোন্ গুণে সে আমা অপেক্ষা প্রার্থনীয় পাত্র। কুমারী দাসের পিতা অবশ্যই এ সব কথা বুঝিবেন।

সে উঠিল—বেশপরিবর্ত্তন করিয়া দাস পরিবারের আবাসগৃহাভিমুখগামী হইল। তাহার হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প, মুখে সুস্পষ্ট বেদনাচিহ্ন।

৪

পরদিন আদালত হইতে ফিরিয়া অমিয়নাথ, চারুশীলার পিতার পত্র পাইল। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, তিনি বিশেষ প্রয়োজনে সপরিবারে দার্জ্জিলিং যাইতেছেন; সে দিন সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে অমিয়নাথের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল—সেই জন্য তিনি এই পত্র লিখিতেছেন। অমিয়নাথ তাঁহার ত্রুটি মার্জ্জনা করিলে তিনি বাধিত হইবেন।

ব্যাপারটা রহস্যকুহেলিকাচ্ছন্ন বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়নাথের আনন্দালোকসমুজ্জ্বল হৃদয়েও আশঙ্কার কুহেলিকা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সে পত্রখানা দুই বার—তিন বার পাঠ করিল; তাহার পর কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া পরামর্শ করিবার জন্য সুরেন্দ্রকুমারের গৃহে চলিল।

সে বন্ধুগৃহে উপনীত হইতেই সুরেন্দ্রকুমারের ভৃত্য বলিল—তাহার প্রভু পাহাড়ে গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন—জিজ্ঞাসায় সে সুরেন্দ্রনাথ যে ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তাহা দেখাইল। অমিয়নাথ দেখিল—দার্জ্জিলিং!

রহস্য সন্দেহে পরিণত হইয়া তাহার হৃদয়ে বিষজ্বালার সঞ্চার করিল। কেন সে দিন তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রকুমারের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল তাহা সে বুঝিল। সে সুরেন্দ্রকুমারকে জগতে পাপিষ্ঠাধম মনে করিল; আর তাহাকে এতদিন বন্ধু ভাবিয়াছিল বলিয়া আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল।

অন্য কাহাকেও না পাইয়া সে ভগিনীপতিকে সব কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "দুই চারি দিন সবুর করিলেই সব জানিতে পারিবে। অত ব্যস্ত হইও না। জানত 'সবুরে মেওয়া ফলে।'"—সবুর করা ব্যতীত গতি ছিল না। সে সবুর করিল—কিন্তু তাহার বোধ হইতে লাগিল, সে এত সবুর করিয়াছে যে, মেওয়া ফলিয়া ঝরিবার সময় হইয়াছে।

শেষে এক পক্ষ পরে সে সুরেন্দ্রকুমারের এক পত্র পাইল। সুরেন্দ্রকুমার লিখিয়াছে—"আমি চারুশীলাকে বিবাহ করিয়াছি। কেন করিয়াছি তাহা বুঝাইতে পারিব না। তুমি আমাকে নরাধম মনে করিতেছ, আমি তাহা জানি। যদি পার, দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। আমি আর তোমার কাছে দেখা দিব না, চারুকে লইয়া দার্জ্জিলিং এই থাকিব। আমি তোমাকে যে সুখে বঞ্চিত করিলাম, ভগবান তোমাকে তদপেক্ষা অধিক সুখে সুখী করুন্। সেই অধিক সুখই তোমার প্রাপ্য।"

অমিয়নাথ পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল—পদদলিত করিল। তাহার মনে হইল, সুরেন্দ্রকুমারকে সম্মুখে পাইলে সে তাহাকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিত।

৫

দশ বৎসর পরে এক দিন অপরাহ্নে একটি উদ্যানবেষ্টিত রম্য গৃহে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অমিয়নাথের মোটর গাড়ী প্রবেশ করিল। গাড়ী বারান্দার মধ্যে স্থির হইতে না হইতে সুবেশে সজ্জিত দুইটি বালক ও একটি বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। বারান্দার মধ্যে নানা পাত্রে রক্ষিত পাদপে, লতায় ও পত্র-গাছায় বিকশিত বহুবিধ কুসুমের মধ্যে তাহাদিগকে সুন্দরতম কুসুম বোধ হইতে লাগিল। অমিয়নাথ অবতরণ করিয়া পুত্রকন্যাকে আদর করিল—তাহার পর কক্ষে প্রবেশ করিল। বালকবালিকারা সঙ্গে গেল।

সুরেন্দ্রকুমার চারুশীলাকে বিবাহ করিলে অমিয়নাথ হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছিল—তাহার প্রথম দারুণ আঘাত দূর হইলেই সে স্থির করিয়াছিল, সে অতীতের সব ভুলিবে—সংসারে সংগ্রাম করিয়া সুখ ও সাফল্য লাভ করিবেই। সে রমাকে বিবাহ করিয়াছে। ব্যবসায়ে সে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। পত্নীর প্রেম, পুত্রকন্যার হাসি, সাফল্যের গৌরব, সঞ্চয়ের সুখ—তাহার জীবন মধুময় করিয়াছে।

৬

সেই দিন সন্ধ্যার পর আহারান্তে অমিয়নাথ গাড়ীবারান্দার ছাতে বসিয়া ছিল। বর্ষার আকাশ—মেঘ আছে—বর্ষণ নাই—বড় গুমট। কয়টা টবে যূথিকার শ্বেত কুসুমে হরিৎ পল্লব যেন ঢাকিয়া গিয়াছে। পবনে মৃদু মধুর সৌরভ। অমিয়নাথ চুরুট টানিতে টানিতে কি ভাবিতেছিল। এমন সময় রমা আসিল। রমা স্বামীকে লক্ষ্য করিল,,জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ ?

অমিয়নাথ চুরুটটা টেবলে রক্ষিত আধারে রাখিয়া বলিল, "আজ একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে!"

"কি ?"

"আমি আদালতের ফেরত দিদির বাড়ী গিয়াছিলাম, জান। তথা হইতে ফিরিবার সময় পথে—সুরেন্দ্রকুমারকে দেখিতে পাইলাম।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করিলে না ?"

"না। এই দশ বৎসর পরে তাহাকে দেখিয়া মন বিরক্তিতে চঞ্চল হইয়া

উঠিল। আমি কি করিব স্থির করিতে না করিতে মোটর দূরে আসিয়া পড়িল।"

রমা হাসিয়া বলিল, "আজও চাঞ্চল্য? তুমি তবে আজও কুমারী দাসকে ভুলিতে পার নাই!"

অমিয়নাথ বলিল, "না ভুলিলে আজ এত সুখ পাইতাম না। রমা, তুমি আমার জীবনে দেবতার আশীর্ব্বাদ। তোমার ভাগ্যে আমি আজ সমাজে সমাদৃত ধনী—ভাগ্যবান।"

অমিয়নাথ সাদরে পত্নীর কোমল কর আপনার দুই করে ধারণ করিল।

তাহার পর অমিয়নাথ বলিল, "কিন্তু কি ভীষণ দৃশ্যই দেখিলাম!"

রমার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল "কি?"

"সুরেন্দ্রনাথের বেশ জীর্ণ—দেহ শীর্ণ, সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।"

রমা আবেগোদ্বেলিত ভাবে, বলিল, "কেন তাহার সংবাদ লইলে না?"

অমিয়নাথ বলিল, "বড় ভুল করিয়াছি।"

রমা কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ পাইবার কি কোন উপায় নাই?"

অমিয়নাথ বলিল,—"এই জনারণ্যে কিরূপে তাহার সংবাদ পাইব?"

৭

দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশদিন মধ্যাহ্নের পর হইতেই অবিশ্রাম বর্ষণ আরব্ধ হইল। পয়ঃপ্রণালী জলনিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বিস্তৃত নহে; রাস্তায় জল দাঁড়াইল। অমিয়নাথের গৃহপ্রাঙ্গণে লতিকাবিতানে নবীন বল্লরী বর্ষণবেগে যেন কাতর হইয়া মঞ্চের উপর অবশ অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

রাত্রিতে আহারের পর বসিবার ঘরে আসিয়া অমিয়নাথ বলিল, "কি গরম!"

রমা বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া দিল।

অমিয়নাথ বলিল, "বোধ হয় বৃষ্টির জন্য দ্বার জানালা বন্ধ থাকায় ঘরে এত গরম। দেখ দেখি, বাহিরের দিকে কোন দ্বার কি জানালা খুলা যায় কি না?"

একটা জানালা খুলিয়া রমা শুনিল, দ্বারবান কাহার সহিত বচসা করিতেছে। সে দ্বারবানকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি।" দ্বারবান উত্তর দিল একজন কুলী একখানা পত্র লইয়া আসিয়াছে।

রমা বলিল, "পত্র কোথায়?"

দ্বারবান বলিল, "সে হুজুর ব্যতীত আর কাহাকেও পত্র দিবে না।"

"তাহাকে লইয়া আইস।"

"সে যে এক হাঁটু কাদা লইয়া আসিয়াছে তাহাতে মেজের মাদুর—সিঁড়ির গালিচা নষ্ট হইবে।"

অমিয়নাথ বিস্মিত ভাবে রমার মুখে চাহিল। রমা দ্বারবানকে বলিল, "তাহাকে লইয়া আইস।"

অল্পক্ষণ পরে দ্বারবান একজন কুলীকে লইয়া আসিল। তাহার নিকট হইতে একখানি সিক্ত পত্র লইয়া অমিয়নাথ খাম খুলিল; পড়িল—"আমি মরিতেছি। আমার আপনার লিখিবার সাধ্য নাই—তাই আর একজনকে দিয়া এই পত্র লিখাইলাম। তোমাকে বলিবার অনেক কথা ছিল। কিন্তু তুমি যে আমাকে দেখিতে আসিবে—এ আশা করিতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করিও।"

পত্র সুরেন্দ্রকুমারের!

অমিয়নাথ পড়িয়া পত্রখানা রমাকে দিল। রমা পড়িয়া বলিল, "এখনই যাইতে হইবে।"

বিলাসে ও আরামে অভ্যস্ত অমিয়নাথ বলিল, "আজ বড় দুর্যোগ।"

রমা বলিল, "হউক দুর্যোগ। যাইতেই হইবে।"—সে পত্রবাহককে নিম্নতলে অপেক্ষা করিতে ও দ্বারবানকে হাওয়া গাড়ী আনাইতে বলিল; তাহার পর স্বামীকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া স্বয়ং চলিয়া গেল ও অত্যল্পকালমধ্যে স্বয়ং সজ্জিতা হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া অমিয়নাথ বলিল, "তুমিও যাইবে নাকি?"

"ডাক্তার ব্যানার্জ্জির সহিত আমারও পরিচয় ছিল। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

৮

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মোটর একটা বস্তির সরু রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। মোটর হইতে অবতরণ করিয়া অমিয়নাথ ও রমা সেই সঙ্কীর্ণ পথে কুলীর অনুসরণ করিল। পথ সঙ্কীর্ণ—অন্ধকার—আবর্জ্জনাময়—দুর্গন্ধ। এমন পথে তাহারা পূর্ব্বে কখনও ভ্রমণ করে নাই। অমিয়নাথ ভাবিল অপরিচিত ব্যক্তির কথায় অন্ধকার রাত্রিতে এ স্থানে আসিয়া সুবুদ্ধির কার্য করে নাই—বিশেষ রমা সঙ্গে।

একটি ক্ষুদ্র দ্বারপথে তাহারা একটি প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। প্রাঙ্গণে জল দাঁড়াইয়াছে। সেই "জল ভাঙ্গিয়া" তাহারা একটি জীর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বহিয়া মাটকোটার দ্বিতলে একটি কক্ষে পৌছিল। সেই ঘরের এক পার্শ্বে একটি মলিন শয্যায় একজন মরণাহত রোগী শায়িত। ঘরে একটি কেরাসিন ডিবা অতি সামান্য আলোক ও প্রচুর ধূম উদ্গার করিতেছিল। ডিবার মুখে পলিতা পুড়িয়া অঙ্গারের কোরকের মত দেখাইতেছিল। কুলী টোকা দিয়া সেটি ভাঙ্গিয়া দিলে আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুরেন্দ্রকুমার দেখিল, সম্মুখে অমিয়নাথ ও রমা। সে বলিল—"কে অমিয়নাথ—মিস মিত্র!"

অমিয়নাথ বলিল, "হাঁ, আমার পত্নী রমা।"

সুরেন্দ্রকুমার বলিল,—"আমি তাহা শুনিয়াছি। শুনিয়া যে কত সুখী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করিবে কি?"

"তুমি এখন ক্ষমা বা ক্রোধ সকলেরই অতীত লোকের যাত্রী। তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি।"

সুরেন্দ্রকুমার বলিল,—"মৃত্যুর পূর্ব্বে যে তোমাদের দেখা পাইলাম—এ আমার পরম সৌভাগ্য। এই দীর্ঘ দশ বর্ষ কাল যে কথা ব্যক্ত করি নাই ও করিতে পারি নাই আজ তাহা ব্যক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। যাহার বন্ধুত্বে আমি জীবনে সুখ ও শান্তি পাইয়াছিলাম তাহার বিরক্তিভাজন হইয়া আমি বিষম বেদনা অনুভব করিয়াছি; আজ আশা হইতেছে, মৃত্যুর কূলে আবার তাহার বন্ধুত্ব ফিরিয়া পাইব।"

সে বলিল, "অমিয়নাথ, মনে পড়ে—দশ বৎসর পূর্ব্বে যে দিন অপরাহ্নে তুমি কুমারী চারুশীলা দাসের সহিত তোমার বিবাহ স্থির হইয়াছে আমাকে এই শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছিলে?" তাহার কোটরগত নয়নের দৃষ্টি অমিয়নাথের মুখে সংস্থাপিত হইল।

অমিয়নাথ বলিল, "হঁা।"

সুরেন্দ্রকুমার বলিল, "আমি তোমার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তোমরা জানিতে না—কিন্তু আমি জানিতাম—চারুশীলার দেহে কুষ্ঠরোগ আপনার অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। আমি চিকিৎসা করিতে যাইয়া ইহা জানিতে পারি; আরও জানিতে পারি, গলিত-কুষ্ঠে তাহার জননীর মৃত্যু হয়। রেঙ্গুনে সে কথা সকলে জানিত। তাই তথায় কন্যার বিবাহ

দিতে না পারিয়া মিষ্টার দাস কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; কন্যাকে সভা সমিতি সর্ব্বত্র লইয়া যাইতেন; উদ্দেশ্য—যত সত্বর সম্ভব তাহার বিবাহ দেওয়া। যে কথা চিকিৎসকরূপে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার ছিল না। আমি সে কথা ব্যক্ত করিলেও অন্য প্রমাণের অভাবে তুমি বিশ্বাস করিতে কি না সন্দেহ। অথচ তাহাকে বিবাহ করিলে তোমার জীবন ব্যর্থ—বেদনাময় হইবে। এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য? আমি অনেক ভাবিলাম। ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।"

অমিয়নাথ ও রমা বিস্ময়পূর্ণ নয়নে সুরেন্দ্রকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রকুমার যেন অবসন্ন বোধ করিতেছিল। কিন্তু উৎসাহে সে অবসন্নতা দূর করিয়া সে বলিতে লাগিল,—"আমি ভাবিয়া দেখিলাম—তোমার উপর বৃহৎ ও ব্যয়বহুল সংসারের ভার রহিয়াছে—আমার কেহ নাই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম—যখন কোনরূপে কন্যার বিবাহ দেওয়াই মিষ্টার দাসের উদ্দেশ্য তখন তিনি আমাকেও কন্যাদান করিতে পারেন। বিশেষ সম্পদে তোমার অপেক্ষা আমি অধিক ভাগ্যবান। আমার সঙ্কল্প স্থির হইল। মিষ্টার দাস আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাহার পর—তাহার পর এই দশ বৎসরে স্বাস্থ্য, সুখ, অর্থ সব শেষ করিয়াছি। চারুশীলার সকল যন্ত্রনার অবসান হইয়াছে—আমারও সব যন্ত্রণা শেষ হইতেছে। অমিয়নাথ, আজ কি মৃত্যুর কূলে তোমার বন্ধুত্ব ফিরিয়া পাইব?"

উত্তেজনায় ও শ্রমে অবসন্ন হইয়া সুরেন্দ্রকুমার চক্ষু মুদিত করিল।

অমিয়নাথ তাহার মলিন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার বক্ষে মুখ রাখিয়া বিহ্বল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বন্ধু! বন্ধু! তুমি আমাকে সুখী করিবার জন্য স্বেচ্ছায় গরল পান করিয়াছ; আর আমি—আমি তোমাকে কি ভাবিয়াছি!"

৯

সুরেন্দ্রকুমারের আত্মত্যাগের কথা শুনিতে শুনিতে রমা কাঁদিতেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনার অতর্কিত সংঘটনে রমণী স্বভাবতঃই পুরুষ অপেক্ষা সহজে স্থির হইয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে পারে। রমা কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান পথপ্রদর্শককে বলিল—"গৃহস্বামীকে ডাকিয়া আন।"

গৃহস্বামী কক্ষে অমিয়নাথ ও রমার মত বেশধারী আগন্তুক দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইল।

রমা তাহাকে বলিল, "যত ব্যয় হয় দিব—এখনই একজন ডাক্তার ডাকিয়া আন।"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কাটিল। রমা অস্থির হইতে লাগিল। শেষে ডাক্তার আসিলেন। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু ইহাকে ত কোন হাঁসপাতালে লইবে না!"

রমা বলিল, "আপনি ইহাঁকে গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করুন। যিনি আমার স্বামীর সুখের জন্য আপনার জীবন বিষজ্বালাময় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, যাঁহার বন্ধুত্ব আমার প্রেমকে পরাজিত করিয়াছে তাঁহার শেষ আশ্রয় হাঁসপাতালে নহে—আমার গৃহে।"

আলোক।

(১)

তপন দিনের আলো!
নিখিল দৃশ্য কান্ত কিরণে
ফুটে উঠে চোখে ভাল!

(২)

জড় দেহে আলো প্রাণ!
ধরার ধূলায় গড়া এই দেহ
করিয়াছে শোভমান্!

(৩)

পরাণের আলো প্রেম!
বহিরন্তর সব চরাচর
প্রেমালোকে হয় হেম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাদ-প্রসঙ্গ।

আমরা অনেক সময় কথোপকথনের মধ্যেই প্রয়োজন অনুসারে প্রবাদ-বচনের উল্লেখ করিয়া থাকি। প্রবাদগুলিতে উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু প্রবাদের ব্যবহারক তাহার ইতিহাস সকল সময়ে অবগত থাকেন না। কোন্ প্রবাদ কি প্রকারে, কোন্ ঘটনা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তাঁহার জানা থাকে না। অনেক দিনের কথা পাদরী মিষ্টার লঙ্গ (Long) প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহার পর দ্বারকানাথ বসু 'প্রবাদমালা' প্রকাশ করেন। অতঃপর 'ভারতী' নামক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারপ্রমুখ লেখকগণ বাঙ্গালা প্রবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন প্রবাদ সম্বন্ধে আর কাহারও বিবরণ কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।* আমার মনে হয়, প্রবাদগুলি যেমন প্রয়োজনীয় তাহাদিগের বিবরণও সেইরূপ। বিষয়ের আবশ্যকতা ও গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

(১) "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"। কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে বৈষ্ণবচরণ সেঠ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লোক ছিলেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বড়বাজারে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার সময়ে যে সমস্ত লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষ্ণব বাবু একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তেলিঙ্গানার রাজকুমার রামরাজা কলিকাতা হইতে তাঁহার দেবারাধনার জন্য গঙ্গাজল লইয়া যাইতেন। কিন্তু সেই গঙ্গাজল বৈষ্ণবচরণের মোহরাঙ্কিত না হইলে তিনি ব্যবহার করিতেন না। একদা বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেন নামক তাঁহার অংশীদারের নামে প্রচুর রাঙ্‌তা ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে দেখা গেল, সেই রাঙ্‌তার অধিকাংশই রৌপ্যমিশ্রিত। বৈষ্ণবচরণ এই রাঙ্‌তার কারবারে যাহা লাভ হইল তাহার একপয়সাও গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, যখন জিনিষ গৌরী সেনের নামে ক্রীত হইয়াছে তখন তাহার লাভের অংশ অবশ্যই গৌরী সেনের প্রাপ্য হইবে। গৌরী

* 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়ও প্রবাদ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল।—সম্পাদক

সেন অনেক জিদাজিদি করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। সামান্য ব্যবসাদার গৌরী সেন "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইলেন। অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া গৌরী সেনের কারবারের উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে লাগিলেন। এই গৌরী সেন তাঁহার অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন। তাঁহার ঝোঁক ছিল, যদি কেহ দেনার দায়ে জেলে যাইত, তিনি অর্থ দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেন ; যদি কোন দরিদ্র সদুদ্দেশ্যের জন্য কাহারও সহিত কলহ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইত তিনি তাঁহাকে অর্থ দিয়া মুক্ত করিতেন।

এইরূপ নানা উপায়ে অর্থ বিতরণ করায় লোক অনেক সময়ে অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া একটা কায করিয়া বসিত, মনে মনে আশা থাকিত, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। কাযেও তাহাই ঘটিত। ইহাই এই প্রবাদের উৎপত্তির হেতু। ((Calcutta in the Olden Times and its Localities)

(২) "বিস্‌মল্লায় গলদ্‌", হিন্দুরা যেমন "শ্রীগণেশায় নমঃ" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, মুসলমানরা তেমনই কোন কায করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই "বিস্‌মল্লায় রহমা নীররহীম্‌" বলিয়া থাকে। ইহার অর্থ "দয়াময় কৃপাবান আল্লার (পিতার) নামে"। বিষমল্লা—এই কথাটিতে তিনটি শব্দ আছে। বে—মধ্যে,—ইসম্‌—নাম, আল্লা ঈশ্বর (পিতা।)

কাযেই বিস্‌মল্লা মানে হইতেছে ঈশ্বরের নামে। এইবার প্রবাদটির উৎপত্তির কথা বলিব। একজন ফকির নিত্যই প্রাতে ভিক্ষায় বাহির হইত। অপরাহ্ণে কুটীরে ফিরিত। তাহার সাত আটজন চেলা ছিল। তাহাদিগকে খাওয়াইয়া সে স্বয়ং আহারে বসিত। এক দিন তাহার একজন চেলা তাহাকে বলিল "আপনি এত কষ্ট করিয়া ভিক্ষা করেন কেন? আমাদিগের বাদ্‌সা দয়ালু, ধর্ম্মভীরু, ভগবৎ-বিশ্বাসী পুরুষ। আপনি যদি এক কায করেন তাহা হইলে আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায় এবং আমরা ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাই।" ফকির সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "বৎস! কি উপায় আমায় শীঘ্র বলিয়া দাও। তুমি বড়ই বুদ্ধিমান।" চেলা বুদ্ধির কবাট খুলিয়া দিল। সকলে স্থির করিল, ফকির নিবিড় অরণ্যে যাইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ত্বকে ছুরিকার দ্বারা অঙ্কিত করিয়া আসিবে যে, অমুক স্থানে অমুক ফকির আছে ; সেই ফকিরকে বাদ্‌সা যদি দুই লক্ষ আসরফি দেন তাহা হইলে বাদসার মঙ্গল

নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ফকির এইরূপ লিখিয়া আসিয়া কিছুদিন গৃহে বসিয়া রহিল। চেলারা' নিত্য ভিক্ষায় বাহির হইতে লাগিল। প্রত্যহ এক একটি চেলা বাদ্‌সার প্রাসাদে দর্শন দিত। বাদ্‌সাও তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কিছু ভিক্ষাও দিতেন। একদিন এক্‌জন চেলা আসিয়া বাদ্‌সাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "খোদাবন্দ! গত রাত্রিতে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনার রাজ্যের আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে হইতেছে না, স্বপ্নে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাদ্‌সার এইরূপ অভ্যুদয় কিরূপে হইল। কিন্তু সে বলিল, বাদ্‌সা অমুক বনস্থিত একটি বৃক্ষে অঙ্কিত ভগবানের আদেশ পাঠ করিয়া এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।" এই কথা বলিয়া চেলাটি চলিয়া গেল। বাদ্‌সা সেই অরণ্যস্থিত বৃক্ষ অন্বেষণ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। বহু অন্বেষণে ভৃত্যগণ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাস্তবিকই আল্লার আদেশ একটি বৃক্ষে লিখিত আছে; মর্ম্মার্থ এই যে—বাদ্‌সা অমুক ফকিরকে দুই লক্ষ আসরফি দিবেন। বাদ্‌সা কোষ হইতে দুই লক্ষ আসরফি দিতে হুকুম দিতেছেন এমন সময় উজীর বাধা দিয়া বলিলেন যে, বাদসা ও তিনি স্বয়ং লেখা না দেখিয়া অর্থ দিবেন না।

বাদসা ও উজীর অরণ্যে গমন করিলেন ও বৃক্ষত্বকে লিখিত অংশ পাঠ করিলেন। উজীর বলিলেন "গলতসৃৎ বিস্‌মল্লা" অর্থাৎ বিস্‌মল্লায় গলদ্। বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" উজীর উত্তর করিলেন, "মানুষ কিছু লিখিলে প্রথমই বিস্‌মল্লা প্রভৃতি লিখিয়া থাকে; কিন্তু আল্লা যদি লিখিবেন তাহা হইলে তিনি আল্লা কেন লিখিবেন?"

বাদ্‌সার আদেশে ফকিরের প্রতি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হইল। উৎ-পত্তিরিয়মস্ত প্রবাদস্ত।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

রামায়ণ ও মহাভারত।

(৪)

রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ এ কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মহাভারত রচিত হইবার বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ রচিত হইবার কত বৎসর পরে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে রামের সময় হইতে শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, মহাভারত রচনার আনুমানিক দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। আদিশূরের সময় যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এ প্রদেশে আনীত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের হইতে তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ ষড়বিংশতিতম হইতে অষ্টবিংশতিতম পুরুষে উপনীত হইয়াছেন। ৯৯৯ সংবতে বা ৮৪২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে এ প্রদেশে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। সে আজ প্রায় পৌনে এগারশত বৎসরের কথা। ২৭ পুরুষ অতীত হইতে যদি প্রায় এগার শত বর্ষ অতীত হয়, তাহা হইলে চল্লিশ পুরুষ অতীত হইতে আনুমানিক দেড় হাজার বৎসর অতীত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বিশেষতঃ পূর্ব্বকালের লোক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হইতেন, তাহা সর্ব্ব শ্রেণীর বংশ-তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। শ্রীহর্ষ হইতে বর্ত্তমান লেখকের প্রায় ত্রিশ পুরুষ মাত্র হইয়াছে।

রামায়ণের রচনার সময় হইতে মহাভারত রচনার সময় পর্য্যন্ত সামাজিক রীতি, নীতি ও ব্যবস্থার কোনও বিপর্য্যয় হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রমী জাতি অত্যন্ত রক্ষণশীল। সপ্ত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে বৈদিক মন্ত্রে দ্বিজাতির সংস্কারাদি সাধিত হইত, এখনও সেই বৈদিক মন্ত্রে তাঁহাদের সংস্কারাদি সাধিত হইয়া থাকে। মহর্ষি ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি যে সবিতৃমন্ত্র জপ, ও যে বৈদিক মন্ত্রে আচমন করিতেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সবিতৃমন্ত্র জপ ও সেই বৈদিক মন্ত্রে আচমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিবাহকালে যে মন্ত্র পাঠ

করিয়া সপ্তপদী গমন করিয়াছিলেন, হোমকুণ্ডে লাজাহুতি দিয়াছিলেন, এখনও দ্বিজাতিগণ সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া সপ্তপদী গমন ও হোমকুণ্ডে লাজাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। এত যুগযুগান্তর ধরিয়া কোনও জাতি আপনাদের জাতীয় আচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। হিন্দুর এই বিশেষত্ব প্রতীচ্য জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। এই বিশেষত্বই হিন্দু জাতিকে প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর নিকট দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা ভারতের ইতিহাস আলাচনায় অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ফলে অন্য দেশে যে পরিবর্ত্তন দুই শত বর্ষে সংঘটিত হয়, ভারতে সেই পরিবর্ত্তন দুই সহস্র বর্ষে সংঘটিত হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং, রামায়ণের সময় হইতে মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে যদি কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

কিন্তু পরিবর্ত্তনসাধনই কালের ধর্ম্ম। কাল কোথাও বা দ্রুত গতিতে কোথাও বা অতি মন্থর গতিতে পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়া থাকে। পাঁচ ছয় হাজার বৎসরেও হিন্দুজাতির যে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, এ কথা নিতান্ত বাতুল ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না। হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে, প্রথমে তাহাই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতে পাই,—হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি রমণীরা বৈদিক 'ব্রহ্মবিদ্যা' লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু পরে স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক বেদালোচনা রহিত করা হইয়াছিল। "স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই নিষেধাত্মক বাক্য কোন্ সময়ে প্রচারিত হয়, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। যাহা হউক অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীজাতি ধর্ম্মবিষয়ে যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন,—উত্তরকালে সে অধিকার তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক, রামায়ণের রচনাকাল হইতে মহাভারতের রচনাকাল পর্য্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে স্ত্রীজাতির এই অধিকারসঙ্কোচের কোনও আভাস পাওয়া যায় কি না?

রামায়ণে দেখা যায় যায় যে, রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে ঋষিগণ শাস্ত্রে যে যে দেবতার যে যে বলি বিহিত আছে,—সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই বলি প্রদান করিয়াছিলেন। আর দশরথের প্রধানা

মহিষী কৌশল্যা স্বহস্তে তিন খড়্গের আঘাতে সেই অশ্বকে ছেদন করিয়াছিলেন। আদিকাণ্ডের ১৪শ সর্গে লিখিত আছে ;--

কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ
কৃপাণৈর্ব্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥ ৩৩
পতত্রিণা তদা সার্দ্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্ম্মকাম্যয়া ॥ ৩৪

ইহার অর্থ, পরে কৌশল্যা পরম প্রমোদসহকারে সেই অশ্বের বিশেষরূপ পরিচর্য্যা করতঃ তিন খড়্গের আঘাতে তাহাকে ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মকামিনী হইয়া সুস্থির চিত্তে সেই অশ্বের সহিত একরাত্রি যাপন করিলেন। ("ত্রিভিঃ কৃপাণৈঃ" অর্থে কেহ কেহ তিন খানি স্বতন্ত্র খড়্গের আঘাতে আর কেহ কেহ একই খড়্গের তিন আঘাতে অর্থ করিয়া থাকেন।)

ইহাতে দেখা যায়, কৌশল্যা পূর্ব্বদিন অশ্বকে নিহত করিয়াছিলেন এবং পরদিন ঋত্বিকগণ ঐ অশ্বের বপা উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিতে হবপ করিলে দশরথ ঐ বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে যাজ্ঞসেনী তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে তাঁহার সহিত একত্র যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রুপদনন্দিনীকে স্বহস্তে যজ্ঞীয় অশ্ব ছেদন করিতে হয় নাই। মহাভারতের অশ্বমেধ ৯১ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ;—

শ্রপয়িত্বা পশূনন্যান্ বিধিবদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১
ততঃ সংশ্রপ্য তুরগং বিধিবৎ যাজকাস্তদা
উপসংবেশয়ন্ রাজং ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাং ॥ ২

ইহার অর্থ দ্বিজসত্তমগণ অন্যান্য পশুদিগকে যথাবিধি শ্রপণ করিয়া সেই তুরঙ্গকে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিহত করিলেন। পরে সেই তুরঙ্গকে অগ্নিতে সম্যকরূপে শ্রপিত করিয়া দ্রুপদাত্মজাকে যথা বিধানে উপবেশন করাইলেন।

পাঠক দেখুন, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সহধর্ম্মিণীকে স্বহস্তে যজ্ঞের তুরঙ্গকে হত্যা করিতে হয় নাই, অথবা নিহত অশ্ব লইয়া এক রাত্রি অতিবাহিত করিতেও হয় নাই। ইহা ভিন্ন রামায়ণের সময় হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুরা দশরথপত্নীদিগকে সেই নিহত অশ্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। যথা—

হোতাধ্বর্য্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা॥

আদি। ১৪। ৩৫

"পরে হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতারা দশরথের মহিষী এবং বৈশ্যজাতীয়া পত্নী ও শূদ্র জাতীয়া পত্নীকে সেই অশ্বের সহিত সংযুক্ত করিলেন।"

এই ব্যাপারটা মহাভারতে একেবারেই নাই। ইহাতে রীতিনীতির যে কতকটা পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরে দুই গ্রন্থেই ঐ যজ্ঞের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি ঠিক একরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

যে সময় পবন-নন্দন লঙ্কার সকল স্থানে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া অশোক বনে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সময় তথায় সুনির্ম্মল নদী দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন;—

সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীঞ্চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী॥

সুন্দর কাণ্ড। ১৪। ৪৯

যদি সেই বরবর্ণিনী শ্যামা জানকী সন্ধ্যা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই সন্ধ্যা করিবার জন্য এই শুভজলা নদীতে আগমন করিবেন।

ইহাতে বুঝা যায়, তদানীন্তন দ্বিজাতি রমণীরা ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। ঐ শ্লোকের দুই স্থানে সন্ধ্যা কথা রহিয়াছে। সন্ধ্যার সাধারণ লক্ষণে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

ত্রয়াণাঞ্চৈব বেদানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমঃ
সন্ধি সর্ব্বসুরাণাঞ্চ তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

ব্যাস বলিয়াছেন;—

গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা॥

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে * * * * "বক্ষ্যমান প্রকারেণ প্রণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্ত নামরূপোপেতং সন্ধ্যা শব্দস্য বাচ্যমাদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্" ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, গায়ত্রীসম্বলিত প্রণায়ামাদি পূর্ব্বক দ্বিজাতির উপাসনাই সন্ধ্যা শব্দের বাচ্য। আর সন্ধ্যা অর্থে যদি কেবল দেবতার উপাসনাই বুঝাইবে, তাহা হইলে তাহার কালাকাল বিবেচনা

হইবে কেন? আর সে জন্য তিনি নিশ্চয়ই শুভজলা নদীতে আসিবেন (ধ্রুবমেষ্যতি) এরূপ চিন্তা হনূমানের মনে উদয় হইত না।

যাহা হউক, ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে সময় রামায়ণ রচিত হয়, সে সময় দ্বিজকন্যাগণ যথারীতি সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন। এই সন্ধ্যা বৈদিক সন্ধ্যা। কলিকলুষনাশের জন্য দেবাদিদেব কর্ত্তৃক তন্ত্র ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং কলিযুগ আরব্ধ হইবার বহুকাল পূর্ব্বে রাম-ভামিনী সীতাদেবী ও অন্যান্য বরবর্ণিনীগণ তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণই নাই। সে সময়ে দ্বিজাতীয় রমণীগণ পুরুষের ন্যায় বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। প্রাচীন কালে দ্বিজাতিসম্ভূতা যোষিদ্‌গণ বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনে তাহা বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য তখন সকল ব্রাহ্মণীই ব্রহ্মিষ্ঠা ছিলেন না; ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য দেবের প্রথমা মহিষী কাত্যায়ণীর ন্যায় অধিকাংশ রমণীই গৃহকর্ম্ম ও যাগযজ্ঞ পশুবলি প্রভৃতি কার্য্যে পতির সাহায্য ও সেবা করিতেন ইহা সত্য। কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন না বৈদেহ জনকের যজ্ঞ-সভায় যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐ সময়ে ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষের অধিকারভেদ ছিল না;—ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

পক্ষান্তরে মহাভারতের সময় রমণীরা "সন্ধ্যা" করিতেন এরূপ প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ সময় দেবতানির্ব্বিশেষে পতিকে সেবাধর্ম্মই কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি বিহিত হইয়াছে, উহা বন পর্ব্বে ব্রাহ্মণ কৌশিক ও সাধ্বীস্ত্রী সংবাদেই প্রকাশ।

এখন দেখা গেল, বৃহদারণ্যক উপনিষদাদিতে যে সময়ের কথা বর্ণিত আছে, সে সময়ে রমণীগণ পতির সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী ছিলেন, তাঁহারা পতিসেবার সঙ্গে সঙ্গে পতির হইয়া যজ্ঞীয় পশুবলি প্রভৃতি কার্য্য করিতেন ও যজ্ঞাদি কার্য্যে পতির সাহায্য করিতেন। রামায়ণ রচনার সময়ও ঠিক ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময়ে দ্বিজাতীয়া নারীরা সন্ধ্যোপাসনা, ভর্ত্তার সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুশীলন এবং বেদাদি অধ্যয়ন করিতেন। মহাভারতের সময় পত্নী ত দূরের কথা, স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তাই যজ্ঞীয় পশু নিহত করিতেন না। দ্বিজগণই কর্ম্মীর হইয়া ঐ কার্য্য করিতেন। তখন স্ত্রীজাতি বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনার

অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় পতির সহ-ধর্ম্মিণীরূপে পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিতেন। তবে ঐ সময় রমণীগণ দেবতাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে পূজা ও স্তবে তুষ্ট করিতে পারিতেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিতে কত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল? দুই চারি শত বৎসরে এই পরিবর্ত্তন সংঘটন সম্ভবপর নহে। সুতরাং, এই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সপ্রমাণ হইতেছে যে, রামায়ণ রচনার বহুকাল পরেই মহাভারত রচিত হইয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

অবসান।

কত নিশি কত স্বপনের মত
গিয়াছে চলিয়া সুদূর অতীতে
আজি এ ভুবনে গাহিতেছে সে যে
আকুলিত প্রাণ সেই মধুগীতে।

২

মধুর প্রভাতে সে আকুল গীতে
বিপদ-বেদনে কাঁদিছে এ প্রাণ;
বাসন্তী সমীরে আবাতিয়া ছন্দে
জীবন নিকুঞ্জে উঠিছে সে তান।

৩

ছিঁড়ি হৃদয়ের ভিন্ন গ্রন্থিগুলি
বাজিয়া উঠেছে মম ছিন্ন বীণ;
কোথা কত দূরে কোন্ স্বপ্ন-পুরে
এই হৃদিখানি হতে চাহে লীন!

৪

তাই বুঝি হেথা সব অবসাদ,
সান্ত্বনা কিছুই খুঁজিয়া না পাই;
এ অসীম বিশ্বে নাহি আর সে যে
কেন বা বৃথায় খুঁজিবারে চাই!

শ্রীমতী চঞ্চলকুমারী দেবী।

আর্য্যাবর্ত্ত,

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

K. V. Seyne & Bros

মনসা-মঙ্গল।

একসময়ে বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, মনসাদেবীর পূজা যেরূপ ঘটা ও জাঁকের সহিত সম্পাদিত হইত, আমাদের দেশ-বিশ্রুত শারদীয়া পূজা হয় ত তেমন ভাবে হইত না। মনসা দেবী, চাঁদ সদাগর, লক্ষীন্দর, বেহুলা প্রভৃতির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা হইত, এবং প্রতিমার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নূপুর পায়ে গায়কগণ চামর হস্তে পাঁচালী গান করিত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী এই পূজার সময়; তখন পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের উৎসব এক সময়ে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। পল্লীগুলি এই আনন্দে প্রমত্ত হইয়া পড়িত, এবং ভাসান-গান গাহিতে গাহিতে শত শত দাঁড়ী দাঁড় টানিয়া এক এক খানি ছোট নৌকা তীরবৎ নদীতে বাহিয়া চলিত। দীর্ঘ এবং অপ্রস্ত শত শত তরী এই ভাবে বঙ্গীয় পল্লীর নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে বহিয়া যাইত, এবং তীরে দাঁড়াইয়া পল্লীর নরনারীগণ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য দাঁড়বাহকগণের কণ্ঠে মনসা-মঙ্গল গান শুনিতেন এবং সেই উদ্যমপূর্ণ নৌকার খেলা দেখিতেন। এখনও এই উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাচীন কালের সমস্ত উৎসবের ন্যায়, সেই আনন্দ-উৎসাহের স্রোতঃ বৎসর বৎসর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে।

মনসা-মঙ্গলের আখ্যায়িকা প্রধানতঃ বেহুলার অপূর্ব্ব ভক্তি ও পাতিব্রত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই গীতির অসামান্য পবিত্র ভাব যে বঙ্গীয় পল্লীগুলিকে একসময়ে ধর্ম্মপ্রাণ ও সরস করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে: যাঁহারা জ্বলন্ত চিতার অগ্নিতে আপনাদের দেহ স্বামী-প্রেমের পবিত্র বলির ন্যায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বেহুলা তাঁহাদের অপেক্ষা উন্নততর পাতিব্রত্য দেখাইয়াছেন। ভিন্নদেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানলেখকগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই সতীত্বের আদর্শ রমণীগণের অনুকরণ করা শ্রেয়ঃ কি না। স্বামীকে প্রাচীনগণ যে উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপে, বিশেষ আমেরিকায়, তাঁহার সে স্থান নাই। কিন্তু হিন্দুস্থান এই প্রশ্নের প্রশ্রয় দিবে না। প্রাচীন আদর্শ হিন্দুললনার অস্থিমজ্জাগত। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'বিষবৃক্ষ' বঙ্গীয় অন্তঃপুরে বেশী দিন উৎপাত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বেহুলার যে শিক্ষা সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী প্রভৃতি নারীচরিত্রগুলির সকলেরই সেই শিক্ষা। গল্পের মালঞ্চমালা এবং কাঞ্চনমালায় এই শিক্ষা আরও সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, কারণ উহা বিশেষভাবে এ দেশেরই কথা। ইহাই বাঙ্গালীর কাব্য ও চিত্রে অঙ্কিত; চামর ধরিয়া গায়কগণ এই গান করিতেন; নৌকাখেলার অশিক্ষিত দাঁড়বাহকগণ ইহাই তার স্বরে গাহিয়া অপূর্ব্ব উদ্যম প্রকাশ করিত। মনসা দেবীর প্রতিমার সঙ্গে বেহুলার প্রতিমা গড়িয়া পূজক উভয়ের পদেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন। এই পাতিব্রত্য উপলক্ষে দাক্ষায়ণী সতী হইতে আরম্ভ করিয়া খুল্লনা ও রঙ্গাবতী প্রভৃতি শত শত নারীচরিত্র বঙ্গীয় কাব্যগুলিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পবিত্র বিজয়মাল্য পরাইয়া রাখিয়াছে। খোল, করতাল, কংশ ও ঘণ্টারবে এই কথা পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত। একটা বিশেষ আদর্শ সমস্ত দেশে প্রচার করিতে হইলে যে সকল সহজ ও চিত্তাকর্ষক উপায় অবলম্বন করিতে হয় আমাদের দেশে তাহার কিছুরই অভাব হয় নাই। সর্ব্বপ্রধান কবি হইতে ভিক্ষাজীবী মূর্খ গায়ক সকলেই একটা কথা ক্রমাগত শুনাইয়া শুনাইয়া ভারতবর্ষের প্রধান চিন্তা-গুলি জনসমাজে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আদর্শ একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে তাহা কিরূপে নির্ব্বিচারে প্রচার করা যায় তাহা, বোধ হয়, জগতের মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাই জানিতেন। এই জন্যই, বোধ হয়, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকরাও জগতের অন্য সমস্ত দেশের কৃষক মজুর হইতে অনেক উন্নত। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মোৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে শিক্ষাস্রোতঃ প্রবাহিত হইত পল্লীসমাজ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল পথ অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

বেহুলার অপূর্ব্ব নিষ্ঠাসম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মিষ্টার টনি লিখিয়াছেন "The story of Behula and Laksmindra is most delightful" চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার জে, ডি, এণ্ডারসন্ লিখিয়াছেন "As for Manasa Devi, I have a great (sympathetic) regard for her, having watched with intense interest the cult paid to her for a whole month, (was it not ?) when I was in Sylhet just 30 years ago. Is it during that month that people read the Padmapurana ?" প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃদ্ধ

বেভারিজ লিখিয়াছেন, "The story of Behula, the daughter-in-law of the famous Chand Sadagar, who had refused to worship Manasha Devi, is an affecting tale of wifely fidelity and has drawn tears from generations of Bengali men and women" সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর উইলিয়ম রথেনষ্টাইন পদ্মপুরাণের উপাখ্যানকে "Enachanting story" বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, শিক্ষিত য়ুরোপীয়গণ তাহা বিশেষ কৌতুহলী হইয়া পড়িয়াছেন। এই কাহিনীর মধ্যে যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্যই না থাকিবে, তবে এতকাল ধরিয়া বঙ্গের নরনারী আত্মহারা হইয়া ইহার কি শুনিয়াছিল?

এখন দেখা যাউক, এই গল্পোক্ত ঘটনার উৎপত্তির স্থান কোথায়? আমরা ইতঃপূর্ব্বে নানা প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, বগুড়া, দিনাজপুর, আসাম এমন কি দারজিলিংএর নিকটও চাঁদ সদাগরের বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, বঙ্গের প্রত্যেক স্থানের লোকরাই মনসা-মঙ্গলের গল্পটিকে একান্তরূপে প্রাণের জিনিস বলিয়া মনে করিয়াছিল; এই জন্য স্বীয় আবাসপল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ বা প্রাচীন নদী উক্ত কাব্যের গল্পোক্ত ঘটনার সঙ্গে সংযোজিত করিয়া সুখী হইয়াছে। যাবা ও বালিতে অযোধ্যা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান আছে; এবং তাহাই নির্দ্দেশপূর্ব্বক তথাকার অধিবাসী হিন্দুগণ স্বদেশকে রাম ও কুরুপাণ্ডবের লীলাক্ষেত্র প্রতিপন্ন করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। পুরাণোক্ত চরিত্রগুলি হিন্দুগণের এমনই প্রাণের জিনিস যে, তাহারা উহাদিগকে দূরে রাখিয়া সুখী হয় না; স্বীয় আবাসগৃহের সান্নিধ্যে আনিয়া শ্লাঘা বোধ করে, এবং কাল্পনিক আনন্দে বিভোর হয়। এই জন্যই আমাদের বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে বিরাট রাজার গোগৃহ, ভীমের লাঙ্গল ও চন্দ্রধরের বাড়ী।

নারায়ণ দেব তাঁহার পদ্মপুরাণের এক স্থানে লিখিয়াছেন, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সোনকা "বেহারীয়া রাজার কন্যা" ছিলেন। দ্বিজবংশী লিখিয়াছেন, মগধের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশের হলবাহক জাতীয় "বছাই" নামক রাজা মনসাদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। নারায়ণ দেব স্বয়ং মগধে জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ় হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলার বুড় গ্রামে বাস করেন। সুতরাং এই তিন প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, মনসা-মঙ্গলের উপাখ্যান আদৌ মগধ অঞ্চলের কথা ছিল। এতৎসম্বন্ধে আর একটি অনুকূল যুক্তি এই

যে, ভাগলপুর ও পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও গীতিব্যবসায়ীদল মনসা-মঙ্গলের গান গাহিয়া থাকে। পাটনা স্কুল বিভাগের ইনস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত ভগবতী সহায় এবং ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ নারায়ণ সিংহ মহোদয়দ্বয় আমাকে এই সকল গীতি সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারা এই গীতি তাঁহাদের দেশের ভাষায় অনেকবার শুনিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে যে সকল বেদিয়ার দল এ দেশে আইসে, তাহারা সর্প-ক্রীড়ার সময় বেহুলা ও লক্ষীন্দরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক ছড়া গাহিয়া থাকে।

সম্ভবতঃ মগধ বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন রাজধানী হইতে এই উপাখ্যান সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজধানীর আমোদ উৎসব স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র অনুকৃত হইয়া থাকে। পাল রাজগণের সময়ে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বঙ্গদেশের পদানত ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই রাজত্বকালে এই গান সর্ব্ব প্রথম গীত হইয়াছিল; এই সম্বন্ধে আমাদের আরও প্রমাণ আছে; এ স্থানে তাহার উল্লেখ করিবার অবকাশাভাব। কিন্তু এই গানের সূচনা যে দেশেই হউক না কেন, বঙ্গদেশে মনসা দেবীর প্রসঙ্গ যেরূপ পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছিল, অন্যত্র তাহা হয় নাই। বিজয়গুপ্ত ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচিত করেন। তিনি লিখিয়াছেন, কাণা হরি দত্তই বঙ্গীয় মনসাগীতির প্রবর্ত্তক, এবং তাঁহার সময়েই উক্ত হরি দত্তের গীতিগুলি একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি উহার যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন তাহার অনেক স্থলেই দুই চরণে মিল ছিল না। এই সকল কথায় মনে হয়, কাণা হরি দত্ত অত্যন্ত প্রাচীন কবি ছিলেন। কাণা হরি দত্ত যে এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, পরবর্ত্তী কালে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পুরুষোত্তম প্রভৃতি কবি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এতাদৃশ কবির গীতি লুপ্ত হইতে অন্যূন আড়াই শত বৎসর লাগিবার কথা। তাহা হইলে বিজয় গুপ্তের ঐ সময়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ অনুমান ১২২৮ খৃষ্টাব্দে কাণা হরি দত্ত তদীয় মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। নারায়ণ দেবের বিংশ পর্য্যায়ের বংশধর এখনও ময়মনসিংহ বুড় গ্রামে আছেন, সুতরাং তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া আমরা নারায়ণ দেবের জন্মকাল ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে পাইতেছি। তৎপরে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিজবংশী তদীয় মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। এই কবিগণ সকলেই চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গই মনসা-মঙ্গল গানের প্রধান ও আদি কেন্দ্র। আদি কবিগণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি—

কাণা হরি দত্ত (গ্রন্থ রচনাকাল)—১২২৮খৃঃ।

নারায়ণ দেব (জন্মকাল)—১২৪৬খৃঃ।

বিজয় গুপ্ত (গ্রন্থরচনাকাল)—১২৪৬খৃঃ।

দ্বিজবংশী (গ্রন্থরচনাকাল)—১৪৮৫খৃঃ।

ইঁহারা তিন জন ময়মনসিংহ নিবাসী। শুধু বিজয় গুপ্ত বরিশাল ফুলশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পুস্তক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনুমান ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমাননিবাসী কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ স্বীয় অপুর্ব্ব করুণ-রসাত্মক মনসার ভাসান রচনা করেন; তাহা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে প্রত্যেক ছত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতে হইবে। কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ নারায়ণ দেবের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী আরও ৫৭ জন ভাসানরচকের কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আর কতশত কবির কাব্য যে লুপ্ত বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিবে? মনসার ভাসানের আদি লেখকগণের ভাষা ও ভাব কিরূপ করুণ ও সহজ-সুন্দর তাহা নারায়ণ দেবের এই কয়েকটি ছত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে। বেহুলা বিলাপ করিতেছেন—

"অমৃত সমান প্রভুরে তোমার মুখের বাণী।
পুনরপি না শুনিলুম মুই অভাগিনী॥
হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কন করিমু চূর।
মুচিয়া ফেলিমু আমি সিঁথীর সিন্দুর॥
এ হেন সুন্দর রূপ প্রভুরে প্রকাশিত রজনী।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া রূপ প্রভু হরিল নাগিনী॥
চাঁপার কলিকাসম প্রভুরে তোমার কোমল অঙ্গুলী।
তুমি আমার প্রভুরে অভাগা বেহুলারে ডাক
চাহ চক্ষু মেলি॥"

দ্বিজবংশী মনসা দেবীর যে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হয়, দেবীর দুই পার্শ্বে নেতা ও সুগন্ধা এবং জালু ও মালু ভ্রাতৃদ্বয়। এই ভাবের মূর্ত্তির ধ্যান কোন্ হিন্দু বা বৌদ্ধপুরাণে আছে, তাহা জানি না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুইর লোকান্তর গমনকালে তাঁহার পুত্র জীবিত না থাকায় তাঁহার পৌত্র "ষোড়শ লুই" নাম ধারণ পূর্ব্বক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি জার্ম্মাণ সম্রাট-দুহিতা মেরি অন্তনেতের পাণিগ্রহণ করেন। মেরি অন্তনেতের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ইংলণ্ডের বাগ্মীবর বার্ক ইঁহাকে "প্রভাতী তারকা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইনি বিশাল ফরাসী রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া ফরাসী জাতিকে ভিন্ন দেশীয় লোক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তাহাদের রীতি, নীতি, প্রথা, পদ্ধতি তাঁহার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অযথা ঘৃণার উৎপাদন করিল। † তিনি ফরাসী জাতির নব অঙ্কুরিত জাতীয় জীবনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাদের উন্নতি-মার্গের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন। কতিপয় অনুগ্রহভাজন নগণ্য ব্যক্তির অসার যুক্তি গ্রহণে তিনি দুর্ব্বলচিত্ত নৃপতিকে করতলগত করিয়া রাজনৈতিক সর্ব্ব বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ষোড়শ লুই যথেচ্ছাচারনীতি-পরায়ণ হইলেও প্রজাপুঞ্জের অহিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি প্রবুদ্ধ ফরাসী জাতির স্বায়ত্ত-শাসন-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে অনিচ্ছুক হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের দুঃখবিমোচন করিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞীর প্ররোচনায়, তাঁহার সর্ব্ব যত্নই বিফল হইল। রাজকার্য্যে জার্ম্মাণ রাজনন্দিনীর অবৈধ হস্তক্ষেপনিবন্ধন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনে অক্ষম হইলেন।

ষোড়শ লুই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মরেপা প্রধান মন্ত্রীত্বে এবং টার্গট্ রাজস্ব-সচিবপদে নিযুক্ত হইলেন। মরেপা প্রধান মন্ত্রীপদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত

* "I saw her just above the horizon, decorating and cheering the elevated sphere she had just begun to move in, glittering like the morning star, full of life and splendour and joy"

Burke—'Reflections on the French Revolution'

† Encyclopaedia Britannica 9th Edition p. 593

হইলেও টার্গটের অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা নিবন্ধন রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। টার্গট রাজস্ব-সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় ৪০০০০০০০ পাউণ্ড পরিমাণে অধিক; সুতরাং অচিরে তৎসম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে রাজার রাজসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাজস্ব বিভাগে ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে বহুদর্শী মন্ত্রীগণেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু টার্গট রাজকরপ্রপীড়িত প্রজাগণের স্কন্ধে পুনর্ব্বার গুরুভার অর্পিত না করিয়া মিতব্যয়িতা অবলম্বনে রাজস্ব বিভাগে শৃঙ্খলতা সংস্থাপিত করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজস্ব-সচিবপদে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিলেন না। রাজস্ব সংক্রান্ত কয়েকটি কুপ্রথা নিবারণে প্রয়াসী হইয়া তিনি পার্লিয়ামেণ্ট, ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজকগণের কোপানলে পতিত হইলেন। সুতরাং রাজা তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। (১৭৭৭ খৃঃ এপ্রিল)। টার্গটের স্থলে ক্যালনি রাজস্ব-সচিবপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ক্যালনির অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত নেকারের হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত সমগ্র ভার অর্পিত হইল।

নেকার টার্গটের ন্যায় উদার নীতিপরায়ণ ছিলেন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তত্তুল্য চরিত্রবান পুরুষ সংসারে অতি বিরল। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনে শান্তি ও পবিত্রতা নিরন্তর সমভাবে বিরাজ করিত। ধর্ম্মবিহীন ফরাসীরাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। বাণিজ্যের সাহায্যে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধন উপার্জ্জন করিয়া ধনিসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; দীন হীন দরিদ্রব্যক্তিগণকে মুক্ত হস্তে দান করিয়া তিনি সেই ধনের সদ্ব্যবহার করিতেন। ফরাসী জাতির জাতীয় উন্নতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জন্মিয়াছিল; তিনি সেই জাতীয় জীবনের শক্তিবর্দ্ধনকল্পে পারশ্রমিক স্বরূপ কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে রাজস্ব সংক্রান্ত দুরূহ কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। *।

* "He refused the whole emoluments of office an example of disinterestedness which excited the jealousy, as it was beyond the power of imitation, of the courtiers"

Alison's History of Europe vol 1. p 291

ঘটনাক্রমে এই সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে ফরাসী জাতি আমেরিকাবাসিগণকে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মার্কিন জাতির সাহায্যার্থ সৈন্য, অর্থ ও রণতরী প্রেরণ করেন এই ইচ্ছা দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজস্ব-সচিব নেকার দেখিলেন যে, মার্কিন জাতির সাহায্যকল্পে অর্ণবসহায় ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন; অর্থহীন ফরাসীরাজ কি প্রকারে সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন? এই চিন্তা করিয়া মন্ত্রীবর আমেরিকা-যুদ্ধে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ফরাসী জাতি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। ফ্রান্স নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বাধীনতাপ্রয়াসী মার্কিন জাতির পরাভব দর্শন করিবে এই চিন্তায় সর্ব্ব সম্প্রদায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অচিরে রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভূস্বামিগণের ও সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের যোগদান নিবন্ধন সেই আন্দোলন ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া ষোড়শ লুই জাতীয় ইচ্ছা পূরণকল্পে আমেরিকা-সমরে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন।

ফরাসী জাতির সাহায্যে আমেরিকার জয়লাভ হইল। স্বাধীনতাপ্রয়াসী মার্কিন জাতি বীরদর্পে জগতীতলে স্বীয় মহিমধ্বজা উত্তোলন করিল। সাম্য ও স্বাধীনতার মুখোজ্জ্বল দৃষ্টে সাম্য ও স্বাধীনতাবাদিগণ ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইল। সুদূর আমেরিকা হইতে ফ্রান্সবাসীরা যশোবিমণ্ডিত শিরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জয়নাদে দিগদিগন্ত নিনাদিত করিল। ফরাসী জাতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু মার্কিনের জয়লাভ আসন্ন ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণে পরিণত হইল। মার্কিনের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইয়া ফরাসী জাতি আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের শক্তি, সামর্থ্য, উৎসাহ, উদ্যম চতুর্গুণ হইল। সুতরাং, মার্কিন সমরই যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহা হউক স্বাধীনতা-সমরে যোগদান নিবন্ধন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ঋণবৃদ্ধি হইল। নেকার অনন্যোপায় হইয়া মিতব্যয়িতার আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। ইহাতে অভিজাতবংশীয় বৃত্তিভোগীদলের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। ধর্ম্মযাজকগণ ও ভূস্বামীবৃন্দ নেকারের ধ্বংসসাধনকল্পে সম্মিলিত হইলেন। মন্ত্রীবর স্বার্থসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের কোপানলে পতিত হইয়া পদত্যাগ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন। (১৭৮১ খৃঃ)

নেকার পদত্যাগ করিলে, রাজ্ঞী শাসনসংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে অবাধে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার মন্ত্রণায় পর্য্যায়ক্রমে ফ্লুরি, অরমেছন কলন প্রভৃতি নগণ্য ব্যক্তিগণ রাজস্ব সচিবপদে নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব বিভাগে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিলেন। অরমেছন রাজকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ১৪০০০০০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াও কার্য্যপরিচালনে অসমর্থ হইয়া পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার পদত্যাগকালে দৃষ্ট হইল যে, রাজকোশে ১৪৪০০ পাউণ্ড মাত্র আছে! কলন রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হইয়া অর্থসমাগম অথবা ব্যয়নির্ব্বাহ সংক্রান্ত সর্ব্বচিন্তা পরিহার পূর্ব্বক বিলাসপরায়ণা রাজ্ঞীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। সুতরাং, রাজকার্য্যসংক্রান্ত আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের অর্থাভাব হইলেও রাজ্ঞীর বিলাসপরিচর্য্যার নিমিত্ত অর্থাভাব হইল না। এইরূপে আয় অপেক্ষা ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যেই রাজকোশ এককালে শূন্য হইবার উপক্রম হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রী রাজকরের সাহায্য গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবে? ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজকগণ তৎকালে রাজস্বসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের স্কন্ধে করভার অর্পণের প্রস্তাব হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে; আবার পক্ষান্তরে করভারপ্রপীড়িত জন সাধারণের স্কন্ধেই বা পুনর্ব্বার অতিরিক্ত ভার কিরূপে অর্পিত হইবে? উপায়ান্তর না দেখিয়া মন্ত্রী অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি-গণকে এক বিরাট সভায় আহ্বানের নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। (১৭৮৭ খৃঃ) সর্ব্ব সম্প্রদায়ের স্কন্ধে সমভাবে করভার অর্পণের নিমিত্ত এবং রাজস্বসংক্রান্ত কয়েকটি কুপ্রথা নিবারণ কল্পে এই সভা আহূত হইল। কিন্তু অভিজাতগণ রাজার কোন প্রস্তাবেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া কলন পদত্যাগ করিলেন। *

কলন পদত্যাগ করিলে ব্রাইন রাজস্ব সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত হওয়ায় ভার্জ্জিনিছ প্রধান

* Encyclopaedia Britannica 9th Edition.

মন্ত্রীত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্ববিভাগে অভিনব ব্যক্তিসমাগমে রাজকার্য্য অভিনব প্রকারে পরিচালিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে ফরাসীরাজ্যের মহারাণী মেরি অন্তনেতের বিচিত্র লীলা জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল। এক দিকে অন্নাভাবে ক্ষুৎপীড়িত মানবগণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, অপর দিকে সেই সুন্দরীকুলদর্পহারিণী অষ্ট্রিয়ানন্দিনীর অযথা বিলাসপরিচর্য্যা ফরাসী চিত্তে অপরিসীম ঘৃণা উৎপাদন করিল। প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব, অভিযোগ, সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তির প্রতি সমভাবে ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক মেরি অন্তনেত অনন্ত বেশভূষায় অহরহঃ বর বপুর শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ভার্সেলিস ও ত্রিয়ানন্ ভবনে অহর্নিশি নৃত্যগীত, সান্ধ্যসম্মিলন প্রভৃতি অশেষবিধ আমোদ উৎসব চলিতে লাগিল। মহামহোপাধ্যায় বংশোদ্ভূত নরবৃষগণ রাজভবনের সেই সম্মিলনে—সেই উৎসবে যোগদান করিতে লাগিলেন। এদিকে কাউণ্ট ডি আর্ত্তয় প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গসহ রাজ্ঞী রাজার অবিদ্যমানে গভীর নিশায় প্রাসাদশিখরে নিদাঘ-সমীরসেবনে চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্যারিসবাসীরা সেই সমস্ত আমোদ উৎসবের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া রাজপরিবারবর্গের অশেষবিধ কুৎসা রটনা এবং পথে ঘাটে গৃহে গৃহে সহস্র মুখে সহস্র প্রকারে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে বিধির বিড়ম্বনায় রাজ্ঞীর দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘটনাক্রমে হীরকহার প্রসঙ্গীয় একটি অদ্ভুৎ ব্যাপারে সমগ্র প্যারিস নগরী আলোড়িত হইল। যদিও পরিশেষে বিচারসমিতি পার্লিয়ামেণ্ট হীরকহারবিষয়ক ঘটনাবলীতে রাজ্ঞীর নির্দ্দোষিতা অবধারণ করিলেন, তথাপি উন্মত্ত ফরাসী জাতি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, হীরকহার প্রসঙ্গীয় ব্যাপারটি লীলাময়ী অন্তনেতের অনন্ত লীলার একটি দৃষ্টান্ত। ঘটনাটি এই ঃ—বোহেমার নামক প্যারিস নগরীর সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার-বিক্রেতা রাজপরিবারবর্গের যাবতীয় অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি বহু পরিশ্রমে ও অশেষ যত্নে একটি অপূর্ব্ব হীরকহার নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয়ার্থ রাজ্ঞীর সমীপে আনয়ন করেন। মূল্য ৬৪০০০ পাউণ্ড শুনিয়া রাণী হার ক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অনন্তর বোহেমার হার বিক্রয়ের নিমিত্ত দেশ দেশান্তরে গমন করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইলেন না। কিয়দ্দিবস পরে মথি নাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা বোহেমারসন্নিকটে আগমন

করিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞী অনেক চিন্তার পর আপনার সেই হীরকহারটি ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন; এ কথা আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।" এই বলিয়া মথি রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত একখানি লিপি বোহেমারের হস্তে অর্পণ করিলেন। পত্রখানি প্রকৃত পক্ষে রাজ্ঞী কর্তৃক স্বাক্ষরিত কি না, তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বোহেমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। মথি বলিলেন, "আপনার সন্দেহভঞ্জনার্থ আমি রাজভবনস্থ জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে সত্বরই আপনার নিকট প্রেরণ করিব। তিনিই ক্রয়কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।" কিয়ৎকাল পরেই কার্ডিনাল রোহান নামক রাজ্ঞীর দাতব্য বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী মথিসমভিব্যাহারে বোহেমারসমীপে আগমন করিয়া ৫৬০০০ পাউণ্ড মূল্য অবধারণে রাজ্ঞীর নামে সেই হার ক্রয় করিলেন। কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশক্রমে বিক্রীত হারটি মথির হস্তে প্রদত্ত হইল। মথি বোহেমারের হস্তে রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত লিপি প্রদান পূর্ব্বক হার লইয়া প্রস্থান করিলেন। মূল্য সম্বন্ধে এইরূপ কথা স্থির হইল যে, বোহেমার সমগ্র মূল্য এককালে প্রাপ্ত হইবে না; আংশিকরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজ্ঞী ঋণ পরিশোধ করিবেন। মূল্যের প্রথমাংশ প্রদানের নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হইলে বোহেমার রাজ্ঞীর কোশাধ্যক্ষসমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কোশাধ্যক্ষ মূল্য প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। বোহেমার রাজভবনস্থ জনৈক মহিলার নিকট অভিযোগ করিলেন। রাজা তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোহানকে ভর্ৎসনা করায়, রোহান উত্তর করিলেন, "মথি আমাকে যে পত্র দেখাইয়াছিলেন তাহা আমি রাজ্ঞী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সেই জন্য হার ক্রয়কালে উপস্থিত ছিলাম।" রাজা বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "আপনি রাজভবনের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী, ফরাসী রাজ্ঞী কি প্রকারে নাম স্বাক্ষর করেন তাহা অল্প আয়াসেই অবগত হইতে পারিতেন।" ইহার অল্পকাল পরেই রোহান্ এবং মথি ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্যারিস পার্লিয়ামেণ্ট সমীপে প্রেরিত হইলেন।

হীরকহারপ্রসঙ্গীয় অদ্ভুত ব্যাপারে সমগ্র ফরাসীভূমি আলোড়িত হইল। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা বিচারফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিচারকালে এক অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। হীরকহার ক্রয়ের অব্যবহিত পরে মথি রোহানকে বলেন, "হীরকহার প্রসঙ্গে আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য রাজ্ঞী আপনাকে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত ছদ্মবেশে রজনীযোগে আপনার সহিত ত্রিয়ানন্ উদ্যানে সাক্ষাৎ করিবেন।" রজনীযোগে নিভৃতে

রাজ্ঞীদর্শনলাভসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া রোহান মহানন্দে ত্রিয়ানন্ উদ্যানে গমন করিলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মেরি অন্তনেতসদৃশী অপূর্ব্বরূপলাবণ্যসম্পন্না মহিলা ছদ্মবেশে তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। মহিলা বচনসুধাবর্ষণে রোহানের কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে একটি গোলাপ কুসুম প্রদান করিলেন। রোহান ক্ষণকালের নিমিত্ত স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া অপার আনন্দে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সেই ছদ্মবেশধারিণী, কুঞ্জবিহারিণী, মধুরভাষিণী রমণী কে? ইনি কি সেই অনিন্দ্যরূপিণী ফরাসী মহারাণী অন্তনেত? ইনি কি যথার্থই হীরকহার ক্রয় করিয়া রোহানকে গুপ্তভাবে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত ছদ্মবেশে নিশা-কালে নিভৃতে ত্রিয়ানন্ উদ্যানে আগমন করিয়াছিলেন? রোহানের তৎকালে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইনিই ফরাসী রাজ্ঞী। জনসাধারণের ধ্রুব বিশ্বাস যে, তিনিই অন্তনেত। যাহা হউক, বিচার-সমিতি পার্লিয়ামেণ্ট প্রমাণের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সেই ত্রিয়ানন্ উদ্যান-বিহারিণী মহিলা মহারাণী মেরি অন্তনেত নহেন; ইনি অলিভা নাম্নী কুলধর্ম্মত্যাগিনী প্যারিসবাসিনী জনৈকা মহিলা। মথি স্বীয় দুরভিসন্ধি-ক্রমে রোহানের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ইঁহাকে ত্রিয়ানন্ উদ্যানে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পার্লিয়ামেণ্ট রোহানকে অব্যাহতি দিলেন এবং মথির স্কন্ধ উত্তপ্ত লৌহশলাকায় চিহ্নিত করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত করিলেন। কিন্তু প্যারিস নগরীর জনসাধারণ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসমিতির বিচারে পরিতৃপ্ত হইল না। তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মহারাণী মেরি অন্তনেতই সর্ব্ব অনর্থের মূল। দুর্দ্দমনীয় লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি স্বীয় বিলাস-পরিচর্য্যার নিমিত্ত রোহান ও মথি উভয়ের সাহায্যে হীরকহার ক্রয় করেন; তিনিই নিশাযোগে ছদ্মবেশে নিকৃষ্টা রমণীর ন্যায় ত্রিয়ানন্ উদ্যানে নিভৃতে মধুর বচনে রোহানকে আপ্যায়িত করেন; পরিশেষে বোহেমার মূল্য প্রার্থী হইলে তিনিই শঠতা পূর্ব্বক ক্রয়সংক্রান্ত সর্ব্ব বৃত্তান্ত অস্বীকার করিয়াছেন। বলাবাহুল্য এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্তু প্যারিসের উন্মত্ত ইতর সাধারণ তখন বিচার-শক্তিবিবর্জ্জিত।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

* এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অপরাধ।

পাছে অপরাধ হয়!

সদা ভয়ে-ভয়ে থাকি, লুকাই সজল আঁখি,
চেপে রাখি উদ্বেল হৃদয়!
যে কথা বলিতে চাহি, বুঝি তা'র ভাষা নাহি
কি বলিব, তাই শুধু ভয়;—
পাছে অপরাধ হয়।

রিক্ত করি আপনারে সর্ব্বস্ব দিয়াছি তা'রে,
প্রাণ-মন তৃপ্ত তবু নয়।
তবু কিছু দিতে বাকী এখনো রয়েছে না কি?
কেমনে তা' বুঝিব নিশ্চয়!
পাছে অপরাধ হয়।

সদা দূরে-দূরে থাকি, প্রাণপণে ঢেকে রাখি—
মরমের নিভৃত নিলয়!
তবু মোর ভালবাসা খুঁজি' প্রকাশের ভাষা
ব্যাপ্ত হ'তে চাহে বিশ্বময়;
পাছে অপরাধ হয়!

ভাল সেও—আঁখি জল হৃদয়ের চিতানল,
জীবনের চির পরাজয়,—
নিয়ে র'ব এক ধারে জানিতে দিব না কা'রে,
হয় হোক্ যত দুঃখময়,—
পাছে অপরাধ হয়।

যেথায় গোপন পুরে বেদনার মত সুরে
গীতি হেন ধ্বনিছে প্রণয়;
কে বুঝিবে তা'র কথা,— সেথা তা'র আকুলতা,—
কোথা শেষ, কোথায় উদয়;—
পাছে অপরাধ হয়।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

মরুভূমে।

(ব্যালজাক)

গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে সার্কাস দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। তখন সহরের অলিতে গলিতে এরূপ সার্কাসের আবির্ভাব হয় নাই। দর্শকেরা সকলেই বিজ্ঞাপনে বর্ণিত বাঘের খেলা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। গৃহিণী বলিলেন, "ঐ বাঘের সঙ্গে লড়াইটা দেখিয়া আমার বড়ই ভয় পাইতেছিল; ঐ লোকটা বাঘটাকে কি করিয়া এ রকম বশ করিল আমি ত ভাবিয়া পাইতেছি না। ও নিশ্চয়ই বুজরুকি জানে। বাঘের মুখের মধ্যে মাথা পূরিয়া দেওয়া কি সহজ কথা!" আমি বলিলাম, "তুমি যাহা এত দুঃসাধ্য মনে করিতেছ বাস্তবিক তাহা অতি স্বাভাবিক। উহার মধ্যে যাদুবিদ্যার নামগন্ধও নাই।" বোধ হয়, কথাটা আমার অর্দ্ধাঙ্গিণীর ভাল বিশ্বাস হইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সত্য নাকি?"

আমি বলিলাম, "তুমি কি মনে কর, ইতর প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি নাই? এটা বড়ই ভুল। সভ্য ভব্য হইয়া আমাদের যাহা কিছু কদভ্যাস হইয়াছে ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে তাহা সমস্তই শিখাইতে পারা যায়। আমি প্রথমবার যে দিন সার্কাসে এই খেলাটা দেখি সে দিন তোমারই মত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাহবা দিয়াছিলাম। সে দিন আমার পার্শ্বে কাঠের পা ওয়ালা একজন বৃদ্ধ ফরাসী সিপাহী বসিয়া ছিল। তাহার চেহারা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সে অনেক লড়াইয়ের ফেরতা। লোকটা বড়ই আমুদে। তাহার সাদাসিধা ভাব দেখিয়া গোড়া হইতেই তাহাকে আমার পছন্দ হইয়াছিল। এ শ্রেণীর অসমসাহসিক আমোদপ্রিয় লোক আজকাল আর বড় দেখা যায় না। হাজার আশ্চর্য্য জিনিস দেখিলেও ইহারা অবাক হইতে জানে না;—ভয় ভীতির ত কথাই নাই। এ সব লোক সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুলি আটকাইতেও যেমন মজবুৎ, মুমূর্ষুর পকেট হাতড়াইয়া যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেও তেমনই মজবুৎ। ইহারা মিছা ভাবনায় সময় নষ্ট করিতে জানে না; সুবিধা পাইলে স্বয়ং সয়তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতেও গররাজী নহে। খেলার সময় সার্কাসওয়ালা যখন বাঘের খাঁচায় ঢুকিতেছিল তখন চাহিয়া দেখি, বৃদ্ধটি তাহার দিকে তাকাইয়া অবজ্ঞাভরে হাসিতেছে। সে হাসির ভাবটা এই যে, আমি ও সমস্তই ধরিয়া ফেলিয়াছি, আমার কাছে কিছুই নূতন নহে। খেলা সাঙ্গ হইলে আমি যখন উচ্চকণ্ঠে সার্কাসওয়ালার প্রশংসা করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিল, 'মহাশয় ও ত সহজ কথা—উহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলেন কি?' আমি বলিলাম, 'সে কি মহাশয়, উহাতে যদি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইবার না থাকে তাহা হইলে কি করিয়া এরূপ অঘটন ঘটায় আমাকে বুঝাইয়া বলুন দেখি।' কথায় কথায় আলাপ জমিয়া উঠিল। নিকটেই একটা হোটেল

ছিল, তথায় উভয়ের জলযোগের ব্যবস্থা করা গেল। আকার ইঙ্গিতে বুঝিলাম, বৃদ্ধের একটু পানদোষ আছে; সুতরাং ভদ্রতার খাতিরে এ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিতে হইল। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির সহিত বৃদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি যেন ভালরূপ জাগিয়া উঠিল। সে কথা-প্রসঙ্গে আমার নিকট তাহার আত্মজীবনের যে অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করিল তাহা শুনিয়া আমারও মনে হইতে লাগিল, এরূপ খেলায় আর আশ্চর্য্যটা কি? আমার স্ত্রী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি ধরিয়া বসিলেন, বৃদ্ধটি যে আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিয়াছিল তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। স্ত্রীলোকের কৌতূহল একবার জাগ্রত হইলে শুধু স্তোক বাক্যে নিবারিত করা অসম্ভব; সুতরাং তাঁহাকে আদ্যোপান্ত না বলিয়া আর উপায় ছিল না। গল্পটির সার মর্ম্ম এই,—

মিসর দেশের সামরিক অভিযানে একজন ফরাসী সৈনিক পুরুষ মানগ্রাবিন জাতীয় আরবগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সে যুদ্ধে আরবরা জয়লাভ করিতে পারে নাই। পাছে শত্রুগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে সেই ভয়ে তাহারা বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও তাহারা বন্দীটিকে পরিত্যাগ করে নাই। বন্দীটি আর কেহই নহে, আমাদের সেই বৃদ্ধ সৈনিক। সন্ধ্যার সময় আরবরা একটি ইন্দারার সন্নিকটে কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষের তলদেশে তাম্বু খাটাইয়াছিল। এ স্থানে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের কিছু আহার্য্যের সংস্থান ছিল। ঘোড়াগুলির দানার বন্দোবস্ত করিয়া এবং পূর্ব্বসংগৃহীত শুষ্ক খর্জ্জুর প্রভৃতির সাহায্যে কোনও প্রকারে আপনাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া তাহারা সে দিনের মত আপন আপন পট্টাবাসে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের নিবদ্ধহস্তপদ বন্দীটি যে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিবে এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সৈনিকটি যখন দেখিল যে, তাহার শত্রুপক্ষীয়রা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তখন সে কোনও প্রকারে দন্ত ও হাঁটুর সাহায্যে একখানি তরবারি ধারণ করিয়া বাঁধনগুলি কাটিয়া ফেলিতে সক্ষম হইল। হস্তপদ মুক্ত হইবামাত্র সে কালবিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র ও তাহার পৃষ্ঠবদ্ধ থলিয়ায় আবশ্যক মত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া একটি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। কোন্ দিক ধরিয়া অগ্রসর হইলে সত্বর শিবিরে ফিরিয়া যাইতে পারিবে অনুমানে তাহা ঠিক করিয়া লইয়া সে বিদ্যুদ্বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। সৈন্যাবাসে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার মনে এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, সে ক্লান্ত অশ্বটির প্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করে নাই, এবং অশ্বটিও পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের আশা একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছিল।

বালুময় মরুপ্রান্তরে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সে সন্ধ্যাকালে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। সে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় মুক্ত আকাশের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা বা অভিলাষ তাহার মনে আদৌ স্থান পায় নাই। পাহাড়ের উপর কয়েকটি সুদীর্ঘ তাল ও খর্জ্জুর জাতীয় বৃক্ষ ছিল। দূর হইতে এই পত্রমণ্ডিত বৃক্ষ কয়টির শিরো-

দেশ দর্শন করিয়া সৈনিকের মনে সতঃই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুৎপিপাসাকাতর যোদ্ধা কোনরূপ আত্মরক্ষার উপায় না করিয়াই একটি—সমতল প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। সে মনে করিয়াছিল যে, এরূপ দুর্গম মরুপ্রদেশ হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করা তাহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না। এক্ষণে আরব শত্রুপক্ষগণের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করায় তাহার মন অনুক্ষণ তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল। এরূপ জনহীন স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করা অপেক্ষা বর্ব্বর আরব দস্যুগণের সাহচর্য্য এক্ষণে তাহার নিকট বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল।

প্রভাতকালে সূর্য্যরশ্মির প্রবল উত্তাপে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তাপে তাহার প্রস্তর-শয্যা এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিদ্রিতাবস্থায় অল্পক্ষণ তথায় শুইয়া থাকায় তাহার শরীরের কোন কোন অংশে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। খর্জ্জুর বৃক্ষ কয়টির ছায়া তির্য্যক ভাবে নিপতিত হওয়ায় সেগুলি রৌদ্রনিবারণসম্বন্ধে কোন রূপেই সাহায্যকর হয় নাই। বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রশোভিত বৃক্ষকয়টি দেখিয়া সারা-সেন স্থাপত্য অনুসারে নির্ম্মিত স্বদেশস্থ ধর্ম্মমন্দিরে স্তম্ভগুলির কথা তাহার মনে পড়িতে-ছিল। সে যে দিকেই চক্ষু ফিরায় দেখিতে পায়, মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। দিগন্ত-প্রসারিত বালুকারাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়নপথে পতিত হয় না। সূর্য্যকিরণসম্পাতে ঘনসন্নিবিষ্ট বালুকাকণাগুলি বড়ই চাকচিক্যময় হইয়াছিল; সহসা দেখিলে মনে হইতে-ছিল যেন চতুর্দ্দিকে একখানি সুবৃহৎ দর্পণ বিস্তৃত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মরুভূমি হইতে কুয়াসার ন্যায় এক প্রকার বাষ্প উত্থিত হইয়া ঘূর্ণী বাতাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আকাশে সূর্য্যের দীপ্তি এতই প্রখর যে, য়ুরোপীয়গণ স্বপ্নেও তাহা ধারণা করিতে পারে না। দ্যুলোক আর ভূলোক যেন সমস্তই অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত। কোন দিকে শব্দ-মাত্র নাই। সে নিরবতা কি ভয়াবহ, কি অসহ্য! বোধ হইতেছিল যেন অনন্ত অসী-মতা মানবাত্মাকে বেগে নিষ্পীড়ন করিতেছে। আকাশ নিরভ্র—কোথাও ছায়ার লেশ-মাত্র নাই। বায়ুপ্রবাহে বালুকারাশি সমুদ্রবক্ষে উর্ম্মিমালার ন্যায় অনুক্ষণ সঞ্চালিত হইতেছে। বালুকাতরঙ্গের কোথাও বিরাম নাই। দিগ্‌বলয় কেবল একটি প্রোজ্জ্বল রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই আলোকরেখা যেন উন্মুক্ত তরবারির ন্যায় উজ্জ্বল ও খরধার।

সৈনিকটি যুবা পুরুষ। তাহার বয়স দ্বাবিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না। তাহার তখনও অনেক সাধ—অনেক আশা মিটাইবার ছিল। এরূপ নির্জ্জন স্থানে তপশ্চরণের কথা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে নিকটস্থ তালগাছের গুঁড়িটিকে পরম সুহৃদের ন্যায় আলিঙ্গন করিল এবং কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই বৃক্ষের অনতিপ্রশস্ত ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। চারি দিকের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া সে আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। চতুর্দ্দিকস্থ নির্জ্জনতা ভালরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎ-কার করিয়া উঠিল; কিন্তু তদুত্তরে কোনও প্রতিধ্বনি তাহার শ্রবণগোচর হইল না। তাহার কণ্ঠস্বর পাহাড়ের গুহামধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। হতভাগ্য অনন্যোপায়

আয্যাবত্ত—

লইয়া তাহার বন্দুকে টোটা পুরিল ; পরে কি ভাবিয়া বন্দুকটি সরাইয়া রাখিল। সে মনে মনে বলিল, "এ উপায়ে মুক্তিলাভ করিবার এখনও যথেষ্ট সময় আছে।"

সে যে দিকে চক্ষু ফিরায়—দেখে, কেবল আকাশের অনন্ত নীলিমা ও মরুভূমির সীমাহীন ধূসরতা। উদাস মনে এই বিরাট দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সে যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে স্বদেশের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। তাহার গতজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাগুলি ছায়াবাজীর চিত্ররাজীর ন্যায় তাহার স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গিগণের আকার অবয়ব পূর্ব্বদৃষ্ট সহরগুলির রাস্তা ঘাট ঘড়বাড়ী সমস্তই যেন তাহার চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইতে লাগিল—এমন কি পারিসের সুপরিচিত ড্রেণের গন্ধও যেন তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বহুমূল্য সৌগন্ধের ন্যায় প্রীতিপদ হইয়া উঠিল। উদ্দাম কল্পনাবশে—মরুসম্পৃক্ত উত্তপ্ত বায়ুস্তরসমূহের আলোড়ন তাহাকে তাহার জন্মভূমি প্রভেন্সের বন্ধুর প্রস্তরময় অধিত্যকার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। মরুমধ্যে মরীচিকাদর্শনে বিপদের সম্ভাবনা আছে জানিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণমানসে সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক টুকরা ছিন্ন কম্বল দেখিয়া সে সহজেই বুঝিতে পারিল যে, কিছুকাল পূর্ব্বে এই ভীষণ স্থানেও মনুষ্যসমাগম ঘটিয়াছিল। সে আরও দেখিল যে, অদূরবর্ত্তী কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে খর্জ্জুর ফলিয়াছে। মানুষের জীবনাশা সহজে নির্ব্বাপিত হইতে চাহে না। উপস্থিত খাদ্য দর্শনে সৈনিকেরও প্রাণরক্ষার বাঞ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, যদি কিছুকাল খর্জ্জুর প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনও ভ্রমণকারী আরবদলের সাক্ষাৎ পাইব অথবা আমাদিগের ফরাসী বাহিনী আরব-শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে কামানের শব্দে তাহাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া সহজেই সঙ্গিগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে পারিব।

এই আশায় তাহার দেহে যেন নূতন বলের সঞ্চার হইল। একটি বৃক্ষ হইতে সে কতকগুলি পক্ক খর্জ্জুর পাড়িয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, সে যেন অমৃত আস্বাদন করিতেছে। এরূপ সুস্বাদু ফল মনুষ্যের যত্ন ও আয়াস ব্যতিরেকে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না এই ধারণা তাহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছিল। অচিরাৎ উদ্ধারসম্ভাবনায় তাহার নিরাশাকাতর হৃদয় আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে পুনরায় পাহাড়ের শিরোদেশে আরোহণ করিল এবং দিবসের অবশিষ্টাংশ একটি ফলহীন খর্জ্জুর বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে অতিবাহিত করিল। এই বৃক্ষের ছায়াতেই সে গতকল্য দ্বিপ্রহরে বিশ্রামলাভ করিয়াছিল! পাহাড়ের নিকটে একটি ঝরণা ছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এইরূপ ঝরণাতেই রাত্রিকালে হিংস্র জন্তু জলপান করিতে আইসে। এক প্রকার অস্পষ্ট আত্মরক্ষার চেষ্টায় বশীভূত হইয়া সে নিজ বিশ্রামস্থানের প্রবেশমুখে কোনরূপ বৃতি বা বেষ্টন সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শ্বাপদভীতিগ্রস্ত যোদ্ধা প্রাণপণ চেষ্টায় সুদীর্ঘ খর্জ্জুর বৃক্ষটিকে কাটিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু তাহার কঠিন কাণ্ডদেশ বিদীর্ণ করিয়া বৃতিনির্ম্মাণোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিতে পারিল না। সন্ধ্যায়

প্রাক্কালে সেই শৈলশীর্ষস্থ বৃক্ষ সশব্দে ভূপতিত হইল। তাহার পতনধ্বনি সেই নিবিড় নিস্তব্ধতায় চতুর্দ্দিকে প্রতিশব্দিত হইয়া কেবল একটি অশুভ দীর্ঘশ্বাসবৎ শ্রুত হইতে লাগিল। শুনিয়া সৈনিক শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন কাহারও দৈববাণী তাহার ভাবী অমঙ্গল সূচিত করিতেছে। পিতৃপরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী পুত্র যেরূপ সুদীর্ঘকাল পিতার মৃত্যুশোকে ম্রিয়মাণ থাকিতে পারে না সেইরূপ সেও কাল্পনিক অনর্থপাৎচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উপস্থিত সুবিধা অসুবিধার কথা বিস্মৃত হইতে পারিল না। বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সে সময়ের সদ্ব্যবহারে নিযুক্ত হইল। ভাগ্যক্রমে কোনও পূর্ব্বপান্থপরিত্যক্ত একখণ্ড ছিন্ন মাদুর তাহার হস্তগত হইয়াছিল। সেই খর্জ্জুরপত্রসাহায্যে সেখানিকে শয়নোপযোগী করিয়া লইতে তাহার বহুক্ষণ বিলম্ব হইল না। শ্রম ও উত্তাপজনিত অবসাদে ক্লান্ত হইয়া রক্তপ্রস্তরময় পাহাড়ের আর্দ্র গুহাতলে শয়ন মাত্রই সে ঘুমাইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রিতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। কিছু ক্ষণ শ্রবণ করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, উহা কোনও বৃহৎকায় জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসধ্বনি। এরূপ প্রবল নিশ্বাসবায়ু মানবের ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইতে পারে না। একে ঘোর অন্ধকার; তাহাতে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ পাইবার সম্ভাবনা নাই; সে যেন নয়নের সমক্ষে নানারূপ বিভীষিকা দর্শন করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার রোমরাজী কণ্টকিত হইয়া উঠিল—তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। অন্ধকার ভেদ করিয়া সহসা অদূরে দুইটি ক্ষুদ্র পীতাভ জ্যোতির্ম্ময় গোলক তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, তাহারই নয়নের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া এই আলোকের সৃজন করিয়াছে কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যে তাহার চক্ষু অন্ধকারে অধিকতর অভ্যস্ত হইলে গুহাস্থিত বস্তু সমুদায় পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার শয্যা হইতে প্রায় দুই হস্ত দূরে কি একটা বৃহৎকায় জন্তু শুইয়া আছে। সেটা সিংহ ব্যাঘ্র কি তৃতীয় তাহা সে তখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। জন্তুটি কোন্ জাতীয় তাহা বুঝিতে না পারায় তাহার ভয় আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রাণিবিদ্যাবিষয়ে অজ্ঞতানিবন্ধন সে আপনার অবাধ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া একই প্রাণীতে বিভিন্ন জাতীয় হিংস্র জন্তুর শক্তি আরোপ করিতেছিল। সঙ্কীর্ণ গুহাপ্রান্তে আজ সে যে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল তাহা আর বলিবার নহে। সে একান্ত মনে কেবল সেই ভয়াবহ জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল; সর্ব্বদা ভয়, কখন উহা আক্রমণ করে। হস্তপদ নড়াইবে তাহার এরূপ সামর্থ্যও ছিল না। কি একটা বিকট গন্ধে সমস্ত গুহাটি ভরিয়া গিয়াছিল। সে গন্ধ শৃগাল খট্টাশ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় বন্য জন্তুর গন্ধ অপেক্ষা অনেক তীব্র। সে যে কোনও শ্বাপদের আবাসেই আশ্রয় লইয়াছে এক্ষণে সে বিষয়ে তাহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। ক্রমে অস্তগামী চন্দ্রের চক্রবালসমান্তরালবর্ত্তী কিরণমালায় সমস্ত গুহাটি আলোকিত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চিতাবাঘের গাত্রের কাল কাল ফোটাগুলি বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল।

সে আজ ইহারই গৃহে অতিথি! শার্দ্দূল গুহামুখসান্নিধ্যে একটি কুলুঙ্গীর ন্যায় স্থানে গৃহদ্বারপ্রান্তে শায়িত। সে পালিত কুক্কুরের ন্যায় কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া শুইয়াছিল। উহার মুখ সৈনিকের দিকেই ফিরান ছিল। সে একবার তাহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া পুনরায় মুদ্রিত করিল। পরিত্রাণের নানারূপ সম্ভব অসম্ভব উপায় যুবকের মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল, বন্দুকের গুলিতেই বাঘটিকে হত্যা করিবে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এত অল্প যে, তাহাতে ভালরূপ নিশানা করা চলে না। এরূপ অবস্থায় বন্দুক ছুড়িলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। আর যদি বন্দুকের শব্দে বাঘটি উঠিয়া বসে তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! ভয়ে তাহার হাত পা অসাড় হইয়া উঠিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে সে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের দুর দুর শব্দ শুনিতে পাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। পাছে এই ঘনস্পন্দনশব্দে বাঘটি জাগিয়া উঠিয়া তাহার উদ্দাম উদ্ধার কল্পনায় বাধা প্রদান করে এই কাল্পনিক ভয়ে সে আপনার ভীতি বিহ্বলতাকে শতবার ধিক্কার দিতেছিল। তাহার শ্বাপদ শত্রুটির প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে সে দুই একবার তরবারির আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যাঘ্রের স্থূল চর্ম্ম অসিভেদ্য হইবে কি না এই বিষয়ে সন্দিহান থাকায় সে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে নাই। পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ন্যায়যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াই তাহার নিকট শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু উষার ত্বরিত আগমনে তাহাকে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। এখন তাহার বাঘটিকে নিরীক্ষণ করিবার যথেষ্ট অবসর ঘটিল। সে দেখিল, উহার মুখ শোণিতাপ্লুত। দেখিয়া তাহার কতকটা ভরসা হইল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আজ ইহার অদৃষ্টে নিশ্চয়ই ভালরূপ আহার জুটিয়াছে। কল্য শয্যাত্যাগ করিতে করিতেই আর কিছু ইহার ক্ষুধাবোধ হইবে না। ব্যাঘ্রটি নরখাদক কি না—নরমাংসেই সে উদরপূর্ত্তি করিয়াছে কি না এই সকল নিরর্থক জল্পনা তাহার মনে স্থান পাইল না। ব্যাঘ্রটি স্ত্রীজাতীয়। তাহার উদরের ও দেহের পার্শ্বদেশের রজত-শুভ্র রোমরাজী চন্দ্রালোকে ঝলকিত হইতেছিল। কাল কাল ডোরাদাগগুলি মখমলের কঙ্কনের ন্যায় তাহার পদচতুষ্টয় বেষ্টন করিয়াছিল। তাহার দেহের ঊর্দ্ধাংশ কষিত কাঞ্চনের ন্যায় পীতাভ, তদুপরি পুষ্পাকৃতি চিহ্নগুলি বড়ই শোভা পাইতেছিল। তাহার গাত্রচর্ম্ম এরূপ কোমল ও মসৃণ যে, তাহার নিকট বহুমূল্য গালিচা প্রভৃতিও লজ্জা পায়। পদের ন্যায় তাহার লাঙ্গুলটিও কৃষ্ণবর্ণ ডোরাদাগে আবৃত। এরূপ নয়নাভিরাম দৈহিক সৌন্দর্য্য পূর্ণযৌবনা কামিনীতেও সম্ভবে না।

ভীষণ নখরসংযুক্ত পদদ্বয়ের উপর মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া ব্যাঘ্রসুন্দরী শয্যাশায়িত বিড়ালের ন্যায় সুন্দর ভঙ্গীতে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার ওষ্ঠের উপরিভাগে সূক্ষ্ম রৌপ্যসূত্রবৎ শুক্র কেশ তাহার বিড়ালের সহিত জ্ঞাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। বাঘটি খাঁচার ভিতর বদ্ধ থাকিলে সিপাহীপুঙ্গব উহার গঠনভঙ্গী ও বিচিত্র বর্ণসমাবেশ যথেষ্ট তারিফ করিতে পারিত বটে কিন্তু মুক্ত অবস্থায় এরূপ নৈকট্য তাহার নিকট বড় প্রীতিপ্রদ হইল না। প্রাণভয় সৌন্দর্য্যবোধের পরিপন্থী হইল। কয়েকজাতীয় সর্প

যেরূপ দৃষ্টি মাত্রেই পক্ষিগণকে ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে এই ঘুমন্ত ব্যাঘ্রীটিও যোদ্ধার বীরহৃদয়কে সেইরূপ অভিভূত করিয়াছিল। সে গোলাবর্ষণকারী কামানের সম্মুখেও নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু এ শ্রেণীর শত্রুর সমক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে একেবারেই 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যতের জন্য তাহার আর কিছুমাত্র শঙ্কা ছিল না। এই নৈরাশ্যপ্রবুদ্ধ সাহসে তাহার মানসিক অবসন্নতা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাই হউক শেষ পর্য্যন্ত যোদ্ধার ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। এইরূপে সে আপনাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করিয়া সকৌতূহলে তাহার ভাবী প্রাণহন্ত্রীর উত্থানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরে বাঘিনী সহসা চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিল, এবং দেহের জড়তা দূর করিবার জন্য সবেগে অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিল। তখনও সে একেবারে নিদ্রাবেশমুক্ত হয় নাই। আলস্যত্যাগকালে মুখব্যাদান করায় তাহার ভয়াবহ দন্তপংক্তি ও খরস্পর্শ জিহ্বা সৈনিকের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। ব্যাঘ্রী তাহার সুন্দর দেহলতাখানি রমণীসুলভ চাপল্যের সহিত লীলায়িত করিতেছে দেখিয়া সৈনিক মনে মনে বলিতে লাগিল, "ইহারও যে দেখি, পারিসবাসিনী নাগরিকাগণেরই মত ভাবভঙ্গী!" বিড়ালজাতীয় জন্তুরা স্বভাবতঃ বড়ই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় এবং ব্যাঘ্রীটিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে নাই। সে ইত্যবসরে তাহার মুখ ও পদাদি লেহন করিয়া গতরাত্রির রক্তচিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিতে নিযুক্ত ছিল এবং মধ্যে মধ্যে পদনখর দ্বারা তাহার মস্তকের রোমরাজী চিত্তাকর্ষক ভাবে বিন্যস্ত করিতেছিল। ফরাসী দেশবাসীগণের শৌর্য্য ও আমোদপ্রিয়তা লোকপ্রসিদ্ধ এবং এই বিপন্ন অবস্থাতেও যোদ্ধা তাহার স্বজাতিসুলভ সাহস ও প্রফুল্লতা একেবারে হারায় নাই। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে সে বড়ই কৌতুক অনুভব করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, "আচ্ছা, আপনার প্রসাধন শেষ হউক তাহার-পরেই না হয় স্বাগত সম্ভাষণাদি হইবে।" কথা কয়টি এরূপ কল্পিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যেন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে। এই উক্তি শেষ হইতে না হইতেই যুবা আরবগণের নিকট হইতে সংগৃহীত একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। চিতাটিও প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই মুখ ফিরাইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল

(ক্রমশঃ)

অদৃষ্ট-চক্র।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা ও আশঙ্কা

ধরণীধরের ছুটী ফুরাইলে তিনি আরও এক মাসের অবকাশ লইয়াছিলেন। বৈশাখের শেষভাগে তাহাও ফুরাইল। ধরণীধরের একবার মনে হইল, চাকরী হইতে অবসর লইবেন। কিন্তু তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, আর আট মাস চাকরী করিলেই তাঁহার মাসিক অবসর-বৃত্তির পরিমাণ কিছু অধিক হয়। তিনি স্থির করিলেন, এই আট মাস চাকরী করিয়া বাড়ী ফিরিবেন। তিনি দীর্ঘকাল কেবল হিসাব করিয়াছেন—চাকরীরও হিসাব করিয়াছেন, আপনিও হিসাব করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই হিসাবের বাহুল্য তাঁহার চিত্তের কোমলতা দূর করিতে পারে নাই। অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চায় তিনি যেমন হিসাবী হইয়াছিলেন—সাহিত্যালোচনায় তেমনই তাঁহার কল্পনা বিকশিত হইয়াছিল। এইবার বিদায়ের কথা মনে করিয়া ধরণীধরের মনে হইতে লাগিল—তিনি দিগন্তবিস্তৃত মরুমধ্যে যে পথে চলিতেছিলেন এত দিনে সে পথের শেষ দেখা যাইতেছে—মরুপারে স্নিগ্ধসলিলোদ্গারীনির্ঝরকলনাদ-মুখরিত—পুষ্পিতদ্রুমলতাশোভিত—জীবনকলরবধ্বনিত রম্য উপবন নয়ন-গোচর হইতেছে। তাঁহার মনে হইল—তিনি কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে অতৃপ্ত পারিবারিক সুখলাভ-তৃষ্ণার তৃপ্তি করিতে পারিবেন, পুত্রপুত্রবধূ লইয়া তিনি আবার সংসারী হইবেন। পরলোকগতা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া ধরণীধরের নয়ন অশ্রুময় হইয়া উঠিতে লাগিল।

যতীশচন্দ্রের বিবাহের পর ধরণীধর প্রায় দুই মাস গৃহে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পুত্রকে পত্নীর প্রেমে আকৃষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে তিনি নানা অছিলায় যতীশকে কয়বার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছিলেন ও সরোজাকেও কয়বার নিজগৃহে আনিয়াছিলেন।

নববিবাহিত যুবক যতীশচন্দ্রও যে পত্নীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়

নাই এমন নহে। যৌবন জীবনের বসন্তকাল। বসন্তে যেমন বিহগকণ্ঠে কলগান আপনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে—বৃক্ষলতায় ফুল আপনি ফুটিয়া উঠে—যৌবনে তেমনই হৃদয়ে প্রেম আপনি বিকশিত হয়। তখন প্রেম প্রেমাস্পদের সন্ধান করে, তরুণ তরুণীর আননে তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য দর্শন করে। এই প্রেমবিকাশকালে যতীশচন্দ্র যে সরোজাকে পাইয়া পরম পুলকিত হইয়াছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার কল্পনা স্নানের ঘাটে দৃষ্টা যে বালিকাকে নন্দনের সকল সৌন্দর্য্যে মণ্ডিতা করিয়া তুলিয়াছিল সে যে তাহাকে লাভ করিবে এ আশা সে করিতে পারে নাই; অথচ তাহার সেই আশাই সফল হইয়াছিল। তাহার মত সুখী কে?

ধরণীধর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে যতীশচন্দ্র কলিকাতায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত—একটা ছুতা পাইলেই সে তাহার সাহিত্যিক বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত—যাইবার সময় তাহার মুখে যেমন আনন্দদীপ্তি দেখা যাইত—প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহার মুখে তেমনই বিরক্তির অন্ধকার লক্ষিত হইত। তিনি লক্ষ্য করিলেন, যতীশচন্দ্রের সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সে যেন গৃহেই প্রবাসী ছিল; এমন গৃহে তাহার আকর্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল। আপনার ঘরখানি সাজাইতে—দ্রব্যাদি গুছাইতে তাহার উৎসাহ দেখা দিল। প্রেম সৌন্দর্য্যের সহচর। সে সুন্দর ভালবাসে। তাই হৃদয়ে প্রথম প্রণয়প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যতীশচন্দ্রের হৃদয়ে গৃহ সুন্দর করিয়া সৌন্দর্য্যপ্রতিমা পত্নীর উপযুক্ত মন্দিরে পরিণত করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ধরণীধর এ সব লক্ষণ লক্ষ্য করিতেন। তিনি লোকচরিত্রজ্ঞানাভিজ্ঞ—এই সকল লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তিনি আশার আনন্দে আশঙ্কার বেদনা দূর করিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সুখী হইলেন। কিন্তু তিনি একেবারে নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, পুত্র এখনও কেন্দ্রস্থ—স্থির হয় নাই; তাহার চঞ্চল চিত্ত এখন যে ভাবে পূর্ণ তাহা স্থায়ী না হইলে আশঙ্কা দূর হইবে না—হইতে পারে না। তবে তিনি আশা করিলেন, পুত্রের হৃদয়ে সেই ভাব স্থায়ী হইবে—প্রেমের প্রভাবে সে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হইতে অব্যাহতি পাইবে।

বাস্তবিক যতীশচন্দ্র এখন তাহার সাহিত্যিক বন্ধুসমাজে মিশিবার জন্য সময় সময় ব্যাকুল হইত। অমূল্যচরণের উদ্যোগে তরুণ সাহিত্যিকগণের

একটি সাপ্তাহিক বৈঠক বসিত। অধিবেশন প্রায়ই অমূল্যচরণের গৃহে হইত। যতীশচন্দ্র সে বৈঠকের একজন অতি উৎসাহী সভ্য ছিল। সে প্রায়ই বৈঠকে প্রবন্ধ পাঠ করিত। সে সকল প্রবন্ধ অমূল্যচরণের মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত। প্রতি রবিবারে বৈঠক বসিত। পিতা গৃহে থাকায় যতীশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু রবিবার আসিলেই সে তাহার পল্লীগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বন্ধু সমাজে যাইতে ব্যাকুল হইত। সে যে যশের মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়াছিল তাহা সে জনারণ্য কলিকাতায় সহজপ্রাপ্য মনে করিয়াছিল। তাই সে রবিবারে যখন আপনার পল্লীভবনে ক্ষুদ্র কক্ষে পালঙ্কে শয়ন করিয়া বাহিরে মধ্যাহ্নরবিকরতপ্তা প্রকৃতির মলিন মুখ দর্শন করিত—দেখিত, তাম্রাভ আকাশে মেঘ নাই—বহু উচ্চে শবান্বেষী শকুনিরা চক্রাকারে উড়িতেছে, আর চাতক কাতর কণ্ঠে জল ভিক্ষা করিতেছে; আর শুনিত, নিম্নে বৃক্ষশাখায় মলিনশ্রী পল্লবের অন্তরালে আসীন ঘুঘুর কাতর স্বর ভাসিয়া আসিতেছে—তখন সে কর্ম্মকোলাহলকলয়িত ধূলিধূসর কলিকাতার স্বপ্ন দেখিত। সে কল্পনানেত্রে কলিকাতার পরিচিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিত—কলিকাতার ধূলি—কলিকাতার আবর্জ্জনা—কলিকাতার দুর্গন্ধ যেন সে অনুভব করিত। সে ভাবিত, সেই কর্ম্মস্রোতে সে তরী ভাসাইয়াছে—সেই তরী তাহাকে তাহার উদ্দিষ্ট যশোমন্দিরে লইয়া যাইবে।

তাহার পর সে বন্ধুদিগের, বিশেষ অমূল্যচরণের, পত্র পাইত—

"তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতুরারে
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে॥"

বন্ধুরা তাহার অনুপস্থিতিহেতু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া পত্র লিখিত। সে বিদ্রূপ শাণিত; তাহার আঘাত উপভোগযোগ্য। বিশেষ অমূল্যচরণের পত্র সর্ব্বদাই সরস। অমূল্যচরণের ক্ষমতা দীর্ঘ বা সারবান রচনার উপযোগী ছিল না। কিন্তু ক্ষুদ্র রচনায়—পত্রলিখনে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সে কথোপকথনে যেমন ক্ষুদ্র রচনাতেও তেমনই সহজে রসসঞ্চার করিতে পারিত—সেসকল রচনা বিদ্রূপপরিহাসে সমুজ্জ্বল হইত। অমূল্যচরণের এই সকল পত্র যতীশকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। বিশেষ তাহার তরুণ হৃদয়ে অমূল্যচরণের যে প্রভাব পতিত হইয়াছিল তাহা দূর হয় নাই।

এইরূপ অবস্থায় যখন ধরণীধরের ছুটী ফুরাইয়া আসিল এবং তিনি কর্ম্মস্থলে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তখন যতীশচন্দ্রের পরীক্ষার ফল বাহির হইল। যতীশচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

এ সংবাদে যতীশচন্দ্র বিচলিত হইল না। সে জানিত, তাহার সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল না—কারণ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার পক্ষে অনুকূল নহে মনে করিয়া তাহাতে যথেষ্ট উপেক্ষা প্রদর্শনই করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে তাহার পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক অমূল্যচরণের চেষ্টায় এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই এই অসাফল্যে সে বিচলিত হইল না।

যতীশচন্দ্র বিচলিত হইল না বটে, কিন্তু ধরণীধর অত্যন্ত বিচলিত ও কাতর হইলেন। তিনি পুত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা অতি অল্প জানিয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাহার প্রধান কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন, পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিলে পুত্রের শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে সে তাহার সাহিত্যিক বন্ধু সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে। সেই বন্ধুদিগের নিকট হইতে দূরে যাইলে সে তাহাদিগকে যত ভুলিবে তাহার হৃদয়ে দাম্পত্য প্রেমের প্রভাব ততই প্রগাঢ় হইবে; আশঙ্কার কারণ ততই দূর হইবে। এই আশায় তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন। এখন আর সে আশার অবকাশ রহিল না। আর সঙ্গে আশঙ্কার ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

এ দিকে ছুটী ফুরাইয়াছে। আর বিলম্ব করিবার উপায় নাই। একবার তিনি ভাবিলেন, পুত্রকে আর পড়িতে দিবেন না, তিনি যে সঞ্চয় করিয়াছেন—তাহাতে তাহার দিনপাতে কষ্ট হইবে না। কিন্তু জ্ঞানপিপাসাতুর ধরণীধর সে চিন্তায় সুখ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন—পুত্রের জ্ঞানার্জ্জন অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে—চিত্তের প্রসারবৃদ্ধির জন্য। এ অবস্থায় সে কেন অধ্যয়ন বন্ধ করিবে?

ধরণীধরের ঠিকে ভুল হইল। তিনি যদি পুত্রকে আর বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠে নিযুক্ত না করিতেন—তবে সে পরম পুলকিত হইত। সে সাহিত্য-চর্চায় মন দিত—হয় ত সাফল্য লাভও করিতে পারিত। বিশেষ তিনি যদি নিকটে থাকিতেন ও বধূকে নিকটে রাখিতেন তবে তাঁহার স্নেহ-স্নিগ্ধ প্রভাবে ও পত্নীর প্রেমে সে ক্রমে গৃহকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া

লইত। তখন তাহার বন্ধুসমাজ তাহার জীবনের দূর পরিধিরেখার সামান্য বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

কিন্তু তাহা হইল না। তিনি পুত্রের পুনরায় বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠের ব্যবস্থা করিলেন; বুঝিলেন না, যে পাঠে তাহার প্রবৃত্তি নাই সে পাঠের জন্য গৃহ হইতে দূরে থাকিলে সে পাঠে মনোযোগ দিবে না, পরন্তু বন্ধুসমাজে মিশিবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে তাহার যে আকর্ষণ সৃষ্ট হইতেছিল তাহাও ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

হৃদয়ে আশা ও আশঙ্কা লইয়া ধরণীধর প্রবাসযাত্রা করিলেন।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

চরিত্র।

সংপ্রতি বিলাতের 'রেফারী' নামক বিখ্যাত পত্রে 'ভেনক' নাম স্বাক্ষর করিয়া জনৈক ব্যক্তি মানব-চরিত্র সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় লেখক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। ঐ সকল কথা হিন্দুর নিকট অপরিজ্ঞাত না হইলেও য়ুরোপীয়দিগের নিকট নূতন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে লেখকের উক্তির সারমর্ম্ম ও তৎসহ আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত করিলাম। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, লেখক তাঁহার সন্দর্ভে দৃষ্টান্তস্বরূপ য়ুরোপের অনেক রাজনীতিক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা আমাদের সঙ্কলনে সেই প্রসঙ্গ যথাসম্ভব পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

লেখক তাঁহার সন্দর্ভের মুখবন্ধেই লিখিয়াছেন, মানুষের মনের যে গুণ ও প্রকৃতি চরিত্র নামে অভিহিত, তাহার শক্তি অসাধারণ। উহা পার্থিব ব্যাপারে যেরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই করে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি বহুবার প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, উহার মনে প্রবল ঘৃণার উদ্ভবও সম্ভবে, কিন্তু তাহার প্রণয় স্থায়ী হয় না, তাহার ঘৃণা মন্দ ইচ্ছায় পরিণত হইয়া থাকে। যে হেতু রাজ্যের অধিবাসী নরনারীর যোগ্যতার উপরই দেশের যোগ্যতা নির্ভর করে, সেই জন্য যাহাতে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি বা অবনতি ঘটে—তাহার আলোচনায় মানব জাতির স্বার্থ আছে।

আত্মনির্ভরতা ও চরিত্র।

স্বর্গীয় ডাক্তার স্মাইল্‌স্ আত্মনির্ভরতাকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া মধ্য-শ্রেণীর জনসমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা জনসমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অনেক শুভেচ্ছাপ্রণোদিত মানবের অবিবেচনা হইতে উদ্ভূত। যে আত্মনির্ভরতা মধ্য-শ্রেণীর জনসমাজের আদর্শ, তাহা নিম্ন শ্রেণীর জন্তুর ও পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী লেখকদিগেরও আদর্শ। সামান্য কুক্কুর বৃশ্চিক প্রভৃতিও আত্মনির্ভর করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত

আত্মনির্ভরতা ভিন্ন সমাজের সম্ভারকার্য সামাজিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। যেরূপ গ্রন্থই প্রণীত হউক না কেন,—যেরূপ বিধি বিধিগ্রন্থে স্থানলাভ করুক না কেন,—মানব-প্রকৃতি আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে—সে সীমা উহা কিছুতেই লঙ্ঘন করিবে না। যিনি যাহাই বলুন না কেন নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও অবিচলিত সাহস পুরুষজাতির এবং পবিত্রতা ও নম্রতা নারীজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজে বিক্ষোভ উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিক্ষোভ মানব-চরিত্র-বিপর্য্যয়-জনিত নহে,—সমাজের ভারকেন্দ্র-বিপর্য্যয়সম্ভূত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ এক পার্শ্বে অবনত তরণীর ন্যায় কালসাগরে ভাসিতেছে,—হয় ইহা স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে, নহে ত একেবারে উল্টাইয়া পড়িবে।

চাঞ্চল্যের কারণ।

ডাক্তার স্মাইল্‌স্ যে অর্থে 'আত্মনির্ভরতা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই অর্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় যে, সাধারণ মানব-সমাজের আত্মনির্ভর করিবার অভিলাষ নাই, সেইজন্য তাহারা নির্ব্বেদগ্রস্ত হইতেছে। ইদানীং জনসমাজ সকল বিষয়েই সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে। যে সময়ে মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবে সেই সময় সরকার ইহাদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবার জন্য বিনামূল্যে ধাত্রী যোগাইবেন আর আমরণকাল ইহারা ইহাদের বেতন-নির্দ্দেশ, শ্রমের সময়হ্রাস, প্রভৃতি ব্যাপারে ভোট দিয়া জীবন অতিবাহিত করতঃ যখন দেহত্যাগ করিবে তখন সরকারেরই ব্যয়ে ইহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হইবে, ইহাই ইদানীন্তন জনসাধারণের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া যে সমাজ স্থায়িত্ব-লাভের কামনা করে সেই সমাজ আত্মনির্ভরতা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবে এ সত্য বিপর্য্যস্ত হয় না।

বর্ত্তমান সময় চরিত্রগঠনের উপযুক্ত নহে। এ যুগে সরকারী বিধিই এখন মানবজাতির উন্নতির উপায় বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত। চরিত্রবল হইতে যে সমস্ত মঙ্গলের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহার জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া এখন 'ফ্যাসান' হইয়া পড়িয়াছে। এই মত লোকের মনে এতদূর দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে যে, সামান্য গ্রন্থপ্রচারদ্বারা উহার খণ্ডন সম্ভবে না।

কালের প্রভাব।

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, চরিত্রবলই সকল মানবীয় ব্যাপারে অন্তর্নিহিত শক্তি। বিশেষতঃ ইহারই উপর গবর্ণমেন্টের শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। উদাহরণস্বরূপ ঋণের কথা বলা যাইতে পারে। যাহারা জাতীয় ঋণের কুশীদপ্রদাতা তাহাদের চরিত্র বলই ঐ ঋণের জামীন স্বরূপ। ভোক্তাদাতৃগণ ইচ্ছা করিলে সকল সময়েই ঋণ অস্বীকার করিতে পারে; এক ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই ইদানীং জাতীয় ঋণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়াছে; তাহার কারণ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রভাবে ও স্বাধীনভাবে ঋণ অস্বীকার করিয়া তাহার ফলে ঠেকিয়া বুঝিয়াছে যে, বাক্যরক্ষা, ও প্রতিশ্রুতি-পালন, বাক্যলঙ্ঘন ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ অপেক্ষা পরিণামে অধিক মঙ্গলজনক। বর্ত্তমান যুগে যে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক ব্যাপার উন্নত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই আহ্লাদের কথা। চরিত্রের উপর লোকমতের প্রভাবের ফল পরিদৃশ্যমান।

অত্যন্ত কুচরিত্র লোকও নীরবে সুচরিত্র লোকের প্রশংসা করিয়া থাকে—নীরবে করিয়া থাকে কিন্তু প্রশংসা ত করে।

য়ুরোপে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই শোচনীয়। শ্রমজীবিগণ তাহাদের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা যে পরিমাণ সময় কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইতেছে, সেই জন্ত এই বিক্ষোভের আবির্ভাব। এখন লোকতন্ত্রী শ্রমজীবীদিগের সাম্প্রদায়িক জীবনের শৈশব অবস্থা। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কেবলমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্পত্তি হাতে পাইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, নব্য শ্রমজীবিগণের এখন সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তাহারা এখনও চরিত্রের মূল্য বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। অনভিজ্ঞতা নিবন্ধনই তাহারা প্রভুদিগের ও সমাজের নিকট প্রতিশ্রুতিপালনে অসম্মত হইয়া উঠিতেছে। এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ফলে তাহারাই যে পরিণামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চরিত্রহীনতার প্রভাব।

ক্ষমতাপ্রিয়তা, খ্যাতিলিপ্সা, স্ত্রীজাতির প্রতি প্রেম ও অর্থলালসা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত মানবকে কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মব্যবস্থা, নৌবিভাগ ও শাসনবিভাগ কোন কোন বিষয়ে মানবের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে, আবার কোন কোন বিষয়ে ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধনও করিয়া থাকে। লোকমতমূলক রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিকতা ধর্ম্মে ভক্তি, রাষ্ট্রে আনুরক্তি ও পরিজনে আসক্তি প্রভৃতির পরিপন্থী। এখন লোক স্বার্থরক্ষার জন্যই সামাজিক বন্ধনে সংহত। বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের অনুশাসনে চরিত্র-সংগঠনের ব্যবস্থা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। এখন সমাজে যেরূপ লুকাচুরী ও স্বার্থপরতার আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে ড্রেক, ফরবিশার, গর্ডন, ওয়ারেণ হেস্‌টিংস ও রোড্‌সের ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাব অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। দলাদলি চরিত্রসংগঠনের অনুকূল নহে।

অবস্থার প্রতিকূলতা।

যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে 'বিষম চরিত্র' বলিয়া বর্ণিত করি তখন সেই ব্যক্তিকে খোস খেয়ালের বশবর্ত্তী, অন্যান্য সাধারন ও সমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান যুগের মানবজীবন মানবের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিনষ্ট করিয়া দেয়। সেফিল্ডের জনৈক শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের নেতা কমন্স সভার উভয় দলের নেতাদিগের উপর গুরুতর দোষারোপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে যখন সেই অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে বলা হয়, তখন তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া আপনার চরিত্রদোষ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। মিঃ প্লিমসল যখন নতজানু হইয়া ডিস্রেলিকে বদ্ধমুষ্টি প্রদর্শন করিয়া সয়তান বলিয়াছিলেন,—তখন তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষই প্রকটিত হইয়াছিল; কারণ তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। তাঁহারই চেষ্টার ফলে জাহাজে অতিরিক্ত বোঝাই দিবার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। ইহার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যখন আবার অতিরিক্ত বোঝাই দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতিকে এইরূপ ভাবে অভিযুক্ত করিবার কেহই ছিল না। ইহাতেই সমুমিত হইতে

চরিত্রবল।

পারে যে, অন্যের স্বার্থরক্ষাকল্পে চরিত্রবল প্রদর্শন বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত বিরল। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞাপনের প্রভাবে আত্মশক্তি জাহির করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা আইন কানুন বিধি নিষেধ প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের চরিত্রের উপরই উহার সাফল্য নির্ভর করে।

চরিত্রের লক্ষণ।

চরিত্র বলিলে কেবল শিষ্ট ব্যবহার বুঝায় না। অশিষ্ট ব্যবহারের মধ্যেও কোন কোন লোকের চরিত্রবল আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। টিটানিক জাহাজের পঞ্চম কর্ম্মচারী বোর্ড অভ ডিরেক্টরের সভাপতি মহাশয়কে যখন কর্কশভাবে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনি শিষ্টাচারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রবল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। য়্যাড্-মিরাল্ মাহান্, এবং মার্কিণের সংবাদপত্র সকল যে সময়ে নির্লজ্জের ন্যায় মিঃ ইস্মেকে অকারণ আক্রমণ করিয়াছিল তখন তিনি জানিতেন যে, সেই ভয়ানক সময়ে (যে সময়ে টিটানিক জাহাজ সাগরজলে নিমজ্জিত হইতেছিল) তিনি যথাসম্ভব তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। মিষ্টার ইস্মে এই সকল নির্য্যাতন ও পরুষ ব্যবহার যে ভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি একজন চরিত্রবান্ ব্যক্তি। লেখক যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহার আচরণে শিষ্টাচার অপেক্ষাও অধিক কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সময়ে ভারত-সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে তিনি জনৈক ফকিরকে তাঁহার মঙ্গলকামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন; ফকির সম্রাটের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ সম্রাট সেইজন্য ফকিরকে তিন দিন ধরিয়া একটি প্রকাণ্ড কটাহে সিদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। সিদ্ধ করিবার জন্য ফুটন্ত জলপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত হইলে ফকির সম্রাটকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, তিনদিনের মধ্যে সম্রাটের মৃত্যু হইবে। অভিসম্পাত প্রদানের তিন দিন পরে সম্রাট হুমায়ুন পুরাণো কুইলাপল্লীস্থ সের-মণ্ডল প্রাসাদের সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। সেই পতনেই তাঁহার প্রাণান্ত হয়। এই ফকিরকে যখন সিদ্ধ করা হইতেছিল, তখন তিনি যে অভিসম্পাত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

লেখক ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন। চরিত্রহীন ব্যক্তিকে তাঁহার বন্ধুগণ বিশ্বাস করেন না, চরিত্রবান্ শত্রুও সকলের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া থাকেন। বুয়ারদিগের সহিত ইংরাজজাতির যুদ্ধ বাধিলে ধনাঢ্য বুয়ারগণ ইংরেজের ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার জন্য টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেশের ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে নাই, ওলন্দাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ এবং আমেরিকান্ ব্যাঙ্ক-গুলিকেও বিশ্বাস করেন নাই, ঐ সময়ে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণের বিশ্বাসভাজন ছিল। লেখক লিখিয়াছেন, সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই যে চরিত্রবান্ হয়েন, এ কথা আমি কখনও বলি নাই, বলিবও না।

লেখক মহাশয় তাঁহার সন্দর্ভে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতাই সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র, আত্মশক্তিকে যাঁহারা উচ্চাসন প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, সুগঠিত চরিত্রের উপরই আত্মশক্তির পবিত্র বেদী প্রতিষ্ঠিত। যাহার চরিত্র গঠিত হয় নাই, কর্ত্তব্যের কঠোর পরীক্ষাক্ষেত্রে সে কখনই আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয় না। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণ 'চরিত্রগঠনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য' ইহা অবগত ছিলেন। চরিত্র সুগঠিত ও সম্যক বিকশিত হইয়াছে, ইহা দেখিলেই গুরু তাঁহার সমস্ত শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিতেন। চরিত্রের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন, এ পর্য্যন্ত কোন মহাত্মা চরিত্রের সংজ্ঞানির্দ্দেশে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই;তাঁহারা ইহার কয়েকটি লক্ষণমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বালক ক্যাসাবিয়াঙ্কা পিতার আদেশে দহ্যমান্ তরীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান, পিতার আদেশ ব্যতীত সে স্থান-পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রজ্জ্বলিত তরণীর প্রদীপ্ত পাবকশিখা তাহার দেহকে ভস্মীভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বালক পিতার আদেশে সেই স্থানে অচল ও অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সকলেই বালকের সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু বালকের সেই সাহস সুগঠিত চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া সেই ভীষণ পরীক্ষাক্ষেত্রেও তাহা অবিচলিত ছিল। ক্ষেত্র হইতে বৃষ্টির জল যাহাতে বাহির হইয়া না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য গুরু শিষ্যকে ধারা-বর্ষ দুর্দ্দিনে ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। শিষ্য ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিল যে, ক্ষেত্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল প্রবল বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। শিষ্য মৃত্তিকাদ্বারা বাঁধ বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না; অবশেষে অনন্যোপায় শিষ্য সেই ভগ্ন বাঁধের উপর স্বয়ং পতিত হইয়া জলের গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। গুরু ক্ষেত্রে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন, শিষ্যের চরিত্র সুগঠিত হইয়াছে; তাই তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার সমস্ত বিদ্যা অধীত হইয়াছে, তুমি এখন সংসারে প্রবেশ করিয়া সাংসারিক কার্য্য-পালনে যোগ্যতালাভ করিয়াছ।" গুরুদক্ষিণা প্রদানে প্রতিশ্রুত একলব্যের নিকট যখন দ্রোণাচার্য্য তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন একলব্য সহাস্য বদনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া গুরুর পাদপদ্মে প্রদান করিলে গুরু দ্রোণাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরোক্ষ শিষ্য একলব্যের চরিত্র বাস্তবিকই সুগঠিত হইয়াছে। রাজপুতদিগের চরিত্র এইরূপ সুগঠিত হইত বলিয়াই তাঁহারা অতীব বিস্ময়জনক কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন। ইতিহাস-বিখ্যাত দণ্ডাচার্য্য অসাধারণ চরিত্রবলেই পৃথ্বীবিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের নিকট পরাজিত হইয়াও চরিত্রবলে আলেকজাণ্ডারের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংসারের সকল কার্য্যে সকল অবস্থাতেই চরিত্র-বলের প্রয়োজন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে জাতির চরিত্র সুগঠিত, চরিত্রবল সম্যক বিকশিত, সে জাতি সমস্ত সভ্যজগতের বিস্ময়োৎ-পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মপ্রাণ মহানুভব কুষ্ঠরোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ

করিয়া স্বয়ং কুষ্ঠরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণ চরিত্র তাহাকে সিজার, হানিবল, আলেকজাণ্ডার, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি বিশ্ববিজয়ী শূরগণ অপেক্ষা উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমাদের দেশে চরিত্রগঠনের দিকে একেবারেই দৃষ্টি প্রদত্ত হয় না, সেই জন্য আমরা দিন দিন চরিত্রহীন হইয়া পাড়তেছি। এই চরিত্রহীনতাই আমাদের অধোগতির একমাত্র কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, সেবাব্রতের উদযাপনে, বর্ত্তমানকে স্বদেশহিতৈষণা প্রদর্শনে আমরা যে অসাফল্যের কলঙ্ক অঙ্গে মাখিতেছি চরিত্রহীনতাই তাহার প্রধান কারণ; সুতরাং আমাদের দেশে চরিত্রগঠনের দিকে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। যে'দেশে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লোকের চরিত্র গঠিত হইত, যে দেশের লোক একদিন চরিত্রবলে সমস্ত মানবজাতির শীর্ষস্থান মণ্ডিত করিয়াছিলেন সেই দেশের লোক চরিত্রহীনতার জন্য পদে পদে কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্ট হইতেছে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যদি কখনও ভারতবাসীর চরিত্রগঠনের সুব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এই জাতি আবার ইহার প্রণষ্ট গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। নতুবা এ অধঃপতিত জাতির নিস্তারের আর উপায় নাই।

কোথা যাও হে তপন?

(রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী-পর্য্যটন-যাত্রার উপলক্ষে
এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে।)

চালিয়া অপূর্ব্ব অসংখ্য প্রপাত,
দিনান্তে লুকা'লে দিবসের নাথ,
ধরা হয়—ভাঙ্গি কুন্তলের বাঁধ—
মুক্তকেশী মহাকালী
হে রবীন্দ্র! ঢালি' অযুত তরঙ্গ,
চলিলে প্রবাসে আঁধারিয়া বঙ্গ,
হের দেখ, দেব! জননী উৎসঙ্গ
তোমা বিনা আজি খালি।

২

হায় এ তিমিরে নাহি তারা শশী
চারি ধারে শুধু সুচীভেদ্য মসী
ঝলকি' নয়ন চমকিছে অসি
অসভ্য দৈত্যের করে!
চারিধারে আজি আঁধার জলদ
গরজে গম্ভীরে! গর্জ্জে যেন নদ
পড়িয়া সমুদ্রে! কালিয়ার হ্রদ
যেন কালিন্দীর সরে।

৩

নহে এ রজনী নয়ন-আনন্দা

ফোটে না তিমিরে দিব্য নিশিগন্ধা,

প্রকৃতি দুলালী শেফালীও বন্ধ্যা

অপরূপ অমানিশা !

কেবলি হেথায় জম্বুক-চীৎকার,

পেচকের রব শুনি বার বার,

আলেয়ার হাসি বাড়ায় আঁধার

পথিক হারায় দিশা।

৪

ফোটে না কুমুদী,—কোথায় কৌমুদী ?

কেনিল আঁধার উঠিছে বুদ্‌বুদি !

অন্তরে নয়ন রাখিয়াছি রুধি'

মুখোসের আবরণ।

এ দীর্ঘ যামিনী কেমনে পোহা'বে ?

জোনাকীর পাঁতি আলো কি বিলা'বে ?

ঘরে নাহি বাতি, কি মেঘান্ধ রাতি।

কোথা যাও হে তপন !

৫

কি বলিব দেব ! সকলি মেঠিক !

এযে ঝুটা চুনি পান্না অলীক !

এ বক্ষে নাহি একটি মাণিক,

নাহি নাহি গৃহমণি !

শিরে ওই জ্বলে—ও নহে রতন ;

মহাদেব ভালে চাঁদের কিরণ

ও নহে ও নহে। বিকট-বদন

বিষধর ও যে ফণী !

৬

আপন চরণ-শবদে আপনি

চমকিয়া উঠি ! ঝিল্লি রণরণি

চারিধারে শুনি ! বঙ্গ গৃহমণি

কোথা যাও দিনমণি ?

তুমি ঢালিয়াছ অযুত কিরণ

সত্য ও ধর্ম্মের ! কোন্ সে রতন

তব প্রভারাশি করেছে গ্রহণ

কোন্ সূর্য্যকান্ত মণি ?

৭

তুমি এনেছিলে হাস্যময়ী উষা
উজ্জ্বল আলোক, কুসুমের ভূষা,
মোরা চক্ষু বুজি' করেছি শুশ্রূষা
আঁধারের দিনমানে।
নিবিড় বসনে করেছি বন্ধন
গান্ধারীর মত মোরা দু'নয়ন ;
ঠেলেছি চরণে হীরক রতন,
না চাহিয়া তব পানে !

৮

অভিমানে খেদে তাই কি চলিলে
বঙ্গ পরিহরি ? আঁধার আসিলে
তবে নরনারী বুঝ গো নিখিলে
রবির কি প্রয়োজন !
এখন বুঝেছি মর্য্যাদা তোমার
ওহে দিনমণি ! কি ঘোর আঁধার !
কোথা গেলে দেব ! আলোকসম্ভার
আন, আন, হে তপন।

৯

ওহে গুরুদেব, মানি তব শিক্ষা
ওহে ঋষিরাজ, জানি এই দীক্ষা
অপূর্ব্ব সুন্দর ! করিব প্রতীক্ষা
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের তরে।
লোহিতে রঞ্জিয়া পূরব গগন,
নব মহিমায় এস গো তপন,
প্রতিভা-উষার হেরিয়া বদন
কমল ফুটুক সরে।

১০

ক্ষম অপরাধ ; এ আঁধার আর
ভাল নাহি লাগে, বিকট চীৎকার
ওই শোনো দেব, করে বার বার
অসত্যের সেনাদল।
কিরণে ভাস্বর এস দিনকর
নবীন সৌন্দর্য্যে এস হে সুন্দর !
ছাড়ি ছদ্মবেশ এবার পূজিব
তোমার ও দীপ্তি, কিরণে রঞ্জিব
হৃদয়ের শতদল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পুরাতন প্রসঙ্গ।
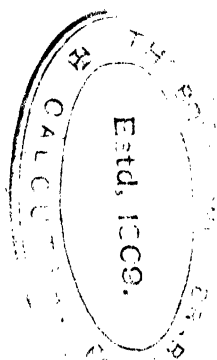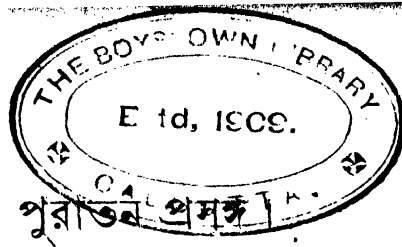
(১২)

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আবার তাঁহার পূর্ব্ব-স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "দ্বারি বাবুর মৃত্যুর অনেক দিন পরে তালতলায় নীলমণি কুমারের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি Positivist Club স্থাপিত হয়। সে সময়ে কয়েকজন ইংরাজ Positivist আমাদের দেশে ছিলেন; সিভিলিয়ন গেডিঙ্গ (Gedes I. C. S) খুব পণ্ডিত ছিলেন, বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে কায করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সহিত positivism সম্বন্ধে আমার আলাপ হইয়াছিল কি না স্মরণ হয় না। কটন, বেভরিজ, হ্যাগার্ড এবং আরও ২১ জন ছোকরা সিভিলিয়ন positivfst বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেই ছোকরা সিভিলিয়ন দুইজন বিশেষ কোনও অপকর্ম্ম করায় সর্ব্বিস্ হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। ইংরাজরা আমাদের ক্লবে আসিতেন না। বাঙ্গালী সভাদিগের মধ্যে ছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) ছোট আদালতের জজ K. M. Chatterjee, হাইকোর্টের অনুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, আমার ছাত্র নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার।

"ইহারা সকলেই যে পুরা কোম্‌তের শিষ্য ছিলেন তাহা বলা যায় না; কিন্তু Humanityর কার্য্যে জীবনকে পর্য্যবসিত করা আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যকর্ম্ম এই মতটি সকলেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পূর্ণ কোম্‌তের মতাবলম্বী ছিলেন। শেষাশেষি তাঁহার ঝোঁক হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত কোম্‌তের মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক। এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি Humanityর নাম দিতে চাহিয়াছিলেন, 'নারায়ণী'। এতদ্ব্যতীত কোম্‌তের অভিপ্রায় ছিল যে, Humanityর মূর্ত্তি যিশু খৃষ্টের জননী Madonnaর প্রতিকৃতির অনুরূপ করিতে হইবে। ম্যাডোনা যেন একটি দুগ্ধপোষ্য বালক ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাই ভবিষ্যতে visible representation of Humanity বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু যোগেন্দ্র বলিতেন যে, ঘাগ্‌রাপরা মূর্ত্তি আমাদের দেশের লোকের ভাল লাগিবে না।

সেই জন্য তিনি নারায়ণীর একটি ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা ও কপালে সিন্দুর দেওয়া নারী একটি শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন। * এতৎব্যতীত যোগেন্দ্র শেষাশেষি কোম্‌ৎকে ঋষি নাম দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার একটু বাদানুবাদও হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, অমরকোষে লিখিতেছে, ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ অর্থাৎ ঋষিরা সত্যভাষী; ইহার অর্থ সাধারণ সত্যবাদী নহে, ইহার অর্থ বাক্‌সিদ্ধ; যে ব্যক্তির এমন ক্ষমতা আছে যে, যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে, যেমন শাপ দেওয়া ও বর দেওয়া, তাঁহারাই প্রকৃত ঋষিপদবাচ্য। ঋষি শব্দের প্রাথমিক অর্থ যে এই প্রকার সঙ্কীর্ণ (limited) তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যোগেন্দ্রের সহিত বাদানুবাদ প্রসঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম আমার মনে এই অর্থের স্ফূর্ত্তি হইল। এ কথা আমি যোগেন্দ্রকে জানাইয়াছিলাম: এবং সেই নিমিত্ত কোম্‌ৎকে ঋষি নাম দেওয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। যোগেন্দ্র কিন্তু আমার এই পরাঙ্মুখতাদর্শনে কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যোগেন্দ্র কোম্‌তের ধর্ম্মপ্রণালীর যে হিন্দুয়ানি সংস্করণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা আমি বিশেষ পছন্দ করিতে পারি নাই। কটন প্রভৃতি ইংরাজ positivistরাও যোগেন্দ্রের নারায়ণী-মূর্ত্তির বড় একটা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। উক্তপ্রকার প্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া যোগেন্দ্র আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জবাকুসুমসঙ্কাশং প্রভৃতি সূর্য্যের স্তব পর্য্যন্ত positivism ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সমস্ত উদ্যম দেখিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম, পাছে জিনিষটা বিবেচক লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ইহার পর অল্পকালমধ্যেই যোগেন্দ্র লোকলীলা সম্বরণ করিলেন: সুতরাং এই সকল উদ্যমও বন্ধ হইয়া গেল।

"যোগেন্দ্রের মৃত্যু হইতেই এ দেশে positivismএর আর কেহ পাণ্ডা রহিল না। এখন ত ইহা একপ্রকার নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছে! যদিও অবিদিত ভাবে কোনও কোনও ব্যক্তির ইহার দিকে ঝোঁক থাকে তাহার প্রকাশ নাই; পাঁচ জন একত্র হইয়া সমালোচনা করিবারও কোনও ব্যবস্থা নাই। ফলতঃ আমার বোধ হয় যে, এ দেশ এখনও কোম্‌তের

* যোগেন্দ্র বাবুর পুত্র এই চিত্রের কিছু পরিবর্ত্তন করাইয়া যে চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

ধর্ম্মের জন্য পরিপক্ক হয় নাই; কখনও যে হইবে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। যখন য়ুরোপেই উহা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হয় তখন এ দেশের কথা ত অনেক দূরে। কোম্‌তের উৎসাহী শিষ্যরা খুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন বটে যে, কালসহকারে তাঁহার ধর্ম্মের প্রাধান্য হইবেই হইবে, কিন্তু আমি সে ভরষা তত দূর করি না। এত বড় বড় লোককে হার্বার্ট স্পেন্সার ও মিলের এত গোঁড়া দেখিতে পাই যে, সেই স্রোত কোন্ দিক দিয়া বন্ধ হইবে তাহা ত কিছুই ঠাহরাইতে পারি না।

"তালতলায় আমাদের ক্লবের যে অধিবেশন হইত, তথায় কোম্‌তের কোনও এক গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ প্রথমে পাঠ করা হইত; পরে তৎসম্বন্ধে যাঁহার যাহা মন্তব্য উপস্থিত হইত তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। সভার অধিবেশন দুই একবার কে. এম. চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতেও হইয়াছিল। সেই সময়ে চ্যাটার্জ্জি এক একটি বক্তৃতা দিতেন। ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জি যিশু খৃষ্ট ও তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য যে জ্যোতিষশাস্ত্রের রূপান্তরবিশেষ এ ideaটি যে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কিন্তু বোধ হয় যেন কোনও না কোনও য়ুরোপীয় চিন্তয়িতা ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়া থাকিবেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের সাংঘাতিক বিরোধী এক প্রকার কতকগুলি মত সময়ে সময়ে য়ুরোপে দেখা দিয়াছে। দেখ, Strauss নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত Leben Jesu নামক গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব হইবামাত্র খৃষ্টানমণ্ডলী স্তম্ভিত—হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল গতেই খৃষ্টানরা এরূপ প্রক্রিয়া করিয়াছে যে, ঐ গ্রন্থখানি এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।' কোম্‌ৎও এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, যিশু খৃষ্ট খৃষ্টানধর্ম্মের নামমাত্র প্রবর্ত্তক; প্রকৃত প্রবর্ত্তক সেণ্ট্ পল। যেমন বুদ্ধের বিষয় তেমনই কোনও কোনও ব্যক্তি যিশু খৃষ্টের বিষয়ও সন্দেহ করেন যে, ঐ নামের কেহ কখনও ছিল কি না। কিন্তু এই সকল ধারণার বনিয়াদ কিছুই উপলব্ধ হয় না। হয় ত খৃষ্টানদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদ্বারা সে সকল জব্দ হইয়া গিয়াছে। মিল কিন্তু বলেন, Bless them that curse you, Love them that hate you. Do good to them that spitefully use you এ প্রকার কথা বলিবার লোক কল্পনার দ্বারা নির্ম্মিত হইবার নহে। সত্য সত্য তেমন মানুষ অবশ্যই জন্মিয়া থাকিবেন।

মিলের এই কথাটা অনেকাংশে মনে লাগে বটে; কারণ, কল্পনা যতই স্বাধীন হউক, তথাপি উহা সীমাবদ্ধ। এ দিকে প্রকৃতির ক্ষমতা এত অধিক যে সময়ে সময়ে এমন এক একটা সত্য ঘটনা ঘটিয়া উঠে যাহার নিকট কল্পনা অপদস্থ হইয়া যায়, যথা হানিবল নেপোলিয়ন, জোন অভ্ আর্ক্, শার্লট কের্দে।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আপনার কখনও positivism সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল?" তিনি বলিলেন, "না—না। তবে ঘটনাচক্রে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি কোম্‌তের শিষ্য। আমার দাদার মৃত্যু হইলে আমি যেন সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখিলাম। হৃদয়ের আবেগে একখানা খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ লম্বা চিঠি কোম্‌ৎকে পারিসের ঠিকানায় লিখিলাম, আমার নিজের ঠিকানা দিয়াছিলাম Care of Iswar Chandra Vidyasagar কোম্‌ৎ যে তখন জীবিত নাই তাহা জানিতাম না। চিঠিখানা dead letter আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগরের হাতে পড়িল। আমাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 'পারিস থেকে তোর একখানা চিঠি ফিরে এসেছে। তোর এ আবার কি পাগ্‌লামি?' বুঝিলাম, তিনি ঐ খোলা চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে পাগল ঠাহরাইয়াছেন। আমাকে তিনি কিসে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছেন এ কথা আমি তাঁহাকে একদিন অভিমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'আরে না, না, সে রকম পাগল নয়, তুই একটু বেশী romantic।'

"তুমি বোধ হয় জান না, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু তোৎলা ছিলেন, কেহ তাহা টের পাইত না। তোৎলার প্রধান ঔষধ, আস্তে কথা কহা। বিদ্যাসাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে, তিনি তোৎলা। সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি ত অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কিন্তু কখনও ক্লাস পড়ান নাই। একবার শুনিয়াছিলাম, তিনি উত্তরচরিত ও শকুন্তলা ক্লাসে পড়াইবেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা ঘটে নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃই তিনি ক্লাস পড়ান ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন তিনি চাকরী করিতেন তখন বোধ হয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক এক জন সিভিলিয়ন ছাত্র লইয়া বাঙ্গলা পড়াইতে হইত। কারণ, তিনি নিজেই গল্প করিয়া-

ছেন, তিনি বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল অংশ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্র তাঁহাকে সে বিষয়ে অভয় দান করেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। সিভিলিয়নরা তাহাই পাঠ করিত। এখনকার রীতি অনুসারে ঐ দুইখানি গ্রন্থ পছন্দ হইবার কথা নহে। সেই জন্যই বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থের মধ্যে একটি সন্দর্ভ লইয়া পূর্ব্বে খুব হাস্যপরিহাস চলিত। এই সন্দর্ভের মধ্যে লিখা আছে যে, বুদ্ধি চারি প্রকার,—বেগবেগা, বেগচিরা, চিরবেগা, চিরচিরা। বেগবেগার অর্থ যে শীঘ্র বুঝিতে পারে, অথচ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; বেগচিরা—শীঘ্র বুঝে অনেক দিন মনে রাখে; চিরবেগা—বুঝিতে দেরী হয় অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; চিরচিরা বুঝিতে দেরী হয়, কিন্তু অনেক কাল মনে থাকে। এই 'চিরচিরা' লইয়া লোক বিস্তর আমোদ করিত। যাহা হউক সে গ্রন্থ দুইখানি একেবারে লুপ্ত হওয়া ভাল নহে; কারণ, বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত রীতির পূর্ব্বে কি প্রকার রীতি প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ ডেঁপো পণ্ডিতদিগের মধ্যে, তাহার অতি সুন্দর নমুনা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ পড়াইবার সময় বিদ্যাসাগর বোধ হয় হাড়ে চটিয়া যাইতেন; বোধ হয় তাঁহার শয্যাকণ্টক বোধ হইত, তাই তিনি অত উৎসাহের সহিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'বেতাল পঁচিশি' নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কালখানি পাইয়াছিলেন; রক্ত, মাংস, চর্ম্ম ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। তাই বাঙ্গালায় অমন পরম সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

"১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মুর্শিদাবাদে যায়েন। আমি তখন, বোধ হয়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাসে পড়ি। রামকমল সেনের বাড়ীর উপরের এক হলের ভিতর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ক্লাস, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ক্লাস ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাস বসিত। ১৮৫০ হইতে মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কালঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক জোর করিয়া

বিচ্ছিন্ন করিলেন, সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে চাহি না। কালক্রমে যাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' গ্রন্থে এই মনোমালিন্যের কারণ সম্বন্ধে নিজে চুপ করিয়া গিয়াছেন, তখন যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইব না।

"তর্কালঙ্কারের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের লিখা মুক্তার মত ঝলমল করিত। লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লিখাপড়া কিছুই জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একবার Librarianএর নামে শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল, সে কবিতার আর কিছুই আমার এখন মনে নাই, কেবল 'লাইব্রেরিয়ান্ গরীয়ান্' এই দুইটি কথা যেন কাণে বাজিতেছে। পুনশ্চ,

তারাশঙ্কর শঙ্কর সদয়া
বিদ্যাসাগর সাগর কৃপয়া
বিদ্যামন্দির মধ্য বিরাজে
পুস্তকধক্ষ্যক লাইব্রেরিকাজে

'পুস্তকাধ্যক্ষ' লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না তাই কথাটা পরিবর্ত্তিত হইল। তারাশঙ্কর তথা বিদ্যাসাগর খুব আমোদ পাইয়াছিলেন।

"আবার রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়ো ঝাঁ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন;—

যঃ ঈশ্বরো নিম্নগতঃ করন্তি
সঃ ঈশ্বরো নিজালয়ং নয়ন্তি।

"লোকটির impudence আবার এত ছিল, যে পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতে কাটকুট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে 'সঙ্কর' খুড়ো ভাবিলেন দন্ত্য স ভুল; লিখিলেন, তালব্য শ, এবং আদর্শ পুঁথিতে স কাটিয়া শ করিয়া দিলেন।

"মদনমোহন চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বীটন মেমোরিয়ালের (Bethune memoriac) জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বীটনকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু কবে হইল ঠিক আমার

মনে পড়ে না ; কিন্তু বেশ মনে পড়ে, যে দিন বেথুন কলেজগৃহ খোলা হইল। সংস্কৃত কলেজে আমি তখন মাসিক আট টাকা বৃত্তি পাই। বিদ্যাসাগর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোদের scholarship থেকে এ মাসে দু' টাকা কেটে নিচ্চি, বীটন মেমোরিয়ালের জন্যে। কি বলিস ?' বিদ্যাসাগর যখন বলিলেন, তখন ব্যাপারটা কি বুঝি আর নাই বুঝি, তাঁহার কথার কি প্রতিবাদ করা চলে ?

"Law Member ও শিক্ষাসমিতির সভাপতির বীটন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন হলে পারিতোষিক দেওয়া হইত ; সেই সময়ে তিনি বক্তৃতা করিতেন। একবার আমি বিদ্যাভূষণের ক্লাসের পারিতোষিক লইতে টাউন হলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, daisএর উপর অনেক য়ুরোপীয় উপবিষ্ট। নিম্নে আলাহিদা আলাহিদা জায়গায় সংস্কৃত, হিন্দু, কৃষ্ণনগর, হুগলি, ও ঢাকা কলেজের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাদম্বরীর অনুবাদক তারাশঙ্কর ও আমার দাদা সংস্কৃত কলেজের front benchএ উপবিষ্ট। সভাপতি ছিলেন বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর Sir John Littler। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বীটন উপবিষ্ট। স্যার জন বেঁটে ছিলেন, পেটটি মোটা। বীটন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রসন্ন বাবুর মুখে শুনিয়াছি (কারণ, তখন তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতার রসগ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না,) বীটন সভাপতির দিকে ফিরিয়া 'Sir John'—বলিয়া সহসা পূরা নামটি উচ্চারণ না করিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রসন্ন বাবু বলেন যে, বেশ বুঝা গেল, ডেপুটি গবর্ণরের সেই খর্ব্বাকৃতি, বর্ত্তুলোদর মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া Sir John বলিতে গিয়া বীটনের মনে Sir John Falstaffএর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া লইয়া শুধু Sir দিয়া বক্তৃতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কলেজগুলি পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিল ; বক্তৃতায় ছেলেদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ পরস্পরের প্রতি এই রেষারেষির আবশ্যকতা আছে কি ? শিকারের সময় এক প্যাক কুক্কুর অগ্রসর হইয়া যদি খরগোসটাকে ধরিয়াই ফেলে, তাহা হইলে অন্য প্যাকগুলির বিশেষ লজ্জার কারণ কি ?

"বীটনের নাম করিতে যাইয়া কাপ্তেন রিচার্ডসনের নাম স্মৃতিপথে

উদিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমাকে কিছু বলিয়াছি; বীটন তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করেন, তাহাও বোধ হয় তোমাকে বলিয়াছি। চাকরী গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি অধ্যাপনা করিতেন, এক দিন একজন ভদ্রলোকে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন 'আপনি surrender at discretionএর ভুল অর্থ গতকল্য ক্লাসে বলিয়া দিয়াছেন, আপনি কি উহার প্রকৃত অর্থ জানেন না? কাপ্তেন উত্তর করিলেন—'I never surrendered at discretion and, therefore, it is possible I do not know what it exactly means'. কেন তাঁহার চাকরী গেল সে কথা তোমাকে প্রকাশ করিতে বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন শুনিতেছি, রাজ-নারায়ণ বাবু কাপ্তেনের চরিত্র-দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বীটন বক্তৃতায় কাহাকে উদ্দেশ করিয়া hoary libertine আখ্যা প্রদান করিয়া-ছিলেন তাহা জানিতে কাহারও বাঁকি ছিল না। কিন্তু তোমায় বলিয়াছি, কাপ্তেন surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন—There was a man who was little and he was beaten (বীটন) and there was a man who was littler (Sir John Littler), and he was * * *।' একজন Law Member লর্ড মেকলে কাপ্তেনকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর এক জন Law Member তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কামনা।

সাযুজ্য চাহি না, নাথ, শুধু দাসীরূপে
চরণ পূজিতে চাহি শুধু চুপে চুপে;
চাহি ভালবাসিবারে ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়া;
চাহি, প্রভো, সর্ব্ব জীবে তোমারে হেরিয়া
বিলাইতে সবাকারে স্নিগ্ধ অনাবিল
মৌন ভালবাসা। চাহি, হেরিতে নিখিল
ভাস্বর তোমার প্রেমে। হে জগৎস্বামি,
তুমি থাক প্রভু হ'য়ে দাসী থাকি আমি।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

মাতৃমূর্ত্তি

(ডাভিঞ্চি)

পাষাণের কথা।

(১২)

তাহার পরদিন মনুষ্যজাতির প্রতি ও সঙ্ঘের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানবকে কত ভালবাসি, মনুষ্য-সংসর্গ কত ভালবাসিতাম, আজীবন মানবকরস্পর্শে চালিত করিয়া আসিয়াছি, আজীবন যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছি তাহাও মানবের কৃপায়; স্মৃতিশক্তিহীন, চলচ্ছক্তিহীন জীবনে যতটুকু স্থান ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও মানবের জন্য। তাহাই নিশ্চল পাষাণের মানবের প্রতি আকর্ষণের হেতু ও তাহাই আমাদের মানবদর্শনলালসার মূল। মনুষ্যদর্শন করিবার জন্য উৎসুক চিত্তে বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি; যখন মনুষ্য-সংসর্গের পরিবর্ত্তে নিবিড়বনবেষ্টিত হইয়া অসংখ্য অগণিত বৎসর যাপন করিয়াছি তখনও জীবনের একমাত্র লালসা—একমাত্র উদ্দেশ্য—মানবসমাজের সংস্পর্শলাভ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। জীবনে মানবসংস্পর্শের প্রথম দিনে মানবের নগরোপকণ্ঠে আসিয়া যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, কত দিন তোমাকে বলিয়াছি, সেরূপ সৌন্দর্য্য আর দেখি নাই, আর কখনও দেখিবার আশা নাই। কিন্তু এক দিনে সেই মানবের প্রতি ও মানবসংস্পর্শের প্রতি এরূপ দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, এখনও তাহা প্রশমিত হয় নাই। মানবের প্রারম্ভ হইতে মানবকে দেখিতেছি, মানবকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, মানবকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, এখন ঘৃণা ও শ্রদ্ধা অতিক্রম করিয়া মানবকে দেখিতেছি; কিন্তু যশোধর্ম্ম দেবের স্তূপার্চ্চনার দিন মানবের যে রূপ দেখিয়াছি সে রূপ আর কখনও আমাদিগের গোচর হয় নাই। মানবের প্রারম্ভ দেখিয়াছি, বলবীর্য্যসম্পন্ন, দীর্ঘাবয়ব, সরলচিত্ত, আর তখন দেখিয়াছি বলহীন, ক্ষীণ, ক্ষুদ্রদেহ, ক্ষুদ্রচেতা কুটিলমতি মানব। তাহাদিগকে দেখিয়া মনে স্বতঃই ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, অধঃপতনের শেষ সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ নিমিষের জন্য আত্মরক্ষার চিন্তা করে নাই। তখন জগতে কোন প্রকার উত্তেজনাই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিত না। শাক্যের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তাহাদিগের নিকট সমান হইয়াছে; উন্নতির চেষ্টা বহুদিন শেষ হইয়াছে; তখন ধর্ম্মের নাম স্বার্থসাধন, সঙ্ঘের নাম কামাগার

ও বুদ্ধের নাম বিশ্বাসঘাতকতা ; তখন ব্রাহ্মণের ইজ্যার নাম অর্থশোষণ, অধ্যয়ণের নাম স্বার্থসাধন ও দানের নাম পরস্বাপহরণ হইয়াছে। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, নিঃশব্দে জগতকে জানিতে না দিয়া ধীমান ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন সরল ধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাদিগেরই বংশধরগণ স্বার্থসাধনের জন্য দৃঢ় ভিত্তি ক্ষয় করিয়া ভবিষ্যৎ বিনাশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ; দেখিতে পাইবে, এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নাই, ধীরে ধীরে মিথ্যার গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে, সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্ধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সহিত আর্য্যাবর্ত্তের কি দশা হইয়াছে? সত্য আবহমানকাল সত্যই রহিয়াছে, কখনও দীর্ঘকাল মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত থাকে নাই। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সদ্ধর্ম্মের ছায়ামাত্র বর্ত্তমান আছে, শাক্যরাজকুমারের সরল বিশ্বাসের ধর্ম্ম অতীতে বর্ত্তমান নাই, যাহা আছে তাহা কি সদ্ধর্ম্ম? তথাগতের মহাপরিনির্ব্বাণের পর যে সকল মহাস্থবির সেই সুসমাচার জগতে ঘোষিত করিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে কি সদ্ধর্ম্মের নামে প্রচলিত ছায়া চিনিতে পারিবেন? নিজমনে অন্বেষণ করিয়া দেখ, যাহাকে আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্ম বলিত তাহা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা আছে তাহা তোমরা চিনিতে পারিবে না। স্বেচ্ছাচারীর অদম্য কাম ও অসহ্য লালসা সদ্ধর্ম্মের সহিত দেশে ও বিদেশে যাহা মিশ্রিত করিয়াছে তাহাতে সদ্ধর্ম্মে সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য প্রবেশ করিয়াছে। যাহা সত্য তাহা সরল ও সহজবোধগম্য, এক সত্যের সাহায্যে অপরের সাহায্য লাভ করা যায়, তাহা স্থায়ী হয়। কিন্তু একবার যদি অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তদ্ব্যতীত আর পন্থা থাকে না ; একটি মিথ্যা কথা প্রমাণ করিতে হইলে যেমন শত শত মিথ্যা কথার অবতরণা করিতে হয়, সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত হইলে তেমনই অসত্যেরই প্রাদুর্ভাব হয়, সত্য দূরীভূত হইয়া যায়। চাহিয়া দেখ কি হইয়াছে, উত্তরমেরুপ্রান্তে চিরতুষারমণ্ডিত সমুদ্রকূলবাসী অসভ্য বর্ব্বরগণও সদ্ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের সদ্ধর্ম্ম কিরূপ? তাহাদিগের শ্রমণগণ দন্তহীন মৎস্যের পূজায় দিবস অতিবাহিত করিয়া থাকে ও সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া রজনীযাপন করে। দূরে যাও, মেরুবাসী মৎস্যভুক বামনগণও সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী, তাহাদিগেরও শ্রমণ আছে, তাহারা মৎস্যের আকাঙ্ক্ষায় সমুদ্রের পূজা করিয়া

থাকে, বহু শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্ম, বুদ্ধ বা সঙ্ঘের নাম শ্রবণ করে নাই। উত্তর-কুরুর সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তে যে সুসভ্য জাতি বাস করে তাহারও বৌদ্ধ; তাহাদের ভিক্ষু ও শ্রমণগণ কাষায় পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের শত শত বিহার ও সঙ্ঘারাম আছে; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিও, তাহাদিগের মধ্যে কয়জন গৌতমবুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াছে। তাহাদিগের ভিক্ষুগণ দারপরিগ্রহ করিয়া সঙ্ঘারামে গৃহস্থাশ্রম স্থাপিত করিয়াছে,হলকষণ বা বাণিজ্য তাহাদিগের নিকট দোষাবহ নহে। আর্য্যাবর্ত্তের নিকটে আগমন কর; চাহিয়া দেখ, আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তে কি হইতেছে! সদ্ধর্ম্ম আছে, বুদ্ধ আছে, কিন্তু সার বস্তুর অভাব। এক বুদ্ধের স্থানে চতুর্বিংশতি সহস্র বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে; ধ্যানীবুদ্ধ, মানসীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণপরিবৃত অন্তঃসারশূন্য গৌতম বুদ্ধের নাম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। শত শত শক্তিপরিবেষ্টিত বোধিসত্ত্বগণ সর্ব্বদাই বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়লালসাপরিতৃপ্তি ব্যতীত নির্ব্বাণলাভের উপায় নাই। বিত্তশালী সঙ্ঘারামসমূহে সুরার সহিত শক্তির উপাসনা ব্যতীত অপর কোন কথা শুনিতে পাইবে না। যে সুবর্ণভূমি হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই সুবর্ণভূমিতে সদ্ধর্ম্মের কি অবস্থা হইয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখ। সুবর্ণব্রীতিমণ্ডিত কাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতি দিন বসা-লিপ্ত অন্নসংস্থাপন করাই বৌদ্ধের একমাত্র কর্ম্ম! প্রব্রজ্যা গ্রহণের নাম এখনও বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহা নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। শিশুগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া প্রভাতে চীরধারণ করে ও সন্ধ্যাকালে তাহা দূরে নিক্ষেপ করে, ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিয়াছ? সদ্ধর্ম্মে যখন অব-নতির সূত্রপাত হইল, তখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘ উন্নতির কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন? তাঁহারা দেখিলেন, রাজশ্রীর আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মমতে কালানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তদনুকরণে তাঁহারাও তথাগতের সরল ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে শাক্য-রাজকুমারের সরল ধর্ম্মের সহজাত মাধুর্য্য নষ্ট হইল। যে আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া জনসমাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর ও বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তথাগতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিত তাহা আর রহিল না। তখন আকর্ষণ করিবার নূতন উপায় আবশ্যক হইল, সদ্ধর্ম্মে সরল বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বাহ্যাড়ম্বর সার হইল। বহুদিন হইতে বাহ্যাড়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ অভ্যস্ত, জনসমাজও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আড়ম্বর দেখিতে

অত্যন্ত। অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরে বৌদ্ধসঙ্ঘ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। বৌদ্ধসঙ্ঘের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল ও পদস্খলন আরব্ধ হইল। অবনতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া শান্তিময় মহাজিনের শান্তিময় ধর্ম্ম নিরীহ আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের রক্তস্রোতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে তাড়িত হইল। নিরীহ সদ্ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী জনসমূহের রক্তস্রোতে সদ্ধর্ম্মের নাম দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক উপত্যকা হইতে ধৌত হইল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদিগের ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া তাহারা অনন্তের শেষ পর্য্যন্ত দুর্জ্জেয় থাকিবে। কিন্তু যাহা কখনও হয় নাই তাহা তখনও হইল না। প্রসারবিহীন ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গিরিদুর্গ জিত হইয়াছে। সংস্কার দূর হইয়াছে, নাম বর্ত্তমান আছে ; সার অপহৃত হইয়াছে, ছায়া এখনও অপসৃত হয় নাই। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেছি ; দেখিতেছি, যাহা আছে তাহাও থাকিবে না ; কারণ, জগতে অসত্যের স্থান নাই।

যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাহার নাম যথেচ্ছাচার ও সুশৃঙ্খলার অভাব। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যাহারা এ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহারা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইবে। দশপুর হইতে সেনা আসিয়াছে। তাহাদিগের অধিনায়কবর্গ, অস্ত্রসস্ত্র, অনুচর, পার্শ্বচর প্রভৃতি সমস্তই উপস্থিত ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে সুশাসন বা সুশৃঙ্খলার একান্ত অভাব। সেনা আসিবার পূর্ব্বে বহুসহস্র পটমণ্ডপ আসিয়াছে ; কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবে শিবিরস্থাপনের আদেশ হয় নাই, সুতরাং শিবির স্থাপিত হয় নাই। দিবাবসানে শ্রান্ত সেনাদল আসিয়া যে স্থানে আশ্রয় দেখিল সেই স্থানেই অধিবাসিগণকে নিষ্কাশিত করিয়া তাহা অধিকার করিল। ভিক্ষু ও শ্রমণগণ আশ্রয়বিহীন হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন, কিন্তু সৈনিকগণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। রাত্রি অতিবাহিত হইলে পটমণ্ডপ স্থাপিত হইল, সেনাদল শিবিরে চলিয়া গেল, কুটীর ও গৃহসমূহের অধিবাসিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্রমে প্রাচীন স্তূপের বেষ্টনীর বহির্ভাগে কতকগুলি বিপণী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আহার্য্য, বস্ত্রাদি ও সুরা বিক্রীত হইতেছে। বিপণীর চতুঃপার্শ্বে সেনাদলের পার্শ্বচারিণীদিগের পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। বিপণী

হইতে কলসের পর কলস সুরা এই কুটীরসমূহমধ্যে আনীত হইতেছে ; কিন্তু বিক্রেতা সকলের নিকট মূল্য পাইতেছে না। পুরাতন পাষাণখণ্ডসমূহে নির্ম্মিত নূতন সঙ্ঘারামে ভিক্ষু ও শ্রমণগণের সহায়তা করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক বারাঙ্গনার আবির্ভাব হইয়াছে। ভিক্ষুগণ কাষায়ের পরিবর্ত্তে রক্ত-বর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। সঙ্ঘারামেও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ আকারের মৃণ্ময় কলস আনীত হইতেছে, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ সাধনার জন্য আবশ্যকানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের মধু আনয়ন করিতে অনুচরবর্গকে আদেশ প্রদান করিতেছেন। বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের কলসের মুখে পুষ্প বা ফলের আচ্ছাদন রহিয়াছে, কোন কলসের মুখে কদম্ব বা যবশীর্ষ, কোন কলসের মুখে প্রফুল্ল কমল বা মধুকপুষ্প, কাহারও মুখে আম্রশাখা এবং কাহারও মুখে বা পক্ক কদলী। রজনীসমাগমে মধুর প্রয়োজনের আধিক্য হইত, বরবর্ণিনী শক্তিগণের সাহায্যে সদ্ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কলস কলস মধু প্রতি রজনীতে যথাস্থানে প্রেরিত ও উপস্থিত হইত। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের নাম করিলেই হইত। সময়ে সময়ে তাহার আবশ্যকও হইত না, সঙ্ঘারাম-বাসী অনেকেই বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বনামে অভিহিত হইতেন। নিশীথে সঙ্ঘারাম হইতে নৃত্য ও গীতের শব্দ উত্থিত হইয়া প্রাচীন পাষাণসমূহের মনে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদিত করিত। কখনও কখনও মহাশক্তিগণ বুদ্ধবোধিসত্ত্বাদির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক-গণের আশ্রয় গ্রহণ করিত। তখন শক্তির অধিকারের জন্য সৈনিকে ও ভিক্ষুতে ভীষণ কলহ হইত ও সময়ে সময়ে সঙ্ঘারামবাসী ও শিবিরবাসি-গণের মধ্যে ক্ষুদ্র রণাভিনয়ও হইয়া যাইত ; সেনাদলের পার্শ্বচারিণীরাও যে সময়ে সময়ে সঙ্ঘারামে আশ্রয় লাভ না করিত তাহাও নহে। সদ্ধর্ম্মের এমনই মহিমা যে, সঙ্ঘারামমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারাও আচার-পরিবর্ত্তন করিয়া মহাশক্তিরূপ ধারণ করিত।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল, স্তূপ ও বর্ত্মসংস্কার, এবং মন্দিরাদি-নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে শুনিলাম, সম্রাট তীর্থদর্শনে আসিবেন ও তাঁহার সহিত নানা দিগ্দেশ হইতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও স্থবিরগণ আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের বাসস্থানসমূহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এক দিন বহু দূর হইতে বহু যানবাহন নূতন বুদ্ধ, নূতন বোধিসত্ত্ব ও শক্তিরূপিণী শত শত নারী বহন করিয়া স্তূপসন্নিধানে উপস্থিত হইল। ক্রমে স্তূপের চতুঃপার্শ্বে

ক্ষুদ্র নগর স্থাপিত হইল, শত শত বিপণীতে নগরোপকণ্ঠ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। প্রতি রজনীতে সম্প্রদায়ানুযায়ী সাধনার আনন্দধ্বনি বহু দূর হইতে শ্রুত হইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কখনও কোন গৃহস্থ নাগরিক স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে তীর্থদর্শনে আসিত না। একদিন সম্রাট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক সৈন্য আসিল, বহুকালপরে চীরধারী কয়েকজন ভিক্ষু সম্রাটের পার্শ্বচররূপে স্তূপসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের সহিত যে সমস্ত সেনা আসিয়াছিল তাহারা রণযুদ্ধে সুশিক্ষিত, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে নিয়ম বা শৃঙ্খলার বিশেষ অভাব ছিল না। সম্রাটের সহিত যে কয়জন চীরধারী ভিক্ষু আসিয়াছিলেন তাঁহারা সমাগত বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের সংস্পর্শে আসিতেন না, দূরে বনমধ্যে পর্ণকুটীরে দিনযাপন করিতেন। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণ ইঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। একদিন শুনিলাম, সম্রাট পার্শ্বচরগণপরিবৃত হইয়া উপাসনার জন্য স্তূপে আসিবেন। স্তূপ ও বেষ্টনী পরিষ্কৃত হইল; সজ্জারও অভাব হইল না। শুনিলাম, সেই দিন উপাসনার জন্য নাগরিকগণও স্তূপ-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু উৎসবদর্শনে আমাদিগের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

নূতন উৎসবে বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু তথাপি আমরা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হই নাই! যে দিন সম্রাট স্তূপার্চ্চনা করিতে আসিলেন সে দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমণ্ডলী স্তূপ ও বেষ্টনী অধিকার করিয়া বসিলেন। নানা স্থানে শিষ্য ও শক্তিমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া ভূতলে নানাবর্ণে রঞ্জিত চক্রাঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে উষাকাল হইতে ইঁহারা সম্রাটের দর্শনলাভেচ্ছায় উপবেশন করিয়া ছিলেন। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দলে দলে পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে নাগরিকগণ স্তূপসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রিকাল হইতে সশস্ত্র সৈনিকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পথ রক্ষা করিতেছিল। নাগরিকগণ যথাবিধি স্তূপার্চ্চনা ও বেষ্টনীপরিক্রমণ করিয়া পরে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণেরও অর্চ্চনা করিতেছিলেন। স্তূপার্চ্চনাকালে মন্ত্রপাঠের পর ভিক্ষুগণ বা তাঁহাদিগের শিষ্যমণ্ডলী নাগরিকদিগের নিকট হইতে যথা-সম্ভব অর্থাকর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু জীবিত বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণ অর্চ্চিত হইবার পর স্বয়ং দক্ষিণা গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পার্শ্বচারিণী শক্তি-সমূহও যথাসম্ভব উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমার পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া মধুবিহ্বলা শক্তিরূপিণী জনৈকা মহিলা দারুণ তৃষ্ণা জানাইয়া জনৈক তরুণ নাগরিকের নিকট হইতে এক কলস মধুর মূল্য প্রার্থনা করিতেছিলেন; তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক সৈনিক তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিতেছিল। মহাশক্তির তৎকালীন অধিকারী চক্রমধ্যে অবস্থিত বোধিসত্ত্ব-প্রবরের সহিষ্ণুতা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; তিনি ত্রিমূর্ত্তির প্রতি ঘন ঘন রোষকটাক্ষক্ষেপণ করিতেছিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া কতকগুলি নাগরিক ও নাগরিকা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিল। কোন স্থানে প্রত্যেক বুদ্ধ ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রাপ্ত দক্ষিণার বিভাগ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল ও কয়েকজন প্রৌঢ় নাগরিক বিবাদ ভঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। যে সকল নাগরিকের সহিত তরুণী ও যুবতী মহিলাগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা সত্বর পূজা সমাপন করিয়া বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও সেনাধ্যক্ষ স্তূপাভিমুখে আসিবার ও পরিক্রমনের পথ রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন কোন সৈনিককে স্থানান্তরিত করিতে হইতেছিল। কোন কোন শক্তিরূপিণী মহিলা নাগরিকগণের আকর্ষণে তাঁহাদিগের অধিকারী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণকে পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু সম্রাটের সুবর্ণখণ্ডের আশায় চক্র পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে সম্রাটের অনুযাত্রী কয়েকজন সৈনিক পরিবৃত হইয়া কাষায়ধারী নবাগত ভিক্ষুগণ সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। জনৈকা শক্তি আসিয়া ইঁহাদিগকে মধু পান করিতে আহ্বান করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ মধুভাণ্ড প্রত্যাখান করিলে তিনি অতি ভদ্র ও শ্লীল ভাষায় ভিক্ষুগণের বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার অধিকারী বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের আদেশে তাঁহার শিষ্য ও অনুচরমণ্ডলী বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে আসিয়া ভিক্ষুগণের সহিত মল্লযুদ্ধের উদ্যম করিল। কোলাহল শুনিয়া রাজপুরুষগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সৈনিকগণের সাহায্যে মহিলা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে দূর করিয়া দিলেন। চক্রমধ্যে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ররূপ দুর্গমধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না ও ক্রমে শান্তি সংস্থাপিত হইল। বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে পূর্ণ মাত্রায় উৎসব চলিতেছিল। শিষ্যমণ্ডলী ও মহাশক্তিগণ শৌণ্ডিকগণের

বিপণী হইতে অনবরত মধুর কলস স্তূপমধ্যে বহন করিতেছিলেন, কখন কখন নাগরিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য বিপণীমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। দূরে অরণ্যোপকণ্ঠে নাগরিকগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রন্ধন ও বিশ্রামের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী প্রতীহার ও রক্ষীদল শান্তি রক্ষা করিতেছিল ; ভিক্ষু বা শক্তিগণকে তাঁহা-দিগের নিকটে গমন করিতে দিতেছিল না।

প্রথম প্রহর অতীত হইলে সম্রাট স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ; শৃঙ্গ ও তূর্য্যনিনাদে জনসঙ্ঘ বধির হইল, ক্ষণেকের জন্য উৎসবস্রোত রুদ্ধ হইল। সৈনিকগণ জনস্রোত রুদ্ধ করিয়া পথ পরিষ্কৃত করিল ; শ্বেত কৌশেয় বস্ত্র-পরিহিত সম্রাট ও যুবরাজ বেষ্টনীর দ্বারে উপনীত হইলেন, নতজানু হইয়া কাষায়পরিহিত ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন তাঁহারা পুরোবর্ত্তী হইয়া বেষ্টনীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাচীন রীতি অনুসারে স্তূপার্চ্চন ও পরিক্রমণ সমাপ্ত হইলে সম্রাট বেষ্টনী হইতে বহির্গত হইয়া ভিক্ষুগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। অর্চ্চনা শেষ হইলে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ দেখিলেন যে, নবাগত ভিক্ষুগণ দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন না। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, স্তূপার্চ্চনা শেষ হইলে সম্রাট নাগরিকগণের ন্যায় তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিবেন। সম্রাট বেষ্টনী পরিত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া অনেকেই চক্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ভাণ্ডাগারিক ইন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন। ইন্দ্র গুপ্ত সম্রাটের নামাঙ্কিত নূতন সুবর্ণমুদ্রা বিতরণে প্রবৃত্ত হইলে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ চক্র পরিত্যাগ করিয়া ভাণ্ডাগারিককে বেষ্টন করিলেন। সুবর্ণের নাম শ্রবণে মধুভাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও শক্তিগণ শৌণ্ডিক-বীথি হইতে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নাগরিকগণ ব্যাপার দেখিয়া দূরে অপসরণ করিল। বহু কষ্টে সৈনিকগণের সাহায্যে সুবর্ণ-বণ্টন আরব্ধ হইল। মর্য্যাদা অনুসারে বুদ্ধ, ও বোধিসত্ত্ব, শক্তি, ভিক্ষু ও শিষ্যমণ্ডলীকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তৃতীয় প্রহরে কার্য্য শেষ হইল। তখন জনৈক বৃদ্ধ কোন মধুবিহ্বলা বিবস্ত্রা তরুণী শক্তিকে শৌণ্ডিকালয় হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতেছিলেন। মধুপানের আধিক্যপ্রযুক্ত সুবর্ণের লোভ সম্বরণ করায় বৃদ্ধ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্র গুপ্ত ইঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই বেষ্টনী হইতে প্রস্থান করিলেন। অপরাহ্নে জনসঙ্ঘ স্তূপাভি-

মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সন্ধ্যাগমে প্রাচীন রীতি অনুসারে স্তূপ ও বেষ্টনী আলোকমালায় সজ্জিত হইল, নাগরিক ও নাগরিকাগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ, বোধিসত্ব ও শক্তিগণ যথাসাধ্য সজ্জা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিলেন। তখন প্রতীহার ও নগর রক্ষিগণ পথ রক্ষা করিতেছিল। প্রথম প্রহর অতীত হইলে উৎসবস্রোত মন্দীভূত হইল। শ্রুত হইল, জনৈক বুদ্ধ কোন তরুণী নাগরিকার অঙ্গে হস্তক্ষেপণের জন্য তাহার স্বামী কর্ত্তৃক আহত হইয়াছেন; একজন বোধিসত্ব জনৈক নাগরিকের কন্যাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া রজনীর অন্ধকারে প্রস্থান করিয়াছেন, রক্ষিগণ তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে নির্গত হইয়াছে; কয়েকজন ভিক্ষু বেষ্টনীর মধ্যে অর্থাপহরণ করায় মহাপ্রতীহার কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; কয়েকজন ভিক্ষু, শক্তি ও শিষ্য বিপণী হইতে বিনামূল্যে দ্রব্য গ্রহণ করায় মহাপ্রতীহার কর্ত্তৃক চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে নগরে প্রেরণ করিতে হইবে ও দণ্ডপাশিক ও দণ্ডনায়কগণ কর্ত্তৃক ইহাদিগের বিচার হইবে। কতকগুলি মহিলা সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া নাগরিকগণের আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদিগের অধিকারী বোধিসত্ব ও বুদ্ধগণ মহাপ্রতীহারের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে বেষ্টনী জনশূন্য হইল, তখনও আসববিক্রেতাদল পণ্যশালা বন্ধ করে নাই, ভিক্ষুগণ মধুর সাহায্যে নির্ব্বাণের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন; চলচ্ছক্তিহীন স্ত্রী ও পুরুষগণকে রক্ষিদল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কাহাকেও বা নাগরিকগণ পদাঘাত করিতেছে। রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে দীপসমূহ নির্ব্বাপিত হইল, তখন রক্ষিদল ব্যতীত অপর সকলে স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রত্যূষে সম্রাট ও যুবরাজ অতি অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া শিবির পরিত্যাগ করিলেন। উৎসব শেষ হইল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষণিক সুখ।

বহুদিন পরে আজ আবার সমুদ্রতীরে আসিয়া বসিয়াছি। কত দিনের, কত বৎসরের বিচ্ছেদের পর আজ পুনর্ম্মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতেছি! সমুদ্রের সহিত যত প্রেম, বুঝি মানুষের সহিত তত প্রেম হয় না; সে প্রেম নিস্বার্থ সুতরাং নিরঙ্কুশ।

দূরে সমুদ্র এবং আকাশের সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া সুবিমল শশধর পৌর্ণমাসী রজনীর মৃদু মধুর হাস্যে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ধীরে ধীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর গগনে আরোহণ করিতেছেন। স্নিগ্ধ কিরণরেখা তির্য্যক্ ভাবে সমুদ্র-বক্ষে পতিত হইয়া সততচঞ্চল ঊর্ম্মিমালার লীলাভঙ্গী চিত্তবিমোহন করিয়া তুলিয়াছে। যেন তরল রজতরাশি চল চল ছল ছল করিয়া হেলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া নাচিয়া, পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া মিলনের মধুর রসাস্বাদন করিতে করিতে অনন্তের অনন্ত অন্তরে আত্ম মিলাইতে ছুটিয়াছে।

পূর্ণ চন্দ্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া, তাহাকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া সমুদ্র তাহার প্রণয়াস্পদের আসঙ্গজনিত হৃদিকম্পন বিজ্ঞাপন করিতেছে। আনন্দে আত্মহারা সমুদ্রের সরম নাই, শঙ্কা নাই, আত্মগোপনের চেষ্টামাত্র নাই। তাহার আনন্দ যে ক্ষণস্থায়ী, তাহার সে চিন্তা নাই। পূর্ণিমার পর যে অমাবস্যা, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে; তাই সে হৃদয়ের শশীকে নাচাইয়া দোলাইয়া নির্লজ্জ ভাবে সোহাগ জানাইতেছে। তাহার উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ দেখিয়া যে অপরের ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে, সে কথা তখন তাহার কল্পনায়ও স্থান পাইতেছে না।

কিন্তু সমুদ্র, তোমার এ শশীসোহাগ কতক্ষণ? যতক্ষণ রজনী না প্রভাত হয়। তাহার পর, তোমার হৃদয়ে অন্যের ছবি অঙ্কিত হইবে। তাহার তেজ বড় তীব্র। তখন তোমার এ মৃদু মধুর ভাব থাকিবে না; তখন তোমার এ শ্রান্তিহরা পাগলকরা শ্রুতিসুখকর মন্দ গর্জ্জন থাকিবে না। এমন ক্ষুদ্র বীচিমালার লীলাময় নৃত্য থাকিবে না; তখন প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর কিরণে তোমার হৃদয়-সাহারা উত্তপ্ত ধূসর ভাব ধারণ করিবে। উষ্ণ নিশ্বাসে উচ্চ তরঙ্গে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে। তখন তোমার বিস্তৃত হৃদয়ের প্রতি

এমন স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারা যাইবে না; চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। তখন বেলাভূমি উত্তপ্ত বালুকারাশির তীব্র উত্তাপে অনধিগম্য হইবে। তোমার এমন কল কল ধ্বনি থাকিবে না;—উগ্র গর্জ্জন প্রাণে ভীতিসঞ্চার করিবে।' কি পরিবর্ত্তন! সুখ কত ক্ষণভঙ্গুর!

আমারও হৃদয়ে একদিন অকস্মাৎ এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে দিনও তুমি এমনই আনন্দে অধীর হইয়া এমনই মধুর হাসিতেছিল, চলিতেছিলে, নাচিতেছিলে; এমনই করিয়া রাকাশশী হৃদয়ে ধরিয়া দোলাইয়া দোলাইয়া কত বিরহের, কত মিলনের, কত সোহাগের মধুর গীত গাহিতেছিলে। তোমার আনন্দ সংক্রমিত হইয়া আমারও হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু, অনন্ত জলরাশি, সে কতক্ষণের জন্য?—একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত মাত্র।

সে দিনও এই কলঙ্ক পীঠে (Scandal Point) এমনই সময়ে আসিয়া বসিয়াছিলাম; কিন্তু একাকী নহে। সে দিন আমার পার্শ্বে এক কিশোরী উপবিষ্টা ছিল। প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় তাহার মুখ, গোলাপসন্নিভ তাহার বর্ণ, মৃণালসদৃশ তাহার ভুজযুগল, দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় বঙ্কিম তাহার ভ্রূযুগল, তন্নিম্নে আয়ত দুইটি চক্ষু, আর স্ফুটনোন্মুখ মল্লিকার ন্যায় তাহার কৈশোর। তাহার কুঞ্চিত কেশদাম যত্নসংবদ্ধ, কেবল দুইটি লঘু গুচ্ছ ললাটপ্রান্তে ক্রীড়া করিতেছিল। তোমার বক্ষচুম্বী এমনই মধুর মলয়হিল্লোল আমাদিগের বিরাম বিধান করিতেছিল। সে কি সুখের মুহূর্ত্ত!

সে বালিকা আমার স্বজাতি নহে, আমার মাতৃভাষা তাহার মাতৃভাষা নহে, আমার শিক্ষা দীক্ষা তাহার শিক্ষা দীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি বিবাহিত সেও বিবাহিতা। তথাপি তোমার এই আনন্দ উচ্ছ্বাসের সংক্রামকতা আমাকে এমনই বিভোর করিয়াছিল—এতাদৃশ তন্ময় করিয়াছিল যে, আমি এক স্বপ্ন-রাজ্যে বিরাজ করিতেছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, সে রাজ্য অনন্ত, অব্যয়, চিরস্থির;—তথায় বিধান নাই, ব্যবধান নাই; আত্মায় আত্মায় পরিচয়, ভাবে ভাবে আলিঙ্গন, বিশুদ্ধতার—পবিত্রতার মধুর সম্মিলন। মনে হইয়াছিল, তুমি আমি এক, আমি তুমি এক; দুই কেবল কথায় পর্য্যবসিত; সে কেবল একের মহত্ত্ববিজ্ঞাপকমাত্র। মনে হইয়াছিল, আমাদের হৃদয়ের একই গতি, একই স্রোত, একের স্পন্দন অন্যের স্পন্দনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহার পর একটি ক্ষুদ্র কথায় ঘুম ভাঙ্গিল,

নেশা টুটিল, স্বপ্ন ছুটিল। সে ক্ষুদ্র কথার এমন কি শক্তি? সে কথা পরে বলিতেছি।

*　　*　　*　　*

তখন গোধূলি; দিগন্তস্পর্শী নিষ্প্রভ তপনের সুবর্ণকিরণ বক্র ভাবে পতিত হইয়া বৃক্ষশীর্ষ, গৃহচূড়, পর্ব্বতশিখর, অদূরস্থিত স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতীবক্ষ সুবর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়াছে। দীপ যেমন নিবিবার পূর্ব্বে জ্বলিয়া উঠে, তেমনই তমসাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে বসুধা সুন্দরী যেন একবার মুনিজনমনো-লোভা রক্তিমরাগে উজ্জ্বলে মধুর হাসি হাসিয়া লইতেছিলেন।

চিরবসন্ত-বিরাজিত ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া জনৈক বন্ধুসহ কলিকাতা হইতে আগত মাদ্রাজ মেলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম। অল্পদূরস্থিত সমুদ্রচুম্বিত সুখশীতল মৃদু পবন শ্রান্তি ক্লান্তি হরণ করিয়া, সন্তাপ প্রশমিত করিয়া মানব-হৃদয়ে বিশ্রামের এক অপূর্ব্ব সুখ-স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিতেছিল।

গাড়ী আসিয়া পৌঁছিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল, তাই বহিঃসৌন্দর্য্যের প্রতি ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সেই স্তব্ধ স্নিগ্ধ প্রকৃতির মনো-লোভা অনন্ত লাবণ্য, যাহার অনুভূতি আছে সে উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না।

কিছুক্ষণপরে ট্রেণ আসিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর "রিজার্ভ" প্রকোষ্ঠ হইতে এক স্বারস্বত ক্ষত্রিয় যুবক কিশোরী ভগিনীর হাত ধরিয়া নামিয়া আসিলেন। আমরা তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পশ্চাতে তাঁহাদের বর্ষীয়সী জননী প্রবীণা পারিচারিকার সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন।

সেই গোধূলির রক্তিম সূর্য্যের কনককিরণে পরিণতাবয়ব যুবকের তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর দেখাইল;—সেই অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর স্নেহসিক্ত, কুসুমপেলব, কমনীয় মুখখানিতে হেমকিরণছটা প্রতিফলিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইল। তাহাতে চাঞ্চল্য নাই, চপলতা নাই; কৌশল নাই, কুটিলতা নাই; স্থির, ধীর, স্নিগ্ধ, রম্য, ক্রমবর্দ্ধনশীল স্ফুটনোন্মুখ যৌবনপ্রতিভা।

বন্ধু তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত; অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইলেন,—"দেখুন, মূর্ত্তি-মান সরলতা মূর্ত্তিমতী মাধুরীসমভিব্যাহারে দাক্ষিণ্য পরিচালিত হইয়া কোন এক গূঢ় উদ্দেশ্যসাধন করিতে এই স্বাস্থ্য-তীর্থে আসিয়া উপনীত হইলেন।"

দেখিলাম এবং নয়ন সার্থক করিলাম। তাহার পর কত দিন, কত বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখনও সেই পুণ্য সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্মৃতি হৃদয়ের স্তরে স্তরে মুদ্রিত হইয়া আছে। এখনও সেই নীরব প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্য্যের,রম্য দৃশ্য হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে।

এই যে আজ এতদিন পরে সেই সমুদ্রতীরে আসিয়া চন্দ্রালোকপুলকিত মধু যামিনীতে প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য্যে আত্মনিবিষ্ট হইয়া অবহিত চিত্তে বসিয়া আছি, আজও সেই রম্য সন্ধ্যার রম্যতর দৃশ্য আমার নয়নসম্মুখে জাজ্বল্যমান প্রতীত হইতেছে। সেই মুখখানি সে দিন যেমন সুন্দর দেখিয়াছিলাম, আজও তেমনই সুন্দর—তেমনই তরুণ দেখিতে পাইতেছি। কালের কুটিল প্রকোপ সে কমকান্তির যেন কোন ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে নাই; তাহাতে যেন এখনও বয়সের প্রবীনতা, সংসারের অস্বচ্ছতা কোন চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই।

থাক! আমার হৃদয়-মন্দিরে—নিভৃত নিকেতনে তোমার সেই দেবদুর্ল্লভ, ভুবনভুলান, প্রীতিপ্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, সরল, চিরপবিত্র বাল্যসৌন্দর্য্য লইয়া চিরাধিষ্ঠিত থাক। তেমন স্বচ্ছ পবিত্রতা এই পাপপঙ্কিল পৃথিবীতে বহুদিন বিশুদ্ধ থাকে না। সেই ত দুঃখ; সেই জন্যই ত এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের এত আদর।

লৌহ যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয়, আমিও তদ্রূপ সেই ভ্রাতাভগিনীর প্রতি তন্মুহূর্ত্তে আকৃষ্ট হইলাম।

পরিচয় হইল। পরিচয় ক্রমে সৌহার্দ্দে পরিণত হইল। সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হইয়া বন্ধুত্বে পর্য্যবসিত হইল। দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, কালের অপ্রতিহত প্রভাব অতিক্রম করিয়া বন্ধুত্ব এখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা।

সেই প্রবাস-তীর্থে আমরা দুই মাস অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সে কি সুখের দিন ছিল! এখন যদি সর্ব্বস্ব দিলে সেই দিনগুলির একটি দিনও পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না।

সেই একত্র আহার, একত্র বিশ্রাম, একত্র ভ্রমণ, একত্র বিশ্রব্ধালাপ,—তাহার একটি মুহূর্ত্ত যে কোটী কোটী মুদ্রা দিলে আর ফিরিয়া আসিবার নহে! কাল যে তাহার কলঙ্ককালিমা অল্পবিস্তর আমাদিগের সকলের মুখেই লেপন করিয়া দিয়াছে। আমরা যে সেই পবিত্র স্মৃতির পুণ্য প্রতিষ্ঠা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! এখন যে নয়নে নয়নে চাহিয়া তেমন

ভাবহীন, অর্থহীন অথচ সর্ব্বার্থময়ী, সর্ব্বক্ষেমঙ্করী দৃষ্টিবিনিময় করিতে পারি না। তখন যাহাকে লইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সমুদ্রতীরে, গৃহকুট্টিমে ছুটাছুটি করিতাম এখন কয় দিন তাহার দর্শন লাভ ঘটে? তখন শকটাভ্যন্তরে, ভ্রাতৃবন্ধুসম্মিলনে আমি যে তাহার আশ্রয়—অবলম্বন ছিলাম! দ্বিধাহীন, ভেদহীন, বিধানবিহীন, ব্যবধানবিরহিত উদার পবিত্র অকপট স্নেহের পুণ্য প্রভায় তখন আমরা প্রথমসামরবমুখরিত তপোবনে তাপনতনয় এবং মুনিকন্যার ন্যায় এক পুণ্য লোকে পুণ্য স্নেহে ভরপুর ছিলাম। সে দিন গিয়াছে, আর আসিবে না। রাজার ঐশ্বর্য্য, ঋষির ঋদ্ধি, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিলেও তাহার একটি দিন, একটি পল, একটি অনুপলও আর ফিরিয়া আসিবে না। সর্ব্বগ্রাসী কাল যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু পবিত্র সব গ্রাস করিয়াছে; তাহা ফিরাইয়া পাইবার, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য নাই। সে যে নিয়তি।

* * * *

যে দিনের কথা বলিয়াছিলাম, সে দিন বিদায়ের পূর্ব্বদিন। সে দিন পূর্ণিমা, অথবা শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী। চাঁদ উঠিয়াছে, রজত কিরণে সমুদ্র প্লাবিত। তন্নিম্নে শশধরের প্রতিকৃতি হেলিয়া দুলিয়া, ঢলিয়া মজিয়া সমুদ্রের তরল প্রকৃতিকে তরলতর করিয়া তুলিয়াছে। তৎপার্শ্বে শত শত ক্ষুদ্র তারকা নাচিতেছে।

বিদায়ের বিষাদে উভয়েই ক্ষুণ্ণ, উভয়েই মলিন। কিঞ্চিৎ দূরে বালিকার ভ্রাতা এবং আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু মৃদু কথোপকথন করিতেছিলেন। আমরা কিন্তু উভয়েই মূক। কি এক অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি আমাদের উভয়ের হৃদয়ে যুগপৎ বাজিয়া উঠিয়াছে! আমাদের অনাবিল স্নেহে এক ক্ষুদ্র লঘু বিষাদরেখা উঠিয়াছে। পূর্ণেন্দু যেমন সমুদ্রগর্ভে কাঁপিতেছিল, আমাদের উভয় হৃদয়ে বোধ হয় তেমনই স্পন্দিত হইতেছিল।

অথবা তুফান উঠিয়াছিল আমার পরিণত হৃদয়ে;—বালিকার হৃদয় স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ, স্থির, ধীর তেমনই ছিল। তাহাতে হিল্লোল উঠিবার পরিপক্কতা তখন জন্মে নাই; তবে ইহা নিশ্চিত যে, সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিচ্ছেদ-ব্যথার সহানুভূতি জাগিয়াছিল; নতুবা চঞ্চলা বালিকা প্রবীণার গাম্ভীর্য্য লইয়া মূক হইয়া বসিয়া থাকিবে কেন?

বিষাদবেদনায় আবেগভরে ডাকিলাম—"সরযু"! সরযু তাহার বাম হস্ত

আমার দক্ষিণ স্কন্ধে অর্পিত করিয়া তাহার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি আমার ম্লান মুখে ন্যস্ত করিল।

সে এক কি অপূর্ব্ব সুখের বিভ্রম! কি ভাবিতেছিলাম মনে নাই;—কাহার কথা তখন হৃদয়ে জাগিতেছিল তাহা এই এতদিনপরে স্মৃতিমন্থন করিয়া উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই; তবে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মনে আছে; আর যে উত্তর পাইয়াছিলাম তাহাও হৃদয়ে মুদ্রিত আছে।

আমি বলিলাম, "দেখ, সমুদ্র কেমন চন্দ্রের প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধরিয়া নাচিতেছে;—মানুষের হৃদয়ে প্রিয়জনের প্রতিকৃতি বুঝি বিদায়ের দিনে এমনই কাঁপে!"

ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র উত্তর দিল,—"চাঁদ বড়, এক; নক্ষত্র ছোট, অনেক।"

তাই ত! উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম,—চন্দ্র বড়—এক, নক্ষত্র ক্ষুদ্র—অনেক। সমুদ্রবক্ষে নেত্রপাত করিলাম,—চন্দ্র বড়—এক, নক্ষত্র ক্ষুদ্র—অনেক। নয়ন মুদিত করিয়া হৃদয়ফলকে অনুভব করিলাম,—বড় এক, ক্ষুদ্র অনেক।

সহজ সরল সত্য, কিন্তু ইহাতে কি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে! বালিকার মুখে দেবতার ইঙ্গিত।

ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া আশ্রমে ফিরিলাম; দেখিলাম, প্রকৃতি এক, আকৃতি অনেক; দেবতা এক, উপদেবতা বহু; বড় এক, ক্ষুদ্র অনেক!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রহণ ও বর্জ্জন।

যে পদার্থ যত শীঘ্র তাপরাশি লয়,
তত শীঘ্র করে তাহা তাপ বিকীরণ;
যেই মন যত শীঘ্র ক্রোধের অধীন,
তত শীঘ্র ক্রোধমুক্ত হয় সে তেমন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

জীবন বৈচিত্র্য।

প্রেম।

মানুষ জীবনে যতপ্রকার সুখ সম্ভোগ করে প্রেমজনিত সুখের সহিত তাহার আর কোনটির তুলনাই হয় না। কবিবর কীট্‌স্ বলেন, যদি প্রেম না থাকিত তাহা হইলে বৃক্ষলতা ফলফুলে সুশোভিত হইত কি না সন্দেহ! ইহা কেবল কবির কল্পনামাত্র নহে। বাস্তবিক যদি আমরা প্রেমধনে বঞ্চিত হইতাম তাহা হইলে এই সুন্দরী পৃথিবী আমাদের নয়নে কি ভীষণ মরুভূমি বলিয়া প্রতিভাত হইত! প্রেমের কথা বাদ দিলে মানব-সাহিত্যে থাকে কি? সৃষ্টিসংরক্ষক প্রেম কাব্যজগতের প্রাণস্বরূপ। প্রেমের প্রসঙ্গ আবহমানকাল নানা ভাবে ও নানা ছন্দে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহার চির-নবীনত্বের কি কোনওরূপ হ্রাস হইয়াছে? প্রেমিকযুগলের মনের ভাব যেমন চুম্বনালিঙ্গনে নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মানুষের অসম্পূর্ণ ভাষাতেও প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রেমসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন প্রকৃত প্রেমিক তাহাতে নিজ হৃদয়ের অপরিস্ফুট ছায়ামাত্র দেখিতে পায়েন। কিন্তু প্রেমের এমনই মোহিনী শক্তি যে, এই চির-পরিচিত প্রসঙ্গের চর্ব্বিতচর্ব্বণও সর্ব্বজনপ্রিয়। আমি এই সাহসে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইয়াছি।

কবির কবি স্পেন্‌সার্ বলেন যে, দুইটি রাজযোটক আত্মার সংযোগে যে স্বর্গীয় সঙ্গীত উৎপন্ন হয় তাহারই নাম প্রেম। বস্তুতঃ দুইটি হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাঁধা না হইলে প্রকৃত প্রেম জন্মে না। মহাকবি ভবভূতি প্রেমের প্রকৃতি কিরূপ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন! তিনি বলেন—

> "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য-
> দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
> কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
> ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎপ্রাপ্যতে॥"

যাহা সুখে দুঃখে সমভাবে থাকে, যাহা সকল অবস্থার অনুকূল, যাহা হৃদয়ের বিশ্রামস্থল, জরা যদ্বিষয়ক আস্বাদ হরণ করিতে পারে না, কাল-

ক্রমে হৃদয়ের লজ্জাদি আবরণ স্খলিত হইলে যাহা পরিপক্ক হইয়া হৃদয়ে স্নেহসাররূপে স্থিতিলাভ করে এবম্বিধ কল্যানজনক সুজনের প্রেম কদাচিৎ লাভ করা যায়।

আত্মলোপই প্রেমের চরমোৎকর্ষ। পারসীক কবি জেলালুদ্দীন মস্‌নবি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি তাহার প্রিয়তমার গৃহে প্রবেশার্থী হইয়া দ্বারে করাঘাত করাতে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে তুমি?" তদুত্তরে সে বলিল, "আমি।" দ্বার তথাপি পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ রহিল এবং ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, "এ গৃহে তোমার ও আমার, উভয়ের স্থান হইবে না।" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি সে স্থান হইতে চলিয়া গেল এবং বনে যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া সে পুনর্ব্বার উক্ত গৃহদ্বারে করাঘাত করাতে আবার ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে তুমি?" সে তদুত্তরে এবার বলিল, "আমি তুমি।" তাহার প্রবেশের জন্য তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। আর একজন পারসীক কবি (হিলালি) ঠিক এই কথা বংশীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। বংশী বলিতেছে, "আমি বুঝিতে পারিতেছি না আমি আমি তুমি তুমি, না তুমি আমি?" ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারসীক কবি আমীর খস্রুর মুখেও সেই কথা—

"মন্ তু শুদম্, তু মন্ শুদী,
মন্ তন্ শুদম্, তু জান্ শুদী।
তা কস্ ন গোয়েদ্, বাদ অজীঁ,
মন্ দীগরম্, তু দীগরী॥"

আমি তুমি হইয়াছি, তুমি আমি হইয়াছ। আমি তনু হইয়াছি, তুমি প্রাণ হইয়াছ। অতএব অতঃপর কেহ যেন বলে না যে, আমি ভিন্ন, তুমি ভিন্ন। প্রেমের ইহার অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না, এবং মানুষ যে পরিমাণে এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে সে ঠিক সেই পরিমাণে প্রেমের স্বর্গসুখে সুখী হয়। এ সংসারে আত্মবিসর্জ্জনে যে সুখ লাভ করা যায় তাহার সহিত আর কোনও সুখের তুলনা হয় না। এই জন্যই মানবচরিত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা বলেন, যে ভালবাসা পায় তাহার অপেক্ষা যে ভালবাসে সে অধিক সুখী। এই জন্যই কবিগণ নিরপেক্ষ প্রেমের এত পক্ষপাতী। মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার বলেন, যে প্রেম প্রার্থিত হইলে প্রদত্ত

হয় তাহা উত্তম বটে, কিন্তু যে প্রেম বিনা প্রার্থনায় অর্পিত হয় তাহা আরও উত্তম। সেলীও ঠিক এই কথা বলেন। টেনিসন্ বলেন, প্রকৃত প্রেম অনাদৃত হইলেও মধুময়। সেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক একজন কবি বলেন যে, প্রেম স্বর্গীয় নিধি বলিয়া উহাকে পার্থিব ধন দিয়া ক্রয় করা যায় না; প্রেম আপনার বিনিময়েই ক্রীত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রেম ক্রয়বিক্রয় চাহে না।—

"চায় না প্রেম কেনাবেচা, ভালবেসে পূরায় আশা।"

প্রকৃত প্রেমিক যতটুকু প্রেম নিজে পাইবার আশা করেন কেবল ততটুকু প্রেম দিয়া কখনই সন্তুষ্ট হয়েন না। তিনি প্রেম বিতরণ করিবার সময় বণিকের ন্যায় তুলাদণ্ড বা মানদণ্ড ব্যবহার করেন না। তাঁহার প্রেম বিলাইয়া শেষ হয় না এবং তাঁহার বিলাইবার সাধও কিছুতে মিটে না। তিনি জুলিয়েটের ন্যায় বলেন, "আমার দানশীলতা সমুদ্রের ন্যায় অসীম এবং আমার প্রেম সমুদ্রের ন্যায় গভীর।" যে প্রেম সমুদ্রের ন্যায় গভীর সে প্রেম কি কখনও প্রতিদানের প্রত্যাশা করে?

"প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাদরে শুকাবার?
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি না তাতয়ে সাগরমাঝার॥"

প্রণয়ের গুণে দোষও গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—

"অন্যমুখে দুর্ব্বাদো যঃ প্রিয়বদনে সএব পরিহাসঃ।
ইতরেন্ধনজন্মা যো ধূমঃ সোঽগুরুভবোধূপঃ।"

যেমন অন্যান্য কাষ্ঠ পোড়াইলে যে ধূম হয় তাহাকে ধূম বলি কিন্তু অগুরু-চন্দন পোড়াইলে যে ধূম হয় তাহাকে ধূপ বলি, সেইরূপ যে কথা অন্যের মুখে উচ্চারিত হইলে দুর্ব্বাক্য মনে করি তাহাই আবার প্রিয়জনের মুখে উচ্চারিত হইলে পরিহাস বলিয়া বোধ হয়। যাহাকে ভালবাসি তাহার অধরপল্লব যদি ক্রোধে বা ঘৃণায় আকুঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই আকুঞ্চনেও কত সৌন্দর্য্য দেখি! নিরপরাধা ডিস্‌ডিমোনার সতীত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার স্বামী যখন তাঁহার প্রতি অসদাচারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, হতভাগিনী প্রণয়ের মোহে তাহা প্রথমে ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সখীকে বলিয়াছিলেন, "আমি আমার স্বামীকে এত ভালবাসি ও ভক্তি করি যে, তাঁহার নিগ্রহে এবং ভ্রুকুটিতেও অনুগ্রহ ও করুণা দেখিতে পাইতেছি।" পতিপ্রাণা সাধ্বী যখন পরিশেষে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের স্বরূপ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন তখনও তাঁহার প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল; তিনি

বলিয়াছিলেন, "নিষ্ঠুরতা অনেক ক্ষতি করিতে পারে, এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে পারে; কিন্তু আমার প্রেমের কিছুই করিতে পারিবে না।" যে দেশে সীতা ও দময়ন্তী এখনও সর্ব্বত্র পূজিতা সে দেশে প্রেমের নিরপেক্ষতার আর কি দৃষ্টান্ত দিব?

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে বিচ্ছেদও তাহার কোনও ক্ষতি করিতে পারে না, বরং বিচ্ছেদে প্রেম সমধিক বৃদ্ধিলাভ করে। একজন প্রেমিক কবি বলেন—

"সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহবিরহোন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

প্রণয়িনীর সহিত সঙ্গমাপেক্ষা বিচ্ছেদ শ্রেয়ঃ; কারণ সঙ্গমে সে একাই থাকে, কিন্তু বিরহে সে সমস্ত ত্রিভুবন জুড়িয়া থাকে।

কিন্তু সদ্যোজাত প্রেমাঙ্কুর "বিচ্ছেদছাগে মুড়িয়ে খায়।" উহাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা না করিলে উহা অকালে লয় প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কবি উপদেশ দেন—

"মনো ভূমৌ জাতা প্রকৃতিচপলায়াং বিধিবশাৎ
সখে সম্যকবর্দ্ধ্যা প্রচুরগুণপুষ্পপ্রসবিনী।
তথা সংসেক্তব্যা স্মরণসলিলে নাম্নুদিবসং
যথা নেয়ং ম্লানিং ব্রজতি মৃদুল স্নেহলতিকা॥"

সখে! স্বভাবতঃ চঞ্চল মনোরূপ ভূমিতে যদি দৈবযোগে একটি প্রচুরগুণ-পুষ্পপ্রসবিনী কোমলা স্নেহলতিকা জন্মিয়াছে তবে উহা যাহাতে সম্যক বৃদ্ধি লাভ করে তাহার চেষ্টা করা উচিত; উহা যাহাতে শুকাইয়া না যায় উহার মূলে অনুদিন তদনুরূপ স্মরণসলিলসেক করিতে হইবে।

সূর্য্য যেমন জগতের তিমির ধ্বংস করিয়া নানাবিধ সৌন্দর্য্য উদ্ভাবন করে সেইরূপ প্রেম-সূর্য্যের উদয়ে মনের সমস্ত নীচতা ও মলিনতা দূর হয় এবং নানাপ্রকার উন্নত ও মহৎ ভাবের আবির্ভাব হয়। সমুদ্র যেমন পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া উহার যাহা কিছু নীচ ও অসার তাহা বিদূরিত করে, প্রেমের স্পর্শে মানব-হৃদয়েরও ঠিক সেইরূপ ঘটে। কবিগুরু দান্তেকে সমস্ত জীবন অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তথাপি বলিতেন, "যখন আমার প্রণয়িনী বিয়াট্রিস্‌কে দেখি, তখন আমার মনে হয় যে, সমগ্র পৃথিবীতে আমার কোনও শত্রু নাই।"

আহা প্রেমের কি উদার দৃষ্টি! সতী স্বামীর সোহাগে বঞ্চিতা হইলে স্বামীর চরিত্রে দোষারোপ না করিয়া ভাবেন, তাঁহার নিজের কোনও অপরাধে বুঝি এরূপ ঘটিল। পতির দোষ ধরা দূরে থাকুক, পতি-নিন্দা কাণে শুনিলেও সতী মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায়েন। প্রেমের ক্ষমাশীলতারও ইয়ত্তা নাই। প্রেমে "সাত খুন মাফ।" প্রেম ক্ষমাপ্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া শত অপরাধ মার্জ্জনা করে। অভিমানিনী সীমন্তিনী প্রিয়তমের অপরাধে "মান" অবলম্বন করিয়া উভয় শঙ্কটে পড়েন; যতক্ষণ মানভঞ্জন না হয় ততক্ষণ "বারিছাড়া মীনের" ন্যায় ধড়ফড় করিতে থাকেন। "না সাধিলে কথা কহিবেন না" এ প্রতিজ্ঞা রক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থা ললনার কথাও আমার অবিদিত নাই। এই রূপ প্রকৃতিবিশিষ্টা নারীরত্নের মানাবলম্বন বিড়ম্বনা মাত্র। তাই কবি বলেন—

"মুগ্ধে মানং নতে কর্ত্তুং যুক্তং প্রাণাধিকে প্রিয়ে।
ধত্তে মৎস্যী কিয়ৎকালং জীবিতং জীবনং বিনা॥

মুগ্ধে! যে তোমার প্রাণের অধিক প্রিয়, তাহার উপর মান করা তোমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে। বারি-ছাড়া মীন কতক্ষণ জীবিত থাকে?

প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে রূপের কথা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। মানুষ স্বভাবতঃ এরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয় যে, রূপ সহজেই প্রণয়াকর্ষণ করে। একজন কবি বলেন, রূপ আমাদিগকে কেবল একগাছি কেশ দিয়া বাঁধিয়া ঘুরাইতে পারে। তাই প্রেমের কাব্যে রূপের এত ছড়াছড়ি। হাফেজ বলেন, তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর গোলাপ-বিনিন্দিত গণ্ডস্থল এবং শ্বেতশতদলসদৃশ করযুগল পাইলে যত সুখী হয়েন বোখারার গৌরবভূত সুবর্ণরাশি ও সমরকন্দের সমস্ত রত্নরাজি পাইলেও তত সুখী হয়েন না। সুন্দরীর কপোলে প্রকৃতিদেবী নিজহস্তে যে বর্ণ ফলান তাহার সহিত মানুষের শিল্পের কি তুলনা হয়?

"সৌবর্ণানি সরোজানি নির্মাতুং সন্তি শিল্পিনঃ।
তত্র সৌরভনির্ম্মাণে চতুরশ্চতুরাননঃ॥"

সুবর্ণকমল নির্ম্মাণ করিতে পারে এরূপ শিল্পির অভাব নাই, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মা ভিন্ন কে তাহাতে সৌরভ প্রদান করিতে পারে?

ভাস্কর সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণে পটু, কিন্তু সে এরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র কোথায় পাইবে যদ্দ্বারা সে ক্ষোদিত প্রস্তর মূর্ত্তিতে প্রাণবায়ু ক্ষোদিত করিতে পারে?

একএকজন স্ত্রীলোকের মুখ দেখিলে তাহাদের সকল দোষ ভুলিয়া যাইতে হয়।

সুন্দরী যখন নিজের ওকালতী নিজে করেন তখন তাঁহার প্রতিপক্ষ উকীল কোথায় পাইবে? সুন্দরীর হাসি-মুখ যেমন প্রফুটিত কমলের শোভা ধারণ করে সেইরূপ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলও শিশির-স্নাত গোলাপের ন্যায় মনোহর। শৈবলানুবিদ্ধ সরসিজের ন্যায় স্বভাবসুন্দর মুখে কালিমা পড়িলেও উহাতে এক বিচিত্র রমণীয়তা লক্ষিত হয়। একএকখানি মুখের স্বর্গীয় প্রভায় ছায়াময় স্থানও আলোকাকীর্ণ বোধ হয়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বেশ-ভূষার অপেক্ষা করে না, বরং বেশভূষার আধিক্যে উহা আবৃত হয়। এরূপ সৌন্দর্য্য আভরণের আভরণ, সজ্জার সজ্জা এবং উপমানের প্রত্যুপমান;

"আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে! প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ॥"

একখানি ইংরাজী নাটকে বর্ণিত আছে যে, একজন ধনাঢ্য ডিউকের সুন্দরী সহধর্ম্মিণী নাচের মজলিসে নিমন্ত্রিতা হইয়া কি পোষাক পরিবেন তদ্বিষয়ে স্বামীর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ডিউক্ তাহাতে উত্তর দিলেন:—"আমার ইচ্ছা তুমি একটি শুভ্রবর্ণের দীন পরিচ্ছদ পরিধান কর। শিরোভূষণ স্বরূপ একটি মাত্র অর্দ্ধপ্রফুটিত গোলাপের কুঁড়ি তোমার কবরীতে আবদ্ধ কর। তোমার হীরামুক্তা পরিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না; তোমার নয়নযুগলে যে হীরক জ্বলিতেছে, দন্তচ্ছদে যে পদ্মরাগমণি আছে এবং তদভ্যন্তরে যে মুক্তাপঙ্‌ক্তি বিরাজ করিতেছে তাহাই যথেষ্ট। যখন তোমার সুগঠিত দেহলতা সঙ্গীতের তালে তালে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে এবং তোমার অলকদাম বাতাসে দুলিবে তখন তোমার রূপ যেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তদপেক্ষা অধিক আকর্ষণ বাঞ্ছনীয় নহে। স্ত্রী যেরূপ বেশ-ভূষা করিলে স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী হয়েন তাঁহার পক্ষে সেইরূপ বেশভূষাই যথেষ্ট।" বাস্তবিক বিধাতৃদত্ত অলঙ্কারের কাছে অন্য অলঙ্কার অতি অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়া বোধ হয়।

একএকজন রূপসী নিজের রূপের কথা স্বপ্নেও ভাবেন না, অথচ তাঁহারা সাক্ষাৎ রূপের অবতার স্বরূপা। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ অসামান্য রূপলাবণ্যবতী একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়াছিলাম। যদিও তাহাকে গৌরাঙ্গী বলিতে পারি না, তথাপি সেরূপ লাবণ্য আমি আর কখনও দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। আমি রূপের অপেক্ষা লাবণ্যের অধিক পক্ষপাতী। গ্রীক্ কবি বাস্তবিকই বলিয়াছেন যে, লাবণ্যের বড়িশ না থাকিলে রূপের টোপ কোনও কার্য্যেরই হয় না। আমার এক বন্ধু পরিহাস করিয়া বলিতেন যে, সুবিখ্যাত নুরজাহান রাজ্ঞী ওজনে এক ছটাক ছিলেন এবং তাঁহার দেহে আর যাহা কিছু ছিল তাহা কেবল লাবণ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, নুরজাহানের রূপের অপেক্ষা লাবণ্য অধিক ছিল, নচেৎ তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে কখনই জাহাঙ্গীরের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন না। ইতিহাসেও তাঁহার রসিকতা, কাব্যপ্রিয়তা, শিল্পকুশলতা ও কার্য্যদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মিশরের যে রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার প্রেমে মজিয়া আণ্টনি রোমসাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ এবং স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তিনি যেরূপ জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন তদপেক্ষা অধিক লাবণ্যবতী ছিলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আণ্টনি সেক্স্পীয়ারের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের একস্থলে বলিতেছেন—

"ওগো কলহতৎপরা রাজমহিষি! তোমাকে ধিক্! তোমার তিরস্কার, তোমার হাসি, তোমার কান্না, তুমি যখন যাহা কিছু কর, সবই তোমাকে কেমন সুন্দর সাজে! এমন কোন উৎকট মনোবৃত্তি নাই যাহা তোমাতে আবির্ভূত হইলে সুন্দর দেখাইতে ও প্রশংসা লাভ করিতে বিধিমতে চেষ্টার ক্রটি করে।"

ইহাই লাবণ্যের প্রধান লক্ষণ। রূপে মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু লাবণ্যে পাওয়া যায়। এই জন্য লাবণ্য নির্জ্জীব রূপকে সজীব করে।

ডেভন্সিয়ারের ডিউক্-পত্নী সুবিখ্যাত সুন্দরী জর্জ্জিয়ানার অসাধারণ মানসিক সৌন্দর্য্য ছিল বলিয়া তাঁহার রূপের অপেক্ষা লাবণ্যের খ্যাতি অধিক ছিল। যাহার লাবণ্য আছে সে যাহা করে তাহাই সুন্দর দেখায়। এই জন্য ফ্লেরিজেল্ তাঁহার প্রণয়িণী পার্ডিটাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন যাহা কর আমার তখন তাহাই ভাল লাগে; তুমি যখন নৃত্য কর, কি গান কর, কি ভিক্ষা দাও, আমার তখন ইচ্ছা হয় তুমি চিরদিন তাহাই করিতে থাক।" লাবণ্যময়ীর মনে যখন যে ভাবের উদয় হয় তাঁহার ভাব-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে ও বিম্বগ্রাহী নয়নযুগলে তাহার ছায়া পড়িয়া প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য উদ্ভাবিত করে।

আমি এতক্ষণ রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে

করেন না যে, প্রেমের রূপ নহিলে দিন চলে না। একজন কবি বলেন, ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের শিক্ষার জন্য ভালবাসার বস্তু দেন এবং শিক্ষা শেষ হইলে উহা ফিরাইয়া লয়েন। সেইরূপ প্রেমও শৈশবাবস্থায় রূপের হস্তধারণ করিয়া হাঁটিতে শিখে এবং শিক্ষা শেষ হইলে ক্ষণভঙ্গুর রূপের পরিবর্ত্তে হৃদিস্থিত অটল রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রকৃত সৌন্দর্য্য হৃদয়ের অতি নিভৃততম কন্দরে লুক্কায়িত থাকে। যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিতহয়, তখন উভয় হৃদয়ের আবরণগুলি একে একে খসিয়া পড়ে এবং পরস্পরের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ পরস্পরের পরিচিত হয়।

চিন্তাশীল কবি ব্রাউনিং বলেন, অতিবড় নরাধমের আত্মাও দুই দিক্ বিশিষ্ট ; উহার জঘন্য দিক্‌টি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভাল দিক্‌টি কেবল উহার প্রণয়িনীই দেখিতে পায়। এইরূপে অতি নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকও প্রণয়সুখে একেবারে বঞ্চিত হয় না। রোমের দুর্ব্বৃত্ততম সম্রাট্ নিরোর কবরেও কোনও অজ্ঞাত হস্ত ফুল ছড়াইয়াছিল। কবিগণ প্রেমকে অনেক সময়ে অন্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন ; কিন্তু প্রেমের ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি গগনবিহারী শ্যেনপক্ষীরও নাই। হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য অপর কেহ দেখিতে পায় না প্রেম তাহাও দেখিতে পায়। হাফেজ বলেন, যথায় প্রেমের ছায়া পড়ে তথায় সৌন্দর্য্যেরও অধিষ্ঠান হয়। প্রত্যেক প্রেমিকের জন্য যে স্বতন্ত্র রত্নপ্রদীপ একটি নিভৃত কক্ষে দীপ্তিবিস্তার করে তাহা জনসাধারণের দৃষ্টিপথের অতীত।

"হৃদয়ের অন্তস্থলে, যে মাণিক গোপনে জ্বলে,
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকায় ?"

প্রেম মানস-চক্ষু দিয়া দেখে বলিলেও প্রেমের দৃষ্টির যথাযথ বর্ণনা হয় না ; প্রেম হৃদয় দিয়া দেখে। হৃদয়ের দৃষ্টি স্নেহের দৃষ্টি—বুদ্ধির দৃষ্টি অপেক্ষা যে কত সূক্ষ্মতর তাহা ভারতীর বরপুত্র কালিদাস জানিতেন। তিনি বলেন—

"নহি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদামর্থদর্শনং।
কার্য্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যুপলভ্যতে॥"

বন্ধু-বাঞ্ছিত বিষয়দর্শন কেবল বুদ্ধির গুণেই হয় না ; স্নেহের গুণেও কার্য্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম পথ লাভ করা যায়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার।

এক্ষণে আমরা আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে উপনীত হইলাম, অর্থাৎ দেশমধ্যে ম্যালেরিয়া বর্ত্তমান থাকিলে, কি প্রকারে অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে, ইহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ের আলোচনাকে আমরা সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করিব।

(ক) যাহাতে মশকে কামড়াইতে না পারে, তাহার চেষ্টা।

(খ) ম্যালেরিয়া হইলে যাহাতে সত্বর রোগমুক্ত হইতে পারা যায়, তদ্রূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(গ) শরীরকে এরূপভাবে শিক্ষিত করা, যাহাতে উহার রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার মত অবস্থা জন্মে।

(ক) মশক নিবারণের জন্য নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মশারী ব্যবহার না করিয়া নিদ্রা যাইবে না; গৃহস্থলী পরিচ্ছন্ন রাখিবে; ঘরের সর্ব্বস্থান ঝাঁট দিবে কিম্বা ঝাড়িবে; গৃহের যে সকল স্থানে কোনরূপ ঝাড়পোঁছ হয় না, সেই সকল স্থানে মশকরা আশ্রয় লইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে গৃহে ধুনা দিবার প্রথাটি ভাল; ধূমের গন্ধে মশক গৃহ হইতে পলাইয়া যায়। গৃহের জানালা ও দরজা মশকনিবারণকারী জাল দিয়া ঢাকিবার পরামর্শ অনেক দিয়াছেন। জামা প্রভৃতি গাত্রে দিবে। আমাদের ধুতি অপেক্ষা পায়জামা, বোধ হয়, মশকনিবারণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। মশকসঙ্কুল স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাইবে না। খুব প্রত্যূষে কিম্বা সন্ধ্যাকালে বাহির হইবে না, কারণ ঐ সময় মশকরা শিকার অন্বেষণে বাহির হয়। তামাক প্রভৃতির ধূম কতকটা মশক তাড়াইয়া থাকে, কাযেই ম্যালেরিয়াসঙ্কুল দেশে তামাক-সেবন হিতকর। রশুনের গন্ধে মশক কতকটা দূরে যায়। যাহারা স্নান করে না, তাহাদিগের শরীরের ত্বকের উপরিভাগে পুরু মৃত চর্ম্মের স্তর থাকে বলিয়া মশকগণ তাহাদিগকে ভাল করিয়া কামড়াইতে পারে না। অস্নাত ব্যক্তিদিগের অধিক জ্বর না হইবার উহা অন্যতম কারণ। ইটালী প্রভৃতি দেশের ম্যালেরিয়াসঙ্কুল-স্থানবাসীদিগকে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া মুখটিকে পর্য্যন্ত মশকনিবারণকারী জালের দ্বারা আবৃত করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

(খ) ম্যালেরিয়া রোগ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে উহাকে চিকিৎসার দ্বারা সহজে দূর করিতে পারা যায় কিংবা চিকিৎসার দ্বারা কি প্রকারে উহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আমার কোন অধিকার নাই। ডাক্তারগণ এবিষয়ে উপদেশ দিবেন। তথাপি এই প্রবন্ধ সাধারণ লোকের জন্যও লিখিত বলিয়া এবং ম্যালেরিয়া এমনই সাধারণ রোগ যে, অনেক আনাড়িকেও বাধ্য হইয়া উহার চিকিৎসা করিতে হয় বলিয়া, এতৎ সম্বন্ধে দুই একটি স্থূল কথা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। ডাক্তারগণের মতে কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ঔষধ ; ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে যাহাদিগকে বাস করিতে হইবে তাহাদিগকে লবণ, তৈল ও মশলার খরচের ন্যায় দৈনিক কুইনাইন খরচারও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যহ দুই এক গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়া উচিত। অন্য অনেকে বলেন, প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া কুইনাইন না খাইয়া সপ্তাহে দিন দুই উপরি উপরি তিন চারি গ্রেণ করিয়া খাইবে। শেষোক্তটি আধুনিক মত। ঐরূপভাবে কুইনাইন সেবন করিলে আর ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

(গ) আমাদের শরীরকে এরূপ ভাবে শিক্ষিত করা আবশ্যক, যাহাতে উহার রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার ক্ষমতা জন্মে। এই বিষয়টিই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ম্যালেরিয়াসম্পর্কে এ বিষয়ে কোনওরূপ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। এই কারণে আমার এই নূতন মতবাদ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আমি বিশদরূপে আলোচনা করিব।

"শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাও তাহাই সয়" এই প্রবাদ বাক্য আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। শরীরের সহিষ্ণুতাশক্তি যে অত্যন্ত অধিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একজন প্রধান অহিফেনসেবী যে মাত্রায় আফিং এক এক বারে সেবন করেন, অনভ্যস্ত তিন চারি ব্যক্তির উহা সেবনে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। ডারউইন বরফের দেশে সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহ লোক অবিচলিতভাবে বাতাসে বসিয়া আছে, দেখিয়াছিলেন। সুশ্রুতে লিখিত আছে, প্রাচীন ভারতের কুটিল ব্যক্তিগণ রাজা বা অন্য শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য কোন কন্যাকে শিশুকাল হইতে একটু একটু করিয়া বিষ খাইতে অভ্যস্ত করিয়া বিষকন্যা প্রস্তুত করিত। শরীরের অভ্যাসশক্তির সম্বন্ধে এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ মিট্‌সিনিকফ (Metschnikoff) প্রভৃতির চেষ্টায় শরীরস্থ শ্বেত-রক্ত-কণিকাগুলির (White Corpuscles) কার্য্য আবিষ্কৃত হওয়ায়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ও শারীরবিধানশাস্ত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, রক্তস্থ শ্বেতকণিকাগুলি শরীরের রক্ষীসৈন্যের কার্য্য করিয়া থাকে। শরীরের মধ্যে কোনও প্রকার অনিষ্টকারী পদার্থ প্রবেশ করিলে, উহারা তাহাদিগের অপকারিতা হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। পদার্থগুলি সজীব হইলে উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করে, নির্জ্জীব হইলে তাহাদিগকে সত্বর শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করে কিম্বা শরীরের কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইয়া বন্দী করিয়া রাখিয়া দেয়। অপকারী পদার্থের সংখ্যা যদি শ্বেতকণিকাগুলির অপেক্ষা অধিক হয়, কিম্বা যদি তাহারা অধিকতর পরাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত সংগ্রামে শ্বেতকণিকাগুলি পরাভূত হয় ও দেহ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, দেহস্থ শ্বেতরক্তকণিকাগুলিই শরীরকে বিবিধ অপকারী পদার্থের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপাদান নহে ; পরন্তু শরীরগঠনকারী যাবতীয় কোষগুলিই (Cells) অল্পাধিক পরিমাণে শরীরআক্রমণকারী বিষের প্রতিষেধক পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ। শুধু তাহাই নহে, রক্তস্থ তরল পদার্থেরও (Plasma) বিষদোষ নাশ করিবার গুণ আছে ; এবং শরীরনির্ম্মাণকারী কোষগুলির (Cells) চারি ধারে অবস্থিত যে রস (Lymph) আছে, তাহার এই বিষদোষ নাশ করিবার গুণ আরও অধিক। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ রক্তস্থ বা কোষমধ্যস্থ রস লইয়া তাহার সহিত কিছু রোগ উৎপাদনকারী বা অন্যবিধ জীবাণু মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ জীবাণুগুলি শরীরের রসের বিষনাশক ও বীজনাশক গুণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নানা কারণে বহুসংখ্যক রোগ উৎপাদনকারী ব্যাকট্রিয়া বা বীজাণু আমাদের শরীরমধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা আমাদের শরীরস্থ রস বা শ্বেতরক্তকণিকাগুলির দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি কোন কারণে শরীরস্থ শ্বেতকণিকাগুলির বিষদোষনাশক কিম্বা বীজাণুনাশক শক্তির অল্পতা ঘটে, তাহা হইলেই দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কথাটি আরও ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। মনে করা যাউক যে, দশটি মশক দংশন করিলে যে পরিমাণ ম্যালেরিয়ার বীজাণু শরীরমধ্যে প্রবেশ

করিবে তাহা সহজেই শরীররক্ষী কণিকা ও রসের সাহায্যে বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যদি এককালে একশত মশক দংশন করে, তাহা হইলে বীজাণুর সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে যে, কণিকা ও রস তাহাদিগের কতকগুলিকে বিনষ্ট করিতে পারিলেও যেগুলি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা রোগ সৃষ্টি করিবে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, শরীরের কোনও দুর্ব্বল অবস্থায় শরীরস্থ রসের শক্তি এত অল্প থাকিতে পারে যে, তখন অতি অল্পসংখ্যক বীজাণুই রোগ উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

পণ্ডিতগণ ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, শরীরের এই জীবাণু ও বিষদোষ-নাশক ক্ষমতার অনেকটা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, কোন লোককে যদি এক ভরি পরিমিত আফিং খাওয়ান যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। অহিফেনের বিষ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের রসের বিষনাশক শক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু রসের শক্তি তখনও সম্যক জাগ্রত হয় নাই, কাযেই দেহ উক্ত বিষের শক্তি অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু যদ্যপি ঐ ব্যক্তি প্রথম বারে অল্প মাত্রায় আফিং সেবন করে, তাহা হইলে তাহার শরীরের রসের অহিফেনের বিষপ্রতি-ষেধক গুণ উক্ত বিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে পরাভূত ত করিবেই; অধিকন্তু উহা পরদিন আরও অধিক অহিফেনবিষের সহিত যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য সঞ্চয় করিবে; এবং দিন দিন অহিফেনের মাত্রা বাড়াইয়া তাহার রসের বিষ-প্রতিষেধক সামর্থ্য এত বাড়িয়া যাইবে যে, সে কালে বহু মাত্রায় আফিং সেবন করিতে পারিবে। আমাদের দেশের অনেক লোকের বিশ্বাস যে, ম্যালেরিয়া জ্বর যদি কুইনাইন সেবন না করিয়া সারান যায়, তাহা হইলে সেই আরোগ্য অধিক দিন স্থায়ী হয়। লোকের এই বিশ্বাসটি অসঙ্গত নহে। শরীর যদি অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় রসের ও রক্তকণিকার বীজাণুধ্বংশকারী শক্তির দ্বারা আপনাকে আরোগ্য করে, তাহা হইলে উহার ঐ শক্তির এরূপ বিকাশ হইবে যে, পরবারে আরও অধিক সংখ্যক জীবাণু উহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। মানবশরীর এইরূপে আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয় করে বলিয়া যে সকল রোগ প্রথম প্রথম কোনও দেশে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, কিয়ৎকাল সেই দেশমধ্যে অবস্থানের পর তাহাদের ভীষণত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই কারণেই দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া যখন প্রথম বঙ্গদেশে আসিয়াছিল তখন উহার যেরূপ ভীষণ মারাত্মক শক্তি ছিল, এখন আর

সেরূপ শক্তি নাই। ইহা দেখা গিয়াছে যে, ম্যালেরিয়াসঙ্কুল দেশে অধিকাংশ লোক জ্বরে ভুগিলেও সেই স্থানের জনকতক লোক ঔষধাদি সেবন না করিয়াও বেশ সুস্থ থাকেন। কিরূপে এই সকল লোক ম্যালেরিয়া হইতে অব্যাহতি পাইবার শক্তি (immunity) সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমি এরূপ একটি লোক দেখিয়াছিলাম। তাঁহার মশকভয় বড় প্রবল ছিল। দুই একটি মশকের ডাকেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত এবং তিনি মশারী না হইলে কখনও নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। তদ্ব্যতীত তিনি অত্যন্ত নিয়মিত অভ্যাসের লোক ছিলেন; তাঁহার আহারাদি কিছুই অনিয়মে হইতে পারিত না। তাঁহার ঐ দুইটি অভ্যাসই যে বিশেষ উপকারী ছিল তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, মশারীব্যবহারনিবন্ধন তাঁহার শরীরে এককালে অধিক বিষ যাইতে পারিত না; এইরূপে তাঁহার শরীরে ক্রমশঃ অব্যাহতিশক্তি (immunity) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় অভ্যাসটির ফলে ম্যালেরিয়াবিষ কোন সময়েই তাঁহার দেহকে কাবু অবস্থায় পাইত না। ম্যালেরিয়াসঙ্কুল স্থানে যাঁহাদের থাকা অভ্যাস তাঁহারা জানেন যে, তথায় অতি অল্পমাত্র অনিয়মের ফলে জ্বর হয়। সামান্য অতিভোজনে বা অতিশ্রমে ম্যালেরিয়া উপস্থিত হয়। ঐ সকল কারণে শরীর যখন দুর্ব্বল হয়, তখন অল্প সংখ্যক জীবাণুও শরীরে প্রবেশ করিয়া তথায় বংশবৃদ্ধি করিতে ও রোগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।

কি প্রকার শিক্ষায় আমাদের শরীরে অব্যাহতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে?

ইহাই আমাদের শেষ আলোচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমার বিবেচনায় নূতন। ম্যালেরিয়াযুক্ত দেশে বহুকাল বাসনিবন্ধন কতকগুলি দেশীয় সংস্কারের সহিত আমি পরিচিত হইয়াছিলাম। রক্তসঞ্চালন তত্ত্ব (circulation) ও অব্যাহতিতত্ত্বের (immunity) অধ্যয়ন, আলোচনা ও চিন্তার ফলে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রচলিত দেশীয় সংস্কারগুলিতে অনেক সত্য নিহিত আছে। পূর্ব্বে যে সকল কথা একান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইত, এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের কারণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এক সম্প্রদায় সাধারণ লোকের সংস্কারমাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা একান্ত একদেশদর্শী; কারণ, তাঁহারা বিনা বিচারে ফতোয়া দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের সকল

সংস্কার বা ধারণা অনেক সময়ে অল্প বা অধিক পর্য্যবেক্ষণের ফল। হইতে পারে,তাহারা অনেক সময় অল্প বা অধিক ঘটনা হইতে ভ্রান্ত মত (inference) সংগঠিত করে। তাহাদিগের সংস্কারকে বিজ্ঞানের উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ঐ সংস্কার কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার ভিতরে কতটা সত্য ও কতটা অসত্য আছে, তাহাও বিজ্ঞানকে নির্ণয় করিতে হইবে। ক্লীফোর্ড বলেন, বিজ্ঞান শৃঙ্খলাবদ্ধ সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। * বিজ্ঞানকে একটা উৎকট রকমের জিনিস বলিয়া লোকের কাছে খাড়া করা সমীচীন নহে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণও সাধারণ জ্ঞানকে বিনা বিচারে অস্বীকার করেন নাই। প্রসিদ্ধ জেনার গোয়ালাদিগের নিকট হইতে আপনার গোবীজের টীকার আভাস পাইয়াছিলেন। ডারউইন গল্প শুনিয়াছিলেন যে, ফরাসীদেশীয় সীম গাছের নিকটে সঙ্গীত করিলে উহার বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তিনি সত্যসত্যই এক বেহালাবাদককে ঐ গাছের নিকট সঙ্গীত করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ, আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে নিজ নিজ মনকে নিরপেক্ষ রাখিয়া সত্যেরই সমাদর করিতে হইবে। সত্য সক্রেটিস বা প্লেটোর নিকট হইতে আসিলেই আদরণীয় হইবে, নিত্যানন্দের নিকট হইতে আসিলে হইবে না, এমন নহে।

উপরে যে সাধারণ সংস্কারগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা এই :—

(১) সর্দ্দি হইলে লোককে অধিক জল খাইতে দেওয়া হয় না। সোডিয়াম সালফেট্ প্রভৃতি জোলাপ শরীরের জল বাহির করিয়া বিষ্ঠাকে তরল করে ও পরে জোলাপের কায করে। উহাতেও সর্দ্দি ভাল হয়।

(২) সর্দ্দি হইলে লোক গরম রস পান করে। অনেকে গরম জিলিপিও সর্দ্দির ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। এই দুই উপায়ে সর্দ্দি আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

(৩) ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে লোক জ্বরের পর কিম্বা শরীরে জ্বরভাব হইলে ভাত খায় না। তাহাদিগকে রুটী খাইতে দেওয়া হয়। রোগীকে ভাত দেওয়ার পরও কিছুকাল তাহার এক বেলা ভাত ও অপর বেলা রুটীর ব্যবস্থা থাকে। শরীরবিধানবিৎ (Physiologist) পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, রুটী অপেক্ষা ভাত অনেক সহজে হজম হয়। এমন কি ভাত সাগু অপেক্ষাও

---

* Science is organised common sense

সহজে জীর্ণ হয়। এই কারণে আমার পরিচিত এক ডাক্তার রোগীদিগকে রুটীর পরিবর্ত্তে ভাত দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

(৪) অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও একাদশী প্রভৃতির উপবাসে রোগীর উপকার হয় বলিয়া শুনিয়াছি।

(৫) ঘৃত, মাংস ও মিষ্টান্নাদিসংযুক্ত প্রচুর আহারের পর লোক অত্যন্ত তৃষ্ণা অনুভব করে ও প্রচুর জল পান করে।

(৬) পালওয়ানগণ কসরতের পর শুধু জল পান করে না, কিন্তু প্রচুর সরবত পান করে। ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে লোক প্রাতঃকালে শুধু জল পান না করিয়া মিষ্ট ও জল খাইয়া থাকে।

(৭) শীতকালে লোক খুব কম জল পান করে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহারা প্রচুর জল পান করে।

(৮) শীতপ্রধান দেশের লোক স্বভাবতঃই পানীয়ের জন্য মদ্য, চা, কফি প্রভৃতি উত্তেজকপদার্থমিশ্রিত জল পান করিয়া থাকে; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক সাধারণতঃ বিশুদ্ধ জল পান করিয়া থাকে।

(৯) কবিরাজী চিকিৎসামতে নব জ্বরে লঙ্ঘনই প্রথম ব্যবস্থা। এই উপবাসের দ্বারাই সেকালে অনেক রোগ আরোগ্য হইত। এখনও লোক বলিয়া থাকে "মুখ চোখ রসে টস্‌টস্‌ করিতেছে; অসুখ এখনও কমে নাই; রসের পরিপাক হয় নাই"।

(১০) রসাধিক্যে জ্বর হয় লোকের এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া প্রাচীনকালে আমাদের দেশের ও য়ুরোপের লোক চিকিৎসার্থ রক্তমোক্ষণকার্য্য করিত ও জলৌকাদ্বারা শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া লইত। যদিচ কিছুকাল হইল, রক্তমোক্ষণের দ্বারা চিকিৎসাপ্রণালী লোকসমাজে নিন্দিত হইয়া পড়ে, তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ উপায়ে অনেক লোক আরোগ্য লাভ করিত।

শারীরবিধান বিদ্যার দুইটি সুপরিচিত তথ্যের সাহায্যে উপরিলিখিত সাধারণ সংস্কারগুলির অধিকাংশেরই উপকারিতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সে দুইটি তথ্য এই:—

(১) শরীরের রক্তের রসের (Plasma) জীবাণু বিনাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোষমধ্যস্থ রসের (Tissue Juice) এই জীবাণুবিনাশ করিবার শক্তি (Bactericidal Power) আরও অধিক। অর্থাৎ যে সকল

জীবাণু রক্তরসের দ্বারা বিনষ্ট হয় না তাহারা সহজেই কোষগণের মধ্যস্থ রসের দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

(২) শরীরের রক্তের আয়তন সকল সময়েই প্রায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। উহার মাত্রা যদি অধিক হয়, তবে রক্ত হইতে জল প্রস্রাবে বা ঘর্ম্মে বাহির হইয়া যায় কিম্বা কোষমধ্যস্থ স্থানসমূহে প্রবেশ করে। তদ্রূপ রক্তের পরিমাণ কমিয়া গেলে উহা হয় উদর হইতে জল শোষণ নহে ত কোষমধ্যস্থ রসকে আকর্ষণ করিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পূর্ণ করে।

ঐ কারণে দেখা যায় যে, লোকের রক্তস্রাবের পর অত্যন্ত অধিক তৃষ্ণা পায়। শরীরের রক্তের পরিমাণ—হয় উদর হইতে জল গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হইবে, নহে ত কোষমধ্যস্থ রস রক্তে আসিয়া উপনীত হইয়া রক্তের মাত্রা পূর্ণ করিবে। রক্তের সহিত রসের সংযোগ হইলে এই মিশ্র পদার্থের যে রোগের জীবাণু বিনাশ করিবার শক্তি সম্যক বৃদ্ধি পাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কারণে পূর্ব্বে রক্তমোক্ষণের ফলে অনেক রোগ আরোগ্য হইত।

উপবাসে রোগ আরোগ্য হইবার কারণও ঐরূপ। রক্তের অংশ ক্রমাগত নানা কার্য্য করিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ পাকস্থলী হইতে পরিপক্ক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রক্তের ঐ ক্ষয়ের পূরণ হয়। কিন্তু উপবাসের ফলে আর উহার উক্তরূপে ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা থাকে না। কাযেই রক্ত তখন কোষমধ্যস্থ রস টানিয়া বাহির করে। কোষের রস চলিয়া যাওয়ার ফলে কোষগুলিও শুষ্ক ও রসহীন হইয়া পড়ে। ইতোমধ্যে কোষরস রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া শরীর আক্রমণকারী রোগ বিনষ্ট করে। রক্তের কিয়দংশ যে রক্তবাহী নলগুলি হইতে বাহির হইয়া রসে(Lymph) পরিণত হয়, তাহা শারীরবিধান শাস্ত্রের অতি স্থূল কথা। এবং রসের কিয়দংশও যে রক্তের দিকে আইসে, তাহাও শারীরবিধান শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া জানা থাকিলেও, এই ঘটনা যে দেহকে রোগ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়তা করে, তাহা সাধারণ্যে সবিশেষ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। মাঝে মাঝে উপবাস শুধু যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কিম্বা ম্যালেরিয়া আরোগ্য করিবার উপায়, তাহাই নহে ; শারীরিক সমুদায় ব্যাধিই উপবাসদ্বারা আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। উপবাসে ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনারও হ্রাস হয়। কারণ, উপবাসক্লিষ্ট দেহের রক্তে রসাধিক্য থাকা প্রযুক্ত উহার জীবাণুনাশের ক্ষমতা অধিক ; উহা যে কোনও

অঙ্গের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইবার সময় তত্রস্থ জীবাণুগুলিকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে।

উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, নিরম্বু উপবাস শুধু উপবাস অপেক্ষাও হিতকর। কারণ, আহার্য্য ত্যাগ করিয়া যদি প্রচুর জল গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে রক্তের পরিমাণ বিশেষ কমিবে না। উহার ফলে রক্ত ও রসের মধ্যে যে দ্রব্য-বিনিময় তাহা সাধারণ মাত্রা অপেক্ষা অধিক হইলেও যথেষ্ট মাত্রায় অধিক হইবে না।

উক্ত আলোচনা হইতে ইহাও বোধগম্য হইবে যে, আহার গ্রহণ করিয়াও যদি জলগ্রহণ হইতে বিরত থাকা যায়, কিম্বা পানীয় জলের মাত্রা মাঝে মাঝে বহুল পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ মাঝে মাঝে শুধু পানীয় জলের উপবাস দেওয়া হয়, তাহা হইলেও রস হইতে রক্তের দিকে প্রবাহ বৃদ্ধির পক্ষে প্রভূত সাহায্য করা হইবে; কারণ রক্ত সময় মত পাকযন্ত্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জল না পাইলে রস টানিয়া বাহির করিবে এবং তাহাতে রক্তের জীবাণুনাশক শক্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে।

অতএব অমাবস্যা প্রভৃতির উপবাসদ্বারা লোক কেন যে সুফল পায়, তাহার কারণ বুঝা যইতেছে। লোক যে শরীরে জ্বরভাব হইলে কিম্বা জ্বরের পর লঘুপাচ্য অন্ন পথ্য না দিয়া দুষ্পাচ্য রুটী খাইতে দেয়, এই নূতন হিসাবে দেখিলে তাহারও কারণ সহজে উপলব্ধ হইবে। উহার প্রথম কারণ এই যে, ভাতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে, কিন্তু রুটীতে অতি অল্পমাত্র জল থাকে। উহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন ব্যক্তি যে খাদ্য খাইতে অধিক অভ্যস্ত, সে সেই খাদ্য সহজে পরিপাক করিতে পারে নূতন খাদ্য অত সহজে পরিপাক করিতে পারে না। অতএব জ্বরভাবাপন্ন কোন ব্যক্তিকে ভাত খাইতে দিলে সে সত্বরই উহার জলভাগ ও অন্যভাগ গ্রহণ করিয়া রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিবে এবং তাহার ফলে রসের রক্তের দিকে আসিবার চেষ্টা অতি সত্বরই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
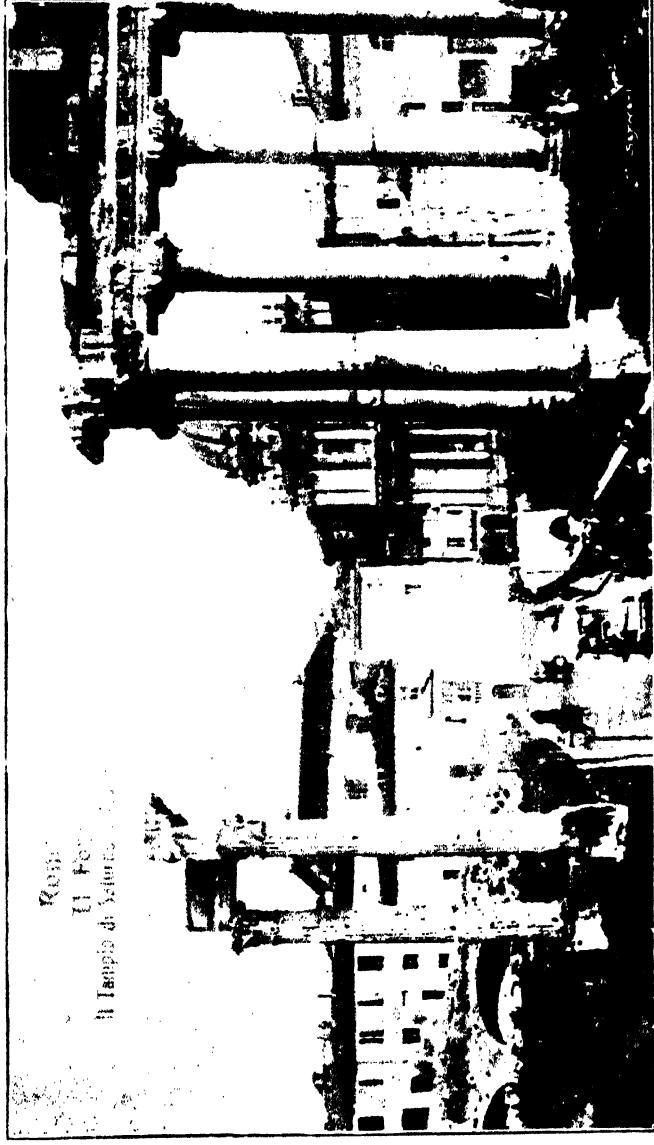
রোমান্ ফোরাম

যুরোপ-ভ্রমণ।

মিলান।

মিলান বাণিজ্যপ্রধান প্রকাণ্ড সহর। সহরের বাহিরে কিছু কিছু খোলা জায়গা আছে বটে, কিন্তু সহরের ভিতর অত্যন্ত ঘন বসতি ও দোকানপাট। রাস্তা প্রায়ই খুব সরু, আমাদের দেশের পশ্চিমোত্তর প্রদেশের সহরের রাস্তার ন্যায়। বিশেষতঃ Corso Vittorio Emanuele (কর্সো ভিটোরিও এমান্নুয়েল) নামক যে রাস্তার একমুখে প্রসিদ্ধ মিলান কেথিড্রেল অবস্থিত এবং যাহার দুই ধারে মিলানের প্রধান প্রধান বিপণী-শ্রেণী তাহা একেবারেই সরু রাস্তা। এই পথের ধারেই একটি হোটেলে আমি ছিলাম। সন্ধ্যার পর এই পথের শোভা অতি সুন্দর। অসংখ্য বিদ্যুতালোকে সজ্জিত বিপণীশ্রেণী এবং ক্রেতা ও দর্শকের সমাবেশে পথটি অত্যন্ত জাঁকালো দেখায়।

মিলানের বড় ষ্টেশনে রেল পৌঁছিবার পূর্ব্বে অনেকগুলি কারখানা নয়ন-গোচর হয় এবং ষ্টেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাম পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড বিদ্যালয় (Elementary and Technical School) দেখা যায়।

ষ্টেশনের বাহিরেই একটি প্রকাণ্ড উদ্যান (Public Gardens)। ইহা ষ্টেশন ও চতুঃপার্শ্বস্থ রাস্তা হইতে কিছু উচ্চ। এই বাগানের মধ্যে অনেক মেলা প্রভৃতি বসে এবং অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় মিলানবাসীরা এই স্থানে আসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন সহরে নূতন পার্ক (Nuovo Parco) নামক আর একটি প্রকাণ্ড উদ্যান আছে, আমি তথায় যাই নাই।

মিলানে দেখিবার জিনিষ অনেক, কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। কিন্তু সকলের অপেক্ষা মিলান যে জন্য প্রসিদ্ধ সেই কেথিড্রালের কথা সর্ব্বাগ্রে বলা উচিত।

মিলান কেথিড্রাল বা ডুওমো (Duomo) মর্ম্মরে রচিত এক প্রকাণ্ড মন্দির। যদিও ইহাতে তাজের সরল সৌন্দর্য্যের অভাব তথাপি ইহার সামঞ্জস্য অতি বিস্ময়কর। পৃথিবীতে এক রোমের সেণ্ট পিটার্স ব্যতীত এত বড় ভজনালয় আর নাই; কিন্তু ইহা এমনই চমৎকার ভাবে গঠিত যে, ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথম মনেই হয় না যে, বিশেষ একটা বড় হলে

ঢুকিয়াছি। ভিতরে ঘুরিলে তবে বুঝা যায়, কত বড় ব্যাপার। দেড় শত গজ লম্বা ও এক শত গজ চওড়া একটি প্রকাণ্ড মার্ব্বলের হল। ভিতরে, বাহিরে ও ছাতের উপর অসংখ্য মর্ম্মরগঠিত প্রতিমূর্ত্তি, ছাতের উপর শত শত turrets—প্রত্যেকটির গঠনকৌশল অতি চমৎকার। যে স্থানে দাঁড়াও চারিদিকেই সমান বোধ হয়, সমস্তই অতি সামঞ্জস্যসহকারে গঠিত। প্রত্যেক জানালার প্রত্যেক খিলানে, প্রত্যেক স্তম্ভে মর্ম্মরে ক্ষোদিত অতি সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায়। ছাতের উপর হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

এই মন্দির মনে যে সৌন্দর্য্যের ভাব সঞ্চারিত করে তাহা অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। ইহাকে "মর্ম্মরে গঠিত প্রেমস্বপ্ন" বলা যায় না; কিন্তু মর্ম্মরে গঠিত পরিরাজ্য নাম বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এই কেথিড্রাল ব্যতীত মিলানে দ্রষ্টব্য স্থান অনেকগুলি, তাহার মধ্যে (১) ব্রেরা (২) অনেকগুলি অতি প্রাচীন গির্জ্জা (৩) বিশ্রুত Last Supper নামক চিত্র (৪) পিয়াসা স্কালা (Piazza della Scale) এবং (৫) গোরস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আদেশে প্রস্তুত Arena বা ঘোড়দৌড়ের স্থান ও Arch of Triumph বা মর্ম্মরমূর্ত্তিপরিশোভিত প্রকাণ্ড মর্ম্মরখিলানও দেখিবার জিনিষ। মিলান হইতে আল্পসের উপর পর্য্যন্ত Simplon রোড নামক রাস্তা শেষ করিয়া নেপোলিয়ন এই খিলান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

(১) ব্রেরা (Brera) একটি প্রাসাদ। এই প্রাসাদে পুস্তকাগার, মানমন্দির ও চিত্রশালা আছে। পুস্তকাগার ও মানমন্দির আমি দেখি নাই। চিত্রশালা অতি প্রকাণ্ড। ইটালির বিখ্যাত সকল চিত্রকরের চিত্রই চিত্রশালায় আছে। তন্মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—র‍্যাফেলের অঙ্কিত মেরি মাতার বিবাহ, গিডো রেণির অঙ্কিত পিটার ও পল এবং এলবানোর অঙ্কিত প্রেমের নৃত্য (Dance of the Cupids) টিসিয়ান মুরিলো প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরের চিত্র এই স্থানে দেখা যায়। এই চিত্রশালার চিত্রের এক বিশেষত্ব দেখিলাম যে, অধিকাংশ চিত্রই মাতৃমূর্ত্তি, Madonnaর ছবির কিছু ছড়াছড়ি।

ব্রেরার উঠানে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত এক রোমান মূর্ত্তি আছে। রোমান মূর্ত্তি অর্থে রোমক সম্রাটদিগের ন্যায় বেশপরিহিত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ক্যানোভার (Canova) রচিত।

(২) প্রথমেই বলা উচিত যে, ইটালিতে ভজনালয়ের অত্যন্ত আধিক্য; এক এক সহরে এত গির্জ্জা আছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মিলানের পুরাতন গির্জ্জার মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একটির নাম ইউষ্টর্জিও (Sant Eustorgio), ইহা নাকি ৩২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এবং দ্বিতীয়টি এম্‌ব্রোজিও (Ambrogio or St. Ambrose) ইহাও খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রস্তুত এবং অগষ্টাইন এই স্থানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চকমিলান বাড়ী, একটি বারাণ্ডায় বহু পুরাতন সমাধি, দেওয়ালের উপরিস্থিত কারুকার্য্য প্রভৃতির চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছে। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভজনালয় Santa Maria Delle Grazie যথায়

(৩) Leonardo da Vinciর Last Supper চিত্র অবস্থিত। একটি ছোট রকম হল; তাহার এক পার্শ্বের একটি দেওয়াল সম্পূর্ণ জুড়িয়া এই প্রসিদ্ধ চিত্র। কাগজে নহে, কাপড়ে নহে, দেওয়ালের গাত্রে এই চিত্র অঙ্কিত। মধ্যে যিশু, দুই পার্শ্বে তাঁহার শিষ্যরা আহারে বসিয়াছেন। যিশু বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষিপ্ত করিবে" ঠিক সেই সময়ের ভাব অঙ্কিত। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যের মনোভাব ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও যুডাসের মুখভঙ্গী অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে এই চিত্র অঙ্কিত। দেওয়ালে ঠাণ্ডা লাগিয়া চিত্র অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, একজন ইহার সংস্কার করিয়াছেন। চিত্রখানি অতি সুন্দর। এই ছবির আদর্শে অঙ্কিত অনেক চিত্র ইটালির অনেক চিত্রশালায় দেখা যায়; এমন কি মিলানেই আর দুইখানি আছে।

(৪) কেথিড্রালের সম্মুখেই ইটালির রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রকাণ্ড অশ্বারোহী মূর্ত্তি। তাহার পর গ্যালারি ভিটোরিও ইমানুয়েল নামক অতি সুন্দর বাজার। কলিকাতায় আজকাল হোয়াইট্যাবের যেরূপ দোকান হইয়াছে অনেকটা ঐরূপ প্রকাণ্ড কাচমণ্ডিত বাড়ী। মধ্যে প্রকাণ্ড উঠান, চতুঃপার্শ্বে দোকান, সবটাই কাচে মণ্ডিত। এই স্থানের নাম পিয়াসা স্কালা এবং এই স্থানে লেনার্ডো ডাভিঞ্চির এক মূর্ত্তি স্থাপিত।

(৫) গোরস্থান খুব বৃহৎ একটি মাঠ, চতুর্দ্দিকে বৃতিবেষ্টিত; তাহাতে মিলানবাসী যত বড় বড় পরিবারের সমাধিস্থান। প্রত্যেক গোরের উপর অতি সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি। কত রকমের মূর্ত্তি ও কত রূপক যে এই স্থানে রক্ষিত তাহা আর কি বলিব। মর্ম্মর ভিন্ন ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিও কতকগুলি আছে। আবার শব

দাহের ব্যবস্থাও আছে। প্রায় দেড়শত বিঘা ব্যাপী এই গোরস্থান বাস্তবিকই অতি গম্ভীরভাবব্যঞ্জক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিলান খুব বড় সহর। ইহার অধিবাসীসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। ইহা একটি খুব প্রাচীন নগরও বটে। রোমক সাম্রাজ্যের সময়ও মিলান খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এক স্থানে ১৬টি বৃহৎ কোরিন্থিয়ান স্তম্ভ দণ্ডায়মান, সেই স্থানে প্রাচীন মিলানের ফটক ছিল। ফটক আরও দুই তিনটি দেখা যায়।

মিলানের চতুঃপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় আছে, ইহা খাল কি পুরাতন গড়খাই তাহা বলিতে পারি না। ইহার জল অত্যন্ত দুর্গন্ধ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ মিলানে অনেক; প্রায়ই অভিজাত বংশীয়দিগের আবাসস্থল, এখনও কোন কোনটি ব্যক্তি বিশেষের বাসগৃহ কোনটি বা সরকারী আফিস; এইরূপ একটি প্রাসাদের চত্বরে তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত।

রোম।

রাত্রি নয়টায় মিলান ছাড়িয়া তাহার পরদিন প্রাতঃকালে রোম (ইতালীয় ভাষায় রোমা) পৌঁছিতে হয়। মিলানের রেলওয়ে ষ্টেশনটি অতি বৃহৎ, টিকিট প্রভৃতির আফিস হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে যাইতে ভূগর্ভস্থ রাস্তা দিয়া যাইতে হয়।

গাড়িতে উঠিয়া দেখিলাম, বেশ ভিড়। শুইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ১৭ টাকা খরচ করিয়া একরাত্রি নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হইল না, (মিলান হইতে রোম পর্য্যন্ত Sleeping Carএর ভাড়া ১৭ টাকা) কাযেই বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। মধ্যরাত্রিতে বলোনিয়া (Bologna) নামক স্থানে আর একজন যাত্রী ব্যতীত সকলে নামিয়া গেলেন, তখন বেশ ঘুমান গেল।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ, সূর্য্য হাসিতেছে। য়ুরোপে আসিয়া পর্য্যন্ত আর এ দৃশ্য দেখি নাই। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ছোট ছোট মেয়েরা সুর করিয়া জর্ণালি (Giornali বা খবরের কাগজ) বেচিতেছে, সে সুরও যেন আমাদের দেশের মেয়েদের গলার সুর। তদ্ভিন্ন পথের ধারে দেখি, গরুতে লাঙ্গল টানিতেছে ও গরুর গাড়ি যাইতেছে। য়ুরোপে আর কোথায় এ দৃশ্য নাই।

রোমে পৌঁছিবার প্রায় বিশ মাইল পূর্ব্বে একটা ছোট পাহাড়ের মত দেখি-

লাম ; রেলের পাশ দিয়া যাইতেছে, লোক গরু ভেড়া লইয়া হাঁটিয়া পার হইতেছে। শুনিলাম, ইনিই টাইবার সেই Father Tiber to whom the Romans pray.

দশ মাইল দূর হইতে সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জার গম্বুজ নয়নগোচর হয়। মনে পড়ে, আগ্রার তাজমহলও প্রায় ১০।১২ মাইল দূর হইতে প্রথম দেখা যায়। ট্রেণ রোম সহরটি প্রায় পরিক্রমণ করিয়া সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে আসিল। পৌঁছিবার কথা বেলা নয়টায়, পৌঁছিল প্রায় সাড়ে দশটায়। ব্রেকে মালের খোঁজ করিতে যাইয়া শুনিলাম, মাল তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আরও ২।৩ ঘণ্টা পরে পুনরায় গাড়ি আসিবে, তাহাতে মাল আসিবে।

হোটেলে যাইয়া শুনিলাম, কুক কোম্পানির প্রেরিত "সেখোঠাকুর" গাড়ি লইয়া বসিয়া ছিলেন ; দশটার পর কেহ খবর দিয়াছে যে, মিলানের ট্রেণ পৌঁছিয়াছে, তাহাই শুনিয়া আমি আসিলাম না মনে করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন !

প্রদর্শককে আসিতে টেলিফোন করিয়া স্নান করিয়া লইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এ বেলা আর পাওয়া যাইবে না। কাযেই সাধারণ ভাড়াটিয়া গাড়ির শরণাপন্ন হইতে হইল।

প্রথমেই প্যান্থিয়ন (Pantheon) দেখিতে গেলাম। পথে বাহির হইলেই রোম দর্শককে মুগ্ধ করে। অসমতল সরু সরু পুরাতন পাতর-বাঁধান রাস্তা ; রাস্তার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ, মাঝে মাঝে বাগান, পথের মধ্যে দুই চার শত ফুট অন্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারা,—প্রত্যেক ফোয়ারা ব্রোঞ্জ বা মার্ব্বেলনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পির মূর্ত্তিগুচ্ছ সম্বলিত,—কোথাও বা Triton blowing his horn, কোথাও বা Horse Tamerএর মূর্ত্তিগুচ্ছ। সর্ব্বোপরি রোমের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মৃতি। এই সমস্ত মিলিয়া বাস্তবিকই পর্য্যটকের মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে।

প্যান্থিয়ন একটি বৃত্তাকার হল। মার্ব্বলের দেওয়াল—বাইশ ফুট চওড়া, গম্বুজ তাম্রমণ্ডিত ; গম্বুজের ঠিক মধ্যস্থলে ত্রিশ ফুট একটি ছিদ্র। এই ছিদ্র-পথে ও একমাত্র দ্বারপথে গৃহে আলোক প্রবেশ করে। দ্বার ব্রোঞ্জনির্ম্মিত। গম্বুজ সুগোল, উহার উচ্চতা ও পরিধি উভয়ই সমান, প্রায় ১৫০ শত ফুট। এই প্যান্থিয়নের স্তম্ভগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য ক্ষোদিত। প্যান্থিয়নে

রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ও রাজা হাম্বার্টের সমাধি বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন ভুবনবিখ্যাত চিত্রশিল্পী র‍্যাফেল এই স্থানে মহানিদ্রায় নিদ্রিত।

প্যান্থিয়ন হইতে স্যান জোভানি লেটারাণোর গির্জ্জা (San Giovanni in Laterano) দেখিতে গেলাম। বলা বাহুল্য, রোমে সহস্র সহস্র গির্জ্জা আছে, প্রত্যেকটিই সুন্দর এবং প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু চিত্রশিল্প বা মর্ম্মরশিল্পের প্রকৃষ্ট আদর্শ বিদ্যমান। কিন্তু পর্য্যটকের পক্ষে সে সমস্ত দেখা সম্ভব নহে; আমি যে কয়টি দেখিয়াছিলাম সব কয়টির কথা আমার বিশেষ মনে নাই। যতদূর স্মরণ হয় লিখিতেছি। রোমের সমস্ত ভজনালয় দেখিতে বোধ হয় বর্ষাধিককাল অতিবাহিত হয়।

এই লেটারেণো গির্জ্জার বিশেষত্ব, ইহাতে বরোমিনি (Borromini) কৃত খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন ইহাতে একটি বেদী আছে, তাহার মধ্যে নাকি সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট পলের মস্তক নিহিত।

এই স্থান হইতে "পবিত্র সিঁড়ি" দেখিতে গেলাম। ইহা পণ্টিয়াস পাইলেটের বাড়ীর সিঁড়ি;—যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যিশু ক্রুশস্থানে গিয়াছিলেন, সেই ২১টা ধাপসম্বলিত সিঁড়ি নাকি এই। ভক্ত ক্যাথলিকরা হাঁটিয়া এই সিঁড়িতে উঠেন না, হাঁটু গাড়িয়া উঠেন। সিঁড়ির নিম্নে পোপের এক হুকুমনামা রহিয়াছে, হাঁটু গাড়িয়া এই সিঁড়িতে উঠিলে কয় পুরুষ মুক্ত হইবে তাহারই আদেশপত্র!

রোমের কোলিসিয়মের নাম সকলেই শ্রুত আছেন। রোম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিসময়ে এই স্থানে বহুপ্রকার মল্ল যুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি হইত এবং সম্রাট ও স্ত্রীপুরুষ সকলে তাহা দেখিতেন। কোলিসিয়মে মৃতপ্রায় গ্লাডিয়েটরের দর্শকের অঙ্গুষ্ঠের প্রতি ক্ষীণ দৃষ্টি (রমণীরা অঙ্গুষ্ঠ নিম্নমুখী করিলে পরাজিত ব্যক্তি হত হইত) অনেক কবিতার ও চিত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সেই কোলিসিয়মের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। তিন দিকে ৫।৭ তল উচ্চ গ্যালারির মত (Tiers of galleries) মধ্যে মধ্যে পথ এবং একদিকে হিংস্র জন্তু ও দাসদিগের থাকিবার অন্ধকার কক্ষগুলি। এই প্রকাণ্ড স্থানে এক সঙ্গে ৪০।৫০ হাজার দর্শকের স্থান হইত। সম্রাটের বসিবার স্থানের নিকটে কতকগুলি গর্ত্ত দেখা যায়—তাহাতে খুঁটি লাগাইয়া চন্দ্রাতপ খাটান হইত, পাছে রাজার রৌদ্র লাগে। এই কোলিসিয়মের বসিবার আসন দেখিয়া

লণ্ডনের Albert Hallএর বসিবার ব্যবস্থা মনে পড়ে এবং হিংস্র জন্তুগুলির জন্য নির্ম্মিত বিবরাদি দেখিয়া আগ্রার দুর্গের একাংশ স্মৃতিপটে উদিত হয়।

কেলিসিয়ম পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখি, এক স্থানে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছে। একটু দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আমাদের দেশের সেই সনাতন ডাণ্ডাগুলি খেলা; দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। কেলিসিয়মের নিকটেই Roman Forum বা প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ। এখনও ইহার খনন কার্য্য চলিতেছে ও নিত্য নূতন স্থান আবিষ্কৃত ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা ইতিহাসখ্যাত স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যে স্থানে ব্রুটাসের বক্তৃতা হইয়াছিল, যে স্থানে মার্ক এণ্টনি রোমকদিগের প্রতিহিংসানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, যে স্থানে জুলিয়াস সিজারের শবদাহ হইয়াছিল, যে সব রাস্তা বাহিয়া রোমক সেনানীগণের বিজয়-অভিযান (Triumphs) আসিত, সেই সকল স্থান দেখিতে দেখিতে মনে কতরূপ ভাবের উদয় হয় তাহার আর কি বর্ণনা করিব।

এই স্থান হইতে সেণ্ট পিটার্স দেখিতে গেলাম। সকলেই জানেন, ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভজনালয়। মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড চাতালের মত। এই চাতাল শত শত স্তম্ভে সজ্জিত এবং সেই স্তম্ভগুলির উপর ছাত দিয়া রাস্তার মত করিয়াছে। সেই রাস্তায় দুইখানা গাড়ি পাশাপাশি যাইতে পারে। উপরে প্রায় ১৫০ শত সেণ্টদিগের প্রতিমূর্ত্তি। এই চাতালের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড Obelisk স্থাপিত ও দুইপার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড ফোয়ারা। এই চাতালের পার্শ্বে পোপের রাজ্য ভেটিকানের (Vatican) প্রবেশদ্বার।

এই চাতাল পার হইয়া কতকগুলি সিঁড়ি উঠিয়া ভজনালয়ের বারাণ্ডা পাওয়া যায়। মন্দিরের পাঁচটি দ্বার, সর্ব্বমধ্যস্থিত দ্বার বন্ধ থাকে, মাত্র পঁচিশ বৎসর অন্তর একবার খোলা হয়। বারাণ্ডার দুই পার্শ্বে দুইটি মূর্ত্তি, একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সার্লেমেনের ও অন্যটি কন্‌স্ট্যাণ্টাইন দি গ্রেটের।

এই গির্জ্জা যে কত বড় তাহা প্রথম ঢুকিয়া বোধগম্য হয় না। আমার সেথো তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া সর্ব্বনিকটস্থ স্তম্ভ ও তদুপরিস্থ বালমূর্ত্তি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মূর্ত্তিগুলি কত বড় বোধ হয়?" আমি আন্দাজ করিয়া বলিলাম, "বোধ হয় তিন ফুট হইবে।" তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা নিকটে যাইয়া দেখুন।" আমি যতই অগ্রসর হই মনে হয় যেন স্তম্ভ পিছাইতেছে ও মূর্ত্তিগুলি বড় হইতেছে! ক্রমে

নিকটে যাইয়া দেখিলাম, মূর্ত্তিগুলি ছয় ফুট অপেক্ষাও অধিক উচ্চ। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এই মন্দিরে যে কত সুন্দর সুন্দর চিত্র, কত সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি রহিয়াছে তাহা আর কি বলিব। ছাতে অনেক চিত্র ও যিশুশিষ্য-দিগের মূর্ত্তি লিখিত আছে। গম্বুজটি অতি প্রকাণ্ড। চারিটি স্তম্ভের উপর এই গম্বুজ নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভের পরিধি ২৫০ শত ফুট। এই গম্বুজের মধ্যে অনেক Mosaics আছে; ঠিক মধ্যস্থলে God the Father অঙ্কিত। গম্বুজের গাত্রে লাটিন ভাষায় একটা লিপি আছে; শুনিলাম, প্রত্যেক অক্ষর ৬॥০ ফুট উচ্চ। নিম্ন হইতে দেখিলে ছাপার অক্ষর অপেক্ষা বিশেষ বড় মনে হয় না। ইহাতেই উপলব্ধি হইবে, গম্বুজ কত উচ্চ।

মন্দিরের মধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তিগুলির মধ্যে সেণ্ট পিটারের একটি উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে। ইহা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত উপাসকরা ইহার দক্ষিণ পদ চুম্বন করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিকই দক্ষিণ পদ কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মন্দিরে অনেক পোপের সমাধি ও স্মৃতিচিহ্ন আছে। ক্যানোভা, মিকেলেঞ্জেলো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মর্ম্মর-শিল্পীর রচনা অনেক মূর্ত্তিও দেখা যায়। এই মন্দি-রের সৌন্দর্য্য এবং অদ্ভুত সামঞ্জস্য-শোভা বহুক্ষণ না দেখিলে উপলব্ধ হয় না। It grows upon one কিছুক্ষণ ক্ষেপন করিয়া এই স্থান হইতে চলিয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হয়।

সেণ্ট পিটার্সের পরেই সেণ্ট পলের গির্জ্জার কথা বলিতে হয়। আধুনিক সহরের বহির্ভাগে এক নির্জ্জন স্থানে এই মন্দির। ইহাতে বহুমূল্য অ্যালা-ব্যাষ্টার ও ম্যালাকাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত অনেকগুলি স্তম্ভ আছে। আর আছে, ইহার ছাতে সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পোপের চিত্র ও প্রত্যেকের রাজত্বকাল লিখিত। অনেকে ৮।৯ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছেন, একজন দেখিলাম, মাত্র তিন দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার চেহারাটিও কিছু অদ্ভুত, মস্তকে প্রকাণ্ড টাক ও মুখে প্রকাণ্ড দাড়ি। এতদ্ভিন্ন এই গির্জ্জায় সেণ্ট পিটার, সেণ্ট পল ও পোপ গ্রেগরির বৃহৎ মূর্ত্তি সংরক্ষিত। আর দুইটি ছোট গির্জ্জা উল্লেখযোগ্য। যে স্থানে যিশু সেণ্ট পিটারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "কোথা যাও ?" বলিয়া তাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্তকে আশ্বস্ত করেন প্রথমটি সেই স্থানে এবং যে স্থান হইতে নির্গত হইয়া সেণ্ট অগষ্টিন ব্রিটেনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যায়েন দ্বিতীয়টি সেই স্থানে। দ্বিতীয়টি অতি ক্ষুদ্র।

রোমের এক পার্শ্বে একটু উচ্চ স্থান আছে, সেই স্থানে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহা যুদ্ধহয়। সেই স্থানে এখন গ্যারিবল্ডির এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত। এই পাহাড়ের উপর হইতে পুরাতন রোমের সপ্তগিরি বেশ দেখা যায় এবং রোমের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। সন্ধ্যাকালে এই স্থান হইতে রোম দেখিতে বড় চমৎকার। এই পাহাড় হইতে নামিবার পথে দুই পার্শ্বে আধুনিক ইতালীয় ও রোমক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আবক্ষ মূর্ত্তি রক্ষিত।

বলা উচিত, গ্যারিবল্ডির মূর্ত্তি ও তাঁহার নামে রাস্তা নাই এরূপ কোনও সহর ইটালিতে নাই।

এই পাহাড়ের উপর হইতে Roman Campagna অর্থাৎ চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশ বেশ ভাল দেখা যায়।

পোপের প্রাসাদস্থ পুস্তকাগার এবং শিল্পাগার সম্বন্ধে অধিক লিখা বাহুল্য। এত মর্ম্মরমূর্ত্তি আর কোথায়ও আছে কি না জানি না, আমি ত দেখি নাই। পোপ এখন এই ভেটিকানে বন্দিভাবে বাস করেন। রাজত্ব অবসান হওয়া পর্য্যন্ত কোনও পোপ ভেটিকানের বাহিরে আগমন করেন না।

কেপিটোল নামক পাহাড়ের উপর পুরাতন রোমক সেনেটের স্থান। অনেক মর্ম্মর-মূর্ত্তি ও পুরাতন কবরের আবরণ (Sarcophagi) দেখা যায়। এই যে সব মর্ম্মরশিল্প ইহাতে একটা বড় ভাবিবার বিষয় আছে, দুই একটি ভিন্ন নগ্নমূর্ত্তি সবই পুরুষের। কেন? স্ত্রীজাতির রূপ মর্ম্মর-শিল্পীরা অঙ্কিত করেন নাই কেন? আমার ত মনে হয়, তাঁহাদের বিবেচনায় সুগঠিত পুরুষ-মূর্ত্তিই অধিকতর রূপবান্; স্ত্রীলোকের রূপ কেবল সজ্জায় ও দর্শকের মনে।

রোমের ভিতর দেখিবার স্থান অসংখ্য। সে সকলের বর্ণনা করিবার সাধ্যও আমার নাই, স্থানও নাই। সব আমি দেখিও নাই। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান মাত্র নির্দ্দেশ করিব। জুলিয়াস সিজার যে স্থানে হত হয়েন সেই স্থানটি আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, পম্পের মূর্ত্তির নিম্নে সিজার হত হয়েন, সে মূর্ত্তিটি এখন অন্য স্থানে রক্ষিত। এতদ্ভিন্ন ট্রেজানের ফোরাম, ডাইওক্লিটিয়ানের ফোরাম, ক্যারাকালার স্নানাগার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্নানাগারে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ সকল লোকই আসিতেন। এই স্নানাগার কবি, যোদ্ধা, দার্শনিক প্রভৃতিদিগের সম্মিলনস্থান ছিল।

আধুনিক রোম নগরের বাহিরে Appian Way নামক পুরাতন সড়ক

এখনও বিদ্যমান। তাহার দুই পার্শ্বে ক্রমাগত প্রাচীন রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ; দেখিলেই দিল্লীর কথা মনে পড়ে। ইহার নিকটে অনেকগুলি Catacombs বা ভূগর্ভস্থ বাসস্থান আছে। রোমের সম্রাটগণ যখন খৃষ্টবিদ্বেষী ছিলেন, তখন তাঁহাদের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খৃষ্টীয়ানরা এই সব ভূগর্ভস্থ স্থানে বাস করিতেন। আমি একটিতে নামিয়াছিলাম। একজন পাদরী পথপ্রদর্শক ছিলেন। হাতে বাতি লইয়া নামিতে হয়; কারণ, সে স্থানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। ৬০ ফুট মাটির নিম্নে মাইলের পর মাইল পাতরের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকের গ্যালারি চলিয়াছে,—অনেকটা দেওয়ালের গাত্রে তাকের মত। এই সব তাকে সেকালের খৃষ্টীয়ানদিগের জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই হইত। কোথাও গোর রহিয়াছে, কোথাও বা চ্যাপেল বা ভজনালয়। দুই একটি কবরে এখনও কঙ্কাল রহিয়াছে দেখা যায়। দুই একটা মামির (Mummy) ন্যায় দেখিলাম; একটি স্ত্রীদেহের মস্তকে কৃষ্ণ কেশ দেখা গেল। আলোকের জন্য আমাদের পল্লীগ্রামে ব্যবহৃত মৃৎপ্রদীপের ন্যায় প্রদীপ ব্যবহৃত হইত। একস্থানে কতকগুলি সংগৃহীত রহিয়াছে, দেখিলাম। স্থানে স্থানে কিছু কিছু কারুকার্য্যও আছে দেখিলাম। অনেক স্থানে মৎস্য অঙ্কিত আছে, যিশুর সহিত ইহার কি একটা Symbolical সম্বন্ধ আছে প্রদর্শক পাদ্রি বলিয়া দিয়াছিলেন, ভুলিয়া গিয়াছি। এত নিম্নেও বাতাস বেশ শুষ্ক মনে হইল, আর্দ্রতা নাই। বরং দুই এক স্থানে যথায় নূতন মেরামত হইয়াছে ড্যাম্প (Damp) মনে হইল। এইরূপ ভূগর্ভস্থ রাস্তা নাকি ৬০ মাইল আছে।

রোমের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে বসতি বড়ই কম, প্রায়ই খোলা মাঠ। শুনিলাম, ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ।

এই প্রাচীন সহরে আর একটি জিনিষ দেখিয়াছিলাম, যাহা য়ুরোপে আর কোথাও বোধ হয় নাই। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার পার্শ্বেই রাজমাতা মার্গেরিটার প্রাসাদ। একদিন দ্বিপ্রহরে দেখি, রাণীর প্রাসাদে অন্নসত্র বসিয়াছে। ম্যাকারোণী রাঁধিয়া বিতরণ করা হইতেছে, যত দরিদ্র লোক টিন ভাঁড় প্রভৃতি পূরিয়া সেই অন্ন লইয়া কেহ নিকটে রাস্তার উপর বসিয়াই আহার করিতেছে, কেহ বা গৃহে যাইতেছে।

এই ম্যাকারোণী ইতালীয়দিগের সাধারণর খাদ্য। ব্যাপারটা কি বোধ হয় অনেকেই জানেন। চাউল, গোধূম, যব প্রভৃতি শস্য চূর্ণ করিয়া তাহাই অন্ন

ভিজাইয়া সূতার ন্যায় পাকাইয়া রাখে (আমাদের দেশে যাহাকে চষি বলে) পরে তাহাই সিদ্ধ করিয়া পণিরের গুঁড়া প্রভৃতি সহযোগে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার। খাইতে নাকি বড়ই ভাল। আমি ত কিছুতেই গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম না।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

সমুদ্র।

হে নীলাম্বুরাশি, কোথা যা'ব ভাসি',
বলিতে পার কি মোরে?
যতদূর যাই, কূল নাহি পাই,
তরিব কেমন করে?
ভাবি কত দিন, ওগো সীমাহীন,
কূল নাহি পাই যদি;
তোমার হিয়ায়, মন প্রাণ কায়,
মিশাইব হে জলধি!
ক্ষুদ্র তরীখান, মাত্র ব্যবধান,
তোমার আমার মাঝে;
তরঙ্গ-লীলায়, হৃদয় দোলায়,
এ ক্ষুদ্র বাধা কি সাজে?
আমি যা'ব যা'ব, লহ লহ তব,
শীতল সলিলকোলে;
সে চির শয়নে, মধুর স্বপনে,
ঘুমা'ব অতলতলে!
বহুদিন ধরে, ভাসিয়া সাগরে,
ভয় দূর হইয়াছে;
এখন এ সিন্ধু, প্রিয়, সখা, বন্ধু,
আত্মীয় আমার কাছে!

শ্রীমতী সু—ঘোষ।

মরুভূমে

(২)

সেই নির্নিমেষ দৃষ্টির কঠোর অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা তাহার নিকট অত্যন্ত দুঃসহ বলিয়া মনে হইতেছিল। ব্যাঘ্রীটি যখন ক্রমেই ধীরে ধীরে তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন তাহার প্রায় সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক আপনার চিত্ত-দৌর্ব্বল্য যথাসাধ্য গোপন করিয়া সে কৃত্রিম সোহাগভরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল এবং সম্মোহনশক্তিপ্রভাবে তাহাকে বশীভূত করিবে এই ভরসায় তাহার নেত্রদ্বয়ের উপর দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিল। ব্যাঘ্রী নিকটে আসিলে সে প্রীতিপ্রফুল্লভাবে উহার সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত উহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—যেন সে কোনও রূপবতী রমণীর অঙ্গসেবায় নিযুক্ত! তাহার নমনীয় মেরুদণ্ডটি খাঁচড়াইয়া দেওয়ায় বাঘিনী আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল এবং তাহার প্রখর দৃষ্টি ক্রমেই স্নিগ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এই স্বার্থপ্রণোদিত চাটুকারবৃত্তি তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত হইলে চিতাটি বিড়ালের ন্যায় 'ঘড় ঘড়' শব্দ না করিয়া থাকিতে পারিল না। এই শব্দ অনুচ্চ হইলেও এরূপ তীক্ষ্ণ যে গুহামধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উহা উপাসনামন্দিরস্থ বাদ্যযন্ত্রাদির গম্ভীর নির্ঘোষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এইরূপ গাত্রামর্শনের উপর তাহার জীবনাশা কতটা নির্ভর করিতেছে সৈনিকের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না—নিজ সেবাগুণে এই শ্বাপদরূপিণী বিলাসিনীকে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার অব্যবস্থিতচিত্ত সঙ্গিনীর হিংস্র স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে তখন সে গুহাত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্বদিন প্রচুর পরিমাণে আহার জুটিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ব্যাঘ্রীর স্বাভাবিক হিংসাপরায়ণতা সেরূপ উদ্রিক্ত হয় নাই; নতুবা তাহার সহিত এত সত্বর সখ্য সংস্থাপন করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। চিতাটি তাহাকে গুহার বাহিরে যাইতে দিল বটে, কিন্তু সে পাহাড়ের শিখরদেশে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ক্ষিপ্রগতিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং পৃষ্ঠদেশ উত্তোলন করিয়া তাহার পদদ্বয়ে গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল। সে এরূপ সবেগে ও সহজ ভাবে লাফাইয়া আসিল যে, তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্রকায় পক্ষীদিগের এক ডাল হইতে আর এক ডালে উড়িয়া বসা ভিন্ন আর কিছুই মনে পড়ে না। গাত্র ঘর্ষণ করিতে করিতে শ্বাপদ-স্বভাবসুলভ অভ্যাসের বশে সে কয়েকবার চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকার প্রকৃতই করাতের কর্ত্তনশব্দের ন্যায় কর্কশ। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের এই তুলনাটি বড়ই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

সৈনিক তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "এ যে বড় জুলুম দেখিতেছি! তুমি কি আমাকে একটু নড়িয়া বসিতেও দিবে না?" তাহার সাহস ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে বাঘিনীর মাথা চুলকাইয়া দিতে লাগিল—পেট চাপড়াইতে

লাগিল এবং তাহার কাণ দুইটি ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টা ক্রমশঃই সফল হইতেছে দেখিয়া সে তীক্ষধার ছুরিকা খানির অগ্রভাগ দিয়া ক্রীড়াচ্ছলে তাহার মস্তক আঁচড়াইতে লাগিল, উদ্দেশ্য—সুবিধা পাইলেই আমূল বিদ্ধ করিয়া দিবে।

মরুপ্রদেশের একমাত্র অধিশ্বরী এই শার্দ্দূল রাজ্ঞীর আজ বড়ই খোজ মেজাজ। অন্য দিন অপেক্ষা আজ তাহার আকৃতি প্রকৃতি বড়ই ধীর! সে মুখ তুলিয়া, মাথা উচু করিয়া, ঘাড় বাড়াইয়া নানা প্রকারে তাহার পরিচর্য্যাপরায়ণ ভক্তটির প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। যুবকের মনে হইল যে, এক আঘাতে বাঘটিকে মারিয়া ফেলিতে হইলে হঠাৎ তাহার কণ্ঠনালীতে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। সে এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রখানি উত্তোলিত করিল বটে, কিন্তু ব্যাঘ্রী সেই সময়ে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার পদতলে লুটাইতে থাকায় তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা হইল না। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, উহার হিংস্রতাব্যঞ্জক দৃষ্টিতেও যেন একটি অব্যক্ত অনুরাগের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সৈনিক আর কি করিবে? সে অনন্যোপায় হইয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষে হেলান দিয়া পূর্ব্বসংগৃহীত খর্জ্জুরগুলি এক একটি করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে ও ভরসায় আন্দোলিত হইতেছিল। কোনও অজ্ঞাত ত্রাণকর্ত্তার আকস্মিক আবির্ভাব-প্রত্যাশায় সে মাঝে মাঝে এক একবার মরুভূমির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার ভীষণ সঙ্গিনীর অনিশ্চিত দয়ায় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে তাহার আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতেছিল। যুবক আহারান্তে খর্জ্জুরবীজগুলি যে স্থানে ফেলিয়া দিতেছিল বাঘিনীর দৃষ্টি সেই স্থানটির প্রতিই বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। এই বীজনিক্ষেপ দর্শনে সে যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া উঠিল—তাহার নয়নে ক্রমেই সন্দেহের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ব্যবসায়ীরা কোনও নূতন পণ্যদ্রব্য যেরূপ সযত্নে পরীক্ষা করিয়া থাকে বাঘিনীও সেই-রূপ বিজ্ঞতার সহিত সিপাহী যুবককে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। বোধ হয়, পরীক্ষার ফল অসন্তোষজনক হয় নাই; কারণ, যুবকের সামান্য আহার শেষ হইবামাত্র সে স্বীয় খরস্পর্শ জিহ্বাদ্বারা তাহার চর্ম্মপাদুকা চাটিতে লাগিল এবং সুক্ষিপ্র কৌশলে সঞ্চিত ধূলিকণসমূহ নিঃসারিত করিয়া ছিল। যুবক মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এখন না হয় উহার ক্ষুধা নাই; কিন্তু যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে তখন উপায় কি? যদিও এ চিন্তায় তাহার মন অনেকটা দমিয়া গিয়াছিল বটে তথাপি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহার বিচিত্র বান্ধবীর দেহ-সৌষ্ঠব ও অঙ্গাদির দৈর্ঘ্য স্থূলতা প্রভৃতি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বাস্তবিকই এ জাতীয় ব্যাঘ্রের এরূপ সুন্দর নমুনা সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা উচ্চে প্রায় ২॥০ হাত এবং লাঙ্গুল বাদ দিয়াও দৈর্ঘ্যে ৩॥০ হাতের কম নহে। উহার লেজটিও প্রায় দুই হস্ত পরিমিত; দেখিতে একগাছি নমনীয় যষ্টির ন্যায়—শেষাংশ অনেকটা বর্ত্তুলাকার, উহার মস্তক প্রায় সিংহীর মস্তকের ন্যায় বৃহৎ এবং অপূর্ব্ব উৎকর্ষপরিব্যঞ্জক। উহার মুখাবয়বে ব্যাঘ্র জাতির স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা বিশেষ ভাবে প্রকটিত থাকিলেও তাহাতে বিলাসিনী-গণের লোল হাবভাবের অস্পষ্ট সৌসাদৃশ্যও যেন অত্যধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছিল।

তাহার আকারপ্রকার স্বতঃই মধুপানোন্মত্তা ভামিনীর উদ্দাম স্ফুর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। রক্তপানে পরিতৃপ্ত হইয়া সে এখন ক্রীড়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। সৈনিক ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গমনাগমনে আর কোনও বাধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না। বাঘিনী তাহাকে কিছুই বলিল না, শুধু সুবৃহৎ পোষা বিড়ালের ন্যায় মনোযোগের সহিত তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে সৈনিক হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, তাহার অশ্বের মৃত-দেহটি ঝরণার নিকট পড়িয়া আছে। উহার কেবল প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিদ্যমান, অবশিষ্ট ইতোমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। দেখিয়া তাহার প্রাণে কিঞ্চিৎ ভরসা হইল। ব্যাঘ্রী যে কি কারণে তাহাকে এ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে নাই এবং কেনই বা সে তাহার গুহাপ্রবেশের সময় অনুপস্থিত ছিল এখন তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না! প্রথম চেষ্টায় কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাহার মনে এক দুরাশা স্থান পাইয়াছিল। সে মনে করিল, বাঘিনীর সন্তোষ উৎপাদন করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার সহিত সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কিছুক্ষণপরে যখন সে বাঘিনীর নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল যে, তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে সে অল্প অল্প লেজ নাড়িয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে। ইহাতে সে বড়ই আহ্লাদিত হইল এবং নির্ভয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। সে নির্ব্বিকার চিত্তে কখনও তাহার মাথা ধরিয়া, কখনও পা ধরিয়া, কখনও পিঠে হাত দিয়া, কখনও তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া নানা ভঙ্গীতে খেলা দিতে লাগিল। বাঘিনী কিছুতেই ওজর আপত্তি করিল না, বরং সৈনিক যখন তাহার পায়ের লোমশ অংশগুলিতে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল তখন পাছে তাহার আঘাত লাগে এই ভয়ে স্বীয় নখরগুলি থাবার মধ্যে টানিয়া লইতে লাগিল। সিপাহী একবার ভাবিল যে, এই সুযোগে উহার উদরে ছোরা বসাইয়া দিবে; কিন্তু ক্রুদ্ধ শ্বাপদ পাছে মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় তাহার উপরে পড়িয়া তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে এই ভয়ে তাহার এ কার্য্য করিতে সাহস হইল না। বিশেষতঃ এইরূপ একটি নিরপরাধ প্রাণীকে হঠাৎ মারিয়া ফেলিতে তাহার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। এ কর্ম্মটি কোন মতেই তাহার বিবেক-বুদ্ধির অনুমোদন পায় নাই। এই চিতাবাঘের সাহচর্য্যে সে তাহার অসীম মরু-কারার মধ্যে যেন বন্ধুলাভের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে অতীতের একটি ঘটনা তাহার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল। তাহার প্রথমা প্রণয়িণী এরূপ কোপন স্বভাবা ও সন্দিগ্ধচিত্তা ছিল যে, সে পরিহাসচ্ছলে তাহার নাম রাখিয়াছিল, 'সুধা।'

সেই ভীষা রমণীর শাণিত ছুরিকার ভয়ে তাহার মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি ছিল না। এই পূর্ব্বস্মৃতি মনে হওয়ায় তাহার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল উপস্থিত হইল। সে স্থির করিল যে, এই উদ্ভিন্নযৌবনা বাঘিনীকেও সে 'সুধা' নামে অভ্যস্ত করাইবে। সৈনিক কিরূপ অধ্যবসায়ী তাহার পরিচয় ইতঃপূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে! সে সন্ধ্যার মধ্যেই এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল যে, গলা ভারি করিয়া 'সুধা' বলিয়া ডাকিতেই বাঘিনী তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সন্ধ্যাসমাবেশে 'সুধা' কয়েকবার ক্রমান্বয়ে চীৎকার করিয়াছিল। সেই চীৎকার-শব্দ যেন প্রগাঢ় বিষাদব্যঞ্জক। সে সময়ে তাহার স্বভাবিক চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া আমোদপ্রিয় সৈনিক রঙ্গচ্ছলে বলিতে লাগিল, "ইহার শিক্ষা দীক্ষা ভালরূপ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—সন্ধ্যাকালে নমাজ পড়ার অভ্যাসটুকুও আছে, দেখিতেছি।" যুবক স্থির করিল যে, ব্যাঘ্রী ঘুমাইয়া পড়িলেই—সে তথা হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টা দেখিবে। সে সেই জন্য ব্যাঘ্রীকে লক্ষ্য করিয়া রঙ্গচ্ছলে বলিতে লাগিল, "সুন্দরী আজ তুমিই আগে নিদ্রা যাও, তাহার পর আমি নিদ্রা যাইব।"

অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে সে পলায়নের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইবামাত্র সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নীলনদের অভিমুখে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু দেড় পোয়া পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই সে শুনিতে পাইল যে, বাঘিনী করাতঘর্ষণের ন্যায় সেই ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ব্যাঘ্রাদির লম্ফন শব্দ অপেক্ষা এই চীৎকারধ্বনিই অধিকতর ভয়াবহ।

অনেকের মরিতে বসিয়াও রঙ্গ যায় না। যুবকটিও সেই দলের লোক। সে বলিতে লাগিল, "আমার প্রতি উহার প্রকৃতই অনুরাগ জন্মিয়াছে দেখিতেছি। আর হইবে নাই বা কেন? সদাসর্ব্বদা ত আর সকলের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে না—প্রথম বন্ধুকে কি সহজে ছাড়িতে পারে?" তাহার স্বাগতোক্তি শেষ হইতে না হইতেই সৈনিক অতর্কিতে চোরা বালির মধ্যে পড়িয়া গেল। মরুচারী পথিকবর্গের এই সকল চোরা বালির ন্যায় ভীষণ বিপদ আর নাই। কোন পতিকে একবার পড়িয়া গেলে আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। যুবক বালুমধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া যেমন ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে বাঘিনী সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। সে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দন্তদ্বারা তাহার উর্দ্দি দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া এক বিপুল লম্ফে তাহাকে সেই বালুকার ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিল। ইহাতে এতই অল্প সময় লাগিয়াছিল যে, উদ্ধারকার্য্যটি যেন ইন্দ্রজালপ্রভাবে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সিপাহী বাঘিনীকে সোৎসাহে আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "সুধা! আর দেখিতেছ কি? এখন হইতে তোমাতে আমাতে জীবনেমরণে বাঁধা। তাই বলিয়া যেন কোনও দিন আমার সহিত বেয়াড়া রকম রসিকতা করিও না।" সে বাঘিনীর সহিত গুহায় ফিরিয়া আসিল।

তখন হইতে মরুভূমি আর তাহার নিকট বিজন বলিয়া মনে হইত না। তাহার অন্ততঃ একজন কথা কহিবার সঙ্গিনী জুটিয়াছিল। আলাপটা এক তরফা হইলেও সে তাহাতেই বেশ আনন্দ অনুভব করিত। বাঘিনী তাহার প্রভাবে যেন ক্রমেই শান্ত হইতে লাগিল।

আসন্ন মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাত্রিতে বহু চেষ্টা করিয়াও সে আর জাগিয়া থাকিতে পারিল না; অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সে আর বাঘিনীকে খুঁজিয়া পাইল

না। পরে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিয়া সে দেখিতে পাইল যে, সে দূর হইতে লাফাইতে লাফাইতে আসিতেছে। ব্যাঘ্রাদির মেরুদণ্ড নমনীয় বলিয়া উহাদিগকে লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে হয়। অপরাপর চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় উহারা সহজভাবে হাঁটিয়া চলিতে পারে না।

দেখিতে দেখিতে বাঘিনী নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। আজিও তাহার মুখ রক্তমাখা! সৈনিক পূর্ব্বের ন্যায় তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল এবং অভ্যাসমত সেও বিড়ালের ন্যায় ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার আবেগ-ভরা দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্নিগ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। যোদ্ধা তাহাকে সোহাগ করিতে করিতে পোষা জন্তুর ন্যায় নানারূপ আদরের কথা বলিতে লাগিল, "ওঃ তুমি আজ বড় লক্ষীটি হইয়াছ, কেমন? বাঃ এ বড় মন্দ নয়, এর মধ্যেই আদরকুড়ান অভ্যাসটা বেশ হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি! এ রকম দুরন্তপনা করিতে তোমার কি একটু ও লজ্জা করে না! আজ একজন আরবটারব ধরিয়া খাইয়াছ বুঝি—তাহা হউক তাহারা জানোয়ারের সামীল বলিলেও হয়। দেখিও, যেন ফরাসী সিপাহী ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিও; না তাহা হইলে তোমার সঙ্গে রাগারাগি হইয়া যাইবে।"

কুকুরগুলা যেরূপ তাহাদের মনিবের সঙ্গে খেলা করে সেও তেমনই আজ যুবকের সহিত নানা ভঙ্গীতে খেলা করিতেছিল। সৈনিক তাহাকে মাঝে মাঝে কাত করিয়া ফেলিতেছিল; কিন্তু তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং যাহাতে খেলাটি বন্ধ না হয় এই উদ্দেশ্যে সে মধ্যে মধ্যে নিজে থাবা উচু করিয়া যেন তাহাকে ক্রীড়ার্থ আহ্বান করিতেছে এইরূপ ভাব দেখাইতেছিল।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। শ্বাপদসহবাস যেন তাহার নিকট মরুভূমির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য উপভোগের একমাত্র সহায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহার জীবনে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাহার ভাবনা আর পূর্ব্বের ন্যায় সীমাহীন—কেন্দ্রহীন নহে। এখন অন্ততঃ সে একটা জীবিত প্রাণীর বিষয় লইয়াও চিন্তা করিতে পারে। আহার্য্য সামগ্রীরও আর পূর্ব্বের ন্যায় অনাটন ছিল না। আশা ও নৈরাশ্য, ভয় ও ধৈর্য্য প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী চিত্তবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে দিনগুলি ক্রমে ক্রমে যেন তাহার অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইতে লাগিল। নিভৃতবাসের—বিমল আনন্দ সে অনুক্ষণ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নির্জ্জনতার গুপ্ত সৌন্দর্য্য তাহার নিকট ক্রমেই ব্যক্ত হইতেছিল। তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতি ও বোধশক্তি সবিশেষ উদ্রিক্ত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্তসময়ে যে বিরাট মনোহর দৃশ্য তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইত তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

সেই মরুভূমে খেচরাদিরও সমাগম এরূপ বিরল যে, হঠাৎ কোনও দিন মাথার উপর দিয়া শন্ শন্ শব্দে পাখী উড়িয়া গেলে যুবক শ্রবণমাত্রেই ব্যাকুল হইয়া পড়িত। সে দেখিত, নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিচিত্র বর্ণের অভ্রমালা—বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত বিভিন্ন দেশীয় পথিকগণের ন্যায় আকাশপথে আগমন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত

হইতেছে। নিশীথে চন্দ্রালোকে সে এই মরুমহাসাগরের বালুকাময় তরঙ্গমালার তীব্র আবর্ত্তন ও বিচিত্র বিক্ষোভ দর্শন করিয়া বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইত।

প্রাচ্যদেশীয় দিবসের প্রাকৃতিক শ্রীসম্পদে নিমগ্ন হইয়া সে ক্রমেই আত্মহারা হইতেছিল। কোন দিন হয়ত দিবাভাগেই মরুপ্রদেশে ঝটিকার আবির্ভাব হইত। সে দেখিত, জলবাষ্পশূন্য কুহেলিকায় সমাবৃত ঘূর্ণ্যমান বালুকারাশি রক্তমেঘাকারে চতুর্দ্দিকে মৃত্যু আনয়ন করিতেছে। এইরূপ ঝঞ্ঝাবাতের পর নিশীথের স্বাস্থ্যপ্রদ স্নিগ্ধতা তাহার নিকট বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইত। সে নক্ষত্রখচিত মুক্তাকাশতলে প্রকৃতি দেবীর নিভৃত সঙ্গীত-রঙ্গালয়ে একাকী বসিয়া নিজ কল্পনাসৃষ্ট আকাশ-সঙ্গীত শ্রবণ করিত। নির্জ্জনতা তাহাকে নিজ স্বপ্নসম্ভার উদ্‌ঘাটন করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। সে তাহার অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিয়া বা অকিঞ্চিৎকর স্মৃতি-প্রবাহে নিমগ্ন থাকিয়া প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিত।

ক্রমে চিতাবাঘটির উপর তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া গেল। কারণ, কোনও রূপ স্নেহের বন্ধন না থাকিলে এরূপ স্থানে একাকী জীবন যাপন করা যায় না। মানবের ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগে উহার হিংস্রস্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বলিয়াই হউক বা খাদ্যসামগ্রীর কোনও রূপ অভাব না ঘটার জন্যই হউক বাঘিনী এক দিনও যুবকের প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই—যুবকও উহার বশ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া নিজ প্রাণরক্ষার সম্বন্ধে আর পূর্ব্বের ন্যায় সাবধানতা অবলম্বন করিত না। সে অধিক সময় ঘুমাইয়া অতিবাহিত করিত বটে, কিন্তু পাছে কোনও উদ্ধারক্ষম পান্থ শৈল-সান্নিধ্যে আগমন করিয়াও তাহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত না হয়—পাছে মুক্তির উপায় তাহার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াও বিফল হইয়া যায়—এই ভয়ে সে তন্তুমধ্যস্থিত লূতার ন্যায় ব্যগ্র-ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। সে নিজ পরিধেয় কামিজটিকে পতাকাকারে পরিণত করিয়া একটি শাখাহীন খর্জ্জুর বৃক্ষের শিরোদেশে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। বায়ুবেগে আন্দোলিত না হইলে যদি এই বিপদবার্ত্তাজ্ঞাপক নিশানটি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারে এই জন্য সে একখণ্ড যষ্টির সাহায্যে কামিজের হাতা দুইটি প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে যখন সে নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়িত—তখন দীর্ঘ সময় আর কাটিতে চাহিত না—তখন বাঘিনীর সহিত ক্রীড়ারঙ্গ তাহার নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না।—ক্রমে উভয়ে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিল যে, বাঘিনীর চাহনির মর্ম্ম, তাহার উচ্চ নিম্ন কণ্ঠস্বরের বিকৃতিবোধ কিছুই আর তাহার নিকট অবিদিত ছিল না! তাহার সুবর্ণবর্ণ গাত্রচর্ম্মে যতগুলি পুষ্পাকৃতি চিহ্ন ছিল সে তাহার প্রত্যেকটির অঙ্কনবৈচিত্র্য উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বলয়াকৃতি সমুজ্জ্বল ডোরা দাগগুলি গণনা করিবার জন্য তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করিলেও ব্যাঘ্রী তাহাতে কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিত না। তাহার ললিত লাবণ্য, নিটোল দেহযষ্টি, সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী, শ্বেত রোমাবৃত উদরদেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিত বটে, কিন্তু ক্রীড়ারতা বাঘিনীর যৌবনসুলভ চটুল চাপল্যেই সে সর্ব্বাধিক প্রীতি উপভোগ করিত। লম্ফন,

বৃক্ষারোহণ, মুখাদিপ্রক্ষালন, অঙ্গসংস্কার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্যে সুধা এরূপ চিত্তাকর্ষক দক্ষতা প্রকাশ করিত যে, সৈনিক তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিত না। সে যতই বেগে লম্ফ প্রদান করুক না কেন তাহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সে মধ্যপথে থামিয়া দাঁড়াইত, শৈলপৃষ্ঠস্থ প্রস্তরাদির পিচ্ছিলতা সত্বেও তাহার এ নিয়মের ব্যত্যয় হইত না।

একদিন দ্বিপ্রহরে একটি বৃহৎকায় পক্ষী সেই পাহাড়ের দিকে উড়িয়া আসিল। যুবক এই নবাগত পাখিটিকে দেখিবার জন্য অল্পক্ষণ সরিয়া গিয়াছিল। বাঘিনী এই মুহূর্ত্তেক বিলম্বও সহ্য করিতে পারিল না—সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। উহার দৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় তীব্র ভাবাপন্ন হইয়াছে দেখিয়া যুবক বলিতে লাগিল, "ইহার ঈর্ষ্যা ত বড় কম নহে দেখিতেছি! নিশ্চয়ই বর্জ্জিনী (Virginie) মরিয়া ব্যাঘ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—তাহা না হইলে উভয়ের এরূপ চরিত্রগত সাদৃশ্য দেখা যাইবে কেন?" বলা বাহুল্য, এই বর্জ্জিনীই—বিপরীত গুণহেতু 'সুধা' নামে অভিহিতা হইত।

ইতোমধ্যে ঈগল পক্ষীটি আকাশে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং সৈনিকও অনন্যমনে বাঘিনীর সুডৌল দেহের প্রশংসা করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকসংস্পর্শে উহার কাঞ্চনাভ চর্ম্মে ও কৃষ্ণপাটল গাত্রচিহ্নগুলি হইতে অপূর্ব্ব দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। যুবকের মৃদুস্পর্শ অনুভব করিয়া বাঘিনীর সর্ব্বশরীর পুলকে বেপমান হইল। ব্যাঘ্রী তাহার মানব বন্ধুর প্রতি চাহিয়া দেখিল—সে দৃষ্টি কি আবেগময়! তাহার তীব্র কটাক্ষ যেন বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে সবেগে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সৈনিক তাহার আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কে বলিবে, ইহার আত্মা নাই?" মানবেতর প্রাণিগণের যে আত্মা আছে খৃষ্টীয়ানরা এ কথা স্বীকার করেন না। বালুশায়িতা বাঘিনীর প্রতি নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যুবক মনে ভাবিতেছিল, "এই বালুরাশির অধিশ্বরী বালুকারই মত হেমাঙ্গী, বালুকারই মত অসংশ্লিষ্ট, বালুকারই মত উষ্ণস্বভাবা।"

গৃহিণী বলিলেন, "আর বক্তৃতার আবশ্যক নাই। 'জীবে প্রীতি' সম্বন্ধে মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিবেন তাহা আমার জানা আছে। এখন ইহাদিগের প্রণয়ের কি পরিণাম ঘটিল তাহা বলিলেই পালা সাঙ্গ হইয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "পরিণাম আর কি ঘটিবে? প্রবল অনুরাগ জন্মিলে সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে এ স্থলেও তাহাই হইয়াছিল। মনে কর, এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোনও কারণে অবিশ্বাসী বলিয়া স্থির করিল। হয় ত এ সন্দেহের কোনও ভিত্তি নাই। দুই কথায় বুঝাইয়া বলিলে যাহ সহজে মিটিয়া যাইত উভয়ের অহমিকা তাহা হইতে দিল না। অবশেষে কেবল এক গুঁয়েমির জন্য পরস্পরের চির বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "কলহান্তরিত হইলে পুনর্ম্মিলন কি এতই কঠিন? একটি কথায় বা এক কটাক্ষেই ত সকল বাধা কাটিয়া যায়। সে কথা যাউক এখন গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেল।"

আমি বলিলাম, "বৃদ্ধ নেশার ঝোঁকে কত আবল তাবল বকিয়াছিল তাহা আর শুনিয়া কি হইবে? শেষে এইরূপে এক দিন খেলা করিতে করিতে সে নিজ অজ্ঞাতসারে বাঘিনীকে কিরূপে পীড়া দিয়াছিল। বৃদ্ধ বলিয়াছিল, "সে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিল কি না জানি না—হঠাৎ দেখি সে যেন রাগভরে মুখ ফিরাইয়া—আমার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। যদিও সে খুব আস্তেই ধরিয়াছিল বটে—তথাপি আমাকে খাইয়া ফেলিবে এই মনে করিয়া আমি প্রাণভয়ে ছোরাখানি তাহার গলদেশে বসাইয়া দিয়াছিলাম। সে আঘাত করিবা-মাত্র এরূপ করুণ আর্ত্তনাদের সহিত উল্টাইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা শুনিয়া আমার বুকের রক্ত জমিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, মৃত্যুকালেও সে আমার দিকে অনুরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া আছে। আমার যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি আমার গলার ক্রশাকার পবিত্র পদকটি দিয়াও যদি তাহাকে বাঁচাইতে পারিতাম তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইতাম না, কিন্তু তখনও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ এই পদকপ্রাপ্তির সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। আমার প্রতিষ্ঠিত পতাকা দর্শনে সৈনিকগণ যখন আমার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল তখনও আমি নয়ননীরে ভাসিতেছি।" বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "মহাশয় ইহার পর আমি অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি, এই অকর্ম্মণ্য দেহভার বহন করিয়া জার্ম্মাণি রুসিয়া, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কোনও স্থানই দেখিতে বাকি রাখি নাই; কিন্তু মরুভূমির ন্যায় সৌন্দর্য্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

আমি বলিলাম, "তথায় আপনার কিরূপ বোধ হইত, প্রকাশ করিয়া বলুন।" সে বলিল, "আপনি তরুণবয়স্ক যুবক মাত্র আপনাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিব কিরূপে? আমি যে কেবল খেজুর গাছ ও চিতাবাঘের জন্যই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি তাহা নহে—তাহা হইলে আর আমার শোকের সীমা থাকিত না। মরুভূমির ইহাই বিশেষত্ব যে তথায় কিছুই নাই—অথচ সবই আছে।" আমি বলিলাম, "সে কি রকম?" বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "এটা আর বুঝিলেন না? তথায় মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই বটে, কিন্তু ভগবদনুভূতি সর্ব্বক্ষণই ঘটিয়া থাকে।"

শ্রীগুরুদাস সরকার।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতে ষোড়শ লুইর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ফরাসীদেশে কতকগুলি সামাজিক এবং শাসনসম্বন্ধীয় কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। এ স্থলে সেগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক। ফরাসীরাজ য়ুরোপখণ্ডের অন্যান্য নৃপতিগণের অপেক্ষা শাসনকার্য্যে অধিকতর শক্তিপরিচালন করিতেন। বিচারালয়, বিচারপতি, বিচারপদ্ধতি বা ব্যবহার শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি অপ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি ইচ্ছানুরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে পারিতেন; তাঁহার ক্ষমতা কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল না। আবার ফ্রান্সের ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণও কতকগুলি বিশিষ্ট অধিকার ভোগ করিতেন।

ধর্ম্মযাজকগণ "অক্ষান্তি সারসর্ব্বস্ব ভগবানের" প্রদীপ্ত ক্রোধানল হইতে মানব জাতির পরিত্রাণকার্য্যে নিযুক্ত; সুতরাং ঈদৃশ মহাত্মগণের রোষদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কোন ব্যক্তি অক্ষত শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারিত না; তাহাকে অশেষবিধ নিগ্রহ, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত। ভূস্বামিগণের প্রতি বিদেশীয় বৈরীদিগের আক্রমণ নিবারণের ভার ন্যস্ত ছিল, সেই জন্য প্রজাপীড়নে তাঁহাদেরও তুল্য অধিকার জন্মিয়াছিল।

ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণ নিরক্ষর ও চরিত্রহীন হইলেও, তাঁহারাই রাজ্য-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত পদে নিযুক্ত হইতেন। দেশে শিক্ষা ও যোগ্যতার গৌরব বা আদর ছিল না। রাজকর সর্ব্বশ্রেণীর উপর তুল্যভাবে নির্দ্ধারিত হইত না। ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণ রাজকরের সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে মুক্ত ছিলেন বলিয়া অপরাপর শ্রেণী ও সম্প্রদায়সমূহ সমগ্র রাজস্বের গুরুভারে প্রপীড়িত হইত। আবার যে ভূস্বামিগণ রাজকোষের সাহায্যার্থ কপর্দ্দক পরিমিত রাজকর প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন, তাঁহারাই উৎপন্ন শস্যের দ্বাদশ ভাগের একাদশ ভাগ আত্মসাৎ করিয়া হতভাগ্য কৃষকগণকে বঞ্চনা করিতে ক্রুটী করিতেন না। প্রাগুক্ত কারণপরম্পরায় কৃষক ও শ্রমজীবিগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা অহোরাত্র

অকাতরে পরিশ্রম করিয়াও স্ত্রীপুত্রপরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইত না। বিচারালয়সমূহে বিচারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত না; কারণ বিচারপতিগণ রাজা, ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন। সেইজন্য সমগ্র দেশে অবিচারস্রোত অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত হইয়া ঘোরতর অশান্তি উৎপাদন করিত। জ্ঞানের অপূর্ব্ব আলোকবিস্তারে এবং সভ্যতার আবির্ভাবে ইতঃপূর্ব্বে প্রায় সমগ্র য়ুরোপের দণ্ডবিধি হইতে কঠোরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল; কিন্তু ফরাসীদেশে তৎকালেও অঙ্গচ্ছেদন, অঙ্গদাহ প্রভৃতি নানাবিধ পৈশাচিক দণ্ড প্রচলিত ছিল। সেই বর্ব্বরতার বিষময় ফলে সর্ব্বদাই অস্থিকঙ্কালচূর্ণিত রুধিরাক্তদেহ ব্যক্তিগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে দেশ পূর্ণ হইত।

ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামী ভিন্ন অপর সাধারণ টায়ার ইটাট্ (Tier Etat) অর্থাৎ "তৃতীয় সম্প্রদায়" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বণিকমণ্ডলী এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। শাসনসম্বন্ধীয় কুপ্রথা ও সম্প্রদায় বিশেষের অযথা প্রাধান্য নিবন্ধন ইঁহাদিগকেই যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। সেইজন্য ইঁহারাই সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জাতীয় উত্থানের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সমগ্র ফরাসীরাজ্যে কতিপয় পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নির্ব্বাচনভিত্তি অবলম্বনে সংগঠিত না হওয়ায় এই সমস্ত সভাসমিতি স্বায়ত্ত-শাসনপ্রয়াসী ফরাসী জাতির মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিত না। স্বজাতিবৎসল, উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহারা সমগ্র জাতির বিশ্বাস ও অনুরাগের পাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রাগুক্ত সমিতিগুলির গঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকারের। এই সকলের সভ্যগণ জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন না। তাঁহারা অর্থবিনিময়ে সভ্যপদ ক্রয় করতঃ সমিতিগৃহে আসন গ্রহণ করিতেন। * কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টগুলির গঠনপ্রণালী ফরাসীজাতির আকাঙ্ক্ষানুরূপ না হইলেও সে সকলের সভ্যগণ ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত একই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

উপরোক্ত পার্লিয়ামেণ্টগুলি দ্বিবিধ শক্তি পরিচালিত করিত। উচ্চতম

* Alison's 'History of Europe' vol 1 p 127

বিচারসংক্রান্ত যাবতীয় ভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল; তদ্ভিন্ন ইহাদের বিনানুমোদনে কপর্দ্দক পরিমিত রাজকর নির্দ্ধারিত হইতে পারিত না। রাজকরনির্দ্ধারণপ্রসঙ্গে ইহাদের ঈদৃশ শক্তি বিদ্যমান থাকায় ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে রাজস্ব বিভাগে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। কারণ, সভ্যগণ প্রায় সকলেই জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; স্বায়ত্ত-শাসনপ্রয়াসী ফরাসী জাতির মনোরথ পূর্ণ না হইলে তাঁহারা রাজকরনির্দ্ধারণে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক রাজা ও মন্ত্রীগণকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু এদিকে রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় ৫০০০০০০ পাউণ্ড অধিক; রাজার রাজসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে; মিতব্যয়িতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রীবর ষ্ট্যাম্প শুল্কের হার বৃদ্ধি করতঃ রাজকোষের অভাবমোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরে তৎসম্বন্ধে রাজাজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়া অনুমোদনের নিমিত্ত প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের সমীপে প্রেরিত হইল। কিন্তু সভ্যগণ প্রস্তাবিত শুল্কে সম্মতি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সমিতি (States General) ব্যতীত কাহারও কর-নির্দ্ধারণের অধিকার নাই।"

এদিকে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রয়াসী ফরাসীজাতি সম্প্রদায় সমিতি আহ্বানের প্রস্তাব শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইল। ভলটেয়ার, রুসো প্রভৃতি মনীষিগণের তেজস্বিনী রচনার অসাধারণ প্ররোচনাশক্তিপ্রভাবে তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অভিনব ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। নবযুগের আবির্ভাবে প্রাচীন রীতি, নীতি, প্রথা, পদ্ধতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। যদি কালবিলম্ব না করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ সময়োচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন, যদি তিনি দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করিয়া অচিরে সম্প্রদায় সমিতি আহ্বান পূর্ব্বক জাতীয় বাসনা পূর্ণ করিতেন, যদি তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শাসনসম্পর্কীয় সর্ব্ববিধ কুপ্রথা নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ফরাসী জাতি বিপ্লবের চরম পন্থা অবলম্বন করিত না। * কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসীরাজ প্রথম হইতেই দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন; পরিশেষে যখন প্রজাশক্তি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সর্ব্বগ্রাস করিবার উপক্রম করিল, তখনই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল।

* Thier's 'History of the French Ravolution' vol I p 19

প্যারিস পার্লিয়ামেণ্ট প্রস্তাবিত শুল্কে সম্মতি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে রাজা মন্ত্রীবর ব্রাইনের যুক্তি অনুসরণে উক্ত সভাসমিতিকে ট্রয় নগরে নির্ব্বাসনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর বলপূর্ব্বক প্রস্তাবিত শুল্কে সম্মতি গৃহীত হইল। তদ্দৃষ্টে অপরাপর পার্লিয়ামেণ্টগুলি তীব্রভাবে রাজা ও মন্ত্রীর কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিলেন। তখন ব্রাইন দেখিলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টগুলির সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। বলপূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি লইয়া রাজকর নির্দ্ধারণ করিলে, জনসাধারণ রাজকর প্রদানে অশেষবিধ আপত্তি উত্থাপিত করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নির্ব্বাসিত প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের সহিত সন্ধি সংস্থাপনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, প্যারিস পার্লিয়ামেণ্ট পুনর্ব্বার প্যারিস নগরে আহূত হইবে; রাজা যে কয়টি প্রস্তাবে বলপূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত একটি শুল্কসংস্থাপনে সম্মতি প্রদান করিতে হইবে।

মন্ত্রীবরের কার্য্যকুশলতানিবন্ধন প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের সহিত ফরাসীরাজের সন্ধি সংস্থাপিত হইল বটে; কিন্তু সে সন্ধি দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। রাজকোষের অভাবমোচনকল্পে যে উপায় উদ্ভাবিত হইল, তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া মন্ত্রী পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে উপস্থিত হইয়া ১৭২০০০০০০ পাউণ্ড ঋণগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ডিউক ডি অরলিন্সের প্ররোচনায় পার্লিয়ামেণ্ট সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। পরদিবস রাজা ডিউক্ প্রবরের নির্ব্বাসনের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। রাজার যথেচ্ছাচার দৃষ্টে পার্লিয়ামেণ্ট চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজশক্তির সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কোন ব্যক্তির দৈহিক স্বাধীনতায় রাজার হস্তার্পণের অধিকার নাই—সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রচারিত হইল।

এদিকে মন্ত্রীবর ব্রাইন দেখিলেন যে, অর্থাগমের উপায় ভিন্ন রাজকার্য্য পরিচালন অসম্ভব; কিন্তু সম্প্রদায় সমিতি আহূত না হইলে পার্লিয়ামেণ্ট কোনক্রমে রাজকরনির্দ্ধারণে সম্মতি প্রদান করিবেন না। তিনি দেখিলেন যে, করনির্দ্ধারণসম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টের শক্তি অসীম; কোন উপায়ে সেই শক্তি হরণ করিতে না পারিলে অর্থাভাব নিবারণের সকল চেষ্টাই বিফল

হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পার্লিয়ামেণ্টের শক্তিহরণকল্পে কুরপ্লেনি নামক এক অভিনব সমিতির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সেই সমিতির হস্তে করনির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গীয় সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত করিতে কৃতসঙ্কল্প করিলেন।

আকাঙ্ক্ষিত সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যথারীতি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। পার্লিয়ামেণ্ট পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলে বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই পাণ্ডুলিপি গুপ্তভাবে ভার্সেলিস নগরের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত প্রেরিত হইল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের চক্ষুতে ধূলি প্রদান সহজ ব্যাপার নহে। সভ্যপ্রবর ডি এছপ্রিমিনেল মন্ত্রীবরের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে সন্দিহান হইয়া ভার্সেলিস নগরে একজন গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। প্রাগুক্ত মুদ্রাযন্ত্রের জনৈক কর্ম্মচারীর সাহায্যে গুপ্তচর একখণ্ড প্রুফ সংগ্রহ করিয়া প্যারিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। ডি এছপ্রিমিলেন এইরূপে মন্ত্রীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই দিনই পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন,—"কয়েক ঘণ্টাকাল মাত্র আমাদের প্রতিবাদ করিবার অধিকার আছে। সেই জন্য আমরা আত্মসম্মানগর্ব্বিত পুরুষগণের অধ্যবসায় সহকারে,—সেই জন্য আমরা বিশ্বস্ত প্রজামণ্ডলীর নির্ভীকতাসহকারে,—প্রতিবাদ করিব। মন্ত্রীদল এক অতি হাস্যাস্পদ সমিতিপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। দুরূহ রাজকার্য্যপ্রসঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রজামণ্ডলীর সহিত রাজার মন্ত্রনা করিবার এই কি উপযুক্ত স্থান? ঈদৃশ উপায় অবলম্বনে কি মন্ত্রীদল রাজাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিয়াছেন? এই জন্যই কি সম্প্রদায় সমিতির অধিবেশন হইতেছিল? যাহা হউক ফরাসী জাতি রাজার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইবে না।"

অনন্তর সভ্যগণ একে একে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কেহই বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট ভিন্ন অন্য কোন সভা সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া রাজা অথবা মন্ত্রীগণকে সাহায্য করিবেন না। পার্লিয়ামেণ্টের দৃঢ়তা দৃষ্টে মন্ত্রীগণ স্তম্ভিত হইলেন। তথাপি রাজমর্য্যাদাসংরক্ষণকল্পে তাঁহারা বলপ্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সভ্যপ্রবর ডি এছপ্রিমিনেল ও মনসাবর্ত্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের রোষদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ডি আগষ্ট নামক রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে প্রেরিত হইলেন।

পার্লিয়ামেণ্ট সম্প্রদায় সমিতির অধিবেশন কামনা করিয়া সমগ্র ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। সেইজন্য পার্লিয়ামেণ্টের প্রতি বল-

প্রয়োগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শনের নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট-সন্নিধানে সংখ্যাতীত লোকসমাগম হইল। তাহারা এছপ্রিমিনেল ও মনসাবর্ত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধাসহকারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজকর্ম্মচারী ডি আগষ্ট কতিপয় সৈনিক পুরুষ সমভিব্যাহারে পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এছপ্রিমিনেল ও মনসাবর্ত্ত কোথায় ?" সমবেত সভ্যদল একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আমরা সকলেই এছপ্রিমিনেল এবং মনসাবর্ত্ত ; আপনি আমাদের সকলকেই ধৃত করুন।" ডি আগষ্ট সভ্যদ্বয়কে চিনিতে না পারিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরদিবস বেলা একাদশ ঘটিকার সময় তিনি অপর একজন কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে পার্লিয়ামেট গৃহে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন। শেষোক্ত কর্ম্মচারী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় এ স্থানে নাই।" তাহা শুনিয়া ডি আগষ্ট প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া এছপ্রিমিনেল দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে ব্যক্তিদ্বয়ের অনুসন্ধানে এই স্থানে আসিয়াছেন, আমি তন্মধ্যে একজন ; আমার নাম এছপ্রিমিনেল। আমি অবৈধ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আত্মসম্ভ্রমের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারি না। আমি যদি আপত্তি করি তাহা হইলে আপনার সৈনিকগণের প্রতি বলপ্রয়োগের আদেশ আছে কি ?" ডি আগষ্ট উত্তর করিলেন, "আপনি কি তাহাতে সন্দেহ করেন ?" তখন এছপ্রিমিনেল বলিলেন, "তবে আপনি অগ্রগামী হউন ; আমি আপনার পশ্চাতে গমন করিতেছি। আপনি এই স্থানে বলপ্রয়োগ করিয়া বিচারালয় কলুষিত করিবেন না। চলুন, আমরা পশ্চাৎ দিকের সোপান-পথে গমন করি, সম্মুখপথে গমন করিলে সমবেত জনগণ আপনার কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।" ডি আগষ্টকে এই কথা বলিয়া এছপ্রিমিনেল এই অবৈধ রাজাজ্ঞাপ্রসঙ্গে এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি সভ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা ভীত হইবেন না। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে মনোনিবেশ করুন। আর একটি কথা, আপনারা আমার পরিবারবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না। আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক আমি তাহাতে দুঃখিত নহি।" এই বলিয়া এছপ্রিমিনেল সভ্যমণ্ডলীকে অভিবাদন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মনসাবর্ত্তও তাহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ চলিলেন। তখন সভ্যগণ এছপ্রিমিনেল ও মনসাবর্ত্তের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও রাজার যথেচ্ছাচারপ্রসঙ্গে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ত্রিশ ঘণ্টাকাল-ব্যাপী অধিবেশনের পর সভাভঙ্গ করিলেন।

এছপ্রিমিনেল ও মনসাবর্ত্ত জনসাধারণের হিতার্থে ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক সমগ্র ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগ অর্জ্জন করিলেন। রাজবর্ত্মে, প্রতি গৃহে, প্রতি স্থানে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া উন্মত্ত ইতর সাধারণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষম কাণ্ড আরম্ভ করিল। প্যারিস নগর হইতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশে অশান্তিস্রোত প্রবাহিত হইল। রেণিছ, বোর্ডো, টুলু, আই প্রভৃতি স্থানসমূহের প্রাদেশিক পার্লিয়ামেণ্টগুলি প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যাবলীর অনুমোদন করিলেন। অচিরে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ আন্দোলনে আলোড়িত হইল।

পরদিবস রাজাজ্ঞাক্রমে ভার্সেলিস নগরে প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের অধি-বেশন হইল। রাজা স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেনঃ—

"জনসাধারণের হিতার্থে এবং স্বকীয় এবং উত্তরাধিকারিগণের স্বার্থা-নুসরণে গত বৎসর আমি যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছি, প্যারিস পার্লিয়া-মেণ্ট তাহাতেই অন্তরায় ঘটাইয়াছেন। প্রাদেশিক পার্লিয়ামেণ্টগুলিও প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণ বশতঃ আমি দণ্ডবিধির উন্নতি সাধন করিতে পারি নাই, বিচারকার্য্য এক-কালে স্থগিত হইয়াছে, সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে, জাতীয় প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টগুলির বিরুদ্ধাচরণ যাহাতে নিবারিত হয় তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আমি দুইজন সভ্যের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছি, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। পার্লিয়ামেণ্টগুলির ধ্বংসসাধন আমার অভিপ্রেত নহে, তাহাদিগকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শনই আমার উদ্দেশ্য।"

রাজা আসন গ্রহণ করিলে মন্ত্রী লামিনন্ পার্লিয়ামেণ্টের অনুমোদনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়টি প্রসঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেনঃ—

(১) বিচারকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পন্ন হইবার নিমিত্ত নূতন বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা।

(২) দণ্ডবিধি আইনের সংশোধন।

(৩) রাজকরে সম্মতি প্রদানের নিমিত্ত কুরপ্লেনি সভার সংস্থাপন।

(৪) অভিনব বিচারালয়সংস্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের বিচার-কার্য্য স্থাপিত করণ।

পার্লিয়ামেণ্টের শক্তিহরণের প্রস্তাব শুনিয়া সভ্যগণ ক্রোধে অধীর হইলেন; কিন্তু রাজার সম্মুখে কোন প্রকার বাকৃবিতণ্ডা না করিয়া তাঁহারা সভা ভঙ্গ হইলে গুপ্তভাবে সম্মিলিত হইয়া রাজার সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

এইরূপে প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টের দৃঢ়তানিবন্ধন মন্ত্রীবর ব্রাইনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কোন সভ্যই প্রস্তাবিত কুরপ্লেনি সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। আবার নগণ্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ ভিন্ন কেহই নূতন বিচারালয়ের পদপ্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্রসর হইল না। কিন্তু এ দিকে রাজাজ্ঞাপ্রচারে দেশের বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়াছে; অর্থাভাবে রাজকার্য্যপরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে সুতরাং বিষম সমস্যা উপস্থিত।

অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রীবর অর্থসমাগমের উপায় উদ্ভাবনকল্পে ধর্ম্মযাজক-গণকে এক বিরাট সভায় আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "সম্প্রদায় সমিতি ভিন্ন কাহারও কর-নির্দ্ধারণের অধিকার নাই।" তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া মন্ত্রীবর সম্প্রদায় সমিতি আহ্বান করিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রণয়ে।

(সংস্কৃত হইতে)

মধুর বচন কহ অথবা কঠোর,
তু-ই সখি! মম রসায়ন।
ঢালহ শীতল বারি অথবা সুতপ্ত
তু-ই করে অগ্নি নির্ব্বাপন।

অদৃষ্ট-চক্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বর্জ্জন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

ধরণীধর কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইলেন। তখনও যতীশচন্দ্রের কলেজ খুলিবার বিলম্ব আছে। কিন্তু সে কলিকাতায় গেল - পিতামহীকে বুঝাইয়া গেল, পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা না করিলে ভাল "মেসে" স্থান পাওয়া যায় না—ভাল "মেসে" স্থান না পাইলে আহারের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আহারের অসুবিধা হয়—এই যুক্তিই স্নেহশীলা পিতামহীর সকল আপত্তি নিরস্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। যতীশ কলিকাতায় গেল। আসল কথা, এতদিন গৃহে থাকিয়া কলিকাতায় বন্ধুসমাজে মিশিবার জন্য তাহার বাসনা ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার ধৈর্য্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইতেছিল। এই কয় মাসে সাহিত্য-জগতে হয় ত কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! 'বিশ্বদূতে' প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা অমূল্যচরণ তাহাকে পাঠাইয়াছিল। সে সমালোচনা নির্জ্জলা সুখ্যাতি। সেই উপলক্ষে অমূল্যচরণ লিখিয়াছিল, "আমি কত দিন হইতে আপনাকে বলিতেছি, কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করুন। আপনি নিরতিশয় লজ্জানিবন্ধন তাহাতে অসম্মত। প্রতিভার জয় অবশ্যম্ভাবী, সত্য; কিন্তু সংসারে আপনাকে একটু চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আমার কথা শুনুন;—কবিতাগুলিকে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখিয়া আর নকলনবীশদিগকে মৌলিক কবি করিবার পক্ষে সহায়তা করিবেন না।" বাস্তবিক—নগেন্দ্রনাথ তাহার তুলনায় নগণ্য। যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণের উপদেশে চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু পিতার অমত জানিয়া সে

পুস্তকপ্রকাশবিষয়ে অমূল্যচরণকে কোন কথাই লিখে নাই। তাহার "ফুল-শয্যার" দিন অমূল্যচরণ তাহার গৃহে আসিয়াছিল। পরদিন অমূল্যচরণ তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল—

"কাল, 'ফুলশয্যা' কেমন উপভোগ করিলেন? আমরা অনেকক্ষণ জ্বালাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপনার শ্বশুর যদি সকাল সকাল 'ফুলশয্যা' পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমরাও শীঘ্র আপনাকে মুক্তি দিতাম। রাত্রিতে মেঘ বেশ কাটিয়া গিয়াছিল। চাঁদের আলো দেখিতে দেখিতে চাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছেন ত? বাস্তবিক আপনার বিবাহটা আগাগোড়াই খুব romantic রকমের হইয়াছে। 'অস্তরবির স্বর্ণকিরণে' সমুজ্জ্বল অপরাহ্নে নদীবক্ষে 'শুভদৃষ্টি'! বিশেষ পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণরঞ্জিত কুসুমশয়নে 'মামুলি' 'ফুলশয্যা'—অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ।

"আজ একবার আপনাদের ওদিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একটি কায পড়ায় (অর্থাৎ একরাশি প্রুফ দেখিবার থাকায়) যাইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে কবিতা বাছাই করিবার কথা আছে।

"আপনার প্রবন্ধাদির প্রুফ পরে পাঠাইয়া দিব। এবার এখনও কাগজের কিছুই হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আমার আলস্য—যাহা ঠাহরাইয়াছেন—তাহা নহে। গত দশ মাস (অর্থাৎ মাঘ পর্য্যন্ত) কাগজ চলিয়াছেন, কিন্তু এই দুই মাস অচল। এই দুই মাস গ্রাহক মহাশয়রা 'উপুড় হস্ত' করেন নাই।

"আপনার এই উৎসবানন্দের মধ্যে আমার এই সব ব্যাপার লিখাই বেয়াদবি। আপনিও কাগজের একজন, তাই লিখিলাম।

"আর একটি কথা লিখিতে নিতান্ত লজ্জা করিতেছে; বিশেষ এ সময়ে। কিন্তু নিরুপায়ের চক্ষুলজ্জা নাই। আপনার হাতে যদি টাকা থাকে, তাহা হইলে মাস দুই তিনের জন্য আমায় দুই শত টাকা ধার দিলে আমার অত্যন্ত উপকার হয়। তাহা হইলে কাগজখানা বাহির করিয়া ফেলা যায়। আপনার সুবিধা হইবে কি?

"আশা করি, শীঘ্র এই পত্রের উত্তর দিবেন। টাকার কথা আমিও অসঙ্কোচে লিখিলাম, আপনিও অসঙ্কোচে উত্তর দিবেন। আমি এ কয়দিন অনেক স্থানে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অদ্য আপনাকে লিখিলাম। কাগজখানা সময়ে বাহির করিতে না পারিলে উহার প্রতিষ্ঠার বড় ক্ষতি হয়। সেটা

কিছু হইয়াছে, তাই বড় ব্যস্ত হইয়াছি। এবং আমার ব্যস্ততা যত বাড়িতেছে সেই পরিমাণে নিরাশ ও নিরুপায় হইতেছি। সেইজন্য আপনাকে এ সময়ে কাগজের এই দুঃখের সংবাদ লিখিলাম। আপনি ক্ষমা করিবেন।"

এই পত্র পাইয়া যতীশ কিছু বিচলিত হইয়াছিল। বিচলিত হইবার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ সে কাগজখানির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছিল। এই পত্রেই সমাজে তাহার প্রতিভার পরিচয়, তাহার যশের প্রতিষ্ঠা। ইহার যথেষ্ট সমাদর হইতেছে না কেন? হায় বাঙ্গালী পাঠক! বড় দুঃখেই কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যেজন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হ'বে?"

আরও এক কারণে সে কিছু বিচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে অমূল্যচরণ, আপনার জন্য নহে—কাগজের জন্য, মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট অর্থসাহায্য লইয়াছে। কিন্তু কখন একবারে অধিক অর্থ চাহে নাই। এবার প্রার্থিত সাহায্যের পরিমাণ দুই শত টাকা! এত টাকা একজন ছাত্রের পক্ষে কিছু অধিক। লোকচরিত্রজ্ঞানহীন যুবক জানিত না, অমূল্যচরণ বিশেষ চতুর; সে সময় বুঝিয়া—সুবিধা বুঝিয়া অনুরোধ করিত। সে জানিত, যতীশচন্দ্রের পক্ষে অধিক অর্থ প্রদান এতদিন অসম্ভব ছিল—তাই সে পূর্ব্বে কখনও একবারে অধিক অর্থ চাহে নাই। সে জানিত, এবার যৌতুক প্রভৃতিতে তাহার হস্তে কিছু অধিক অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, তাই সে এবার এরূপ অনুরোধ করিয়াছে। যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণের চরিত্রের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই। সে ক্ষমতা তাহার ছিল না। বিশেষ অমূল্যচরণ তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, সে তাহার অসাধারণ প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত করিয়া আত্মোৎসর্গের আদর্শ দেখাইয়াছে—সে যেন বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য—তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শতশত শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিবে তখন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পদসম্ভারে সমগ্র সভ্য জগতে সমাদৃত হইবে। তখন সে মরণের শান্তিতে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শ্রান্তির পর সুপ্তি লাভ করিবে; কিন্তু সেই শুভদিনের কল্পনায় সে বর্ত্তমা-

নের সমস্ত কষ্ট—সকল অভাব সানন্দে সহ্য করিতেছে। তাহার আশা, তাহার মাতৃভাষা এক দিন জগতে সম্মানের স্বর্ণসিংহাসন লাভ করিবে। এই উদ্দেশ্যের সংসাধনজন্য আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। সে বঙ্গভারতীর দীন ভক্ত, তাহার সর্ব্বস্ব দেবীর পূজার জন্য আনিয়াছে। অমূল্যচরণের এই সকল কথা বলিবার এমন ভঙ্গী ছিল যে, সরলহৃদয় যতীশচন্দ্র সহজেই তাহার কথা বিশ্বাস করিত। সে অমূল্যচরণের সাহিত্যসেবায় বিস্মিত—পুলকিত হইত। সে বুঝিতে পারিত না, অমূল্যচরণের এই সকল উক্তির মূলে সত্যের লেশমাত্র নাই—তাহার স্বার্থত্যাগের ভাণ কেবল লোককে ভুলাইবার জন্য। তাই এবারও যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণের অনুরোধ এড়াইতে পারে নাই। সে তাহাকে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছিল,—তাহার হস্তে আর টাকা না থাকায় সে আর পাঠাইতে পারিল না।

এই সময় হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতেছিল। স্বল্পসময়ব্যাপী সাক্ষাতে, কথায় ও পত্রে অমূল্যচরণ তাহার সেই আগ্রহবর্দ্ধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু পিতাকে কি বুঝাইয়া সে কলিকাতায় যাইবে? তাই এতদিন তাহার যাওয়া ঘটে নাই। এক্ষণে সে অন্তরায় অন্তর্হিত হইলেই সে বহুদিন বন্ধনের পর সহসা বন্ধনমুক্ত তেজস্বী অশ্ব যেমন মন্দুরা হইতে ছুটিয়া বাহির হয় তেমনই গৃহ হইতে যাত্রা করিল।

এই যাত্রায় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইবে। পূর্ব্বে যখনই সে কলিকাতায় গিয়াছে—তখনই সে শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের অভিপ্রায়ে গিয়াছে। এবার তাহার অভিপ্রায় অন্যরূপ। এবার সে সাহিত্য-সেবায় যশ অর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাত্রা করিল। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ তাহার উদ্দেশ্য নহে—সাহিত্যক্ষেত্রে যশ অর্জ্জনই তাহার উদ্দেশ্য। এবার অমূল্যচরণ তাহার আদর্শ।

সে আপনার অদৃষ্টাকাশে যশের সমুজ্জ্বল দিবাকরকরব্যাপ্তির কল্পনা করিতেছিল। সে জানিত না যে, রবিকরোজ্জ্বল-মেঘলেশশূন্য গগনেও সহসা নিবিড় কৃষ্ণ কাদম্বিনীর সঞ্চার হইয়া থাকে; প্রবল বাত্যা সেই মেঘ ছড়াইয়া আকাশ হইতে রবিকর মুছিয়া দেয়, বজ্রনাদে প্রকৃতির কমনীয় উপবনে বিহগবিরাব, মধুপঝঙ্কার আর শ্রুত হয় না—জীবনের কলরব থামিয়া যায়—প্রলয়ের বিষাণে মৃত্যুর আহ্বান ধ্বনিত হয়।

আপনার ভবিষ্যৎ জীবন একরূপে গঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া যতীশচন্দ্র

গৃহ হইতে যাত্রা করিল। আর দূরে ধরণীধরের ব্যাকুল পিতৃহৃদয় পুত্রের ভবিষ্যৎজীবন অন্যরূপে সংগঠিত করিবার কল্পনা করিতেছিল। তিনি আশা করিতেছিলেন, পরীক্ষায় পুত্রের অসাফল্য তাহাকে সাফল্যলাভে যত্নবান করিবে—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে সে জীবনে আনন্দ ও শান্তি, সম্পদ ও সম্মান লাভ করিয়া সমাজে সমাদর ও গৃহে সুখ ভোগ করিবে। সে ব্যতীত তাঁহার স্নেহের অন্য অবলম্বন নাই; তিনি তাহারই জন্য এত দিন শ্রম করিতেছিলেন। তাহার অসুখের কল্পনাও তাহার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ।

সমালোচনা।

অশোক। *

প্রাচীন ভারতের যে সকল পরাক্রান্ত নৃপতি ভারতের দিকে দিকে আপনাদিগের প্রভাব প্রশারিত করিয়াছিলেন—এমন কি ভারতের বাহিরে ও কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন—অশোক তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। নির্ব্বাণমন্ত্রে দীক্ষিত সম্রাট অশোক ভারতের নানাস্থানে অনুশাসন প্রচারিত করিয়া ভারতে গৌতমবুদ্ধের ধর্ম্মমত প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারই সহায়তায় ভিক্ষুগণ পর্ব্বত ও জলধি অতিক্রম করিয়া তিব্বতে, চীনে, সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে পাঠক দেখিবেন, "ভারতে এবং ভারত-বহির্ভূত প্রদেশে অশোক তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, এবং ইহারই ফলে যে ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য স্থলে ক্ষিপ্রগতিতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।" গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন,—উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে অশোকের প্রচারকেন্দ্র যথাক্রমে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়—

* শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

(১) মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ।

(২) সাম্রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ, অর্থাৎ যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রীক, পিটেনিক, অন্ধ্র, পচিত্ত, নাভান প্রভৃতি দেশ এবং নভপন্থী প্রভৃতি জাতির আবাসভূমি।

(৩) অরণ্যপ্রদেশ।—এই স্থানে নানাবিধ আরণ্যক জাতির নিবাস ছিল।

(৪) দক্ষিণভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ।—কেরলপুত্র, সতীয়পুত্র, চোল ও পাণ্ড্যদেশ।

(৫) সিংহল।

(৬) মিশর, সিরিয়া, সাইরিন, ইনিরাস ও মাসিডোনিয়া।

যখন রাজানুগৃহীত ধর্ম্মের প্রচারক্ষেত্র এইরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তখন যে রাজপ্রতাপ অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না।

আবার এই ধর্মপ্রচারব্যপদেশেই দেশের লিপির, সাহিত্যের ও স্থাপত্যাদি শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনসমূহ প্রচারোদ্দেশে যে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল—তাহাতে লিপির, সাহিত্যের ও শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। "যদিও অশোকলিপি আজ দুই হাজার বৎসরের অধিক কাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অতীতের গভীর অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, তথাপি এখনও এত সুন্দর ও পরিষ্কার অবস্থায় বিদ্যমান আছে যে হটাৎ দেখিলে ইহা-দিগকে সদ্য উৎকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর নানা দেশে এপর্য্যন্ত যত প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে, আশোক অক্ষরের ন্যায় পরিষ্কার, নিরলঙ্কার সরল অক্ষর অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোকলিপি দুইপ্রকার অক্ষরে লিখিত।" এই অশোকলিপির উৎপত্তির সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রিন্সেপ অসাধারণ ধীশক্তি ও সহিষ্ণুতাবলে এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি পণ্ডিতসমাজে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

অশোকের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে ভারতে স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ ছিল কানিংহাম তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু অশোকের সময় রাজানুগ্রহপুষ্ট ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য যে সকল স্তূপ, স্তম্ভ, বৃত্তি, বিহার ও চৈত্য নির্ম্মিত হয় সে সকলে ভারতীয়

শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এখনও সে সকল শিল্পকীর্ত্তি আমাদের বিস্ময় উৎপাদিত করিতেছে।

এইরূপে অশোকের রাজত্বকালকে বৌদ্ধযুগের সমৃদ্ধিসময় বলা যাইতে-পারে। এই সময়ের ইতিহাসের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হওয়া যায়—প্রাচীন ভারতীয় সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার আধুনিকত্ব সপ্রমাণে সচেষ্ট তাঁহারা এই পুস্তকের উনবিংশ অধ্যায়ে অশোকের রাজ্যশাসন-প্রণালীর বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিবেন যে, সভ্যতাগর্ব্বিত য়ুরোপে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ভারতে অশোকের শাসনকালে সেই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিসাধন হইতে পীড়িত বিদেশগত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার উপায়বিধান পর্য্যন্ত সকলেরই সুব্যবস্থা ছিল।

আবার অশোকের জীবনকথাও উপন্যাসের মত বৈচিত্র্যময়।

সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অশোকের রাজত্বকালসম্বন্ধে বহু প্রমাণ্য ঘটনার আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রন্থকার সেইসকল উপাদান অবলম্বন করিয়া আলোচ্য পুস্তকরচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় ইতঃপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরলোকগত কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় অশোকের একখানি জীবনী রচিত করিয়াছেন। তাহার পর অশোকসম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানা-গিয়াছে। বাঙ্গলার কোন লেখক সে সকলের সম্যক সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'সাহিত্যে' ও অল্পদিনপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'আর্য্যাবর্ত্তে' অশোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত; দ্বিতীয় প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক নহে। ইংরাজীতে বিশেষজ্ঞ রিজ ডেভিড অশোকচরিত রচিত করিয়া কোন অজ্ঞাত-কারণে পুস্তকের প্রচার বন্ধ করেন। তাহার পর ভিনসেণ্ট স্মিথ অশোক-চরিত রচনা করিয়াছেন। এখন তাহাই অশোকের সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। চারুবাবু আলোচ্য গ্রন্থরচনা করিয়া বাঙ্গালার বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। পুস্তকখানি তথ্যবিষয়ে বিশেষ সারবান। বাঙ্গালায় চারুবাবু বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক তাহা-রই ফল।

পুস্তকের কয়টি ক্ষুদ্র ত্রুটির উল্লেখ করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ

করিব। গ্রন্থকার ভাষা সম্বন্ধে কিছু অসাবধান। পুস্তকে, বিশেষতঃ পাদ-টীকায় ছাপার ভুল কিছু অধিক। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকের নাম Civilisation in Ancient India—Ancient Civilisation নহে। Tree and Serpent Worship—কানিংহামের রচনা নহে, ফার্গুসন উক্ত গ্রন্থের গ্রন্থকার। বৌদ্ধযুগের শিল্পনিদর্শন আবিষ্কারপ্রসঙ্গে লেখক মহাশয় ফার্গুসন ও বার্জেসের সহিত হ্যাভেলের নাম না করিয়া কানিংহামের নাম করিলে সঙ্গত হইত।

সংগ্রহ।

সাহিত্য।

গত ১৬ই মে তারিখে বিলাতের রয়েল লিটেরেরী ফণ্ডের অধিবেশনে সাহিত্যসম্বন্ধে মিষ্টার বালফুর একটি সুচিন্তিত সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বালফুর বিলাতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিক। বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। বিলাতের সাহিত্যিক সমাজে তাঁহার খ্যাতিও যথেষ্ট। সুতরাং, সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই মনোযোগসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা নিয়ে তাহার স্থূলমর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

বক্তৃতারম্ভে শ্রীযুত বালফুর ভোজনান্ত বক্তৃতার বিষয়বিভাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ তিন প্রকার বিষয় লইয়া ভোজনান্ত বক্তৃতা হইয়া থাকে। (১) অতি সামান্য বিষয়, যে সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুই নাই। (২) জটিল বিষয়, যে সম্বন্ধে সহসা সম্যক আলোচনা করা সম্ভবে না। (৩) বহুবিস্তৃত বিষয়। সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা এই তৃতীয় বিষয়ের অন্তর্গত। বক্তার জিহ্বায় যদি দেবতার শক্তি থাকে, তাহা হইলেও তিনি সাহিত্যসম্পর্কে যে সকল কথারই আলোচনা করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ আশা কেহই করিতে পারে না।

ভোজনান্ত বক্তৃতা।

সাহিত্য আলোচনায় একটি বড় বিষম গোল আছে। সমালোচক অতীত, বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কোন্ যুগের সাহিত্যের আলোচনা করিবেন, তাহা লইয়াই গোল। অতীত যুগের সাহিত্যের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশই ধৃষ্টতা। কেহই অমরদিগকে 'দীর্ঘায়ু হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন না। অতীত যুগের সাহিত্যিকদিগের খ্যাতি পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত; বক্তার বা সমালোচকের

আলোচনার বিষয়।

মন্তব্যে তাঁহাদের যশোভাতি অপেক্ষাকৃত পরিম্লান বা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। সমালোচকদিগের মন্তব্যে তাঁহাদিগের প্রতি পাঠকদিগের সম্মান বা প্রীতি ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। সৌভাগ্যক্রমে ভবিষ্যৎ যুগের ইতিহাসসম্বন্ধে মনুষ্যের কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ সাহিত্য কিরূপ হইবে, তাহা অনুমান করা সম্ভবে না। তবে কি আমাদিগকে কেবল বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে? সচরাচর দেখা যায়, সমালোচকগণ তাঁহাদের সমকালীন প্রতিভাশালী লেখকদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী নহেন। বর্ত্তমান যুগের যশস্বী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ভবিষ্যতে যশের মন্দিরে কে কোন্ তলের প্রকোষ্ঠ অধিকার করিত সমর্থ হইবেন, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণ প্রায়ই নীরব রহেন। তাঁহারা অতীতযুগের সাহিত্যিকদিগের সহিত বর্ত্তমানযুগের সাহিত্যিকদিগের তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উপর বর্ত্তমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ প্রভাব জন্মিবে, সে সম্বন্ধেও তাঁহারা কোন কথাই বলিতে চাহেন না। বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত সমালোচকদিগের রচনা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগে সমালোচকদিগকে যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়, তাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কল্পনায়ও আসিতে পারিত না। বর্ত্তমানযুগের সমালোচকগণ জীবিত গ্রন্থকারদিগের আপেক্ষিক ক্ষমতা ও খ্যাতিসম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন না; সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা অতীত বা ভবিষ্য সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারি না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বর্ত্তমান সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত বাঁধা ধরা নিয়মগুলি মানিয়া আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে; সুতরাং সাহিত্য-সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ যে নিতান্ত কঠিন ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাহিত্যসম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ কঠিন হইলেও ইহা অত্যন্ত প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয়। আমরা বড় বড় সমালোচকের রচনা পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, আলোচ্য সাহিত্য

সমসাময়িক চিত্র।

যে যুগে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই যুগের মানব-চরিত্র তাহাতে প্রতিফলিত থাকে। সাহিত্যই সমকালীন জনসমাজের নিখুঁত চিত্র। অতীত সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি দেখা যায় যে, কি প্রকার সাহিত্য সেই যুগের মানবচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিত তাহা হইলে সেই যুগের মানবজাতির চিত্তবৃত্তি ও মনোবৃত্তি উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অতএব বর্ত্তমান যুগে আমরা যে সমস্ত সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকি, যে সমস্ত সাহিত্য গ্রন্থ আমরা ক্রয় করি, পাঠ করি, যাহার প্রশংসা করি, এবং যাহা পরিপাক করি, তাহাতেই আমাদিগের আলোকচিত্র এবং সিনেমেটোগ্রাফ্ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাই। এই সাহিত্যই আমাদিগকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত করিয়া দিবে; এই সাহিত্য দেখিয়াই ভবিষ্যৎ মানবসমাজ বর্ত্তমান মানবসমাজের দোষগুণ বিচার করিবে।

এই মত আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে সুদৃঢ় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবে;

কিন্তু আমার মতে যাঁহারা এই মতের প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই মত লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে পারেন। আমি এই মতটি যেরূপ বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে, প্রত্যেক যুগে এক এক রূপ প্রতিভাই জনসমাজের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে; তদ্ব্যতীত অন্যরূপ প্রতিভা সেই জনসমাজের উপর কিছুমাত্র আধিপত্য বিস্তৃত করিতে পারে না। কাচ রঙ্গিন হইলে তাহার ভিতর দিয়া কোন কোন আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, অন্য প্রকার আলোকরশ্মি তাহার ভিতর দিয়া গমন করিতে পারে না। সেইরূপ জনসমাজও সময়ে সময়ে কোন কোন প্রতিভাকে সমাদৃত ও কোন কোন প্রতিভাকে উপেক্ষিত করিয়া থাকে। আপনারা যদি আমার এই মত গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যুগভেদে মানবের রুচিভেদ হইয়া থাকে। সামাজিকগণের চরিত্রভেদই এই রুচিভেদের কারণ। আমার মত সত্য করিয়া গ্রহণ করিলে, এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে রুচি বিভিন্ন মানব-সমাজের এই ভেদ-নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, সাহিত্যের প্রভাবে প্রতিভাশালী ও মনীষাসম্পন্ন লেখকদিগের রচনাপ্রভাবে সেই রুচিও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রতিভাশালী লেখক-দিগকে উক্তপ্রকার স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া তাঁহাদিগের প্রভাববিস্তার করিতে হয়, ইহা সত্য নহে। রুচির পরিবর্ত্তন করা সম্ভবে। পণ্যের ন্যায় রুচিরও সৃষ্টি করা যাইতে পারে। যাঁহারা পণ্য প্রস্তুত করেন, বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, সাধারণে যে জিনিস চাহে, তাঁহাদিগকে কেবল সেই জিনিসই প্রস্তুত করিতে হয় না, পরন্তু জনসাধারণের দ্বারা গ্রহণ করাইবার জন্য নূতন বস্তুও প্রস্তুত করিতে হয়। অর্থাৎ যে দ্রব্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে লোক তাহার অভাব বোধ করিত না, কিন্তু প্রস্তুত জিনিস দেখিলে তাহা লইবার জন্য ব্যগ্র হয় তাঁহাদিগকে এইরূপ দ্রব্যও প্রস্তুত করিতে হয়। পণ্যপ্রস্তুতকারী যদি নূতন পণ্য প্রস্তুত করিয়া লোককে উহা লওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কার্য্যকে ভাল বলিয়া আমরা কীর্ত্তন করিয়া থাকি; কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ, মৌলিক লেখকগণ ও যে সকল মনীষাসম্পন্ন লেখক গতানুগতিকের ন্যায় সমসাময়িক লোকদিগের ছন্দানুবর্ত্তী হয়েন না তাঁহারা নূতন ভাবে নূতন ভাষায় নূতন মত প্রকাশ করিয়া সাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে রুচিদ্বারা ভবিষ্যৎ মানবসমাজ তাঁহার রচনার বিচার করিবে, সেই রুচিই তিনি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত সেই রঙ্গিন কাচের বর্ণ বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। জনসাধারণের রুচি কিরূপে কোন বিশেষ প্রকারের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, সফল করে, তাহা লক্ষ্য করা কেবল কৌতূহলের তৃপ্তিসাধক নহে; পরন্তু প্রতিভার প্রভাবে মানবসমাজের রুচি কিরূপে পরিবর্ত্তিত এবং পুরাতন আদর্শস্থলে নূতন আদর্শ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাও লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

প্রতিভা ও রুচি।

শিল্পকলা বা সাহিত্যিক রচনার দিকে যন্ত্রের ন্যায় দৃষ্টিপাত করা সমীচীন নহে। সাহিত্য কেবল সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত কারণ হইতে উদ্ভূত হয় না; ইহা যে কেবল সমাজ-বিজ্ঞান-

বিজ্ঞান ও প্রতিভা।

সম্মত কারণের পরিণতি নহে, তাহা নহে; পরন্তু সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত কারণ ইহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে না।

সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত কারণ ও ব্যক্তিগত প্রতিভা এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতজনিত শক্তিদ্বারা সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক সমীকরণে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলে সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় না। সুতরাং আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক ভাবে ভাবিত হইয়া সাহিত্যের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নহে। কারণ আমার মনে হয়, বিজ্ঞান যখন মানবের স্বাধীন ভাবের উন্নতি লইয়া আলোচনা করে, তখন বিজ্ঞান তাহার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তীর্ণ হইলে বিজ্ঞান যে ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহা আমি বলি না; কারণ আমি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিতে চাহি না। কিন্তু এখন আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যতটুকু অধিকার নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে উহা এত দূর অগ্রসর হইতে পারে না। প্রতিভার প্রভাব সর্ব্ববাদীসম্মত এই কথাই আমি বলিতে চাহি। যদি উহাই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাকে কোন কঠোর নিয়মের নিগড়ে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক কৌশলী শিল্পী বা শিল্পীসম্প্রদায় প্রভৃতির প্রভাবে মানবরুচির পরিবর্ত্তন আলোচনা করিলে, কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। আমার

অগ্রদূতগণের প্রভাব।

মনে হয়, যাঁহারা সাহিত্যের ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কার্য্য করিয়া যায়েন, জনসাধারণ তাঁহাদের যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে না। যাঁহারা সাহিত্যের, শিল্পের বা সঙ্গীতের বিকাশ সাধনে অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগের কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কিরূপ উপকৃত হইলাম, এইটুকু মাত্র দেখিয়া থাকি; কিন্তু এই অগ্রদূতদিগের কার্য্যের একটি বিশেষ বিষয়ে আমরা একেবারেই দৃষ্টিপাত করি না। অগ্রদূতগণই তাঁহাদের পরবর্ত্তী অধিকতর মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবির্ভাবের অনুকূল ভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া যায়েন। ইঁহারা যে রুচি প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পায়েন, ইঁহাদের পরবর্ত্তী মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেবল তাহারই উন্নতি সাধন করেন, সুতরাং কোন বিশেষ সাহিত্যিক বা শিল্পকলাসম্পর্কিত আন্দোলনের যাঁহারা অগ্রদূত, তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্ত্তী প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের তুলনায় অনেকটা হীন বলিয়া আপনাদিগের নিকট বিবেচিত হয়েন সত্য, কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, ঐ অগ্রদূতগণ যদি আবির্ভূত না হইতেন, তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া যদি লোকের রুচি এবং প্রতিবেশ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন না করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবির্ভাব সম্ভবই হইত না।

আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাহিত্যের ইতিহাসকে আমি বিজ্ঞানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, ইহাতে আমি আমার নিজের মতেরই

চরিত।

কতকটা প্রতিকূলগামী হইতেছি। আমি স্বয়ং চরিত্রালোচনায় আনন্দ উপভোগ করি। চরিতলেখক আমাকে অতীত যুগের মনস্বী ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন; ইহাতেই আমার আনন্দ। ইহা ভিন্ন চরিত-পাঠে আমার আর এক প্রকারের আনন্দও আছে; সে আনন্দও উপেক্ষা করা যায় না। চরিত-লেখক আমাকে তাঁহার রুচির সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সাহিত্য-সমালোচনা হইতে আমি যে বিবিধ আনন্দ লাভ করি, তাহাতে ব্যক্তিগত হিসাবে আমি সাহিত্যেতিহাস-পাঠের আনন্দ পাইয়া থাকি। যাঁহারা অতীত যুগের ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের চরিত-সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্যই যদি সত্য বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমার এই ব্যক্তৃতার উপসংহার করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি অনৈক গ্রন্থকার একখানি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছেন। ঐ উপন্যাসের নায়ক সংসারে ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করিয়া পরিশেষে তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যেরূপ ভাবে পরিতৃপ্ত

আনন্দই লাভ।

করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে আনন্দিত হইতে হয়। নায়ক পরিণামে চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল। একজন সমালোচক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "মোটের উপর এই পুস্তকের নায়ক কি করিয়াছেন? কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন?" আর একজন বন্ধু সমালোচক তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "গ্রন্থখানি মোটের উপর আমাদিগের সকলকে আনন্দ বিতরণ করিয়াছে। আনন্দ-প্রদান সাহিত্যের একটি প্রধান কার্য্য, ইহাই বালফুরের মত।

আমার মনে হয়, যখন আমার বয়স অল্প ছিল, তখনকার সাহিত্য বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক ছিল। হইতে পারে, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া

আনন্দদায়ক সাহিত্য।

পড়িতেছি, সেই জন্য সাহিত্য আর আমার নিকট আনন্দ-প্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু আমি নিজে এখনও বসন্তকাল, ভাস্বর ভাস্কর, বিহগের কূজন, আসার স্নাত নৈসর্গিক দৃশ্য প্রভৃতিতে প্রীতি অনুভব করি। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতির মধ্যে যাহা বিভীষিকাপ্রদ, ভীষণ ঝটিকা, অন্ধকারাচ্ছন্ন ধারাবর্ষ দুর্দ্দিন প্রভৃতি সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় নহে, এ কথা আমি বলি না। যাহা বাস্তব, তাহাই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়, কেবল ঐকান্তিকতার সহিত প্রত্যক্ষভাবে লেখকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া লেখক যাহা লিখিবেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। উপসংহারে শ্রীযুত বালফুর বলিয়াছেন, এই দুঃখপূর্ণ, সঙ্কটসঙ্কুল সংসারে মানবকে নানারূপ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যথায় জীবিকার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া মানব অবসন্ন হইয়া পড়ে, তথায় সাহিত্যে যাহা সত্য, যাহা বাস্তবের প্রকৃত প্রতিকৃতি তাহা অপেক্ষা যাহা আনন্দপূর্ণ অথচ সত্য, তাহাই প্রতিফলিত দেখিতে লোক ইচ্ছা করিয়া থাকে। সুতরাং যে সাহিত্য মানব জাতিকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, আমি সেই সাহিত্যের স্বাস্থ্য পান করিতেছি।

বিলাতের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত বালফুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্যের মুকুরে সমসাময়িক মানব জাতির মানসচিত্র পূর্ণ মাত্রায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যে সমাজের সাহিত্যে অতি কদর্য্য, ঘৃণ্য, নারকীয় পাপের চিত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, সে সমাজের জনসাধারণ যে ঘোর পাপী তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, যাহারা ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহারাও যে ঘৃণ্য, পাপী ও নারকী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দণ্ডবিধির ভয়ে হয়ত তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে ততদূর পাপের অনুধাবন করিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের পঙ্কিল সাহিত্য-মুকুরেই তাহাদের নারকীয় ভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। শ্রীযুত বালফুর বলিয়াছেন, যে সাহিত্য পাঠে মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হয়, সেই সাহিত্যের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, উন্নত সাহিত্যে প্রীতি অনুভব করা উন্নত মনেরই পরিচায়ক। উপন্যাসের আলোচনা করিলেও দেখা যায়, যাহারা নগণ্য জঘণ্য ডিটেকটিভের গল্প, রহস্য প্রভৃতি পাঠে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে, সাহিত্যে মানবের উদ্দাম পশুভাব চিত্রিত দেখিলে যাহারা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠে, সাহিত্য সেবীদের মধ্যে তাহাদের স্থান অতি নিম্নস্তরে; কিন্তু জর্জ্জ এলিয়ট, বুলওয়ার লিটন, প্রভৃতির উপন্যাস পাঠে যাঁহারা আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারা ডিটেকটিভের গল্প পাঠকদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যে ইদানীং যে চিত্র প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বথা আশাপ্রদ নহে; তবে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রতিভাপ্রভাবে মানব সমাজের রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারেন। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাবলে বাঙ্গালীর রুচি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। আশা করি, বাঙ্গলায় আবার নূতন প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রভাবে বাঙ্গালীর রুচি পরিবর্ত্তিত হইবে।

মন্তব্য

সময়।

(সংস্কৃত হইতে)

যতই বাড়িছে চাঁদের কলা
ক্ষীণ ক্ষীণতর হতেছে বালা॥
লয়ে বুঝি তা'রি দেহের সুধা
মিটাইছে বিধি বিধুর ক্ষুধা॥
পূর্ণিমা আসিলে কি আর র'বে ?
তা'র আগে, সখা, আসিও তবে॥

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

ভারতীয় শিল্প
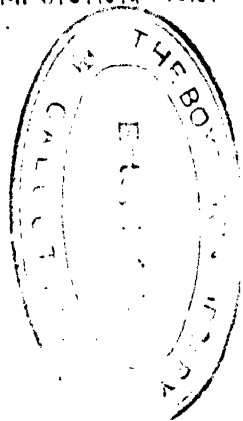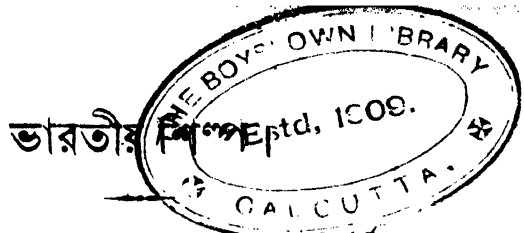
বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ রচনায় তাঁহার স্বদেশীয় বেদবিদ্যার্থিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, বেদসম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মত এ দেশে এতই প্রচলিত যে, তাঁহাদিগের মত অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা বড়ই প্রবল। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের কৃত কর্ম্মের জন্য প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই; কিন্তু বিচার না করিয়া তাঁহাদিগের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে।* ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে আলোচনাকালে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে এই মহাজনবাক্য স্মরণ করিতে হইবে।

এ দেশে ভারতীয় শিল্পের আলোচনা প্রধানতঃ য়ুরোপীয়দিগের দ্বারাই হইয়াছে। ফার্গুসন ও কানিংহাম হইতে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ও হ্যাভেল পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়গণ ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। সরকারী পুরাবস্তুবিভাগের বিবরণীতে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচনার উপাদান সঞ্চিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ—ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় শিল্প অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও শিল্প অপেক্ষা আধুনিক ও হীন এই পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারেন না,—তাই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। আরও দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পের ইতিহাস সংগঠনক্ষম ভারতীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় শিল্পের আলোচনায় আকৃষ্ট হইতেছেন না। রামরাজের ভারতীয় স্থাপত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ † ব্যতীত ভারতবাসীর ভারতীয় শিল্পসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ একান্তই বিরল। যাঁহারা ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে য়ুরোপীয় শিল্পসমালোচকদিগের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার সাধনাক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কৃত কার্য্যের গুরুত্ব বিচার করিয়া আমরা সে জন্য দুঃখ করি না। তাঁহার উড়িষ্যা ও বুদ্ধগয়া সম্বন্ধীয় বিরাট গ্রন্থদ্বয় সমগ্র সভ্য সমাজে ভারতীয় শিল্পের গৌরবের পরিচয় দিয়াছে। এই স্থলে আর একজন ভারতবাসীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার

* The Calcutta University Magazine, 1894

† Hindu Architecture

আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে দেয় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বালোচনার গুরু শ্রমই প্রিন্সেপ ও কীটো উভয়ের অকালমৃত্যুর কারণ। পূর্ণবাবুর গুরু শ্রমের কথা তাঁহার কোন্ স্বদেশীয় ভক্ত কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে? ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি'। * তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং বহুদিনপূর্ব্বে প্রকাশিত।

এরূপ অবস্থায় এ দেশে প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মতের বহুল প্রচলন বিস্ময়ের বিষয় নহে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল পণ্ডিত প্রাচীর দীনতা ও হীনতা সম্বন্ধে পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার সহজে পরিহার করিতে পারেন না। সত্য বটে আজকাল কোন কোন প্রতীচ্য লেখক এমন কথাও বলিয়াছেন যে,—প্রাচীন ভাষার মধ্যে সম্পদে সংস্কৃতের তুলনা নাই। একান্ত আধুনিক ব্যতীত সকল বিষয়েরই সংস্কৃত পুস্তক দেখা যায়। সংস্কৃত পুস্তকের প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। দুঃখের বিষয়, এই বিপুল সাহিত্য হইতে প্রাচীন আর্য্যজাতির সামাজিক অবস্থানির্ণয়ের যথাসম্ভব চেষ্টা হয় নাই। আজকাল জার্ম্মাণীতে ও হাঙ্গেরীতে সংস্কৃতের যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে—আর কোথাও সেরূপ হইতেছে না। বুদাপেস্তের পুস্তকাগারে সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু কোথাও এই সাহিত্যের সদ্ব্যবহার হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতা অল্পদিনের নহে। অসভ্য জাতিকে সভ্যসমাজে প্রচলিত শিল্পচর্চ্চানিরত করা বহুকালসাপেক্ষ। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সমাজে সময় সময় অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। ভারতে যে পরিমাণ উপাদান সহজপ্রাপ্য তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ উপাদান হইতে মিশরের, গ্রীসের ও রোমের ইতিহাস পুনর্গঠিত হইয়াছে। যে হেটিট জাতির অস্তিত্ব অল্পদিনপূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল—সেই হেটিট জাতির ইতিহাসেরও উদ্ধার হইয়াছে। আজকাল পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশ্বাস হেটিট, ক্যালডীয় ও মৈশরী সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে উৎপন্ন। এক্ষণে প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারীদিগকে ভারতে সন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মিশরে ও মেশোপোটেমিয়ায় আর নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা অল্প। ভারতে নূতন আবিষ্কারের যথেষ্ট সুবিধা আছে। সভ্যতার জন্মভূমি ক্রমেই পূর্ব্বমুখে স্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এ অবস্থায় প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের ভারতে অনুসন্ধানকার্য্য আরব্ধ না করাই

* শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত।

বিস্ময়ের বিষয়। প্রতীচ্য লেখকদিগের রচনায় এইরূপ উদার উক্তিও বিরল।

বরং যেসকল য়ুরোপীয় ভারতীয় শিল্পের—ভারতীয় পুরাবস্তুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় শিল্পকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বা পরপ্রভাবপুষ্ট প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন ভারতীয় পুরাবস্তুর সংরক্ষণে অমনোযোগের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতে বিরত হয়েন নাই এবং ভারতীয় পুরাবস্তুর সংরক্ষণের নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই যে, আসিরিয়ার বা মিশরের—এমন কি প্রাচীন য়ুরোপের পুরাবস্তুর তুলনায় ভারতীয় পুরাবস্তু - গৃহাদি—আধুনিক। ভারতে বর্ত্তমান ভাস্করকার্য্যকমনীয় গৃহের মধ্যে সাঁচির স্তূপই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। স্তূপ কিছু অধিক দিনের হইলেও হইতে পারে; কিন্তু বৃতি খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নাই। আসিরিয়ার ও নাইনিভের প্রাসাদপুঞ্জ ও মিশরের পিরামিড প্রভৃতি তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। * তবে এই মত প্রকাশকালে লর্ড কার্জ্জন তাঁহার স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করেন নাই; পরন্তু বলিয়াছেন,—তাঁহার এই মত অভ্রান্ত নাও হইতে পারে। লর্ড কার্জ্জন বিশেষজ্ঞ নহেন। তাঁহার পক্ষে ভ্রান্তি বিস্ময়কর নহে। জার্ম্মাণ লেখক মুলার তাঁহার প্রাচীন শিল্পসম্বন্ধীয় পুস্তকে ভারতীয় শিল্পের বিবরণের জন্য তিন পৃষ্ঠা স্থানও দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান ভারতবাসীরা সাহিত্যচর্চ্চায়—ধর্ম্মালোচনায়, কবিতারচনায়—বিশেষ পারদর্শী হইলেও মৌলিক শিল্পচেষ্টায় পারদর্শী ছিল না। তাহাদিগের শিল্প যে বিদেশীয় (গ্রীক বা যবন) আদর্শে গঠিত এই সংস্কার পরিহার করা সহজ নহে। আবার ভারতবাসীরা এই বিদেশীয় আদর্শও সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। † ভারতীয় স্থাপত্যের সমালোচক ও ইতিহাসলেখক ফার্গুসনও ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ফরাসী পণ্ডিত ব্যাবিলন প্রাচ্য শিল্পাদর্শে ভারতীয় শিল্পের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। ‡ তিনি বলিয়াছেন, গ্রীসের ও রোমের প্রভাবের পূর্ব্বে যে সকল প্রাচ্য সভ্যতা জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল

* Ancient Indian Buildings
† Muller's 'Ancient Art'
‡ Babelon's 'Manual of Oriental Antiquities'

সে সকলে অনুসন্ধান করিলে শিল্পাদর্শের দুইটি প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। একের উৎপত্তি মিশরে—অপরের উৎপত্তি আসিরিয়ায়। সময় সময় এই দুই প্রবাহ এক অপরের অব্যবহিত পার্শ্বে সমান্তর রেখায় প্রবাহিত হইত উভয়ে শিল্পসাম্রাজ্য অধিকার করিত; সময় সময় দুই স্রোত বিপরীত মুখে বহিয়া যাইত; আবার সময় সময় উভয়ে মিশ্রিত হইয়া—উভয়ের মৌলিক গুণরাশির সমন্বয়ে নূতন শিল্পের সংগঠন করিত। এইরূপ অবস্থাভেদে যদি কোন কোন দেশে এমন শিল্পের উদ্ভব হইয়া থাকে—যাহা মৈশরীয়ও নহে—আসিরিয়ও নহে তবে সে সকল শিল্পের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের উপাদানবিভাগ করিলে দেখা যায়—মৈশরীয় ও আসিরিয় উপাদান ব্যতীত সে সকলে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রকৃতপক্ষে পারস্য, হেটিট, ইহুদী, ফোনিসিয়া বা কার্থেজ—কাহারও মৌলিক শিল্প নাই—সবই মিশরের ও আসিরিয়ার শিল্পের সংমিশ্রণোৎপন্ন।

একান্ত বিস্ময়ের বিষয় যে ভারতীয় শিল্পাদর্শ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অর্দ্ধাংশে অনুসৃত, লেখক তাহার উল্লেখও করেন নাই। চীনের বৌদ্ধ শিল্প যে ভারতীয় তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান। * জাপানের শিল্পে ও সভ্যতায় ভারতীয় প্রভাব সর্ব্বত্র সপ্রকাশ। জাপানের সবই ভারত হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে জাপানে আসিয়াছিল—আর বৌদ্ধ ধর্ম্মই জাপানে সভ্যতার প্রবর্ত্তক। এই সভ্যতা চীন হইতে জাপানে গিয়াছিল সত্য, কিন্তু চীনের সভ্যতা তখন ভারতীয় ভাবে ওতপ্রোত। জাপানী প্রথাদির মূলে ভারতীয় ভাব ও ভারতীয় আদর্শ বিদ্যমান। জাপানে বৃদ্ধ হইলে নরনারী যে সন্তানদিগকে সংসারভার দিয়া অবসর গ্রহণ করে সে বাণপ্রস্থের অনুকরণ। জাপানী ধর্ম্মেও ভারতীয় ধর্ম্মের বহু প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাপানী ভাষায় ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য হইতে অন্নাহার পর্য্যন্ত জাপানের সবই ভারত হইতে গৃহীত। ভারতীয় প্রভাব ভারত হইতে চীনে—চীন হইতে কোরিয়ায়—কোরিয়া হইতে জাপানে গিয়াছিল। †

যে শিল্পের প্রভাব এমন প্রবল সে শিল্পকে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা না করা যে কিরূপ অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? বাস্তবিক এই শিল্প বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, এবং এই শিল্পের নিদর্শন

* Anderson's 'Catalogue of Japanese and Chinese Paintings'

† Chamberlain's 'Things Japanese.'

হইতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। এই শিল্প-নিদর্শনেই ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের উপাদান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কেন নাই—তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে বিজ্ঞবর ওল্‌ডেনবার্গ হইতে তরুণ লেখক ব্রাডলী বার্ট পর্য্যন্ত অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। ওল্‌ডেনবার্গ বলেন, ভারতে ধর্ম্মানুষ্ঠানবৃত্তি ঐতিহাসিকবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল ছিল;—বাস্তবিক ভারতবাসীরা ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। * বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—"ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড় প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দেবতানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব' অশুভের নাম 'দুর্দ্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা, বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মানুষ হয়, দেবতার আংশিক অবতার, নয়, দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি * * * এইজন্য গর্ব্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এইজন্য আমাদের ইতিহাস নাই।" †

বাস্তবিক সকল প্রাচীন জাতিরই পুরাতন ইতিহাস না থাকিবার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। দেশের রাজনীতিক অবস্থা সে সকলের মধ্যে প্রধান। তখন দিগ্বিজয়, উপনিবেশ-সংস্থাপন, বাণিজ্য এ সবই ছিল, কিন্তু দেশে

* Buddha

† বিবিধ প্রবন্ধ।

রাষ্ট্রীয় একতা ছিল না। দেশ বহু খণ্ডরাজ্যে শতধা বিভক্ত ছিল। সমগ্র দেশের একখানি ইতিহাস রচনা যেমন অসম্ভব ছিল—সেরূপ ইতিহাস রচনার কল্পনাও তেমনই লোকের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

তখন "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বম্" বলিলে স্বরাজ্যে আধিপত্য ও নিকট-বর্ত্তী খণ্ডরাজ্যসমূহের "উৎখাতপ্রতিরোপিত" রাজ্যেশ্বরদিগের নামমাত্র অধীনতাস্বীকার বুঝাইত। তখন দেশ দুর্গম অরণ্যাবৃত—দুস্তর জলপ্রবাহ-বিচ্ছিন্ন। কাযেই বিস্তৃত রাজ্যে শাসনশৃঙ্খলাসংস্থাপন একরূপ অসম্ভব ছিল। দেশের এই দুর্গমতানিবন্ধন আপদও যথেষ্ট ছিল। দিলীপের বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন,—

"যস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং
নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপথে গতানাম্।
বাতোঽপি নাস্রংশয়দংশুকানি
কোলম্বয়েদাহরণায় হস্তম্॥"
বিহারস্থানের পথে বারাঙ্গাগণ,
রাজ্যে তাঁ'র, মদাবেশে করিলে শয়ন,
না সরা'ত ভয়ে বায়ু অঙ্গের বসন।
কা'র সাধ্য কিছু তা'র করিবে হরণ?

ইহাই পূর্ব্বকালের সুশাসিত রাজ্যের আদর্শ। এই কবিকৃত অতিরঞ্জনের ফেনপুঞ্জতলে যদি সত্যের শীর্ণধারা প্রবাহিত থাকে, তথাপি এই সুশাসন রাজধানী হইতে বহু দূরপর্য্যন্ত প্রসারিত হইত কি না সন্দেহ। আমরা খণ্ড-রাজ্যের ও আপদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি "দিগ্বিজয় যাত্রার" বাহুল্যেই তাহা প্রমাণিত হইবে। নূতন রাজাকে "দিগ্বিজয়" করিয়া সামন্ত নৃপতি-গণের মনে ভয়সঞ্চার করাইয়া স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইত। রঘুর রাজ্যাভিষেকের পরই—

"সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥"
শরৎ সরিৎকূলে করি' সুপ্রতর,
কর্দ্দম বিশুষ্ক করি' রাজপথ' প'রে,
না হইতে উত্তেজিত রঘুর অন্তর
করি'দিল উত্তেজিত যুদ্ধযাত্রাতরে।

এরূপ অবস্থায় দেশের বিস্তৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। যদি খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে কতকগুলির ইতিহাস লিখিত থাকিত—তাহাতেও

ভারতীয় সভ্যতার ও সমাজের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইত কি না সন্দেহ। কারণ পূর্ব্বে নৃপতির পরিবর্ত্তন ও যুদ্ধের কথাই ইতিহাসের উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইত। ভলটেয়ার প্রথম বুঝাইয়া দেন—এই প্রচলিত মত একান্ত ভ্রান্ত। জনসাধারণের কথাই ইতিহাসের উপকরণ।

কাযেই প্রাচীন ভারতের কোন কোন অংশের লিখিত ইতিহাসের ভগ্নাংশ নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কারণ নাই। সে ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। কোন প্রাচীন জাতিই আপনাদিগের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই। অথচ ভারতে সহজপ্রাপ্য উপাদান অপেক্ষা বহু পরিমাণে বিরল উপাদান হইতে গ্রীসের, রোমের, মিসরের ও হেটিটদিগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ভারতে উপাদানের অভাব নাই বরং প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়। যে জাতি অল্পকালস্থায়ী বল্কলে বা কাগজে আপনাদিগের ইতিহাসের উপাদান রক্ষা না করিয়া কালজয়ী শিলাবক্ষে সেই উপাদান রাখিয়া যায়, ঐতিহাসিক হিসাবে সেই জাতির উত্তরপুরুষগণ অধিক ভাগ্যবান। এইজন্য আমরা বলিতে পারি, আমরা পরম ভাগ্যবান। প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক কীর্ত্তির অভাব নাই। সেই সকল কীর্ত্তিতে ভারতীয় সভ্যতার—সমাজের বিবর্ত্তন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেই সকল হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার—প্রাচীন সমাজের ইতিহাস গঠিত করিতে হইবে। ইতিহাসে সময়ের পরিমাণ বৎসরে নহে যুগে—আদর্শের পরিবর্ত্তনে। এ অবস্থায় তারিখের জন্য ব্যস্ত হইবার কোনই কারণ নাই।

কোন সভ্যতাই পবনহিল্লোলের মত চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয় না। তাহা স্থাপত্যে—ভাস্কর্য্যে—চিত্রে—নিত্যব্যবহার্য্য তৈজসপত্রেও সেই সময়ের শিল্পাদর্শের চিহ্ন রাখিয়া যায়। ভারতে সেরূপ চিহ্নের অভাব নাই, বিশেষ ভারতবর্ষ তাহার রক্ষণশীলতার বর্ম্মতলে পুরাতন সভ্যতারই সংরক্ষণে সচেষ্ট ও বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পের—বিশেষ স্থাপত্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

এই সকল কারণে ভারতীয় শিল্প বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। এই শিল্পের আলোচনা হইতে লব্ধ উপাদানের বলে—বিশ্লেষণ ও সংযোজনের ফলে আমরা ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব—ভারতীয় সমাজের ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিব।

Positivism বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ।

(৩)

ধর্ম্মের নামে এইরূপ অত্যাচারের কারণ আছে। কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে, স্বার্থপর বৃত্তিগুলি এত প্রবল যে, উহাদিগকে সংযত রাখিবার চেষ্টা যতই কর না কেন, সময়ে সময়ে উহারা নিজের বলবত্তর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে কথনই ছাড়িবে না। সেন্ট পল বলিয়া গিয়াছেন,—পরস্পরকে স্নেহ কর (Love ye one another) যিশুখৃষ্টও বলিয়া গিয়াছেন, অন্যের যে প্রকার আচরণ তোমার প্রতি তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতি তোমার সেইরূপ আচরণ করা উচিৎ (Do unto others as you would they should do unto you)। ইহাকেই বলে ধর্ম্মনীতির চরম সূত্র, (Golden rule of conduct) কিন্তু Inquisitor যথন বিধর্ম্মীকে দাহ করিতে বসেন, তথন তিনি এসকল কথা ভুলিয়া যায়েন। অভিমান নামে তাঁহার যে একটি স্বার্থপর বৃত্তি আছে, সেইটিই তথন প্রবল। তিনি ভাবেন, ধর্ম্মের বিষয় আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক, তাহার বিপরীত আর সকল মতই ভুল ; ঐ সকল মতের অনুবর্ত্তীদিগকে ধরিয়া পোড়াইবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা ভগবানই আমাকে দিয়াছেন, অতএব ইহা ভগবানেরও অভিপ্রেত বোধ হইতেছে যে, আমি বিধর্ম্মীকে ধরিয়া দাহ করি। যথন যথন লোক ধর্ম্মের নামে অন্যের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তথন তথনই বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত প্রকার একটি যুক্তিবিন্যাস অত্যাচারীর মনে অপ্রকাশভাবে উদিত হয়,—সে অম্লানবদনে ঘোরতর পাষণ্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে বুদ্ধির দোষও আছে, স্বভাবের দোষও আছে। সকল স্বভাবের লোক Inquisitor হইতে পারে না। যাহারা উগ্রপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর ও নৃশংস, তাহারাই ধর্ম্মের নামে অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়।

কোম্‌তের প্রবর্ত্তিত ধ্রুবধর্ম্মে এই একটি বৈশিষ্ট লক্ষিত হয় যে, তিনি দেবদেবীবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার অলৌকিক বিশ্বাস একেবারে পরিহার করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বতন প্রাচীন কোনও ধর্ম্মেই অলৌকিক বিশ্বাস (supernatural belief) একেবারে পরিত্যক্ত দৃষ্ট হয় না। এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম্ম যদিও নাস্তিকের ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত—যদিও বৌদ্ধরা একজন পরমেশ্বর স্বীকার

করেন না, তথাপি ছোট খাট অনেকপ্রকার অলৌকিক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। তাঁহারা জন্মান্তর মানেন; ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর ইত্যাদি দেবযোনির সত্তাও স্বীকার করেন। কোম্‌ৎ সে সকলই এক কালে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ধ্রুব ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তর (Catechism of Positivism) নামক যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার প্রথমেই এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনাও আছে। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আপনি যখন অলৌকিক বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আপনার প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম (Religion) বলেন কেন? কারণ, সকল ধর্ম্মেই কিছু না কিছু অলৌকিক বিশ্বাস বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।" গুরু উত্তর করিলেন,—"যদি Religion শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য (connotation) কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বাস-বিশেষের সহিত সেই তাৎপর্য্যের কোনও সম্পর্ক নাই। Religion শব্দের ব্যুৎপত্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, সেই তাৎপর্য্য একতাপাদন ligo to bind।" এই প্রকার কহিয়া গুরু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের 'একতাপাদন' এই অর্থে religion শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন। গুরু আরও কহিলেন,—"ভাবিয়া দেখ, প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বিরোধী লোকদিগের সংখ্যাই অধিক, অর্থাৎ খৃষ্টান অপেক্ষা বেখৃষ্টানের সংখ্যা অধিক; হিন্দু অপেক্ষা হিন্দুত্ববিরোধীর সংখ্যা অধিক, মুসলমানের চেয়ে ইসলামদ্বেষীর সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সমস্ত নর-জাতির সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ কথা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন হয়।" অতএব কোনও একটি ধর্ম্মের সত্যাসত্য ভোটের সংখ্যা ধরিয়া নির্ণীত হইবার নহে। কেবল যুক্তির দ্বারাই ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু অলৌকিক বিশ্বাস লইয়া যুক্তি প্রয়োগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। অলৌকিক বিশ্বাসের বনিয়াদ কল্পনা। কল্পনা এমন বস্তু নহে যে, যুক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। এই নিমিত্তই প্রাচীন সকল ধর্ম্মেরই নানা সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা আবার পরস্পর এত বিরোধী যে, ক্রুশের যুদ্ধে খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের যেরূপ রক্তারক্তি হইয়াছিল, ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যেও সেইরূপ রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে এরূপ বিরাট-হত্যা (massacre) সংঘটিত হইয়াছে,—যথা Massacre of St. Bartholomew যে, ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এবং মনে এ প্রকার সন্দেহ হয়

যে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপকগণ (Founders of religion) ভূলোকের ইষ্ট কি অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা ভার।

ধ্রুবধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিপ্রায় এই যে, কেবল যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া সমস্ত নরজাতিকে কালসহকারে একধর্ম্মান্বিত করিয়া তুলিবে। কোম্‌ৎ বলিয়াছেন, কোনও প্রাচীন ধর্ম্মই অশ্রদ্ধেয় বা দ্বেষ করিবার বিষয় নহে; সকলেরই এক একটা উপযোগিতা ছিল এবং অদ্যাপি আছে। তিনি কোনও প্রাচীন ধর্ম্মকেই নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি বলিতে প্রস্তুত নহেন এবং জবরদস্তি দ্বারা কোনও ধর্ম্মই উঠাইয়া দিতে চাহেন না। যেমন ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তিনটি কোণ মিলিয়া দুইটি সমকোণের তুল্য এ কথার প্রতিবাদ চলে না, যেমন পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ, জলের উপাদান, মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা, পাকস্থলির কার্য্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আর মতভেদ চলিতে পারে না, তেমনই উপচিকীর্ষাই ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ, এ সম্বন্ধেও মতভেদ উঠিয়া যাইবে।

মিলও এ কথার অনুমোদন করেন বলিয়া বোধ হয়। 'কোমৎ ও ধ্রুবদর্শন' সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, কোম্‌ৎ ধ্রুবধর্ম্মের যে নক্সা গঠন করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকরা তাহা হইতে বিস্তর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। সম্প্রতি মিলের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব চিঠিপত্রের যে দুই খণ্ড বহি বাহির হইয়াছে, তাহারও এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরোপকারব্রত (Universal love) মনুষ্য-হৃদয়ের যে বৃত্তি তাহা লইয়া এমন একটি ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে যে, তাহা অবলম্বন করিয়া মনুষ্য-সমাজ অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। সেই ধর্ম্মপ্রণালীর গঠন করাই কোম্‌তের উদ্দেশ্য। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য প্রধান প্রধান চিন্তয়িতারা (Thinkers) এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কত দুর একমত হইবেন এখনও তাহার নির্ণয় করা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার গঠিত ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে কতকগুলি রচনা এমন পরম সুন্দর ও সুমধুর বলিয়া আমার বোধ হয় যে, সেগুলির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইয়া যাই ও তৃপ্তিলাভ করি। তন্মধ্যে একটি Positivist Calendar। এক্ষণে খৃষ্টানরা অনেকগুলি মাসের নাম গ্রীক ও রোমকদিগের দেবদেবীর নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; যথা—January—Janus ; March—Mars ; June—Juno ; ইত্যাদি।

কোম্‌ৎ যে পঞ্জিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে বৎসরকে তের মাসে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রত্যেক মাসের দিনসংখ্যা ২৮। ইহাতে বৎসরের দিনসংখ্যা ৩৬৪ হয়। অবশিষ্ট এক দিনকে তিনি সমস্ত মৃত ব্যক্তির পর্ব্বাহ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। চারি বৎসর অন্তর যে এক অতিরিক্ত দিন হয়, তাহাকে তিনি সাধ্বী নারীদিগের স্মরণার্থ পর্ব্বাহ ধার্য্য করিয়াছেন। আর প্রত্যেক মাসের নাম এক একজন অতি প্রধান নরজাতির মহোপকারসাধনকর্ত্তার নামে দিয়াছেন। যথা, প্রথম মাসের নাম মোসেস। ইনি য়িহুদি জাতির জাতীয়তার মূলীভূত যাবতীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা: খৃষ্টানরা য়িহুদি জাতির শিষ্য; খৃষ্টানদিগের দ্বারাই এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা বিস্তারিত হইতেছে; অতএব এ বিষয়ে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বেখৃষ্টানদিগেরও অভিমান করিবার কোনও কারণ দেখি না। এক্ষণকার বিজ্ঞান য়ুরোপের নিকট হইতেই সকলকে লইতে হইতেছে। য়ুরোপের সভ্যতার উন্নতি খৃষ্টান ধর্ম্মের নিকট যে কতদূর ঋণী হইয়া আছে তাহা বর্ণনাতীত। খৃষ্টান ধর্ম্ম আবার য়িহুদি জাতি ব্যতীত উৎপন্ন হইত না। সেই য়িহুদি জাতির জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা যদি মোসেস হয়েন তবে তিনি সমস্ত পৃথিবীর কি মহোপকার পরম্পরা সম্বন্ধে করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে মাস বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকা উচিত নহে।

দ্বিতীয় মাসের অধিষ্ঠাতা হোমার। য়ুরোপে কবিতাসম্বন্ধে হোমরের সর্ব্বপ্রাধান্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দুরা এ বিষয়ে অভিমান করিবেন; বলিবেন, আমরা বাল্মীকিকে ছাড়িব কেন? সে সম্বন্ধে উপস্থিত অবসরে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; বলিতে গেলে হয় ত গোঁড়া Positivist বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। এই নিমিত্ত কোম্‌ৎ যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই এ স্থলে বলিয়া যাই।

তৃতীয় মাসের অধিষ্ঠাতা আরিষ্টটল। স্থলবিশেষে কোম্‌ৎ বলিয়াছেন যে, আরিষ্টটল যাবতীয় প্রকৃত চিন্তয়িতাদিগের চিরস্থায়ী সম্রাট (The eternal prince of all true thinkers)। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোম্‌ৎ যে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয়দিগের উপযোগী; এবং আরিষ্টটল য়ুরোপের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের মূর্ত্তিমান আবির্ভাব (Representation) বলিলে বলা যায়। সুতরাং মাসের অধিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম

অবশ্যই স্থানলাভ করিবে। তবে মিল আরিষ্টটলকে তত উন্নত পদ প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। 'কোম্‌ৎ ও ধ্রুবদর্শন' নামক গ্রন্থে মিল বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছেন যে, আরিষ্টটল, ডেকার্ট, এবং কোম্‌ৎ এই তিন ব্যক্তিকে কোম্‌ৎ নিজে যত বড় লোক মনে করেন আমরা (অর্থাৎ মিল প্রভৃতি) তত বড় লোক মনে করিতে রাজি নহি (We have not that degree of admiration for the trio) ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইল যে, কোম্‌ৎ আপনাকেও একজন বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অনেক স্থলে যেন তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে, কোম্‌তের আত্ম-গরিমা অতিমানুষ (His self-confidence was gigantic)

চতুর্থ মাসের নাম আর্কিমিডিস। ইনি প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতিনিধি স্বরূপ। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে আর্কিমিডিস যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই সম্যক অবগত আছেন। আমরা তাহা উত্তমরূপ অনুধাবন করিতে পারি কি না সন্দেহ।

পঞ্চম মাস—সিজার। ইনি সভ্যতাসমুচিত যুদ্ধ বিদ্যার (Military civitisation) আদর্শ স্বরূপ। সিজারকেও মিল তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি বলেন যে, আপনার জন্মভূমির স্বাধীনতা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা ব্যতীত সিজারের আর কি গুণ ছিল? কিন্তু আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে সালা, মারিয়াস, পম্পে প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিদ্বেষে ও দলাদলিতে রোম এবং সেই সঙ্গে তৎকালের প্রায় সমস্ত সভ্য জগৎ উচ্ছন্ন যাইতেছিল, এবং শান্তি পৃথিবী হইতে প্রায় লোপ পাইতেছিল। সেই অবস্থাটি সিজার স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পর হইতে সাম্রাজ্যব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়াতে লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ফলতঃ সিজারের সময়ে রোমকরা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপযোগী সমস্ত গুণগ্রাম হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

ষষ্ঠ মাস—সেণ্ট পল্। কোম্‌তের মতে সেণ্ট্ পলই খৃষ্টান ধর্ম্মকে বিধিবদ্ধ ও ব্যবস্থাযুক্ত করিয়া দিয়া যায়েন।

সপ্তম মাস—শার্লমান্। ফিউড্যাল ব্যবস্থা নামক য়ুরোপে যে ব্যবস্থা এক সময়ে সার্ব্বত্রিক হইয়াছিল, ইনি তাহার আদর্শ স্বরূপ। ঐ Feudal ব্যবস্থার দ্বারা য়ুরোপের সভ্যতা বিশিষ্টরূপে অগ্রসর হইয়াছিল।

অষ্টম মাস—দাঁতে (Dante)। বলা বাহুল্য ইনি ইদানীন্তন কালের কাব্য শাস্ত্রের আদর্শ স্বরূপ।

নবম মাস—গটেনবার্গ। ইনি মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সভ্যতার উন্নতিকল্পে মুদ্রাযন্ত্রের মহোপকারিতা বোধ হয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই কারণেই কোম্‌ৎ তাঁহাকে ইদানীন্তন কালের শিল্পচর্চ্চার (Modern indnstry) আদর্শ বলিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

দশম মাস—সেক্সপীয়র। ইনি বর্ত্তমান কালের নাটকাকারদিগের আদর্শ।

একাদশ মাস—ডেকার্ট (Descartes)। ইনি বর্ত্তমান কালের দর্শন শাস্ত্রের আদর্শ। ডেকার্টকে এত উচ্চপদ প্রদান করাতে ইংরাজ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতিরা বোধ হয় কোম্‌ৎকে স্বজাতিপক্ষপাতিত্বদোষে অভিযুক্ত করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে য়ুরোপে এখন যাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে, তাহার অনেকগুলি মৌলিক কথা ডেকার্টের দোহাই দিয়াই চলিতেছে। এবং যদিও তাঁহার Theory of vortices স্থানচ্যুত হইয়া নিউটনের Universal gravitation সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, তথাপি ডেকার্ট Analytical Geometryর সৃষ্টিকর্ত্তা। আমার সামান্য বুদ্ধিতে ত বোধ হয় যে, যিনি Analytical Geometry সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্ররাজ্যের মধ্যে এমন কোন উচ্চস্থান নাই যাহা তাঁহাকে দেওয়া না যায়। শিল্পচর্চ্চাতে বাষ্পযন্ত্র যে প্রকার, গণিতমূলক বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার চর্চ্চাতে Analytical Geometry সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রস্বরূপ।

দ্বাদশ মাস—ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেট্‌। আধুনিক রাজ্যশাসনের (Modern polity) আদর্শ।

ত্রয়োদশ মাস—বিশা (Bichat)। ইনি একজন শারীরবিধানবেত্তা। ঐ শাস্ত্রে tissue এই নামক যে নূতন একটি idea উদ্ভাবিত হইয়াছে, বিশা তাহারই উদ্ভাবক। এই উদ্ভাবনার দ্বারা উক্ত শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আধুনিক বিজ্ঞানে বিশার পদ এত উচ্চ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(১)

এক অতি অন্ধকারময়ী শ্রাবণ রজনীতে উত্তর-বঙ্গ রেলপথের হিলি ষ্টেশনের অনতিদূরে সহসা ভীষণশ্রবণ—ভৈরব শব্দ শ্রুত হইল। সেই আকস্মিক শ্রবণবিদারী শব্দে নিকটস্থ বাজারের অধিবাসীরা মূক ও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল; কুলায়ে বিহঙ্গকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সুপ্ত শিশু মাতৃক্রোড়ে চমকিয়া লুকাইল।

একখানি যাত্রীপরিপূর্ণ গাড়ি ও একখানি মালগাড়ি পরস্পর বিভিন্নদিক হইতে দুই মহাকায় সরীসৃপের ন্যায় একই বর্ত্মে ছুটিয়া আসিতেছিল। নিশীথের অন্ধকারে তাহাদের ত্রিনেত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মালগাড়ি হিলি ষ্টেশন ছাড়িয়া পূর্ণ বেগ লাভ করিয়াছে মাত্র, যাত্রীগাড়ির বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে উভয় গাড়ি হইতে শ্রবণপটহবিদারক শৃঙ্গধ্বনি উত্থিত হইল এবং একত্র শতকামাননিনাদের ন্যায় ভয়াবহ শব্দ বিশ্রুত হইল। পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বের অতিমাত্র ব্যস্ততা শান্ত হইয়া গেল, আর মধ্যে মধ্যে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মানবকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ সেই শ্মশানভূমির বিভীষিকা দ্বিগুণিত করিতে লাগিল।

নিকটস্থ অধিবাসীরা যখন প্রকৃতিস্থ হইল তখন তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাহসী কতকগুলি যুবক লণ্ঠন ও লাঠি হাতে লইয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে ছুটিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশন-মাষ্টার সদলে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশও আনিয়াছিলেন। তাহারা ঘটনাস্থল বেষ্টিত করিয়া একটি ব্যূহ রচনা করিল, যাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে অথবা বাহির হইতে না পারে। বাজারের অধিবাসীরা হতাশ হইয়া ফিরিল; তাহারা শুনিল কেবল মুমূর্ষুর করুণ কণ্ঠস্বর, আর দেখিল দুইখানি ট্রেণের বিক্ষিপ্ত—বিপর্য্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন ধ্বংশাবশেষ। পুলিশ প্রহরীর রুলের সহিত আপনাদের জীর্ণ পঞ্জরের সম্বন্ধস্থাপন করা অপেক্ষা তাহারা সারমেয়ের ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তন সার নীতি বলিয়া মানিল।

(২)

রেলপথের কিয়দ্দূরে প্রান্তর-পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; তাহার দুই ধারে ঝোপ ও মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। সেই প্রান্তর-পথ বাহিয়া একখানি গরুর গাড়ি দুলিয়া দুলিয়া রাত্রিশেষে গন্তব্য স্থানে চলিয়াছিল। গাড়োয়ান নিদ্রার প্রভাবে এ দিকে ও দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে গরু দুইটার প্রতি যষ্টির সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছিল। হঠাৎ গরু দুইটা থমকিয়া দাঁড়াইল; গাড়োয়ানও উৎকর্ণ হইল। পথিপার্শ্বে আর্ত্তের কাতরোক্তি শুনা গিয়াছিল। হিন্দু গাড়োয়ান মনে মনে একবার রামনাম উচ্চারণ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ভয় বিস্ময়ে পরিণত হইল। সে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, রাস্তার ধারে, গাড়ির অতি নিকটে শুভ্র বসনাবৃত এক ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে।

সে ব্যক্তি ক্ষীণকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, "বাপু গাড়োয়ান, আমি বড় বিপন্ন। আমাকে যদি একটা আশ্রয়ে পৌঁছিয়া দিতে পার, তবে দুই হাত তুলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

গাড়োয়ান বলিল, "আমার গরু সমস্ত দিন না খাইয়া পথ চলিয়াছে। আমি হিলিতে সোয়ারি নামাইয়া দিয়া ঘোড়াঘাট যাইতেছি, আমি এখন ভাড়া বহিতে পারিব না।"

আগন্তুক ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমিও ঘোড়াঘাটে যাইব। বড় কষ্ট পাইতেছি, বাবা! তোমাকে বিশেষ খুসী করিয়া দিব। আমায় লইয়া চল, বাবা।"

গাড়োয়ান কাকুতি মিনতিতে ভুলিল না; বলিল, "আমার গরু দুইটাকে ত আর মারিয়া ফেলিতে পারি না, মহাশয়!" এই বলিয়া গাড়োয়ান গরুর পৃষ্ঠে হাত দিল। "টির-র-র।"

আগন্তুক বুঝিতে পারিলেন, হঠাৎ এরূপ সময় এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া গাড়োয়ানের মনে স্বভাবতঃই ভয় হইয়াছে এবং সেই জন্যই সে ইতস্ততঃ করিতেছে। তিনি বলিলেন, "বাপু, তুমি ভয় পাইতেছ? আমি ডাকাইত নহি, খুনীও নহি। যে গতিকে আমি এ স্থানে এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি, সব তোমাকে বলিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে। তোমার কোনও ভয় নাই। বাপধন আমার, আমি নিতান্ত বিপন্ন ব্রাহ্মণ!"

"ব্রাহ্মণ" এই কথা শুনিয়া হিন্দু গাড়োয়ান বড় গোলোযোগে পড়িল।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে বলিল, "আমরা, মহাশয়, গরীব লোক, এক করিতে আর করিয়া ফেলি। শেষে 'ছাঁ-বাচ্ছার' অন্ন পর্য্যন্ত মারা যাইবে ?"

আগন্তুক তাহাকে আশ্বাস দিলেন এবং প্রচুর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সম্মত করাইলেন। তখন সে নামিয়া তাঁহাকে ধরিয়া গাড়িতে তুলিল এবং তামাক সাজিয়া বলিল, "ছাব্‌তা, তামাক ইচ্ছে হোক।"

ধূমপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া ভদ্রলোক সংক্ষেপে তাঁহার বৃত্তান্ত গাড়য়ানকে বলিলেন। আজ তিনি দিনাজপুর হইতে যে গাড়িতে ফিরিতে-ছিলেন সেই যাত্রীপরিপূর্ণ গাড়ি মারা পড়িয়াছে। রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা এখনই মৃত ও আহত লোক সব গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া পদ্মায় ফেলিয়া দিবে। তিনি গড়াইতে গড়াইতে ঝোপের ভিতর দিয়া ভিতর দিয়া এতদূর আসিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার দুইখানি পদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাথায়ও চোট লাগিয়াছে। এই বলিয়া তিনি গাড়য়ানের হাতে দশটি টাকা দিলেন; বলিলেন, "বাবা, এখন তোমার হাতে আমার প্রাণ, যদি বাঁচি তোমায় আমি আরও খুসী করিয়া দিব।"

গাড়য়ান হাতে করিয়া টাকা কয়েকটি লইল, দুই একবার নাড়িল; তাহার পর ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তোমার টাকা রাখিয়া দাও, ঠাকুর মহা-শয়! আমি টাকা চাহি না। আমা হইতে যদি তোমার প্রাণটা বাঁচে তবে সেই আমার লাভ। আমার ছেলেটা পুলেটা আছে, তুমি তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলে আমার ভাল হইবে।"

ভদ্রলোকের নিবাস মেদিনীপুর জিলায়, নাম রামশরণ চক্রবর্ত্তী; বয়স ৩৫ বৎসর, গঠন বলিষ্ঠ। তাঁহার আকারপ্রকার দেখিলে সঙ্গতিহীন বলিয়া মনে হয় না। তিনি তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়াকে লইয়া দিনাজপুর হইতে আসিতেছিলেন। ট্রেণে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন তাঁহারা একত্র ছিলেন। তাহার পর কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার স্মৃতির বহির্ভূত। শীতল নৈশ বায়ু যখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিল, তখন শারীরিক যন্ত্রণা অল্পক্ষণেই তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত অবস্থা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যাহাদের ত্রুটীতে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটে, তাহাদের দায়িত্ব লঘু করিবার জন্য মৃত ও আহত লোক-গুলিকে কোনও রকমে সরাইয়া ফেলে। সুতরাং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাঁহাকে দুর্ব্বহ শারীরিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া পলায়নের সামর্থ্য আনিয়া দিল।

প্রাণের আশঙ্কা যে সাময়িক উত্তেজনা তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করিয়া শারীরিক যাতনাকে দূরে রাখিয়াছিল, গাড়িতে উঠিবার পর সে আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও তিরোহিত হইল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর অসাড় ও আহত পদদ্বয় অস্বাভাবিক ভারবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার জাগরণক্লিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। তিনি অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যকিরণে বনভূমি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। শিশিরকণবাহী সমীরণ পথিপার্শ্বস্থ শাল, শিশু ও দেবদারু প্রভৃতি বনস্পতিশ্রেণীকে স্নিগ্ধ ও আন্দোলিত করিতেছে। প্রশস্ত বনপথ সরলভাবে বহুদূর গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে গহন অরণ্য। দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণ সে অরণ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে লাজসম্ভ্রমানভিজ্ঞ সাঁওতাল রমণীগণের সুস্থ সবল আকৃতি ও হাস্য-চপল মুখ পথিকের মনে সে অরণ্যে লোকালয়ের সম্ভাবনার কথা আনিয়া দেয়।

সেই নির্জ্জন অরণ্যপথে ধীরমন্থর ভাবে গোশকটখানি চলিতেছিল। গাড়য়ান একবার ভাল করিয়া রামশরণকে দেখিয়া লইল। তাঁহার মুখে গত রজনীর স্মৃতি ও শরীরের যন্ত্রণা বিষাদের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। গাড়য়ান কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার করুণ দৃষ্টি স্পষ্টভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিল। অজ্ঞ নীচজাতীয় গাড়য়ান নিরাশ্রয় পথিককে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল।

রামশরণ জাগরিত হইবার পরই মস্তকে হাত দিলেন এবং দেখিলেন যে, আহত স্থানের কেশগুলি রক্তে জটাবদ্ধ হইয়া আছে। তিনি পদদ্বয়েও খুব বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি ক্ষীণস্বরে একবার "মা-গো" বলিয়া উঠিলেন।

গাড়য়ান জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার মা আছে?"

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "না, বাপু, মা নাই।"

গাড়য়ান আর কোনও কথা না কহিয়া গরু দুইটাকে নানা প্রকার ভাষায় ও ভর্ৎসনায় উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু গরু যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিল। সেই এক ঘেয়ে শব্দ যেমন হইতেছিল, তেমনই হইতে লাগিল। বনভাগ ছাড়িয়া পথ এখন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। দুই ধারে শস্যক্ষেত্রে সোণার ঢেউ খেলিতেছিল। কোথাও বর্ষার জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

তড়াগের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে বিচিত্র বর্ণের প্রস্ফুটিত কুমুদরাজি প্রভাত-সমীরণে আন্দোলিত হইতেছিল। মাঠের শস্যহীন প্রদেশে গো-মহিষের পাল চরিতেছিল এবং মাঝে মাঝে কৃষকগণ শস্যলোলুপ পশুদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চীৎকার করিতেছিল।

রামশরণ ভাবিতেছিলেন, একখানি সুকুমার মুখের কথা। তাঁহার বড় আদরের কন্যা মতিয়া তাঁহার সমস্ত মানসরাজ্যকে অধিকার করিয়া ছিল। যাহাকে সংসারে কেহ ভালবাসে অথবা যে কাহাকেও মনপ্রাণ দিয়া ভাল-বাসিয়াছে, তাহার পক্ষে মৃত্যু বড়ই ক্লেশকর। মরণের ছায়া যতই নিবিড় হইয়া আসিতেছিল, ততই যেন সেই ক্ষুদ্র কুসুমপেলব মুখখানি মধুর হইতে মধুরতর রূপে তাঁহার স্মৃতিপটে ভাসিতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল—তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী স্ত্রীকে। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহ ছিল না।

গাড়য়ান জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আপনি এখন কোথায় যাইবেন, ঠিক করিতেছেন?"

রামশরণ ভাবিত হইলেন।

গাড়য়ান বলিল "তোমার বাড়ী তারে খবর দিলে পাওয়া যাইবে?"

"তা' যাইতে পারে।" একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "খবর দিয়া কি হইবে? আসিতে পারে এমন লোক বাড়ীতে কেহ নাই।"

রামশরণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কারণ, ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। আপাততঃ আশ্রয় পাইয়া যে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই কষ্টলব্ধ শান্তিকে তিনি সহসা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগবান যখন একটা উপায় করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনিই আবার উপায় করিয়া দিবেন।

তাঁহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া গাড়য়ান কহিল, "অত ভাবিতেছ কেন, বাবু? ভগবান একটা উপায় করিয়া দিবেই দিবে।"

সে মনে মনে একটা উপায় স্থির করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল। সে বলিল, "আমার বাড়ীতে একখানা ছোট ঘর আছে, সেখানায় আমরা থাকি না। সেই ঘরে তোমাকে থাকিতে দিব। আর পাড়ার গৌর পরামাণিককে ডাকিয়া আনিব; সে খাবার জল আনিয়া দিতে পারিবে, দুধ আল দিবে; আমাদের ওখানে ভাল চিঁড়া পাওয়া যায়, ভাল আকের গুড়—"রামশরণ

তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সবই যেন হইল। আমি তোমার বাড়ীতে গেলে সে কথা ত লোকের জানিতে বাকী থাকিবে না। আর আমার সারিতে কত দিন লাগিবে, তাহার ঠিক কি? ইহার মধ্যে যদি কোম্পানির লোক সন্ধান পায় তবে আমাকে লইয়া যাইয়া কবরই দিউক্ আর পদ্মায়, ফেলিয়াই দিউক্, এক রকমে সরাইবেই।"

কোম্পানির লোকের ব্যবহারের সম্বন্ধে রামশরণের এমনই একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার ছিল।

গাড়য়ান জিজ্ঞাসিল, "তোমার বাড়ীতে কে আছে?"

রামশরণ উত্তর করিলেন, "আমার স্ত্রী ও একটি চার বৎসরের মেয়ে।"

গাড়য়ান দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল; বলিল, "আমার একটি দুই বৎসরের মেয়ে সে দিন ফাঁকি দিয়া গিয়াছে।" সে তাহার চক্ষু মুছিল। রামশরণের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখন কয়টি ছেলে?"

"দুইটি ছেলে। একটি পাঁচ বৎসরের আর একটি এই তিন মাসে পড়িয়াছে।"

রামশরণ ও গাড়য়ানের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন অতি সাধারণ, সংসারিক এবং হয় ত অনাবশ্যক। ইহা জানিয়া জগতের কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু এই সামান্য আলাপে যে সহানুভূতির বন্ধন দুইটি বলিষ্ঠ মানব-হৃদয়কে তাহাদের অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করিয়া লইতেছিল, তাহা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। অর্থ সে বন্ধনের সৃষ্টি করিতে পারে না, দারিদ্র্য তাহা দূর করিতে পারে না।

রামশরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়াঘাট আর কত দূর?"

গাড়য়ান বলিল, "যাইতে দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইবে।"

"তোমাদের বাড়ী হইতে ষ্টেশন কত পথ, মণিলাল?" গাড়য়ানের নাম মণিলাল।

"হিলি আসিতে প্রায় সারা দিনমান লাগে।"

"আর কোনও ষ্টেশন কাছে নাই?"

"দেওয়ানতলা বলিয়া আর একটা ষ্টেশন হইয়াছে। তথায় যাইতে প্রায় 'এক দুপহর" লাগে, কিন্তু পথ ভাল নহে।"

রামশরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ঘোড়াঘাট আসিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া গাড়য়ানের পত্নী প্রতীক্ষা করিতেছিল। আঙ্গিণায় আসিবা মাত্র সে গরু দুইটাকে খুলিয়া বিচালী দিবার জন্য গোয়ালে লইয়া গেল; অপরিচিতকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল না। একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে গাড়ী হইতে হুক্কা, কলিকা, আগুনের মালশা, বালতী একে একে সংগ্রহ করিয়া ঘরে লইয়া গেল। সেগুলি রাখিয়া সে ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। রামশরণ এই সুস্থ সবল বালকটিকে দেখিয়া খুসী হইলেন। তিনি পাঁচটি টাকা তাহার হাতে দিতে গেলেন। হঠাৎ বালক গম্ভীর হইয়া পড়িল, এবং তাহার পিতাকে আসিতে দেখিয়া একদৌড়ে তাহার মাতার নিকটে গেল।

(৩)

মণিলালের সাহায্যে রামশরণ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মণিলাল তাঁহাকে একখানি ছোট ঘরে লইয়া গেল—ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মেজেয় কেবল একখানি কম্বল পাতা, রামশরণ শুইয়া পড়িলেন।

কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি অতি কষ্টে মুখ হাত ও মস্তকের রক্ত প্রক্ষালিত করিলেন। গাড়য়ানপত্নী আসিয়া বলিল, "আকের গুড়, খুব ভাল চিঁড়া আর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছি। উনি পরামাণিককে ডাকিতে গিয়াছেন।"

রামশরণ বলিলেন, "আমি ও সব কিছু খাইব না, মা। একটু দুধ খাইব মাত্র। তা', মা তুমি হাতে করিয়া দিলেই হইবে। কোনও পরামাণিককে ডাকিবার দরকার নাই।"

মণিলালের স্ত্রী বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের হাতে কেন খাইবেন?"

কিছুক্ষণ পরে গৌর পরামাণিকে সঙ্গে লইয়া গাড়য়ান আসিল। রামশরণ কেবল দুগ্ধ পান করিলেন।

মণিলালের পুত্র বৈকালে কতকগুলি পেয়ারা ও কলা আনিয়া তাঁহাকে দিল; এবং তিনি খাইতে অসম্মত হইলে অগত্যা নিজেই তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

সন্ধ্যার পর রামশরণ গাড়য়ানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। গাড়য়ান-গৃহিণী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়য়ান বলিতেছিল, "কলিকাতায় যাইব বলিতেছ, অথচ আবার

বলিতেছ যে, পায়ের ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এমন অবস্থায় কিরূপে যাওয়া চলে? তাহার চেয়ে আমি বলি, আমার এই কুঁড়ে ঘরখানায় থাক, আমরা সাধ্যমত সেবা করিতে ক্রুটী করিব না।"

রামশরণ চিন্তা করিতেছিলেন। মণিলাল তাহার স্ত্রীর হস্ত হইতে কলিকা লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। সেও ভাবিতেছিল।

মণিলালের স্ত্রী বলিল, "উনি পায়ে যে রকম ব্যথা বলিতেছেন, তাহাতে এখানে থাকিলে কি উপায়ে সারিবেন তাহা ভাবিয়াছ?"

রামশরণ বলিলেন, "সে জন্য ভাবিতেছি না, মা। তোমাদের এ স্থানে থাকিলে আরও বিপদের সম্ভাবনা আছে। গৌর পরামাণিক যে রকম ভাবে আমার নিকট হইতে সব কথা বাহির করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে-ছিল, তাহাতে দেখিবে কাল সকালেই সে সব কথা গ্রামে রাষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

রামশরণের মনে কেবলই এই আশঙ্কা হইতেছিল যে, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কোন প্রকারে তাঁহার সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। জনশ্রুতি অমূলক হইলেও বিপদের সময়ে মানুষকে বিহ্বল করিয়া ফেলে।

মণিলালের স্ত্রী বলিল, "আমি বলি কি, উহাঁকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দেওয়াই ভাল।"

মণিলাল বলিল, "উনি যাইতে পারিবেন? তুই খুব বুঝেছিস্ দেখিতেছি; ওঁর নড়িবার ক্ষমতা নাই; বলিতেছিস্, কলিকাতায় রওনা করিয়া দাও!"

মণিলালের স্ত্রী অতি শান্তভাবে উত্তর করিল, "তুমি না হয় গিয়া রাখিয়া আইস।"

রামশরণ ঠিক এমনই একটা কল্পনা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু বলিতে তাঁহার ভরসা হয় নাই। মণিলাল অর্থের জন্য কিছু করিবে না, সুতরাং এই বিপন্ন অবস্থায় এমন সুহৃদের অযাচিত স্নেহের উপর অত্যধিক দাবী করায় যে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহাকে সঙ্কুচিত করিতেছিল। তিনি উত্তরের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন।

গাড়য়ান ধূমপান করিতেছিল। হুক্কাটি কোণে রক্ষা করিয়া বলিল, "অগত্যা তাহাই।"

ব্রাহ্মণ আগ্রহের সহিত গাড়য়ানের হস্ত গ্রহণ করিলেন। মণিলাল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

পরদিন রামশরণ অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ও সেই পল্লীভবনের স্নিগ্ধ স্মৃতি লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

(৪)

পথে ট্রেণেই তাঁহার প্রবল জ্বর হইয়াছিল। শরীরের বেদনাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দক্ষিণ পদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, কলিকাতায় গিয়া প্রথমেই মেডিকেল কলেজে যাইবেন।

পরদিন কলিকাতায় পৌঁছিয়াই রামশরণ হাঁসপাতালে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভর্ত্তি হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি খরচ পত্র দিয়া মণিলালকে বিদায় দিলেন। অতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে সে ব্রাহ্মণের পদধূলি লইল। তিনি সস্নেহে তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। একটি কথাও কেহ কহিতে পারিল না। কুলিরা ক্যাম্বিশের দোলায় করিয়া তাঁহাকে গাড়ি-বারান্দা হইতে লইয়া গেল।

অপরাহ্নে "ডাক্তার সাহেব" আসিলেন। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে রামশরণ সত্য গোপন করিলেন; বলিলেন, ঘুমের ঘোরে ছাতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হঠাৎ ছাত হইতে পড়িয়া গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটে। সত্য ঘটনা ব্যক্ত করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিলেন, কি জানি যদি কেহ এই "সাহেবের" নিকট প্রকৃত ঘটনা জানিতে পায়, তবে নূতন বিপত্তি ঘটিবে।

ডাক্তার সমস্ত শরীর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন; মস্তকের রক্তচিহ্ন তখনও রহিয়াছে; পরে অবিশ্বাসের ভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি মদ খাও?" রামশরণ উত্তর করিলেন "না, 'সাহেব'।" ডাক্তার তাঁহার সহকারীর সহিত কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক করিয়া রামশরণের পদদ্বয় টিপিয়া দেখিলেন, ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "দক্ষিণপদের দুইখানা হাড়ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" পরক্ষণেই রোগীকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ও কিছুই নহে, শীঘ্র ভাল হইয়া যাইবে। বামপদ বেশ ভালই আছে, সামান্য মালিশেই সারিয়া যাইবে।"

বাস্তবিক তাহা হইল না। বামপদ কিছুদিনের মধ্যে ভাল হইল বটে,

কিন্তু দক্ষিণ পদের জন্য বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। এক সময় এমন সম্ভাবনা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ পদখানি বুঝি বা কাটিয়াই ফেলিতে হয়। "ডাক্তার সাহেবের" অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে পাখানি কাটিয়া ফেলিতে হইল না বটে, কিন্তু নিত্য নূতন রকমের যন্ত্রণায় রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল। ক্লোরো-ফরমের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানলোপ করিয়া ডাক্তার ভগ্ন হাড়কে স্বস্থানে আনিয়া গাটাপার্চ্চার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। অনেকদিনপরে খুলিয়া দেখা গেল, হাড় স্বস্থানে আইসে নাই। আবার তাঁহার জ্ঞানলোপ করিয়া ভগ্ন হাড় স্বস্থানে আনিবার চেষ্টা হইল। এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। ভাঙ্গা হাড় কিছুতেই আর যোড়া লাগিতে চাহে না।

রামশরণ ক্রমেই জীবনে হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়া-ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে যাইতে পারিবেন। কিন্তু ক্রমেই সে আশা দূর হইতে অতি দূরে অপসারিত হইয়া গেল। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা ও স্ত্রী—এ জীবনে যাহাদের মুখ আর দেখিবার আশা নাই—তাহাদের চিন্তায় কত দীর্ঘ নিশা তিনি জাগরণে অবসান করিয়াছেন কত দীর্ঘ দিনমান তিনি শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কোন সময়ে তিনি এত অধীর হইতেন যে, তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া যাইত, ললাটে স্বেদবিন্দু নির্গত হইত এবং জ্বরের উত্তাপ অনুভূত হইত।

মাসের পর মাস এই ভাবে কাটিতে লাগিল। রামশরণ পরিবারের কোনও সংবাদ পাইতেন না। পাইলে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিতেন। কিন্তু সংবাদ আদানপ্রদানের পথ তিনি নিজেই রুদ্ধ করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি হতাশ হইতেছিলেন। যখনই বাড়ীতে সংবাদ দিবার কথা তাঁহার মনে হইত, তখনই তিনি ভাবিতেন, "আর কেন? যদি বাঁচি, দেখা হইলে এক মুহূর্ত্তে সারা জীবনের দুঃখ ভুলিয়া যাইবে, আর যদি মরিতেই হয়, তবে আর হর্ষে বিষাদ কেন ঘটাইব? আশা দিয়া নিরাশ করিয়া কি হইবে? আমার মৃত্যু সংবাদ এত দিনে অবশ্যই পৌঁছিয়াছে। যদি মরিতেই হয়, তবে সে ভুল ভাঙ্গিয়া লাভ কি? আবার নূতন শোকের সৃষ্টি করা বই ত নয়!"

রামশরণের একটি আত্মীয় তাঁহার গৃহে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়া-ছিল। তাহারই উপর তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের ভার দিয়া তিনি বিদেশে

আসিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে মনে হইত, তাহাকে আসিতে লিখিবেন। কিন্তু তাহাকে আসিতে হইলে, তাঁহার পরিবারকে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে হয়। রামশরণ তাহা ইচ্ছা করিতেন না। রোগমুক্তিসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস যদি এত শিথিল না হইত, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে সংবাদ দিতেন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, তাহাতে তিনি মৃত্যুরই জয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়াছিলেন, কাযেই তাঁহার এই অনিশ্চিত পরিণামের সহিত আর কাহাকেও জড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

কখন কখন ইহাও তাঁহার মনে হইত যে, আরোগ্যলাভ করিয়া হঠাৎ একদিন তিনি গৃহে উপস্থিত হইবেন, আর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিবেন; আর কণ্ঠবিলগ্না হর্ষবিহ্বলা পত্নীর সম্ভাষণের সহিত বালিকার স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপরিস্ফুট বাক্যামৃত উপভোগ করিবেন। সে আনন্দের দৃশ্য কল্পনা করিতে করিতে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইত, চক্ষু বিস্ফারিত হইত। পরক্ষণেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সুখের কল্পনারাজ্য হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিত। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিতেন।

রামশরণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। সেই একই ঘর, একই শয্যা, একই শয্যার সারি। রোগীর সকরুণ আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর মর্ম্মস্পর্শী কাতরতা, শুশ্রূষাকারিণীদিগের অতর্কিত পরিক্রমণ, শববাহকদিগের সতর্ক পদবিক্ষেপ সেই একই ভাবে চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই; অথবা পরিবর্ত্তন নাই। প্রতি দিনের সেই অধীর প্রতীক্ষা—ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা, আহারের প্রতীক্ষা, ঔষধের প্রতীক্ষা - দীর্ঘ দিনগুলিকে আরও দীর্ঘ করিয়া তুলিত। অন্য রোগিগণের আত্মীয়স্বজন অবধারিত সময়ে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া যাইত। রামশরণের অশ্রু গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বহিত। জগতে তাঁহার এমন কেহ ছিল না যে, এই মরণপথে সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার শেষমুহূর্ত্ত কয়েকটি স্নিগ্ধ করিয়া দিতে পারে। এই চিন্তা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিত।

যে সময় ডাক্তার আসিতেন, সেই মুহূর্ত্তগুলি রামশরণের অত্যন্ত শান্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হইত। তিনি প্রত্যহই আশ্বাস দিতেন, প্রত্যহই অবসাদক্লিষ্ট রোগযন্ত্রণাকাতর প্রাণে উৎসাহের অমিয়বারি সিঞ্চন করিতেন; আসিয়াই

রোগীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন, আছ ?" বলিতেন, "ও অল্পদিনের মধ্যেই সারিবে। ভয় কি ?" রামশরণ আশার সম্মোহন ছবি দেখিতেন। তাঁহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

(৫)

ট্রেণে দুর্ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর জিলায় একখানি গণ্ডগ্রামের অপ্রশস্ত নির্জ্জন পথে শ্রান্ত পদবিক্ষেপে একজন পথিক গমন করিতেছিলেন। তখন শুক্লপক্ষের মেঘবিনির্ম্মুক্ত পঞ্চমীর চন্দ্র পশ্চিম-গগনে ম্লান হইয়া আসিয়াছিল, ঝিল্লীরবমুখরিত পল্লীপথ কোথাও আম্র-বনের মধ্য দিয়া, কোথাও প্রান্তরের কিনারা দিয়া, কোথাও বা গৃহস্থের আঙ্গিণা দিয়া স্নায়ুর ন্যায় গ্রামের সমস্ত কলেবরটিকে ব্যাপিয়াছিল। সেই পল্লীপথ বহিয়া শ্রান্ত পথিক অনন্যমনে গমন করিতেছিলেন। পল্লী যেন স্পন্দহীন, নিস্তব্ধ এবং বিজন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি কুক্কুর অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া নিরস্ত হইতেছিল। অবসাদ-বিবশা যামিনী যেন সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষদ্বয়ে অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিকুলকে আবৃত করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। একাকী পথিক সেই অন্ধ নিস্তব্ধতা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক মলিন বসনে মণ্ডিত। শরীর দীর্ঘ কিন্তু কঙ্কালাবশিষ্ট। পদবিক্ষেপ শ্রান্ত অথচ অস্থির, তাহাতে যেন খঞ্জত্বের ভাব বিদ্যমান।

পথিক রামশরণ; হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আশাভরে আজ গৃহে ফিরিতেছিলেন। কল্পিত সুখের চিত্তোন্মত্তকারী মোহ সময়কে দীর্ঘ বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছিল। তাঁহার মনোরথ বহু পূর্ব্বে ছুটিয়া চলিল, আর তাঁহার সদ্যরোগবিমুক্ত খঞ্জ দেহ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

রামশরণ যখন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার গৃহের অঙ্গিনা তৃণসমাচ্ছাদিত, সংস্কারা-ভাবে গৃহগুলি হতশ্রী। কিন্তু এ সকল তাঁহার আশা-আশঙ্কা-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে স্থান পাইল না। মধ্যরজনীর সেই অপার্থিব নিস্তব্ধতা সেই বিরলগৃহ প্রদেশে তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতেছিল, এবং অমঙ্গলের আভাস যেন তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রাঙ্গণে গিয়া কাহাকেও ডাকিবেন, সে শক্তি যেন তাঁহার ছিল না। কণ্ঠস্বর নিরুদ্ধ। ইতস্ততঃ চাহিয়া একটি জানালায় আলোকরশ্মি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে একটু আশার সঞ্চার

হইল। তিনি মনে করিলেন, বাতায়নতলে যাইয়া অকস্মাৎ তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিবেন। সে আনন্দের কল্পনা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রতি ধমনীতে বিদ্যুৎ ছুটাইল। তিনি অস্থিরপদে জানালার নিকটে গেলেন এবং যাহা দেখিতে পাই-লেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু যেন জমিয়া গেল। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি প্রাচীরগাত্রে আপনার দেহ মিশাইয়া দিতে চাহিলেন।

তাঁহার পরম আত্মীয়—যাহার উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—সেই আত্মীয়টি তাঁহারই শয্যায় শয়ান, আর তাঁহার স্ত্রী সেই একই শয্যাবিলগ্না। এই সেই স্ত্রী যাহার চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী প্রভাত হইয়াছে, কত অধীর কামনা শান্তিলাভ করিয়াছে, যাহার জন্য তিনি অসহ্য ক্লেশের মধ্যেও নির্ব্বাপিত জীবনবর্ত্তি বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন! তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পাপের অগ্নিশিখায় তাঁহার সুখের লতা-কুঞ্জ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ক্রূর বিধাতা তাঁহাকে হাঁসপাতালের ক্লেশহীন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন কেবল এই হলা-হলের পূর্ণপাত্র তাঁহার মুখে ধরিবার নিমিত্ত। সে গরল মুহূর্ত্তে তিনি নিঃশেষে পান করিলেন। সে পানপাত্রে তাঁহার প্রেম, তাঁহার আশা, তাঁহার উদ্যম ও ভরসা সকলই যেন বিষের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। বহুদিনসঞ্চিত ব্যাকু-লতা শান্ত হইল। একবার মাত্র সাধ হইল, তাঁহার বড় আদরের কন্যাটিকে দেখিবেন। দেখিলেন, যাহা দেখিবার জন্য রোগশয্যায় তাঁহার ব্যাধিক্লিষ্ট অশ্রুসিক্ত চক্ষু সর্ব্বদা ত্রস্তভাবে সেই হাঁসপাতালের গৃহের চারি দিকে অন্বেষণ করিত সেই সুকুমার শিশু হর্ম্ম্যতলে মলিন শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কঙ্কালসার নগ্নদেহ অদৃষ্টের শেষ নির্ম্মম আঘাতের ন্যায় কঠোর বোধ হইল। দুঃখের আতিশয্য হৃদয়কে কঠিন করিয়া ফেলে, নহিলে অল্প আঘাতে যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে, কঠিন আঘাতে তাহার কিছুই হয় না কেন?

রামশরণ সবলে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিলেন। সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া গেল। তাঁহার সতৃষ্ণ নয়ন বালিকার পাণ্ডু গণ্ডস্থলে নিবদ্ধ ছিল। গৃহের সে হাসি সম্ভাষণ তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইতেছিল না। বালিকার অস্ফুট প্রলাপে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে ক্ষুদ্র জীবনপ্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কোমল কোরকের অন্তঃসার কীট ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে।

হায়! ইহাই দেখিবার জন্য তিনি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও জীবনের সাধ করিয়াছিলেন! হায় জীবন!

অকস্মাৎ গৃহস্থিত দীপ বাতাসে কাঁপিয়া উঠিল। রামশরণের স্ত্রী জানালা বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিল। সে জানালায় আসিবার পূর্ব্বেই দীপ নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকারে রামশরণের স্ত্রী দেখিতে পাইল, একখানি পরিচিত, দীর্ঘ, পাণ্ডুর মুখ। একটি অমানুষিক চীৎকার ও তাহার সঙ্গে পতনের শব্দে রামশরণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলপূর্ব্বক আপনাকে জানালা হইতে ছিনাইয়া লইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অসাড় মস্তিষ্কে উত্তেজনা ফিরিয়া আসিল। তিনি আবার তাঁহার পদদ্বয়ে সবলতা অনুভব করিলেন। প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া তিনি দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

জ্যোৎস্না তখন মিলাইয়া গিয়াছে; আকাশের প্রান্তে মেঘের সারিতে চকিতে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। ঝোপের মধ্যে ঝিল্লীরব নিশীথের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল। কোথাও নিবিড় বেতসকুঞ্জে, ঘনপল্লবান্তরালে জোনাকীর পুঞ্জ বনভূমিকে প্রসাধিত করিয়াছিল। কিন্তু রামশরণের দৃষ্টি সে দিকে ছিল না, কোন দিকেই ছিল না। তাঁহার শরীর যন্ত্রের মত তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে গতি লক্ষ্যহীন, অনির্দ্দেশ্য অথচ অপ্রতিহত। কণ্টকে যদি পদ ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে, পরিশ্রমে যদি কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া থাকে, তাহা রামশরণের জ্ঞানের সীমার মধ্যে ছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, চলিতে হইবে। এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে রহিয়াছে। গৃহ পরিজন ছাড়িয়া দূরে, অতি দূরে যাইতে হইবে। আর এমনই চলিতে চলিতে, এমনই ভাবনাহীন, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে যদি মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন ঘটে তবেই মনস্কাম পূর্ণ হয়—অদৃষ্টের প্রতি সমুচিত প্রতিহিংসা লওয়া হয়। সংসারে আর বন্ধন নাই, জীবনে আর মমতা নাই। আশারজ্জুর একটি তারও আর ছিঁড়িতে অবশিষ্ট নাই। কন্যা—কাহার কন্যা? পাপের সংসর্গ! আর কাহারও কথা ভাবিব না, আমার কেহ নাই।

এমনই চিন্তার স্রোত রামশরণের ক্লান্ত মস্তিষ্কে তরঙ্গ তুলিতেছিল। আবার অবসাদ আসিয়া যেন সমস্ত স্পন্দনকে অসাড় করিয়া দিল। রক্তের উষ্ণপ্রস্রবণ যেন জমিয়া গেল। একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে রামশরণ বসিয়া পড়িলেন। এইবার ইচ্ছা হইল, কাঁদিয়া কষ্টের লাঘব করেন। কিন্তু

কাঁদিবার অধিকার হইতেও তিনি বঞ্চিত। দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া তিনি বৃক্ষের শিকড়ে মস্তক রক্ষা করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রা তাঁহার অবশিষ্ট চৈতন্যটুকু হরণ করিল। তাঁহার হৃদয়ের দাবদাহ স্নিগ্ধ অশ্বত্থতলে প্রশমিত হইল।

যখন রামশরণের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন চতুর্দ্দিক সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষিকুলের কলরবে সে পল্লীপথ ধ্বনিত; অদূরে স্রোতস্বিনী-তট হইতে স্নানার্থীর কলরব আসিতেছিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন এবং সমস্ত অবস্থাটা ভাল করিয়া একবার বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। এক এক করিয়া সমস্ত ঘটনাগুলি নবীন বর্ণচ্ছটায় স্মৃতিপটে উদিত হইতে লগিল। রামশরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পদ ত আর চলিতে চাহে না। হায় এই বিশাল ধরণীতে তাঁহার জন্য কি এতটুকু স্থান নাই, যথায় এই দীর্ণ দগ্ধ হৃদয় শান্তিলাভ করিতে পারে! মনে পড়িল, মণিলালের সেই স্নিগ্ধ কুটীর, সেই পবিত্র সরলতা। তখন যদি মণিলালকে লইয়া কলিকাতায় না আসিয়া, একেবারে গৃহে আসিতাম, তাহা হইলে, তখন মরিয়াও শান্তি ছিল। আজ তাহা হইলে অদৃষ্টের এ নিষ্ঠুর কশাঘাত সহ্য করিতে হইত না। তখন আসি নাই জীবনের মমতায়। আসি নাই—সে কাহার দোষ? আসিলে বোধ হয় এমনটি হইত না। মণিলাল বলিয়াছিল, বাড়ীতে খবর পাঠাইতে—তাহাও কেন পাঠাই নাই? হয় ত এই সকল কারণেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তখন যদি একখানা চিঠি লিখিয়াও খবর লইতাম, তাহা হইলেও বুঝিত, আমি বাঁচিয়া আছি। কেন লিখি নাই? এ বুদ্ধি তখন আমার কোথা হইতে আসিল! হায় হায়, দোষ আমারই।

চিন্তার স্রোত সেই রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে কেমন করিয়া ফিরিল, তাহা রামশরণ বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে ঘৃণা ও বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার মন অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ শোচনীয় পরিণাম তাঁহারই রচিত। পত্নীর ব্যবহার মনে হইলে যখন ঘৃণায় ও ক্রোধে অধর কুঞ্চিত হইতেছিল, তখনই অনুকম্পা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে দ্রব করিয়া দিতেছিল। এমনই প্রতিকূল স্রোত তাঁহার জীর্ণ জীবনতরি-খানিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, একটি নিরাশ্রয়া রমণী তাহার শিশু সন্তানটিকে লইয়া অকস্মাৎ এমন দুরবস্থায় পড়িলে কি না করিতে পারে? সংসারের সঙ্গিহীন পিচ্ছিল পথে যদি তাহার পদস্খলন হয়, তবে

ভগবান সে অপরাধের বিচার করিবেন। কিন্তু মানুষ তাহার নিজের দায়িত্ব-টুকু পরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিলে সে কি অব্যাহতি লাভ করিবে? তাঁহার মনে হইতে লাগিল; তাঁহার নিজের দোষেই এই মহা অনর্থ ঘটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই অধিক অপরাধী।

রামশরণ তাঁহার এই চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উপলাহত স্রোতস্বতীর ন্যায় এমনই ভাবনা দ্বিগুণবেগে তাঁহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া ফেলিল। মনে হইল, তাঁহার কন্যার কথা। সেই ক্ষীণ কণ্ঠের প্রলাপ তাঁহার কর্ণে তখনও ধ্বনিত হইতেছিল। তাহার সেই অযত্নবিস্রস্ত কেশ প্রান্তরপথে প্রতি পদে হেন তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। এইবার তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

তাঁহার মন অনুশোচনায় পূর্ণ। ভিতর হইতে তর্জ্জনীহেলনে কে যেন তাঁহাকেই অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিল। তিনি দ্রুতপদে ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা এখন সেই রুগ্না কন্যাটির উপর কেন্দ্রীভূত। হয়ত সে ক্ষুদ্র সেফালিকা প্রভাতের বাতাসেই ঝরিয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে চেষ্টা করিলেও হয়ত তাহাকে বাঁচান যাইত। তাঁহাকে দেখিলেও সে আশ্বস্ত হইতে পারিত। "হায়, অবশেষে তাহার মৃত্যুর জন্যও কি আমাকে দায়ী হইতে হইবে?" এই চিন্তাই সমস্ত পথ তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইতে ত্রুটী করে না। অনশন, জাগরণ, দুঃখ, ভাবনা, অতিরিক্ত ভ্রমণ তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রবল ইচ্ছা সত্বেও তিনি দ্রুত চলিতে পারিলেন না। যখন তিনি তাঁহার গ্রামের সীমার মধ্যে পদার্পণ করিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, বায়ুর নিস্তব্ধতা ঝড়ের সূচনা করিতেছিল। রামশরণের মনে আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিতেছিল। নদীতীরে চিতাগ্নি দেখিয়া রামশরণ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তাঁহার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিল। মন অমঙ্গলকেই সর্ব্বাগ্রে টানিয়া আনে। শ্মশানের পাশ দিয়া পথ। রামশরণ একটু দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, শববাহকরা তাঁহারই প্রতিবেশী। নদীতটে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। চিতাগ্নির আলোক পশ্চাতে রাখিয়া তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারা গিয়াছে কে?"

অপর এক ব্যক্তি বলিল, "রামশরণ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী মারা গিয়াছে।"

রামশরণ আর কিছু না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়টিকে সে স্থানে না দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

মেঘের নির্ঘোষের সঙ্গে, ঝটিকার প্রথম নিঃস্বনের সঙ্গে রামশরণের কক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত হইল। এবং ঝটিকারই মত উদ্দাম বেগে রামশরণ তাঁহার কন্যার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। দুইচারিজন দয়ার্দ্রচিত্ত প্রতিবেশী সে রোগ-শয্যা ঘিরিয়া যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আর তাঁহার সেই আত্মীয়টি অনাদৃতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। রামশরণকে দেখিয়া সকলে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল; মনে করিল, এই আকস্মিক ঘটনায় বালিকার স্তিমিত জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। হতভাগ্যের বিদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার জন্য তিনি কন্যাটির জীবন রাখিয়া দিলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

সান্ত্বনা।

কে তুমি আমায় দিতে এসেছ সান্ত্বনা
উদাস নয়নে বহি তপ্ত অশ্রুকণা?
বাক্যে যা' লুকাতে চাহো,—রুদ্ধমর্ম্মদাহ,
উচ্ছ্বসিয়া রক্তিমায় খুঁজে পরীবাহ।
লুকাতে পারনি, সখা, কণ্ঠের জড়তা.
গুমরি' গুমরি' চাপি' দীর্ঘশ্বাসব্যথা।
তোমারে চিনেছি ওগো তুমি পর নহ,
তবে কেন সান্ত্বনার তত্ত্বকথা কহ?
দূরে দূরে মর্ম্মজ্বালা রাখিও না বাঁধি,
এস তবে গলাগলি প্রাণ ভরে কাঁদি।
অশ্রু নদী সিন্ধু মাগে,—ছুটে' তা'র সুখ,
সান্ত্বনা উপলে কেন বাঁধ তা'র বুক?

শ্রীকালিদাস রায়

ভাষাতত্ত্ব।

(১)

আমরা হিন্দু। আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি যাহা কিছু সবই সংস্কৃত আদর্শের ছাঁচে ঢালা। শাস্ত্রের যে সমস্ত বচন আমরা শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলি সেগুলি সব সংস্কৃতে লিখা। আমাদের দৈনিক সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা, শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কার্য্য সমস্তই সংস্কৃতে অথবা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে লোক বাদবিতণ্ডা করিবার সময় সংস্কৃত ভাষায় করিত, ফলতঃ সংস্কৃতই তাহাদের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিল।—এখন আমরা তাহার স্থানে নিজ নিজ প্রদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সংস্কৃত ভিন্ন যে সমস্ত ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থাদি লিখিত হইত তাহার সাধারণ নাম "প্রাকৃত"। আর বর্ত্তমানকালে হিন্দুগণ সাধারণতঃ যে ভাষায় কথোপ-কথন করিয়া থাকেন তাহাকেও আমরা "প্রাকৃত" সংজ্ঞা দিয়া থাকি। মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি যে সমস্ত রীতি উত্তর ভারতে প্রচলিত তাহার নামও প্রাকৃত। সাধারণের ধারণা সংস্কৃতই এই গুলির মধ্যে প্রাচীনতম, আর প্রাকৃতগুলি সংস্কৃত-সম্ভূত।

জগতের সমগ্র জাতির সম্মুখে একমাত্র ভারতবর্ষই ভাষাতত্ত্বের (Philology) আদিম জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিতে পারে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতা একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে ভাষাতত্ত্বের উৎপত্তি-তত্ত্ব আলোচিত হই-য়াছে। ইহাতে একস্থানে লিখিত আছে—"বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রনব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈ বৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যতে ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোঽ-বক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতাবাগুদ্যতে।" অর্থাৎ এক সময়ে বাক্ পরা (Inarticulate) এবং অব্যাকৃত (Undistinguished) ছিল। তখন দেবতাদল ইন্দ্রকে বলিলেন—"আমাদের বাক্‌কে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করিয়া দিউন।" তিনি বলিলেন—"আমি তোমাদিগকে বর দিব, আমার এবং বায়ুর উভয়ের জন্য এক পাত্রে সোম ঢালিয়া দেওয়া হউক।" এই জন্যই ইন্দ্র ও বায়ু উভয়ের মধ্যে একপাত্রে সোম ঢালিয়া দেওয়া হয়। তখন দেবতাদল তাহার মধ্যে থাকিয়া ইহাকে বিভাগ করিয়া লইলেন।

কাযেই এক্ষণে ব্যাকৃত বাক্ কথিত হইয়া থাকে। (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৪, ৭) সংহিতা-ভাগের অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ ভাগ গণনীয়। এই ব্রাহ্মণ ভাগে এমন কি তৈত্তিরীয় সংহিতায় শব্দের ব্যুৎপত্তিবিষয়ক ব্যাখ্যা যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যাগুলি ভাষাতত্ত্বের উদ্দেশ্যে লিখিত না হইলেও এগুলি হইতে ভাষাতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটি উদ্ধৃত করা করা গেল—

ত্রৈষ———(ঐতরেয় ব্রাঃ ৩।৯)
মানুষ ——(„ ৩।২৩)
জায়া —— („ ৭।১৩)
রুদ্র———(তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৫,১)
বৃত্র———(„ „ ২।৪,১২
২।৫,২)
অশ্ব———(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১,৫)
নক্ষত্র----(„ „ ২।৭,১৮)

একজন আচার্য্যের পর অপর আচার্য্য আসিলেন। তাঁহারা সকলে যত্ন-সহকারে ভাষাকলেবরের অবয়বগুলি পরীক্ষা করিয়া যিনি যে নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে পারিলেন তিনি তাহাই সূত্রে নিবদ্ধ করিয়া গেলেন। তাঁহারা শব্দের প্রকৃতি ও অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে যাহা সামান্য বা সাধারণ তাহা বাহির করিতেন, শব্দের যে অংশ অপরিবর্ত্তনীয় তাহাকে পরিবর্ত্তনশীল অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া লইতেন।—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় শব্দের যে পরিবর্ত্তন হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাষাতত্ত্বোপযোগী বিশ্লেষণদ্বারা তাঁহারা সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তির বিশুদ্ধ প্রণালী নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈয়াকরণ আচার্য্যদিগের মধ্যে পানিনি, কাত্যায়ন, ও পতঞ্জলিই শেষ। সংস্কৃত হইতে যে সমস্ত প্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছে অতঃপর তাহাই বিজ্ঞব্যক্তিদিগের আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে যে যে নিয়মে সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত পরিণত হইয়াছে তাহাই আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত শব্দগুলিও এই সময় বাছিয়া বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পণ্ডিতরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন।

এইরূপ অবস্থায় সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব য়ুরোপীয়দিগের হাতে গিয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপীয়গণ সংস্কৃতের কথা জানিতে পারেন এবং ভাষাতত্ত্বের এক অভিনব পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। ইহার পূর্ব্বে ভাষাতত্ত্বের, বিশুদ্ধ প্রণালী অথবা ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণবিষয়ে তাঁহাদের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, য়িহুদীরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বা মনোনীত প্রজা। সুতরাং তাঁহারা স্থির করেন যে, য়িহুদীদিগের ভাষা যে হীব্রু তাহাই প্রাচীনতম ভাষা—অন্যান্য ভাষা তাহা হইতেই ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন আমাদের দেশের গোঁড়া পণ্ডিতগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃতই আদিম ভাষা তাহা হইতে যাবতীয় ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে—সেইরূপ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও বিশ্বাস ছিল যে, হীব্রুই আদিম ভাষা। কিন্তু য়ুরোপ এক্ষণে ভাষাতত্ত্ববিষয়ে স্বাধীন চিন্তাদ্বারা সংস্কৃত ভাষার প্রণালীর সাহায্যে ভাষাতত্ত্বের স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন য়ুরোপীয় ভাষানিচয়কে পরস্পরের সহিত এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত তুলনা করিয়া এক নূতন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ক্রমশঃ ইহা হইতে ভাষাসমুদায়ের বিভাগে ও তুলনায় ভাষাতত্ত্ব সমালোচনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ ক্রমশঃ মনুষ্যভাষার উৎপত্তির নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানবের বর্ত্তমান শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানও স্বীয় অধিকার লাভ করিয়াছে। বিগত অশীতি বর্ষের মধ্যে এ বিভাগে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা অত্যন্তই বিস্ময়কর। য়ুরোপীয়দিগের অক্লান্ত অধ্যবসায়বলেই বর্ত্তমান কালে ভাষাতত্ত্বের অচিন্তিতপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণই এ বিষয়ের অগ্রণী। ইহাঁদের যত্নেই ইহার ঈদৃশ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

সুকীয়াবিবি ও সুকীয়া ষ্ট্রীট।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (১) জব চার্ণক (Job Charnock) কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথম বসতি করেন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে। সেথ (Seth) তাঁহার আরমানীদিগের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, সুকীয়া নামে একজন আরমানী ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথম বাস করিয়াছিলেন। (২)

কলিকাতার প্রথম অধিবাসী কে তাহার নিশ্চিত মীমাংসা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সেথের আরমানী ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সুকীয়াবংশের কোন এক ব্যক্তি বর্ত্তমান বাদুড় বাগানে বাস করিতেন। (৩)

ইঁহার সুকীয়া বিবি নাম্নী এক কন্যা ছিল। এই কন্যা বিবাহের দুই বৎসর পরে বিধবা হইয়াছিলেন। বৈধব্যদশায় ইনি পরম দানশীলা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার গৃহের নিকট একটি পথ নির্ম্মাণের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন এবং আজকাল আমরা তাহাকে সুকীয়াষ্ট্রীট বলিয়া থাকি তাহা এই বিপুলবিত্তশালিনী পুণ্যবতী মহিলার ব্যয়ে জনসাধারণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান এজরা

(১) বাষ্টিড তাঁহার Echoes from Old Calcutta নামক গ্রন্থে অন্য বৎসর দিয়াছেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে চার্ণকের কলিকাতায় আগমনসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দই সমীচীন বোধ হয়।

(২) Seth's 'History of the Armenian's p. 35

(৩) আরমানীরা চার্ণকের প্রাচীন কলিকাতা সংস্থাপনের পূর্ব্বেই এই স্থানে আসিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা আরব ও পারস্য উপসাগরের পথে ভারতজাত দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিত। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে পুরাতন পথে তাহাদিগের বাণিজ্য চলা ভার হইয়া উঠে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকদিগের সহিত আরমানীদিগের এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধির সর্ত্তহিসাবে তাহারা কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য করে। কিন্তু ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে আরমানী সুকীয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বাণিজ্যব্যপদেশে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও তিনি কলিকাতায় কারবার চালাইয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সন্ধির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। (Bengal and Agra Annual Guide and Gezetteer for 1841 Vol I. Calcutta. pp. 14-15, the History of the Armenians p. 45).

ষ্ট্রীটে তাঁহার একটি দাতব্যাগার ছিল। কতিপয় আরমানীবংশের লোকের অনুরোধে তিনি তাঁহার দাতব্য কার্য্যের সুবিধার জন্য একটি পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। (১) অধুনা তাহা সুকীয়াস্ লেন্ বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। *

সুকীয়া বিবি কলিকাতার অতীব প্রাচীন ধনিবংশে জন্মিয়াছিলেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। * তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁহার পিতামহ কর্ত্তৃক একটি মহান্ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই উৎসবে তাঁহার সহৃদয় পিতামহ প্রায় দুই লক্ষ টাকা বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থে বহু বৃহৎ উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল; কূপাদিও খনন করান হইয়াছিল; দরিদ্রদিগকেও বস্ত্র উত্তরীয় ছত্র দান করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক দরিদ্রকে চারি টাকা করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল। †

সুকীয়া বিবি ইংরাজদিগকে বহু অর্থ ঋণ দিয়াছিলেন। ঐ অর্থ প্রত্যর্পিত হইলে তিনি অসহায় এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে তাহা দান করেন। তাঁহার দানের কথা কলিকাতার প্রত্যেক পথে ঘাটে এবং প্রতি ঘরে ঘরে জল্পনার বিষয় হইয়াছিল। সুকীয়া বিবি সরলপ্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি কখনও আপনাকে বহু অলঙ্কারে বিভূষিত করিতেন না। তাঁহার অর্থ ছিল। তিনি সেই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন, অসৎ কার্য্যে এবং বিলাসিতায় ব্যয় করিতেন না। অর্থের মর্য্যাদা তিনি জানিতেন। তাঁহার মনে হিংসা দ্বেষাদি কখনও স্থান পায় নাই। কেহই তাঁহার নিকট হইতে মনের কষ্টে বা ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। শুনা যায় যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র ও অসহায়দিগকে বিতরিত হইয়াছিল। ‡

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের Bengal Annual পত্রিকায় তাঁহার চরিত্রের সরলতার বিবরণ বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

সুকীয়া বিবি সম্বন্ধে Herald এবং Gentleman's Magazine পত্রে

(১) Simm's Report p. 5.

* Bengal Annual p. 91. (1792.) Vol. 8.

† Gentlman's Magazine 1791. p. 342.

‡ Astle's 'Old Reminiscences' pp. 45-47.

আরও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা ও তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) তাঁহার বাসস্থানের নিকটে একটি উদ্যান ছিল। তথায় তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি একজন নিত্য-সহচরীর সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় পুষ্করিণীতে পতনশব্দ শুনিতে পাইলেন। শব্দ শুনিয়া তিনি পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং নয় বৎসর বয়স্ক একটি দরিদ্র বালকের জীবন রক্ষা করিলেন। তাহার পর হইতে এই বালককে তিনি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। *

(২) তাঁহার গৃহের জনৈক ভৃত্য একজন দরিদ্র লোককে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, তাহাতে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। স্বর্কীয়া বিবি তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দিগের সংবাদ লইয়াছিলেন। এবং তাহার বিধবাকে ৩০০০ টাকা এবং একখণ্ড ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। †

(৩) কেহ তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিলে তিনি আর কখনও তাহাকে নিকটে আসিতে দিতেন না। প্রবঞ্চককে তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং দেশের কণ্টক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ‡

(৪) পক্ষিশাবক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ইন্দুর, লালমাছ এবং ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার ভোজনের সময় অন্ততঃ আটজন বালক বালিকা নিকটে না থাকিলে ভোজন করিতে পারিতেন না। § তাঁহার ঔদার্য্য এবং চরিত্রের উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

---

* Bengal Harkara, March, 1802.

† Bengal Annual 1794. P 87.

‡ Bengal Annual, 1794.

§ " " p 87.

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

— *:* —

তৃতীয় অধ্যায়।

"সৎ" এবং "অসৎ" এই দ্বিবিধ উপাদানে সমগ্র বিশ্ব-সংসার রচিত। নিরবচ্ছিন্ন "সৎ" কবির কল্পনা ভিন্ন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যদি জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইত; যদি সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়পরতা প্রত্যেক অট্টালিকা ও প্রত্যেক পর্ণকুটীরে নিরন্তর সমভাবে বিরাজ করিত; যদি হিংসা, দ্বেষ এবং ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় রিপুবর্গ মানব-হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে দেবে ও মানবে, ভূলোকে ও দ্যুলোকে কোন প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে, চৌর্য্য, তস্করতা, নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াকলাপে ধরাধাম কলুষিত হইত না, সুতরাং মানব-সমাজে চিরশান্তি ও পবিত্রতা বিরাজ করিত। কিন্তু "সৎ" ও "অসৎ" এই দুইটি বিপরীত উপাদান হইতেই মানব-সমাজের উৎপত্তি। সেই জন্য আমরা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মানবগণের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে কপটাচারী কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাই। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, একদিকে সর্ব্বলোকারাধ্য নরপুঙ্গবগণ জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন; অন্যদিকে নীচাশয় নরাধমবৃন্দ নিরন্তর নিকৃষ্টবৃত্তিপরিচালিত হইয়া ঘোরতর অনর্থ উৎপাদিত করিতেছে। সেই নিকৃষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের যদৃচ্ছাচার নিবারণ পূর্ব্বক মানব-সমাজে শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত শাসনশক্তির প্রয়োজন। শাসনশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত মানব তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিতে সক্ষম হয় না। সেই জন্য রাজনীতিতত্ত্বদর্শী মনীষিগণ ভূরি ভূরি উদাহরণ দ্বারা শাসন শক্তির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন (১)। হিন্দু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তে বৈ সদা।" ফলতঃ সমাজসংরক্ষণকল্পে শাসনশক্তি ব্যতীত তত্তুল্য অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় অদ্যাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই। সেই শাসন বা রাজশক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকে; যাহাতে বিপ্লব ও অরাজকতার আবির্ভাবে দেশ ও সমাজ উচ্ছিন্ন না যায় তৎপ্রতি ব্যক্তি

(১) "Mankind can never exist even for a day without a ruling authority * * * The most imperious of all necessities to mankind is a government" Alison's 'History of Europe' vol II, p. 117

মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে রাজশক্তি সংরক্ষণের নিমিত্ত রাজভক্তির প্রয়োজন।

রাজভক্তি যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকে, দূরদর্শী ও প্রজাবৎসল ভূপতিগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে কদাপি ক্রটী করেন না। প্রজারঞ্জনই নৃপতিকুলের প্রধান ধর্ম্ম। সেই প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কালধর্ম্ম পালন করিতে হয়। কালধর্ম্ম কোন ভূপতির উপেক্ষার সামগ্রী নহে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরন্তর উন্নতিমার্গে ধাবমান। সৃষ্টি হইতে আবহমান কাল যাবৎ কোন জাতিই চেতনাশক্তিবিহীন, নিৰ্জ্জীব, জড় পদার্থের ন্যায় অবস্থিতি করে না। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে অভিনব ভাবের উদয় হয়। সেই ভাব হৃৎপ্রদেশে বদ্ধমূল হইলে কোন জাতিই বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। সেই জন্য কালচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হয়। পরিণামদর্শী ভূপতিবর্গ কালবিলম্ব না করিয়া কালের প্রয়োজনীয়তানুসারে ব্যবস্থা প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রজামণ্ডলীর হৃদয়ে সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ষোড়শ লুই অদূরদর্শী মন্ত্রীদলের অসার যুক্তি গ্রহণে কালের পশ্চদ্বর্ত্তী হইয়া ঘোরতর বিভ্রাট উৎপাদন করিলেন। তিনি ব্রাইনের কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া সম্প্রদায়-সমিতির আহ্বানপ্রসঙ্গে প্রথমাবধি শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে যখন প্রতিকূল ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে নিতান্ত নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখনই তাঁহার সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জন্মিল। সুতরাং ফরাসী জাতি মনে করিল যে, রাজা প্রজাশক্তির নিকট পরাভূত হইয়া জাতীয় বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঈদৃশ দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীনতার পরিচয়প্রদান রাজার পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে ফরাসীদেশে একবার মাত্র সম্প্রদায়-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। তৎপরে প্রায় দুই শতাব্দী অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সম্প্রদায়-সমিতি সেই আদর্শে, অথবা কালের প্রয়োজনীয়তানুসারে অন্য কোন প্রকারে সংগঠিত হইবে তৎসম্বন্ধে ফরাসীরাজ সর্ব্বসাধারণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিলে সমিতির গঠনপ্রসঙ্গে সম্প্রদায়বর্গের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইল। পার্লিয়ামেণ্ট ভূস্বামীদল ও ধর্ম্মযাজকবৃন্দ

প্রাচীন সমিতির আদর্শে সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাম্যবাদী তৃতীয় সম্প্রদায় তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া আমেরিকার সাধারণ তন্ত্রের আদর্শে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলনে একমাত্র সভা সংস্থাপনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন অপর একটি বিষয়েও সম্প্রদায়বর্গের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণের ইচ্ছা যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় তুল্যসংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায় ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামী সভ্যগণের সমষ্টির তুল্য সংখ্যক সভ্যনির্ব্বাচনের অধিকারপ্রাপ্তি কামনা করিলেন। সুতরাং যদিও সর্ব্বসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া সম্প্রদায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছিলেন, সেই সমিতির গঠনপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সম্প্রদায়বর্গ ভেদমন্ত্রপরিচালিত হইয়া বিষম বিভ্রাট উৎপাদন করিলেন। উপস্থিত বিরোধের গুরুত্ব দৃষ্টে রাজা মীমাংসার ভার মন্ত্রীদলের হস্তে সমর্পিত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইতঃপূর্ব্বে সচিবাধম ব্রাইন সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া পদত্যাগ করায়, মহানুভব নেকার পুনর্ব্বার মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিরোধ-ভঞ্জনের ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত হইল। নেকার দেখিলেন যে, তৃতীয় সম্প্রদায়ই সমগ্র ফরাসা জাতি ; ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় তুল্য সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বাচন প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, তৃতীয় সম্প্রদায় ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজক সভ্যগণের সমষ্টির তুল্য সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে বিরোধীয় দ্বিতীয় প্রসঙ্গে তৃতীয় সম্প্রদায় জয়লাভ করিলেন ; কিন্তু সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে অথচ সর্ব্বসম্প্রদায় একই সভায় সম্মিলিত হইবেন তৎসম্বন্ধে মন্ত্রীবর কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে সমগ্র দেশে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বণিকগণ ভিন্ন, ফরাসী দেশের অনভিজ্ঞ ইতর সাধারণও তৎকালে তৃতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু শিক্ষার ও জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রগাঢ়তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের পাশববৃত্তিগুলি নিমেষে প্রলয় উৎপাদন করিত। পূর্ব্বে বহুকালযাবৎ ধর্ম্মযাজকগণের শিক্ষাধীন থাকিয়া তাহারা ভগবানকে হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধাদি রিপুবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর জীববিশেষ জ্ঞানে অর্চনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মবিহীন ভলটে-

য়ারের অসাধারণ প্ররোচনাশক্তিপ্রভাবে সম্প্রতি তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ভগবান, পরলোক ইত্যাদি সমস্তই মানবচিত্তের উদ্ভাবনী শক্তির সৃষ্টি মাত্র। শিক্ষিত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ঈদৃশ সংস্কার বদ্ধমূল হইলে তদ্দ্বারা সমাজের অনর্থসংঘটন সম্ভবপর নহে, কিন্তু অজ্ঞতাতিমিরাচ্ছন্ন অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হইলে উচ্ছৃঙ্খলতা-স্রোতে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই ধর্ম্ম-বিহীন গণ্ডমূর্খগণ রাজনৈতিক সর্ব্ববিষয়ে হস্তার্পণ ও সর্ব্ব আন্দোলনে যোগদান করিত। প্রাগুক্ত কারণ পরম্পরায় ফরাসী বিপ্লবকালে যেরূপ পৈশাচিক বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। (২)

সম্প্রদায়-সমিতির গঠনপ্রসঙ্গে মতভেদ উপস্থিত হইয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইতোমধ্যে অকস্মাৎ প্যারিস নগরের রাজনীতিব্যাধিগ্রস্ত ইতর সাধারণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যদৃচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইল। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদ্বয়, ব্রাইন ও লামিনন্, যথেচ্ছাচারপ্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। মন্ত্রীদ্বয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নিমিত্ত সংখ্যাতীত ব্যক্তি পন্থলি নামক স্থানে সমবেত হইয়া “ব্রাইন ও লামিনন্ উচ্ছিন্ন যাউক” বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে এবং সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকে সেই চীৎকারে যোগদানে বাধ্য করাইতে লাগিল। তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহারা মন্ত্রীদ্বয়ের কুশপুত্তলি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাসমারোহে অনলে সমর্পিত করিল। শান্তি রক্ষার নিমিত্ত তথায় একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হইলে তাহারা অশ্বারোহিগণকে নিঃশঙ্কচিত্তে আক্রমণ করিল। অশ্বারোহিগণ আক্রান্ত হইয়া অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিলে এক ব্যক্তি হত হইল। তদ্দৃষ্টে শান্তিভঙ্গকারীরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অশ্বারোহিগণের প্রতি ক্ষিপ্রহস্তে অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। অচিরে ৮ জন অশ্বারোহী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দৃষ্টে ইতর সাধারণ জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সান্ত্রিশালাসমূহে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া রাজবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা ডিগ্রিভ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে বন্দুকধারী পুলিস তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে কিয়ৎকাল যাবৎ তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে বিংশতি সংখ্যক ব্যক্তি ধরাশায়ী হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ পলায়ন করিল।

(২) Buckle's 'History of Civilisation' vol II, p. 199.

পরদিবস বহুসংখ্যক ব্যক্তি তরবারি, সঙ্গীন ও প্রদীপ্ত মশাল হস্তে অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা লামিননের কুশপুত্তলিকার অগ্নিকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সমর-সচিব ব্রাইনের গৃহে অগ্নি প্রদানকল্পে, নক্ষত্রবেগে ধাবমান হইল। তাহারা তথায় আগমন পূর্ব্বক সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে গৃহদ্বার ভঙ্গের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গার্ড ডি ফ্রাঙ্ক নামক সৈনিকদল বিদ্যুৎবেগে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গিনের সাহায্যে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে বহুক্ষণযাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক ব্যক্তি হত হইল। শান্তিভঙ্গ-কারীরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সম্প্রদায় সমিতির গঠনপ্রসঙ্গে মতভেদ উপস্থিত হইয়া সমগ্র দেশে আন্দোলন চলিতেছে, এবং প্যারিস নগরের উষ্ণমস্তিষ্ক ইতরসাধারণ ক্ষণে ক্ষণে চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক শান্তিরক্ষকগণের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছে, ইত্যবসরে সভ্যনির্ব্বাচনসংক্রান্ত নিয়মাবলী যথারীতি সমগ্র দেশে প্রচারিত হইল। কয় দিবস পরেই প্রথমতঃ নির্ব্বাচন-সমিতির এবং তৎপরে সম্প্রদায়-সমিতির সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইলেন। সম্প্রদায়-সমিতির অধিবেশনকাল সমাগত দৃষ্টে ফরাসী জাতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সামাজিক ও শাসন সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কুপ্রথা নিবারিত হইয়া সমগ্র ফরাসী রাজ্যে সাম্য সংস্থাপিত হইবে; অচিরে ফরাসীজাতি সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করতঃ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে,—সেই জন্য আবাল-বৃদ্ধবণিতা সকলেই উৎফুল্ল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট, ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজকগণের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সম্প্রদায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, সমিতির অধিবেশন আরব্ধ হইলেই জাতীয় শক্তির প্রাদুর্ভাবে পার্লিয়ামেণ্টের প্রাধান্য ও শ্রেণী বিশেষের অযথা প্রতিপত্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন এখন আর উপায়ান্তর নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

ভারতে চীন অভিযান।

ইতিহাসের পুরাতন কথা নিত্য নূতন। তাই পুরাবৃত্তের পুনরাবৃত্তি দোষাবহ নহে। সকলের তৃপ্তিপ্রদ না হইলেও তাহা অনেকের প্রীতিপ্রদ হওয়া অসম্ভব নহে। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের কিঞ্চিৎ পুরাতন কথার আলোচনা করা হইল।

হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌম সম্রাট ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬০৬ হইতে ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার বিজয়বাহিনীর প্রভাবে শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। খ্যাতনামা চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সাং তাঁহারই রাজত্বকালে ভারতভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হিউএন্‌সাং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হর্ষবর্দ্ধনের আদেশে হিউএন্‌সাংকে তিন সহস্র সুবর্ণমুদ্রা এবং দশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা তাঁহার পাথেয় স্বরূপ প্রদত্ত হয়। "উদিত" নামা জনৈক সামন্ত রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে একদল অশ্বারোহী রক্ষিসৈন্য তাঁহাকে ভারতসীমান্ত পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবার জন্য তাঁহার সহগমন করিয়াছিল। পথিমধ্যে নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সুদীর্ঘ ছয় মাসে পরিব্রাজকপ্রবর নির্ব্বিঘ্নে পঞ্জাব প্রদেশস্থ জলন্ধর নগরে উপনীত হয়েন। ভারতীয় রক্ষিবাহিনী এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। তথা হইতে নূতন লোকের রক্ষণাধীনে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে দ্বাদশ বৎসর প্রবাসের পর পরিব্রাজক স্বদেশে উপনীত হয়েন।

এই প্রথিতনামা চীন পরিব্রাজকের ভারতে অবস্থানকালে মগধ-সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন চীন মহারাজ্যের সহিত দৌত্যসম্ভাষণে পররাষ্ট্রীয় প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় করিতে যত্নবান ছিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে এক দল ভারতীয় দূত চীনে প্রেরিত হয়েন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের সহিত একদল চীন রাজদূত ভারত সম্রাটের নিকট চীন সম্রাটের প্রত্যুত্তর লইয়া আগমন করেন। এই দূতদল ভারতে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া ৬৪৫ অব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যায়েন। ওয়াংহিউএন্‌সি নামক এক ব্যক্তি এই দলের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। পরবৎসর চীন-সম্রাট আর একদল দূত

প্রেরণ করেন। ওয়াংহিউএন্‌সি ৩০ জন অশ্বারোহীসহ এই দলের অধিনেতা হইয়া ভারতে পুনরাগমন করেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ভারতে উপনীত হয়েন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভারতসম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যলীলার অবসান হইয়াছে; এবং তৎসহ অরাজকতার তাণ্ডব নৃত্যে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা তিরোহিত হইয়াছে। তখন অরুণাশ্বনামা জনৈক উদ্ধতপ্রকৃতি রাজমন্ত্রী হৃতশক্তি সিংহাসনে বিরাজিত। চীন রাজদূত মগধে উপনীত হইয়া ভারতের রাজনৈতিক চক্রনেমীর এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া একান্ত ব্যথিত হয়েন।

রাজ্যাপহারী অদূরদর্শী নবীন সম্রাট চীন রাজদূতকে দস্যু তস্করের মত অভ্যর্থিত করিলেন। ওয়াংহিউএন্‌সির অনুচরবৃন্দ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব রাজেঙ্গিতে বিলুণ্ঠিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ওয়াং-হিউএন্‌সি কতিপয় মাত্র সহযাত্রীসহ রাত্রিযোগে নেপালে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। ওয়াংহিউএন্‌সি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন। রাজনৈতিক সুযোগও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণের অনুকূল প্রতীয়মান হয়।

এই সময় ইতিহাসপ্রখ্যাত মহাবীর স্রং-শান-গাম্পো তিব্বতের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। ইনি ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরী সংস্থাপিত করেন; এবং ভারতীয় পণ্ডিতদিগের সহায়তায় তিব্বতীয় বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। নেপালরাজ অংশু বর্ম্মনের কন্যা ভ্রূকুটি দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। প্রবলপ্রতাপ চীন-সম্রাটও বলদৃপ্ত তিব্বত-রাজের বিজয় চমূর প্রবল পরাক্রমে অভিভূত হওয়ায় সম্রাটদুহিতা ওয়েন্ চেং তিব্বত রাজমহিষীরূপে বৃত হয়েন। এই খ্যাতনামা রাজমহিলাদ্বয় অর্থ-দক্ষ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা তিব্বতের ইতিহাসে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। আজিও তিব্বতের বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে "হরিৎ তারা" ও "শ্বেত তারা" বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপে ধর্ম্ম এবং বৈবাহিক বন্ধনে নেপাল, তিব্বত এবং চীন সাম্রাজ্য এক রাষ্ট্রীয় সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। সুতরাং পলায়িত চীন রাজ-দূত সহজেই তিব্বত ও নেপাল রাজের সাহায্য লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অবসর প্রদান করিল। তিব্বতরাজ এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান

করিলেন। নেপাল হইতে সপ্ত সহস্র যোদ্ধা সংগৃহীত হইল। ওয়াংহিউএন্‌সি এই সম্মিলিত বীর বাহিনী সমভিব্যাহারে হিমগিরি অতিক্রম করিয়া বঙ্গের সমতল ভূমিতে অবতরণ করিলেন। তদীয় প্রতিহিংসা-প্রণোদিত ক্রোধোন্মত্ত অভিযানের সম্মুখে ভারতের নেতৃবিহীন কলহ-বিচ্ছিন্ন জনপদসমূহ একে একে পরাজিত হইতে লাগিল। দিবসত্রয় ব্যাপী অবরোধের পর "ত্রিহুত" পরাজিত ও পতিত হইল। তিন সহস্র বঙ্গবীর বিপক্ষের অসির আঘাতে বীরনামের গৌরব রক্ষা করিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিলেন। দশ সহস্র নিরপরাধ নাগরিক নিকটস্থ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। বিজয়োন্মত্ত চীন অনীকিনীর বীর বিক্রমে মগধের সিংহাসন প্রকম্পিত হইল। রাজ্যাপহারী অরুণাশ্ব তস্করের মত পলায়ন করিয়া আপাততঃ প্রাণরক্ষা করিলেন। বিজেতার উন্মত্ত কৃপাণাঘাতে সহস্রাধিক বন্দীর মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত হইল। ৫৮০টি প্রাকারবেষ্টিত বৃহৎ নগরী বিজেতার পদ চুম্বন করিল। কামরূপাধিপতি কুমার বর্ম্মন প্রচুর পরিমাণে পশু, অশ্ব, যুদ্ধসজ্জা প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া বিজেতার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অরুণাশ্ব বহু চেষ্টায় কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার ভাগ্যপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী এবার তাঁহার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সপরিবারে শত্রুকরে বন্দী হইলেন। এইবার চীন রাজ-দূতের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হইল। প্রবল পরাক্রমে ধ্বংস, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের একশেষ করিয়া ত্রিশ সহস্র পশু, দ্বাদশ সহস্র বন্দী ও নানা মূল্যবান উপঢৌকন সহ তিনি সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভারতের বক্ষে কেবল অতীতের অত্যাচারকাহিনীর মসীরেখা চিহ্নিত রহিল।

শ্রীপঞ্চানন বিশ্বাস।

ক্রোধ।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত)

অপকারীপ্রতি হয় ক্রোধোদয় যবে,
ক্রোধের উপরে ক্রোধ কেন নহে তবে ?
চতুর্ব্বর্গপরিপন্থী যে ক্রোধ দুর্ব্বার
কি আর অহিতকারী সমান তাহার ?

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

অদৃষ্ট চক্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃসংবাদ।

আষাঢ়ের আরম্ভ। এবার আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নিদাঘের আকাশে বর্ষার সজলজলদসঞ্চার হয় নাই। আকাশে মেঘ নাই। বেলা প্রায় দশটা; ইহারই মধ্যে রৌদ্রতাপে ধরণী তপ্ত—বাতাসে অনলের স্পর্শ। প্রায় সকল বিহগ বিবার বন্ধ করিয়া পল্লবের ছায়াস্নিগ্ধ অন্তরালে বসিয়াছে। কাকের কা-কা রবও বড় শুনা যায় না। কেবল এক এক দল চড়াই কখন গৃহপ্রাঙ্গণে কখন রাজপথে নামিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাগান হইতে ফিরিলেন। পশ্চাতে ভৃত্য, তাহার স্কন্ধে ঝুড়ীতে বাগান হইতে সংগৃহীত আম্র—বর্ণ কাহারও হরিৎ, কাহারও হরিদ্রা, কাহারও হরিদ্রায় যেন সিন্দূর মিশ্রিত। দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভৃত্যকে বলিলেন, "আম্রগুলি নামাইয়া তামাক লইয়া আয়।" তিনি দ্বারপথে বেঞ্চে বসিলেন।

সম্মুখে রাজপথের পরপারে একটা ডোবায় সামান্য একটু জল ছিল। একটা সারমেয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া সেই জলে পড়িল। তাহার লোল জিহ্বা বহিয়া স্যন্দিকা ঝরিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন;—তাহার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিল।

রাজপথে প্রতিবেশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আজ যে স্নানে যাইতে এত বিলম্ব? বড় রৌদ্র।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "একটা হিসাব মিলিতেছিল না—মিলাইতে বিলম্ব হইল।"

"মিলিয়াছে ত?"

"হাঁ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের হিসাবনিকাশের সময় হইয়াছে; এখন মিলিলেই মঙ্গল।"

চট্টোপাধ্যায় তাম্রকূটধূমাকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীর দ্বারপথে প্রবেশ করিলেন;

বলিলেন, "আপনার পুণ্যের সংসার—পুণ্যের শরীর, আপনি ত হিসাব মিলাইয়াই বসিয়া আছেন। নিকাশের তলবে আপনার ভয় কি?"

"ভয় করিয়া কে কবে নিস্তার পাইয়াছে? সে তলব যে অমান্য করিবার উপায় নাই! আজও হিসাব খতাইয়া দেখিতেছিলাম। হিসাব মিলাইয়া আনিয়াছি, কিন্তু একটু অবশেষ যায় নাই। ভাবিয়াছিলাম, অগ্রহায়ণে সরোজার ও মাঘ বা ফাল্গুনে দেবীচরণের বিবাহ দিব। তাহার পর নীরজার বিবাহ দিলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাহা ত হইল না!"

"দেবীর বিবাহের কিছু স্থির করিলেন?"

"সম্বন্ধ ত আসিতেছে, কিন্তু স্থির করি কোথায়? যে দিকে টাকার আঁচটা অধিক বামাচরণের মত সেই দিকে। আমি বলিয়াছি, ও পাপ দরিদ্রের ঘরে ইচ্ছা করিয়া ঢুকাইব না। তিন ছেলের বিবাহে যে প্রলোভনে ভুলি নাই বৃদ্ধ বয়সে আর সে প্রলোভনে ভুলিব না। আমি ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় আমার অপমান নাই। কুটুম্বের টাকায় ধনী হইবার প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি চাহি ভাল ঘর, যে কুটুম্বের দোষে—বধূর দোষে সংসার ভাঙ্গিয়া না যায়।"

"ইহাই ত আপনার উপযুক্ত কথা।"

হুক্কা হইতে আম্রপত্রনির্ম্মিত নলটি খুলিয়া লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুক্কাটি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিলেন। হুক্কায় ভৃত্যদত্ত আর একটি নল পরাইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধূমপান করিতে লাগিলেন।

দূরে অশ্বযানের চক্রঘর্ঘর শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজপথে একখানি যান ধূলি উড়াইয়া দ্রুতবেগে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহের দিকে আসিতে লাগিল। যানখানি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহদ্বারে আসিয়া স্থির হইতে না হইতে বামাচরণ যান হইতে অবতরণ করিল। তাহার মুখ মলিন; সে মুখে আশঙ্কা সপ্রকাশ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্মিত ভাবে পুত্রের দিকে চাহিলেন। কারণ, ছেলেরা ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়াই গৃহে আসিত। তাহাদের গাড়ীতে না আসিবার কারণও একাধিক। প্রথমতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে সকলকেই মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে হইত। তিনি বলিতেন, যখন আহার্য্য পরিধেয় প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে তখন বিলাস বর্জ্জন করা ব্যতীত গৃহস্থের গত্যন্তর নাই। এ অবস্থায় যে বুঝিয়া চলিতে না শিখিবে তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি গৃহে সকল ব্যবস্থায় মিতব্যয়ী ছিলেন;

পুত্রকন্যাদিগকেও সে বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পল্লীগ্রামের অশ্বযান পল্লীপথে যেরূপে যাতায়াত করে তাহাতে সঙ্গে রমণী, রোগী, শিশু বা দ্রব্যবাহুল্য না থাকিলে সুস্থকায় পল্লীবাসীরা সহজে গাড়ীতে আইসে না। বর্ষায় পথে গুরুভার যানের চারি চক্র কর্দ্দমমুক্ত করা যেরূপ আয়াসসাধ্য মানুষের দুইখানি পদ কর্দ্দমমুক্ত করা সেরূপ আয়াসসাধ্য নহে—বর্ষা ব্যতীত অন্য ঋতুতে যানসঞ্চালনোত্থিত পরাগপ্রাচুর্য্যে যুবকের কৃষ্ণ কেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় যানে গমনাগমন সুখদ নহে।

কিন্তু আজ বিশেষ প্রয়োজনে বামাচরণ গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছিল। সে নামিয়াই পিতাকে বলিল, "ব্রজেন্দ্রের বড় অসুখ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ?"

"বিসূচিকা।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবালোক নিবিয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন হইয়াছে?"

বামাচরণ বলিল, "অদ্য প্রত্যূষে।"

যানচালক যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল। সে বামাচরণকে বলিল, "বাবু আমার ভাড়া দিয়া দিউন। ট্রেণের সময় হইল; আমি আবার ষ্টেশনে যাইব।"

বামাচরণ বলিল, "আমিও আবার ষ্টেশনে যাইব।"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ট্রেণ কখন যাইবে?"

বামাচরণ বলিল, "অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই একটা ট্রেণ আছে।"

"চল, আমি যাইব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভৃত্যকে ডাকিয়া একটি পিরাণ ও একখানি উত্তরীয় আনিতে আদেশ করিলেন এবং ব্রজেন্দ্রের চিকিৎসাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বামাচরণ বলিল, প্রত্যূষে ব্রজেন্দ্রের পীড়ার বিকাশ হয়। প্রভাতে সংবাদ পাইয়া সে তথায় গিয়াছিল। পিসীমা, রাধাচরণ ও দেবীচরণ তিনজনই তথায় গিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইতেছে। ডাক্তাররা বলিতেছেন, রোগ অত্যন্ত প্রবল।

এদিকে ভৃত্য যাইয়া অন্তঃপুরে সংবাদ দিল, বামাচরণ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখনই কলিকাতায় যাইতেছেন। শুনিয়া পার্ব্বতীচরণ বাহিরে আসিল।—সে সংবাদ শুনিয়া বলিল, "আমি যাই। আপনি আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে যাইবেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "না। তুমি বাড়ীতে থাক। আমি এখনই যাইব।"

বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিরাণটা পরিধান করিয়া লইলেন। তৎপরে উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ফেলিয়া তিনি "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বামাচরণ গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পার্ব্বতীচরণ বেঞ্চে উপবেশন করিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিলেন; এখন পার্ব্বতীচরণকে দুই চারিটি আশার কথা বলিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন।

অনুরোধ।

মরণের কোলে যবে রচিব শয়ন
চির-আকাঙ্ক্ষিত শয্যা, জীবনের পরে,
নামিবে অনন্ত রাত্রি আবরি' নয়ন,
সুমধুর শেষ হাসি মিলা'বে অধরে।
তখন, হে প্রেমময় দেবতা আমার,
ফেলিবে কি দু'টি ফোঁটা নয়নের ধার?
মরণে, হে প্রিয়তম, জীবনে যেমন
শীতল অধরে দিবে একটি চুম্বন?

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু

মানব-প্রহেলিকা।

জড় ও জীব।

Nature ! We are surrounded and embraced by her : powerless to seperate ourselves from her and powerless to penetrate beyond her.-- Goethe.

ধরাতলে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানবের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। একদিকে মানুষ পশুমাত্র,—আর এক দিকে মানুষ দেবতা। এক দিকে মানুষ জড়পিণ্ড মাত্র—আর এক দিকে মানুষ আধ্যাত্মিকতার অবতার। তির্য্যক প্রাণীতে যে মানসিক শক্তির ক্ষীণ উন্মেষমাত্র দৃষ্ট হয়—মানবে তাহার পূর্ণ পরিণতি পরিলক্ষিত হইতেছে। মানুষের দেহ ধূলিকণায় গঠিত, কিন্তু সেই মানুষই ক্রমশঃ সমস্ত জড়জগতের উপর আধিপত্য বিস্তৃত করিতেছে। এই মানুষই দেবভাবপ্রণোদিত হইয়া পরের জন্য অকাতরে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছে,—আবার পশুভাবের তাড়নায় ক্রোড়স্থ শিশুকে দানবের ন্যায় নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মানবের মত বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝি বিধাতার সৃষ্টিতে আর নাই। মানবই বিধাতার পার্থিব সৃষ্টির চরম প্রহেলিকা।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মনীষাসম্পন্ন মহাত্মগণ এই মানব-সমস্যার সমাধানকল্পে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া আসিতেছেন। নানা ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও এই বিষয়ে নানাবিধ সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন,—“বিধাতা স্বর্গীয় দূতের আদর্শে নূতন ছাঁচে মানুষ গড়িয়াছেন।” মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতও অনেকটা ঐরূপ। হিন্দুর মত এই যে, জীব একেবারেই মানব-দেহ প্রাপ্ত হয় নাই। অশীতিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, অশীতিলক্ষ দেহ ধারণ করিয়া, পরে জীবাত্মা কর্ম্মানুসারে মানব-দেহ ধারণ করিবার সামর্থ্যলাভ করে। জীবের দেহ-ধারণ সাধনা-সাপেক্ষ। ইহা ভিন্ন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মার মানস সৃষ্টির কথাও আছে। অন্যান্য দেবতারাও ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনমতে মানস পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন,—ইহাও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উক্তি। বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমি ধর্ম্মশাস্ত্রের এই কথার আলোচনা

করিতে চাহি না; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বাধীন ভাবে তথ্য-সংগ্রহ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিকগণ জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। (১) জড় জগৎ, (২) জীব জগৎ। জড় পরমাণু, দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু প্রভৃতির সমবায়ে, বিবর্ত্তনে—এই বিশ্বের সমস্ত জড় পদার্থই উদ্ভূত হইয়াছে। পরমাণু নিত্য, উহার সৃষ্টিও নাই বিনাশও নাই। সৃষ্ট পদার্থের ধ্বংস হয়—অণু পরমাণুর ধ্বংস নাই। কিরূপে পরিদৃশ্যমান জড় পদার্থের উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি জড় বিজ্ঞান বিশেষরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন জড়ের গতি ও চাঞ্চল্য (motion) আছে।

কিন্তু জীব-জগৎ এখনও মানবের সমক্ষে বিষম প্রহেলিকারূপে দণ্ডায়মান। জড় ও জীব জগতের মধ্যে একটা বিরাট বৃতি রহিয়াছে। জীব-জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা (১) উদ্ভিদ জগৎ ও (২) প্রাণী জগৎ। উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত জীবের মধ্যে একটা সাধারণ উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় উহাকে protoplasm বলে। আমরা বাঙ্গালায় উহাকে 'জৈব উপাদান' বলিব। উদ্ভিদে ও প্রাণীতে উহা বিদ্যমান আছে। জড় পদার্থে উহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ জড় পদার্থ-দ্বারা উহা প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ইহা গাঢ় (শুষ্ক নহে) জিউলের আটার ন্যায় পদার্থ। ইহাতে অ্যাল্‌বুমেনের মত পদার্থ আছে। অঙ্গার ইহার একটি উপাদান। ইহা জীবের পুষ্টির ও প্রজনন-শক্তির কারণ। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হইতেই জীবের অনুভূতি ও গতি-শক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী এই উভয় জাতিরই পরিপাকশক্তি আছে। বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া উহারা পরিপাকশক্তির সাহায্যে ভুক্ত বস্তুর সমস্ত বা কিয়দংশ আপনাদের দৈহিক উপাদানে পরিণত করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অল্পাধিক পরিমাণে আপনাদের অবস্থার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে সমর্থ। চতুর্থতঃ জীবিত অবস্থায় ইহাদের দেহ হইতেই বংশধর জন্মিবার বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন জীবমাত্রেরই অনুপলব্ধ স্মৃতি (functional memory) আছে। অনুপলব্ধ স্মৃতি কি তাহা বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। ইহার অর্থ এই যে, জীব-মাত্রেরই দৈহিক ধর্ম্ম অনুসারে যান্ত্রিক

ক্রিয়ার মত অনুকূল অবস্থায় এক প্রকার স্মৃতি উদিত হইয়া থাকে; কিন্তু যাহার মনে সেই স্মৃতি উদিত হয়, সে তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জড়বাদীরা বলেন যে, অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবেরও এই শক্তি আছে যে, তাহারা অতীত অভিজ্ঞতাটি একেবারে বিস্মৃত হয় না; যেরূপ অবস্থায় তাহারা ঐ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, ঠিক সেইরূপ অবস্থায় পুনরায় পতিত হইলে তাহারা যন্ত্রের ন্যায় ঠিক সেই অভিজ্ঞতা-জনিত কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। দেহস্থ যন্ত্রগুলি যেমন দেহীর অজ্ঞাতে আপনাপন কার্য্য করিয়া যায়, তাহারা যে কার্য্য করিতেছে দেহী তাহা যেমন কিছুই বুঝিতে পারে না,—দেহস্থ কোষ, (cells) তন্তু (tissue) এমন কি মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সেইরূপ দেহীর অজ্ঞাতে অতীত কালে অর্জ্জিত স্মৃতির পুনরাবৃত্তি—করে। বৈজ্ঞানিকগণ এই অনুপলব্ধ স্মৃতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন; যথা কৌষিক স্মৃতি (Cellular memory), মাংসজ স্মৃতি (Histionic memory) ও অজ্ঞাত স্মৃতি (Unconscious memory)। ইহার শেষোক্ত স্মৃতি স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট প্রাণী ও মানুষেই লক্ষিত হইয়া থাকে। আর প্রথম দুইটি জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম।

এই ব্যাপারটি একটি বিষম প্রহেলিকা। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সম্পূর্ণ তথ্য-নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন নাই। স্মৃতি পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত বাহ্য বস্তুসম্বন্ধে ধারণার পুনরুদ্ভবমাত্র। সেই ধারণাটি কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে অনুকূল অবস্থায় বা পূর্ব্ব অবস্থার পুনঃ সংঘটনে সেই পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার আবার জাগিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, জীবদেহের উপাদানগুলির ক্রমাগত অপচয় ও উপচয় হয়। কোষ, মাংস ও মস্তিষ্কের উপাদান প্রভৃতি সমস্তই কিছু কালের মধ্যে আবার সম্পূর্ণ নূতন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় সেই বহু দিন পূর্ব্বের অর্জ্জিত ধারণা বা সংস্কার ধরিয়া রাখে কে? সমস্যা ঐ স্থানেই। দ্বিতীয়তঃ ধারণা যখন জন্মে তখন ধারণাসম্বন্ধে ধারণাকর্ত্তার কোন বোধ (consciousness) উদ্রিক্ত হয় না,—ইহাও বিচিত্র ও রহস্যময়। কিন্তু সমস্ত জীব-জগৎ ব্যাপিয়া এই স্মৃতির লক্ষণ বিরাজমান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পায়েন, তাহা নিতান্তই গোঁজামিল। *

* অনুপলব্ধ স্মৃতি সম্বন্ধেই জনৈক পাশ্চাত্য নাস্তিক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন,—The intrinsic nature of this fundamental quality of living matter is altogether

এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ আমি একটি কথা বলিব। প্রাচীন হিন্দুরা এই সমস্যার একটা সমাধান করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদিগের সিদ্ধান্ত এই যে. সমস্ত জীবের, এমন কি উদ্ভিদেরও, 'আত্মা' আছে। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সমস্ত উদ্ভিদ পদার্থ অত্যন্ত তমোগুণে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও ইহাদের সুখ দুঃখ বোধ হইয়া থাকে এবং ইহাদের অন্তঃসংজ্ঞা (internal consciousness) আছে। *

এই মত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের সম্পূর্ণ অনুমত নহে। কতকগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ ত দূরের কথা, মেরুদণ্ডহীন জীবগুলিরও অন্তঃসংজ্ঞা ও সুখদুঃখ-বোধ আছে, ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে. দেহে যে যে যন্ত্র থাকিলে সংজ্ঞার (consciousness) উদ্ভব হয়. ইহাদের সেই সেই যন্ত্র নাই ; অতএব উহারা সংজ্ঞাহীন। অধুনাতন শারীর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নানা পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মস্তিকের স্থানবিশেষই (cortex) সংজ্ঞার উৎপত্তি-স্থান। আবার কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, স্নায়ুমণ্ডল কতকটা উন্নত হইলে জীবের সংজ্ঞার বা চেতনাবোধের উন্মেষ হয়। সুতরাং যাহার মাথা নাই তাহার যেমন মাথাব্যথা অসম্ভব, যে জীবের মস্তিষ্ক নাই ও স্নায়ুমণ্ডল আবশ্যক পরিণতিপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারও তেমনই সংজ্ঞা বা চেতনাবোধ অসম্ভব। আপাততঃ দৃষ্টিতে এই যুক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হইলেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হইবে না। পরিবীক্ষণ (observation) দ্বারা জানা গিয়াছে,—জীব যতই উন্নত স্তরে আরূঢ় হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ তাহার দেহের বিবিধ যন্ত্র গঠিত হয় এবং দেহস্থ 'জৈব উপাদান' (protoplasm) গুলিও এক একটি বিশেষ যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এক একটি বিশেষ কার্য্য করিতে থাকে। উন্নত জীবদেহে এইরূপ জৈব উপাদানের কার্য্য বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিম্ন স্তরের জীবের ঐরূপ বিভিন্ন যন্ত্র না থাকিলেও তাহার দেহের সমস্ত জৈব উপাদানগুলিকেই সকল কার্য্য

---

incomprehensible, and imagination strives in vain to form some conception of it.. Yet it is indisputable that living matter possesses this quality. Its existence is manifest throughout the whole animate world from the simple cell to the most complex organism,—Alfred Hook.

* তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

মনু ১।৪৯

করিতে হয়। মনেরা (monera) নামক অতি সূক্ষ্ম জীবগুলির পাকস্থলী নাই, চক্ষু নাই, জননেন্দ্রিয় নাই, কিছুই নাই; আছে কেবল সামান্য ঝিল্লিবৎ পদার্থে আবৃত একটু জৈব উপাদান। কিন্তু তথাপি তাহারা আহার করে, পরিপাক করে, সঞ্চরণ করে ও বংশবৃদ্ধিও করিয়া থাকে। অ্যামিবা (amoeba) নামক ক্ষুদ্র জীবের কোনও ইন্দ্রিয়ই নাই; কেবল তাহাদের দেহের মধ্যস্থ জৈব উপাদানের মধ্যে একটি স্থান অপেক্ষাকৃত অধিক ঘন। কিন্তু তথাপি ইহারা খাদ্যের অন্বেষণে ছুটাছুটি করে ও খাদ্য সম্মুখে পাইলেই তাহা ভক্ষণ করে। মানুষের ন্যায় সর্পের সুদীর্ঘ চরণ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ অপেক্ষা সাপ মন্দ চলে না। সুতরাং জীবদেহে কোনও যন্ত্র সপ্রকাশ না হইলেই সেই যন্ত্রের কায যে একেবারেই হয় না,— এ কথা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায় না।

উদ্ভিদ ও নিম্ন প্রাণীরা সংজ্ঞাবান কি সংজ্ঞাহীন, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে উহাদের সংজ্ঞাবত্তার কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় কি না, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। সংজ্ঞা দ্বিবিধ; অন্তঃসংজ্ঞা (self-consciousness) ও বহিঃসংজ্ঞা (world-consciousness)। এই উভয়বিধ সংজ্ঞার অস্তিত্বসম্বন্ধে সেই সংজ্ঞাবান জীব ভিন্ন অন্য কেহই সাক্ষ্য দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) একই। সেই জন্য ইহাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আমলে আনিবার উপায় নাই। অন্যের সংজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার ইহাই প্রধান অন্তরায়। তবে বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ইহার অস্তিত্ব কতকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। আর যে জীবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিতেছি, সেই জীব যদি কতকটা মানুষের মত করিয়া ঐ বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা হইলে উহার অস্তিত্বসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতকটা নিশ্চিত হইতে পারে; নতুবা নহে। * উদ্ভিদ ও নিম্নস্তরের জীবগণ যে ঠিক মানুষের মত চেতনা-বোধের লক্ষণ প্রকাশ করিবে, এরূপ আশা করাই বিড়ম্বনামাত্র।

তথাপি বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ক্রটী করেন নাই। লজ্জাবতী প্রভৃতি লতা (mimosa, drosera, dionoea) মানুষের স্পর্শে মুদিতা হয়; জয়ন্ত্রী প্রভৃতি বৃক্ষের শাখাসঞ্চালন ও নিদ্রালু বৃক্ষের (papilionacea) নিদ্রা-লক্ষণ প্রকটন দেখিয়া জীব-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত

* Vide Haeckel's 'Riddle of the Universe'.

করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ জাতি সংজ্ঞাহীন নহে। এক প্রকার মাংসাশী বৃক্ষ নাকি নিকটে জীব আসিলেই শাখাপল্লব আস্ফালন করিতে থাকে। আমরা দেখিয়াছি, যে স্থানে গাঁজা পোড়ান হয়, তাহার সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত (দগ্ধ না হয় এইরূপ দূরে অবস্থিত) লতার ডগাগুলি গাঁজার বিপরীত দিকে ফিরিয়া যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া Fechner প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ উদ্ভিদগণের অতি ক্ষীণ চৈতন্য-বোধের ও উদ্ভিদ আত্মার (vegetal soul) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের মতের সহিত এই মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, হিন্দুদিগের বিশ্বাস, জীবাত্মা কর্ম্মানুসারে উদ্ভিদ-যোনিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন ইহার চৈতন্য তমোগুণে আবৃত হওয়াতে মোহাচ্ছন্ন ও জড়ীভূত হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উদ্ভিদাত্মা উদ্ভিদের দেহের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। আর এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকরা বলেন,—উদ্ভিদ ও নিম্ন স্তরের প্রাণীর আত্মা ও সংজ্ঞা (consciousness) নাই। তাহাদের উপর্য্যুক্ত ভাবাভিব্যক্তির লক্ষণ সংজ্ঞা-দ্যোতক নহে,—চেতনা-বোধের সহিত উহার কোনও সম্পর্কই নাই। মানুষের হৃদ্-স্পন্দন, রক্ত-সঞ্চালন, প্রভৃতি যান্ত্রিক ক্রিয়া যেমন প্রাকৃতিক নিয়মবশেই মানবের অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়, ইহাও অনেকটা সেইরূপেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐ কার্য্যগুলি কতকটা যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় সম্পাদিত হয়। জড়বাদীরা প্রায় সকলেই শেষোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া থাকেন।

আর এক কথা, সর্ব্বজীবে সংজ্ঞার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে বিবর্ত্তনবাদ (Theory of evolution) ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ (Theory of natural selection) বুঝা অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। সেই জন্য কোন কোন বৈজ্ঞানিক সর্ব্বজীবে সংজ্ঞার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া থাকেন। কথাটা পরে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

ফলে উদ্ভিদ ও নিম্ন শ্রেণীর তির্য্যক প্রাণিগণের চেতনাবোধ আছে কি না,—এ সম্বন্ধে এখনও কোনও মতই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয় নাই। এই ব্যাপারটি একটি বিষম সমস্যা। স্বল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে ইহার সমাধান সম্ভব হইবে কি না, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্বে যে 'জৈব উপাদানের' কথা বলা হইয়াছে, তাহা দুই দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এক দিকে উহা সামান্য, অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু

হইতে ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিলেন। এবার ঐ কাচপাত্রে একটিও
আর এক দিকে উহা অতি সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষ [illegible] নানারূপ
সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য মানব পর্য্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আম [illegible]
কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণীর কথারই আলোচনা করিব।

এই স্থানে আবার একটা দুরূহ সমস্যা বর্ত্তমান। পৃথিবীতে এই জৈব পরমাণুর আবির্ভাব হইল কোথা হইতে? এই প্রহেলিকা লইয়া বহুকাল ধরিয়া বিষম বিতর্ক ও সতর্ক অনুসন্ধান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার কোনও মীমাংসাই হয় নাই, সাধারণ মানুষের বুদ্ধির দ্বারা যে ইহার কোনও মীমাংসা হইবে এমন আশা করিবারও স্পষ্ট লক্ষণ এখন দেখা দেয় নাই। এই ব্যাপার লইয়া দুইটি দলের আবির্ভাব হইয়াছে। এক দলের নাম একবাদী (Monist), আর এক দলের নাম দ্বিবাদী (Dualist)। এখন এই দুই দল নাম ভাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে প্রথমোক্ত দলের নাম ছিল জড়বাদী (Materialist) আর দ্বিতীয়োক্ত দলের নাম (Spiritualist)। জড়বাদীরা জড় পরমাণু ও তাঁহার শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই নিত্যতা স্বীকার করেন না। ইহাঁরা বলিয়া থাকেন, এই বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম, জড়, অজড়, সমস্তই জড় পরমাণু হইতে সমুদ্ভূত। যাহাকে আমরা চৈতন্য বলি, তাহা জড়েরই শক্তি-বিশেষ। অনুকূল অবস্থা পাইলে জড়ের সেই শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে,—অনুকূল অবস্থার বিপর্য্যয় হইলে সেই শক্তি আত্মগোপন করে। জড়ে এই চিচ্ছক্তির বিকাশ ও লয়ই জীবের জন্ম মরণের রহস্য। জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

দ্বিবাদী বা আত্মবাদীরা জড় ও আত্মা দুইটির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। ইঁহারা বলেন, চৈতন্য আত্মারই শক্তি, উহা জড়ের শক্তি নহে। জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে—ইহার একেবারেই কোনও প্রমাণ নাই। যখন দেখা যাইতেছে, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়, জীব বিনা জীবের উৎপত্তিই সম্ভবে না,—তখন আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিলে উপায় নাই। তবে যদি কখনও জড় হইতে স্বতঃই চৈতন্যের বিকাশ হইতেছে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সপ্রমাণ হয়, তখন চৈতন্য জড়েরই শক্তি বলিয়া স্বীকার করা যাইবে। নতুবা নহে।

জড়বাদিগণও নিশ্চেষ্ট নহেন। জীব জড় পদার্থের বিকার বা রাসায়নিক বিকৃতির ফল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে-

করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ জাতি সংজ্ঞাহীন নহে। এক [illegible] নাকি নিকটে জীব আসিলেই শাখাপল্লব [illegible] এচ, সি, বেষ্টিয়ান নামধেয় [illegible] দেখিয়াছি. [illegible]বিৎ জড় হইতে জীবের উৎপত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য [illegible] যত্ন করিয়াছিলেন। ইনি ইঁহার Beginnings of Life নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—Both observation and experiment unmistakably testify to the fact that living matter is constantly being formed *de novo* in obedience to the same laws and tendencies which determine all the simple chemical combination অর্থাৎ "পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষণ নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই সত্য সপ্রমাণ করিতেছে যে, যে প্রাকৃতিক নিয়মের ও ঝোঁকের ফলে ভৌতিক উপাদানের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিতেছে, সেই নিয়ম ও ঝোঁকের ফলে জড় উপাদান হইতেই জগতে নূতন নূতন জীবের আবির্ভাব হইতেছে।" ইনি এ বিষয়ে যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ ;--কতকটা তৃণাদি পচা জলে একটি কাচ পাত্রের তিনভাগ পূর্ণ করিয়া ঐ পাত্রস্থ সমস্ত জীবাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ঐ তৃণ-পচা জলে বিলক্ষণ উত্তাপ প্রদত্ত হইত। সর্ব্বপ্রকার জীবাণু-নাশের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া ঐ পচা জল ফুটান হইত। বলা বাহুল্য, ঐ কাচপাত্রের মুখ এরূপ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখা হইত যে, বাহিরের বাতাস উহার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ-লাভ করিতে পারিত না। ঐরূপ উত্তাপ প্রদানের ফলে পাত্রস্থ জীবগুলি মরিয়াছে, ইহাই তখন মানিয়া লওয়া হয়। তাহার পর জল ঐরূপ বদ্ধ অবস্থাতেই কিছুদিন রাখিয়া দিলেই উহার ভিতর লক্ষ লক্ষ জীবাণু বা জীব নৃত্য করিতেছে দৃষ্ট হইল। তখন জড় হইতে জীবের উৎপত্তি সপ্রমাণ হইল বলিয়া অনেকেই বিস্মিত হইলেন। নাস্তিক মহলে আনন্দ-নৃত্য আরব্ধ হইল।

বিখ্যাত দেহ-বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক জন টিণ্ডাল বহুবার এই পরীক্ষা করেন। তৃণাদি পচা জল জীবশূন্য করিবার জন্য তিনি নানারূপ উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ফল পূর্ব্ববৎই হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সন্দেহ জন্মিল যে, কাচপাত্রের মধ্যস্থ বায়ু একেবারে জীবশূন্য হয় না। সেই জন্য তাঁহার মনে প্রশ্ন উদিত হইল যে, যদি কাচপাত্রমধ্যস্থ বায়ু অত্যন্ত সাবধানতার সহিত একেবারে প্রাণিশূন্য করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ স্বয়ম্ভুতিসম্পন্ন জীবের উদ্ভব হয় কি না? বিজ্ঞানসম্মত অতি সতর্ক পরীক্ষার দ্বারা যে বায়ুমণ্ডল জীবশূন্য বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করিলেন, সেই বায়ুমণ্ডলে

তিনি ঐরূপ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিলেন। এবার ঐ কাচপাত্রে একটিও জীবাণু দেখা দিল না। তাহার পর তিনি নানাদিক দেখিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অন্য অনেক বৈজ্ঞানিকও ঐরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সকল আপত্তি বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল। শেষে দেখা গেল যে, বায়ুমণ্ডল একেবারে জীবশূন্য হইলে ঐরূপ তৃণাদি পচাজলে কিছুতেই জীবাণু আবির্ভূত হয় না। ফলে এবার য়ুরোপে নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদিগেরই পরীক্ষার ফলে য়ুরোপীয় আস্তিক্য-বাদ জয়যুক্ত হইল। *

আর এক কথা। ডালিঙ্গার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন যে, নিম্নস্তরের জীবগুলি মরিতেই চাহে না। ডাক্তার বেষ্টিয়ান যেরূপ উত্তাপ লাগাইয়াছিলেন, সেরূপ উত্তাপে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী অক্লেশে জীবিত থাকে। অনেক জীব অগ্নি ভিন্ন আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। আবার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের যত উন্নতি হইতেছে, ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবের অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। সুতরাং অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সন্ধান পাওয়া যায় না এরূপ জীবের (Ultramicroscopic germs) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, যে সকল জীবাণুর দ্বারা পচনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহারা শেষ অবস্থায় অনুবীক্ষণাতিগ (Ultramicroscopic) জীবের উৎপত্তি করিয়া থাকে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জীব হইতেই জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মতকে প্রাণী হইতে প্রাণিজনন (biogenesis) বলে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

---

* কেম্‌ব্রিজের শ্রীযুত যে, বাটলার বার্ক বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষাগারে (Laboratory) জড় ও জন্তুর মাঝামাঝি এক প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। এখনও জার্ম্মণীর বিখ্যাত জড়বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক অসোয়াল্ড দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, শীঘ্রই জড় হইতে জীবের উৎপত্তি করা সম্ভব হইবে।

য়ুরোপ-ভ্রমণ।

ফ্লরেন্স।

প্রাতে ১০টায় রোম হইতে বহির্গত হইয়া বেলা ২॥০টার সময় ফ্লরেন্স পৌঁছিতে হয়। পথে রেলের দুই ধারে পাহাড় ও জঙ্গল, মাঝে মাঝে কর্ষিত প্রান্তর ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র। পাহাড়গুলি সবই লতাপাদপমণ্ডিত, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের নিম্নগ অঙ্গে দ্রাক্ষাক্ষেত্র। ফ্লরেন্সের অনেক দূর হইতে আর্ণো নদী রেলের পাশে পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চলিতেছে, দেখা যায়।

আমার সহিত গাড়িতে সহযাত্রী একজন জার্ম্মাণ চিকিৎসক ছিলেন। ভদ্রলোক প্রাচীন ও প্রবীণ। তাঁহার ইংরাজি ভাষাতে ব্যুৎপত্তিও যথেষ্ট। নানা সদালাপে সময় কাটিল।

ফ্লরেন্স অতি সমৃদ্ধিশালী ও অতি সুন্দর নগর। বাস্তবিক ফ্লরেন্সে একটি মাধুরী ও Holiday garbএর ভাব আছে যাহা আর কোনও স্থানে দেখি নাই। সহরটি বেশ বড়, কিন্তু এ সহরে যে লোক দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ করে বা অন্নের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে তাহা সহজে অনুভব করা যায় না।

ফ্লরেন্সে প্রাসাদ অনেক, বাস্তবিক কলিকাতা অপেক্ষা ফ্লরেন্সই বোধ হয় City of Palaces নামের অধিক উপযুক্ত। বহু পুরাকালীন প্রাসাদে বড় বড় কড়া লাগান আছে, তাহাতে সেকালে মশালধারীরা মশাল আটকাইয়া রাখিত। ফ্লরেন্স শিল্পকলাপ্রসিদ্ধ ইটালির মধ্যে শিল্পকলার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শিল্প বলিতে যাহা কিছু বুঝায় ফ্লরেন্সে সে সমস্তই খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই প্রাসাদগুলিও স্থাপত্য হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য সকলই ফ্লরেন্সে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক হিসাবেও ফ্লরেন্সে সাভানোরোলা স্বদেশভক্তির যে সব উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে।

চিত্রসম্বন্ধে ফ্লরেন্সে Pitti ও Uffizzi প্রাসাদদ্বয়স্থিত গ্যালারি দুইটি জগদ্বিখ্যাত। য়ুরোপে আমি অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিয়াছি; প্যারিস, লণ্ডন, ব্রসেলস্, এনভার্স, এমষ্টারডাম, কলোন, মিলান, রোম সর্ব্বত্রই

গ্যালারি, প্রায় অনেক স্থানেই একাধিক গ্যালারি, অনেক চিত্র, কিন্তু এক ফ্লরেন্সে এই দুইটি গ্যালারিতে যত ভাল ভাল ছবি আছে অন্যত্র সর্ব্ব সংগ্রহের সমষ্টি তদপেক্ষা অধিক হইবে না। এই দুইটি গ্যালারি আর্ণো নদীর দুই ধারে স্থিত, নদীর উপর দিয়া সেতু বাঁধিয়া ইহাদিগকে যুক্ত করা হইয়াছে। এই সেতুর দুই পার্শ্বে দেওয়ালে ক্রমাগত ছবি। তদ্ভিন্ন গ্যালারি দুইটির কক্ষগুলি পাশাপাশি রাখিলে বোধ হয় প্রায় এক মাইল লম্বা হইবে। প্রত্যেক ঘরে অনেক ছবি, মধ্যে মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি। র‍্যাফেল, টিসিয়ান প্রভৃতি চিত্রকরের অধিকাংশ চিত্রই এই গ্যালারিদ্বয়ে রক্ষিত; আর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেদিচি পরিবারের (Medicis) সংগৃহীত অনেক চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে।

একটি অষ্টকোণ কক্ষে এই দুই গ্যালারির সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি রক্ষিত। তন্মধ্যে Venus de Medici, Group of Wrestlers and Satyr নামক প্রস্তরমূর্ত্তি এবং র‍্যাফেলের Madonna with the Goldfinch, এবং Pope Julius II. টিসিয়ানের Venus of Orbino এবং Venus and Cupid এবং ডুরারের Adoration of the Magi নামক শিল্পকীর্ত্তির কথা সকলেই শ্রুত আছেন।

র‍্যাফেলের অঙ্কিত অনেক চিত্র এই দুইটি গ্যালারিতে দেখা যায়। কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে একক রক্ষিত। এই সব চিত্রের বর্ণ অতি আশ্চর্য্য রকম ফলান; দেখিলে কিছুতেই বুঝা যায় না যে, এই মাত্র অঙ্কিত নহে। এই সব বর্ণের উপাদান নাকি আজকাল কেহ জানেন না। শুনিতে পাইলাম, প্রসিদ্ধ মার্কিণ ধনকুবের পিয়ারপঁত মর্গান নাকি এই গ্যালারির একখানি চিত্রের জন্য তিন কোটি মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইতালির গভর্ণমেণ্ট চিত্র বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। আজকাল আইন হইয়াছে যে, পুরাতন কোনও চিত্র ইটালি দেশ হইতে রপ্তানি করা যাইবে না।

এই সব চিত্র এত মনোহর যে, বোধ হয় যদি প্রতিদিন নিয়ত দেখা যায় তবুও বিরক্তি বোধ হয় না এবং নূতনত্ব যায় না।

ফ্লরেন্সের ইতালিয় নাম ফাইরেনসে (Firenze).

একটি প্রাসাদ (Palazzo Vecchio) আজকাল টাউনহল রূপে ব্যবহৃত। 'রমলা' পাঠকের নিকট এই প্রাসাদ সুপরিচিত, এইস্থানে ডিউক Cosimoর আবাসগৃহ ছিল এবং দ্বিতলের এক গৃহে সাভানারোলার বিচার হয়

প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি অতি বৃহৎ মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত এবং সম্মুখের সানবাঁধান উঠানে যে স্থলে সাভানারোলাকে জীবন্তে দাহ করা হইয়াছিল সেই স্থানে একটি সুন্দর প্রস্রবণ স্থাপিত। প্রাসাদে সাভানারোলার মর্ম্মরমূর্ত্তি বিদ্যমান।

প্রাসাদ ভিন্ন স্থাপত্য বিদ্যার পরাকাষ্ঠা ফ্লরেন্সে অনেক ভজনালয়ে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইটালিতে গির্জ্জা অনেক, ফ্লরেন্সের গির্জ্জা যতগুলি আমি দেখিয়াছিলাম সবগুলিই অতি সুন্দর মর্ম্মরনির্ম্মিত এবং দুর্লভ কারু-কার্য্যমণ্ডিত। দুইটি দেখিয়াছিলাম, অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া বহুমূল্য মণিমুক্তাবিমণ্ডিত।

ফ্লরেন্সের কেথিড্রাল বা প্রধান ভজনালয়টি খুব বৃহৎ এবং ব্রুণেলেস্‌কি (Brunelleschi) নামক প্রসিদ্ধ স্থপতি-নির্ম্মিত গম্বুজবিশিষ্ট। অনেক ভাস্করের নির্ম্মিত মূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপিত। প্রকাণ্ড দরজা দুইটি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে ক্যাম্পেনাইল নামক প্রসিদ্ধ উচ্চ স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি কত উচ্চ তাহা এক কথায় বুঝাইতে হইলে বলা যায় যে, কুতবমিনার অপেক্ষা ইহা তিনগুণেরও অধিক উচ্চ। প্রস্তর-নির্ম্মিত এত উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে আর নাই। এক লৌহনির্ম্মিত ঈফেল টাওয়ার ইহার অপেক্ষা উচ্চ। অন্য পার্শ্বে ব্যাটিষ্টেরো (Battistero) নামক প্রসিদ্ধ অষ্টকোণ গৃহ। ইহার তিনজোড়া ব্রোঞ্জনির্ম্মিত দ্বার অতি সুন্দর Relief work বিভূষিত।

ইটালিতে ভিক্ষুক ও সচিত্র পোষ্টকার্ডবিক্রেতার অত্যন্ত উৎপাত। আমি যখন নিবিষ্টচিত্তে ব্যাটিষ্টেরোর দ্বার দেখিতেছিলাম তখন একজন সচিত্র পোষ্টকার্ডবিক্রেতা আসিয়া ক্রমাগত বিরক্ত করিতেছিল। আমি যখন রাগিয়া লাঠি ধরিলাম, সে চীৎকার করিয়া লোক জড় করিল। আমার সেথোর পরামর্শে আমরা সরিয়া পড়িলাম। নচেৎ বোধ হয় বিপদে পড়িতে হইত। কারণ, ইতালিয় ইতর লোক ছুরিকা ব্যবহার করিতে সিদ্ধহস্ত

স্যানলরেঞ্জো নামক গির্জ্জায় প্রসিদ্ধ মেডিচি পরিবারের সমাধিস্থান। একটি প্রকাণ্ড গোলাকার গৃহে তাঁহাদের শবাধার সংরক্ষিত, অনেকের প্রস্তরমূর্ত্তি ও অনেক অতি সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তিতে এই সমাধিস্থল সুসজ্জিত। দেখিলে মনে অতি গম্ভীর ও পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

সাণ্টা ক্রোসে (Santa Croce) নামক আর একটি পুরাতন গির্জ্জা

উল্লেখযোগ্য। বাহির হইতে দেখিতে বিশেষ ভাল নহে। ঢুকিয়া প্রথমে একটি দরদালানের মত দেখা যায়, তাহার ছাতে অনেক চিত্র ছিল এখন প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। ভিতরে অনেক প্রসিদ্ধ ইতালিয়ের গোর ও স্মৃতি-স্তম্ভ বিরাজমান। মিকেলেঞ্জেলো আল্‌ফিয়েরি ম্যাকিয়াভেলি প্রভৃতি এই স্থানে মহানিদ্রায় শয়ান। তদ্ভিন্ন এই স্থানে দান্তে ও গ্যালিলিয়ো প্রভৃতির মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা রসিনিরও সমাধি আছে; অনেক সুন্দর Frescoe ও মর্ম্মরের রূপক মূর্ত্তিগুচ্ছ আছে। বলা উচিত, ফ্লরেন্সের সকল প্রাসাদে ও গির্জ্জায় Mosaicsএর অত্যন্ত ছড়াছড়ি।

সান্টা মেরিয়া নোভেলা (Santa Maria Novella) নামক আর একটি গির্জ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার এক পার্শ্বে Old Cloisters দেখা যায়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা কিরূপ ভাবে বাস করিতেন এই স্থানে তাহা দেখা যায়। ছোট ছোট অন্ধকার ঘর, কোনও রূপ শিল্প-কার্য্য নাই; অথচ পার্শ্বেই সুন্দর ভজনালয়, বহুমূল্য চিত্র মূর্ত্তি প্রভৃতির দ্বারা পরিশোভিত।

আর্ণো নদীর দুই ধারেই ফ্লরেন্স নগর অবস্থিত। নদীর উপর অনেকগুলি সেতু বিদ্যমান। পিটি প্রাসাদ হইতে উফিজি প্রাসাদ পর্য্যন্ত যে সেতুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা অবশ্য আবৃত এবং রাস্তা হইতে তাহাতে যাওয়া যায় না। তাহার পার্শ্বেই পন্টি ভিচিও (Ponte vecchio) নামক সেতু। তাহার দুই পার্শ্বে অনেক সুন্দর সুন্দর মণিকারের দোকান।

সহরের উপকণ্ঠে অনেক সুন্দর সুন্দর উপবন-বাটিকা দেখা যায়। এই সব স্থানে বিভিন্ন দেশীয় অনেক লোক স্থায়িভাবে বাস করেন। আমি যখন যাই, 'ট্রুথ' পত্রিকার ল্যাবুসিয়ার একটি বাটীতে বাস করিতেছিলেন।

পিটি প্রাসাদের পার্শ্বে ববোলি উদ্যান (Boboli Gardens) অতি রম্য কানন। কিছু দূরে একটি উচ্চ ভূখণ্ডে Piazzale Michelangelo নামক একটি Square এর ন্যায় স্থান আছে। তথা হইতে পরিদৃশ্যমান ফ্লরেন্স চতুঃপার্শ্বস্থ পাহাড় প্রভৃতির দৃশ্য অতি মনোহর।

ফ্লরেন্সে এখনও অতি সুন্দর Mosaic প্রস্তুত হয়। শ্বেত পাতরে নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড বসাইয়া চিত্র অঙ্কিত করে। আমি এইরূপ একটি কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। স্বত্বাধিকারী অতি যত্নসহকারে আমাকে

সমস্ত দেখাইলেন। র‍্যাফেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরের ছবি পাতরে ক্ষোদাই হইতেছে। একখানি চিত্র পরবৎসর রোমের প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য প্রস্তত হইয়াছে। শুনিলাম, চারিজন লোক তিনবৎসর পরিশ্রম করিয়া ছবিটি ক্ষোদাই করিয়াছে। দাম আমাদের মুদ্রায় ৯০,০০০ টাকা। ছোট ছোট টি টেবল (Tea Table) অনেক রহিয়াছে; সাধারণ মূল্য পাঁচ ছয় শত মুদ্রা। আগ্রায় যেরূপ ফল ফুল অঙ্কিত রেকাবি পাওয়া যায় সেইরূপ রেকাবির মূল্য ৭।৮ টাকা।

ফ্লরেন্সের গাড়োয়ানরা এক অদ্ভুত ছাতা ব্যবহার করে। ছাতাগুলি অতি বৃহৎ ও বাঁট অতি ছোট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপের ভাড়াগাড়ি সবই ফেটিন জাতীয়। এই ছাতার ডাট কোচম্যানের পৃষ্ঠস্থিত রেলে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে। তখন ইহার দ্বারা গাড়ির আবরণ হইতে ঘোড়ার পৃষ্ঠের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে; কাযেই আমাদের দেশে ফিটনে যেরূপ আরোহীর সম্মুখভাগ অয়েলক্লথ দিয়া চাপা দিতে হয়, বৃষ্টির সময়ে সেরূপ কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

ফ্লরেন্সের সরকারি উদ্যানে একজন ভারতবর্ষীয় রাজপুত রাজার সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে শুনিয়াছিলাম, আমি দেখি নাই।

ফ্লরেন্সের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবস্থল দান্তের বাসগৃহের কথা বলিয়া ফ্লরেন্সের বিবরণ শেষ করিব। ছোট একটি সাদা চুণা পাতরে (White limestone) প্রস্তুত সরু ত্রিতল গৃহ। বোধ হয় প্রত্যেক তলে একটি কি জোর দুইটি কক্ষ। গলির মোড়ে বাড়ী। দরজার ইতালিয় ভাষায় লিখিত রহিয়াছে, "এই বাড়ীতে স্বর্গীয় কবি, আলিঘেরির পুত্র জন্মগ্রহণ করেন" (Here was born the Divine Poet, the son of Alligheri).

ভেনিস।

ফ্লরেন্স হইতে বেলা ২টার সময় যখন যাত্রা করি তখন খুব বৃষ্টি হইতেছে। এই দিন গাড়িতে আমার অত্যন্ত দুর্গতি হইয়াছিল। এই ট্রেণ বরাবর রোম হইতে মিলান যায়, কেবল একখানা গাড়ি ভেনিস যায়, সেই গাড়িতে চড়িতে না পারিলে পথে ট্রেণ বদলাইতে হয়। এখন ইটালির

গাড়ির অসুবিধা এই যে, একই গাড়ির দুইটি কামরা প্রথম শ্রেণী এবং অবশিষ্ট তিনটি কামরা দ্বিতীয় শ্রেণী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপে সবই Corridor carriages ; গাড়ির দুই কোণ দিয়া উঠা যায়। ভিতরে গিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই, কেবল গদির বর্ণ বিভিন্ন ; তাহাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকার। আমার ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট। গাড়ি যখন আসিল ভেনিসের Through carriage এ গিয়া উঠিলাম। একটি কক্ষে একটি স্থান ছিল. সেই স্থানে বসিলাম ও জিনিষ পত্র তুলিতে বলিলাম। মুটিয়া কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। ট্রেণ ছাড়িলে যখন কণ্ডাকৃটার বা গার্ড আসিয়া টিকিট দেখিল তখন বুঝিলাম, আমি প্রথম শ্রেণীর কক্ষে উঠিয়াছি। উঠিয়া যাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখি, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীতে কক্ষগুলি পূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রীকে গাড়িতে স্থান দেয় না। কি করি ; বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। আরও বিপদ কোনও সহযাত্রী বা কণ্ডাকৃটার কেহই ইংরাজিনবিস নহে। কি বলে কিছুই বুঝি না। কিছুক্ষণ পরে গার্ড কি বলিল। আমি বুঝিলাম যে, সে আমাকে অন্য কামরায় যাইতে বলিতেছে এবং আরও বোধ হইল যে, যে গাড়িতে লইয়া গেল তাহাও ভেনিস যাইবে। আহ্লাদের সহিত সেই গাড়িতে গিয়া বসিলাম। ঘণ্টা দুই পরে একজন ইংরাজিভাষাবিৎ সেই গাড়িতে উঠিলেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিলাম যে, গাড়ি ভেনিসগামী নহে। কি আর করি, গাড়ি বদলাইতেই হইবে। বলোইনা (Bologna) ষ্টেশনে যখন ট্রেণ পৌঁছিল তখন ভেনিসের ট্রেণ ছাড়িবার মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। শুনিলাম, তিনটা প্ল্যাটফর্ম্ম পার হইয়া ভেনিসের গাড়ি পাওয়া যাইবে। অনেক কষ্টে মুটিয়াকে বুঝাইলাম যে, লাইনের উপর দিয়াই যাইব। গিয়া দেখি, ট্রেণে সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষ পরিপূর্ণ। আর বৃথা না ভাবিয়া এক প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বেই গার্ড আসিয়া বকাবকি আরম্ভ করিল। ভাগ্যক্রমে গাড়িতে একজন ইংরাজিজানা লোক ছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম। তিন ঘণ্টার পথের অতিরিক্ত ভাড়া লাগিল ৩৸৵৹ আনা।

রাত্রি প্রায় দশটায় ভেনিস পৌঁছিলাম। গিয়া শুনিলাম যে, অত্যন্ত বর্ষায় সহরের প্রধান স্থল পিয়াসা সান মার্কো (Piazza San Marco)

ভাসিয়া গিয়াছে। সে পর্য্যন্ত জলপথে যাওয়া যাইবে না। অর্দ্ধপথ হইতে হাঁটিতে হইবে। বৃষ্টি খুব চলিতেছে। কি করা যায়, সেই বৃষ্টিতে জলের মধ্যে প্রায় দশ মিনিট হাঁটিয়া হোটেলে গিয়া উঠিলাম। হোটেলটি Piazzaর উপরই অবস্থিত। রাত্রি ১১টার সময় দেখি, তখনও খুব জল। মিউনিসিপালিটির লোক Piazzaয় বেঞ্চ পাতিয়া দিতেছে, পথিকরা তাহার উপর দিয়া এবং কেহ কেহ লোকের পৃষ্ঠে উঠিয়া যাতায়াত করিতেছেন। ভাবনা হইল যে, আমার কপালে বুঝি ভেনিস দেখা ঘটে না। সৌভাগ্যক্রমে পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, জল সমস্ত সরিয়া গিয়াছে ও সূর্য্যদেব হাসিতেছেন।

ভেনিস (ইতালিয় নাম ভিনিসিয়া Venezia) দেখিলে মনে হয় যে, বিংশ শতাব্দী এ স্থানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধুনাতন যুগের প্রধান উপাদান, বিশেষতঃ য়ুরোপের—ব্যস্তভাব (hustle) এ স্থানে আদৌ নাই; থাকিবার উপায়ও নাই। এই স্থানে গাড়ি ঘোড়া একেবারে নাই। প্রধান রাস্তা কেনাল বা জলপ্রণালী এবং প্রধান যান গণ্ডোলা (Gondola) বা নাতিবৃহৎ জেলেডিঙ্গি—একজন মাত্র নাবিক একটি লাগ দিয়া চালায়। স্থলপথে যে সব রাস্তা তাহা অত্যন্ত সরু; অধিকাংশ রাস্তায় তিনজন লোক পাশাপাশি চলা প্রায় অসম্ভব। খালগুলিও প্রায়ই খুব সরু, অনেক স্থলে দুই খানা ডিঙ্গি পাশাপাশি যায় না। বাঁকের নিকট মাঝিরা একরূপ অদ্ভুত চীৎকার করিয়া অপর দিকের মাঝিকে সাবধান করে, নচেৎ ধাকা লাগিবার সম্ভাবনা। তবে ভেনিসের প্রধান গৌরব Grand Canal বেশ চওড়া। প্রায় ২॥০ মাইল লম্বা সর্পাকৃতি উল্টা Sএর ন্যায় চেহারা এই প্রণালীর উভয় পার্শ্বে অভিজাত বংশীয়দিগের প্রাসাদ বিরাজমান। জল হইতে বাড়িগুলি উঠিয়াছে, প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে খুঁটি পোতা। তাহাতে গণ্ডোলা আটকান। সকলেরই আপন আপন গণ্ডোলা আছে। বেশ বড় বড় নৌকা আছে এবং একাধিক নাবিকও আছে, তাহাদের বেশভূষা অতি অদ্ভুত রকমের।

এই কেনালগুলি কেবল রাস্তা নহে, সহরের ড্রেণও বটে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে কতক আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু তবুও এত পূতিগন্ধ যে লোক কি করিয়া নিরোগী হইয়া এস্থানে বাস করে বুঝা যায় না। ভেনিসে এই জন্য মশাও যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহরের প্রধান স্থান পিয়াসা সান মার্কো। ইহা কতকটা ABCDEF ধরণের স্থান। A B প্রায় ৬০ গজ এবং E F ৯০ গজ। এই সমগ্র
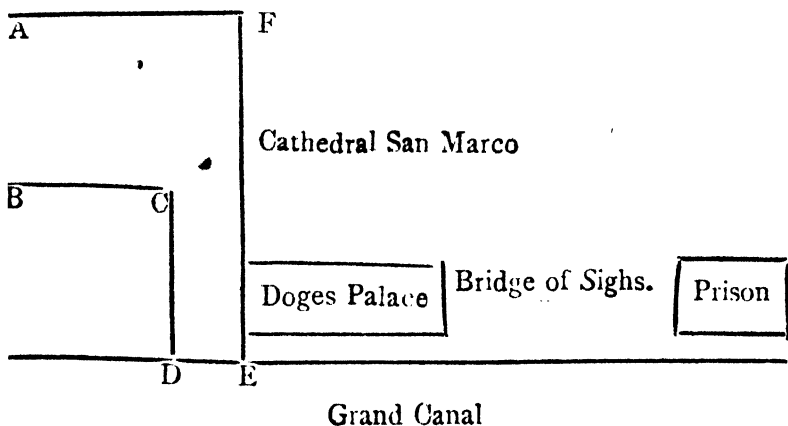
পিয়াসা মর্ম্মরে মণ্ডিত। এই স্থানে লক্ষ লক্ষ পারাবত থাকে ; সমস্ত দিন লোক তাহাদের কড়াইভাজা প্রভৃতি খাইতে দেয়। খাবার দেখিলে তাহারা লোকের সমস্ত অঙ্গে আসিয়া উড়িয়া বসে, হাতের উপর টুপির উপর হইতে খাবার তুলিয়া লয়। সেই অবস্থায় ফটোগ্রাফ তোলান এখানকার ফ্যাসান। পিয়াসায় সমস্ত দিনই ভিড় —বিশেষ রাত্রিতে। এত বেকার লোকও ভেনিসে আছে !

গ্রাণ্ড কেনালের ঠিক মধ্যস্থলে সেই রিয়াল্টো ব্রিজ (Rialto Bridge) একটি মাত্র খিলান। খিলানটি বেশ চওড়া, তুইধারে বিপণিশ্রেণী, মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা। পূর্ব্বে এই সেতু কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল, এখন মার্ব্বেল পাতরে প্রস্তুত। সেক্সপীয়র পাঠকের নিকট এই সেতু চিরপরিচিত। এই সেতুর নিম্নেই পুরাকালের বণিকদিগের মিলনস্থানও তৎপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ সাইলকের গৃহ বলিয়া খ্যাত। তাহার অল্প দূরেই মেছোহাটা, তথায় নানারূপ মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন ডেস্‌ডিমোনার গৃহ, অ্যান্টোনিওর গৃহ প্রভৃতি যাত্রীদের দেখান হয়, সবই অবশ্য Apocryphal.

পিয়াসার এক পার্শ্বে সানমার্কো কেথিড্রাল দ্রষ্টব্য। এই মন্দিরে মর্ম্মর স্তম্ভের বাহুল্য। প্রায় ৫০০ স্তম্ভ আছে, সব গুলিই সুবর্ণ কারুকার্য্যে মণ্ডিত। তদ্ভিন্ন এই কেথিড্রালের ছাত প্রায় ২৪০০ ফুট কাচের Mosaicsএ মণ্ডিত। একটুও পাতরের কায নাই, সমস্ত কাচের কারুকার্য্য, দেখিতে বড় চমৎকার।

কেথিড্রালের পার্শ্বে Doges Palace বা ভেনিসের পুরাকালের অধিপতি-দিগের আবাস। অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদ। দ্বিতলভাগ অতি জমকালো। যে সব ঘরে সেকালে রাজসভা বসিত, তাহাদের ছাতে ও দেওয়ালে অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত। যে কক্ষে সাধারণ বিচারগৃহ ছিল, পোর্শিয়া যথায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই কক্ষে দেওয়ালে দুইটি প্রকাণ্ড ঘড়ি আছে, প্রত্যেকটিতে একটি কাঁটা, একটিতে ঘণ্টা দেখায়, অন্যটিতে মিনিট।

আর একটি বড় কক্ষে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈলচিত্র দেখা যায়। ৭২ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া চিত্রে লিখিত বিষয় "স্বর্গ।" টিনটোরেটো লিখিত এই চিত্রে ৭০০ মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই কক্ষে দুইটি গোলক আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয়গণের নিকট পৃথিবীর কতটুকু অংশ জ্ঞাত ছিল এই গোলক দুইটিতে তাহা বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন এই কক্ষে সমস্ত Doges বা ডিউকদিগের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, কেবল একটি স্থান শূন্য, সেই ডিউকের প্রাণদণ্ড হয়।

প্রাসাদের গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহও বেশ সুসজ্জিত, কেবল Council of Threeর যে ঘরটিতে অধিবেশন হইত তথায় চিত্রাদি নাই। Council of Ten এবং Council of Three অতি নৃশংস বিচারাধিকরণ ছিল, তাহাদের হস্তে কখনও অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাইত না। প্রাসাদের নিম্নতলে একটি কুলুঙ্গির ন্যায় স্থান আছে। তাহাকে ব্যাঘ্রমুখ (Tiger's mouth) আখ্যা দিয়াছিল। কোনও ব্যক্তির নামে তথায় অপবাদপত্র দিয়া আসিলে সে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিহিত হইত। কারাগার হইতে বিচারালয়ের পথ একটি সরু খালের উপর দ্বিতল সেতু। একতলে রাজকীয় অপরাধীর পথ, দ্বিতীয়ে সাধারণ অপরাধীর। এই সেতুর নাম Bridge of Sighs কারণ এই সেতুপথে গিয়া কেহ কখনও মুক্তি পায় নাই। সেতু এখনও বিদ্যমান এবং প্রাসাদ হইতে কারাগারের সেই পথই সহজ, কিন্তু অপরাধীরা সে পথে নীত হয় না।

Frari নামক একটি গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় ক্যানোভা, টিসিয়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইতালীয়দিগের গোর বা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। প্রসিদ্ধ শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র ত আছেই। আর একটি গির্জ্জা দেখিয়াছিলাম Santa Maria della Salute সাণ্টামেরিয়া ডেলা সালুটে। ইহা প্লেগমুক্ত ভিনিসিয়দিগের ধন্যবাদচিহ্ন। এই গির্জ্জায়ও সুন্দর সুন্দর চিত্র ও Mosaics আছে। য়ুরোপে এই একটি মাত্র গোলাকৃতি গির্জ্জা দেখিয়াছিলাম। আর সবই ক্রুশাকারে নির্ম্মিত।

ভেনিসের সাধারণ উদ্যানটি অতি সুন্দর ও নানা মর্ম্মরমূর্ত্তিতে সজ্জিত। অবশ্য গ্যারিবল্ডির একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্যারিবল্ডির মূর্ত্তি নাই এরূপ সহর ইটালিতে নাই।

ভেনিস কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। ভূখণ্ড হইতে ভেনিস পর্য্যন্ত সরু যোজক নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দিয়া রেল চালাইয়াছে। প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা, দুই ধারে জল—কেবল রেলের লাইনটি মাটির উপর স্থাপিত।

ভেনিস হইতে রেলে অষ্ট্রীয়াদেশস্থ ট্রীয়েষ্টনগরে (Trieste) আসিলাম। এই বন্দর হইতে জাহাজে উঠিতে হইবে। হোটেলটি সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড Strandএর পার্শ্বে অবস্থিত। স্থানটি অতি সুন্দর। বিশেষ কিছু দেখি নাই; কারণ, রাত্রিতে পৌঁছিয়া তৎপরদিন প্রাতেই জাহাজে উঠিতে হইল। জাহাজ দুইটার পরে ছাড়িবার কথা; কিন্তু সকালে সমুদ্রের জল বাড়িয়া রাস্তাঘাট প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিল, দশটার মধ্যে হোটেলের একতলে বেশ জল দাঁড়াইল, কাযেই জাহাজে পলাইতে হইল। এ জাহাজে অনেক যাত্রী, সবই প্রায় য়ুরোপীয়, কেবল মাত্র তিনজন পার্শি; আমিই একক বাঙ্গালী।

এই পথে আসিতে প্রথম দিনকয়েক প্রায়ই ডাঙ্গা দেখা যায়, কেফালোনিয়া জ্যান্টি, গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পোর্ট সৈয়দে আসিলাম। পথের বর্ণনার আর প্রয়োজন নাই, যাত্রার সময়েই সে কথা বলিয়াছি। এবার এডেনে নামিয়াছিলাম। বন্দরের নিকট গোটাকতক দোকানঘর ও সৈন্যাবাস ও গোরস্থান ও বন্দর হইতে মাইল কয়েক দূরে প্রাচীন জলাশয়। এডেনে বৃষ্টি হয় না; বৃক্ষাদি নাই, একটি বাড়ীতে একটা বটগাছ টবে করিয়া রাখিয়াছে; জলাশয়গুলি অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু বিন্দুমাত্র জল নাই। লোক সমুদ্রের জল লইয়া Condense করিয়া তাহাই পানাদির জন্য ব্যবহার করে।

এডেন ছাড়িয়া আরব সমুদ্রে একটা তিমি মৎস্য দেখিয়াছিলাম। উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু দেখি না। যে দিন প্রভাতে হাবড়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম, আমার দুই কন্যা আর সকলের সঙ্গে ষ্টেশনে উপস্থিত। হ্যাট মস্তকে, টাইকলার পরিহিত এক অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া ছোটটি (বয়স ৫ বৎসর) বড়কে প্রশ্ন করিল "ও কে ভাই ?"

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু।

রম্ভা।

[চিল্কা-কূলে স্বপ্ন-রাজ্যবৎ সুন্দরী রম্ভা-নগরী-দর্শনে]

(১)

এই কি সে অফুরন্ত-বসন্ত-যৌবনা
নন্দন-নাগরী রম্ভা রুচির-নর্ত্তনা
শ্রান্ত নেত্রে ইন্দ্র-পুরী করি' পরিহার
বিরলে বিরাম লাগি' আসি' একাকিনী
বসিল চিল্কার তটে খুলি' কেশ-ভার
অন্য মনে ?
কি ভাবিয়া বুঝি সে ভামিনী
ক্ষুদ্র দুটি পদ-পুট অমর-বাঞ্ছিত
নির্মজ্জিল নীল নীরে ; সে চরণ ঘিরি'
নাচিতে লাগিল ঊর্ম্মি, পরশন-স্ফীত,
অনুকরি' লাস্য তা'র ; ফোটে ধীরি ধীরি
সে রক্তিম-গণ্ড-রুচি ঊষার কপোলে ;
বিরলে অলস বায়ু অজ্ঞাতে বালার
উড়ায় উরস-বাস ; স্বচ্ছ চিল্কা-জলে
বিম্বিত হইল তুঙ্গ পয়োধর তার।

(২)

একদা গগন-পথে বিকচ-যৌবনা
মন্দার-মালিকা গলে মদির-ঈক্ষণা
চলিয়াছে অভিসারে অপ্সর-অঙ্গনা
চারু রম্ভা। তনু গন্ধ বহিয়া পবন
মাতোয়ারা; পদে পদে স্খলিছে চরণ
কণ্টকী তারকাদামে : কুন্তল-ভূষণ
গতি-ভরে খসি' পড়ে ; উড়ে বক্ষ-বাস
নগন মাধুরী তা'র করিয়া উদাস ,
ভাব-ভরে আলুথালু কাঁপে কেশ-বাস
শূন্য-পথে।
পদ-নিম্নে সুনীল-বসনা
বিরলে বহিতে ছিল শৈল-সুশোভনা
স্বচ্ছ-কায়া চিল্কা-বাপী মন্থর-চরণা ;
প্রতিবিম্ব পড়ি' বুকে অভিসারিকার
চিল্কারে করিল হেন মাধুরী সম্ভার !

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

সংগ্রহ।

বিজ্ঞান।

—*—

মশক-নাশ।

বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারে স্থির হইয়াছে যে, য়্যানোফিলিস্ নামে এক জাতীয় মশক মানবশরীরে ম্যালেরিয়া রোগের বীজ বিসর্পিত করিয়া দেয়। সেই জন্য আমাদের দেশে মশক-নাশের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ টিন্ টিন্ কেরোসিন কিনিয়া পুষ্করিণী-পল্বল প্রভৃতির জলের উপর ঢালিয়া দিতেছেন। উহাতে করদাতৃগণের অর্থের অপচয় হইতেছে সত্য; কিন্তু স্বাস্থ্যের উপচয় হইতেছে কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। মধ্যে এ দেশের কতকগুলি য়ুরোপীয় ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, জলের উপর কেরোসিন ঢালিয়া দিলে মসকার্ভক (Mosquito Larvae) বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঐ উপায়ে মশকবংশ নির্ব্বংশ করা সম্ভব। সেইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ পল্বলাদির জলে কেরোসিন ঢালিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সার্জ্জন ক্যাপ্‌টেন্ ফ্রেডারিক এফ, ম্যাকেব এম, ডি, নামক জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ বাঙ্গলার এসিয়াটিক্ সোসাইটির একটি বৈঠকে এ সম্বন্ধে এক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সন্দর্ভে তিনি দেখাইয়াছেন যে, কেরোসিনের সাহায্যে মশক-নাশের চেষ্টা করিলে তাহার দ্বারা উপকার না হইয়া অপকারই অধিক হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে তাঁহার সন্দর্ভের সারমর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

বিষয় ও বক্তা।

বর্ত্তমান সময়ে রোগবাহী এবং নির্দ্দোষ মশার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। পল্বলে কেরোসিন তৈল প্রক্ষেপই মশকনাশিনী বাহিনীর প্রধান অস্ত্র। কিন্তু ঐ অস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদিগকে দশ স্থানের মধ্যে নয় স্থানে নিষ্ফল হইতে হয়। কারণ, কেরোসিন প্রক্ষেপে অধিক সংখ্যক মশকার্ভক জীবিত থাকে, পক্ষান্তরে মশকের ডিম্বভোজী জলজ শম্বুক গুগ্‌লী প্রভৃতি পঞ্চত্ব পায়। জলে তৈল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে মশকার্ভকগণ তাহাদের শ্বাসবাহীনলের প্রান্তভাগে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে; কিন্তু শম্বুকাদির ঐরূপ ভাবে আত্মরক্ষা করিবার উপায় না থাকায় তাহারা অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করে। ডাক্তার ম্যাকেব উক্ত সভার সমবেত সদস্যগণসমক্ষে পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জলের উপর কেরোসিন তৈল দিলে মশকার্ভকগণ পঞ্চত্ব পায় না; কিন্তু শম্বুক গুগ্‌লী প্রভৃতি কেরোসিন তৈল স্পর্শমাত্রই প্রাণত্যাগ করে। তিনি একটি প্রকাণ্ড বোতলে জল রাখিয়া সেই জলে মশক কীট আর কতকগুলি গুগ্‌লী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; এবং জলের উপর একস্তর কেরোসিন তৈলও বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন ও জলের উপরিভাগে একখণ্ড কাষ্ঠ ভাসাইয়া রাখিয়াছিলেন। ডাক্তার ম্যাকেব এই বৃহৎ বোতলটি

অসন্তোষজনক চেষ্টা।

উক্ত সভার সমবেত বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সম্মুখে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, আজ চারি দিবস জলের উপর এই কেরোসিনের স্তর বিন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আপনারা দেখুন, ইহার মশকার্ভকগণ জীবিত আছে, এবং ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; পক্ষান্তরে শামুক গুগ্‌লী-গুলি পঞ্চত্ব পাইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, ঐ সকল শমুক গুগ্‌লীকে বাতাস গ্রহণের জন্য উপরে আসিতে হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে তাহাদিগকে ক্রমাগতই বাতাস গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়; এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসবায়ুবাহী নালী বাতাসে পূর্ণ করিয়া লয়। সামান্য তৈলস্পর্শে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। আমি কেরোসিন তৈল প্রক্ষেপের অব্যবহিত পরই তাহাদিগকে জল হইতে বাহির করিয়া প্রবহমান জলে ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি, একবিন্দু প্যারাফিন যদি তাহাদের অঙ্গ-পৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কোনক্রমেই জীবিত রাখিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে একটি বোতলে জল রাখিয়া সেই জলের উপরিভাগ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে তিন চারি দিন পরে অর্দ্ধেকের অধিক মশকশিশু জীবিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিউলেক্স জাতীয় মশকের কতকগুলি উপ-জাতির জীবনীশক্তি অসাধারণ বলবতী। উহারা সহজে মরিতে চাহে না। জলের উপরি-ভাগ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইলে বৃহদাকৃতি য়্যানোফিলিসগুলি শীঘ্রই মরিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র য়্যানোফিলিসগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। বায়ুপ্রবাহ জলের উপরে বিন্যস্ত কেরোসিনের স্তরকে ভগ্ন করিয়া দেয়, এবং মশকার্ভকগণ অনায়াসে বায়ুগ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শামুক গুগ্‌লী প্রভৃতিকে জীবিত রাখিয়া লাভ কি? উহারা কি উদ্ভিজ্জভোজী নহে? প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে উহারা উদ্ভিজ্জভোজী বলিয়াই বর্ণিত আছে। কিন্তু আমি আমার পরীক্ষামন্দিরে দেখিয়াছি, উহারা মশকডিম্ব ভোজন করিয়া থাকে।

শমুক ও গুগ্‌লী।

সাধারণ প্রাণীতত্ত্বসম্পর্কিত গ্রন্থে উহারা শষ্পভোজী বলিয়া বর্ণিত হইলেও ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তেলাপোকা ভোজন করিতেছে, ইহা আমি দেখিয়াছি। শ্রীযুত এইচ, কুক বলিয়াছেন, ইহারা এক জাতীয় কীটকে (Shrickleback) অনায়াসে পরাজিত করিয়া ভোজন করে। যে পুষ্করিণীতে বহুসংখ্যক শমুক গুগ্‌লী প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, সে পুষ্করিণীতে মশকার্ভক একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা আমি দেখিয়াছি। সুতরাং যে উপায়ে সমস্ত মশকশিশু না মরিতেছে, সে উপায় অবলম্বনে উহাদিগকে মারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। আমি দেখাইয়াছি যে, প্যারাফিন্ তৈলে সমস্ত মশক মারিয়া ফেলা যায় না। পক্ষান্তরে এ কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মশককীট ভোজন করিবার জন্য আমি কতকগুলি গুগ্‌লী ও শমুক পুষিয়াছিলাম। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, উহাদের মশক ডিম্ব খাইবার ইচ্ছা সকল সময়ে প্রবল থাকে না। ঐ সকল গুগ্‌লী শামুক প্রভৃতির বংশ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। প্রত্যেক শামুক গুগলী স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতীয়। দুইটি শমুকের সম্মিলনে বড় শমুকটি দুইশত হইতে তিনশত এবং ছোটটি ন্যূনাধিক দেড়শত

ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। আমার মতে লোকালয়ের সন্নিহিত জলাশয়ে ও পল্বলে কশাক সৈন্যের ন্যায় শম্বুক গুগ্‌লী রাখিয়া মশক-সংহারে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শম্বুকাদির বংশ-বৃদ্ধি-কল্পে জলজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শৈবালে যৎকিঞ্চিৎ চর্ব্বি মিশাইয়া দিলে যথেষ্ট হইবে। এই চর্ব্বিটুকু খাইলে উহারা মশকডিম্বের অন্বেষণে ইতস্ততঃ সবেগে ধাবিত হইবে।

জলের উপর খনিজ-তৈলের স্তরবিস্তারে মশকশিশু নষ্ট হয় না, ইহা আমার পরীক্ষা-দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে, মশকনাশিনী-বাহিনী অনেক স্থানে মশকসংখ্যা হ্রাস করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কার্য্যক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবও কমিয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মশকনাশিনী-বাহিনী কেবল স্বল্পজল জলাশয়ের উপর কেরোসিনের বিন্যাস করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহারা অনেক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলগুলি পূর্ণ করিয়াই দিয়াছেন, আবর্জ্জনাপূর্ণ জলাশয়গুলি পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং অবরুদ্ধ পয়ঃপ্রণালী উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন খনিজ তৈলের সাহায্যে মশককীট যে একেবারেই বিনষ্ট হয় না, এ কথাও আমি বলিতেছি না। তবে মশক-নাশিনী-বাহিনী জলের উপর খনিজ তৈল প্রক্ষেপ ভিন্ন অন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই অধিক ফলোপাধায়ী হইয়াছে।

সুফল লাভের কারণ।

ডাক্তার শ্রীযুত ম্যাকেব স্বয়ং মশকসংহারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মশক-হনন উদ্দেশ্যে তিনি বিখ্যাত বার্ড কোম্পানীর জুটমিলের কার্য্য করিতেন। তিনি বলি-ছেন যে, ঐ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সময় নর্দ্দামা, গর্ত্ত, পল্বল, পুষ্করিণী প্রভৃতি অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স প্রভৃতি নানাজাতীয় মশকে পূর্ণ থাকে। যে সকল স্থানে অল্প অল্প জল বাধে, সেই সকল পরিপূর্ণ করিয়া, এবং আবর্জ্জনাময় পুষ্করিণীসকল পরিচ্ছন্ন করিয়া তিনি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রশমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জলাশয়ের পরিচ্ছন্নতা।

নানাবিধ বীজাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগে ডাক্তার ম্যাকেব মশকশিশুর প্রাণনাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইনি বলিয়াছিলেন যে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্তপ্রদেশের রোগ সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, কেরোসিনতৈল প্রক্ষেপে পল্বলস্থ মশককীট অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করে। ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিকারের এত সহজ উপায় থাকিতে ভারতবাসীরা এ রোগে দলে দলে কেন প্রাণত্যাগ করে, ইহা ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। কেবল খনিজ তৈল প্রয়োগেই মশক-শিশু নষ্ট হয় না, পরন্তু সণ্ট অভ মার্কারী, পোটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, ক্যালসিয়ম্ প্রভৃতির সণ্ট বা ক্ষার এবং কুইনাইন, ইউকালিপ্‌টাস্-তৈল, মূল আয়োডিন এবং আয়োডিনের ক্ষার প্রভৃতি প্রয়োগে মশক-শিশু মরিতে চাহে না। নিরাপদে কার্য্যক্ষেত্রে উহা যেরূপ তেজ-স্কর অবস্থায় ব্যবহৃত করা যাইতে পারে, সেইরূপ তেজস্কর অবস্থায় জলবিমিশ্রিত করিয়া উহার ব্যবহার করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, উহাতে মশক-শিশুর কিছুই হয় না। উহার

জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ।

প্রয়োগে অন্যান্য সমস্ত জীবাণু ও কীট মরিয়াছে, কিন্তু মশক-শিশু স্বচ্ছন্দে সেই জলে বিহার করিতেছে, ইহা তিনি দেখিয়াছেন। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধ মশক-সংহার-কল্পে নিরাপদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ইনি আরও বলিয়াছেন, পোটাসিয়ম্ সাইয়েনাইড্ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে জলস্থিত মশককীট পঞ্চত্ব পায় সত্য, কিন্তু ঐ জল পান করিলে অন্যান্য জীবের অনিষ্ট হইতে পারে ; সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে উহা সেইরূপ তেজস্করভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

ডাক্তার ম্যাকেব বলিয়াছেন, Chloride of Lime প্রয়োগে মশককীট পঞ্চত্ব না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পায়, ইহা সত্য ; কি Chloride of Limeএর সহিত প্যারাফিন-তৈল মিশাইয়া উহার চাপাটী প্রস্তুত করিলে তাহাতে মশক শিশুদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা যায়। মশককীটের লেজ বা শ্বাসনালী যদি ইহাতে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহারা অসীম যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রয়োগে জলস্থ প্রায় সমস্ত জীবই বিনষ্ট হইয়া যায়। ডাক্তার ম্যাকেব বলিয়াছেন যে, ইহার প্রয়োগে জলস্থিত আমাদের মিত্রজীবগুলিও পঞ্চত্ব পায় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগুলিও নির্ম্মূল হয়। সুতরাং কেরোসিন প্রয়োগ অপেক্ষা ইহার প্রয়োগে অধিক ফল পাওয়া যায়।

চাপাটী।

ইহা ভিন্ন বিদ্যুৎ প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারাও ডাক্তার ম্যাকেব মশকনাশের চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা দ্বারা কতকটা সুফলও লাভ হইয়াছে। উপসংহারে ইনি মশকনাশের তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) জলাশয়সমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

(২) Chloride of Lime ও প্যারাফিনের চাপাটী অথবা বিদ্যুৎ প্রয়োগ।

(৩) যে সমস্ত জলীয় জীব মশক-ডিম্ব ও মশক-শিশু ভোজন করে, তাহাদিগকে রক্ষা করা।

উপসংহারে ডাক্তার ম্যাকেব বলিয়াছেন, ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে ষ্টেগোমিয়া মশক বিদ্যমান আছে। এপর্য্যন্ত এসিয়াখণ্ডে পীতজ্বর আনীত হয় নাই। দুই এক বৎসরের মধ্যে প্যানামা খাল খনিত হইবে, তখন কুড়ি দিনের মধ্যে পীতজ্বরের দেশ হইতে এ দেশে জাহাজ আসিয়া উপনীত হইবে। ঐ কুড়ি দিনে জাহাজগুলি উষ্ণকোটিবন্ধে থাকিবে। ষ্টেগোমিয়া জাতীয় মশা পীতজ্বরের বিষে আক্রান্ত হইয়া ৬০দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং জাহাজে করিয়া যদি ঐরূপ পীতজ্বরাক্রান্ত মশা এ দেশে আনীত হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ দেশের মশাদিগকে ঐ বিষে আক্রান্ত করিবে। তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিবে না। ভারতের মৃত্যুসংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাইবে। দারিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পীতজ্বর প্রসার লাভ করিবে। সমগ্র ভারত শ্মশানে পরিণত হইবে। অতএব দিন থাকিতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে মশককুল ধ্বংস হয়, সকলে তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।

পীতজ্বরের শঙ্কা।
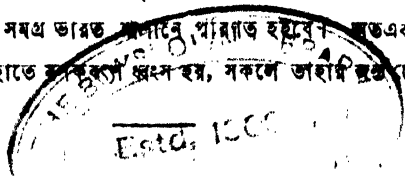
সমালোচনা।

অর্থনীতি। *

যে জাতির আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে—যে দেশে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার আরব্ধ হইয়াছে সে জাতির ও সে দেশের পক্ষে অর্থনীতির আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। য়ুরোপে ও আমেরিকায় অর্থনীতির আলোচনা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; ফলে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু পুরাতন মত পরিত্যক্ত ও বহু নূতন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এই আলোচনার অভাব একান্ত আক্ষেপের বিষয়। যাঁহারা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের ধন্যবাদ-ভাজন। রাণাডে মহোদয় ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তক সম্পূর্ণ নহে; পরন্তু ভগ্নাংশ মাত্র। সংপ্রতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থে অর্থনীতির অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক যোগীন্দ্র-নাথ সমাদ্দার বাঙ্গলায় আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের অভাবমোচনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে তিনি অর্থনীতির মূল ও স্থূল কথাগুলি সরল ভাবে বুঝা-ইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি ভারতের অবস্থা বিচার করিয়া পাশ্চাত্য মতের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থখানি বিশেষভাবে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদিগের উপযোগী হইয়াছে। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়—এই তিনেরই বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি পূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। বর্ত্তমান সংগ্রহে সেগুলি একত্র করা হইয়াছে। ইহাতে যে অসুবিধা নাই এমন নহে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে পুনরুক্তি অপরিহার্য্য। আবার সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে যে সকল আলোচনা—যেরূপ মতোদ্ধার শোভন—পুস্তকে সে সকল আলোচনা—সেরূপ

* অর্থনীতি—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। 'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়, হাওড়া হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

মতোদ্ধার সর্ব্বত্র শোভন নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে, লেখক মহাশয় ৯৮ পৃষ্ঠায় 'বেঙ্গলী' পত্রের, ১০৫ পৃষ্ঠায় 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রের ও ১০৭ পৃষ্ঠায় 'ইংলিস্‌ম্যান' পত্রের মতোদ্ধার করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মতের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, তাহা কোন স্থায়ী রচনার অবলম্বন হইতে পারে না। আবার লেখক স্থানে স্থানে যে সকল ব্যক্তির মতের কথা বলিয়াছেন বা যাঁহাদের কৃতকর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা বরেণ্য হইলেও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন—সুতরাং তাঁহাদের মত এরূপ পুস্তকে আলোচিত হইবার যোগ্য নহে, তাঁহাদিগের কৃত কর্ম্ম ও এখনও অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তকে আলোচিত হইবার মত ফলপ্রদ হয় নাই। এ ত্রুটী সামান্য হইলেও উল্লেখযোগ্য।

পরিভাষার অভাবে গ্রন্থকারকে "শ্রমিকের গ্রাহকতা"—"বিনিময়ের দ্বার" প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিভাষা রচনায় ব্যাপৃত আছেন, এ কথা বহুদিন হইতে শুনিতেছি। আশা করি, বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগ পুষ্টির প্রয়াস দেখিয়া পরিষদ পরিভাষা-সঙ্কলনকার্য্য যাহাতে সত্বর সম্পূর্ণ হয় সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

এরূপ পুস্তকে নানা মতের বিচার করিয়া লেখকের আপনার মত প্রদানই প্রথা। আলোচ্য পুস্তকে সে নিয়মের ব্যতিক্রম বেদনার কারণ। অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে লেখক নানাজনের নানা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং কোন মতই প্রকাশ করেন নাই! অবাধ বাণিজ্যের প্রবল সমর্থক মিলও স্বীকার করিয়াছেন, নবজাত শিল্পের উন্নতি-কল্পে সংরক্ষণ শুল্কের প্রবর্ত্তনই প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ড ভারতজাত বস্ত্রের ব্যবহার বিধিবিরুদ্ধ করিয়া স্বীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনে সক্ষম হইয়াছিল। আজও য়ুরোপে অন্য সকল দেশে সংরক্ষণ নীতিই আচরিত। কিন্তু লেখক মহাশয় সে সকলের আলোচনা করেন নাই।

পুস্তকের ভাষাসম্বন্ধে তিনি আরও মনোযোগী হইলে আমরা সুখী হইতাম।

তবে আমাদের আশা আছে, গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এ সকল ত্রুটী সংশোধিত হইবে—আরম্ভে ত্রুটী অনিবার্য্য। আমাদের আরও আশা আছে, লেখক মহাশয় এবার অর্থনীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

কূটদন্তের উপাখ্যান

বা
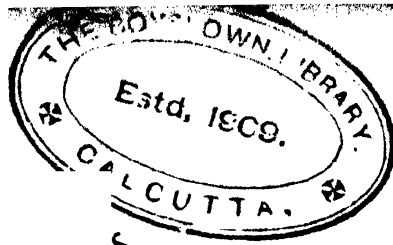
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের পূর্ব্বাভাস

মগধপ্রদেশে দানমতি নগরে কূটদন্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নানাশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের জন্য লোকসমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি একদা ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সবিনয় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "হে শ্রমণ, আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, আপনি বুদ্ধ—সর্ব্বজ্ঞ—তথাগত—ও লোকপাবন। তবে কেন আপনি রাজন্যবর্গের ন্যায় গৌরব ও প্রভুত্ব মণ্ডিত হইয়া অবস্থান করেন না?"

তথাগত তাঁহার কথা শুনিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন; অতঃপর তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "কূটদন্ত! তোমার জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত রহিয়াছে, তজ্জন্য তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না। যখন অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে, সত্যের উজ্জ্বল মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।"

কূটদন্ত কহিলেন, "আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সত্যপথ প্রদর্শন করাইয়া দিউন, তাহা হইলেই আমার চৈতন্যোদয় হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আপনার উপদেশে কোন সামঞ্জস্য নাই—সেই জন্য ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। সামঞ্জস্য থাকিলে নিশ্চয়ই ইহা স্থায়ী হইত।"

তথাগত বলিলেন, "সত্য কখনও অস্থায়ী হয় না। তোমার ধারণা অমূলক।"

কূটদন্ত কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি অষ্টাঙ্গমার্গ* সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন এবং প্রচলিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদির অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া

* অটঠঙ্গিক মগ্গং—সম্মাদিটঠি (সম্যক দৃষ্টি) সম্মাসঙ্কপ্পো (সম্যক সংকল্প) সম্মাবাচা (সম্যক বাক্য) সম্মাকম্মন্তো (সম্যক কর্ম্মান্ত অর্থাৎ উত্তম ব্যবসায়) সম্মা-আজীবো (সম্যগাজীব অর্থাৎ উত্তম জীবিকা) সম্মাবায়াম (সম্যক ব্যায়াম অর্থাৎ উত্তম চেষ্টা) সম্মাসতি (সম্যক স্মৃতি) সম্মাসমাধি (সম্যক সমাধি অর্থাৎ ধ্যান) এই আটটিকে অষ্টাঙ্গমার্গ বলে।

থাকেন। আপনার শিষ্যবর্গও ধর্ম্মের নামে যাগ, যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ নিরর্থক বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু আমার মতে পূজা ও যাগ যজ্ঞই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।”

বুদ্ধদেব বলিলেন, “দেবতাসমক্ষে প্রাণিহিংসা করা অপেক্ষা অন্তঃকরণ হইতে স্বার্থ ও কুপ্রবৃত্তিনিচয় দূরীভূত করা সহস্রগুণে শ্লাঘনীয়। বধ্য-প্রাণীর শোণিতপাতদ্বারা কখনও চিত্তের পবিত্রতা সাধিত হয় না—প্রত্যুত মন হইতে পাপসমূহ বিদূরিত করিতে পারিলেই প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, তোমার হৃদয় এখনও স্বার্থে মগ্ন ও স্বর্গসুখভোগে প্রলুব্ধ, সেইজন্য তুমি নির্ব্বাণের অমৃতত্ব ও শান্তিউপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছ না।”

কূটদন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সুতরাং সুকৃতিসঞ্চায়ার্থ দেবতাসমক্ষে অসংখ্য প্রাণী উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানের এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে, অগণ্য প্রাণী বধ করা নিষ্ফল হইয়াছে। তিনি তথাগতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেব, আপনি ঘোষণা করেন যে, মানবজীবন পুনর্জ্জন্ম লাভ করে ও দেহান্তর প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ ও দুঃখের অধিকারী হইয়া থাকে। আপনি ইহাও বলিয়া থাকেন যে, আত্মা নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। আপনার শিষ্যগণ বলেন যে, আত্মার ধ্বংসই নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু আত্মার যদি কোন পৃথক অস্তিত্ব না থাকে, আমি যদি কেবলমাত্র কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টি মাত্র হই, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বলোপ হইবে। সুতরাং আপনার উপদেশের সত্যতা বা সামঞ্জস্য কোথায়? আপনার শিষ্যগণ যে শাশ্বত আনন্দের কথা বলিয়া থাকেন, তাহাই বা কোথায়? আমি কেবল ইহাতে শূণ্যতাই উপলব্ধি করিয়া থাকি।”

তথাগত বলিলেন, “মনুষ্যগণ কেবলমাত্র মোহ ও অজ্ঞতার বশীভূত হইয়া মনে করে যে, আত্মা বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এই শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, সুতরাং অগণ্য প্রাণী উৎসর্গ করিয়াও ইহা রক্ষা করা যাইতে পারে না এবং তাহা নির্ব্বাণ লাভের সহায়ক নহে। ধর্ম্মজীবন-যাপনই মুক্তির প্রধান উপায় ও অবলম্বন। অহং বা স্বার্থই ইহার প্রতিবন্ধক। যথায় স্বার্থ তথায় প্রকৃত জ্ঞান থাকিতে পারে না। যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই স্বার্থ ও মোহ দূরে পলায়ন করে; সেইজন্য প্রকৃত জ্ঞান যাহা, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা কর ও তাহারই প্রচার কর।

স্বার্থ ও মোহ মৃত্যু স্বরূপ, প্রকৃত জ্ঞান জীবনপ্রদ। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণ সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু সত্যপথে ভ্রমণ করিতে পারিলে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।"

কূটদন্ত বলিলেন, "দেব, নির্ব্বাণ কোথায়?"

তথাগত বলিলেন, "আমার উপদেশ যে স্থলে যে পরিমাণে পালিত হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে তথায় নির্ব্বাণ বিদ্যমান থাকে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এক্ষণে বুঝিলাম, নির্ব্বাণ একটি স্থান বা ব্যক্তি নহে; ইহা একটি অবস্থা।"

ভগবান বলিলেন, "তুমি এখনও ইহা সম্যকরূপে বুঝিতে পার নাই। এক্ষণে আমার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান কর। বায়ু কোথায় থাকে?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কোথাও নহে।"

বুদ্ধদেব উত্তরে বলিলেন, "তবে বায়ু নামে কোন পদার্থই নাই?"

কূটদন্ত নীরব রহিলেন।

ভগবান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "হে কূটদন্ত, বিজ্ঞান কোথায় থাকে? ইহা কি একটি স্থান বিশেষ?"

কূটদন্ত বলিলেন, "ইহার অবস্থানের নিমিত্ত কোন স্থান নাই।"

তথাগত তখন বলিতে লাগিলেন, "তবে কি তুমি বলিতে চাহ যে, নির্ব্বাণ একটি স্থান নহে বলিয়া বিজ্ঞান ধর্ম্ম বা মোক্ষ কিছুই নাই?"

কূটদন্ত বলিলেন, "দেব! আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনার উপদেশ প্রকৃত মহৎ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধিহেতু ইহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, দেব! যদি আত্মার স্থায়ী অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে জীবের অমরত্ব কিরূপে থাকিবে? আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে মানসিক বৃত্তিসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং চিন্তাশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "চিন্তা দূর হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে।"

কূটদন্ত বলিলেন, "তাহা কিরূপে হইবে? চিন্তা এবং জ্ঞান কি বিভিন্ন পদার্থ?"

তথাগত তৎকালে উদাহরণস্থলে চিন্তা ও জ্ঞানের পার্থক্য বিশেষরূপে

বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "এক ব্যক্তি যেন রাত্রিকালে শয্যার উপর শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে, তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিতেই হইবে। এই ভাবিয়া তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভৃত্যসাহায্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া পত্র লিখিলেন; তৎপরে প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিলেন। এক্ষণে দেখিতেছ যে, যদিও আলোক নির্ব্বাপিত হইল তথাপি পত্রের লিখন তখনও বিদ্যমান রহিল। এইরূপে আমাদের চিন্তা দূর হইলেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে।"

কূটদন্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "দেব, যদি আমাদের সংস্কারগুলি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব কোথায়? যদি বলেন, আত্মা দেহান্তর লাভ করে, তাহা হইলে 'আমার চিন্তা' 'আমার মন' 'আমার আত্মা' কিরূপে বলা যাইতে পারে?"

ভগবান সুগত বলিলেন, "মনে কর এক ব্যক্তি একটি আলোক প্রজ্জ্বালিত করিলেন—সেই আলোক কি সমস্ত রজনী জ্বলিবে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাহা হয় ত জ্বলিতে পারে।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "রজনীর প্রথম যামে যে শিখা জ্বলিবে—দ্বিতীয় যামেও কি সেই শিখা জ্বলিবে?"

ব্রাহ্মণের মনে দ্বিধা উপস্থিত হইল। অবশেষে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "না—তাহা নহে।"

তথাগত বলিলেন, "তাহা হইলে নিশার প্রথম যামে একটি আলোক জ্বলিবে এবং দ্বিতীয় যামে অন্য একটি শিখা জ্বলিবে?"

কূটদন্ত বলিলেন, "না তাহা নহে; এক পক্ষে এই দুইটি আলোকের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়, এবং অপর পক্ষে ইহাদিগের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই—কারণ ইহাদিগের উপাদান একই দ্রব্য, ইহারা একই প্রকার আলোক দান করে এবং ইহাদিগের দ্বারা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

শাক্যসিংহ বলিলেন, "গত কল্য যে গৃহে যে প্রদীপে যে শিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, অদ্যও কি সেই গৃহে সেই প্রদীপে সেই একই শিখা প্রজ্বলিত হইবে?"

কূটদন্ত বলিলেন, "সেই আলোকটি হয় ত দিবাভাগে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকিতে পারে।"

তথাগত বলিলেন, "মনে কর রজনীর প্রথম যামে যে শিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় যামে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—তাহা হইলেও কি এই দুইটি শিখা একই ?"

কূটদন্ত বলিলেন, "এক পক্ষে ইহারা একই বটে,কিন্তু অপর পক্ষে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।"

ভগবান বলিলেন, "তাহা হইলে এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছ যে, অদ্য প্রদীপে যে শিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং আগামী কল্য সেই প্রদীপে যে শিখা প্রজ্বলিত হইবে—তাহাদের মধ্যে এক পক্ষে কোনও পার্থক্য নাই, পরন্তু অপর পক্ষে তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়।"

কূটদন্ত বলিলেন, "হাঁ ; তাহা প্রকৃত বটে।"

তথাগত বলিলেন, "মনে কর, এক ব্যক্তি তোমার ন্যায় কার্য্য করে, চিন্তা করে, এবং সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। তাহা হইলে কি সেই ব্যক্তিই তুমি নহ ?"

কূটদন্ত বলিলেন, "না। কিছুতেই নহে।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "তুমি কি স্বীকার কর না যে, জগতীস্থ যাবতীয় নর-নারীগণের নিমিত্ত যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রচলিত, তোমারও সম্বন্ধে তাহার কিছু তারতম্য নাই।"

কূটদন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ; পরিশেষে প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমি স্বীকার করি না। পার্থিব যাবতীয় ব্যক্তি একই প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইলেও প্রত্যেক জীবনে কিছু বিশেষত্ব আছে, তন্নিমিত্ত মনুষ্যগণের আত্মার পার্থক্য লক্ষিত হয়। অপর কোনও ব্যক্তি হয় ত আমার ন্যায় সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, আমার ন্যায় কার্য্য করে ও চিন্তা করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি ও আমি এক হইতে পারে না।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "না। সে ব্যক্তি ও তুমি এক হইতে পার না। এক্ষণে বল দেখি, অধুনা যে ব্যক্তি শিক্ষালাভার্থ বিদ্যালয়ে গমন করিতেছে, ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তি যখন বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিবে, তখন কি তাহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা সংঘটিত হইবে ?"

কূটদন্ত বলিলেন, "না। তাহা নহে, তাহারা একই ব্যক্তি বলিয়া পরি-গণিত হইবে।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "তাহা হইলে এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছ যে, রাত্রির

বিভিন্ন যামের দুইটি বিভিন্ন অগ্নিশিখা যে পরিমাণে এক, তুমি এবং তোমার ন্যায় চরিত্রবান ও ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তি সেই পরিমাণে এক।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “হাঁ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।”

ভগবান বলিতে লাগিলেন যে পঞ্চস্কন্ধের * (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান) সমষ্টিই আত্মা, তদ্‌ভিন্ন আত্মা নামক কোন পৃথক পদার্থ বিদ্যমান নাই। কর্ম্মই এই সংস্কারসমূহকে সংযুক্ত করিয়া জীবনপ্রবাহে প্রবাহিত করিতেছে। এই আত্মা বা অহং সদাপরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্যজীবন প্রথমে শৈশব, পরে বাল্য, পরে যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। বালকে ও প্রৌঢ়ে কি কোন প্রভেদ নাই? এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, কোন্‌টা প্রকৃত ‘আমি?’ শৈশবে যাহা ছিলাম তাহাই ‘আমি’, না, এক্ষণে যাহা আছি, তাহাই ‘আমি’? বিভিন্ন যামের দীপশিখায় বরং কতক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এই উভয় ‘আমির’ মধ্যে সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প। এই ‘আমি’ বা অহং স্বার্থের সহিত জড়িত। যখন এই অহং বা আত্মার উচ্ছেদ সাধিত হইবে, তখনই স্বার্থের মোহ হইতে মানব মুক্ত হইবে এবং নির্ব্বাণ কি বুঝিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানবজীবন কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টি; মানবজীবন যেমন বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্বে অগ্রসর হইতে থাকে, আমাদের এই সংস্কার সকলও ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতে থাকে। ক্রমে ইহারা এতাদৃশ বলশালী হইয়া উঠে যে, মানবজীবন ইহাদের হস্তে সামান্য ক্রীড়নকে পরিণত হয়। বর্ত্তমান জীবনে আমরা যে সকল সংস্কার লাভ করিয়াছি, সে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল মাত্র; সেইরূপ বর্ত্তমানে যেরূপ কার্য্য করিব, তাহাই ভবিষ্যতের সংস্কার সকল নিয়ন্ত্রিত করিবে। এই সংস্কারের সমষ্টিই অহং বা আত্মা। স্বর্গেই হউক বা সমুদ্রগর্ভে বা পর্ব্বতবিবরেই হউক, কোন স্থানেই মানব নিজ কর্ম্মের ফলাফল হইতে পরিত্রাণ পায় না। সৎকার্য্য সুফল প্রদান করে

* রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পাঁচটির নাম স্কন্ধ। ইহারাই পুনর্জ্জন্মের কারণ। পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি ব্যতীত জীব আর কিছুই নহে উহাদের চরম বিনাশে নির্ব্বাণ লাভ হয়।

নত্থি রাগো সমো অগ্গি, নত্থি দোষ সমো কলি
নত্থি খন্ধাদিসা দুক্খা, নত্থি সন্তি পরং সুখং।

আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষের ন্যায় পাপ নাই, পঞ্চস্কন্ধের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তি অপেক্ষা সুখ নাই। ধর্ম্মপদ—সুখ বগ্গো।

এবং মন্দ কার্য কুফল প্রদান করে। যেমন কোন ব্যক্তি দূর দেশান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে তাহার আত্মীয় এবং বন্ধুবর্গ সানন্দে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা সৎপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কৃত সৎকার্য্যসকল পরজন্মে তাঁহাদেরই আশ্রয় করিয়া থাকে।"

কূটদন্ত শাক্যমুনির উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইল, তাঁহার মোহান্ধকার দূরীভূত হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রাণিবধদ্বারা মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে না, পূজা বা আরাধনার দ্বারা ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। কিরূপে এই মুক্তি-মার্গ লাভ করিব, তিনি ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই নাই।

বুদ্ধদেব বলিলেন, "অধ্যয়ন উত্তম, কিন্তু উহার দ্বারা সারবস্তু লাভ করা যায় না। সাধনার দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তথাগতপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে প্রমাদই মৃত্যু, অপ্রমাদই অমৃতের পথ স্বরূপ।

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনোপদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥

অপ্রমাদ অমৃতের পথস্বরূপ। প্রমাদ মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। অপ্রমত্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে তৎপর) ব্যক্তিগণ কখনও মরেন না, আর প্রমত্ত ব্যক্তিগণ মৃতস্বরূপ। এই সত্য যাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদা নির্ব্বাণমার্গাবলম্বীদিগের জ্ঞানে বিহার করেন, ধ্যাননিষ্ঠ, সতত চেষ্টাযুক্ত এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম সেই সকল বীরপুরুষ পরাশান্তিস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন।"

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

গৌরী।

(১)

পৌত্রী গৌরীকে লইয়া সুমেরু বাবু যে দিন গ্রামে ফিরিলেন, সে দিন সোদপুরের গ্রাম্য মোড়লদিগের কাহারও দিবানিদ্রা হইল না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রধান মোড়ল সূর্য্যকান্ত বসুর চণ্ডীমণ্ডপে তাম্রকূটের ধ্বংশ করিয়া সুমেরু বাবুর আলোচনায় দিন কাটাইলেন। সূর্য্যকান্ত বলিলেন, "আমি ঐ জন্যই কিছুতে সহরে যাই না। নহিলে আমার শ্যামও ত মাসিক দেড় শত টাকা বেতন পায়; মনে করিলে কি আমি সহরে যাইতে পারি না? এখনকার নব্য বাবুদের যেমন দশ টাকা হইল, অমনই তাঁহারা দেশের ভিটা 'শেয়াল কুকুরের জিম্মে ক'রে' সহরে বাস করিতে চলিয়া যায়েন। এমনই করিয়া যদি গ্রামের অর্দ্ধেক লোক পয়সা হইলেই পলায়, তবে গ্রামের ভগ্নদশা হইবে না ত কি হইবে?"

বিধু বাবু বলিলেন, "আরে ভগ্নদশা ঐ রকমেই হইতেছে ও হইবে। কিন্তু আমি ভাবি, দুর্দ্দশা হইলেই যে ফিরিতে হইবে, সেটা কেন মনে রাখে না? সেটা মনে করিয়া যদি বাড়ী ঘরগুলির উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া রাখে—সেও ত মন্দের ভাল। এই দেখ না—সুমেরু দাদার ছেলে অত পয়সা উপায় করিল, কিন্তু দেশের মেটে বাড়ীটুকু যেমন ছিল তেমনই রহিল। একটা পাকা ইমারত করিল না। দশ বৎসর দেশ ছাড়া হইয়া বিদেশে 'বড় মানুষী' করিয়া কাটাইল, এখন ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সেই মেটে বাড়ীতে মাথা গুঁজিবার জন্যই আসিতে হইল!"

রমানাথ বাবু বলিলেন, "আরে তোমরা আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছ। সুমেরু বাবুর পিসির কথা বল। ভাগ্যে সেই বুড়ী ঐ ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া ছিল, তাই ঘর কয়খানা এখনও খাড়া আছে।"

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "তুমিও যে ছেড়ে দিলে। বুড়ী বাড়ীতে কি কেবল সন্ধ্যা দিয়াছে? নিজের হাতে সামান্য যাহা ছিল, সেই পয়সা খরচ করিয়া তিনবার ঘর ছাওয়াইয়াছে।"

সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "না, না। ঘর ছাওয়াইবার টাকা সুমেরু বাবু আমার কাছে পাঠাইতেন। আমি বুড়ীকে দিতাম। তবে বুড়ীর জন্য বাড়ীখানা পড়ে নাই এটা ঠিক।"

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "কি অসুখে গৌরীর বাপ মারা গেল, শুনেছ কি?"

সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "সহরে মানুষকে যে রোগে ধরে সেই রোগ। খুব কাঁচা পয়সা পাইত। মদে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে যকৃৎ পচিয়া মারা গেল। আর সুমেরু বাবু গোড়া হইতে ছেলেটিকে আদর দিয়া মাথা খাইয়াছিলেন। ও পয়সা রোজকার করে—ও বিদ্বান, যাহা করে ভালই করে, বলিয়া গোড়ায় রাস আলুগা দিলেন। শেষে কি আর টানিয়া রাখিতে পারেন? আমি যখনই আমার শ্যামের কাছে গিয়াছি, তখনই ওঁদের কাছে গিয়াছি। সব ব্যাপারই জানি।"

বিধু বাবু বলিলেন, "এখন গৌরীর বিবাহ দিবে কি প্রকারে? শুনিতেছি, গৌরীর মা'র এক ভরিও সোণা রূপা নাই। আর নগদ টাকাও ত কিছুই নাই।"

সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "নাই বা কিছু রহিল। গৌরীর মত রূপবতী মেয়েকে অনেকে বিনা পয়সায় বধূ করিবে। এই আমার শ্যামের সঙ্গে যদি বিবাহ দেয়—আমিই এখনই বৌ করি।"

সকলে একস্বরে বলিল, "বল কি? তোমার শ্যাম দেড় শত টাকা মাহিনা পায়। বাড়ী ঘর জমী জমা—কত সুন্দর মেয়ে দুই তিন হাজার টাকা সমেত পাইবে। এমন বুঝ্‌দার লোক হইয়া তোমার অমন বুদ্ধি কেন?"

সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ। ছেলের বিবাহে টাকা লওয়া আমি বড় ঘৃণা করি। ছেলে বেচা টাকায় ত বড়মানুষ হওয়া যায় না। তবে কেন লোক লয় বুঝি না। এখন এই নূতন প্রথা হইয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে! কত লোকের ভিটা মাটি চাটি হইতেছে। ছেলের বিবাহে টাকা লওয়ার কথা আর তোমরা কোন দিন মুখে আনিও না। শ্যামের মুখে শুনিয়াছি, কত বড় লোক লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায়, টাকা লওয়া অন্যায়, কিন্তু লুকাইয়া বা জিনিষে দিলে তাহারা অম্লান বদনে লয়। আমার মতে বড় লোক গরীবের ঘরের মেয়ে আনিবে। আর গৃহস্থরা বড় লোকের মেয়ে আনিবে। কারণ বড় লোক শুধু মেয়ে দান করিবে না; কিছু দিবেই। সেটা গৃহস্থর পাইলেই উপকার। কিন্তু তাহা হয় না—বড় লোক বড় লোককে ছাড়া মেয়ে দিবে না। আর ধনবানের পুত্র গরীবের জামাই হইলে পিতার বড় লজ্জা করে—কাযেই তিনিও বড় ঘরের

কন্যা আনেন। কিছু চাহি না বলিলেও "যে কিছু পাইবেন এটা জানা কথা।" সূর্য্যকান্তের এই কথাগুলির পর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সকলেই একটা না একটা কাযের ওজর করিয়া উঠিয়া গেলেন। কারণ, তাহার মধ্যে অনেকের ছেলে পাশ দিয়াছে। তাঁহারা বেশ দুই পয়সা পাইবার আশায় আছেন। এ কথা তাঁহাদের ভাল লাগিল না। আর অনেকে আবার ছেলের বিবাহে টাকা লইয়াছেন। তাঁহারাই বা কি করিয়া এই কথায় সায় দেন? সুতরাং সভা ভঙ্গ হইল।

(২)

সুমেরু বাবুর বাটীখানির খোড়ো চাল ও মাটীর দেওয়াল। মাটীর হইলেও বাটীখানি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাহিরে একখানি বড় ঘর, তাহার পর উঠান। উঠানে একটি কুলগাছ ও একটি লেবুগাছ। ভিতরে চারি-খানি ঘর। দুইখানি বড়, শয়ন-ঘর; একখানি রন্ধনশালা; আর এক-খানিতে গৃহদেবতা নারায়ণশিলা আছেন। খিড়কির দরজার পরই পুষ্করিণী; তাহার চারি ধারে নারিকেল, তাল, আম, কাঁঠাল, পিয়ারা প্রভৃতির গাছ। পুকুরের একটি পাহাড় ছোট বাগানের মত। তাহাতে দোপাটি, শিউলি, বেল ইত্যাদির গাছ। সেই ক্ষুদ্র বাগানটি ও পুকুরটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার। সবই সুমেরু বাবুর পিসিমাতার গুণে। তিনি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। সুমেরু বাবু যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, তত দিন পিসিমাতাকে দশ টাকা করিয়া মাসিক দিয়া আসিয়াছেন। তাহাতেই পিসিমা খাইয়া পরিয়া ভিটা ইত্যাদি বজায় রাখিয়াছেন। আবার তাহারই ভিতর হাতে কিছু জমাইয়াছেন। যে দিন সুমেরু বাবু পুত্ররত্নকে বিসর্জ্জন দিয়া বিধবা বধূ ও পৌত্রী গৌরীকে লইয়া নিঃস্ব অবস্থায় বাটী আসিলেন, সেই দিনই পিসিমা তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি? তুমি যাহা দিতে তাহা হইতে কিছু আছে। আর আমার শ্বশুর বাড়ীর সেই পাঁচ শত টাকা আছে। এই টাকা কোন রকমে খাটাইলে আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে। আমি একা মেয়ে মানুষ বলিয়া এত দিন সাহস করিয়া টাকা ধার দিই নাই। তুমি আসিয়াছ, এখন জমী ভাগে লইলে বেশ চলিয়া যাইবে।"

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুমেরুবাবু বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া কলিকাতার সেই এলো মেলো খরচ ও বাজে বড় মানুষীর কথা ভাবিতেছিলেন। গৌরী ও পাড়ার একটি বালিকা কুলগাছে কুল পাড়িবার চেষ্টা করিতে-

ছিল। একজন শাখা নত করিয়া ধরিতেছে; আর একজন হাতে কুল পাড়িতেছে। কুলগাছে কাঁটা না থাকিলে কেমন মজা হইত, ও তাহা হইলে এতক্ষণে তাহারা কত কুল পাড়িত, উভয়ে সে আলোচনাও করিতেছিল। এমন সময় রামদয়াল আসিয়া সুমেরু বাবুর কাছে দাওয়ায় বসিয়া প্রণাম করিল। অতীতকালের স্মৃতি এই সন্ধ্যাসমাগমে একক সুমেরু বাবুকে বড়ই কষ্ট দিতেছিল। আজ প্রায় এক মাস তিনি আসিয়াছেন, কিন্তু এক দিন ব্যতীত আর কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইসে নাই। আজ রামদয়ালকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন, "আইস। এত দিন কি আসিতে নাই? এই শোক দুঃখের উপর একক দিন কাটান বড়ই কষ্টকর।"

"আপনি ত মনে করিলে আমাদের ওদিকে যাইতে পারেন। এই সেদিন সূর্য্যকান্ত বাবু বলিতেছিলেন, সহরের সেই বড়মানুষী চালটুকু আছে। আমরা ত সকলেই এক দিন দেখা করিয়াছি; উনি যে দশ বৎসর পরে দেশে আসিলেন, একবার সকলের বাড়ী যাওয়া কি উঁহার উচিত নহে?"

"সে কথা ঠিকই বলিয়াছেন। আমি শোকে দুঃখে কেমন এক রকম বুদ্ধিশূন্য হইয়াছি। এবার একদিন তাঁহার ওখানে যাইয়া গৌরীর একটি পাত্রের সন্ধান করিতে বলিব।"

"আমি সেই জন্যই আসিয়াছি। জানেন ত আমার গৃহিণী গত বৎসর মারা গিয়াছেন। গৌরীকে যদি আমায় দেন—"

সুমেরু বাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমার কোন আপত্তি নাই। কারণ যখন পয়সা নাই তখন দোজবরেতে আপত্তি কি? কিন্তু আমার পিসিমা'র আর বৌমা'র মত হইবে না। তাঁহারা প্রথম হইতেই আমায় বলিয়াছেন, বড় ঘরে ত আমাদের মেয়ের বিবাহের আশা আর নাই। তবে গৃহস্থ ঘরের একটি ছোট ও ভাল ছেলে দেখিয়া দিতে হইবে।"

"তাহাতে ত আপনার 'দুশো পাঁচশো' চাহি—"

"আমার পিসিম'ার হাতে কিছু আছে। তাহা ছাড়া গৌরীর মামারাও কিছু দিবেন।"

রামদয়াল বাবু মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশ তাহাই দেখিবেন।

কিন্তু সূর্য্য বাবুর কাছে যাইবেন না। তিনি কেন জানি না, আপনার উপর বড় রাগিয়াছেন। আমি যদি কোন পাত্র পাইব দেখি। আমার ত বিবাহ করিতে ইচ্ছা ছিল না। হইলে এত দিন বিবাহ করিতাম। আপনার উপকারের জন্যই কেবল গৌরীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। এখন তবে আসি। আমি পাত্র দেখিব। আর কাহারও কাছে যাইতে হইবে না।"

"তোমার ছেলের সঙ্গে যদি দাও, তাহা হইলে এখনই বোধ হয় উঁহাদের মত হয়। ছেলেটি এণ্ট্রেন্স পড়িতেছে না?"

"আমি ত প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলাম। সূর্য্য বাবু বলিলেন, তাহা কখনও হইবে না। তুমি ও ছেলের বিবাহে দশ টাকা পাইবে। আর জানেন ত সূর্য্যবাবু এ গ্রামের মোড়ল তাঁহার দ্বারা আমরা সকলেই উপকার পাই। তাঁহার কথা ঠেলিতে পারি না।"

সুমেরু বাবু গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা। তবে আইস।"

(৩)

তখন মধ্যাহ্ন। রৌদ্রের তেজ বড়ই প্রখর। মাঠের গাছগুলিতে পাখী ও কাকরা কলরব তুলিয়াছে। রাখালরা গাভীগুলি ছাড়িয়া দিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া আছে। দুই একজন কৃষক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছে। এই সময়ে একটি বটগাছের ছায়ায় ছাতা মস্তকে দিয়া রামদয়াল একজন ঘটকের সহিত কথা কহিতেছিল।

ঘটক বলিল, "আমি কি আপনার সঙ্গে তামাসা করিতেছি? সত্যই ঐরূপ বর আমার হাতে আছে। একে সে 'বিয়ে পাগলা', তাহার উপর পয়সা কিছু আছে বলিয়া বদমায়েসের শিরোমণি। আমায় বলিয়াছে, সুন্দর কণে জুটাইয়া দিলে হাজার টাকা দিবে। কলিকাতার অনেকে তাহার স্বভাব জানে, তাই তথায় তাহার সম্বন্ধ ঠিক করিতে না পারিয়া এই পল্লীগ্রাম অঞ্চলে খুঁজিতে আসিয়াছি। এবার আমার খুব জোর বরাত, তাই আপনার সঙ্গে দেখা হইল। আপনি যাহা বলিবেন, আমি ঠিক ঐরূপ বলিয়া সুমেরু বাবুর মত করিয়া সব ঠিক ঠাক করিয়া ফেলিব। ভাল কথা—বর আবার 'রাতকাণা'।"

রামদয়াল হাততালি দিয়া বলিল, "বেশ বেশ তাহা হইলেই আমার মনের মত হইবে। বুড়া কি কম দুষ্ট! কিছু নাই তবু দেমাক

দেখে কে। আর আমার পসন্দসই মেয়ে যে সূর্য্যবাবু বৌ করিয়া আনিবেন, তাহাও আমার সহিবে না। সূর্য্য বাবু যেমন আমায় ঘটক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমি তেমনই জব্দ করিয়াছি। বুড়াকে বলিয়াছি, সূর্য্য বাবু তাহার উপর চটিয়াছেন। সূর্য্য বাবুকে বলিয়াছি, বুড়া তোমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে না, সে আরও বড় ঘর চাহে। কেমন বেশ বুদ্ধি খেলাই নাই?"

ঘটক হাসিয়া বলিল, "আপনার বুদ্ধির কথা আমি ত চিরদিনই জানি। না হইলে, আজ আমাকেই বা এমন নীচ ঘটকের কায করিতে হইবে কেন? দুইজনে মাস্‌তুত ভাই। বুদ্ধির দোষে আপনি উচ্চে, আর আমি কত নিয়ে। কিন্তু আপনাকে বলিতেছি দেখিবেন, এই আমার শেষ ঘটকালী। সেই পাগলের কাছে হাজার টাকা পাইলেই এ কায ছাড়িয়া কোন ব্যবসায় করিব।"

রামদয়াল বলিল, "হাজার টাকায় কি ব্যবসা হয়?"

"দেখিবেন, এবার আমারও বুদ্ধি খুলিয়া যাইবে। উহাতে আমি বড় লোক হইব।"

"আচ্ছা তবে এখন আমি যাই। সন্ধ্যার সময় আমিও বুড়ার কাছে যাইব। কারণ, যাহাতে বর দেখার ভারটা আমার উপর পড়ে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ঘটক ঠাকুর ওরফে বিশুবাবু বলিল "কিন্তু বিবাহের পর যখন সব প্রকাশ পাইবে, তখন মোড়ল সূর্য্যবাবু কি আপনাকে অল্পে ছাড়িবেন? বুঝিয়া দেখুন। আমি ঘটক, আমি লম্বা দিব। আর এ আমার বাসস্থানও নহে। মাসি থাকিতে কখন কখন আসিতাম। আপনার আমলে সে পাট উঠিয়া গিয়াছে। এই এত দূর অসিয়াছি, পাছে আপনার বাড়ী যাইয়া মধ্যাহ্ন আহারটা সারি, সেই ভয়ে এই রৌদ্রে মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন সেও ভাল, তবু বাড়ীতে লইয়া গেলেন না। লোক কথায় বলে, পৃথিবীতে মানুষকে কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট করা যায় না; কিন্তু আহারে সন্তুষ্ট খুব করা যায়। কারণ, একটা মানুষ আর কত খায়? আর একটা মানুষকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতে কতই বা খরচ?"

"না হে সেটা ভুল বুঝিয়াছ। আমার বাড়ী হইতে যদি উহাদের বাড়ী যাও লোক বলিবে, আমারই যোগাযোগ। এ আমি নেকা সাজিয়া সূর্য্যবাবুকে বলিব, বরের যে মাথা গরম বা স্বভাব খারাপ আমি জানিতাম না।

বাড়ী ঘর ভাল দেখিয়া পছন্দ করিয়া আসিলাম ; সম্বন্ধ ত আমি করি নাই। আর ও ভ্রাতার সঙ্গে মা'র মৃত্যু অবধি দেখা হয় নাই। যাউক, সে আমি গুছাইয়া বলিব। এ রকম কাণ্ড কত করিতেছি, কেহই আমাকে ধরিতে পারিয়াছে কি ?"

"আমি তবে এখন আসি। সন্ধ্যার পর কি আপনারও দিকে যাইব নাকি ?"

"যাইলে ক্ষতি ছিল না—কিন্তু না যাওয়াই ভাল।"

বিশুবাবু হাসিয়া বলিল, "তবু স্বীকার করিবেন না যে, এক বেলা খাওয়াইতে নারাজ !"

রামদয়াল গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুমি যখন কিছুতেই বুঝিবে না, তখন তাহাই।"

তাহার পর যে যাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

(৪)

আজ গৌরীর বিবাহ। সুমেরু বাবু প্রতিবেসী প্রত্যেকের বাটী যাইয়া জোড় হস্তে এই শুভ কার্য্যে যোগ দিতে বলিয়াছেন। রামদয়াল ভাবিয়াছিল, সূর্য্যকান্ত বাবু কখনই আসিবেন না। কিন্তু সে সবিস্ময়ে দেখিল, সূর্য্য বাবু ও তাঁহার পুত্র প্রাতঃকালেই আসিয়া কর্ম্ম বাড়ীতে কর্ম্মে যোগ দিলেন। রামদয়ালও কায করিতেছিল, ও মনে মনে ভাবিতেছিল, যখন সেই পাগল জামাই দেখিয়া সুমেরু বাবু যাতনায় কাঁদিবেন তখন, আমার সে দিনের অপমানের শোধ হইবে।

বেলা চারিটার সময় সুমেরু বাবু গৌরীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন আনন্দের দিনে দাদাকে কাঁদিতে দেখিয়া গৌরী একটু আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "বুঝিয়াছি কেন্ তুমি কাঁন্দিতেছ। বলিব ? আমার বর বুঝি বাজনা করিয়া আসিবে না ? সেই জন্য। না দাদা ? আমি ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

যদিও আজ নানা কথা বক্ষের ভিতর তোলপাড় করিয়া সুখের দিনেও তাঁহাকে যাতনা দিতেছিল, তবু গৌরীর সেই সরল কথায় সুমেরু বাবুর সব দুঃখ ভাসিয়া গেল। তিনি হাসিমুখে বলিলেন, "তুই ঠিক বলিতে পারিলি না, দিদি। আমিই তোমার বর ছিলাম, আর একটি বর আসিয়া তোকে কাড়িয়া লইবে, তাই কান্দিতেছি।"

"মা গো ইহার জন্য মানুষ কাঁদে! আমি ত তোমায় কত দিন বলিয়াছি, তুমি বুড়া, আমার পছন্দ হয় না। বেশ ছোট সুন্দর বর চাই। তবে তোমার কান্না কেন?

"আচ্ছা! কিন্তু বর বাজনা করিয়া না আসিলে কাঁদিতে হয় কে বলিল?"

"কাল রাত্রিতে মা কান্দিতেছিল আমি জিজ্ঞাসা করায় মা বলিল বর বাজনা করিয়া আসিবে না তাই কাঁদিতেছে। আজ তোমায় কান্দিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, তুমিও বুঝি সেই জন্য কান্দিতেছ। ও মা তাহা নহে।"

বধূর ক্রন্দনের কথা শুনিয়া সুমেরু বাবুর চক্ষু আবার সজল হইল। গৌরী একবার কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "দাদামণি, আমি ছোট বর চাই না। তোমাকেই বিবাহ করিব। আর কাঁদিও না। এ বরকে আজ ফিরাইয়া দিও।"

অষ্টম বর্ষীয়া পৌত্রীর এই উদারতা দেখিয়া সুমেরু বাবু আবার হাসিলেন। এই সময় পিসিমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর কখন আসিবে?"

সুমেরু বাবু বলিলেন "সাতটায়। কিন্তু পিসিমা, বর আর আসিয়া কি করিবে।"

পিসিমা শঙ্কাকুল হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"গৌরী আমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। সে বরকে ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছে।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ গৌরীর এ সুমতি হইল কেন?"

তখন সুমেরু বাবু সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। পিসিমা'রও চক্ষুর পাতা ভিজিয়া আসিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "সত্য বর বাজনা করিয়া আসিলে ভাল হইত। আমাদের এই প্রথম কায, এই শেষ কায। এক বার বলিয়া দেখিলে হইত।"

"তাহা কি বলা হয়, পিসিমা? একে আমরা বেশী দিতে পারিব না। আর কলিকাতা হইতে বাজনা আনিলে অনেক খরচ। আর আমিই কি তাহাদের রসদ যোগাইতে পারি?"

"সে কথা ঠিক বটে" বলিয়া পিসিমা কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা সাতটার সময় সোদপুর গ্রাম কম্পিত করিয়া বাজনা বাজিয়া উঠিল। যখন ষ্টেশন হইতে গ্রাম্য পথে সেই চারি দল বাজনা আলো আশা সোটা নিশান সমেত বরযাত্রী ও বর ইত্যাদি চলিল, তখন বড়ই হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

ছেলের দল পড়ি ত মরি করিয়া ছুটিয়া রাস্তায় আসিল। মেয়েরা বাতায়নে আসিল। একজন বৃদ্ধা কলসে জল আনিতেছিল, সে ছুটিয়া অগ্রসর হইতে পড়িয়া গেল, কলস পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ; সে নিজেও কিছু আঘাত পাইল, তবুও সানন্দে বর দেখিতে লাগিল। গ্রামের কুকুর বিড়াল ছুটিয়া ঝোপে প্রবেশ করিল। কাকরা কা কা করিয়া এ গাছ হইতে ওগাছে বসিতে লাগিল।

(৫)

যখন সুমেরু বাবুর বাড়ীর কাছে বর আসিল, তখন পুরনারীদিগের সহিত গৌরীও ছুটিয়া বর দেখিতে চলিল। পিসিমা হাসিয়া গৌরীকে বারণ করিলেন, "তুমি যাইও না, বিবাহের পূর্ব্বে কণে'কে বর দেখিতে নাই।"

গৌরী বলিল 'বাহা রে সকলে দেখিবে, আর আমি বুঝি দেখিব না? বর বাজনা করিয়া আসিবে না বলিয়া সব কত কথা! আর যেই বাজনা করিয়া আসিয়াছে সকলে ছুটিয়াছেন! অমনই আমার বেলা মানা করা! আমি শুনিব না।"

"ছি, মা, তোমায় দেখিতে নাই। তুমিও যাইও না, আমিও যাইব না।"

"কেন তোমাকেও কি দেখিতে নাই?"

পিসিমা হাসিলেন, তিনি যাইলে পাছে গৌরী লুকাইয়া দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে তিনি অত সাধের ঘটার বর দেখিবার লোভ সম্বরণ করিলেন।

সুমেরু বাবু বর নামাইতে যাইয়া পূর্ব্ববন্ধু দেবী বাবুকে দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আপনাকে এ দীনের কুটীরে আসিতে দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছি। বরের পিতার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি?"

দেবী বাবু সহাস্য মুখে বলিলেন, "না, সুমেরু বাবু, আমারই মধ্যম পুত্রের সঙ্গে আপনার গৌরীর বিবাহ।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুমেরু বাবু তখন সূর্য্যকান্তের ক্রোড়স্থিত বরের মুখের দিকে দেখিলেন, ও আনন্দকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "ধন্য ভগবান। এ কি তোমার খেলা? সেই সুরপতিই আজ আমার গৌরীর বর। দেবী বাবু আজ আমার পরম আত্মীয়! যখন বিশু বাবু বলিয়াছিল, পাত্র দেবীপ্রসাদ ঘোষের পুত্র, তখনও স্বপ্নে জানি না যে, সে আপনি। আমি বিশু বাবু ও রামদয়ালের দেখা শুনায় সব ঠিক করিতেছিলাম। আপনি তাহা কি জানি?"

সুমেরু বাবুর সেই আনন্দ দেখিয়া সূর্য্যকান্তের ও দেবীপ্রসাদের নয়নে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল। এই ব্যাপার দেখিয়া রামদয়ালের মুখ শুকাইল। বিশু রামদয়ালকে গোপনে বলিল, "ভয় পাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার ও দুষ্টামীর কথা কোন দিন প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু এই হইতে যেন আপনার শিক্ষা হয়—পরের ভাল করিলেই নির্ম্মল সুখ, মন্দ করিলে বিপদজ্বালা অনিবার্য্য।"

রামদয়াল শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "জানা ঘর জানা বর সে ত ভাল কথা। তুমি কেন তবে আমাকে ওরূপ বলিলে; সুমেরু বাবুর কাছেও সব কথা ভাঙ্গিলে না?"

সেই সময়ে বাজনা থামিল। বর সভায় বসিল; দরজায় বর-যাত্রীর ভিড় হইল। শ্যাম ও আরও কয়েকটি যুবক বেঞ্চ টুল চেয়ার ইত্যাদি লইয়া রাস্তায় পাতিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা রামদয়াল ও বিশু বাবুকে সাহায্য করিতে বলিল। কাযেই রামদয়ালের কথা আর শেষ হইল না। বিশু বাবু সুবিধামত তাহাকে বলিল, "দেবী বাবুর আজ্ঞামত আমি সব করিয়াছি। উনি বলিয়াছিলেন, এখন কিছু ভাঙ্গিও না। পূর্ব্বে সুমেরু বাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। সুমেরু বাবুর পুত্রের মৃত্যুর পর অবস্থাবিপর্য্যয়ে সুমেরু বাবু উঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়াই চলিয়া আইসেন। দেবী বাবু উদার। বড় লোক কলিকাতায় অনেক আছে; কিন্তু উঁহার মত লোক অধিক নাই। আমার এই ঘটকালীর ব্যাপারে দেবী বাবুর সঙ্গে আলাপ। ইহারই মধ্যে আমার দুঃখে উনি এত কাতর যে, বড়বাজারের দোকানে আমাকে 'শূন্যবখরাদার' করিয়াছেন। তাই আপনাকে বলিয়াছিলাম, এই আমার শেষ ঘটকালী। আপনার এই সব কথা উনি জানেন। আমি যখন বলি, উনি আমার ভাই; বিবাহের পর যেন এ সব কথা ভাঙ্গিবেন না; তখন বলেন, উঁহার মন্দ মতলবের ফলে যখন আমার উদ্দেশ্য সফল হইতেছে তখন মঙ্গল কার্য্যে উঁহাকে অপমান করিয়া—বেদনা দিয়া আমার লাভ কি? আর কখন মন্দকার্য্য করিবেন না; আপনাদের মোড়ল সূর্য্য বাবুর অনুকরণ করিবেন।"

বহু লোকের সমাগমে কিছুক্ষণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে কাটিয়াছিল; কিন্তু সূর্য্য বাবুর ও শ্যামের দক্ষতায় শেষে সব ঠিক হইল। যত বরযাত্রী আসিবার কথা ছিল তদপেক্ষা অনেক অধিক আসিয়াছিল। রামদয়াল,

বিশু বাবু, রমানাথ অনেক খাটিয়াছিল। আহারের ব্যবস্থা খুব সাদা সিধা হইয়াছিল। কিন্তু পাড়ার লোকের যত্ন, দেবী বাবুর হাসিমুখ ও সুমেরু বাবুর মিনতিপূর্ণ বাক্য এসকলে সকলেই তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেবী বাবুর সহিত তাঁহার অনেক ধনী বন্ধু ও কুটুম্ব আসিয়াছিলেন। 'কলিকাতায় ফিরিয়া সকলেই পল্লীগ্রামের বন্দোবস্ত ও পাড়ার একতার কথা গল্প করিয়াছিলেন। আর পল্লী হইতে দেবী বাবু যে একটি স্বর্ণ প্রতিমা আনিতেছেন তাহাও সকলেই বলিয়াছিলেন। কেবল আক্ষেপ যে, এমন নভেলিয়ানায় বিবাহ হইল, কবিবর্ণিত সুন্দরী 'কণে' হইল, একটিও পদ্য হইল না। এখনকার বিবাহে গাঁটছড়ার মত পদ্য চাই-ই। তাহা না হইলে সেটা যেন বিবাহই নহে। কিন্তু দেবী বাবুর পক্ষে মত হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "এখনকার সব বিবাহে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্য দেখিয়া বড় অভক্তি হইয়াছে। যাহা হইবে সবই কি বাড়াবাড়ি! কেহ পদ্য লিখিও না।" বন্ধুর দল সেই নিষেধ আজ্ঞায় পদ্য লিখে নাই; আশা করিয়াছিল, 'কণে'র বাড়ীতে একখানি অবশ্য পাইবে। তাহা ও না পাইয়া তাহাদের একটু দুঃখ হইল। আর সব তাহাদের মনের মত হইয়াছিল।

গৌরীর এই বিবাহের পর সুমেরু বাবুর বিষণ্ণ মুখে হাসি দেখা দিয়াছে। এখন তিনি মাঝে মাঝে স্বর্ণ বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া থাকেন। এখন দুইজনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। গ্রামের উন্নতিবিধানে পরস্পর পরস্পরের সহায়।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী।

নিকটে ও দূরে।

দূরে যাও, তবু হৃদয় আমার
নাহি ছাড় উৎকণ্ঠা-আকুল;
সন্ধ্যাকালে যথা ছায়া যায় বহুদূর,
কিন্তু নাহি ছাড়ে বৃক্ষমূল।

আলিবর্দ্দী-বেগম।

নবাব আলিবর্দ্দীর নাম ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার রাজত্বের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁহার বেগমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। আমরা আলিবর্দ্দী-বেগম সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আজ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

আলিবর্দ্দী-বেগম ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

রঘুজী ভোঁসলে মীর হবিবের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া স্বর্ণ-প্রসূ বঙ্গভূমির বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণান্তর ভাস্কর পণ্ডিতকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। এই মহারাষ্ট্র অভিযানের কথা নবাব আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হইলে তিনি বর্দ্ধমানের নিকটে তাহাদের সম্মুখীন হয়েন। এই সময় তাঁহার বেগমও তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ লুণ্ঠনে ও নানারূপ নির্য্যাতনে লোকদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই কার্য্যে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, 'লণ্ডা' নামক যে হস্তীর উপর নবাব-বেগম অধিরূঢ়া ছিলেন, সেই হস্তীসমেত তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া আপনাদিগের শিবিরে লইয়া যায়। নবাবের জনৈক সেনানী—ওমার খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসাহেব খাঁ, এই অবমাননায় মর্ম্মাহত হইয়া বীরবিক্রমে আত্মজীবন-বিনিময়ে বহু কষ্টে বেগমের উদ্ধার সাধন করেন। *

বালেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রেও আলিবর্দ্দী খাঁর পার্শ্বে আমরা বেগম সাহেবাকে দেখিতে পাই। রণকোলাহলের মধ্যে, অগণিত হিতের প্রাণহীন দেহ দেখিয়া যে কোমলহৃদয়া নারী আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন—শত্রু-শিবিরে বন্দিনী হইয়াও যিনি আপনার শৌর্য্য ও আত্মগরিমার পরিচয় দিতে পারেন, তিনি যে নারীকুলের শিরোমণি তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে সকলকেই

---

* "The Mahrattas continued their depredations, so much so that they laid their hands on the very elephant on which the Begum was riding, and were leading it away to their camp, when Musaheb Khan, eldest son Omer Khan rescued the Begum and the elephant."

Walsh's Murshidabad—p. 146.

স্বীকার করিতে হইবে। তিনি উৎসবে আনন্দময়ী—সোহাগে প্রেমবিহ্বলা লাজময়ী—রোগে শুশ্রূষাপরায়ণা সহচরী—বিপদে পরামর্শদাত্রী। কি রাজনৈতিক উন্নতিবিধানে—কি সামাজিক মঙ্গলকল্পে প্রজাদিগের হিতার্থে পরদুঃখকাতরা বেগম সাহেবা স্বামীকে সৎপরামর্শ দিয়া ঐ সকল শুভকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেন। আর যখনই নবাব সাহেব কোন শুভকর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাঁহার পরামর্শ লইতেন, তখনই তিনি সৎপরামর্শদানে তাঁহাকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিতেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর রঘুজী যখন বিপুল বাহিনী লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সর্দ্দার, সমসের প্রভৃতি আফগান সেনাপতিগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েন। নবাব আলিবর্দ্দী এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেগম সাহেবার পরামর্শ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলে, তিনিও সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া মজঃফর আলি ও ফকীর আলি নামক দুইজন দূতকে রঘুজীর নিকট প্রেরণ করেন। (১) এদিকে রঘুজীও নানারূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু গৃহশত্রু মীর হবিব তাঁহাকে বুঝাইলেন, আর কিছুদিন যুদ্ধ চালাইলে আলিবর্দ্দীকে বাধ্য হইয়া সন্ধি সংস্থাপিত করিতেই হইবে, কারণ তাঁহার রাজকোশ এখন প্রায় শূন্য; সৈনিকরা রীতিমত বেতন না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; অসন্তুষ্ট আফগান সামন্তগণের মধ্যে শীঘ্রই বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে—আমির ওমরাহগণ তাঁহার ব্যবহারে প্রীত নহেন, এরূপ স্থলে আপনি কেন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন? মীর হবিবের পরামর্শমতে রঘুজী নবাব-বেগমের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। রঘুজী তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন দেখিয়া বেগম সাহেবা সৈন্যগণকে মহারাষ্ট্রীয় শিবির আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন।

এই সময়ে আফগান সামন্তবর্গ নবাবকে বড়ই বিপন্ন করিয়া তুলিল। মুস্তাফার পরাজয়ের পর হইতেই তাহারা একপ্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নবাব-কর্ত্তৃক পদচ্যুত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রতিশোধ-গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং তাহারা কৌশলে নবাবের জামাতা জৈনুদ্দীনকে হত্যা করিয়া তৎপত্নী আমিনা বেগমকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

(১) Mutaqherin—Vol. I. p. 522.

এই অপ্রত্যাশিত বিপদে আলিবর্দ্দী বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ধীরপ্রকৃতি বেগম সাহেবা আমিনার উদ্ধারের জন্য ও উদ্ধতপ্রকৃতি আফগানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য অগৌণে সৈন্যসামন্ত লইয়া নবাবকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। এ যুদ্ধের পরিণাম—আমিনার উদ্ধার ও আফগানসামন্তবর্গের বশ্যতাস্বীকার।

এদিকে আবার যখন সুচরিত্রা বেগম সাহেবা হোসেন কুলির সহিত ঘসিটী ও আমিনা বেগমের অবৈধ প্রণয় দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন—যখন কন্যাদিগকে বুঝাইয়াও পাপমার্গ হইতে সুপথে আনয়ন করিতে পারিলেন না—রূপোন্মত্ত হোসেন কুলিকেও প্রণয়াস্পদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিলেন না, তখন মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া কন্যাদিগের দোষ না দেখিয়া হোসেন কুলিকেই তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল ভাবিয়া তাহার হত্যার জন্য সিরাজকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সিরাজও তাঁহার আদেশে হোসেন কুলিকে হত্যা করাইলেন।

এই সময়ে নওয়াজিস মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঘসিটীবেগমের অর্থের প্রতি সিরাজের লোলুপদৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু ঘসিটী পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিতে পারিয়া ধনরত্নাদি লইয়া মতিঝিলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর জীবদ্দশায় সিরাজ ঘসিটীর বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দীর মৃত্যুতে রাজলক্ষ্মী যখন সিরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন, তখন পিতৃব্যধনলুণ্ঠনপ্রয়াসী সিরাজ মতিঝিল অবরোধ করিলেন। বিপদ গুরুতর দেখিয়া আলিবর্দ্দী-বেগম স্বয়ং এই বিবাদ ভঞ্জনার্থ অবরুদ্ধ দুর্গপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং স্থির করিয়া দিলেন, ঘসিটীর পোষ্যপুত্র বাঙ্গালার মসনদে বসিতে পারিবে না বা ঘসিটী আপনার পোষ্যপুত্রের জন্য যুদ্ধাদি করিতে পারিবে না—সিরাজকে বাঙ্গালার নবাব বলিয়া তিনি স্বীকার করিবেন, আর সিরাজও ঘসিটীর স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না কিন্তু যেদিন বিবাদ মিটিল, সিরাজ তাহার পরদিবসই মতিঝিলের যাবদীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। ইহারই ফলে সিরাজের ইংরাজদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল ও তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। হলওয়েলকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে আনা হইল। কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইল। সিরাজ যে এত শীঘ্র হলওয়েলকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, তাহার একটা বিশেষ কারণ

আছে। আলিবর্দ্দী-বেগম ও আমিনা বেগম হলওয়েলের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য সিরাজকে বারবার কাতরকণ্ঠে উপরোধ করেন।(২) স্নেহময়ী মাতামহীর ও জননীর কাতর প্রার্থনায় সিরাজ তাঁহাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন।

হলওয়েল 'Syren' নামক জাহাজ হইতে ডেভিস্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা অবগত হই যে, যে সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন তিনি আলিবর্দ্দী-বেগমের জনৈক পরিচারিকাকে একজন শেখের সহিত বলাবলি করিতে শুনিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রিতে ভোজের সময় আলিবর্দ্দী-বেগম হলওয়েলকে মুক্তি দিবার জন্য সিরাজকে বারবার উপরোধ করেন। (৩) তাহার পর হলওয়েল অবগত হয়েন যে,তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে ; কিন্তু সিরাজের সহিত পরদিন দেখা হইলে তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। নবাব বেগম যে হলওয়েলের মুক্তির জন্য সিরাজকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য হলওয়েল বারবার তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

(২) বেগমদিগের ইংরাজদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার একটা বিশেষ কারণও ছিল। হিল (Hill) তাঁহার পুস্তকের এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"The interest of these ladies in the English Merchants may have been partly due to the fact that they also were accustomed to speculate in commerce."

Indian Records Series : Bengal—P. XCII. Vol. I.

বেগমদিগের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা মদীয় "বাঙ্গালার বেগম—আমিনা" ('বাণী'—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১৭) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) "The 16th in the morning an old female attendant of Allyverdy Cawn's Begum paid a visit to our Shaike and discoursed half an hour with him. Overhearing part of the conversation to be favourable to us, I obtained the whole from him ; and learned that at a feast the preceding night, the Begum had solicited our liberty, and that the Suba had promised he would release us on the tomorrow."

A letter from J. Z. Holwell, Esq. to William Davis Esq. from on board the 'Syren' sloop, 28th February, 1757.

Indian Records Series : Bengal—Hill—p. 151. Vol. III.

Holwell তাঁহার India Tracts (p. 273) নামক পুস্তকেও এরূপ কথা লিখিয়াছেন।

পলাশীর যুদ্ধাবসানে সিরাজের হত্যাকাণ্ড সাধিত হইবার পর মীরজাফরের পুত্র মীরণ আলিবর্দ্দী-বেগম, তাঁহার দুই কন্যা ঘসিটী ও আমিনা, সিরাজ-পত্নী লুৎফ-উন্নিসা ও তাঁহার শিশুকন্যাকে বন্দী করিয়া জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য তথাকার শাসনকর্ত্তা জেসারৎ খাঁর উপর পরওয়ানা পাঠান। কিন্তু সদাশয় শাসনকর্ত্তা এ কার্য্যে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, মীরণ তাঁহার একজন বন্ধুকে এই কার্য্যের ভার দেন। ঘসিটী ও আমিনার শোচনীয় পরিণাম—তাহাদের সলিল-সমাধি ও নির্ম্মম মৃত্যুযন্ত্রণা আমাদিগের সহানুভূতির উদ্রেক করে। অত্যাচারীর নির্ম্মম হস্ত হইতে আলিবর্দ্দী-বেগম ও লুৎফ-উন্নিসা কি প্রকারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন ও কেমন করিয়া বেগম-সাহেবা মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার বিষয় কিছুমাত্র অবগত হওয়া যায় না।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাঙ্গালার নবাব বেগমের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, আলিবর্দ্দীর পদতলে সমাহিতা বেগম-সাহেবার কবরের উপর দুই বিন্দু অশ্রু না ফেলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেঘের আর্ত্তনাদ।

আঁধারি' মেঘের মুখ চপলা যখন
পলায় ত্যজিয়া তা'র আলিঙ্গন-স্বাদ,
বহে দীর্ঘশ্বাসোচ্ছ্বাস মথি' তা'র মন,—
বুকে হানি' কাঁদি' মেঘ করে আর্ত্তনাদ!

শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী

———

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

(বিপ্লবারম্ভ)

(১৭৮৯ খৃঃ, ৫ই মে।)

সর্ব্বমঙ্গলনিদান করুণাময় ভগবানের কৃপায় আজ ফরাসী জাতির জাতীয় জীবনে নবযুগ উপস্থিত। যে সম্প্রদায়-সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্ব সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এ যাবৎ ঘোরতর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অদ্য সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত সভাসমিতির প্রথম অধিবেশনের নির্দ্ধারিত দিন। সেই জন্য অদ্য ফরাসী জাতির আনন্দের ও উৎসাহের পরিসীমা নাই। সেই জন্য অদ্য জাতীয় মহোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সুদূর পল্লী হইতে সংখ্যাতীত নরনারী ফরাসীরাজ্যের অন্যতম রাজধানী ভার্সেলিস নগরে সমবেত হইয়াছে। ভার্সেলিস নগরে একটি কারুকার্য্যশোভিত, সুবৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্ববৃহৎ কক্ষে অধিবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফরাসীরাজ স্বয়ং সেই বিরাট অধিবেশনকল্পে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। নানা রাগ-রঞ্জিত, সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপতলে অপূর্ব্বশোভাসমন্বিত সমুচ্চ মঞ্চ; তদুপরি রত্নরাজিবিমণ্ডিত রাজসিংহাসন। সিংহাসনের বামপার্শ্বে রাজমহিষী ও রাজকুমারীগণের এবং দক্ষিণপার্শ্বে রাজপুত্র ও রাজকুলোদ্ভব পুরুষগণের উপবেশনের নিমিত্ত বহুমূল্যপ্রস্তরক্ষোদিত রত্নরাজিসজ্জিত আসনশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। সম্মুখে নীল পদ্মরাগরঞ্জিত, দুকুলাচ্ছাদিত টেবল বিদ্যমান। তাহার উভয় পার্শ্বে মন্ত্রিদলের এবং মন্ত্রীদিগের পশ্চাতে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণের উপবেশনের স্থান। গৃহের বামপার্শ্বে ভূস্বামিগণের এবং দক্ষিণ-পার্শ্বে ধর্ম্মযাজকবৃন্দের নির্দ্ধারিত স্থান। রাজসিংহাসনের সম্মুখে তৃতীয় সম্প্র-দায়ের প্রতিনিধিদিগের নিমিত্ত বহুসংখ্যক আসন শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। সভ্যগণের পশ্চাদ্দিকে উচ্চ মঞ্চোপরি দর্শকদিগের উপবেশনের নিমিত্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রদায়-সমিতির প্রতিষ্ঠাদর্শনের নিমিত্ত ফরাসীরাজ্যের আবালবৃদ্ধ-বনিতা আগ্রহাতিশয্যে শকটারোহণে সমিতিগৃহাভিমুখে ধাবমান হইল; সুতরাং অধিবেশনের নির্দ্ধারিত কালের বহুক্ষণ পূর্ব্বেই দর্শকদলের জন্য

নির্দ্দিষ্ট মঞ্চাসন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কালবিলম্বে আগমনহেতু বহুসংখ্যক নরনারী স্থান প্রাপ্ত না হইয়া নিরাশ-হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিল। দর্শক-বৃন্দ সভ্যবৃন্দের আগমন দৃষ্টে জাতীয় ভাবে উন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ করতালি প্রদানে অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সচিবদল ও সভ্যবৃন্দ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে কিয়ৎকাল পরে ফরাসীরাজ সপরিবারে সমাগত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমবেত সভ্যদিগকে সম্বোধন করতঃ নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করি-লেন :—"এ যাবৎ একাগ্রচিত্তে যে দিবসের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, অদ্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছে। যে ফরাসী জাতির শাসনকর্ত্তৃরূপে বিদ্যমান থাকিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি, অদ্য আমি সেই ফরাসী জাতির প্রতিনিধিবর্গপরিবেষ্টিত। সম্প্রদায়-সমিতির শেষ অধি-বেশনকাল হইতে প্রায় দুই শতাব্দী অতীত হইয়াছে; সেই জন্য ফরাসী-জাতির এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে সমিতির অস্তিত্ব নাই। আমি সেই মৃতকল্প জাতীয় সমিতির পুনর্জ্জীবন দান করিতে অণুমাত্র দ্বিধা করি না। কারণ আমার বিশ্বাস যে, এই সমিতি হইতেই ফরাসীরাজ্যের নব শক্তি উৎপাদিত হইবে এবং এই সমিতি হইতেই ফরাসী জাতির ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধনের অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। মদীয় রাজ্যভার গ্রহণকালে যে রাজঋণ বিদ্যমান ছিল, আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরে যোগদান নিবন্ধন তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা-সমরে যোগদান করিয়া ফরাসী জাতির গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই যোগদানই যে ঋণবৃদ্ধির কারণ তৎসম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই ঋণ পরিশোধের উপায় উদ্ভাবন নিতান্ত আবশ্যক। আর একটি কথা, বর্ত্তমান সময়ে চঞ্চলতা এবং অপরিমিত পরিবর্ত্তন-লালসা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানানুমোদিত প্রশান্ত যুক্তি প্রদানে সমর্থ, তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া জনসাধারণের চিত্তস্থিরতা সম্পাদন না করিলে ফরাসী জাতির হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ সুসংস্কার অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আশা করি, আপনারা সর্ব্ব সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ যথাসম্ভব উপায় উদ্ভাবন করিতে ত্রুটি করিবেন না। রাজ্যের ব্যয়সঙ্কুলানের নিমিত্ত আমি মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আপনারা কেহ কোন

যুক্তি প্রদান করিতে অভিলাষী হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু মিতব্যয়িতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও প্রজাদিগের আশু দুঃখবিমোচনের উপায় দেখিতেছি না। রাজস্ব বিভাগের প্রকৃত অবস্থা আপনারা মন্ত্রীদিগের নিকট অবগত হইবেন। ভরসা করি, আপনারা রাজকোশের অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক রাজ্যের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি সংরক্ষণের নিমিত্ত যথাসম্ভব উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু আমি আশা করি, সুবিজ্ঞ প্রতিনিধিগণ বিজ্ঞতা ও সতর্কতা পরিহার করিয়া কার্য্য করিবেন না।"

ফরাসীরাজ আসন গ্রহণ করিলে মন্ত্রীবর নেকার রাজকোশের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীবরের বক্তৃতা সভ্যদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিল না। সময়োচিত প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের প্রীতি জন্মে না। সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে, কি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ একই সভায় সম্মিলিত হইবেন তৎসম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু নেকার তৎপ্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া নীরস রাজকরপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ যাবৎ বাক্যব্যয় করিলেন। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে কোন সম্প্রদায়ই তৃপ্তিলাভ করিল না। অনন্তর বেলা সার্দ্ধ চারিঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইলে সভ্যগণ হতাশ্বাস হইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় দিবস (৬ই মে, ১৭৮৯)

সমিতির গঠনপ্রসঙ্গে মতভেদ নিবন্ধন সম্প্রদায়বর্গের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। অধিবেশনের নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিবসের নির্দ্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণ তথা হইতে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যগণ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বিনা সম্মিলনে সমিতির কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইবেন না। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইলে সভ্যগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় দিবস (৭ই মে, ১৭৮৯)

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যগণ অধিবেশনের নির্দ্ধারিত কালে সমাগত

হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিলেন। কিন্তু প্রাগুক্ত বিরোধ নিবন্ধন তাঁহাদের উপবেশন মাত্র সার হইল। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বিনা সম্মিলনে কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইবেন না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যাগণ অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে কালক্ষেপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণ কোনক্রমে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। (১)

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়বর্গের বিরোধভঞ্জন হইল না। এদিকে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্যারিস নগর হইতে বহু সংখ্যক ব্যক্তি ভার্সেলিস নগরে আগমন করিল। রাজনৈতিক সভামণ্ডল তৃতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলন কামনা করিল। প্রতিদিন সংখ্যাতীত সংবাদ পত্রে জন্মভূমির কল্যাণের নিমিত্ত সম্মিলনের প্রয়োজন প্রতিপাদিত হইল। প্যারিস নগরে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইল। তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যদল সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি লাভে বর্দ্ধিতশক্তি হইয়া সাম্য সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজনৈতিক গগন প্রগাঢ় মেঘাচ্ছন্ন দৃষ্টে ফরাসীরাজের দুশ্চিন্তার পরিসীমা রহিল না। উপস্থিত বিরোধের পরিণামফল চিন্তা করিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজকোশের শোচনীয় অবস্থা প্রযুক্ত বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। সমিতির অধিবেশনে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব ঘটিলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু বিরোধভঞ্জন ভিন্ন সমিতির অধিবেশন সম্ভবপর নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় বিরোধভঞ্জন মানবের সাধ্যাতীত। ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজকগণ স্মরণাতীত কাল হইতে বিশিষ্ট অধিকার ভোগে অভ্যস্ত হইয়া সহসা সাম্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক; আবার তৃতীয় সম্প্রদায়

---

(১) ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত সভ্য সংখ্যা—

ধর্ম্মযাজক	২৯১
ভূস্বামী	২৭০
তৃতীয় শ্রেণী	৫৫৭
মোট সংখ্যা	১১১৮

সাম্য সংস্থাপনের ঈদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন ইহাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রতিকূল স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।

দশ দিবস যাবৎ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ভিন্ন ভিন্ন গৃহে উপবেশন ও যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু প্রাগুক্ত বিরোধ প্রযুক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে কেহই মনোনিবেশ করিলেন না। পরদিবস ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের কয়েকজন সভ্য তৃতীয় সম্প্রদায়ের গৃহে আসিয়া কহিলেন,—"পল্লীবাসিগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দুঃখ বিমোচনের উপায় উদ্ভাবনকল্পে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েকজন সভ্য সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক।"

ইহা শুনিয়া তৃতীয় সম্প্রদায়ের জনৈক তরুণবয়স্ক সভ্য উত্তর করিলেন— "আপনারা আপনাদিগের সঙ্গীদিগের নিকট বলুন যে, যদি তাঁহারা দরিদ্র ব্যক্তিগণের দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে এই গৃহে সর্ব্বসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া তৎসম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করুন। তাঁহারা যেন কৌশলে কালবিলম্ব করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান না করেন। তাঁহাদিগকে আরও এই কথা বলিবেন যে, প্রতারণা-পূর্ণ পন্থাবলম্বনে তাঁহারা কোন ক্রমেই আমাদিগকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে পারিবেন না। দরিদ্র ব্যক্তিগণের ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত তাঁহারা আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিলাস পরিত্যাগ করিলেই সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাদের প্রত্যেকের বিলাসপরিচর্য্যার নিমিত্ত বহুসংখ্যক মূল্যবান পরিচ্ছদধারী ভৃত্য বিদ্যমান। সেই ভৃত্যগণকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়া তাহাদের পরিচ্ছদ বিক্রয় করিলেই সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থের সাহায্যে দীনদুঃখীগণের ক্লেশনিবারণ হইতে পারিবে।"

তরুণবয়স্ক বক্তার নাম রবছপিয়র। যি· কয় বৎসর পরে জেকবিন সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান নেতৃরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সংহারমূর্ত্তী ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রুধিরস্রোতে প্লাবিত করিয়াছিলেন, ইনিই সেই স্বনাম খ্যাত রবছপিয়র। রবছপিয়র এ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক রঙ্গভূমে একাধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার তেজস্বীতা দর্শনে প্রীত হইয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলী করতালি প্রদানে তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

কিয়দ্দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে পরিশেষে বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েকজন সভ্য একত্রিত হইয়া অশেষবিধ তর্কযুক্তি প্রয়োগে বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন। কিন্তু তৎসমস্তই ব্যর্থ হইয়া বিরোধ পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যগণ সমগ্র ফরাসী জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় বর্দ্ধিতশক্তি হইয়া ধর্ম্মযাজক ও ভূস্বামিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সমিতির গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ মহানুভব বেলি সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়া সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত সভ্যদলের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। কিন্তু মর্য্যাদাগর্ব্বী স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ধর্ম্ম-যাজক ও ভূস্বামিগণ কেহই আগমন করিলেন না। পরদিবস (১৩ই জুন) যথা সময়ে সমিতির অধিবেশন হইল। সভাপতি মহোদয় যথারীতি সভ্যগণকে আহ্বান করিলেন। তখন তিন জন ধর্ম্মযাজক উপস্থিত হইয়া তৃতীয় সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিলেন। তদ্দৃষ্টে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর আনন্দের পারসামা রহিল না। তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুকগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১৭ই জুন (১৭৮৯) চতুঃসহস্র দর্শক বিদ্যমানে নবপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সমিতি "জাতীয় সমিতি" নাম ধারণ পূর্ব্বক শাসনসম্পর্কীয় সর্ব্ববিষয়ে হস্তার্পণে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরে জাতীয় শক্তির অদ্ভুৎ প্রতাপে ও অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্ব শক্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল। এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীর যুগপৎ সংঘটন দর্শনে ভূস্বামিগণ স্তম্ভিত হইলেন; রাজা ও মন্ত্রীদলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। উপস্থিত মহাবিপ্লবের গতিরোধ পূর্ব্বক রাজশক্তির পুনঃ-প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহারা নিরতিশয় ব্যস্ততা সহকারে রাজভবনে সম্মিলিত হইলেন ১৯শে জুন ১৭৮৯)। তথায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, আগামী ২৩শে জুন ফরাসী-রাজ স্বয়ং সমিতিগৃহে উপস্থিত হইয়া সম্প্রদায়বর্গের বিরোধ ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু তৎকাল যাবৎ রাজাজ্ঞা প্রচারে সমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকিবে। পরদিবস প্রত্যূষে কর্ম্মচারিগণ ভার্সেলিস নগরে এইরূপ ঘোষণা করিল যে, প্রাগুক্ত দিবসে রাজা সমিতিগৃহে পদার্পন করিবেন। কিন্তু কর্ম্মচারি-গণের ভ্রমবশতঃ তৎকাল যাবৎ সমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকা প্রসঙ্গে কোন আজ্ঞা প্রচারিত হইল না। সভ্যগণ অধিবেশনের নির্দ্ধারিত কালে সমিতি-গৃহের দ্বার রুদ্ধ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা ও মন্ত্রিগণের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ

করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সন্নিহিত ক্রীড়াপ্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া প্রত্যেকেই এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন যে, যাবৎ ফরাসী রাজ্যের শাসনশক্তি সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাবৎ তাঁহারা কোনক্রমেই সভাভঙ্গ করিবেন না, যদি রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্থানান্তরে সম্মিলিত হইবেন। (২১শে জুন)।

সভ্যগণের নির্ভীকতা ও অদ্ভুৎ কার্য্যকলাপ দর্শনে রাজা ও মন্ত্রীরা স্তম্ভিত হইলেন। উপস্থিত মহাশঙ্কটে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তাঁহারা শশব্যস্ত হইয়া রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্রণা স্থির করিলেন যে, রাজা তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া ফরাসী জাতির সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন ও অভিযোগ-শ্রবণ করিবেন; কিন্তু লুপ্তপ্রায় রাজশক্তির পুনরুদ্ধারকল্পে সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২২শে জুন) এদিকে জাতীয় সমিতির সভ্যগণও অলস ও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহারা সমিতিগৃহের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সন্নিহিত ক্রীড়া উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন। তথা হইতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা সেন্ট লুই নামক ধর্ম্মমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অধিবেশন আরব্ধ হইলে বহু সংখ্যক ধর্ম্মযাজক সভ্যের যোগদান নিবন্ধন সমিতির শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর ২৩শে জুন পূর্ব্বপ্রচারিত রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সমিতি-গৃহে সমিতির অধিবেশন হইল। তখন সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত সভ্যদল তথায় উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ফরাসীরাজ সান্ত্রিগণ পরিরক্ষিত হইয়া পূর্ণ রাজাড়ম্বরে আগমন পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া সাম্যবাদী তৃতীয় সম্প্রদায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিন্তু ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজকগণ পুনঃ পুনঃ করতালি প্রদানে তৎপ্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যগণকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ তীব্রভাবে সমালোচনা করিলেন। অনন্তর তিনি উপবেশন করিলে সমিতির গঠন ও জাতীয় অভাব মোচন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রাজাজ্ঞা কয়েকটি পঠিত হইল :—

(১) সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) বিগত ১৭ই জুন তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যগণ যে সমস্ত মন্তব্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই রহিত হইল।

(৩) ভবিষ্যতে সম্প্রদায় সমিতির অধিবেশনপ্রসঙ্গীয় নিয়মাবলী রাজা স্বয়ং প্রণয়ন করিবেন।

(৪) অধিবেশনকালে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে।

(৫) রাজকর নির্দ্ধারণ সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে।

(৬) রাজকরের ভার সর্ব্ব সম্প্রদায় তুল্যরূপে বহন করিবেন।

(৭) রাজভবনে মিতব্যয়িতা অবলম্বিত হইবে।

(৮) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ হইবে না।

(৯) প্রজাবর্গের দৈনিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(১০) দণ্ডবিধি সংশোধিত হইবে।

রাজাজ্ঞা কয়েকটি পঠিত হইলে, রাজা সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"সভ্য মহোদয়গণ, আমার অভিপ্রায় আপনারা অবগত হইলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণ ভিন্ন আমার অন্য কোন কামনা নাই। কিন্তু যদি দৈববিড়ম্বনা প্রযুক্ত আপনারা আমার কার্য্যে সহায়তা না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে প্রজাগণের প্রতিনিধি জ্ঞানে একাকী স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবান হইব। আমার বিনা সম্মতিতে আপনাদের শাসন কার্য্যে হস্তার্পণের অধিকার নাই। আমি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের রক্ষাকর্ত্তা; সেই জন্য আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমি সর্ব্ব সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি। এই ক্ষণে আমি আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, আপনারা অদ্য সভাভঙ্গ করিয়া আগামী কল্য সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি সংগঠনে প্রবৃত্ত হইবেন।"

এই বলিয়া ফরাসীরাজ সমিতিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভূস্বামী ও রাজভক্ত ধর্ম্মযাজকগণ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের সভ্যগণ এবং যে সকল ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই স্থানত্যাগ করিলেন না। ফরাসীরাজ সমিতি-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে বাগ্মীকুলতিলক মিরাবো সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—

"রাজা যে সমস্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন, তদ্দারাই দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু যথেচ্ছাচারনীতিপরায়ণ নৃপতিকুলের অনুগ্রহও ভয়ঙ্কর। তিনি আপনাদের সমক্ষে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

করিয়াছেন। অস্ত্রবল প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতীয় মন্দির কলুষিত না করিয়া কি জনসাধারণকে অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করা যায় না? আবার, প্রাগুক্ত ব্যবস্থাবলী তিনি স্বয়ংই প্রণয়ন করিলেন, যেন তিনিই আপনাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা! যিনি আপনাদের আদেশ পালন করিবেন, তিনিই আপনাদের আদেশকর্ত্তা! আপনাদের স্বাধীন মন্ত্রণায় বিঘ্ন প্রদানের নিমিত্ত সৈনিকগণ সমিতি-গৃহে প্রবেশ করিল। এই সমস্ত কারণ প্রযুক্ত আমি প্রস্তাব করি যে, আপনারা আত্মমর্য্যাদা সংরক্ষণকল্পে স্ব স্ব প্রতিজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্মানুসারে কার্য্য করুন; অর্থাৎ যাবৎ দেশের শাসনপ্রণালী সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাবৎ সভাভঙ্গ করিবেন না।"

মহামতি মিরাবো উপবেশন করিলে জনৈক রাজকর্ম্মচারী সমিতি-গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সভাভঙ্গ করিতে রাজা আদেশ করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া মিরাবো বলিলেন, "যদি আমাদিগকে স্থানচ্যুত করাই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বল প্রয়োগ করুন। আপনার প্রভুর নিকট গিয়া বলিবেন যে, আমরা সমগ্র ফরাসীজাতির আদেশক্রমে এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। বলপ্রয়োগ ভিন্ন তিনি আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিবেন না।"

প্রকৃতিপুঞ্জ মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক রাজাজ্ঞার প্রতিকূলচারী হইলে বল-প্রয়োগ ভিন্ন রাজার উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না। সৃষ্টি হইতে এ যাবৎ ভূমণ্ডলের প্রজাপীড়ক বা প্রজারঞ্জক কোন শ্রেণীর ভূপতিই বিদ্রোহ দমনকল্পে পাশব শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু ফরাসীরাজের শক্তি কোথায়? তিনি সৈন্যগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সমগ্র ফরাসীজাতির সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিতে পারেন না। সৈনিকগণের প্রতি শিরা ও ধমনীতে ফরাসী শোণিত প্রবাহিত। তাহারা স্বজাতি-প্রেম, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া উদরান্নের নিমিত্ত স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং গত্যন্তর দৃষ্টি না করিয়া ফরাসী-রাজ সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলনে একমাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন।

সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলন বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র ভার্সেলিস নগরী আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ প্রকাশের সুযোগ প্রদানকল্পে জাতীয় সমিতির অধিবেশন কয়েক দিবসের নিমিত্ত স্থগিত থাকিল।

শত সহস্র নর নারী রাজভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দিগ-দিগন্ত নিনাদিত করিয়া রাজা, রাজ্ঞী ও রাজপুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করিল। নিশাসমাগমে সমগ্র নগরী আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ফরাসী জাতির আনন্দের ও উৎসাহের পরিসীমা রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিদায়।

আবার বিদায়!

পশ্চিমেতে অস্তগামী রবির কিরণ,
এঁকেছে বিদায়-ছবি আকাশের গায়।
আমারো ফুরায়ে এল দু'দিনের হাসিখেলা,
ও'রি সাথে নিতে হ'বে এখনি বিদায়।
শ্রান্ত এ পরাণ ল'য়ে শান্তিময় স্নেহকোলে,
এসেছিনু জুড়াইতে দু'টি দিন গেল চলে,
এ'রি মাঝে উঠিয়াছে কর্ম্মের বিষাণ বাজি',
পশ্চাতেতে কার্য্যক্ষেত্র ডাকে আয় আয়।
কত সুখ কত আশা নবীন হৃদয়ে মম,
জেগেছিল দু'টি দিনে সোনার স্বপনসম,
হরষের পরে ওই বিষাদ ডাকিছে পাছে;
কাতরে পরাণ কহে, এখনি বিদায়!

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু

জীবন-সংগ্রামে সহায়।

জীবের জীবন এক একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম। এই সংগ্রাম মৃত্যুর বিরুদ্ধে। মৃত্যু নানাবিধ উপায়ে জীবকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে, পক্ষান্তরে জীবও তাহার সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিয়া নিরন্তর আত্মরক্ষা করিতেছে। আহার্য্য সংগ্রহ, প্রবলতর জন্তুর আক্রমণ হইতে সতর্ক থাকা, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শরীরকে তদুপযুক্ত সহনশীল করা প্রভৃতি নানা বিষয়ের নিমিত্ত তাহাকে সতত সচেষ্ট থাকিতে হয়

প্রকৃতি এক দিকে যেমন তাহাকে আক্রান্ত করিবার বহুবিধ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, পক্ষান্তরে তেমনই আবার সেই সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ততা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আক্রমণ এবং আত্মসংরক্ষণ—ইহাই নিয়ম—ইহাই প্রকৃতির লীলা। এই মহাহবে যেসকল জীব সর্ব্বাপেক্ষা চতুর অথবা শক্তিমান, তাহারাই বাঁচিয়া যায়। দুর্ব্বলতর জীবের লোপসাধন হয়। এই যুদ্ধে বীরপণা করার নাম জীবন-ধারণ করা এবং ইহাতে পরাজিত হইলেই মৃত্যু।

বহুসংখ্যক জীব জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং সন্তানোৎ-পাদন করিতে বাঁচিয়া থাকে কয়টা? যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান, চতুর, আহারীয় সংগ্রহে সুপটু, বিপদনিবারণার্থ সর্ব্বদা সজ্জিত এবং সতর্ক, তাহারাই এই সংগ্রামে টিকিয়া যায় এবং তাহাদের এই বিশেষ গুণগুলি তাহাদের সন্তানের হস্তে সমর্পিত করে।

এই সকল গুণ থাকিলেই যে জীবনরক্ষা একবারে নিশ্চিত, তাহা নহে। কারণ, জীব জীবন-সংগ্রামে যতই দক্ষ হউক না কেন তাহার অস্তিত্ব সকল সময়েই যেন একটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। কারণ, জলবায়ুর আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইলে মৃত্যু সকলকেই সমভাবে তাহার পথে টানিয়া লইয়া যায়। তবে মোটের উপর ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যোগ্য-তমরাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যায়।

জীবের জীবনটাকে একটা বিরাট সংগ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিলাম বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে, ইহা একটা ভীতিপূর্ণ অপ্রীতিকর ঘাতপ্রতিঘাত মাত্র। বস্তুতঃ ইহা প্রীতিজনক। এই ঘাতপ্রতিঘাতেই সুখ। জীব ইহাই চাহে। কেবল এই ঘাতপ্রতিঘাতের সমষ্টিরই নাম যদি জীবন হয়, এবং সেই

জীবন যদি জীবের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়, তাহা হইলে সেই ঘাতপ্রতিঘাত-গুলিও আকাঙ্ক্ষিত হইবে না কেন? পক্ষিজননী যখন তাহার নীড়মধ্যে শাবকগুলিকে রাখিয়া সমস্ত দিন নানা স্থানে বিচরণ করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সেই শাবকগুলিকে আহার করায়, তখন কি সে এই কার্য্যে বিরক্তি বা ক্লেশ অনুভব করে? কখনই না। একটা অজ্ঞাত শক্তি তাহাকে এই কার্য্যে প্রাণোদিত করিতেছে। ইহাই যেন তাহার জীবনের ব্রত—এই উদ্দেশ্যেই যেন তাহার সৃষ্টি—ইহাতেই যেন তাহার সুখ। ইহা যদি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তিকর কার্য্য হইত, তাহা হইলে কেহ বোধ হয় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইত না। এই মোহিনী শক্তিটুকুই জগৎযন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ। এই শক্তির বলে এবং কৌশলে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা ঘড়ির কাঁটার মত যথা নিয়মে সূক্ষ্মভাবে চলিয়া আসিতেছে। জড়জগতেও এই নিয়ম বর্ত্তমান। কোন একটা জড় বস্তুর অপর কোন একটা না একটা আকর্ষণ আছে—একটা সম্প্রীতি আছে। চুম্বক লৌহ দেখিলেই আকর্ষণ করিবে, চিনি জলে দিলেই মিশিয়া যাইবে।

জীবন ধারণ করিতে গেলে আত্মরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল জীবই আত্মরক্ষার জন্য সতত সতর্ক হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া নাই। সকল জীবই তাহাদের জীবনের কল্পিত অথবা বাস্তব সুখ-সম্পদ উপভোগ করিতেছে। বিপদের কথা তাহারা আদৌ ভাবে না। তবে বিপদ যখন উপস্থিত হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা সচেষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বভাবের লীলা কেবল ক্ষুদ্র বৃহৎ সংখ্যাতীত আহবে পরিপূর্ণ। এই সকল আহব চালাইতে হইলে কতকগুলি অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন। কারণ, বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ কখনও সম্ভবে না। যখন দুইজনে হাতাহাতি হয়, তখন তাহাদের হাত দুইখানাই অস্ত্রের কার্য্য করে। এমন কি যাত্রার দলের বৃথা যুদ্ধেও ধারহীন তরবারি, আবদ্ধপুচ্ছ শরযুক্ত শরাসন এবং তুলাপূর্ণ গদার প্রয়োজন। সেই জন্য প্রকৃতি কতকগুলি অস্ত্রের সৃজন করিয়াছেন। এই সকল অস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি যেমন আক্রমণের জন্য তেমনই কতকগুলি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি এক সঙ্গে ঢাল এবং তলোয়ার উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি নিরপেক্ষ জননী। মাংসাশী পশুর ভয়ঙ্কর দন্তশ্রেণী, শিকারী পক্ষীর বক্র চঞ্চু ও নখর, সর্পের বিষময় দন্ত, কীটের হুল প্রভৃতি এই সকল আক্রমণের জন্য। পক্ষান্তরে আবার

সজারুর গাত্রস্থ কণ্টক ও কর্কট, চিংড়ী, শম্বুক, শঙ্খ, কচ্ছপাদির পৃষ্ঠস্থ খোলা প্রভৃতি আত্মরক্ষার বর্ম্মস্বরূপ।

মানুষের যুদ্ধে যেমন বল ও কৌশল সমধিক প্রয়োজনীয়; প্রকৃতির এই জীবন-সংগ্রামেও ঠিক সেইরূপ। প্রকৃতি সেই জন্য তাঁহার সন্তানগণকে কেবল আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা করিবার অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। পরন্তু তিনি তাহাদের জন্য কতকগুলি কৌশলেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল।

উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী শ্বেত তুষারাচ্ছন্ন দেশের অধিকাংশ জীবই তাহাদের আক্রমণকারীর দৃষ্টিপথ হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্বেত ভল্লুকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল দেশের আর একটু দক্ষিণে আসিলে দেখা যায় যে, তথায় জীবগণ ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের বর্ণেরও পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ঐ দেশীয় শৃগাল, আর্ম্মিন্ প্রভৃতি জন্তুরা গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ ধূসরবর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু শীতাগমে—যখন চতুর্দ্দিক তুষারধবল হইয়া যায়—তাহারা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। অবশ্য ঐ দেশীয় কতকগুলি জন্তু সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া একই প্রকার বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু একটু যত্ন করিয়া অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, উহাদের আত্মরক্ষার অন্য কতকগুলি উপায় আছে।

মরুবাসী জন্তুগণ সাধারণতঃ বালুকাধূসরবর্ণ হইয়া থাকে। কোন কোন কীটের এরূপ শক্তি আছে যে, তাহাদিগকে যদি বিভিন্ন বর্ণের বৃক্ষশাখায় স্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই বৃক্ষের অনুরূপ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কতকগুলি প্রজাপতির পক্ষদ্বয়ের একদিক সুরঞ্জিত। তাহারা যখন উড়িতে থাকে তখন তাহাদিগকে বেশ স্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়। কিন্তু যখন তাহারা আবার তাহাদের পক্ষদ্বয় একত্র সংযুক্ত করিয়া—কোন বৃক্ষগাত্রে সংলগ্ন হয়, অর্থাৎ যখন তাহাদের পক্ষদ্বয়ের অপর পৃষ্ঠ কেবল দৃষ্টিগোচর হয়—তখন তাহাদিগকে বৃক্ষগাত্র হইতে পৃথক ভাবে হঠাৎ দেখা যায় না। আবার এক প্রকার প্রজাপতি আছে, তাহারা তাহাদের ভক্ষকের রসনায় বিস্বাদ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, ভক্ষকের অনাসক্তিই তাহাদের জীবন রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

এই সকল উপযোগিতা এক জাতীয় জীবকে অপর জাতীয় জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু এক শ্রেণীরই জন্তুর মধ্যে

আহারার্জ্জনের জন্য যে আহব তাহা অতি ভয়ঙ্কর। এ ক্ষেত্রে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান এবং চতুর তাহারাই সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। দুর্ব্বলরা খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

যাহা হউক এ বিষয়েও জীবের কষ্ট কতকটা লাঘব করিবার জন্য, প্রকৃতি দেবী কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছেন। কতকগুলি বিভিন্ন জন্তু, যদিও তাহারা একশ্রেণীর নহে তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে একই খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। এই প্রকারের কতকগুলি পক্ষীর মধ্যে যাহারা আকারে বড়, তাহারা একটু বড় আকারের কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে। আবার যে সকল পক্ষী তাহাদের অপেক্ষা আকারে একটু ছোট তাহারা ক্ষুদ্রতর পতঙ্গাদির দ্বারা জীবন ধারণ করে।

আবার দেখা যায় যে, শীত ঋতুর আগমনের সঙ্গে যখন আহার্য্যের অভাব উপস্থিত হয়, তখন অনেক জীব সর্প, ভেক, কতিপয় জাতীয় ইন্দুর ইত্যাদি) তাহাদের আহারান্বেষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে এক প্রকার সুপ্ত অবস্থায় কালযাপন করে। এ অবস্থায় তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি ধীরভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া শক্তির অপচয় অতি অল্প। প্রগুপার্জ্জিত শক্তির সাহায্যে তাহারা কোন প্রকারে সজীব থাকে মাত্র। যখন আবার গ্রীষ্ম ঋতু উপস্থিত হইয়া তাহাদের আহারের আয়োজন করিয়া দেয়, তখন তাহারা বুভুক্ষিত অবস্থায় ভীষণ ভাবে বাহির হইয়া পড়ে এবং বিচার বিতর্ক না করিয়াই খাদ্যবস্তু যাহা সম্মুখে পায় তাহাই ভক্ষণ করিতে থাকে। এই সময়ে তাহাদের জিঘাংসা অত্যন্ত প্রবল। এই সময়ে যুদ্ধ অতি প্রচণ্ড। এই যুদ্ধে যে জয়ী হইতে পারে সে-ই কিছুদিন পৃথিবীতে অবস্থান করে।

পক্ষীদিগের মধ্যে অনেকে যখন কোন স্থানে বা সময়ে আহার্য্যের অভাব হয় তখন দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের জীবন রক্ষার অনুকূল স্থানে গমন করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জীবন-রক্ষার অসংখ্য উপায় বিদ্যমান। এইরূপে আক্রমণ ও আত্মসংরক্ষণের বিবিধ উপায়ের সমষ্টি লইয়া, জন্ম ও মৃত্যুর সমবায় লইয়া, জগৎ চলিতেছে। ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য অথবা লীলা।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

পাষাণের কথা।

(১৩)

যশোধর্ম্ম দেবের বিশাল সাম্রাজ্য জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, উত্তরাপথে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই; রেবাকণ্ঠ হইতে লৌহিত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর স্বীয় অনুজকে স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যশোধর্ম্মের মৃত্যুর সহিত আর্য্যাবর্ত্তে দশপুরের রাজবংশের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন গুপ্তবংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নিত্যই নূতন রাজ্য গঠিত ও অচিরে বিলুপ্ত হইতেছিল। যশোধর্ম্মের মৃত্যুর সহিত ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামের সৌভাগ্যসূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছিল। যতদিন সম্রাট জীবিত ছিলেন ততদিন ত্রাণকর্ত্তা বৃদ্ধ স্থবিরকে স্মরণ করিয়া স্তূপ ও সঙ্ঘারামের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, ততদিন সঙ্ঘারামের অধিবাসীর অভাব হয় নাই। অর্থলোলুপ, সঙ্কীর্ণচেতা, পশুবৃত্তির অনুসরণকারী বোধিসত্ত্ব ও শক্তিগণের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পরে যখন আর্দ্র বালুকানির্ম্মিত কন্দুকের ন্যায় সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি বন্ধনহীন হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তখন বোধিসত্ত্ব ও শক্তিমণ্ডলী সুখের দিন অতীত দেখিয়া স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। আটবিক প্রদেশ তখন জনাকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। দূরে আভীরগণ একখানি গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিল; নির্ভয়হৃদয়ে অসিতবরণী আভীর বালিকাগণ অগ্রজের নগর-শিরে মহিষচারণ করিত। সঙ্ঘারাম জনশূন্য হইলে গ্রাম হইতে আভীর রমণীগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া স্তূপ ও সঙ্ঘারাম মার্জ্জনা করিত, বনজাত পুষ্পমালায় আমাদিগকে সজ্জিত করিত এবং রজনীতে অসংখ্য ঘৃতপ্রদীপদানে আমাদিগের নিকট হইতে অন্ধকারকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত। আভীর যুবকগণ আসিয়া আমাদিগকে অরণ্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিত, বংশদণ্ড ও কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জীর্ণ সঙ্ঘারামের সংস্কার করিত এবং সময়ে সময়ে সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া গ্রাম-বৃদ্ধগণের নিকটে বোধিসত্ত্বগণের অসীম প্রভাব এবং যাদুবিদ্যায় তাহাদিগের অসাধারণ পারদর্শিতা সম্বন্ধে অত্যদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইত। কখন কখন দুই একজন কাষায়পরিহিত ভিক্ষু দূরদেশ হইতে

তীর্থভ্রমণে আসিতেন, বহু পরিশ্রমে বনপথ অতিক্রম করিয়া আমাদিগের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। আভীর রমণীগণ যথাসাধ্য তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। তাঁহারা গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রচলিত প্রাচীন প্রথানুসারে স্তূপ অর্চ্চন, পরিক্রমণ ইত্যাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনরায় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন। এইরূপে কত দিন কাটিয়াছিল তাহা যদি নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিত না। দীর্ঘ দিবস, মাস, বর্ষ আমরা বনচারী আভীরগণের উপাস্য দেবতা হইয়া ছিলাম সঙ্ঘারাম ক্রমে মৃৎস্তূপে পরিণত হইল, পরিক্রমণের পথ শ্যামল দুর্ব্বাদলে আচ্ছন্ন হইল, হরিদ্বর্ণ শৈবালে আমার লোহিত দেহ আবৃত হইয়া গেল, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কেহ আর আমাদিগকে সন্ধান করিতে আসিল না।

এক দিন আভীর পল্লীতে নূতন সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ভিক্ষু আসিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ গৈরিকবর্ণরঞ্জিত, কেশপাশ দীর্ঘ জটায় পরিণত, সমগ্র দেহ ভস্মলেপিত এবং তাহার হস্তে ত্রিশূল। পল্লীর বালকবালিকাগণ তাহাকে দেখিলে দূরে পলায়ন করিত; কিন্তু আভীর বৃদ্ধগণ তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। এই নূতন ভিক্ষু মাসাধিককাল আভীরগ্রামে বাস করিয়াছিল। সে প্রতিদিন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুদুর পর্য্যটন করিত। সে বনভ্রমণকালে একে একে প্রাচীন আটবিকদেশের সমস্ত ধ্বংসাবশেষই লক্ষ্য করিয়া দেখিল। সে অগরাজুর নগর, স্তূপ ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। ইহার পর কিছুকাল নূতন ভিক্ষু স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তখন মধ্যাহ্নে আভীর রমণীগণ আমার ছায়ায় বসিয়া বলিত, "সন্ন্যাসী আপনার দল আনয়ন করিতে মধ্যদেশে গমন করিয়াছে, শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

বস্তুতঃ শৈব সন্ন্যাসী প্রায় তিন মাসকাল পরে অন্যূন পঞ্চাশৎজন অল্প-বয়স্ক সন্ন্যাসী লইয়া পুনরাগমন করিল। নবাগত ভিক্ষু-সম্প্রদায় অগরাজুর নগরের ধ্বংসাবশেষের সর্ব্বোচ্চস্থানে গৃহ নির্ম্মান করিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রথম যে সন্ন্যাসী আভীর-গ্রামে আসিয়াছিল সেই ব্যক্তিই নূতন সঙ্ঘারামের মহাস্থবির হইয়াছিল। ইহারা সঙ্ঘারামকে মঠ বলিত, মহাস্থবিরকে মঠাধীশ বা মঠাধিপ বলিত এবং রাজার ন্যায় সম্মান করিত। বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুগণের ন্যায় স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা

এই নূতন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত না। ইহারা সর্ব্বদাই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও উপাসনায় মগ্ন থাকিত, কঠোর আত্মসংযমে জীবন অতিবাহিত করিত, জ্যেষ্ঠ ও স্থবিরগণকে পিতৃতুল্য বোধে সম্মান করিত এবং স্ত্রীজাতিকে কালব্যালস্বরূপ জ্ঞান করিয়া দূর হইতে পরিহার করিত।

আভীরগণের সাহায্যে স্তূপ ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাষাণ সংগ্রহ করিয়া স্তূপের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে সন্ন্যাসিগণ কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে প্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশিষ্টের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তোমরা তাহার ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলে। সন্ন্যাসিগণ সেই গৃহে বাস করিতেন। পল্লীবাসি আভীরগণের উপহার ও বনজাত ফলমূল তাঁহাদিগের জীবন ধারণের উপায় হইয়াছিল। সন্ন্যাসিগণ অবসরমত বনপর্য্যটন করিতেন। তখন আটবিক প্রদেশে সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী শত শত বিপ্লবে আর্য্য উপনিবেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, জনসঙ্কুল প্রদেশসমূহ অরণ্যসঙ্কুল হইয়াছিল, শত শত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কালক্রমে অনার্য্যবংশসম্ভূত বর্ব্বর জাতিসমূহ এই বনময় রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সন্ন্যাসিগণ ভীষণ অরণ্যমধ্যে নির্ভয়হৃদয়ে ভ্রমণ করিতেন, আভীরগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া বর্ব্বরগণকে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদিগের পবিত্রতা, সংযম, নিষ্ঠা ও শিক্ষা সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে ভক্তিভাজন ও আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। মৃগয়াজীবী গোখাদক আভীর পশুহত্যা পরিত্যাগ করিয়া গোপালের সহায্যে ভূমিকর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পশুচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিয়াছিল, সচ্ছলতার সময়ে অস্বাভাবিক পানাহার ও অভাবের সময়ে অনশন পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছিল। সন্ন্যাসিগণের উদ্যমে আটবিক প্রদেশে মুদ্রার প্রচলন, বিপণী স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আটবিক প্রদেশে ক্রমশঃ সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। উত্তরাপথের রাজগণের সমবেত চেষ্টায় যাহা সফল হয় নাই মুষ্টিমেয় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর চেষ্টায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। আটবিক প্রদেশের অধিবাসিগণের বর্ব্বর নামও এই সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে উত্তর বা দক্ষিণ হইতে তীর্থযাত্রিগণ প্রাণভয়ে প্রাচীন স্তূপে আসিত না; সুদীর্ঘ বনপথ অতিক্রমকালে বর্ব্বরগণ

যাত্রিগণের ধনলুণ্ঠন ও জীবননাশ করিয়া পথচরণ অতি বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যেমন সময় অতিবাহিত হইতেছিল তেমনই বর্ব্বরগণ প্রাচীন আর্য্য সভ্যতায় দীক্ষিত হইতেছিল. যাহারা বন্য মৃগ হনন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদিগের প্রজা সন্ন্যাসিগণের নিকট শিক্ষিত হইয়া হলকর্ষণ ও বাণিজ্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে আর নরহত্যা বা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। আটবিক প্রদেশ ক্রমে পুনরায় জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল; উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ হইতে নির্ভয়ে সার্থবাহগণ অশ্ব, উষ্ট্র ও খরপৃষ্ঠে পণ্যভার ন্যস্ত করিয়া আটবিক প্রদেশ অতিক্রম করিত। মগধ হইতে, মধ্যদেশ হইতে, পঞ্চনদ হইতে বণিক্‌গণ বনজাত পণ্যের লোভে বনময় প্রদেশে আগমন করিত। ক্রমে আটবিক প্রদেশ নামমাত্র থাকিয়া গেল। বিন্ধ্যশিখর ব্যতীত দেশের কোন স্থানে অরণ্যানী পরিলক্ষিত হইত না। সন্ন্যাসিগণ চীর ধারণ করিয়া ও ভগ্ন উপলখণ্ডনির্ম্মিত গৃহে বাস করিয়া এই বিস্তৃত রাজত্ব শাসন করিতেন। আটবিকপ্রদেশে রাজা প্রজা ছিল না, কিন্তু রাজশক্তির অভাবে কখনও বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। ছিন্ন গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসিগণের অঙ্গুলি-হেলনে বিশাল জনসঙ্ঘ পরিচালিত হইত। মঠে অধ্যক্ষের পর অধ্যক্ষ আটবিক প্রদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দেহান্তে মঠবাসিগণ আমাদিগের প্রাচীন স্তূপের পরিক্রমণের পথে আচ্ছাদনীয় পাষাণগুলি উত্তোলিত করিয়া তাঁহাদিগের দেহ সমাহিত করিত, কোন মঠাধীশের পরমায়ু শেষ হইলে বিন্ধ্যাদ্রি হইতে সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত রোদনশব্দ শ্রুত হইত; দেশে সমস্ত কার্য্য স্থগিত হইত; জনসঙ্ঘ শোকে মগ্ন হইত।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাত্যে যে সমস্ত রাজবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ অপহরণ করিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাদিগের অধঃপতন আরব্ধ হইল। বহুদূরে প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রে স্থানীশ্বরের গৌরবরবি উদিত হইতেছিল। তখনও সম্রাট নাম গ্রহণ করিয়া গুপ্তবংশীয় একজন রাজা মগধ শাসন করিতেছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধন পঞ্চনদে হূণপ্রভাব ধ্বংস করিয়াছিলেন; গুপ্তবংশের কন্যা বিবাহ করিয়া জয়বর্দ্ধন ধন্য হইয়াছিলেন; রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতাপে পর্ব্বতরাজের হিমানীমণ্ডিত শিখরে বসিয়া কাম্বোজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের ভয়ে কম্পিত হইতেন; পুরুষপুর হইতে কামরূপনগর পর্য্যন্ত, হিম-

বানের পাদমূল হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; পর্ব্বতরক্ষিত আটবিক প্রদেশ তখনও উত্তরাপথরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নাই। কাণ্যকুব্জ হইতে সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য দক্ষিণ কোশলে তীর্থযাত্রায় নির্গত হইবেন। সম্রাটের দূত ভগ্নগৃহে দর্ভশয্যায় আসনগ্রহণ করিয়া আটবিক প্রদেশের মুকুটবিহীন সম্রাটের সম্মুখীন হইয়াছেন। সুবর্ণগৌরকান্তি শুভ্রজটামণ্ডিতশীর্ষ, ছিন্ন গৈরিকপরিহিত মঠাধ্যক্ষ কুশাসনে বসিয়া রাজদূতের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। মঠবাসিগণকে দেখিয়া রাষ্ট্রনীতিকূটকুশল রাজকর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়াছেন, তাঁহার মনে সন্দেহের পরিবর্ত্তে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। প্রভাতে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমার শীর্ষে হস্তস্থাপন করিয়া স্থবির মঠাধ্যক্ষ বলিতেছেন, "মহাত্মন, আমাদিগের ছলনার আবশ্যকতা নাই, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজের বিজিগীষা পরিতৃপ্ত হয় নাই, বিস্তৃত উত্তরাপথ তাঁহার রাজ্যলাভেচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর সহিত ছলনার প্রয়োজন নাই। আটবিক প্রদেশ ও দক্ষিণাপথের প্রতি হর্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। দেবাদিদেবের পরিচর্য্যায় গুরুপরম্পরায় শতাধিক বর্ষ এই বনমধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে মহেশ্বরের অনুকম্পায় বর্ব্বরগণ শান্ত ও শিক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন কোশল রাজ্যের উর্ব্বর ভূমি বহুরত্নপ্রসবিনী, উত্তরাপথ ও দাক্ষণাপথ রাজগণের লোলুপ দৃষ্টি বহুকাল হইতে ইহার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাহা অনুভব করিয়া শঙ্কিত চিত্তে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, আমরা বর্ব্বর শাসন করিয়াছি বটে, কিন্তু দেশ রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। ত্রিশূল লইয়া চালুক্য ও বর্দ্ধন রাজগণের বিজয়বাহিনীর সম্মুখীন হইতে যাইব না, ইহা নিশ্চয়। আপনি কাণ্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, দেবাদিদেবের শিরস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, নীরবে, নিঃশব্দে, বিনা রক্তপাতে বিশাল কোশলরাজ্য আর্য্যাবর্ত্তরাজের পদানত হইবে, একজন মঠবাসীও বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে না। গ্রামে গ্রামে মাণ্ডলিকগণ স্বাধীনতা হারাইয়া উত্তেজিত হইবে বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের অবাধ্য হইবে না, আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহই হস্তোত্তোলন করিবে না। হর্ষবর্দ্ধন নির্ব্বিঘ্নে আটবিক প্রদেশ অধিকার করিবেন; কিন্তু দাক্ষিণাপথে চালুক্য তাহা সহিবে না। কোশল হইতে বাতাপিপুর বহু যোজন পথ। হর্ষবর্দ্ধন কোশলে পদার্পণ করিলে সত্যাশ্রয়

পুলকেশীর সিংহাসন কম্পিত হইবে। দূতরাজ! পূর্ব্বকালে বহু আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ দক্ষিণাপথ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পথ এখন আর তত সুগম নাই। দক্ষিণাপথে নূতন বল সঞ্চারিত হইয়াছে, মঙ্গলেশের বংশধরগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। মহাত্মন্, কাণ্যকুব্জরাজ-পদে নিবেদন করিও, বিপদ আটবিক কোশলে নাই। বাতাপিপুরে ও নর্ম্মদা তীরে তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিও। দেবাদিদেবের আদেশে আমরা নতশিরে হর্ষবর্দ্ধনের আদেশ পালন করিব; কিন্তু জানিয়া রাখিও, আর্য্যাবর্ত্তে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় গাথার সমতুল কাহিনী আর কখনও শ্রুত হইবে না।"

নতমস্তকে স্থান্বীশ্বররাজের দূত মঠসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, মঠবাসিগণ প্রথমেই আমার শীর্ষচ্ছেদন করিয়া আমাকে শিবলিঙ্গের আকার প্রদান করিয়াছিল এবং প্রতিদিন মহাসমারোহে আমার অর্চ্চনা করিত। কিন্তু যিনি মানবজাতির হিতসুখার্থ রাজসম্পদ ও সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাপথবাসিগণের দ্বারে দ্বারে নগ্নপদে সুসংবাদ বিতরণ করিয়াছিলেন তাঁহার ধ্বংসাবশেষ অদূরে শিলাস্তূপের মধ্যে সমাহিত ছিল; তাহার প্রতি কেহ ফিরিয়াও চাহিত না। ইহাই মানব প্রকৃতি।

উত্তরাপথের লক্ষ লক্ষ সেনা আটবিক কোশলে প্রবেশ করিল। চির-স্বাধীন বর্ব্বরগণ বুঝিয়াছিল যে, ইহা দেবযাত্রা বা তীর্থযাত্রা নহে, হর্ষবর্দ্ধনের দাক্ষিণাপথবিজয়যাত্রা। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নগ্নপদে বিচরণ করিয়া সন্ন্যাসিগণ উদ্ধতস্বভাব বর্ব্বর মাণ্ডলিকগণকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষের কথা সত্য হইল, এক বিন্দু রক্ত ব্যয় না করিয়াও বিশাল সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সম্রাট যাঁহাকে দূত স্বরূপ কোশলে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি রাজসকাশে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোশল বিজিত হইল; দক্ষিণাপথের দ্বার অধিকৃত হইল। সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে কোশল হইতে বিদিশা, বিদিশা হইতে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান হইতে বাতাপিনগরে উপস্থিত হইল। চালুক্য-রাজ বিপদ বুঝিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। নর্ম্মদাতীরে বৃহৎ সেনানিবাস স্থাপিত হইল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আটবিক কোশলের নানাস্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিতেছিল। সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বর্ব্বর গ্রামবাসী ও মাণ্ডলিকগণ সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন স্থানেই বিবাদবহ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে নর্ম্মদাতীরে নানাস্থানে সৈন্য সমাবিষ্ট হইল, তখন সম্রাট স্বয়ং কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া কোশলে প্রবেশ করিলেন। দুর্গপ্রাকারস্বরূপ ধবলশিলামণ্ডিত নর্ম্মদার উচ্চ তীরের পার্শ্বে থাকিয়া বাতাপিনগরের সেনা ঘট্ট রক্ষা করিতেছিল। সামান্য সেনা লইয়া চালুক্য সেনাপতি সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বর্ষাজলপ্লাবিত নর্ম্মদা শিলাসঙ্কুল উপকূলের জন্য উত্তরাপথের সেনাধ্যক্ষগণের নিকট দুস্তর হইয়া উঠিয়াছিল।

তীর্থযাত্রার ছলে প্রচ্ছন্নভাবে দাক্ষিণাপথবিজয়যাত্রায় নির্গত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন তীর্থের কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। আটবিক কোশলে আসিয়া সম্রাট মঠ ও স্তূপ দর্শনের অভিপ্রায় জানাইয়া মঠস্বামীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে হর্ষবর্দ্ধন আত্মীয় স্বজন ও প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষগণ সমভিব্যাহারে মঠদর্শনে আসিলেন। মঠস্বামী সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্রাট কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তূপের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আসিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ও একবার মহাদেবআকারধারী আমার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। সম্রাট সত্বর তীর্থযাত্রা সমাপন করিয়া নর্ম্মদাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তিনি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া স্তূপে আইসেন নাই।

বর্ষা অতীত হইলে হর্ষবর্দ্ধনের সেনা নানাস্থানে নর্ম্মদা পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সর্ব্বত্র পাষাণের অন্তরালে থাকিয়া চালুক্য সেনা তাহাদিগের গতিরোধ করিল। নৌকা বা নৌসেতু কোনও উপায়ে যখন নর্ম্মদার দক্ষিণ কূল অধিকৃত হইল না, তখন হর্ষবর্দ্ধন নানাস্থান হইতে সৈন্য একত্র করিয়া স্বয়ং সৈন্যচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফল তোমাদিগের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। যে চরণযুগল আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ রাজমণ্ডলীর মুকুটমণির প্রভায় আলোকিত হইয়াছিল, তাহা কখনও নর্ম্মদার দক্ষিণতীর স্পর্শ করে নাই। বার বার পরাজিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন অবশেষে নর্ম্মদাতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষকাল চালুক্যরাজ আত্মরক্ষার্থ নর্ম্মদাতটরক্ষা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নদীর উভয় কূলে বৃহৎ সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। হর্ষের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আশা উন্মূলিত হইল, পুলকেশী দক্ষিণাপথের শত শত স্থানে স্বীয় বিজয়কাহিনী ও উত্তরাপথ-সম্রাটের পরাজয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফলে আটবিক কোশলে ঘোর-

তর অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র উৎপীড়িত বর্ব্বরজাতি এক মাসের মধ্যে উত্তরাপথের সেনা ভাগিরথীর পর-পারে রাখিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুগ্ধ।

বহুদূর হ'তে ব্যাধের মধুর
বাঁশরীর গান অনুসরি',
মোহিতা হরিণী লয় অবশেষে
নিশিতশায়ক বুকে ধরি'।
মানব চলেছে জীবনের পথে
আশামুখে শুনি' সুধাবাণী;
দুঃখের শেল লইতে বরিয়া
পাতি' দেয় সেও বুকখানি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানব প্রহেলিকা।

(২)

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই আমি বলিয়াছি যে, জীবিত অবস্থাতেই জীবগণের দেহে তাহাদের বংশধর উৎপন্ন করিবার বীজ জন্মে। এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথ্বীতে যে কত প্রকারের জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৃণ, গুল্ম, মহীরুহ, প্রভৃতি জীব, আবার কৃমি, কীট, তুরঙ্গ, বিহঙ্গ, মাতঙ্গ, মানব প্রভৃতিও জীব। জলে জীব, স্থলে জীব, অন্তরীক্ষে জীব। বুঝি ধরার কোন কন্দরই জীবশূন্য নহে। এই জীবজগতে বৈচিত্র্যই বা কত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষার উদ্যানে (Botanical gardens) যাইয়া দেখিলে উদ্ভিদ জাতির বৈচিত্র্যের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কাণ্ডে শাখায়, পত্রে পল্লবে, ফলে ফুলে, বর্ণে গঠনে পরস্পরের কতই পার্থক্য! আবার কতই সাদৃশ্য! প্রাণিতত্ত্বানুশীলন উদ্যানে (Zoological gardens) প্রবেশ করিলে প্রাণি-জগতের বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। জীবের প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কতই পার্থক্য। কত অঙ্গের কত অপূর্ব্ব বিকাশ, বিস্ময়কর গঠন! দেখিলে ও ভাবিলে প্রকৃতির কারিগরীতে বিস্মিত—স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয়, প্রকৃতি দেবী বুঝি কত বিভিন্ন প্রকারের উপাদান লইয়া এই জগত সৃষ্ট করিয়াছেন।

কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? বাস্তবিকই কি প্রকৃতি দেবী বিভিন্ন জীবের সৃষ্টিকল্পে বিভিন্ন উপাদানের সাহায্য লইয়াছেন? অর্থাৎ জীবোৎপত্তির যাহা আদি বীজ, তাহাকে জৈব উপাদানই বল, protoplasmই বল, আর bioplasm নামেই অভিহিত কর, তাহা একই; সর্ব্ব শ্রেণীর জীবের বীজে তাহা একই ভাবে একই আকারে অবস্থিত। অত্যুন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়া, অভিনব রাসায়নিক বিশ্লেষণী বিদ্যার সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া, ঘাসের ও বাঁশের, শালের ও তালের, পনসের ও পলাশের, পতঙ্গের ও মাতঙ্গের, মীনের ও মানবের—কোনও জীবেরই আদি উপাদানের পার্থক্য নির্ণয় করা

যায় না। আবার কেবল মাত্র উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এরূপ একটি শালের ও একটি তালের বীজ যদি কোনও উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ বৈজ্ঞানিকের হস্তে দিয়া বলা যায়, "এই দুইটি বীজের মধ্যে কোন্‌টি কাহার বীজ তাহা চিনিয়া দিউন" তাহা হইলে তিনি কিছুতেই তাহাদের পার্থক্যসাধনে সমর্থ হইবেন না। প্রাণীদিগের পরস্পরের প্রাথমিক ডিম্বের (ovum) পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব। মানুষের প্রাথমিক ডিম্ব এত ক্ষুদ্র যে, একটি পয়সার ব্যাসরেখার উপর (অর্থাৎ এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত) এক শত পঁচিশটি ডিম্ব সরলভাবে সাজাইয়া রাখা যায়। ইহা আর কিছুই নহে, সামান্য একটি ঝিল্লী-বৎ আবরণে আবৃত জৈব উপাদান (protoplasm) মাত্র। উহার পার্শ্বের এক স্থানে ঐ অর্দ্ধতরল জৈব উপাদান গাঢ়তর। প্রাণিজগতের সর্ব্ব নিম্ন-স্তরের এককোষ প্রাণী যেরূপ ইহা সেইরূপ। এককোষ জীবমাত্রেরই যেরূপ ভাল, ইহারও ভাব সেইরূপ। উহাদের আচরণ এককোষ জীবের আচরণ হইতে কিছু মাত্র পৃথক নহে। প্রাণিজগতের নিম্নস্তরের অ্যামিবার (ameba) যেরূপ আকৃতি ও আচরণ, ইহার আকৃতি ও আচরণ ঠিক সেইরূপ। ইহাই সমস্ত প্রাণীর জীবনের সর্ব্ব প্রথম অবস্থা। এই অবস্থা দেখিয়া প্রাণী মাতঙ্গ কি পতঙ্গ, বিহঙ্গ কি ভুজঙ্গ, মর্কট কি মানুষ, জলচর কি স্থলচর, ভূচর কি খেচর, তাহা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। যৌন সম্বন্ধ-দ্বারা কত জীব উৎপন্ন হয় তাহাদের ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশও কিছুদিন একরূপই হইয়া থাকে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন যে, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম জীবের আদি বীজ একই। উহা অতি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত সামান্য একটু জৈব উপাদান মাত্র। রাসায়ণিকগণ উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাতে অঙ্গারজান, (carbon) উদজান (hydrogen) অম্লজান (oxygen) এবং যবক্ষারজান (nitrogen) প্রধানতঃ এই চারিটি মূল পদার্থ আছে। এই উপাদান চতুষ্টয় ভিন্ন উহাতে আর বিশেষ কিছুই নাই। নেপোলিয়ন, শঙ্করাচার্য্য ও একটি সামান্য কীট ভ্রূণাবস্থায় প্রথমেই ঠিক একরূপ ছিলেন। কেবল তাহাই নহে। স্তনন্ধয় জীবমাত্রেরই প্রথম কিছুদিন ভ্রৌণিক বিকাশ ঠিক একরূপ হইয়া থাকে। যে মানবীয় ভ্রূণ আট সপ্তাহ গর্ভবাস করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ও যে সারমেয় ভ্রূণ ছয় সপ্তাহ কাল গর্ভে অবস্থিতি করিয়াছে—তাহাদের উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ নহে; পরন্তু অত্যন্ত কঠিন। সার আইজাক নিউটনের জীবনের প্রথম দুইমাস ও তাঁহার পালিত

কুকুরের জীবনের প্রথম দেড় মাস ঠিক একই রূপ ছিল, উভয়ের কোন তারতম্যই ছিল না।*

দ্বিবিধ পদ্ধতিতে জীবের উৎপত্তিক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। অতি নিম্নস্তরের এককোষ জীবগুলির (protozoa) স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। উহাদের দেহ হইতেই বিভক্ত হইয়া উহাদের বংশধরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদের ঐ উদ্ভব-পদ্ধতিকে অযোনিসম্ভব উদ্ভব-পদ্ধতি (non-sexual generation) বলা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বহুকোষ জীবদিগের (metazoa) ও তদূর্দ্ধ জীবদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই জীবদিগের স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। ইহাদের উৎপত্তি-পদ্ধতিকে যৌন উৎপত্তিপদ্ধতি (sexual generation) বলা হয়। শেষোক্ত পদ্ধতি অধিকতর রহস্যময়।

যৌন উৎপত্তি-পদ্ধতির প্রারম্ভে স্ত্রীজাতির ডিম্বকোষের সহিত পুরুষজাতির শুক্রবীজের সমবায় একান্ত আবশ্যক। পুরুষের শুক্রে শুক্রবীজ (sparmatozoa) নামক বহুপদার্থ বিদ্যমান থাকে। উহাদের সজীবতার কোন কোন লক্ষণ দেদীপ্যমান। স্ত্রীজাতির ডিম্বকোষও কতকটা সজীব বলিয়া অনুমিত হয়। ডিম্বকোষ এক, কিন্তু শুক্রবীজ বহু। এক বিন্দু শুক্রে লক্ষ লক্ষ শুক্রবীজ বর্ত্তমান থাকে। নিষিক্ত শুক্র হইতে সমস্ত শুক্রবীজই ডিম্বকোষ অভিমুখে

---

* কথাটি অনেকের নিকট বিস্ময়জনক মনে হইতে পারে; সেইজন্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Beale এর গ্রন্থ হইতে নিম্ন লিখিত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—There is indeed, a period in the development of every tissue and every living thing known to us when there are actually no peculiarities whatever—when the whole organism consists of transparent, structureless tisemifluid living bioplasm—when it would not be possible to dis-nguish the growing moving matter which was to evolve the oak, from that which was the germ of a vertebrate animal. Nor can any difference be discerned between the bioplasm matter of the lowest simplest, epithelial scale of man's organism and that from which the nervecells of his brain are to be evolved. Neither by studying bioplasm under the microscope, nor by any kind of physical or chemical investigation known can, we form the notion of the nature of the substance which is to be formed by the bioplasm or which will be the ordinary results of the living.

ধাবিত হয়। গন্তব্য পথে যাইতে যাইতে অনেক শুক্রবীজই পঞ্চত্ব পায়। অনেকগুলি শুক্রবীজ ডিম্বকোষের সন্নিহিত হইলে একটিমাত্র শুক্রবীজ ডিম্বকোষকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয়। ঐ একটি ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্তগুলিই মরিয়া যায়। যে শক্তিপ্রভাবে শুক্রকীট ডিম্বকোষের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য আকৃষ্ট হয়, তাহা রহস্যময়। এ সম্বন্ধে য়ুরোপের বিখ্যাত নাস্তিক আর্ণেষ্ট হেকেল বলিয়াছেন,—"The neuclie of both cells, of spermatozoon and of the ovum, drawn together by a mysterious force, which we take to be a chemical-sense-activity related to smell approach each other and melt into one."—ইহার মর্ম্মার্থ এই "শুক্রের ও অণ্ডের বীজাংশগুলি কোন রহস্যময়ী শক্তির প্রভাবে,—ঐ শক্তিকে ঘ্রাণসম্পর্কিত রাসায়নিক অনুভূতি বলিয়া আমরা ধরিয়া লই—পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উভয়ে মিলিত ও একীভূত হইয়া যায়।" এই ক্ষেত্রে একটি বিষম প্রহেলিকা বর্ত্তমান। যাঁহারা আত্মবাদী অর্থাৎ যাঁহারা জীবাত্মার ব্যক্তিত্ব ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন,—তাঁহাদিগকে জড়বাদিগণ এই ব্যাপার লইয়া পরাজিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। জড়বাদিগণ বলেন যে, দুইটি স্বতন্ত্র কৌষিক আত্মার (cell-soul) সম্মিলনফলেই যখন জীবের তথা জীবাত্মার উদ্ভব হয়, তখন একই জীবাত্মা অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া মানবদেহ ধারণ করে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।* জীর্ণবস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগের ন্যায় এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, যে জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করিল,—তাহার ব্যক্তিত্ব (personality) অব্যাহত থাকিলে সে আবার দুইটি বিভিন্ন কৌষিক আত্মায় পরিণত হইতে পারে না। আর যদিই তাহা হয়, তাহা হইলে সেই বিভক্ত কৌষিক আত্মা যে আবার সম্মিলিত হইবার সুবিধা পাইবে, এরূপ অনুমান করা সম্ভবে না। জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদীদিগের এই যুক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল নহে।

এ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, শুক্রশোণিতের সমবায়ে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। শুক্র শোণিত সমবেত না হইলে জীবাত্মা ভ্রূণরূপে স্ফূর্ত্তি পায় না। তাঁহাদের মতে মাতৃগর্ভস্থ কোষ দেহসৃষ্টির

* প্রাচীনকালে মিশর দেশবাসী যাজকদিগের (Egyptian priests) মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

উপাদানমাত্র। জীবাত্মা দেহান্তে পুরুষের শরীরে শুক্রবীজরূপে আবির্ভূত হয়; যথা কঠোপনিষদে;—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতং॥

"অবিদ্যাবিজড়িত মূঢ় ব্যক্তিরা শুক্রবীজ সমন্বিত হইয়া শরীরগ্রহণার্থ * * দেহীদিগের জঠরে প্রবেশ করে। আর অত্যন্তাধম জনসকল মৃত্যুর পর বৃক্ষাদি স্থাবর ভাবলাভ করে। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিয়াছে ও জ্ঞানলাভ করিয়াছে সে সেইরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়।"

সুতরাং বুঝা গেল, শুক্রবীজেই জীবাত্মা নিহিত হইয়া থাকে। জননী-জঠরস্থ ডিম্বকোষ ভ্রূণগঠনের উপাদানমাত্র প্রদান করে। সুতরাং হিন্দুদিগের বিশ্বাস, ডিম্বকোষের সহিত শুক্রবীজের সংযোগ হইলে ভ্রূণের জন্ম হয়। জীবাত্মা তখন আপনার শক্তি অনুসারে (শক্তি পূর্ব্বজন্মজ কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত হয়) দেহ গঠন করিতে থাকে। †

হিন্দুদিগের এই বিশ্বাস জড়বাদী পণ্ডিতগণ সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন,—শুক্রবীজ ও যেরূপ সজীব ডিম্বকোষও সেইরূপ সজীব। এ কথা কিন্তু সর্ব্বথা সত্য নহে। ডিম্বকোষ অপেক্ষা শুক্রবীজে সজীবতার লক্ষণ স্ফুটতর। শুক্রবীজসকল যে ভাবে পুচ্ছসঞ্চালন করিতে করিতে ডিম্বকোষ অভিমুখে অগ্রসর হয়, সম্মুখে বাধা পাইলে যে ভাবে সেই বাধা অতিক্রম করিতে প্রয়াস পায়, এবং সেই চেষ্টার ফলে তাহাদের অনেকগুলি যে ভাবে পঞ্চত্ব পায়, তাহাতে তাহাদের সজীবতার লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশমান। পক্ষান্তরে ডিম্বকোষের ঐরূপ চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না। উহা শুক্রকীটের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হয় সত্য, কিন্তু উহার শুক্রকীটের সহিত সমধর্ম্মী নহে। ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত লক্ষ লক্ষ জীবাণু জীবের শোণিতাদিতে বিদ্যমান। ভ্রূণদেহেও ঐরূপ জৈব উপাদান থাকিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। উহাতে দুইটি কৌষিক আত্মার সমবায় সূচনা করে না, সকল জীবিত জীবের দেহে যে সজীব জৈব উপাদান দেখা যায়, জীবাত্মার দেহগঠনের জন্য জননী-জঠরে তাহাই প্রস্তুত অবস্থায় অবস্থিতিমাত্র করে। উহাদের প্রাণ আছে, কিন্তু আত্মা নাই। হিন্দুদিগের

† এ কথা মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিচারকালে বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

মতে আত্মা ও প্রাণ * সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলে হিন্দুর কথা জড়বাদিগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, এ স্থলে যে একটি বিরাট প্রহেলিকা বর্ত্তমান, তাহা জড়বাদীরাও অস্বীকার করেন না।

শুক্রশোণিতের সংযোগেই ভ্রূণের উৎপত্তি। সর্ব্বপ্রাণীর সদ্যোৎপন্ন ভ্রূণ একই প্রকারের। উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু বিকাশকালে ক্রমশঃই ইহাদের যে পরিবর্ত্তন হইতে থাকে তাহা অতীব বিস্ময়জনক। কে যেন উহার অভ্যন্তরে থাকিয়া অতি সতর্কতার ও নিপুণতার সহিত হাতে করিয়া উহাকে উহার পিতামাতার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে থাকে। যে হাত সেই গড়ন গড়ে সে হাত অভ্রান্ত। উহা দেখিয়া নাস্তিকপ্রবর অধ্যাপক হাক্সলি বিস্ময়ে বিভোর হইয়া বলিয়াছেন, শিল্পী যেমন একটু মৃত্তিকা লইয়া উহার দ্বারা তাহার ঈপ্সিত গড়ন অতি সাবধানে গড়িতে থাকে, তেমনই কোন দক্ষ শিল্পী যেন সেই জৈব উপাদানটুকু লইয়া অলক্ষ্যে তাহার দ্বারা হুবহু বীজানুরূপ গড়ন গড়িতে থাকে। যেন কোনও অদৃশ্য কারিগর কর্ণিকদ্বারা ঐ উপাদান নানাভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছে। শেষে সেইগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা হয়। তৎপরে যেন কোন সুদক্ষ শিল্পীর অঙ্গুলি উহার মেরুদণ্ড অঙ্কিত করে ও দেহের অবয়ব গুলি ক্রমশঃ বিভক্ত করিয়া দেয়। যে জীবের বীজ হইতে ঐ ভ্রূণ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ভ্রূণের আকার ক্রমশঃ সেইরূপ হইয়া আইসে। যাঁহারা অনুক্ষণে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে স্বতঃই এই ধারণা জাগিয়া উঠে যে, যে সকল বৈজ্ঞানিক শিল্পী অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র নির্ম্মিত করেন তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কোন কৌশলী শক্তিশালী ব্যক্তির সাহায্যে উক্ত গুপ্ত শিল্পীকে দেখা যাইতে পারে।†

বুঝা গেল, একই আদি বীজ হইতে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, মাতঙ্গ, সরিসৃপ কীট ও মানব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বিকাশের গতিতে ইহাদের পার্থক্যসাধন করে কে? একই প্রকার জৈব উপাদানের একটি হইতে

* প্রাণীদিগের দেহে পাঁচটি প্রাণ বর্ত্তমান। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান্। কায়ার সহিত ছায়ার যেরূপ সম্বন্ধ, আত্মার সহিত প্রাণদিগের সেইরূপ সম্বন্ধ; প্রাণগুলি বায়ুমাত্র। মৃতদেহের জৈব উপাদানগুলি প্রাণবন্ত থাকিতে পারে না।

† Huxley's Lay Sermons, on "the Origin of Species."

সার আইজাক নিউটন আর একটি হইতে তাঁহার কুকুর উদ্ভূত হইল কেন? একই প্রকার জৈব উপাদানে এমন কি প্রবেশ করিল যে, তাহাদের মধ্যে এত পার্থক্য জন্মিল? ইহা একটি বিষম প্রহেলিকা। বিজ্ঞান ইহার সমাধান করিতে সমর্থ নহে। ঐরূপ অতি সামান্য বীজ হইতে যে নানা বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে; প্রত্যেক বীজই পরিণামে তাহা হইতে উৎপন্ন জীবে তাহার পিতৃমাতৃকুলের বংশগত ও অর্জ্জিত গুণ ও ব্যাধি পর্য্যন্ত বিসর্পিত করিয়া দিতেছে। সময় সময় ইহাও দেখা যায় যে, বৈজিক শক্তি তিন চারি পুরুষ আত্মগোপন করিয়া চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষে অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিকরা উহাকে পূর্ব্বানুবর্ত্তন (atavism) বলেন। সেই অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দূরবীক্ষণযন্ত্রপ্রেক্ষ্য শুক্রকীটই জননী-জঠরে দেহ নির্ম্মাণ-জন্য প্রস্তুত জৈব উপাদানে এই শক্তি সংক্রমিত করিয়া দেয়, ইহা জড়বাদীরা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট যাহারা সামান্য পথ গমন করিতে দলে দলে পঞ্চত্ব পায়, তাহারা এমন শক্তি কোথায় পাইল যে, যে উপাদান হইতে সামান্য টিকটিকি গিরগিটি জন্মিতেছে—ঠিক সেই উপাদান হইতে শঙ্কর, চৈতন্য, মিল, ম্যাল্‌থাস, নিউটন, হেকেল, কেলভিন, নেপোলিয়ন প্রভৃতি গঠন করিতে সমর্থ হইল? খাঁটি বৈজ্ঞানিক এ সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইহা বিজ্ঞানের বিষম প্রহেলিকা। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ভয় ও ভরসা।

(সংস্কৃত হইতে)

নিঃশঙ্ক শুইয়া আছ বয়সের শেষে?
কৃতান্ত যে সমাগত ভয়ঙ্কর বেশে!
থাক থাক সুখে শুয়ে, কি চিন্তা তাহার—
জাহ্নবী জননী জাগে নিকটে যাহার?

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

POSITIVISM বা ধ্রুবদর্শন-প্রসঙ্গ।

(৪)

এই ত হইল মাসের অধিষ্ঠাতাদিগের নাম। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য এক এক জন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক দিবস ও প্রত্যেক সপ্তাহ এক একজন অধিষ্ঠাতার দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং Leapyearএর জন্য আবার এক একজন পৃথক অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় চতুঃশতাধিক মহাত্মদিগের নাম পঞ্জিকামধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথম মাস—	সপ্তাহের নাম	নিউমা, বুদ্ধ, কনফুসিয়স, মহম্মদ
২য় মাস—	ঐ	এসকাইলস, ফিডিয়স্, আরিষ্টফেনিস, বর্জ্জিল্
৩য় মাস—	ঐ	থেলিস, পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো
৪র্থ মাস—	ঐ	হিপক্রেটিস, অপলোনিয়স, হিপার্কস, (বৃদ্ধ) প্লিনি
৫ম মাস—	ঐ	থেমিষ্টক্লিস, আলেকজন্দর, সিপিও, ট্রাজান
৬ষ্ঠ মাস—	ঐ	সেণ্ট অগষ্টিন, Hilde brande, (Gregory the Great) সেণ্ট বার্ণাড, বস্যুয়ে (Bossuet)
৭ম মাস—	ঐ	আলফ্রেড, গডফ্রি, তৃতীয় ইনোসেণ্ট, রাজা সেণ্ট লুই
৮ম মাস—	ঐ	আরিয়ষ্টো, রাফেল, টাসো, মিল্টন
৯ম মাস—	ঐ	কলম্বস, ভোক্যান্সন, ওয়াট, মংগল্‌ফিয়ে (Montglfier)
১০ম মাস—	ঐ	ক্যালিরন (Calderon) কর্ণিয়ে, মোলিয়ে, লোজার

১১শ মাস—	ঐ	টমাস, একুইনিস্, বেকন,লাইবনিটজ, হিউম
১২শ মাস—	ঐ	একাদশ লুই, তৃতীয় উইলিয়ম, রিস্‌লু (Richelieu); ক্রমওয়েল
১৩শ মাস—	ঐ	গ্যালিলিও,নিউটন, লাভুসিয়র (জল oxygen ও hydrogen এ বিভক্ত করেন)

এই ত গেল সপ্তাহের নামকরণ। দিনের নামকরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাসে নিম্নলিখিত নামগুলি আছে—

Promœtheus, Harcules, Orpheus, Ulysses Lycurgus, Romulus, Cadmus, Manu, Cyrus, Zoroaster, Semiramis. Abraham, Solomon, John the Baptist, Harun al Raschid, David ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মাসে— Anacreon, Pindar, Sophocles, Theocritus, Sapho, Euripides, Aesop, Juvnal, Horace, Ovid, Lucretius, ইত্যাদি।

তৃতীয় মাসে—Herodotus, Solon ইত্যাদি

চতুর্থ মাসে—Galen, Avicenna, Euclid, Ptolemy, Nasiruddin, Strabo, Plutarch ইত্যাদি।

পঞ্চম মাসে—Miltiades, Leonidas, Aristides, Xenophon, Epaminondas, Demosthenes, Brutus, Hannibal ইত্যাদি।

ষষ্ঠ মাসে— Eloisa, William Penn, St. Xavier, George Fox ইত্যাদি।

সপ্তম মাসে—Joan of Arc, Albuquerque, Charlemagne, Peter the Hermit, Thomas a Backet ইত্যাদি।

অষ্টম মাসে—Boccaccio, Chaucer, Rabelais, Cervantes, La Fontaine, Robert Burns, De Foe, Goldsmith, Titian, Rembrandt, Rubens, Chateaubriand, Walter Scott, Spenser, Petrarch, Byron, Madam de Stael ইত্যাদি।

নবম মাসে—Marco Polo, Vasco de Gama, Arkwright. Dalton ইত্যাদি।

দশম মাসে—Otway, Goethe, Voltaire, Schiller, Racine, Miss Edgeworth, Richardson ইত্যাদি।

একাদশ মাসে—Montaigne, Erasmus, Pascal, Locke, Diderot, Adam Smith, Kant, ইত্যাদি।

দ্বাদশ মাসে—Charles V, Henry IV., Washington, Hampden, ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ মাসে—Copernicus, Kepler, Hilley, Pristley ইত্যাদি।

এই সকল নামের ফর্দ্দ দেখিয়া একজন ইংরাজ লেখক পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত দেবতা ও ক্ষুদ্রদেবতা (God and Godkins) দিগের মধ্যে যে কত ফরাসীর নাম আছে তাহা বলা ভার। এ কথাটি কোম্তের স্বজাতিপক্ষপাতিতার উপর ব্যঙ্গ করিয়া লিখা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত নাম গণনা করিয়া দেখিলে কথাটি ঠিক "ভজিবে" কি না সন্দেহ। তেরটি মাসের নামের মধ্যে ত দেখা যায় যে দুইজন য়িহুদি -মোসেস ও সেণ্টপল, তিনজন গ্রীক—হোমার,আরিষ্টটল,আর্কিমিডিস্। শার্লমানকে ফরাসীও বলা যায়, জর্ম্মনও বলা যায়; দাঁতে—ইটালীয়; গটেনবর্গ, ফ্রেডরিক—জর্ম্মন; সেক্ষপীয়র—ইংরাজ; ডেকার্ট ও বিশা—ফরাসী। অতএব মাসের নামে ত স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব বিশেষ দৃষ্ট হয় না। মিল এই সকল নামের ফর্দ্দ উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নামসংগ্রহ অতি চমৎকার ও সর্ব্ব-সংগ্রাহক হইয়াছে। কোম্‌ৎ ইহাতে অসামান্য গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তির পরস্পর এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গলা ছেঁড়াছিঁড়া করিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে তিনি এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ কোম্‌ৎ যেন প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া বলিতেছেন—তুমি আর যাহাই হও না কেন, তোমা হইতে মনুষ্যজাতির এই উপকার সাধিত হইয়াছে অতএব তুমি আমাদের সকলের নমস্য এবং পূজনীয়।

এই নামসংগ্রহ দেখিয়া ভারতবর্ষবাসীরা হয় ত অভিমান করিয়া বলিবেন যে, ব্যাস, কণাদ, কপিল, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি কোথায় গেলেন? কিন্তু তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বার বলিতে হয় যে, কোম্‌ৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার উন্নতির ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিতে

চাহেন যে, গ্রীকদিগের সেই প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতার একটি স্রোত কখনও বা মন্দবেগে কখনও বা প্রবল বেগে এ কাল পর্য্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে, এবং এক্ষণে উহা ক্রমশঃ বিশাল ও বিপুল হইয়া উঠিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে অপর্য্যাপ্ত-ফলপ্রসবকারী বারি বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই স্রোতের বহনকার্য্যে যাঁহারা অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছেন, কোম্‌ৎ তাঁহাদিগেরই নাম করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। অন্যান্য দেশের সভ্যতার স্রোত কতক দূর বহিয়া সরস্বতীর স্রোতের ন্যায় বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছে, অবিচ্ছিন্নভাবে একাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এটি একটি সেই সেই দেশের অদৃষ্টবৈগুণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু কোম্‌ৎ যে, সে বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিহীন ছিলেন তাহা বোধ হয় না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি মনু, বুদ্ধ, কনফুসিয়স, মহম্মদ প্রভৃতিরও নাম করিয়াছেন। এই নাম করিবার কারণও আছে। ইঁহাদিগের নামের সহিত এমন কতকগুলি idea সংশ্লিষ্ট আছে, যেসকল idea য়ুরোপীয়দিগের মনোমধ্যে সময়ে সময়ে প্রবিষ্ট হইয়া উঁহাদিগের বুদ্ধিবিকাশের সহায়তা করিয়াছে। এই জন্য কোম্‌ৎ য়ুরোপীয় সভ্যতাবিকাশের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। বিশেষতঃ তিনি মহম্মদের বড়ই ভক্ত ছিলেন। স্থলবিশেষে তিনি লিখিয়াছেন—মহম্মদের জুড়ি মিলে না, the incomparable Mohammad নিজে খৃষ্টানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি খৃষ্টানদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টানরা কিসের এত গর্ব্ব করেন? তিন শত বৎসর ক্রুশের যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া শেষ কালে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতার জন্মভূমি পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন!

এই পঞ্জিকার মধ্যে নেপোলিয়নের নাম নাই। কোম্‌ৎ তাঁহাকে ভয়ানক পাষণ্ড বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে নেপোলিয়ন humanityর শত্রু।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

গোবসন্ত

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রাধান দেশ। এ দেশে গোজাতি কৃষকের প্রধান অবলম্বন গৃহস্থেরও পরম আদরণীয়। প্রতি বৎসর নানা প্রকার সংক্রামক পীড়ায় গো জাতির ধ্বংসসাধন হইতেছে। এই সকল ব্যাধির মধ্যে গোবসন্ত অতিশয় ভীষণ ও সংক্রামক। 'আর্য্যাবর্ত্তের' পাঠকগণকে এই ব্যাধি-সংক্রান্ত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করি।

গোবসন্ত গোজাতির এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। বঙ্গদেশে ইহার নাম গোবসন্ত হইলেও এই নাম বিজ্ঞান-সম্মত নহে। রোগাক্রান্ত গবাদির গাত্রে কদাচিৎ স্ফোটক দৃষ্ট হয় বলিয়াই ইহার নাম "গোবসন্ত" হইয়াছে। মেষ মহিষ হরিণ প্রভৃতিরও এই রোগ হয়। ইহা একাধিক পাকস্থলী-বিশিষ্ট ও রোমন্থনকারী পশুর ব্যাধি। অশ্বজাতির কখনও এই ব্যাধি হয় না। প্রতি বৎসরই এই ব্যাধিতে অনেক পশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। হিমালয় প্রদেশে মুক্তেশ্বর নামক শৈলে অবস্থিত গবর্ণমেণ্টের গবেষণা-গৃহে এই রোগের এক প্রকার প্রতিষেধক রোগরস প্রস্তুত হইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের সকল প্রদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রতিষেধকদ্বারা টীকা দিয়া এই রোগজনিত মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে; এবং কৃষিজীবীদিগের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে।* গোবসন্ত টাইফয়েড জাতীয় এক প্রকার সংক্রামক জ্বরাতিসার। অতর্কিত আক্রমণ, জ্বরাধিক্য, অত্যন্ত সংক্রমণ, মুখের, কণ্ঠনালীর, পাকস্থলীর

* গত বৎসর শীত কালে কলিতাকায় এই ব্যাধির বড় প্রকোপ হইয়াছিল। এমন কি আলিপুর পশুশালায় প্রাণিগণও রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। নেপাল দরবার ভারত সম্রাট ৫ম জর্জ্জকে সুদৃশ্য ও দুর্ল্লভ নানা প্রকার বিভিন্ন জাতীয় মেষ ছাগ হরিণ উপহার প্রদান করেন। তাহারা বিলাতের রিজেণ্ট পার্কে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে কিছু দিনের জন্য আলিপুরের পশুশালায় রক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্যাধি এই সকল পশুর মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং ইহারা পার্ব্বত্য বলিয়া অতি সহজে আক্রান্ত হইয়াছিল। ২।১ দিনেই ৩।৪টি জন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বঙ্গদেশের পশু চিকিৎসাবিদ্যালয়ের তদানিন্তন অধ্যক্ষ কর্ণেল রেমণ্ডের উপদেশানুসারে লেখক ও তাঁহার সহকারী মিঃ আর, ভি, পিলাই উপযুক্ত পরিমাণ রোগরস দিয়া টীকা দেওয়ায় এই ব্যাধি এই পশুদিগের মধ্যে আর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

ও অন্ত্রের প্রদাহ এবং স্থানে স্থানে ক্ষতবিশেষ, ফুস ফুসে রক্তাধিক্য, অধিক পরিমাণে মৃত্যু প্রভৃতি এই ব্যাধির বিশেষত্ব। পশ্চিম এসিয়া ও ভারতবর্ষের প্রান্তরসকল এই ব্যাধির উৎপত্তিস্থান ও আবাসভূমি। সৈনিক বিভাগের ভারবাহী পশুদ্বারা ও বাণিজ্যবিস্তৃতির সহিত এই ব্যাধি য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে বিসর্পিত হইয়াছে। এই ব্যাধি নূতন দেশে নীত হইলে তথায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ মড়ক উপস্থিত করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রকার মড়ক হইয়া অনেক পশুর মৃত্যু হইয়াছিল। এইরূপ মড়কের পর কিছুকাল এই ব্যাধির আর তদ্রূপ সংক্রামকতা থাকে না; একেবারে সেই স্থান হইতে অপসারিত না হইলেও ইহার প্রাবল্য মন্দীভূত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী হইতে এই ব্যাধি বর্ত্তমান আছে। এবং এতদ্দেশীয় গবাদি ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই এ দেশে মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু তথাপি গবাদির অন্য সকল প্রকার ব্যাধিজনিত মৃত্যুর সমষ্টি অপেক্ষা এই রোগজনিত মৃত্যুসংখ্যা অধিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমতলচারী পশু অপেক্ষা পার্ব্বত্য পশু সহজে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৯০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

সমতলচারী জন্তুগণের মৃত্যুসংখ্যা কিছু কম; রোগের প্রাবল্য অনুসারে শতকরা ২০ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। আসাম ও ব্রহ্মদেশে মৃত্যুসংখ্যা বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক। কোন কোন জাতীয় গরু অন্য জাতীয় গরু অপেক্ষা শীঘ্র আক্রান্ত হয়। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ও এডেন হইতে আনিত গবাদি আক্রান্ত হইলে তাহাদের একশতের মধ্যে একটিও আরোগ্য হয় না। সিন্ধুদেশের গরু অতি সহজেই আক্রান্ত হয়। এই সকল গরু এ দেশে অনীত হইবামাত্র প্রতিষেধক রসদ্বারা তাহাদের টীকা দেওয়া উচিৎ। সমতলচারী গরু অপেক্ষা ইহাদের ১৫।২০ গুণ অধিক প্রতিষেধক রস আবশ্যক হয়। অন্যান্য পশুর মধ্যে মেষ অপেক্ষা ছাগ অধিক পরিমানে আক্রান্ত হয়। সমতলচারী ছাগ কদাচ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হরিণ জাতিও এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত গরুর রক্ত সুস্থ উষ্ট্রদেহে প্রবিষ্ট হইলে উষ্ট্রেরও এই রোগ হয়। কিন্তু তাহারা অতি সহজেই আরোগ্য লাভ

করে।। অশ্ব, কুক্কুর, খরগোস, পক্ষী এবং মনুষ্যজাতি গোবসন্তদ্বারা আক্রান্ত হয় না। একবার কোন জন্তু এই ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিলে পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না।

গোবসন্তের বীজাণু এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ইহা এত ক্ষুদ্র যে, অতি উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দৃষ্ট হয় না। রক্ত, লালা, ক্লেদ ও আমাশয় দ্বারা এই ব্যাধির বিষ সুস্থ দেহে প্রবেশ লাভ করে। সংস্পৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, লালা ক্লেদ ও আম মিশ্রিত ঘাস, খড় ইত্যাদির দ্বারাও সংক্রমন হইতে পারে। সময়ে সময়ে কুক্কুর পক্ষী প্রভৃতির দ্বারাও রোগ সংক্রমিত হয়। গোয়ালা কিম্বা অনুচরবর্গের হস্তপদ, পরিধেয় প্রভৃতি হইতেও ইহা বিস্তারিত হইতে পারে। সুস্থ দেহে বিষ প্রবিষ্ট হইবার পর ব্যাধির প্রথম লক্ষণ প্রকাশিত হইতে প্রায় ৩ হইতে ৮ দিবস পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে ৪র্থ দিবসেই প্রথম লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এই ব্যাধির প্রথম লক্ষণ জ্বরাধিক্য। তাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, জ্বর ১০৪ হইতে ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গবাদির মলদ্বারে তাপযন্ত্র দিয়া তাপ পরীক্ষা করা হয়; কারণ, মানুষের ন্যায় ইহাদের কুক্ষিদেশে তাপযন্ত্র রাখা যায় না। ৫ম দিনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্বর হয়। সচরাচর তৃতীয় হইতে নবম দিবসের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। কথনও দুই হইতে একাদশ দ্বাদশ দিনেও মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে হটাৎ জ্বরত্যাগ হইয়া স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষাও অল্প তাপ হয়। এই জ্বরই ব্যাধির প্রথমাবস্থা। এই অবস্থায় শরীরে জড়তা জন্মে ও কম্প উপস্থিত হয়, নাড়ী দ্রুতগতি হয়। গাত্রের লোম দাঁড়াইয়া উঠে। গরু রোমন্থন করিতে পারে না। মুখের অভ্যন্তর অতিশয় উষ্ণ হইয়া শৈষ্মিক ঝিল্লি রক্তাধিক্য বশতঃ লালবর্ণ হয়। অতিশয় পিপাসা ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং মলের সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়; পৃষ্ঠ কুব্জ হয় এবং স্কন্ধ পৃষ্ঠ ও উরুদেশের মাংসপেশীর আক্ষেপ হয়। পরে মাড়ী ও মুখের ঝিল্লি রক্তবর্ণ হয়; জিহ্বা কণ্টকিত হয়। কোষ্ঠ একেবারে বদ্ধ হইয়া যায় এবং মলে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত থাকে। গরু মলত্যাগের চেষ্টার ন্যায় বেগ দিতে থাকে। যোনীদ্বারের ঝিল্লি শুষ্ক ও ও রক্তবর্ণ হয়। ক্ষুধা কিছুমাত্র থাকে না ও পশু উত্থানশক্তিরহিত

হয়। গরু সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে। নাড়ী দ্রুতগতি বয় ও অসমান ভাবে চলিতে আরম্ভ করে। জ্বর ও মাংসপেশীর আক্ষেপ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। ব্যাধির বৃদ্ধির সহিত চক্ষু, নাসিকা ও মুখ হইতে একপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। তাহার পর মাড়ীতে এবং জিহ্বায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ক্ষত দৃষ্ট হয়। মল অধিকতর পাতলা হইতে আরম্ভ হয়, প্রথমে জলবৎ ও তৎপরে কিছু কঠিন মল থাকে, তাহার পর রক্ত ও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গরু তলপেটে বেদনা উদ্ভব করে; অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় ও একেবারেই উঠিতে পারে না। শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, সকল সময়েই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান না থাকিতে পারে; কিন্তু মুখ, চক্ষু, ও নাসিকা হইতে নির্গত ক্লেদ মাড়ীতে ও মুখের ভিতর ক্ষত এবং রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত আমাশয় অত্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণীতে দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* বঙ্গদেশীয় পশুবিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ মহাশয় পরিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য অনেক প্রকারে সাহায্য না করিলে আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে সক্ষম হইতাম না। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

অদৃষ্ট-চক্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

যে দিন জামাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যস্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আট দিন গিয়াছে। এখনও মধ্যাহ্নের কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু বেলা কত স্থির করা দুঃসাধ্য—আকাশে ঘন ধূসর মেঘে অবিশ্রাম বর্ষণ চলিতেছে, দিবালোক ম্লান। পথের পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী পূর্ণ—শুষ্ক পত্র,ছিন্ন কাগজ প্রভৃতি বহিয়া আবিল জলস্রোত বেগে বহিয়া যাইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহের সম্মুখে রাজপথের পরপারে ডোবা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পথিপার্শ্বে যে সকল স্থানে পথিকের গতায়াত অল্প সে সকল স্থানে ঘনশ্যাম তৃণ দেখা দিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে নব পল্লব উদ্গত হইয়াছে। আর্দ্র বায়ু বেগে প্রবাহিত হইয়া বর্ষণকাতর বৃক্ষলতা কাঁপাইয়া তুলিতেছে। পথ জনহীন। তরুশাখায় দুই একটি বিহগ—তাহাদের সিক্ত দেহ শীর্ণ দেখাইতেছে।

এই দুর্দ্দিনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহদ্বারে একখানি যান আসিয়া স্থির হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যান হইতে আতরণ করিলেন—কোন দিকে চাহিলেন না—নতমস্তকে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিরজা যান হইতে নামিল। তাহার মুখ বর্ষার দিনেরই মত স্বচ্ছান্ধকারসমাবৃত—পরিধানে শুক্লাম্বর। বক্ষে দারুণ বেদনা বহিয়া বিধবা দুহিতাকে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে ফিরিলেন।

আজ বিধবা দুহিতাকে লইয়া গৃহে আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরজার জননীর অভাব যেরূপ অনুভব করিলেন, তেমন আর পূর্ব্বে কখনও করেন নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিয়া আসিয়াছিলেন, এখন হইতে বিরজার পিতার ও মাতার কার্য্যভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। এখন দুরদৃষ্ট তাহাকে যে নূতন জীবন-পথের পথিক করিয়াছে সে জীবনের শিক্ষা স্বতন্ত্র—এখন তাঁহাকেই আদর্শে ও উপদেশে তাহাকে সে শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি সে জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর ব্রজেন্দ্রের জননী বৈবাহিককে বলিলেন,

তিনি কাশীতে যাইয়া তথায় বাস করিবেন। তাঁহার এক পিতৃস্বসা কাশীতে বাস করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার তীর্থদর্শনোদ্দেশে তিনিও তথায় গিয়াছিলেন। আজ যখন মৃত্যু মাতৃহৃদয় দীর্ণ—বিদীর্ণ করিয়া পুত্রকে হরণ করিয়া লইয়া গেল—যখন সংসার শূন্য ও জীবন আকর্ষণবিহীন বোধ হইতে লাগিল তখন ধর্ম্মপ্রাণরমণীহৃদয় স্বভাবতঃই জীবনের অবশিষ্ট কয় দিন তীর্থস্থানে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া পরলোকে শান্তি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই প্রস্তাব শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিরজাকে কি ত্যাগ করিয়া যাইবেন? আপনি ব্যতীত তাহার আর কে আছে? সে যে আপনার স্নেহে মাতৃশোক ভুলিয়াছিল!" শুনিয়া ব্রজেন্দ্রের জননী অশ্রু বর্ষণ করিলেন; বলিলেন, "আমি ব্রজেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া একাকিনী এই গৃহে বাস করিতাম। আজ এই গৃহের শূন্যতা যেন আমাকে শঙ্কিত করিতেছে। আমি আর এই গৃহে বাস করিতে পারিব না। আর সহায়হীন অবস্থায় আমরা দুইটি স্ত্রীলোক কি এ গৃহে বাস করিতে পারি। আপনি বিরজাকে লইয়া যাউন। ভগবান আমার যে বন্ধন ছিঁড়িয়া দিয়াছেন, সে বন্ধনে আমাকে আর বাঁধিবেন না। আমার সব শেষ হইয়াছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কি বলিবেন? শাশুড়ীর সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বিরজা তাঁহাকে বলিল, "মা, আমি সঙ্গে যাইব। এ পোড়া মুখ লইয়া আমি আর পিতৃগৃহে যাইব না।" শাশুড়ীর দুই নেত্রে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি বিরজাকে সন্তানের স্নেহ দিয়াছেন; তাহাকে লইয়া তিনি যে আবার সংসার পাতাইয়া বসিয়াছিলেন! হায়—এই কোমলা কনকলতা—কি পাপে নিষ্পাপ তাহার এই তাপ? তিনি বিরজাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, —"মা, দুরদৃষ্ট আমারই,—তাই তোমার মত বধূ পাইয়াও আজ কান্দিতে কান্দিতে তোমার নিকট বিদায় লইতে হইতেছে। মা আমার, তুমি আমাকে আর মায়ায় জড়াইও না—তুমি জড়াইলে আমি যাইতে পারিব না। জানি না, পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম, তাই এই জন্মে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইল। যে কয় দিন আছি, বিশ্বেশ্বরের চরণদর্শন করিয়া অন্তে মণিকর্ণিকায় জ্বালা জুড়াইব। মা, তুমি আমার পুত্র—তুমি আমার কন্যা; তুমি ইহাতে বাধা দিও না।" শাশুড়ী ও বধূ উভয়েই কান্দিতে লাগিলেন। সত্য সত্যই বধূকে ছাড়িয়া যাইতে শাশুড়ীর হৃদয়ে বিষম বেদনা

বোধ হইতেছিল। খাশুড়ী চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া বিরজা শূন্য জীবন একান্তই উদ্দেশ্যহীন বোধ করিতেছিল।

বিরজার খাশুড়ী গৃহাদির সকল ভার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়া ভ্রাতার সহিত কাশী যাত্রা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবা দুহিতাকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে আসিয়া আদেশ করিলেন, বিরজার মত তাঁহার একাহারের—"হবিষ্যের"—ব্যবস্থা হইবে। কেহ সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না।

অপরাহ্নে পল্লীর বৃদ্ধগণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিলেন। অনেকেই ব্রজেন্দ্রের জননীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তাঁহার শোকের তুলনা নাই। গৃহদাহে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মৃত্যু হইলে অস্থিনির্ণয়কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, গান্ধারীর অস্থি সহজেই নির্ণীত হইবে। কারণ, তাহাতে শত ছিদ্র বিদ্যমান থাকিবে। প্রতি পুত্রশোক জনকজননীর অস্থিতে ছিদ্র করিয়া দেয়। তাই লোক কথায় বলে, শত্রুরও যেন পুত্রশোক না হয়। কিন্তু তবুও তাঁহার শান্তি এই যে, তাঁহার হিসাব চুকিয়া গেল।—এ ক্ষেত্রে আমার হিসাব যে চুকিল না—এ যে নূতন করিয়া চলতি খাতার পত্তন হইল!" যাঁহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার স্থৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সে স্থৈর্য্য যে কি প্রগাঢ় জ্ঞানের—কি অসাধারণ সংযমের—কি প্রবল চিত্তজয়ের চেষ্টার ফল তাহা সকলে বুঝিতে পারিলেন না।

যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পল্লীবৃদ্ধগণের সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন পিসীমা'কে লইয়া বামাচরণ কলিকাতা হইতে আসিল। পিসীমা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচরণ পিতামহের বড় আদরের। তাই এই দারুণ শোকের সময় বামাচরণ তাহাকেও পিতার নিকট রাখিতে আসিয়াছিল। তারাচরণ আসিয়া পিতামহের নিকট বসিল। বামাচরণ অন্দরে প্রবেশ করিল।

পিতা আহারের যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন—তিনিও যে বিধবা দুহিতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা অবগত হইয়া বামাচরণ তাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারে পিতার

কার্য্যের প্রতিবাদ করা পুত্রদিগের শিক্ষার বিরুদ্ধ ছিল—সে পরিবারে পুরাতন প্রথারই প্রচলন ছিল—পুত্র যতই কৃতী হউক না কেন পিতার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না। বিশেষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "রাস-ভারী" লোক ছিলেন। শিশু ও বালক-বালিকারা সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকে, বাড়ীর মেয়েরাও তাঁহাকে নিকট স্বচ্ছন্দে আইসে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক-গণ—পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র—তাঁহার সহিত অবাধে আলাপ করিতে সাহস করে না। তাই ইচ্ছা হইলেও বামাচরণ পিতার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

বামাচরণ পরদিবস কলিকাতায় ফিরিয়া গেল ও পিতাকে কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্যানুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য তৎপরদিবস স্বীয় শ্বশুরকে লইয়া পুনরায় গৃহে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈবাহিক কথায় কথায় বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে। যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। আপনি জ্ঞানী। আপনি যদি শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন—দেহপাত করেন তবে যাহারা অজ্ঞ তাহারা কি করিবে ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্মিতভাবে বৈবাহিকের দিকে চাহিলেন। বৈবা-হিক বলিলেন, "আপনি একাহারী হইয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থায় শরীর কয় দিন থাকিবে ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এখন এ শরীর যাইলেই পৃথিবীর ভার যায়। দুঃখ এই যে, যাহারা যাইবার তাহারা যায় না—আর যাহাদের থাকিবার কথা তাহারাই যায়। যাহারা সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক আবর্জ্জনা তাহারাই থাকে—আর যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সংসার-ব্রততী পল্লবমুকুলে সুশোভিত হইয়া উঠে তাহারাই যায়! কিন্তু সংযমে ত দেহপাত হয় না। আমরা প্রবৃত্তির দাস তাই মনে করি, আমিষ না হইলে আহারই হয় না। 'প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

"সে কথা সত্য; কিন্তু চিরজীবনের অভ্যাস সহসা পরিবর্ত্তিত করিলে স্বাস্থ্যহানি হইবে।"

"আমার কন্যা জীবনের অতৃপ্ত বাসনা লইয়া তরুণ বয়সে যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে আমি তৃপ্ততৃষ্ণ বৃদ্ধ তাহা করিতে পারিব না? যদি না পারি, তবে আমাতে আর পশুতে প্রভেদ কোথায়? পশুশিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত তাহার পিতামাতার আর কোন সম্পর্ক থাকে না;

কিন্তু মানুষের ত তাহা নহে। যদি কন্যার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সংযম-সাধনও না করিতে পারি, তবে আমি পিতৃপদ লাভের যোগ্য নহি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈবাহিক আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, বামাচরণ আপনাকে এইরূপ বুঝাইয়াছে। আপনি তাহাকে বলিবেন, সে তাহার পিতার জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছে যদি তাহার ভ্রাতাভগিনীদিগের জন্য সেরূপ চিন্তিত হয়, তবে সে পিতার প্রিয়কার্য্য করিবে—পিতার পিণ্ডদান অপেক্ষাও তৃপ্তিপ্রদ কার্য্য করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমার হৃদয়ের দুশ্চিন্তাদাবানল নির্ব্বাপিত হইবে; আমার জীবন-সায়াহ্ন শান্তিস্নিগ্ধ হইবে—আমি সুখে মরিতে পারিব। আপনি তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া বলিবেন।"

এতদিন যে বেদনা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্ষে বহিয়াছিলেন—প্রকাশ করেন নাই আজ তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শোক হৃদয়কে দুর্ব্বল করে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা তাঁহার বৈবাহিকের বা দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মান বামাচরণের প্রীতিপ্রদ হইল না। বামাচরণ আপনার উপার্জ্জিত অর্থ আপনিই রাখিত—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাহাতে কোনও আপত্তি ছিল না; কিন্তু সে যে ভাবে ব্যাসায়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া সে কার্য্য করিত তাহাতে তাহার পিতা সত্যই বুঝিয়া ছিলেন, সে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা হইয়া সংসার ঠিক রাখিতে পারিবে না। তাহাতে যে স্বার্থত্যাগের—যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন তাহা বামাচরণের প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ। তাই তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর বামাচরণের কর্ত্তৃত্বে সংসার ভাঙ্গিবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বিরজার বৈধব্যে সে আশঙ্কার গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছে। গৃহে ভগিনী বিধবা, ভ্রাতৃজায়া উন্মাদরোগগ্রস্তা, দুহিতা বিধবা—এ সংসার যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে কাহার কি হইবে—বিরজার কি হইবে? এই ভাবনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন—তাই তাঁহার মনের কথা আত্মপ্রকাশ করিল।

কিন্তু, এ কথা বামাচরণের ভাল লগিল না—তাহার শ্বশুরেরও প্রীতিপ্রদ হইল না—কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারের ভাবনায় তাঁহার কি দায়? তিনি বুঝেন, জামাতার হস্তে অর্থ থাকিলে কন্যা সুখে থাকিবার সম্ভাবনা।

সেই দিন রাত্রিকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার

নয়নে নিদ্রা নাই—হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা। আজ তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, যদি আজ বিরজার জননী জীবিতা থাকিতেন—তবে তাঁহার দুশ্চিন্তা অনেকটা প্রশমিত হইত। বিপদে—দুর্ভাবনায় মানুষ স্বভাবতঃই সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হয়—তখন সে পত্নীর অভাব যত অনুভব করে, সম্পদে—সুখের সময় তত করে না। চিন্তাবিষ্ট ভট্টাচার্য্য মহাশয় চমকিয়া দেখিলেন, মুক্ত বাতায়নপথে দিবালোক কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সমুদ্র-তাণ্ডব।

(পূরীতে সমুদ্র দেখিয়া)

ঘোরঘট্ট-ঘোরঘট্ট গর্জ্জে ঘোর প্রলয়-ডিণ্ডিম,
ববম্—ববম্—বম্—গালবাদ্যে প্রচণ্ড উল্লাস,
তাথেই—তাথেই—থিয়া—নৃত্যে ক্ষিপ্ত অতল নীলিম,
হাঃ—হাঃ—রবে সচকিত করি' হাস কি সংহারী হাস!
হে ভয়াল! হে করাল! একি তব তাণ্ডব নর্ত্তন!
উন্মত্ত উল্লাসে ধেয়ে ধরণীরে গ্রাসিবারে চাও,—
স্তব্ধ স্থির অন্তরীক্ষে ভেদি' উঠে সে গম্ভীর স্বন,
ধ্বনিত করিয়া দিশি প্রলয়ের কি সঙ্গীত গাও!
কল্লোলিত—হিল্লোলিত—ক্ষুব্ধ—ত্রস্ত তব নাচবাট,
তরঙ্গের করতালি—ঘর্ষণে কি শুভ্র ধূম্রোৎক্ষেপ!
প্রলয় নহেক এবে, নটরাজ! বিরম এ নাট,
জীর্ণ—ঘৃষ্ট ধরণীর অঙ্গে দাও শান্তির প্রলেপ!
হে অনন্ত! হে মঙ্গল! ধরণীর সৃষ্টিকাল হ'তে
চলিতেছে সৃষ্টি সনে ধ্বংসের যে নীরব সঙ্গীত,—
তোমারি এ ভীমনাদে,—ভ্রূকুটি করিয়া ঘোর স্রোতে
প্রচারিছ সেই বার্ত্তা বাড়াইতে তব সৃষ্টি-হিত!
নহ তুমি অমঙ্গল, নাহি স্থান দাও নিরাশায়,—
সত্য তুমি, শিব তুমি, প্রণমি, হে রুদ্র, তব পায়!

শ্রীযোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ।

গত বৎসর জুলাই মাসে লণ্ডনে যে সার্ব্বজাতিক মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সার জন ম্যাকডোনেল সি, বি, মহাশয় "আন্তর্জাতিক আইন ও পরাধীন জাতি" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিছুদিন হইল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। আমরা নিম্নে সেই প্রবন্ধের সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

সভ্য ও অসভ্য, স্বাধীন ও পরাধীন জাতির মধ্যে কোনরূপ আদান প্রদানের সম্বন্ধ আছে কি না ও থাকিলে তাহা কিরূপ এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নের তিনরূপ উত্তর হইতে পারে।

এক পক্ষে বলেন, স্বাধীন ও পরাধীন জাতির সম্বন্ধবিষয়ে কোন বিধিব্যবস্থা থাকিতে পারে না; তথায় অসিবলই ন্যায়ের মিমাংসক। যদিও আজকাল কেহই প্রকাশ্যতঃ এইরূপ মতের সমর্থন করেন না তথাপি ইহা নিশ্চয় যে, অনেকে এই মত সর্ব্বান্তঃকরণে পোষণ করিয়া থাকেন। সার্ব্বজাতিক মহাসভায় এরূপ অমানুষিক সিদ্ধান্ত আলোচনা-যোগ্য নহে বলিয়া সার জন অবজ্ঞাভরে এই মতবাদ উপেক্ষা করিয়াছেন।

আর একদল বলেন যে, জাতিহিসাবে স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যে কোন নীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে; কারণ, যথায় আদানপ্রদান অসম্ভব তথায় রাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ কল্পিত হইতে পারে না। অধিকন্তু পরাধীন জাতিগণের জাতীয় নীতি এখনও এতদূর পরি-মার্জ্জিত হয় নাই যে, তাহারা স্বাধীনজাতির সমতুল্য হইবার যোগ্য। স্বাধীনজাতির সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহাদের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিলে বরং তাহাদেরই ক্ষতি হইবে। অতএব পরাধীনদিগকে জাতিহিসাবে কোন অধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তবে মানুষের যাহা প্রাপ্য, তাহাদিগকে অবশ্য সেটুকু ব্যক্তিগত অধিকার দেওয়া উচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই মতাবলম্বী ছিলেন। আরও অনেকে এই প্রকার মতের সমর্থন করেন। কিন্তু পরাধীনদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহা কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন না। অস্পষ্টতাহেতু এবম্প্রকার মতের ব্যবহারিক মূল্য অত্যন্ত অল্প। পরাধীনদিগের প্রতি তাঁহারা যে সকল কর্ত্তব্য স্বীকার করেন তাহার মধ্যে নৃশংস নির্দ্দয়তাও ন্যায্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

এই সূত্রে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অসভ্য ও সভ্যজাতির মধ্যে কোন পরিস্ফুট সীমারেখা অঙ্কিত হইতে পারে না। কোন্ চিহ্নদ্বারা জাতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের পরীক্ষা হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন যে, সংগ্রামে সিদ্ধিই উৎকর্ষতার পরিচায়ক। কিন্তু তাহা হইলে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল দেশ মিকেলেঞ্জেলো বা লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি প্রভৃতি মনীষিগণদ্বারা অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল তাহাদের অপেক্ষা কেবল

তুর্ককেই তৎকালীন সভ্যতায় প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কেহ কেহ ধনসম্পদকেই উৎকর্ষের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু ব্যক্তিগত সামাজিক নীতিতে অর্থকে আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দিই না; জাতিগত নীতিতেও প্রেয় শ্রেয় হইতে পারে না। কেহ কেহ নৈতিক উন্নতির দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু যদি আমরা এই প্রণালীর দ্বারা জাতির উন্নতি বা অধোনতি নির্ণয় করিতে যাই তাহা হইলে এমন সকল অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হই যাহাতে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। উন্নতিশীল ও পশ্চাৎপদ জাতিগণের মধ্যে ভেদ নির্ণয় করিতে যাইয়া জাতিতত্ত্বপণ্ডিতগণ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। যে সকল জাতির অবস্থাবিপর্য্যয়ের ইতিহাস অজ্ঞাত তাহাদিগকেই সাধারণে অবনত বা হীনবস্থ বলিয়া মনে করে। সকল জাতিই স্ব স্ব মার্গে অল্পাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে। কত পরিবর্ত্তন--কত বিপ্লবেরমধ্য দিয়া যে তাহারা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস না জানিলে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। এই বিশাল জগৎ কেবল মাত্র এক প্রকার সভ্যতার রাজত্ব হইতে পারে না বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় কত বিভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে. সেই সকল ভিন্নমুখী সভ্যতা যাঁহারা কেবল এক ধারায় পরিচালিত করিবার প্রয়াস পায়েন তাঁহাদের ইতিহাসপাঠ সফল হয় নাই। ইহা সুনিশ্চিত যে, যদি কেবল এক প্রকারের সভ্যতাই সার্ব্বভৌমিক হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহা জগতের পক্ষে সৌভাগ্য হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে পরাধীন জাতিদিগের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই কর্ত্তব্যের যথাযথ প্রকৃতি কেহই স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করেন না। ফলতঃ অনেক গুরুতর বিষয় এখনও অনিশ্চিত থাকিয়া গিয়াছে। পরাধীন জাতিরা যাহাতে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য কোন অনুষ্ঠান এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তাহার ফলে যেসকল কর্ত্তব্য মৌখিক স্বীকৃত হয় অনেক সময় কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপালিত হয় না।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধান বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

(১) তথাকথিত অসভ্য বা পরাধীনজাতিগণ রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে নাবালক-স্থানীয়। আইনের দৃষ্টিতে নাবালক যেরূপ নিজ বৈষয়িককর্ম্ম পরিচালন করিতে অক্ষম সেইরূপ পরাধীন জাতিগণও স্বদেশীয় রাষ্ট্রকার্য্যসম্পাদনের উপযুক্ত নহে। কোন সভ্যজাতি তাহাদের অভিভাবকরূপে তাহাদের শাসন ভার গ্রহণ করাই উচিত। যে সকল সভ্যজাতি পরাধীনজাতিকে পরিচালিত করিবার ভার লইয়া থাকেন তাঁহাদের সকল সময় মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অভিভাবক মাত্র। পরাধীনজাতি যত অধিক অনুপযুক্ত, তাঁহাদের দায়িত্ব তত অধিক। অভিভাবক যেরূপ নাবলকের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন সেইরূপ শাসনাধীন জাতির স্বার্থসম্পাদনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

(২) আধুনিক সভ্যতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যরূপ সভ্যতামাত্রই হেয়, এই ভাব সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। এই কুসংস্কার অতীতকালে অনেক অনর্থ সংঘটিত করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও অনেক অশুভের সূচনা করিতেছে। আধুনিক সভ্যসমাজের অন্তর্গত যে সকল সমাজ

গঠিত নহে তাহাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত, এই ভাব যতদিন না লুপ্ত হইবে ততদিন জগতের মঙ্গল নাই।

আর একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, তথাকথিত অসভ্য জাতি সকলেই একপ্রকার। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। অসভ্য বলিতে আজকাল যাহাদিগকে বুঝায় তাহাদের মধ্যে কত ভিন্ন প্রকারের সভ্যতা, কত ভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা সমাজতত্ত্ববিদগণ গবেষণা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। সবল ও দুর্ব্বল, উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল, স্বার্থত্যাগী ও স্বার্থপর এইরূপ পরস্পরবিরোধী কত প্রকার জাতি যে সাধারণের স্থূলদৃষ্টিতে অসভ্যতার গণ্ডির মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

এই স্থলে সার জন পেরুবিজয়ী মারকিও সেরা দে লেজেসামার (Marcio Serra de Lejessama) মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। স্পেনদেশীয় বীর লেজেসামা প্রথম পেরুদেশ অধিকার করেন। তাঁহার মতে, পেরুর আদিম অধিবাসী ইঙ্কাগণ (Yncas) শান্তিপরায়ণ, সততাসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল। পাপ, অধর্ম্ম, শঠতা ও চৌর্য্য তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু য়ুরোপীয়গণের সহবাসে আসিয়া তাহাদের কে সারল্য—সে পবিত্রতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে: অল্পদিনের মধ্যেই সকল প্রকার পাপকার্য্যে তাহারা বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছে। লেজেসামা স্পেননরপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, আমরা একটা পবিত্র জাতিকে কলুষিত করিয়াছি সেজন্য আমি বিবেকবিদ্ধ হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। অন্যান্য অসভ্যজাতিগণ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণরাজিতে বর্ত্তমান সভ্যজাতি অপেক্ষা কয়েকাংশে কতদূর উন্নত তাহা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার সমাজ বিজ্ঞানের স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) সমতাপন্ন সভ্যজাতিগণের মধ্যে যে নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হয় পরাধীন জাতিগণের সহিত সম্বন্ধস্থাপনকালে ঠিক সে নিয়ম চলিবে না। যে চুক্তিতে নাবালকের স্বার্থহানির সম্ভাবনা তাহা যেরূপ আইনের দৃষ্টতে চূড়ান্ত বলিয়া সিদ্ধ হয় না সেইরূপ যেসকল সন্ধিতে পরাধীন জাতিগণের স্বার্থসঙ্কোচ হইতে পারে সেসকল সন্ধিপত্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হওয়াই উচিত। কিন্তু এই বিধান অনুসারে প্রায়শঃই কার্য্য হয় না। অনেক সময় ন্যায়ের আবরণ দিয়া বহুবিধ শঠতা ও অন্যায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিধান ফলপ্রদ করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা কর্ত্তব্য যে, পরাধীন জাতিগণ নিজ ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট উপায় হইতে বঞ্চিত হইতেছে না। আদিম অধিবাসিগণ যাহাতে নিজ নিজ ভাবে উন্নতি সাধনের বিশেষ সুবিধা পায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

(৪) এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যতঃ ফলপ্রসূ করিতে হইলে পরাধীনজাতিগণের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব পোষণ না করিলে চলিবে না। তাহাদের সামাজিক আচার পদ্ধতি তাহাদের বিধিব্যবস্থা যাহাতে অটুট থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অবশ্যই যে সকল আচার ব্যবহার নির্দ্দয়তাসূচক বা স্পষ্টই ক্ষতিজনক তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ন

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাসকল আরও পরিষ্কার ভাবে প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। পশ্চাৎপর জাতিগণের অভাব অভিযোগ প্রকাশার্থ এবং তাহাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় আদর্শ সর্ব্বসাধারণে প্রচারার্থ দেশে দেশে কর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। বর্ত্তমান মহাসমিতির ন্যায় মাঝে মাঝে সর্ব্বজাতি সঙ্ঘের—মিলনের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদ্বারা সহানুভূতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া প্রকৃত কার্য্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে প্রণোদিত করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে পরাধীন জাতিগণের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য স্বীকৃত হইয়া থাকে বিস্তৃত সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টার দ্বারা সেসকল কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইবে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সভ্যতা একই গণ্ডির ভিতর কেন্দ্রীভূত করা কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাই বরেণ্য। এই বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া কালে আমরা মহত্তর একতায় ও পূর্ণতর মনুষ্যত্বে উপস্থিত হইতে পারিব।

বরণ।*

হে তাপস! আজি বরিব তোমায়
মঙ্গল-আবাহনে ;
শতেক ভক্ত— কোমল-রক্ত-
মরমকমলাসনে।
ধ্বনিয়া বাণীর দেউল-অঙ্ক
পুরোহিত! তুমি বাজাও শঙ্খ।
ফুটে যা'ক কলি, ছুটে যা'ক অলি,
মরাল—কমলবনে,
চলো আগে আগে, ধরো দীপশিখা
জ্ঞানের কানন পথে।
রাখ রাখ তরী এস কাণ্ডারি!
সারথি! মানস-রথে।
আনো হে শিশুর সরল হৃদয়,
মায়ের মরম, সখার প্রণয়।
স্নিগ্ধ আশীষে করাও সিনান
মুগ্ধ সেবকগণে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

* যশোহর-খুলনা সেবা সমিতির অনুষ্ঠিত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংবর্দ্ধনা সভার গীত। সংবর্দ্ধনার বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে—'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক।
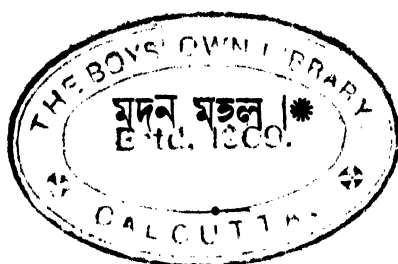
মদন মহল।*

নর্ম্মদার উভতীরশোভী অতুলনীয় শ্বেতমর্ম্মর শৈল ব্যতীত জব্বলপুরে আর একটি দর্শনীয় বস্তু আছে, তাহা মদন মহল। হয় ত ইহা সৌন্দর্য্য-পিপাসুর সম্যক তৃপ্তি সাধন করিতে না পারে, প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যসম্ভারের অপূর্ব্ব সমাবেশ উক্ত শৈলকে অসাধারণত্ব দান করিয়াছে, ইহাতে হয় ত তাহার অভাব লক্ষিত হইতে পারে ; কিন্তু যে চিন্তাশীল ভাবুক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষের অন্তরালে সুদূর অতীতের স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পায়েন, তাঁহার নিকট এই সকল সৌন্দর্য্যহীন ভগ্নপ্রায় দুর্গপ্রাসাদ প্রভৃতি নিতান্ত অনাদরের সামগ্রী নহে। আর এই ভগ্নাবশেষটি যে একেবারে সৌন্দর্য্যলেশবর্জ্জিত তাহাই বা বলি কেন? একটি অনতিউচ্চ পাহাড় ; তাহার বন্ধুর গাত্র নানা জাতীয় ক্ষুদ্রবৃহৎ বৃক্ষ ও গুল্মলতাদিতে সমাচ্ছন্ন,—কিন্তু জঙ্গল খুব ঘন নহে। চতুর্দ্দিকে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘনকৃষ্ণ মসৃণ প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত। এত বড় বড় পাতর আমি আর কোথাও দেখি নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দ্বিতল গৃহসমান উচ্চ ঐরূপ সুবৃহৎ প্রস্তর কোন কোন স্থলে এরূপ বিন্দুমাত্র ভূমির উপর অবস্থিত যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয় যেন একটু বেগে ঝড় লাগিলেই তাহা নিম্নে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কত ঝঞ্ঝা তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, কত ভূমিকম্প তাহাদিগকে ভূতলশায়ী করিতে প্রয়াস পাইয়াছে ; তাহারা সেই একই অবস্থায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে! একজন ইংরাজ পর্য্যটক নাকি আটদশজন লোক দিয়া এইরূপ একটি ক্ষীণাবলম্ব শৈলখণ্ড স্থানচ্যুত করিতে বহুপ্রকারে চেষ্টিত হইয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে একখানি অংশতঃ প্রোথিত প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত একটি প্রাচীন অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা বহু দূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ইহাই মদন মহল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-সীমায় একটি হল, এবং তাহারই পশ্চিমগাত্রসংলগ্ন একটি ছাতহীন কক্ষের কেবল খিলান-

---

* ভাগলপুর সাহিত্য-পরিষদে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

গুলি বর্ত্তমান আছে। এই কক্ষটি এবং তাহার চারি দিকের স্থান অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ; অতি কষ্টে নিকটস্থ হইলে একটি নিম্নগামী সোপানের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইল। প্রবাদ, তাহা একটি সুরঙ্গপথ এবং সেই পথ নর্ম্মদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই প্রাসাদবাসিনী রমণীরা নাকি এই পথ দিয়া নর্ম্মদা-স্নান করিতে যাইতেন। বলিয়া রাখি যে, নর্ম্মদা এ স্থান হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে। অপর দিকে গঙ্গাসাগর দীঘী নামে পরিচিত একটি সুন্দর স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা আছে। পার্ব্বত্য দীর্ঘিকার (tarn) বিবরণ ইংরাজী সাহিত্যে পাঠ করিয়াছিলাম; সেদিন তাহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। ইহার পশ্চিম তটে গুহার ন্যায় একটি স্থান দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন; এবং তথায় মানব-বাসের চিহ্নও লক্ষিত হইল। মহলের অপর পার্শ্বে, পূর্ব্বোক্ত সুরঙ্গ পথের কিঞ্চিৎ দূরে একটি মন্দির আছে, তাহা সারদা দেবীর মন্দির নামে খ্যাত। ইহা জঙ্গলে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে, মহলের নিকট হইতে কেবল ইহার চূড়াটিমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

জব্বলপুর সহরের চারি মাইল পশ্চিমে গড়া বা গড় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহাই এককালে প্রাচীন গড়মণ্ডল নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল; এবং বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী এই রাজ্যেরই রাণী ছিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পাহাড় ও তদুপরিস্থিত মদন মহল এই গ্রামে অবস্থিত। কোন প্রকার যানারোহনে এই পাহাড়ের ঠিক তলদেশে উপস্থিত হওয়া যায় না। কারণ, ইহার কিয়ৎদূর হইতে ভূমি উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ ও ক্রমোচ্চ হইতে আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং এই পথটুকু পদব্রজে অতিক্রম করিতে হয়। পর্য্যটকগণের সুবিধার জন্য জেলা বোর্ড পাহাড়ের বন্ধুর ও পিচ্ছিল গাত্রে কঙ্করাদি দিয়া একটি চলনসই রকমের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। গাছ পালা যথেষ্ট আছে; আম্র গাছের যেরূপ প্রাচুর্য্য তথায় দেখিলাম সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। এক স্থানে অনেকগুলি আম্র বৃক্ষ একটি বৃহৎ কুঞ্জবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

মহলটি প্রধানতঃ প্রস্তরনির্ম্মিত; ইষ্টকের কাযও স্থানে স্থানে আছে। এখনও ইহা এরূপ অভগ্ন অবস্থায় আছে যে, ইহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারা যায়। কিন্তু স্থানটি এরূপ নির্জ্জন ও জঙ্গলময় এবং সম্ভবতঃ শ্বাপদসঙ্কুল যে, তথায় রাত্রি যাপন বিলক্ষণ দুঃসাহসিকতার কায। কেহ এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে বোর্ডের অনুমতি লইতে হয়। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়াটির

অবস্থা যদিও বড় ভাল নহে, তবুও তদ্বারা অনায়াসে উপরে উঠিতে পারা যায়। দ্বিতলে ঘরের সংখ্যা অধিক নহে; তিন কি চারিখানি, আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না। কক্ষগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; ছাত সমস্তই খিলানের, এবং এত অল্প উচ্চ যে, একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তাহা অনায়াসে স্পর্শ করিতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ দেখিলাম যে, বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজীতে নানা দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নাম পশ্চিম দিকের একটি ঘরের ছাতে লিখিত রহিয়াছে! দুইটি মুক্ত গবাক্ষ দিয়া হুহু করিয়া বাতাস সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। শরৎকালের অপরাহ্ণে সেই নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর স্পর্শ বড়ই মধুর লাগিতেছিল। অন্যান্য ঘরগুলিতেও এইরূপ খোলা জানালা। এই সকল গবাক্ষ হইতে দূরস্থিত জব্বলপুর সহর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ নয়নসমক্ষে ঠিক চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই মহলটি একখানিমাত্র অর্দ্ধপ্রোথিত প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত। ইহাই ইহার বিস্ময়কর বিশেষত্ব। ইহার গঠনসৌষ্ঠবে স্থাপতি-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহার অসাধারণ দৃঢ়তাই ইহাকে কালের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কোন্ সময়ে যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার এখন আর কোন উপায় আছে কি না, প্রত্নতাত্ত্বিক তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু ইহা যে বহু শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহা অন্য কোন প্রমাণাভাবেও বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রাসাদসংক্রান্ত ঐতিহাসিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি যাহা অবগত হইয়াছি নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। * দাক্ষিণাত্য দেশে নানা স্থানে এবং মধ্যপ্রদেশে 'গোণ্ড' নামক অনার্য্য জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। অনুমান খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই জাতি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। নর্ম্মদাধৌত প্রদেশসমূহে তখন কালাচুরি বা কলচুরি বংশের একজন নরপতি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। গোণ্ডদলপতি যদু রায়ের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বহ্নি জ্বলিতেছিল; সে কালচুরিরাজের ছিদ্রান্বেষণের অভিসন্ধিতে তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; অধিকন্তু সে এই সময় সুরভি পাঠক নামক একজন কূটবুদ্ধি রাজকর্ম্মচারীকে তাহার ষড়যন্ত্রের সহায় ও মন্ত্রনাদাতৃরূপে

* Vide 'Jubbulpore Gazetteer' and the 'Imperial Gazetteer.'

পাইল। কিছুকাল পরে সে নিকটবর্ত্তী মণ্ডলা নামক স্থানের গোণ্ডদলপতি —নাগদাসের কন্যাকে বিবাহ করিল; এবং শ্বশুরের মৃত্যুতে সে যখন মণ্ডলার গোণ্ডগণকে আপনার অধীনে পাইল, তখন সে এই সম্মিলিত গোণ্ডবাহিনীর সাহায্যে এবং সুরভি পাঠকের সহকারিতায় কালাচুরিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ করিল। গড়া ও মণ্ডলা এই দুই বিভাগ যুক্ত হইয়া তখন গড়মণ্ডল নামক ক্ষুদ্ররাজ্য সৃষ্ট হইল। সুরভি পাঠক পুরস্কার স্বরূপ পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্ত হইল। গড়াকে যদুরায় তাহার রাজধানী করিল। সম্ভবতঃ এই সময় বা ইহার কিছুকাল পরেই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহলটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে, কোন রাজার কেন, একটি বড় গৃহস্থ পরিবারের বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বাস্তবিক যে ইহা কি উদ্দেশ্য সাধন করিত তাহা এখন বলা কঠিন। গড়াই চিরকাল রাজধানী ছিল না; এই স্থান হইতে সিঙ্গরগড় নামক স্থানে এবং পরে তথা হইতে মণ্ডলায় গোণ্ড-রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এককালে যাহা একটি রাজ্যের রাজধানী ছিল কালের বিচিত্র আবর্ত্তনে সেই গড়া এখন একটি জনবিরল ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম মাত্র।

সম্রাট আকবরের সময় এই বংশের রাজা দলপৎ সাহের সহিত রাজপুতবালা দুর্গাবতীর বিবাহ হয়। এই বীরাঙ্গনা কিরূপে রাজ্যাপহারী মোগল সম্রাটের বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এ স্থানে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এই সময় হইতেই গোণ্ড রাজ্যের একরূপ অবসান হয়। রাণী দুর্গাবতীর মৃত্যুর পর মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ গড়মণ্ডলের প্রভুরূপে কিছু কাল এই স্থানে অবস্থান করেন; এবং যদিও তাঁহার প্রস্থানের পর দলপৎ সাহের ভ্রাতা চন্দ্র সাহ রাজা বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তথাপি তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন; প্রকৃত পক্ষে গড়মণ্ডল প্রদেশ আকবরের অন্যতম সুবা মালবের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মদন মহলের নামকরণসম্বন্ধে একাধিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একটি এই যে, মদন সিংহ নামক একজন ফকির কর্ত্তৃক এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা তাঁহারই নামানুসারে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে। কোন গোণ্ড রাজা নাকি পাহাড়ের উপর এরূপ একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণের

বাসনা প্রকাশ করেন যে, তাহার নির্ম্মাণকৌশল লোকের বিস্ময় উৎপাদিত করিবে। কোন স্থপতিই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইল না। পরে মদন সিংহ নামক একজন ফকির একখানি মাত্র প্রস্তরের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে চমৎকৃত করিলেন। রাজা তাঁহাকে ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলিলে, তিনি আর কিছু না চাহিয়া স্বীয় নামানুসারে ঐ প্রাসাদের নামকরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা এই অপূর্ব্ব প্রাসাদনির্ম্মাতা ফকিরের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। 'সময়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, মহাশয় এই মহল সম্বন্ধে একটি প্রবাদমূলক বিচিত্র গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। * তাহার সারাংশ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—বুধবাহন নামক এক পরাক্রমশালী গোণ্ড রাজার তারিণী নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে বুধবাহন নানা দেশের রাজা ও রাজকুমারগণকে স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের পরামর্শানুসারে পাত্রনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। খান্দেশরাজ গিরণকে সকলে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনোনীত করিলে রাজা তাঁহাকেই ভাবী জামাতৃরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, রাজকুমারী তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলেন না। ফুলনাথ নামক এক সুন্দর তরুণ যুবক গিরণের সঙ্গে আসিয়াছিল। এই যুবক গীতবাদ্যে সুনিপুণ ছিল; এবং গিরণ যখন বিবাহের অপেক্ষায় রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সে তাহার সঙ্গীতের দ্বারা সভাস্থ সকলের চিত্তবিনোদন করিত। পুষ্পধন্বার অমোঘ প্রভাবে শীঘ্রই রাজকুমারী ফুলনাথের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন; এবং গোপনে উভয়ের মিলন হইতেও বিলম্ব হইল না। বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে যখন উৎসবান্তে সকলে ঘোর নিদ্রামগ্ন তখন রাজকন্যা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে পলায়ন করিলেন। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে পথ অজ্ঞাত, সুতরাং সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া নিশাশেষে শ্রান্ত হইয়া তাঁহারা নিকটেই একটি পাহাড়ের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রভাতে অশ্বক্ষুরশব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইতেই তাঁহারা সম্মুখে রাজা বুধবাহনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; এবং

* 'অর্ঘ্য'—চৈত্র, ১৩১৭।

তাঁহারা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সুলনাথের ছিন্ন মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। রাজকুমারী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ভূপতিতা হইলেন, এবং রাজা যখন তাঁহাকে উত্তোলন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন কন্যা উন্মাদিনীর ন্যায় রাজাকে তীব্র বাক্য বলিয়া সবলে তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। রাজা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কন্যাকে পদাঘাত করিলেন। তাহাতেই রাজকুমারীর প্রাণবিয়োগ হইল। রাজা কন্যার শোকে অধীর হইয়া কিছু কাল অতি কষ্টে কাটাইয়া একদিন সহসা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। অনেক অনুসন্ধানেও যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মনসার সিংহাসনে আরোহন করিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রদোষ ও দুর্ব্বলপ্রকৃতির জন্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজ্য শত্রুকরতলগত হইবার উপক্রম হইল। রাজকোষে অর্থাভাব, সুতরাং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবারও উপায় ছিল না। রাজ্যের যখন এইরূপ অবস্থা তখন এক দিন এক অতি শীর্ণকায় ফকির আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, তিনি যদি তাঁহার মনোমত স্থানে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে প্রচুর ধনের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন। রাজা প্রতিশ্রুত হইলে সেই ফকির প্রাসাদ-মধ্যে এক গুপ্ত স্থান দেখাইয়া দিলেন। বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, এই ফকির সেই নিরুদ্দিষ্ট রাজা বুধবাহন। মনসার এইরূপে বিপুল ধনরত্ন পাইয়া শত্রুজয়ে সমর্থ হইলেন, এবং ফকিরবেশী পিতার নির্দ্দেশক্রমে যে স্থানে প্রণয়িযুগলের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল সেই স্থানে এই অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, এই গল্পের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। প্রথমোক্ত প্রবাদের মদন সিংহ নামক ফকিরেরসহিত এই রাজ-ফকিরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, অথবা কামদেব মদনের বিজয়কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে কি না, বলা দুষ্কর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মদন মহলে একটি প্রস্তর ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল; তাহাতে হিন্দীতে লিখা ছিল যে, এই মহলের কোন স্থানে বহু লক্ষ টাকা প্রোথিত আছে। জব্বলপুর গেজেটিয়ারে দেখিলাম যে, গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গড়া গ্রাম ও মদনমহলের মধ্যে এক স্থান হইতে ১৪৬টি স্বর্ণ ও ৩৬টি রৌপমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলি কোথায় রক্ষিত হইয়াছে, এবং সেগুলি মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে কোন নূতন আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে কি না, তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

কবিতা।

১

বিকশিত প্রেমফুলে মালা গাঁথি' মোহভরে
সঁপিয়াছি যা'য়,
সে ত গো, দেখেনি চাহি', উপেক্ষায় অনাদরে
দলিয়াছে পায়!
সংসারের পথে যবে পদে পদে পরাজয়
সহি' নিরন্তর
করুণা বিন্দুর তরে কাঁদিয়াছে এ হৃদয়
নিরাশা-কাতর,
তখন করুণাময়ী, দাঁড়া'লে সম্মুখে আসি',
ব্যথায় ব্যথিতা,
হাত ধ'রে তুলি' মোরে, মুছে দিলে অশ্রুরাশি
হে মোর কবিতা!

২

যখন দুর্দ্দিন ঘোর দিখিদিক্ আঁধারিয়া
ঝরে বারিধারা,
রুদ্ধ যত পুরদ্বার, শূন্যপথে খিন্ন হিয়া
আমি গৃহহারা,
চকিত বিদ্যুৎভাতি, গগনে আঁধার মেঘে
ঘোর বজ্রনাদ,
প্রলয়নিশ্বাসসম গরজি' বহিছে বেগে
পবন উন্মাদ,
তখন সান্ত্বনা রূপে তুমি আসি' দিলে দেখা
অয়ি শুচিস্মিতা,
আনিলে ঝঞ্ঝার রাতে শান্তির অরুণলেখা
হে মোর কবিতা!

যেই জন দীন হীন ছিল ক্ষুদ্র গৃহে লীন
মগ্ন নিরাশায়,
এ কি তব লীলা—তা'রে ডেকে নিলে একবারে
বিশ্বের সভায়!
রবি শশি তারাপুঞ্জ তরুলতা পুষ্পকুঞ্জ
নির্ঝরিণী সনে
কোন্ মন্ত্রবলে মোরে বাঁধিলে প্রেমের ডোরে
অক্ষয় বন্ধনে!
এত শোভা এত ছায়া এত গীতি এত মায়া
প্রীতি অকুণ্ঠিতা,
আছে বিশ্বে স্তরে স্তরে—তুমি দেখাইলে মোরে
হে মোর কবিতা।

৪

ব্যর্থ এই জীবনের তুমি মোরে দেখাইলে
কর্ত্তব্য নূতন,
শুষ্ক মরু এ হৃদয়ে তুমি পুন বহাইলে
সুধাপ্রস্রবণ।
শিখাইলে কত উচ্চ পবিত্র প্রেমের ব্রত
নিষ্কাম মহান্,
শত ধারে বহি' সে যে পুণ্য জাহ্নবীর মত
করে আত্মদান।
দেখা'লে দুঃখেরে বরি', মূর্ত্তি তা'র অপরূপ,
কল্যাণমণ্ডিতা,
আঁকিলে মানসপটে মৃত্যুর অমৃত রূপ,
হে মোর কবিতা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মহেশপুরের সূর্য্য রাজা।

পতত্যবিরলংবারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।

অদ্য কান্তঃ কৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

অবিরল বৃষ্টিপাত হইতেছে, শিখিগণ আনন্দে নৃত্য—করিতেছে, কান্ত অথবা কৃতান্ত অদ্য আমার দুঃখ নিবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ এই শিখিনৃত্যমুখর ভরা বাদলে বিরহ-বেদনা দূর করিতে কান্ত অথবা কৃতান্ত ভিন্ন তৃতীয় কেহ নাই।

এই শ্লোকে যে বর্ষায় প্রিয়কণ্ঠলগ্নবাহু রমণীর চিত্তও চঞ্চল হয় সেই বর্ষায় কোন্ বিরহবিধুরার মর্ম্মবেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইহার সহিত যশোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুরের ধীবর রাজা সূর্য্যনারায়ণ দাসের কোন প্রাচীন ইতিহাস জড়িত আছে কি না বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

রাজা রামচন্দ্র খাঁ, রাজা মটুক রায়, হরে শুঁড়ী প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের যে সমস্ত প্রাচীন স্বাধীন হিন্দু নৃপতিদিগের কথা জানা যায় তাঁহাদিগের আবির্ভাবকাল প্রায়ই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই পড়িয়াছে। ইঁহারা সকলেই বার ভুঁইয়াগণের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজা ছিলেন। পাঠানদিগের অবনতি হইতে ইঁহাদিগের সকলেরই অভ্যুত্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন হিন্দু রাজার অস্তিত্ব মধ্যবঙ্গে ছিল কি না জানিতে পারি নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, প্রভুভক্ত জেলে কৈবর্ত্ত রাজা সূর্য্যনারায়ণ দাস পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, প্রভুর প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজার প্রসাদ লাভ করিয়া স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র রাজা হইয়া মধ্যবঙ্গের এক প্রান্ত উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পাঠান-দিগের অভ্যুত্থানের মধ্যেও সূর্য্যরাজার বংশধরগণের রাজত্বলোপ হয় নাই।

একাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ আর বর্ত্তমানে ১৩১৯ সালের বাঙ্গালায় আসমান জমিন ফারাক। তখন বাঙ্গালা দেশ অসংখ্য নদী শাখানদীতে বিভক্ত ছিল। এখন সেই সকল নদী খালের অস্তিত্বলোপ হইতেছে। যে দুই একটি বিদ্যমান তাহারাও গঙ্গার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পাটের জমাতে পরিণত হইতেছে। সেকালে এই সব নদীতীরে জাতীয় ব্যবসা বজায়

রাখিবার জন্য অধিকাংশ ধীবর কৈবর্ত্তগণ বাস করিত। তাহারা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী বলিয়া রাজসম্মান পাইত এবং নদীপথে তাহাদের প্রভূত প্রতাপও ছিল। এই কৈবর্ত্তগণই বল্লাল সেনের নৌবাহিনী পরিচালিত করিত ও নৌসেনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যথেষ্ট শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল।

ভরা ভাদরে ভাগীরথীর রূপ যেন উছলিয়া উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে দমকা দক্ষিণা বাতাস বীচিবিক্ষুব্ধ তটিনীপ্রবাহকে যেন আরও উদ্বেলিত করিয়া যাইতেছে। এই রৌদ্র, এই বৃষ্টি। আকাশের গাত্রে তরল কাল মেঘের গড়াগড়ি, আর নিম্নে ভাগীরথীর গেরুয়া জলে, নবদ্বীপের ঘাটে, গেরুয়া বসন পরিহিত অসংখ্য নরনারীর হুড়াহুড়ি।

আজ ভাদ্র সংক্রান্তি, বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ হিন্দু রাজা বল্লাল সেন তাঁহার অন্যতম রাজধানী নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে বসিয়া মুক্তহস্তে দানধ্যানে রত। পিতাপুত্রে সামান্য মনান্তর ঘটায় কুমার লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত বঙ্গেশ্বর দানকার্য্য সমাধা করিয়া আহারের জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ—লক্ষ্মণ সেনের পত্নী—উপরোক্ত শ্লোকটি লিখিয়া রাখিয়াছেন। পুত্রবধূর প্রাণের ব্যথায় বৃদ্ধ-রাজার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্যস্ত-ভাবে আহার সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে প্রকারেই হউক অদ্য রাত্রির মধ্যেই লক্ষ্মণকে লক্ষ্মণা-বতী হইতে নবদ্বীপে আনিতে হইবে। যদি গৌড় হইতে অদ্যই লক্ষ্মণ সেনকে গৃহে আনিতে না পারি, তবে এই জাহ্নবীজলে জীবন বিসর্জ্জন করিব। আর অন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।" মন্ত্রী বিশেষ চিন্তিত হইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিবার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন।

রাজা মন্ত্রীকে চিন্তান্বিত দেখিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী বিশেষ চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই, আমার প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই রক্ষিত হইবে। তুমি নৌবিভাগের কৈবর্ত্ত দাসদিগকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা জ্ঞাপন কর।"

নৌবিভাগে রাজার প্রতিজ্ঞার কথা প্রচারিত হইলে সকলেই ভাবিতে লাগিল। কেহই রাজসমীপে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না; কারণ, নব-দ্বীপ হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গৌড়ে পৌঁছিয়া আবার গৌড় হইতে রাত্রির মধ্যে নবদ্বীপে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হইতেছিল।

পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নাই। বঙ্গালের নৌসেনাবিভাগের জেলে কৈবর্ত্তদিগের মধ্য হইত উন্নতবক্ষ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অসমসাহসী যুবক, রাজার প্রধান নৌবাহিনীপরিচালক সূর্য্যনারায়ণ দাস—রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন। সূর্য্য দাস মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া প্রভুর অন্নের মর্য্যাদা, এবং রাজার সম্মান ও রাজার জীবন রক্ষা করিবার জন্য অসম্ভব কার্য্য সম্ভব করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সূর্য্য দাস এক বার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর এক বার চঞ্চল উত্তর পবনের ক্ষিপ্রগতি অনুভব করিয়া বঙ্গেশ্বরকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার অনুমতি করুন্, চরণধূলি দিউন, অদ্য রাত্রি-তেই রাজকুমারকে লক্ষ্মণাবতী হইতে নবদ্বীপে আনিয়া দিব।"

রাজা সূর্য্য দাসের ক্ষমতা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সূর্য্যের আশ্বাস-বাক্যে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। সূর্য্য দুইখানি ছিপ একসঙ্গে জুড়িয়া ছিপের ডাক বসাইয়া দ্বিগুণ মাল্লা সমভিব্যাহারে অনুকূল বাতাসে পাইল তুলিয়া জাহ্নবীর প্রবাহ বিদীর্ণ করিয়া প্রখর স্রোতের বিরুদ্ধে উত্তরাভিমুখে চলি-লেন, যে প্রবল বাতাস নৌকার প্রত্যেক আরোহীর—প্রত্যেক মাঝি মাল্লার নিকট সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল তাহাই সূর্য্যদাসের সহায় হইল।

যখন সূর্য্য রাজপুত্রকে লইয়া লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিলেন, তখন আকাশ পরিষ্কার, বায়ু যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, চন্দ্রের কিরণে গঙ্গার বীচমালা জ্বলিতেছে। সূর্য্য দাস যাইবার সময় যেমন পাইলভরে স্রোতের বিরুদ্ধে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন আসিবার সময় সেইরূপ স্রোতের বেগে তীব্র বেগে নবদ্বীপের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক রাত্রিতেই মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে নবদ্বীপে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষা হইল, জীবন বাঁচিল।

বঙ্গেশ্বর দাস কৈবর্ত্তদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি পুরস্কার চাহ; বল। যাহা চাহিবে আমি তাহাই তোমাদিগকে দিব।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অসংখ্য নদীখাল পরিবৃত বঙ্গদেশে সে সময় বহু ধীবর দাসের বাস ছিল। তাহারা রাজসরকারে উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের স্পৃষ্ট জল শুদ্ধ বিবেচিত হইত না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ জেলে-কৈবর্ত্তদিগের জল ব্যবহার করিতেন না বলিয়া তাহারা মনে মনে বড়ই দুঃখিত ছিল। দাস ধীবরগণ সুযোগ পাইয়া মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিল, "ধর্ম্মাবতার, আমরা আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাদিগকে এই

ভিক্ষা দিউন, যেন আজ হইতে কৈবর্ত্তদিগের জল হিন্দুসমাজে চলিত হয়।" বল্লাল সেন জেলে কৈবর্ত্তদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার প্রিয় Royal Boatman সূর্য্যনারায়ণ দাসকে বর্ত্তমান যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন মহেশপুর গ্রামে কয় সহস্র বিঘা ভূমি কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ জায়গীর দিলেন। সূর্য্যের অনুচরগণও কিছু কিছু জমী পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

সেই হইতে কৈবর্ত্তগণ জলআচরণীয় জাতি বলিয়া হিন্দুসাজে পরিগণিত হইয়াছেন। এই সময় হইতে কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়েন। এক দল রহিলেন, দাস ধীবর—জেলে কৈবর্ত্ত, অপর দল হইলেন হেলে কৈবর্ত্ত—মাহিষ্যঃ।

এক্ষণে দেখিতেছি, বল্লালসেনের Royal Boatmanই আমাদের মহেশপুরের প্রাচীন কৈবর্ত্ত রাজা সূর্য্যনারায়ণ দাস। এই মহেশপুরেই মহারাজা তাঁহাকে কয় হাজার বিঘা ভূমি জায়গীর দিয়াছিলেন। রাজার পুত্রবধূর রচিত কবিতা হইতেই সূর্য্য রাজার উৎপত্তি; সেই কারণে সর্ব্ব প্রথমেই সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। মহেশপুর গ্রামের উত্তরে গড়পরিবেষ্টিত "সূর্য্যের বেড়" আজি পর্য্যন্ত সূর্য্য রাজার অস্তিত্বের ও বাস্ত ভিটার পরিচয় দিতেছে। এ দেশের লোক সূর্য্য রাজার বাড়ীকে সূর্য্যের বেড় বলিয়াই অবগত আছে; কিন্তু এই জেলে রাজা কোথা হইতে আসিলেন, কোন্ সময়ের রাজা, কি করিয়া রাজা হইলেন সে সন্ধান কেহই দিতে পারে না। সূর্য্যের বেড় এক্ষণে জঙ্গলে পরিবৃত। সে দিকে লোকের বড় গতায়াত নাই। গড়ের খাতচিহ্ন অদ্যাপিও সামান্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইষ্টকাদিস্তূপের কোন অনুসন্ধান মিলে না।

পাঠান রাজাদিগের অবনতির পরও সূর্য্যরাজার বংশধরগণ মহেশপুরে সসম্মানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, মহেশপুরের বর্ত্তমান জমীদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্য রাজার বংশধরদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি লইয়া জমীদারী স্থাপিত করেন।

আইন-আকবরীর মতে, বল্লাল সেন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অনুমানে বুঝা যাইতেছে যে, তাহার রাজত্বের শেষ সময়েই তিনি সূর্য্য দাসকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সূর্য্যদাস জায়গীর পাইয়াই যদি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহেশপুরে আসিয়া

রাজা হইয়া থাকেন তবে একাদশ শতাব্দীর প্রথমেই আমরা মধ্য বঙ্গের এক প্রান্তে সূর্য্যরাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, এক রাজার প্রিয় কর্ম্মচারী পরবর্ত্তী রাজার অধীনে বড় থাকিতে চাহে না, প্রভুর মৃত্যুর পর সম্মানহানির ভয়ে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সূর্য্য বল্লাল সেনের প্রিয় মাঝি ছিলেন। বিশেষতঃ রাজার সম্মান রক্ষা করায়, রাজপুত্রের সহিত রাজবধূর মিলন করিয়া দেওয়ায় রাজা তাঁহার উপর বড়ই প্রসন্ন ছিলেন। তখনকার আমলে কাহারও সামান্য একটু ভূসম্পত্তি থাকিলেই সে স্বাধীন রাজা বা স্বাধীন জমীদার সাজিয়া বসিত এরূপ ক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বরের নৌবিভাগে সম্মান অর্জ্জন করিয়া মহারাজের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ গ্রাম দান পাইয়া সূর্য্য দাস যে স্বয়ং রাজা না হইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত রাজ-সরকারে জীবন অতিবাহিত করিবেন তাহা সমীচীন বলিয়া অনুমান হয় না। বিশেষতঃ যখন সূর্য্য দাসের অধীন অনুচরবর্গও তাঁহারাই সঙ্গে কিছু কিছু ভূমি পাইয়া তাঁহারই অধীন থাকিয়া হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন সূর্য্য দাস যে সেই সমস্ত অনুচরবর্গসমভি-ব্যাহারে স্বয়ং স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিবেন না ইহা মনে হয় না। অতএব বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরই সূর্য্য দাসের মধ্যবঙ্গে রাজা হওয়া সম্ভব।

তাহা হইলে যখন লক্ষণ সেন বাঙ্গালার রাজা তখন সূর্য্য দাসও মধ্যবঙ্গের একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন মনে হয়।

যদি লক্ষণ সেন বাঙ্গালার শেষ রাজা না হইয়া তদীয় পৌত্র লাক্ষ্মণেয় ১১২৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব একাদশ শতা-ব্দীর প্রথমেই স্বীকার করিতে হয়। মিথিলায় প্রচলিত মহারাজা লক্ষণ সেনের অব্দ দেখিয়া জানা যায় যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মল সংবৎ ছিল ৩৬৭। তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেন ১১০৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন ধরিতে হয়। আমাদের মহেশপুরের ধীবর রাজা সূর্য্যনারায়ণ দাসও তাহা হইলে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মধ্যবঙ্গের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং মধ্যবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীন রাজাদিগের মধ্যে এই সূর্য্য রাজাই সর্ব্বপ্রথম।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

মন্দারে মধুসূদন।

—০:০:০—

ভাগলপুর জিলার বাঁকা সবডিবিজনের অন্তর্গত আমাদের পুরাণপ্রসিদ্ধ মন্দার গিরি। মন্দার গিরি ভাগলপুর নগর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

এতদিন ভাগলপুর হইতে অশ্বযান বা গোযান যোগে মন্দারে যাইতে হইত। সুতরাং, মন্দার-দর্শন নিতান্ত সুলভ বা সুখকর ছিল না। গত অক্টোবর মাস হইতে ভাগলপুর-বৌসি রেলপথ খোলায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বৌসি (রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম পর্ব্বতের নামানুসারে "মন্দার হিল্") হইতে মন্দার গিরির দূরত্ব তিন মাইল মাত্র। ষ্টেশনে দুই একখানি টমটম এবং পাল্কী গাড়ীও পাওয়া যায়।

বরাহ পুরাণে লিখিত আছে:—"পৃথিবীর সকল তীর্থের মধ্যে মন্দার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে পবিত্র মহাঋষিদিগের বাস, এই স্থানই কমলনয়না ইন্দিরার প্রিয় নিকেতন এবং ইহাই প্রসিদ্ধ মধুদৈত্যের বিনাশস্থান। এই স্থানেই বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছিল। এবং এই স্থানেই নলিনীর ন্যায় সুন্দরী এবং মৃণালের ন্যায় সুকুমারী দেবী চিরবিরাজিতা। সুতরাং পৃথিবীতে মন্দারের ন্যায় তীর্থ আর নাই। * * * মন্দারের পাদমূলে যে রমণীয় সরোবর বিরাজিত, তাহাতে স্নান করিলে লোক সবংশে ও সবান্ধবে পাপমুক্ত হয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।" এত সহজে ও সুলভে এরূপ শ্রেষ্ঠ ফললাভের লোভ সম্বরণ করা দুরূহ। তাই আমরা কয়েকটি "পুণ্যলোভাতুর" বন্ধু একদিন প্রত্যুষে মুঙ্গের হইতে মন্দার যাত্রা করিলাম। ভাগলপুরে গাড়ী বদল করিয়া মন্দার হিল ষ্টেশনে পৌঁছিতে বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। স্নানাহারের পর অপরাহ্নে একখানি অশ্বযান সংগ্রহ করিয়া মন্দার দর্শনে চলিলাম।

দিগন্তবিস্তৃত সমতল প্রান্তরমধ্যে আনুমানিক সাত শত ফীট মাত্র উচ্চ ক্ষুদ্র গিরিই আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক মন্দার বলিয়া পরিচিত। ইহাই সেই মন্দার যাহাকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন এবং ইহাই সেই মন্দার যাহা পুরাণে আকাশচুম্বী সুমেরুর সমকক্ষ বলিয়া বর্ণিত।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের শুষ্ক সংশয় ভক্তের হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে না। তাই—স্নান পূজা করিয়া মুক্তিলাভের আশায় আজিও মকর সংক্রান্তির দিনে লক্ষাধিক নরনারী অসংশয়িত চিত্তে এই পর্ব্বততলে সমবেত হয়।

মন্দারের সঙ্গে নানা পৌরাণিক কাহিনী বিজড়িত। সৃষ্টির আদিতে ভগবান বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক ভীষণ দৈত্যদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। মধু ও কৈটভ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান বিষ্ণুর সহিত তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধের পর ভগবান বিষ্ণু জয়ী হয়েন। কিন্তু তাহাতেও দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যের প্রাণ-নির্গত হইল না; মুণ্ডহীন দেহ সৃষ্টি সংহারে উদ্যত হইল। তখন ভগবান সেই ছিন্নমুণ্ড দেহের উপর মন্দার গিরিকে রক্ষা করিয়া স্বয়ং পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। তদবধি ভগবান বিষ্ণু মন্দারে নিত্য বিরাজিত এবং সেই দিন হইতেই মধুসূদনের নাম মন্দারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট।

পুরাণপ্রথিত সমুদ্রমন্থনের সঙ্গেও মন্দারের স্মৃতি চিরসংবদ্ধ। মন্দারকে অবলম্বন করিয়াই দুর্ব্বাসাবিড়ম্বিত দেবকুল লক্ষ্মী এবং অমৃতকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ভক্তের সরল বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকটেও মন্দারের মূল্য সামান্য নহে।

মন্দারের চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া বহু অট্টালিকা, প্রাচীর, প্রস্তরমূর্ত্তি, বাপী এবং তড়াগের অবশেষ। দেখিলেই মনে হয়, ইহার নিকট কোন বিশাল নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পর্ব্বতমূলে একটি ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা। অট্টালিকার প্রাচীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, "দীপাবলীর" রাত্রিতে নগরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থ এই গবাক্ষে একটি করিয়া প্রদীপ দিত; এবং এইরূপে প্রদত্ত প্রদীপের সংখ্যা এক লক্ষের কম হইত না। নগরে ৫২ বাজার, ৫৩ গলি এবং ৮৮ "তালাও" (পুষ্করিণী) ছিল।

এই অট্টালিকার কিছু দূরে আর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। জনরব এই যে, রাজা চোলার রাজত্বকালে এই অট্টালিকা

নির্ম্মিত হয়। রাজা চোলা আজ হইতে প্রায় দ্বাবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই যে এই স্থানে মধুসূদনের মাহাত্ম্যে এক বিপুল সমৃদ্ধিশালী নগরী গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এই বৃহৎ নগরী কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। জনপ্রবাদ এই যে, পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ মধুসূদনের মন্দিরের এবং এই নগরীর ধ্বংসসাধনও সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়েরই অন্যতম কীর্ত্তি। পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি সকলের দুরবস্থা দেখিলে এই জনপ্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্ববর্ণিত অট্টালিকার অনতিদূরে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বিজয়তোরণ। তোরণপৃষ্ঠস্থ সংস্কৃত শ্লোক দেখিয়া মনে হয়, ১১০১ শকাব্দায় এই নগরী বিদ্যমান ছিল এবং সেই সময়ে হিন্দু মুসলমান যুদ্ধের বিজয়চিহ্ন স্বরূপ এই তোরণ ছত্রপতি কর্ত্তৃক মধুসূদনের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই বিজয়তোরণের প্রতিষ্ঠা হইতে মনে হয় যে, বহুদিন ধরিয়া এই স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ চলিয়াছিল এবং সেই দীর্ঘ বিরোধের ফলেই, বোধ হয়, ক্রমশঃ এই নগরী জনশূন্য হইয়া পড়ে। নগর জনহীন হইলে মধুসূদনের বিগ্রহ প্রায় এক ক্রোশ দুরবর্ত্তী বৌসি গ্রামে নীত হয়।

এক্ষণে বৌসি গ্রামস্থ বৃহৎ মন্দিরেই মধুসূদনের স্থায়ী অবস্থান। বৌসির নবনির্ম্মিত মন্দিরটি প্রশস্ত ও শোভাময় এবং মধুসূদনের বিগ্রহও সুদর্শন। এখন কেবল মকর সংক্রান্তির সময়ে মধুসূদনের বিগ্রহ ছত্রপতি নির্ম্মিত বিজয়তোরণতলে নীত হয় এবং সেই সময়ে এই স্থানে পক্ষকালব্যাপী বিপুল মেলার সমাবেশ হইয়া থাকে।

জনপ্রবাদমতে এই মেলার উৎপত্তি এইরূপে হয়ঃ—কাঞ্চীপুরের রাজা ছত্রপতি চোলা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়েন। এই নিদারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার অভিপ্রায়ে রাজা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও সফলকাম হইতে না পারিয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে মন্দারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে গিরিমূলস্থ "মনোহর কুণ্ড' নামক এক সরোবরে স্নান করিবামাত্র রাজার কুষ্ঠক্ষত অকস্মাৎ তিরোহিত হয়। মনোহর কুণ্ডের জলের এই অপূর্ব্ব রোগনাশক শক্তির কারণ ছিল। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এই গিরিশিরে বহু লক্ষ বৎসর তপস্যা করেন। তপস্যা সমাপ্ত হইলে তিনি তাম্বুল কদলী সুপারি প্রভৃতি হস্তে লইয়া যখন যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান

করেন, সেই সময়ে সুপারিটি গিরিপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া মনোহর কুণ্ডের জলে পতিত হয় ইহাই কুণ্ডের জলের পবিত্রতা ও রোগনাশকতার কারণ।

যাহা হউক ভীষণ ব্যাধি হইতে এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়া রাজা চোলা ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে এই ক্ষুদ্র সরোবরকে বিস্তৃত ও গভীর করিয়া খনন করান এবং ইহার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহার নাম "পাপহরণী" রাখেন।

রাজা যে দিন পাপহরণীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হয়েন সেই দিন উত্তরায়ন সংক্রান্তি। তাই সেই সময় হইতে বর্ষে বর্ষে উত্তরায়ন সংক্রান্তির সময়ে এই স্থানে মেলা চলিয়া আসিতেছে।

এই ঘটনার পর রাজা চোলা মন্দারমূলে আপনার রাজধানী স্থাপিত করেন এবং সরোবর, বাপী, প্রস্তরমূর্ত্তি, দেবালয় প্রভৃতির সাহায্যে পর্ব্বত পৃষ্ঠকে সুশোভিত করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিবার জন্য তিনিই বিপুল ব্যয়ে প্রস্তর কাটিয়া সোপান নির্ম্মাণ করান এবং বিদেশী ঐতিহাসিকের মতে এই গিরিগাত্রে ক্ষোদিত বিশাল সর্পমূর্ত্তিও তাঁহারই প্রগাঢ় ভক্তির নিদর্শন। এই মন্দারই যে সমুদ্রমন্থনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল জনসাধারণের চিত্তে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্যই রাজা পর্ব্বতগাত্রে বহু ব্যয়ে এই প্রকাণ্ড সর্পমূর্ত্তি ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন।

পর্ব্বতে উঠিবার প্রস্তর সোপানের পার্শ্বে ক্ষোদিত একটি শিলালিপি হইতে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৌদ্ধ রাজা উগ্রভৈরবের নাম উদ্ধার করেন। উগ্রভৈরবের নাম দেখিয়া মনে হয় যে, রাজা উগ্রভৈরব রাজা চোলার পরে পর্ব্বতে কোন বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্যই সোপানপার্শ্বে আপনার নাম ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন।

পর্ব্বতে বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ প্রভাবচিহ্নেরও অভাব নাই। আজিও মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটি বৃহৎ জৈনমন্দির সুশোভিত।

পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ সোপানরাজি যে স্থানে যাইয়া শেষ হইয়াছে সেই স্থানে নিম্নভূমি হইতে প্রায় ৫০০ ফীট উচ্চ একটি ১০০ ফীট দীর্ঘ এবং ৫০ ফীট প্রস্থ সরোবরের ভগ্নাবশেষ। সরোবরটির নাম সীতাকুণ্ড। জনপ্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে সীতাদেবী কিছুকাল স্বামীসঙ্গে এই পর্ব্বতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে "পুণ্যশ্লোকা" জনকদুহিতা প্রতিদিন

এই কুণ্ডের জলে স্নান করিতেন। রাজা চোলার প্রতিষ্ঠিত মধুসূদনের প্রাচীন মন্দির এই কুণ্ডেরই উত্তরতীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। পাণ্ডারা বলে দুর্দ্ধর্ষ কালাপাহাড় মন্দির চূর্ণ করিয়া মধুসূদনের পবিত্র বিগ্রহকে ভগ্ন করিবার উপক্রম করিলে মধুসূদন সীতাকুণ্ডে লাফাইয়া পড়েন এবং পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গোপনে ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী কাজরালি নামক বৃহৎ সরোবরে পলায়ন করেন। তিনি বহুকাল সরোবরমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অবশেষে একদিন একজন পাণ্ডাকে স্বপ্ন দেন যে, তিনি কাজরালিতে লুকাইয়া আছেন। পাণ্ডা স্বপ্ন পাইয়া মধুসূদনের বিগ্রহকে মন্দার গিরির পাদমূলে নবনির্ম্মিত মন্দিরে লইয়া যায়েন। কালক্রমে সে মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বৌসি গ্রামে মধুসূদনের বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভগবান মধুসূদনের বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সবলপুরের জমাদারর৷ বলেন যে, ভগবান মধুসূদন সীতাকুণ্ডে লম্ফ প্রদানের পর পাক্কেতে উপস্থিত হয়েন এবং তাঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষকে স্বপ্নে এই কথা জ্ঞাপন করেন। স্বপ্ন পাইয়া ভদ্রলোক পাক্কেতের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া মধুসূদনের বিগ্রহ প্রার্থনা করেন; কিন্তু রাজা কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করায় ভক্তবৎসল দয়া করিয়া তাঁহাদেরই জমীদারির অন্তর্গত কাজরালি সরোবরে চলিয়া আইসেন।

সীতাকুণ্ডের কয়েক ফীট উপরে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়—নাম শঙ্খকুণ্ড। এই স্থানেই নাকি প্রসিদ্ধ শঙ্খ দৈত্যের বাস ছিল এবং তাহাকে নিহত করিয়া ভগবান বিষ্ণু তাঁহার প্রসিদ্ধ পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। শঙ্খদৈত্যের পূর্ব্ববাসস্থানের নিদর্শন স্বরূপ এখনও এই কুণ্ডের তীরে একটি ৩ ফীট দীর্ঘ এবং ১॥ ফীট প্রস্থ গহ্বর প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে পর্ব্বতের গুহার মধ্যে একটি নির্ম্মল প্রস্রবণ। প্রস্রবণের নাম আকাশগঙ্গা। গহ্বরটি দেখিতে অঞ্জলির ন্যায়। বৃষ্টির জল ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পর্ব্বতমধ্যস্থ কোন প্রস্রবণের সঙ্গে সংযোগ থাকায় ইহাতে কোন সময়েই সুস্বাদু ও নির্ম্মল জলের অভাব হয় না।

এই গহ্বরেরই নিকটে পর্ব্বতপৃষ্ঠে মধুকৈটভের ভীষণ মুণ্ড ক্ষোদিত।

আকাশগঙ্গার নিকটে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রম। প্রায় বৃক্ষহীন গিরিপৃষ্ঠে সন্ন্যাসীর আম্রকদলীবংশখচিত আশ্রমটিকে অতি মনোহর দেখায়।

এই নির্জ্জন স্থানে সন্ন্যাসী শিষ্য, গোবৎস এবং হনুমানের কতকগুলি দুরন্ত বংশধর লইয়া বেশ শান্তিতে বাস করিতেছেন মনে হইল।

সন্ন্যাসীর আশ্রমের পার্শ্বেই গুহামধ্যে নৃসিংহ দেবের বৃহৎ মূর্ত্তি। প্রবাদ এই যে, ভক্ত প্রহ্লাদের সম্মান রক্ষার্থ ভগবান নারায়ণ স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া এই স্থানেই ভগবৎবিমুখ হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। গুহাভ্যন্তর দিবাভাগেও অন্ধকার। সন্ন্যাসী আলোক জ্বালিয়া আমাদিগকে মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি সুদৃশ্য জৈনমন্দির! মন্দিরের নিকটে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে চারিদিকের দিগন্তবিস্তৃত হরিৎক্ষেত্র এবং ঘনশ্যাম বৃক্ষরাজির স্নিগ্ধ সুষমা হৃদয় মুগ্ধ করে। মন্দিরটির দ্বার আপাততঃ রুদ্ধ। শুনিলাম, মন্দিরের সংস্কার শীঘ্রই আরব্ধ হইবে।

সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করের মধুর বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে আমরা গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলাম।

যখন আমরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বৌসি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চলে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং মধুসূদনের মন্দির হইতে সান্ধ্য আরতির গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিতহইতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কবি-হৃদয়।

কণ্টক-শয্যার ক্লেশ মনে নাহি গণি'
গোলাপ যেমন,
আপন হৃদের মধু সুরভি লইয়া
হাসে ফুল্লমন—
পড়িয়া দুঃখের অঙ্কে ভুলি' শত ব্যথা
কবির হৃদয়,
আপনার ভাবে ভোর হইয়া তেমতি
সদা হাস্যময়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ঋণ-পরিশোধ।

(১)

পিতামাতা যখন স্বর্গগত হইলেন তখন কুমুদের বয়স পাঁচ বৎসর, আর তাহার ছোট ভাই প্রফুল্লের বয়স দেড় বৎসর। সংসারে আর কেহই ছিল না। সুতরাং, ভাই দুইটি নিতান্ত নিঃসহায়, নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে কেহ নাকি নিরাশ্রয় থাকে না, তাই এই নিরাশ্রয়দ্বয়েরও আশ্রয় জুটিল।

কুমুদের পিতা চন্দ্রনাথের এক খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। সরিকি হিসাবে তাঁহার সহিত ভ্রাতা চন্দ্রনাথের বিশেষ সদ্ভাব না থাকিলেও, এই দৈব বিপদের সময় দীননাথ পূর্ব্বের মনোবিবাদ ভুলিয়া গেলেন এবং চন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রীকে মহাযাত্রার জন্য যখন ঘর হইতে ধরাধরি করিয়া বাহির করা হইল, তখন দীননাথের স্ত্রী এই দুইটি নিরাশ্রয় বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

দূর সম্পর্কীয় দুইএকজন আত্মীয় আসিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিলেন; এবং দীননাথের স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমারই ত দায়, তোমার হাতেই দিয়া গিয়াছে। তা' নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করিবেন। তোমরা কি কুমুদ প্রফুল্লকে ফেলিতে পার? তোমার সতীশ বিপিনও যেমন উহারাও ত তেমনই,—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

দীননাথের স্ত্রী মঙ্গলা দেবী বেশী কিছু বলিলেন না;—স্বভাবতঃই তিনি একটু কম কথা বলিতেন; কথা বলার অপেক্ষা কায করিয়া যাওয়াই তাঁহার অধিক অভ্যস্ত ছিল। সমবেদনা ও সহানুভূতিপ্রকাশের পালা যখন শেষ হইল, তখন মঙ্গলা দেবী এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন।

সহানুভূতি করিতে আসিয়া নিষ্কর্ম্মা আত্মীয়কুটুম্বগণ অনেক সময়ে তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া সমালোচনাও করিয়া থাকেন। সেইজন্য মঙ্গলা দেবী আত্মীয়কুটুম্ব 'ক্লাসটিকে'ই অত্যন্ত ভীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। সহানুভূতি-প্রকাশের অন্তরালে যখন তীব্র সমালোচনা উন্নতফণ ফণীর ন্যায় মাথা উচ্চ করিয়াই থাকে, আর একটুকু ত্রুটি পাইলেই দংশন করে, তখন মানুষ আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতে পারে না। সুতরাং মঙ্গলা দেবী ও দীননাথ যখন এই দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া লইলেন, তখনই আত্মীয় কুটুম্বের সহানুভূতির মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে দায়িত্বের গুরুত্ব কতটুকু তাহাও হিসাব করিলেন।

কিন্তু এ ভার গ্রহণ করা ব্যতীত কিছু উপায় ছিল না। এই দুইটি বালককে 'মানুষ করিয়া' তুলিবার শক্তিও ভগবান দিবেন এমনই একটা সহজ সরল বিশ্বাসও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে ছিল।

কুমুদের বয়স পাঁচ বৎসর হইলেও, তাহার একটা শান্ত স্থির বুদ্ধি, এই বাল্যকাল হইতেই লক্ষিত হইত। সে কখনও বালসুলভ চপলতা প্রকাশ করিত না; সে কি যে ভাবিত তাহা সে-ই জানে; প্রতিবেশীরা মনে করিতেন, সে স্বর্গগত পিতামাতার কথাই চিন্তা করিয়া ম্রিয়মান থাকে। দীননাথ কুমুদের এই অপ্রফুল্ল ভাব লক্ষ্য করিতেন; এবং যাহাতে কুমুদ তাঁহার পুত্রদিগের সহিত মিশিয়া খেলাধূলা করিয়া একটু প্রফুল্ল থাকে এমন চেষ্টা করিতেন।

কুমুদ যখন লিখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল, তখন শিক্ষাবিষয়ে তাহার একটা অদ্ভুত একাগ্রতা দেখা গেল। সে শৈশবে তাহার ক্ষুদ্র দপ্তরটিকে ও একটু বড় হইয়া স্কুলের বহিগুলিকে অত্যন্ত যত্ন করিত। বাহিরের একখানি ছোট ঘরে একখানি তক্তার উপর সে তাহার বহিগুলি, কাগজ কয়খানি, পেন্সিলটি গুছাইয়া রাখিত;—ক্রমে সেই ঘরখানিই যেন বাড়ীর মধ্যে তাহার নিকট প্রিয়তম স্থান হইয়া উঠিল। এক স্কুলের সময় ব্যতীত কুমুদকে খুঁজিতে আর কোনও স্থানে যাইবার দরকার ছিল না। ঐ ঘরখানির কাছে আসিয়া ডাকিলেই তাহার সাড়া নিশ্চিত পাওয়া যাইবে, এ কথা বাড়ীর সকলেই জানিতেন।

দীননাথের পুত্রদ্বয়, সতীশ ও বিপিন, কুমুদের অপেক্ষা কিছু ছোট; তাহারা সাধারণ ছেলেদের মত খেলিত, পড়িত, বাজে পাঁচটা কাযে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাইত।

তাহারা কুমুদের এই নিঃসঙ্গ ভাবটি কোন ক্রমেই পছন্দ করিতে পারিত না। দুরন্ত সতীশ মধ্যে মধ্যে ঝড়ের বেগে কুমুদের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া কুমুদকে ডাকিয়া সে কোন সহপাঠীর নাসিকায় কিরূপে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে, তাহা বলিতে বলিতে হয় ত কুমুদের শ্লেটখানির উপরেই এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বসিত।

কুমুদ ভাঙ্গা শ্লেট লইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া মঙ্গলা দেবীকে দেখাইত,—"কাকী মা, এই দেখ, সতীশ আমার শ্লেট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

যথা সময়ে সতীশের কিছু 'দক্ষিণা' লাভ হইত।—সতীশ বিপিনের কাছে

আসিয়া বলিত, "কুমুদদাদা নিজে ত কিছু করিতে পারে না—মা'র কাছে নালিশ করিয়া আমাকে মার খাওয়ায়—তা' আমি দেখিব।"

সতীশ যথাসময়ে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ দস্যুর মত পড়িয়া কুমুদের হাত হইতে তাহার বহি, পেন্সিল, খাতা কাড়িয়া বলিত,—"কেমন আর নালিশ করিবে?"—সতীশ ছুটিয়া আসিত, এবং কুমুদ আসিবার বহু পূর্ব্বেই তাহার ঘরের তক্তার উপর বহিগুলি রাখিয়া দিয়া তাহার 'প্যারালেল বারের' বাঁশ কাটিতে বসিত।

কুমুদ বাড়ী আসিলে, তাহার মুখভাবে মঙ্গলা দেবী বুঝিতেন, দুরন্ত সতীশ আবার একটা কিছু করিয়াছে।

"কিরে কুমুদ,"—মাতার স্নেহ ও করুণা তাঁহার আহ্বানে ফুটিয়া উঠিত। কুমুদ ভয়ে নালিশ করিতে পারিত না। মা সতীশকে ডাকিতেন "সতীশ"—

সতীশ তখন একটা প্রকাণ্ড বাঁশ টানিয়া আনিতেছে; উত্তর দিত—"এই যে, আমি"—

"তুই কুমুদকে কি বলিয়াছিস?"

চক্ষুর তারা কপালে তুলিয়া সতীশ নেহাৎ ভাল মানুষের মত বলিত—"কিছু—না"—

কুমুদ বলিত, "না? তুমি আমার বহি কাড়িয়া লও নাই?"

"কুমুদদা' অতগুলি বহি আনিতে পারিতেছিল না, তাই আমি আনিয়া ঘরে তক্তার উপর রাখিয়া দিয়াছি। বিশ্বাস না হয় তুমি দেখিয়া আইস, মা।"

কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে বহি দেখিতে চলিয়া যাইত। মঙ্গলা বলিতেন, "ছিঃ সতীশ, দাদার সঙ্গে এমন করিতে আছে?"

সতীশ বঙ্কিম দৃষ্টিতে একবার দাদার দিকে চাহিয়া বলিত, "কুমুদদা'র ও 'ভিজে ভিজে' ভাবটি আমি মোট্‌টেই দেখিতে পারি না।"—ততক্ষণে সে বাঁশটা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছে সে মা'কে বলিত "মা, শাবলটা দাও ত।" মাতা রওনা হইবার পূর্ব্বেই সতীশ ঘর হইতে শাবল বাহির করিয়া আনিয়া মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিত।

এমনই করিয়া মঙ্গলার স্নেহ ও দীননাথের মমতার মধ্যে এই বিভিন্ন প্রকৃতির বালকদিগের বাল্যকাল কাটিল।

(২)

প্রাজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, "চিরদিন কখনও সমান যায় না।" দীননাথের ব্যবসায় বুদ্ধির প্রাচুর্য্য অপেক্ষা সাধুতা ও সরলতার মাত্রাই বেশী ছিল সুতরাং তিনি যখন সামান্য স্কুলের মাষ্টারিটি ছাড়িয়া দিয়া কাঠের ব্যবসায়ের উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলেন তখন তাঁহার কিছুদিনের মধ্যেই একটা হাওলাতি ও কর্জ্জের হিসাববহি তৈয়ারি করিতে হইল। কলিকাতায় একটা বাসা ছিল, গ্রামস্থ পাঁচজন আত্মীয় যখন গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বা অন্য কোন ক্ষুদ্র কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইতেন তখন আর তাঁহাদের কলিকাতায় থাকিবার ও আহারের স্থানের কথা বড় একটা ভাবিতে হইত না—দীননাথের ক্ষুদ্র বাসাখানির মধ্যে কোনও প্রকারে সঙ্কুলান হইত, এবং আহার, সে-ও দীননাথের উপর দিয়াই চলিয়া যাইত! এই প্রকারে খরচের আধিক্য হেতু ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম যেটুকু উন্নতি দেখা গিয়াছিল, তাহাতে ক্রমেই ভাঁটা পড়িয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু আত্মীয়গণের গঙ্গাস্নানের বাধাও ছিল না; আর একালের আত্মীয়গণের ধর্ম্মই এরূপ নহে যে, সুযোগ পাইলেই আত্মীয়তা দেখাইয়া কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন।

সুতরাং ৮।৯ বৎসর পরে দেখা গেল, দীননাথের কাঠের ব্যবসায় এক প্রকার মাটী হইতে বসিয়াছে, আর হিসাবখাতায় হাওলাতি ও কর্জ্জ টাকার পরিমাণ এরূপ সংখ্যায় নামিয়াছে যে, দীননাথের আর যোগ দিতে সাহসই হইল না।

কুমুদ, সতীশ প্রভৃতি এখন একটু বড় হইয়াছে। কুমুদ বৃত্তি লইয়া এন্‌ট্রান্সও এফ্, এ পাশ করিয়াছেন, সতীশ দ্বিতীয় বিভাগে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া এফ, এ পড়িতেছে। বিপিন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে।—তবে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই আত্মীয়গণ মনে করেন। প্রফুল্ল তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু সে পড়াশুনায় তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বাঞ্চলে একটু সম্পত্তি ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলা বয়স্থা হওয়াতে সেটুকু বিক্রয় করিয়া দীননাথ প্রায় তিন হাজার টাকা পাইলেন; মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে যে অল্প কিছু টাকা ছিল, তাহা ব্যবসায়ের মূলধনের সহিত যোগ করিবেন বলিয়া কলিকাতায় সঙ্গে করিয়া আনিলেন। কিন্তু হাওলাতি টাকার কিছু শোধ করিতে ও কর্জ্জা টাকাগুলির দুইচারি মাসের সুদ দিয়া

ফেলিতেই সে টাকাগুলি ছিপিখোলা শিশির কর্পূরের মত উবিয়া গেল!

তখন এক দিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীস্ত্রীতে কলিকাতার ক্ষুদ্র বাড়ীটিতে একটি ছোট কক্ষে বসিয়া কথা হইল। অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ব্যবসায় ত আর চলেই না, কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইলেও প্রায় দেড় হাজার টাকার দরকার।

মঙ্গলার মাতার প্রদত্ত কিছু গহনা ছিল; তাহার মূল্যও জোর পাঁচ শত টাকা। মঙ্গলার নিজের যাহা ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তিনি স্বামীর হাতে সমর্পিত করিয়াছেন। মাতার শেষ চিহ্ন বলিয়া ঐ কয়খানি গহনা এত দিন হাত-ছাড়া করেন নাই।

আজিকার ম্লান সন্ধ্যালোকে স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া মঙ্গলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বের কক্ষে উঠিয়া গিয়া একটা ছোট সুদৃশ্য ক্যাসবাক্স বাহির করিয়া আনিলেন। স্বামীর পদতলে বাক্সটি রাখিয়া সাধ্বী নারী কহিলেন, "এগুলি ছাড়াইয়া দিয়া কত টাকা হইতে পারে দেখ—কতকটা দায় মুক্ত ত হও—তাহার পর নারায়ণের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

"মঙ্গলা, তোমার অনেক গহনা নষ্ট করিয়াছি—এ কয়খানি তোমার মাতার শেষ চিহ্ন"—

"তুমি গহনার টাকা দিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই বোধ হয় আমার মা'র আত্মা বেশী তৃপ্ত হইবে—তুমি আপত্তি করিও না। তোমার ম্লান মুখ দেখিয়াও আমি গহনা বাক্সে তুলিয়া রাখিব? ছিঃ—!"

দীননাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন—আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। জীবনে সকল পরীক্ষা ও বেদনায় এই মহীয়সী নারী তাঁহাকে কি সান্ত্বনাই দিয়া আসিতেছেন!

তাহার পর কুমুদের কথা উঠিল। কুমুদের কয়েকটা সম্বন্ধ উপস্থিত ছিল। দীননাথ কোনও দিনই পণগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু কুমুদকে যাহাই হউক একটা "স্থিতি" করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অনেক কষ্টে প্রাণপাত করিয়া যাহাকে 'মানুষ করিয়া' তুলিয়াছেন, তাহাকে একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছেন, বুঝিতে পারিলেও জীবনের শেষ দশায় কতকটা আরাম পাইবেন।

আর একটা কথা দীননাথের মনে জাগিত। দুর্দ্দিনে যদিও কুমুদ ও প্রফুল্লের কোনও আত্মীয়ের নামগন্ধও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কুমুদ যখন ঈশ্বরের কৃপায় "মানুষ" হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহার আত্মীয় ও পরামর্শদাতার অভাব হইবে না। এই সকল আত্মীয় যে তাহাকে সুপরামর্শই দিবেন এমন আশা করা যায় না। সতীশ অন্যায় সহ্য করিতে পারে না; বোধ হয় একটু উগ্রপ্রকৃতি। তবুও সে এখন সবল সুস্থ কিশোর। সে সাধু, সরল ও কার্য্যপটু; কিন্তু তাহার বাল্যের অস্থিরতা এখনও দূর হয় নাই। কুমুদ ও সতীশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। দীননাথ বুঝিতেন, ইহারা কোনও দিন মিলিয়া থাকিতে পারিবে না।

সুতরাং, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে চাহেন, যাহাতে ভবিষ্যতে কুমুদ ও সতীশের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত না হয়। কিন্তু এ কথা তিনি নিজেই চিন্তা করিতেন, মঙ্গলাকে কোনও দিন ভাঙ্গিয়া বলিতেন না। মঙ্গলা কুমুদ ও সতীশের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে, এটা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই সরলহৃদয়া রমণী ভবিষ্যৎ জীবনে নিজপুত্র সতীশের নিকট হইতে যতটা আশা করিতেন, কুমুদের নিকট হইতে তদপেক্ষা কম আশা করিতেন না।

মঙ্গলা কহিলেন, "বীরগ্রামের সম্বন্ধটাই স্থির কর না কেন? তাহারা ত নিজ হইতেই তিন হাজার টাকা ও পড়িবার খরচ দিতে চাহিয়াছে; একঘর জমীদার আমার কুমুদের সহায় হইবে, তাহারা কুমুদকে কত আদর যত্ন করিবে! আমার ত এই সম্বন্ধটাই বেশ মনে হয়।"

"আমিও তাহাই ভাবিতেছি—আমি বিশ্বেশ্বরের কাছে লিখিব। দেখি সে কি বলে।"

আমরা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কুমুদের পিতার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন—নাম বিশ্বেশ্বর। তিনি পোষ্টআফিসে সামান্য চাকরী করিতেন, এবং সস্ত্রীক চিরকাল বিদেশেই থাকিতেন। তিনি ইদানী কুমুদ ও প্রফুল্লের সম্বন্ধে খুব খবর লইতেন। তাঁহার যে যৎসামান্য আয় ছিল তদ্দ্বারা তিনি কোনও প্রকারে নিজের খরচ চালাইতেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে প্রতিপালন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্তও ছিল না আর বিশেষ তাঁহার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্ররা যে কালক্রমে মহারথী হইয়া উঠিতে পারে

এ কথা তিনি কোনও দিন স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই। ইদানীং তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাসায় আসিয়া দাদা দীননাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সংবাদ লইতেন।

দীননাথের কথার উত্তরে মঙ্গলা ভাল মন্দ কিছু কহিলেন না। তখন দীননাথ আবার বলিলেন, "আমি আর একটা কথা ভাবিতেছি, বীরগ্রামের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অগ্রিম এক হাজার টাকা লইয়া দেনা মিটাইয়া ফেলি; তাহার পর ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাই; ছেলে দুইটাকে ত আর ডুবাইতে পারি না। তাহার পর দুই এক বৎসরের মধ্যে নারায়ণ যদি সুবিধা দেন, কুমুদের এক হাজার টাকা শোধ করিব।—"

এই সময়ে দরজার কাছে একটা শব্দ শুনা গেল। কুমুদ বেড়াইয়া ফিরিয়াছে। স্নেহময়ী মঙ্গলা জুতার শব্দেই তাহা বুঝিলেন।

কুমুদ বলিল, "কাকাবাবু, সতীশ আজ ক্রীকেট খেলিতে যাইয়া একটা 'সাহেবের' ছেলেকে ভয়ানক মারিয়াছে—"

"সে কি—সর্ব্বনাশ—"

"'সাহেবের' ছেলে অন্যায় করিলে বুঝি আর তাহাকে মারা যায় না?"—সশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া সতীশ বলিল।

"তা তাহাকে মারিবার দরকার কি ছিল?"—শান্তভাবে কুমুদ উত্তর দিল।

"তোমার বাইবেল আমি শুনিতে চাহি না। তুমি যে সরিয়া পড়িলে তাহার কি?—Coward—"দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সতীশ বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

কুমুদের চক্ষু সেই সন্ধ্যার স্বচ্ছ অন্ধকারে একবার জ্বলিয়া উঠিল—সেটা শুধু নিরুপায়ের প্রতিহিংসার জ্বালা।

সতীশ চঞ্চল ও সরল, মুখে যাহা আসিত বলিয়া ফেলিত, আর পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া যাইত। সতীশ কি ভাবে কথা কহে কুমুদ তাহারই ব্যাখ্যা অন্ততঃ তিন দিন বসিয়া করিত। তাহার সব সময়েই মনে হইত, সতীশ তাহাকে আক্রমণ করিয়া কথা বলে, সেটা, শুধু সে যে সতীশের পিতার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে তাহাই মনে করিয়া।

(৩)

পরদিন কন্যা বিমলা আসিয়া মাতার কাছে কহিল, "মা, বাবা কাল কুমুদের বিবাহের টাকার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?"

মাতা বিস্মিতভাবে কহিলেন—"কেন বিমলা?"

"কুমুদ আমার কাছে আজ কত দুঃখ করিল। বলিল, 'কাকাবাবু আমাকে পর মনে করেন, আমার বিবাহের টাকা লইয়া তিনি দেনা শোধ করিবেন—আবার দুই এক বৎসর পরে তাহা শোধ করিবেন, কাকীমা'র কাছে কাল সন্ধ্যায় বলিতেছিলেন! সতীশ আর আমি—কি ভিন্ন?'"

এমন সময়ে দীননাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো, তোমাদের কি কথা হইতেছে?"—মঙ্গলা সকল কথা খুলিয়া কহিলেন;—"পাগল ছেলে আর কি?—কাল বুঝি ঘরে আসিবার সময় আমাদের কথা শুনিয়াছে!" দীননাথ একটু হাসিলেন। কয় দিনের মধ্যেই বীরগ্রামের সম্বন্ধ পাকাপাকি ভাবে স্থির হইয়া গেল।

দীননাথ হাজারএক টাকা লইয়া আসিলেন; এবং কুমুদের ইচ্ছানুসারে কুমুদের বি, এ, দিবার পর শুভ কার্য্য হইবে স্থির হইল।

কয়েক দিন পরে কলিকাতার ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া দীননাথ সপরিবারে বাড়ী আসিলেন। এই অগ্রিম টাকা লওয়ার কথা বিশ্বেশ্বরের নিকট অপ্রকাশ রহিল না। তিনি দুইএকজন আত্মীয়ের কাছে এমনও কহিলেন, "উহারা ছেলেমানুষ, উহাদের টাকাটা এমন করিয়া লওয়াটা ইত্যাদি"—তাহার পর আর নিকটতম বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট যাহা কহিলেন তাহা আমরা নিজকাণে শুনি নাই বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

দীননাথ অবশ্য কথাগুলি শুনিলেন, কথাগুলি একটু পল্লবিত হইয়াও আসিতে পারে। তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু টাকাটা তখনই শোধ করিয়া রাখিবার আর কোনও উপায় ছিল না।

তিনি উপযুক্ত সুদে একখানি খত লিখিয়া রাখিলেন; এক দিন সতীশ মঙ্গলা ও বিমলাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "সতীশ, কুমুদের হাজার টাকা লইয়াছি। যদি মরিয়া যাই; দেখিস্ আমি যেন ঋণমুক্ত হইতে পারি।"—দীননাথের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে সকলেরই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মঙ্গলা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ছিঃ এমন কথা বলিতে নাই।—আর কুমুদ কি তোমার পর? সেদিন বাছা তোমার কথা শুনিয়া কত দুঃখ করিয়াছে"—

"গিন্নি, সংসারকে আমিও অমনই ভাবিতাম। কালে তুমিও বুঝিতে পারিবে।"—দীননাথের এ কথার আর উত্তর করা চলে না।

সতীশ অস্থির—চঞ্চল; উত্তর করিল, "কেন আপনি ভাবিতেছেন, বাবা? আমরা দু'ভাই বাঁচিয়া থাকিতে আপনার এক হাজার টাকা ঋণের জন্য ভাবনা! আপনি সুস্থ থাকিয়া আমাদের আদেশ করুন, আমরা আপনার দুঃখ কষ্ট—ঘুচাইব।"

মঙ্গলা সতীশের মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বিপিন আসিয়া কহিল, "বাবা আমি Testএ প্রথম হইয়াছি।"

দীননাথের ও মঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিমলা ভাইটিকে কাছে টানিয়া আনিল।

(৪)

কলিকাতা হইতে ব্যবসা তুলিয়া দিয়া আসা হইতেই দীননাথের মুখে আর হাসি দেখা যায় নাই; চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছিল। এ দিকে ঋণের মাত্রাও বাড়িতেছিল। দীননাথের কেবলই মনে হইত, তাঁহার ছুটী ফুরাইয়াছে; শীঘ্রই হাজির হইবার ডাক পড়িবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে ছেলে দুইটিকে একটা পথে উঠাইয়া দিয়া যাইতে পারিলেন না, এই চিন্তাই তাঁহাকে বিশেষভাবে পীড়িত করিতে লাগিল।

সতীশ পিতার অসুস্থতার কারণ বুঝিল—সে কহিল, "বাবা, ছেলে বাপের ঋণ শোধ করে, আপনি কেন বিমর্ষ হইতেছেন? আপনি চিন্তা ছাড়ুন, আমরা ঋণ সব শোধ করিব। বাবা! আপনি ভাবিবেন না।"

"না—কই—কি আর ভাবি?"— অন্যমনস্কভাবে দীননাথ উত্তর করিলেন।

সতীশ কলিকাতায় চলিয়া গেল; বিপিন পূর্ব্বেই গ্রামের স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল—সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সতীশ টুইশনি করিয়া নিজের মেসের খরচ ইত্যাদি চালায়।

কুমুদ ও প্রফুল্ল ভিন্ন মেসে থেকে—কুমুদ বীরগ্রাম হইতে যে পড়ার খরচ পায় তাহাতেই দুই ভ্রাতার চলে।

সে দিন মাঘীপূর্ণিমা; জ্যোৎস্নায় আকাশপৃথিবী প্লাবিত। কয়দিন হইতেই

দীননাথের অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়াছে;—রাত্রি প্রায় ১২টার সময় মৃদুকণ্ঠে দীননাথ ডাকিলেন—"বিপিন"—তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন,—"আমার বুকের মধ্যে কেমন করিতেছে, উঠাও আমাকে"—মঙ্গলা কাছে আসিলেন, রোগী তখন চুপ করিয়া ঘরের চালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

বিপিন ডাকিল—"বাবা, বাবা,"—দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ডে গড়াইয়া আসিল! উত্তর দিবার শক্তি আর দীননাথের তখন ছিল না।

মঙ্গলার চীৎকার শুনিয়া জ্ঞাতিগণ দৌড়াইয়া আসিলেন—একটু পরেই তাঁহারা গতপ্রাণ দীননাথের দেহ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত উন্মুক্ত আকাশের তলে আনিয়া রক্ষা করিলেন।

(৫)

শুদ্ধিকার্য্যাদি সম্পাদনের পরামর্শ চাহিয়া সতীশ যখন কুমুদের কাছে পত্র লিখিল, তখন কুমুদ উত্তর দিল, "বহু জাঁক জমকের সহিত পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা হওয়াই পুত্র ও পুত্রপ্রতিমগণের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে শ্রাদ্ধ, সুতরাং তোমরা কতকগুলি কর্জ্জ করিয়া ইত্যাদি।"

সতীশ বিপিনের হাতে চিঠি দিয়া বলিল, "এই দেখ, কুমুদদাদার চিঠি The cat is out of the bag at last."—এই মার্জ্জিত ভাষায় লিখিত আন্তরিকতাশূন্য পত্রখানি পাইয়া সতীশ আন্তরিক চটিয়া গেল।

কোনরূপে শুদ্ধিকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। কুমুদ ও প্রফুল্ল কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছিল; বিশ্বেশ্বর ছুটী পাইল না বলিয়া আসিতে পারিল না।

বাড়ীর বন্দোবস্ত কি হইবে ও দুই ভ্রাতার পড়ার খরচ কেমন করিয়া চলিবে, এখন তাহাই বিষম সমস্যা হইল।

কুমুদ কহিল, "কাকিমা ও বিপিন বাড়ী থাকুন, আমি দেখি যদি মাসে গোটা পাঁচেক্ টাকা দিতে পারি।—বীরনগরে লিখিয়া দেখিব।"

সতীশ তখন কথা কহিল না; কুমুদ উঠিয়া যাইলে বিপিনকে ও মা'কে কহিল, "মা, তুমি এক বৎসরের জন্য মামারবাড়ী যাও, কুমুদদাদার শ্বশুর-বাড়ীর অনিশ্চিত পাঁচ টাকার অপেক্ষা মামার বাড়ী ঢের ভাল।—বিপিন, কালই তুই মা'কে লইয়া যা,—তাহার পর পরীক্ষা দিয়া যদি বৃত্তি পাস্, তখন দেখা যাইবে।"

অনেক বিতর্কের পর সতীশের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করাই স্থির হইল; কারণ, একে সতীশকে তর্কে আঁটিয়া উঠা যায় না, তাহার উপর এমন জোর দিয়া বেগের সঙ্গে সে তাহার কথাগুলি বলিয়া যায় যে, তাহার বিরুদ্ধে বলিবারও যেন কিছু থাকে না; বিশেষ সতীশের আত্মাভিমানে আঘাত করিয়া কথা বলিতে কেহ সাহস করিত না।

(৬)

প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল; বিপিন দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিল, এবং একটা দশ টাকার টুইশনি করিত, সতীশ এফ্, এ, পাশ করিয়া দুইটা টুইশনিতে পঁচিশ টাকা পাইত। এই টাকাতেই কোনও মতে দুই ভ্রাতার পড়ার খরচ চলিয়া যাইত এবং মাসে ইহার মধ্য হইতে চারি পাঁচ টাকা করিয়া মা'র হাত খরচের জন্য সতীশ পাঠাইয়া দিত।

ইতোমধ্যে বীরগ্রামের চৌধুরী বাড়াতে কুমুদের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর এবার ছুটী পাইলেন এবং বাড়ী আসিয়া তাহার মুরুব্বিয়ানায় সকলকেই সন্ত্রস্ত ও চমকিত করিয়া তুলিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "কথায় বলে গোবধের সময় খুড়া কর্ত্তা—আমারও হইয়াছে তাহাই; এই যে 'প্রাণপাত' করিতেছি, কুমুদ, প্রফুল্ল কি তা'হা বুঝিবে?"

কিন্তু বিশ্বেশ্বর যতই 'প্রাণপাত' করুন না কেন, কুমুদ তাঁহাকে কোনও কালেই ভাল দেখিত না। সতীশ বিবাহে বাড়ী আসিল না, বিপিন মা'কে লইয়া আসিল। কয়দিন থাকিয়াই আবার মঙ্গলা দেবী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার এত সাধের 'কুমুদের বৌ' বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতেই পারিল না। বিশ্বেশ্বরের স্ত্রীই যে একমাত্র বর্ত্তমানা 'দূর সম্পর্কীয়া' শ্বাশুড়ী, এ কথা বীরগ্রামের জমীদারদুহিতার বুঝিতে অধিক সময় লাগিল না।

আর কুমুদও ক্রমেই তাহার দু'দিনের আশ্রয়পরিবার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

গরিবের ছেলে ধনীর কন্যা বিবাহ করিয়াছে;—মেসের বাসায় সে যখন 'ছাপর খাটের' উপর নেটের মশারী টাঙ্গাইয়া শুইত, তখন সে কেবল ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিত। বীরগ্রামের বাসা হইতে শ্যালক নৃপেন্দ্র যখন কুমুদকে বেড়াইতে যাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডাকিতে আসিত, তখন সে সিঁড়ী দিয়া এমন সশব্দে নামিয়া যাইত যে, পার্শ্বের ঘরের নিরীহ পূর্ব্বাঞ্চলের ছেলেটি

ঘর বন্ধ থাকিলেও ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারিত ফিরিয়া আসিয়া বুকের কাছে ঝালরওয়ালা বালিশটা টানিয়া লইয়া ডায়েরীর পাতায় কুমুদ লিখিত, "Had a jolly drive with brother-in-law"—তাহার পর অসাবধানতা বশতঃ সেই খাটের উপর খাতাখানি খোলাই পড়িয়া থাকিত! পরদিন দুই একজন ছাত্র যখন কুমুদের ঘরে আসিত, তখনও খাতা ঠিক্ সেই ভাবেই পড়িয়া আছে! কেহ হয় ত বলিত, "কুমুদবাবু আপনি কি 'কাছা খোলা,' ডায়েরী খুলিয়া রাখেন!"

"তাই, নাকি"—ডায়েরী টানিয়া লইয়া কুমুদ কহিত—"তা' ইহাতে বেশী কিছু গোপনীয় কথা নাই; কাল যে নৃপেন বাবুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেইটাই লিখা রহিয়াছে। এই দেখুন না"—বলিয়া ডায়েরীর সেই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক স্থানটি দেখাইয়া দিত! যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ডায়েরীর পাতার সেই অত্যাবশ্যক স্থানটি দেখিবার জন্য তাহার দুয়ারে আসিয়া অনেকবার উকিঝুকি দিয়া কৌতুহল জানাইয়া গিয়াছে! তাহার পর বীর গ্রামের বাসার গল্প জমিয়া উঠিত।

(৭)

তবু কুমুদ ছেলে ভাল বলিয়া বি, এ, পাশ করিল; দুইতিনবার ডেপুটীগিরি চেষ্টার পর ওকালতীটা পাশ করিবার দিকেই তাহার ঝোঁক গেল।

ইতোমধ্যে বসিয়া থাকিয়া আর কি করিবে বলিয়া সে একটা মহকুমার স্কুলের হেডমাষ্টারী লইয়া গেল।

গ্রামের বাড়ীতে কুমুদের নিজের কোনও ঘর দুয়ার ছিল না। বীরগ্রাম হইতে কুমুদের শ্বশুর লিখিলেন, "বাড়ীতে একটা পাকা ঘর তৈয়ারী করিয়া লও। সুকেশীর বৃত্তির প্রায় আট নয় শত টাকা জমিয়াছে, আমরাও কিছু সাহায্য করিতেছি; আমি জীবিত থাকিতে কিছু না হইলে পরে উদ্যোগ হইবে না। পাকাঘর তুলিবার পূর্ব্বে বাড়ীটা ভাগ করিয়া লওয়া দরকার, এবং এমন ভাবে 'দালান' হইবে, তাহাতে আর কেহ ভবিষ্যতে অংশ দাবী করিতে না পারে—কারণ, সমস্ত কার্য্যই সুকেশীর টাকা হইতেই সম্পন্ন হইবে।"

শ্বশুরের পত্র পাইয়া কুমুদ নিতান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সতীশের কাছে বাড়ীটা ভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়া এক পত্র লিখিল। সে এমনও জানাইল, সতীশ যদি বাড়ী ভাগ করিতে স্বীকৃত না হয়, তাহাকে বাধ্য হইয়া বাড়ী বাটোয়ারা করাইতে হইবে।

সতীশ যথা সময়ে উত্তর দিল, 'আদালতে আর বাটোয়ারার মোকর্দ্দমা করিতে যাইবার দরকার হইবে না ; গ্রীষ্মের ছুটীতে উভয় পক্ষ বাড়ী থাকিয়া গ্রাম্য সালীশ দ্বারা বিভাগ করিলেই চলিবে।"

স্বর্গীয় কর্ত্তাদের আমলে বাড়ী ঠিক ভাগ হয় নাই ; পৃথগন্ন হইবার পর হইতে যে যাঁহার ঘরেই থাকিতেন ; সে হিসাবে ভিতর বাড়ীর চতুঃশালার পশ্চিম ও উত্তরের ঘর কুমুদের পিতার অধিকারেই ছিল। দীননাথ দক্ষিণ ও পূর্ব্বের ঘরেই নিজের কায চালাইতেন।

কুমুদের পিতামাতার মৃত্যুর পর সংস্কারের অভাবে পশ্চিম ও উত্তরের ঘর দুইখানি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে থাকে ; একবার ঝড়ে দুইখানি ঘরই ভূশায়ী হয় ; তখন দীননাথ কলিকাতায়। সে ঘর আর তুলা হয় নাই। দুইটা ভিটা পড়িয়া ছিল। দীননাথ কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আর্থিক অনাটনের জন্য আর ঘর তুলিতে পারেন নাই। কুমুদ 'মানুষ' হইয়া ইচ্ছা করিলে ঘর তুলিতে পারিবে, প্রতিবেশীরা ও কুমুদের আত্মীয়গণ তাহাই আশা করিতেন।

গ্রীষ্মের ছুটীতে সকলেই বাড়ী আসিল। বিশ্বেশ্বরের স্বাস্থ্যটা কিছুদিন হইতে কেমন কেমন হইয়াছিল, সুতরাং তিনিও এক মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলেন।

একদিন আহারাদির পর বাড়ী ভাগের কথা উঠিল। বিশ্বেশ্বর কহিলেন, "তা বাড়ী ভাগ ত আপনারাই করা যায়, ইহার জন্য আর সালিশেরই বা প্রয়োজন কি ? বাড়ী ত এক প্রকার ভাগই আছে।"

সতীশ কথা কহিল না।

কুমুদ কহিল, "আপনি কি ভাবে ভাগের কথা বলিতে চাহেন ?"

বিশ্বেশ্বর একবার কাশিলেন ; তাহার পর কুমুদের মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিলেন,—"ভিতর বাড়ীর চতুঃশালার চারিটি ভিটা, অর্দ্ধেক সতীশদের। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভিটা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই তাঁহারা লউন ; বাকী উত্তর ও পশ্চিম, তাহার যেটা আমাকে দিবে আমি লইতে প্রস্তুত আছি। বিশেষ তুমি যখন পাকা ঘর তুলিবে যেটা হয় তুমি পছন্দ করিয়া লও, আমার আপত্তি নাই।"

সতীশ বিস্মিত হইয়া উঠিল—কাকা বিশ্বেশ্বর আজ যে বড়ই উদার ! সে সহসা বলিয়া উঠিল,—"না—না এভাবে লম্বা ভাগ চলিতেছে না।"

সতীশ বহুবার মনে করিতেছিল যে, সব শুনিয়া পরে যে হয় উত্তর করিবে, কিন্তু এখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; তাহার অস্থির প্রকৃতি অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া বাধা দিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"তবে কি ভাবে ভাগ হইবে ?"—কপালে চক্ষু তুলিয়া, ভ্রূ একটু কুঞ্চিত করিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন। কুমুদ অসন্তোষের ভাব দেখাইতে লাগিল।

"আপনারা উচিত কথা বলিলেই আমার আর কোনও আপত্তি থাকিবে না"—সতীশ আস্তে আস্তে কহিল।

"অনুচিত কোন্‌টা হইল ? যেটা উচিত হইবে, তুমিই কেন বলিয়া ফেল না।"—কুমুদ একটু শ্লেষের সহিত কথাগুলি একনিশ্বাসে বলিয়া গেল।

সতীশ তাহার অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, তবুও কোন দিন কুমুদ তাহার সহিত বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তর্কে বা গায়ের জোরে পারিয়া উঠে নাই। এ জন্য সতীশের উপর তাহার একটা আন্তরিক রুদ্ধ আক্রোশ ছিল। সময়ে সময়ে শ্লেষের সহিত আঘাত দিয়া সে শোধ লইবার চেষ্টা করিত। আজিও সে তাহাই করিল ; সতীশ তাহা বুঝিয়াও কথাটা গায়ে মাখিল না ; বলিল, "কাকা ইচ্ছা করিলেই যাহা উচিত তাহা বলিতে পারেন।"

আমি যাহা বুঝি, বাপু, তাহাই বলিয়াছি,—আমার সাদা মনে কাদা নাই।"—বিশ্বেশ্বর একটু কুণ্ঠিত ভাবে কথা কয়টি বলিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিলেন।

"আপনি যাহা বলিলেন তাহাই কি উচিত হইবে ?"

"অতশত কেন ? তোমার মতলবটা ভাঙ্গিয়া বলিলেই ত হয়। তুমি যে একটা বাধা দিবে তাহা আমি জানি।" কুমুদ উত্তেজিত স্বরে কহিল।

একটু জোর দিয়া কথা বলিয়া সতীশকে সে যেন জানাইয়া দিতে চাহিল যে, পূর্ব্বের মত সতীশের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার মত অবস্থা এখন আর তাহার নাই।

"কিসের বাধা দিব কুমুদ দা' ?"—চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শান্ত স্বরে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

"এই যাহাতে বাড়ীটা ভাগ না হইতে পারে।"

"কি স্বার্থ আমার ?"—সতীশ কহিল।

"তাহা হইলে সহজে আর আমার 'পাকাবাড়ীটা' করা হইবে না।"

"তাহাতেই বা আমার লাভ কি ?"

"বাড়ীটা হইল না, সেইটাই লাভ,—নতুবা তুমি এত কথা তুলিতেছ ?"

কুমুদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সতীশ উত্তর করিল, "দীননাথ মিত্রের বংশে এত লাভ লোকসানের হিসাব কেহ কোনও দিন করে নাই।" ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গর্ব্বিত কণ্ঠে সতীশ কথাগুলি বলিয়া গেল।

কথাটা কুমুদ গায়ে টানিয়া লইল। তাহার মনে হইল, কুমুদ যে সতীশের পিতার নিকট আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়াছে, সতীশ তাহার উল্লেখ করিল।

"তাহা আমার বেশ জানা আছে। তোমাদের ঋণ আমার যথা সর্ব্বস্ব দিলেও শোধ হইবে না—কারণ, তোমরা লাভ লোকসানের হিসাবই রাখিতে জান না।"—কুমুদের এই কথাটার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ 'হুল' ছিল; সে 'হুলটা' সতীশের অন্তরে তীব্র ভাবে বিঁধিয়া গেল। শরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"কুমুদ দাদা, ভুল করিয়াছ। দীননাথ মিত্রের বংশ নিজের লাভ লোকসানের হিসাব রাখে না; কিন্তু পরের ঋণ পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত শোধ করে।"

বিশ্বেশ্বর ক্রমাগত তাহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতেছি; সতীশ বলিয়া যাইতেছিল।

"সে ঋণ না রাখিলেই হয়।"—ওষ্ঠ চাপিয়া অস্পষ্টস্বরে কুমুদ কহিল।

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—অবশ্য রাখিব না—কুমুদ দাদা, সবাই ত আর তোমার মত বিবাহ করিয়া বড় মানুষ হয় না বা আত্মসম্মান হারায় না।"—এবার সতীশ ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল; তাহার মুখে আরও কতকগুলি কথা আসিয়াছিল।—এমন সময়ে বিপিন তাহাকে টানিয়া মা'র কাছে লইয়া গেল।

(৮)

স্বামীর ঋণের কথা লইয়া ছেলেদের মধ্যে এতটা কাণ্ড হইয়া গেল, তাই মনে করিয়া মঙ্গলা দেবীর চক্ষুতে জল আসিতেছিল। বিপিন ও সতীশ যখন কাছে আসিল, তখন তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেল।

"শুনিলে, মা, তোমার কুমুদের কথা ? —অকৃতজ্ঞ, পথের"—

সতীশের অসংযত কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিপিন বাধা দিল; কহিল, "যাহাই হউক কুমুদ দাদার দোষ ক্ষমা করুন।"

"কেন কুমুদ দাদা কি চিরকালই নাবালক থাকিবে না কি?"

এদিকে সতীশের স্ত্রী ও বিপিনের স্ত্রী কি পরামর্শ করিতেছিল; সঙ্কেত করিয়া তাহারা মা'কে ডাকিল। একটু পরেই মা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার হাতে দুইটি ক্যাস বাক্স।

বিপিন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, মা?"

"আমার মায়েরা এই তাহাদের গহনা প্রভৃতি সব আমার কাছে দিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা তোমরা ঋণমুক্ত হও। —আমি কত বলিলাম, পাগলের মেয়েরা কোন কথাই শুনিবে না"—আবেগে মাতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আজ তাঁহার কলিকাতার বাসার সেই অতীত দিনের সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়িল; সে দিনও এমনই করিয়া তিনি তাঁহার সব অলঙ্কারগুলি স্বামীর হস্তে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

সতীশ কহিল, "তাহাই হউক, আগে পিতার ঋণমুক্ত হই।"

"আমি মেয়ে বলিয়া কি কিছুই করিব না?"—বিমলা একটি ছোট ছেলে কোলে করিয়া আসিয়া কহিল। তাহার হাতে একটা সবুজ ফিতা দিয়া বাঁধা একছড়া হার ও দুইগাছি অনন্ত; সেগুলি ছেলের হাতে দিয়া বিমলা কহিল, "দিয়া আয় তোর ছোট মামার কাছে।"

উপস্থিত সকলেরই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

এই দুঃখের করুণ প্রবাহের মধ্যেও কি যেন একটি নির্ম্মল তৃপ্তির আনন্দধারা ছিল।

পরদিন সালিশ আসিয়া অৰ্দ্ধেক করিয়া বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া গেলেন; সতীশ সকলকে লইয়া রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতায় চলিয়া গেল।

* * * *

ঠিক এক সপ্তাহ পরে একদিন বিশ্বেশ্বর ও কুমুদ আহারাদির পর বাহিরের ঘরে বসিয়া কয়লার অসম্ভব দরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন; বাহিরে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র তখনও অত্যন্ত প্রখর; ঘরের দাওয়ায় একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর শুইয়া হাঁপাইতেছিল!

এমন সময়ে ঝড়ের বেগে সতীশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে দেখিয়াই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

মোটা গায়ের চাদরটার ভিতর হইতে দুইটা তোড়া বাহির করিয়া সতীশ

কুমুদের সম্মুখে রাখিল,—তীব্র কণ্ঠে কহিল,—"কুমুদ দা' এই তোমার এক হাজার টাকা, আর শতকরা একটাকা হিসাবে এই তাহার চারি বৎসর তিন মাসের সুদ।—কাকা, আপনি সাক্ষী থাকিলেন, দীননাথ মিত্রের বংশ ঋণ পরিশোধ করিল।"—কেহ কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই আবার ঝড়ের বেগে সতীশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত কুমুদকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে ও বিশ্বম্ভরকে তাহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে দেখা গেল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

দ্বৈত প্রীতি।

প্রিয়ে!
তুমি গানের মতন মনোবিমোহন,
কবিতায় মত মধু;
তুমি প্রাণের মতন রাখিবার ধন,
বক্ষে আঁকড়ি বঁধু!

প্রিয়!
দীনা হীনা আমি, তব পদধূলি
করেছে সুষমাময়ী;
দয়া ক'রে তুমি যা'ই বল, আমি
দাসী বই কিছু নই!

সখি!
সেবায় নিরত, তুমি স্থিরব্রত—
যতনে বিরামহীন;
প্রেমে অবিচল, সরল-কোমল
আমারি প্রেমেতে লীন!

সখা!
তোমারি চরণে, জীবনে মরণে
নিবেদিত প্রাণমন;
পরশে তোমার কোটী অমরার
জাগে শোভা অগণন!

ওগো!
হৃদয় তোমার হউক্ উদার
বিষাদ ডুবিয়া যাক্;
সকল ভুবন উজলি' তোমার
প্রেমরবি ফুটে থাক্!

ওগো!
তোমার আশিসে মোর ডর কিসে?
ভালবেস, এই চাই;
স্বর্গ আমার ও পদযুগল
দিও সেথা চির ঠাঁই!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

অদৃষ্ট-চক্র।

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

কোন্ পথে?

—০—

কলিকাতায় আসিয়া যতীশচন্দ্র বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠে মন দেয় নাই। অমূল্যচরণের উৎসাহে আপনার সাহিত্যিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাতে সে মনে করিয়াছিল, বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠে সময় নষ্ট করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক। সে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশোলাভের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে অমূল্যচরণ তাহার পথিপ্রদর্শক। অমূল্যচরণ ক্রমেই যতীশচন্দ্রের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাসিক পত্রের ব্যয়ভারও যতীশচন্দ্রের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতেছিল। যতীশচন্দ্র জড়াইয়া পড়িতেছিল। এক প্রকার সর্প দৃষ্টির দ্বারা জীবকে আকৃষ্ট করিয়া শেষে তাহাকে গ্রাস করে। অমূল্যচরণ তেমনই সাহিত্যের দ্বারা যতীশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে কয় মাস কাটিয়া গেল। সম্মুখে দুর্গোৎসব। বাঙ্গালায় আবার নবীন আনন্দের ক্ষীণ প্রবাহ প্রবাহিত হইল—শীর্ণ—শুষ্ক তরুর রিক্ত শাখায় যেন পল্লব ও কুসুম দেখা দিল। যতীশচন্দ্র গৃহে গেল।

ধরণীধরের অভিপ্রায়মত তাঁহার জননী যতীশচন্দ্রের গৃহে আগমনের দুই দিন পূর্ব্বেই সরোজাকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়াছিলেন।

নৃজেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যতীশচন্দ্র একবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল—সেও কয় ঘণ্টার জন্য। কয় মাস পরে সরোজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সরোজা মধ্যে মধ্যে স্বামীর পত্র পাইত। সেসকল পত্রের কবিত্বের উচ্ছ্বাস সে সম্যক বুঝিতে না পারিলেও—সেই সকলকে ভিত্তি করিয়া তাহার নবোন্মেষিত হৃদয় আশার বিরাট প্রাসাদ রচিত করিয়াছিল। সে স্বামীকে সর্ব্বগুণাধার কল্পনা করিয়াছিল; আশা করিয়াছিল, তাঁহার অবারিত আদরে,

অনাবিল ভালবাসায় তাহার জীবন কুসুমময় হইবে। এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া সে স্বামীসন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তাহার কল্পিত নন্দনে কুসুমসুষমার অভাব অনুভূত হইল। বাস্তবিক অমূল্যচরণের সহিত আলাপে যতীশচন্দ্র পত্নীর যে আদর্শ কল্পনা করিয়াছিল, তাহা স্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিতা যুবতীর আদর্শ। সে আদর্শ প্রথমস্বামীসন্দর্শনব্রীড়াসঙ্কুচিতা বালিকায় বিকশিত হইতে পারে না। চঞ্চলচিত্ত যতীশচন্দ্র তাহা বুঝিল না। সে পত্নীর ব্যবহারে হতাশ হইল—বিরক্তি বোধ করিল। তাহার ব্যবহারে সে বিরক্তি গোপন রহিল না। তাই সরোজার আশাও মিটিল না সে ব্যথিতা হইল, ফুটিবার পূর্ব্বেই করকাঘাতে কুসুমকোরক সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

যে দিন যতীশচন্দ্র গৃহে আসিয়াছিল—তাহার দুই দিন পরে তাহার কয়জন সাহিত্যিক বন্ধুর তাহার গৃহে আসিয়া আহার করিবার কথা ছিল। নির্দ্ধারিত দিবসে কয়জন বন্ধু মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অমূল্যচরণ অন্য নিমন্ত্রণের জন্য অপরাহ্নের পূর্ব্বে আসিতে পারিল না। সে যখন আসিল তখন সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নহে—তাহার মদ্যের নেশা তখনও কাটে নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া যতীশচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িল।

গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে বন্ধুরা "বৌ" দেখিতে চাহিল। যতীশচন্দ্রের পিতামহী পরম যত্নে বধূর প্রসাধন সম্পন্ন করিলেন। এমন সময়ে সরোজার সহিত তাহার পিত্রালয় হইতে আগতা দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—আগন্তুকদিগের মধ্যে এক জন "মাতাল"। মদমত্তকে সরোজা বড় ভয় করিত। দাসীর কথা শুনিয়া সে কিছুতেই আগন্তুকদিগের সম্মুখে যাইতে সম্মতা হইল না। এ দিকে তাহার গমনে বিলম্ব দেখিয়া যতীশচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিল এবং পিতামহীর নিকট সব কথা শুনিয়া সরোজাকে তিরস্কার করিল। বিনা দোষে স্বামী কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া সরোজা অত্যন্ত ব্যথিতা হইল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পিতামহী সরোজাকে যাইবার জন্য বলিতেছেন—সরোজা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে—যতীশচন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে, দাসী নির্ব্বাক হইয়া একবার পিতামহীর দিকে—একবার যতীশচন্দ্রের দিকে চাহিতেছে এমন সময়ে কক্ষদ্বার হইতে জননীকে ডাকিয়া ধরণীধর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যতীশচন্দ্র পিতাকে প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। ধরণীধর

জননীর পদধূলি লইয়া সরোজাকে বলিলেন, —"এই যে, আমার আর এক মা!" সরোজা শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন পশ্চিমের মুক্ত বাতায়নপথে দিবালোক কক্ষ প্লাবিত করিয়াছে। ধরণীধর সরোজাকে বলিলেন, "মা, কাঁদিতেছ কেন? এই যে তোমার গৃহ। বাপের বাড়ী ত পরের ঘর। মন কেমন করিতেছে বুঝি? তাহাতে কি, মা, আমি একদিন সঙ্গে করিয়া তোমাকে ইচ্ছাপুরে লইয়া যাইব।" তাহার পর তিনি জননীকে বলিলেন, "মা'কে এত গহনা পরাইয়া সাজাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছ কেন?"

ধরণীধরের জননী বলিলেন, "যতীশের বন্ধুরা 'বৌ' দেখিতে চাহিতেছে।"

ধরণীধর সরোজাকে বলিলেন, "চল, মা, আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি।"

দাসী বলিল, "বাবুদের মধ্যে একজন মাতাল। দিদিমণির মাতালকে বড় ভয়, তাই যাইতে চাহিতেছেন না।"

ধরণীধর চমকিয়া উঠিলেন; সরোজাকে বলিলেন, "মা, তোমাকে যাইতে হইবে না।"

তাহার পর প্রলয়ঝঞ্ঝার মত প্রবল বেগে তিনি বৈঠকখানায় আসিলেন।

যতীশচন্দ্রের বন্ধুরা তখন গমনোদ্যোগ করিতেছে। ধরণীধর তথায় আসিলেন—অমূল্যচরণকে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার সর্ব্বশরীরে বিষজ্বালা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া যতীশচন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, ধরণীধর দালানে পাদচারণ করিতেছেন। পুত্রকে দেখিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার অতিথিদিগের মধ্যে একজন মত্ত অবস্থায় বন্ধুগৃহে আসিতে লজ্জা বোধ করেন নাই!" যতীশ কোন কথা কহিল না।

ধরণীধর পুনরায় বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছ। কিন্তু যে শিক্ষা শিক্ষিতকে সঙ্গিনির্ব্বাচনে সমর্থ করে না, সে শিক্ষা কিরূপ? যে গৃহে তোমার পিতামহীর ও পত্নীর বাস, যে গৃহ তোমার জননীর স্মৃতিপূত সে গৃহকে যদি দেবমন্দিরের মত পবিত্র মনে করিতে না পার—সে গৃহ যদি কলঙ্কিত হইতে দাও তবে তোমার মত দুর্ভাগ্য আর কাহারও থাকিবে না।"

যতীশ চলিয়া গেল। সে দিন পিতাপুত্রে আর কোন কথা হইল না। কিন্তু যতীশচন্দ্র পিতার বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

অমূল্যচরণের অবস্থায় যতীশচন্দ্র লজ্জিত হইয়াছিল। পিতার তিরস্কারে তাহার সে ভাব দূর হইল; সে অমূল্যচরণের ব্যবহারের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিল, সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকে মদ্য পান করিয়াছেন—তাহাতে কি তাঁহাদের প্রতিভার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? তবে অমূল্যচরণ কিসে নিন্দার্হ?

যতীশচন্দ্র পিতামহীর নিকট শুনিল, অমূল্যচরণের মত্ততার কথা দাসী ধরণীধরকে বলিয়া দিয়াছিল। সে পিতামহীকে বলিল, "ঝির থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহাকে বিদায় করিয়া দাও।"

পৌত্রের কথায় পিতামহী বিপন্না হইলেন। যাহারা কলিকাতার 'মেসের' ঝি দেখিয়া দাসীর আদর্শ স্থির করিয়াছে তাহারা সেকালের সর্ব্বত্র এবং অল্পদিন পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামের দাসীর স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না। পল্লীর পরিচিত দরিদ্র পরিবারের অসহায়া বিধবা দাসীরূপে অন্য পরিবারভুক্তা হইত। সে সেই পরিবারেরই হইয়া যাইত। সে পরিবারে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিত। সে গৃহিনীর ভগিনীস্থানীয়া, বধূদিগের ননন্দার মত, বালকবালিকারা তাহাকে পর বলিয়া জানিত না। এরূপ দাসীকে বিদায় করিয়া দেওয়া কুটুম্বের অপমান করা। তাই পিতামহী কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যতীশচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে বলিল, "ঝিকে বিদায় করিয়া দাও। না হইলে আমি কল্যই কলিকাতায় চলিয়া যাইব।"

কর্ত্তব্য স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া ধরণীধরের জননী পরদিন পুত্রকে এ কথা বলিলেন। শুনিয়া ধরণীধর বলিলেন, "মা, যতদিন তুমি জীবিত আছ তত দিন সংসারের ব্যবস্থায় আমার—আর যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন তাহাতে যতীশের কথা কহিবার অধিকার নাই। দাসীর কি অপরাধ যে, তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া কুটুম্বের সহিত বিবাদ বাধাইব? ভাবিয়াছিলাম, শিক্ষায় ছেলের বুদ্ধি পরিপক্ক হইবে—এখন দেখিতেছি, আমার অদৃষ্টে সবই বিপরীত হইতেছে।"

কলিকাতায় নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া যতীশচন্দ্র সেই দিন কলিকাতায় গেল। পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত ধরণীধরের মনে হইতে লাগিল, যেন দারুণ ভারে তাঁহার বক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

পুত্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে ধরণীধর তাহাকে বলিলেন, "আমার কর্ম্ম হইতে

বিদায় লইবার তিন মাস মাত্র বিলম্ব আছে। মনে করিয়াছি, বিদায় লইয়া কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিব। তোমাকে সে সকল দেখিতে হইবে। কাযেই তোমার আর পরীক্ষা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তুমি কখনও কলিকাতা ব্যতীত কোথাও যাও নাই। মা'র তুমি 'সর্ব্বতীর্থ' হইয়া আছ। এবার তোমরা আমার সঙ্গে চল। মা'কে তীর্থ দেখাইয়া একটু বেড়াইয়া একেবারে গৃহে আসিব। জীবনের শেষ কয় দিন এই গঙ্গাতীরে গৃহে কাটাইব; আর কোথাও যাইব না। বিশেষ যে এত কাল বিদেশে সে বৃদ্ধ বয়সে সংসারের মায়ায় জড়াইয়া পড়িলে আর নড়িতে পারিবে না।"

ধরণীধর যখন পুত্রকে এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মানস-পটে পুত্রপুত্রবধূপৌত্রপৌত্রীপরিশোভিত সুখময় সংসারের কল্পিত চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দিনান্তগগনের মত তাঁহার জীবনের অন্তভাগ বিচিত্র সৌন্দর্য্যসুখময় হইবে। কিন্তু যতীশচন্দ্র যখন উত্তর করিল, "আমি পরীক্ষা দিব। আপনি বরং ঠাকুরমা'কে একবার তীর্থ দেখাইয়া আনুন।" তখন সেই সমুজ্জ্বল চিত্র সহসা মসিমলিন হইয়া গেল—যেন অতর্কিত জলদোদয়ে দিনান্তগগনশোভা বিলুপ্ত হইল। ধরণীধর আর কোন কথা কহিলেন না।

ধরণীধর পুত্রের শিক্ষার জন্য একজন অঙ্ক-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং প্রতি মাসে শিক্ষকের বেতন নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক অর্থও পাঠাইতেন। একাদশীর দিন যতীশ বলিল, শিক্ষক তাহাকে পূজার পরই কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছেন। সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সেই দিন মধ্যাহ্নের পর সরোজাকে সঙ্গে লইয়া ধরণীধর ইচ্ছাপুর যাত্রা করিলেন।

ধরণীধর বৈবাহিককে সকল কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "যতীশ কুসঙ্গে মিশিয়াছে। আমি তিন মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে কিছু দিনের জন্য পশ্চিমে লইয়া যাইব। তাহার পর যতীশকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব। তখন এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। যত দিন আমি না ফিরিয়া আসি, বধূমাতাকে আমার গৃহে পাঠাইবেন না।"

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ধরণীধর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ভাবিতে ভাবিতে এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, কখন দিবাবসানে

নিশার অন্ধকার ধরণী আবৃত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সায়ংসন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—তাঁহার সে জ্ঞান নাই। নৌকা গ্রামের ঘাটে আসিলে মাঝির কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি নৌকায় সন্ধ্যাসমাপন করিয়া গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

সে রাত্রিতে তাঁহার নয়ন নিদ্রামুদিত হইল না। পরদিন ধরণীধর কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, কবে চাকরীর অবশিষ্ট তিন মাস শেষ হইবে? তিন মাস এত দীর্ঘ কাল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ধরণীধর কর্ম্মস্থানে আসিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই; কেবল দুশ্চিন্তা—কেবল আশঙ্কা—কেবল বেদনা। তিনি সুদীর্ঘ জীবন কঠোর আত্মত্যাগে অতিবাহিত করিয়া যে আশার স্বপ্নে সুখী ছিলেন—সে আশা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি সংসার-মরুভূমিতে যে রম্য উপবন রচনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার রচনার সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি যে উদ্দেশ্যে জীবন বহন করিতেছিলেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এখন তাঁহার জীবন উদ্দেশ্যহীন—আশাশূন্য—বেদনামাত্র।

পক্ষকাল বিবেচনার পর তিনি পুত্রকে পত্র লিখিলেন। সে পত্রে তিনি লিখিলেন, "তুমি ব্যতীত আমার স্নেহের অন্য অবলম্বন নাই, আমার আর কেহ নাই। যাহাতে দারিদ্র্যের অনলে তোমাকে মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতে না হয়, যাহাতে দারিদ্র্যদুঃখে তোমাকে পারিবারিক সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইতে না হয় সেই জন্য আমি সমস্ত জীবন বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি ও সেই অর্থ সঞ্চিত করিয়াছি। আমি যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে তোমার কখনও অভাব হইবার কথা নহে। আমি সে অর্থে ভূমি-সম্পত্তি ক্রয় করিব। তোমাকে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। এ অবস্থায় তোমার পক্ষে তোমার অপ্রিয় পাঠে কালক্ষেপ করা অনাবশ্যক। আমার অবসর গ্রহণের আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি মা'কে ও বধূমাতাকে লইয়া আমার নিকট আসিবে।" তিনি লিখিলেন, "আশা করি, আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিবে।"

যতীশচন্দ্র পত্রখানি অমূল্যচরণকে দেখাইল। সে স্বজনগণের নিকট হইতে যত দূরে যাইতেছিল অমূল্যচরণকে সে ততই আপনার বলিয়া মনে করিতেছিল। অমূল্যচরণ তাহাকে বুঝাইল, তাহার পিতা যাহাই বলুন না কেন তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবেন ; না করিয়া পারিবেন না। পত্র পাঠ করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং ভয় পাইবার কারণ নাই। ধরণীধরের চরিত্রের দৃঢ়তার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অমূল্যচরণের ছিল না। অমূল্যচরণের উপদেশে যতীশ পিতাকে লিখিল, তাহার পরীক্ষার অধিক বিলম্ব নাই ; এ অবস্থায় দেশভ্রমণে যাইলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বিঘ্নবহুল হইবে। তিনি তাহাকে শিখাইয়াছেন, স্বাবলম্বনের তুল্য গুণ আর নাই। সে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বেচ্ছায় স্বাবলম্বন পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।

কেবল ইহাই নহে, সে কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া সরোজাকে আনিবার উদ্যোগ করিল। অমূল্যচরণ মাসিক পত্রের ব্যয়ভার তাহার স্কন্ধে দিয়া তাহাকে ঋণজালে জড়িত করিতেছিল। ঋণ পাওয়া যায় দেখিয়া তাহারও সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই সে আনিবার দিন স্থির করিয়া সরোজাকে পত্র লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ইচ্ছাপুরে উপনীত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শোকে কাতর ছিলেন। তাহার উপর যতীশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব-সম্বন্ধে কোন কথাই ধরণীধর তাঁহার নিকট গোপন করেন নাই। তাহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখন যতীশচন্দ্রের এই প্রস্তাবে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণও একাধিক—সরোজার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীদিগের সহিত বন্ধুত্বে তাঁহার চিন্তার আরও কারণ ছিল। বিধবা দুহিতাকে গৃহে আনিয়া তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, গৃহ যাহাতে শান্তির ও সংযমের পূত মন্দিরে পরিণত হয় তাহারই চেষ্টা করিবেন। সে মন্দিরে উচ্ছৃঙ্খলের প্রবেশাধিকার নাই। যতীশ যখন তাঁহাকে আপনার অভিপ্রায় জানাইল, তখন তিনি বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়ের অনুমতি ব্যতীত আমি সরোজাকে পাঠাইব না। তোমার উপার্জ্জনের ক্ষমতা কি যে, তুমি কলিকাতায় বাসা করিয়া স্ত্রীকে লইয়া যাইবে? অভিভাবকশূন্য অবস্থায় সরোজা কলিকাতায় কিরূপে থাকিবে?" যতীশ বলিল, "আমি সে সব বিবেচনা করিয়াছি। আমি বাসা করিয়াছি।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি

পাগল হইতে পার—আমি পাগল নাহি। তুমি মদ্যপানমত্ত বন্ধুর সম্মুখে পত্নীকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলে, ইহাই তোমার বিবেচনার ফল!"

যতীশ চলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধরণীধরকে সকল কথা লিখিয়া জানাইলেন।

এদিকে ধরণীধর পুত্রের পত্র পাইলেন; বৈবাহিকের পত্রও পাইলেন। সাত দিন তিনি কোন পত্রের উত্তর দিলেন না—দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত রহিলেন। তাহার পর তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইল। তিনি বৈবাহিকের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন। তিনি পুত্রকে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে লিখিলেন, "দেখিতেছি, স্বাবলম্বনের নামে তুমি স্বেচ্ছাচারের উদ্যোগ করিতেছ। স্বাবলম্বন গুরুজনের অবমাননার নামান্তর নহে; তাহা আত্মম্ভরিতায় আত্মপ্রকাশ করে না। তুমি যে সমাজে ও যে পরিবারে জন্মিয়াছ সে সমাজে ও সে পরিবারে গুরুজনের আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। তোমার শুভাশুভ তুমি বুঝ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমারও তোমার শুভকামনা ব্যতীত অন্য কামনা নাই। আমার সাংসারিক অভিজ্ঞতায় তোমার উপকার হইতে পারে। আমি তোমাকে যে আদেশ করিয়াছি, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি। তুমি কলিকাতার কুসঙ্গিসমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে। শুনিলাম, তুমি কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিতে চাহিয়াছ। এ ব্যবস্থা কেন? যাহা হউক, তুমি পত্র পাঠমাত্র গৃহে যাইবে এবং মা'কে ও বধূমাতাকে লইয়া আমার নিকট আসিবে। ইহাই আমার অভিপ্রেত। যদি তুমি আমার নির্দ্দেশমত কায না কর তবে স্বাবলম্বন অবলম্বন করিয়া তোমার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে পার। আমার কোন দায়ীত্ব থাকিবে না।"

পিতৃহৃদয়ের দারুণ বেদনা এই পত্রের ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু যতীশচন্দ্র এই পত্র পাইয়া পিতার অভিপ্রায়-মত কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইল। অমূল্যচরণের উৎসাহ-ইন্ধনে তাহার এই সঙ্কল্পবহ্নি পুষ্ট হইল। যতীশচন্দ্র বুঝিল না, সেই বহ্নির শত শিখা তাহারই সর্ব্বনাশ করিতেছিল।

যথাকালে ধরণীধর কার্য্যত্যাগ করিলেন। তিনি এত দিন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন ও এত মনোযোগের সহিত কায করিতেন যে, কার্য্যত্যাগ করিয়া তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার আর কোন বন্ধন নাই। তিনি যে

বন্ধনের আশায় এ বন্ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন সে বন্ধনলাভ তাঁহার ভাগ্যে আছে কি ?

তিনি গৃহে অসিলেন। যতীশ সে সংবাদ পাইল ; কিন্তু গৃহে আসিল না।

কয়দিন অপেক্ষা করিয়া তিনি ইচ্ছাপুরে গমন করিলেন। তিনি বৈবাহিককে সকল কথা বলিলেন ; বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে সুখভোগ নাই, আমি সুখ লাভের চেষ্টা করিলে কি হইবে ? আশা করিয়াছিলাম, সুদীর্ঘ কাল গৃহত্যাগী অবস্থায় দাসত্বে কাটাইয়া জীবনের শেষ কয়দিন পারিবারিক সুখে অতিবাহিত করিয়া গঙ্গার তীরে অনন্ত শান্তিভোগ করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আমি আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বধূমাতার দুঃখে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। কিন্তু যাহাতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।" ধরণীধর পাঁচ হাজার টাকার 'কোম্পানীর কাগজ' সরোজার নামে লিখিয়া আনিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহা দিলেন। তাহার পর তিনি বিদায় লইলেন। সরোজা শ্বশুরকে প্রণাম করিলে ধরণীধর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা আমার, চিরসুখী হও।" তিনি একটি বাক্স আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পত্নীর অলঙ্কার ছিল। বাক্সটি সরোজাকে দিয়া তিনি বলিলেন, "মা, এইগুলি তোমার শাশুড়ীর অলঙ্কার। এগুলি তুমি ব্যবহার করিও। আমি এতদিন তোমার জন্য এগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছি।"

পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় ধরণীধরের অভ্যস্ত স্থৈর্য্য বিচলিত হইল—তাঁহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া ধরণীধর জননীকে বলিলেন, "মা, যতীশ আমার কথা শুনে নাই। আমি কিছু দিনের জন্য কাশীতে যাইব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

তিনি শিশুকাল হইতে যে পৌত্রকে "মানুষ" করিয়াছেন—যে তাঁহার সর্ব্বস্ব, ধরণীধরের জননী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মতা হইলেন না। হায় স্নেহ ! তুমি মানুষকে এমন বন্ধনে বদ্ধ কর যে, সে তাহা ছিন্ন করিতে পারে না। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন—যতীশ "ছেলে মানুষ"—তাহার উপর কি রাগ করিতে আছে ? তিনি তাহাকে আর বাড়ী হইতে যাইতে দিবেন না ; ইত্যাদি। জননীর ব্যয়নির্ব্বাহের কি উপায় করিবেন

ধরণীধর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, গ্রামে কোন ভদ্রলোক তাঁহার গাঁতি জমার মালেকান স্বত্ব বিক্রয় করিতেছেন। সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় এক সহস্র টাকা। "ঠাকুরদাদা" হরিনাথ ভট্টচার্য্যকে মধ্যে রাখিয়া ধরণীধর সব কথা পাকা করিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া উহার আয় জননীর জীবনস্বত্ব করিয়া দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নগদ টাকা বা 'কোম্পানীর কাগজ' দিলে যতীশ তাহা অধিকার করিবে এবং তাঁহার জননী বঞ্চিতা হইবেন।

এই ব্যবস্থা করিয়া ধরণীধর যাত্রার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার দিন আসিল। রাত্রিতে আহারের পর যাত্রা করিতে হইবে। জননী সে দিনও পুত্রকে গমনে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। পুত্র বিচলিত হইলেন না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশী হইতে কবে ফিরিবি?" ধরণীধর বলিলেন, "স্থির নাই।" তিনি মনে মনে ভাবিলেন, হয় ত আর ফিরিবার সুযোগ হইবে না।

যাত্রাকালে ধরণীধর মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন—জননীর পদধূলি লইলেন। আজ তিনি হয় ত চিরবিদায় লইতেছেন। বর্ষান্তে যে মাতৃচরণ দর্শনের জন্য তিনি সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া গৃহে আসিতেন হয় ত তাঁহার ভাগ্যে আর সে মাতৃচরণদর্শন ঘটিবে না। ধরণীধরের হৃদয় বিষাদভারাক্রান্ত হইল।

বাহিরে আসিয়া ধরণীধর একবার গৃহের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। এই গৃহ তাঁহার শৈশবের স্মৃতিজড়িত—যৌবনের স্বপ্নক্ষেত্র—বার্দ্ধক্যের আশাকেন্দ্র। এই গৃহ তাঁহার পরলোকগত পত্নীর স্মৃতিপূত—এই গৃহ তাঁহার নিকট দেবালয়ের নিকট পবিত্র। নিষ্কলঙ্ক জীবনে তিনি পত্নীর যে পূত প্রেম লাভ করিয়াছিলেন—যে প্রেম অল্পকালস্থায়ী হইলেও তাঁহার নিকট কালজয়ী—যে প্রেমের স্মৃতি তাঁহার জীবনের সুখ ও সান্ত্বনা সে প্রেম এই গৃহে বিকশিত হইয়াছিল—এই গৃহ সেই প্রেমাস্পদের বাসভূমি। আর তিনি আশা করিয়াছিলেন—যাহাতে অর্থের অভাবে পুত্রকে পারিবারিক সুখভোগে বঞ্চিত হইতে না হয় তাহার উপায় করিয়া তিনি জীবনের সায়াহ্নে এই গৃহে পুত্রপুত্রবধূপৌত্রপৌত্রীপরিবেষ্টিত হইয়া অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখ ভোগ করিবেন। আজ তিনি সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—হৃদয়ে নিরাশাবেদনা বহিয়া—উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিতে যাইতেছেন।

ধরণীধরের দীর্ঘশ্বাস নৈশপবনে মিশাইয়া গেল। বিদায় কবে সুখের হয়?

ধরণীধর যাইয়া নৌকায় আরোহন করিলেন। উপরে আকাশ মেঘ-মুক্ত—নক্ষত্রখচিত। নিম্নে জাহ্নবীর কলকল্লোলিত প্রবাহ—প্রবাহের অন্ধকার অঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জ্বলিতেছে। কূলে বৃক্ষ-লতার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে খদ্যোতের বিলয়ভূয়িষ্ঠ আলোক জ্বলিতেছে—নিবি-তেছে। নৈশবায়ুর স্পর্শ শীতল। নৈশপবনে কেবল ঝিল্লির ধ্বনি—কেবল দূরাগত নিশাচর প্রাণীর রব।

নৌকা ছাড়িয়া দিল। ধরণীধর ভাবিতে লাগিলেন—এতদিন পরে আজ তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রার যাত্রী। রজনীর নিস্তব্ধতা চিন্তাশীলকে বিক্ষিপ্ত চিন্তা একত্রিত করিতে সহায়তা করে। এই নিস্তব্ধতা চিন্তার—সাধনার বিশেষ উপযোগী। আজ নৈশ নিস্তব্ধতায় বিনিদ্র ধরণীধর অতীত—বর্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালের কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনায় কেবল বেদনা।

সন্ধ্যা।

শূন্যপথ বাহি', ধূসর-বাসাবৃতা
সন্ধ্যা ধরাতলে নামিল;
থামিল কলরব, শান্ত নীরবতা
সুধীরে ধরণীরে ঘেরিল।
শেষ-আলোকটুকু আঁধারে ধীরে ধীরে
নিমেষমাঝে গেল মিলা'য়ে।
সায়াহ্নে জীবনের যেমন ধীরে ধীরে
মৃত্যু আসে ধীরে ঘনায়ে!
মুখর কোলাহল মুহূর্ত্তে থেমে' যায়!
মূক সে স্তব্ধতা রাজে, গো!
জীবন-আলোটুকু মিলা'য়ে যায় মরি!
মরণ-তমোরাশি মাঝে, গো!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

জীবনের নব-জীবন লাভ।

বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে মানকর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে এক সময়ে জীবন নামা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পোষ্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, অথচ তাঁহার এমন কোন উপায় বা অবলম্বন ছিল না, যদ্দ্বারা তাহাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আপনার দুরবস্থা নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। অবশেষে—ক্লেশ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি বিবেকী হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন এবং অর্থ প্রাপ্তির কামনায় কাশীধামে যাইয়া শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু বর্ষ ব্যাপিয়া মহাদেবের তপস্যা করিলেন। ব্রাহ্মণের কঠোর তপে দেবাদিদেব প্রসন্ন হইলেন এবং একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন—

"বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম,
সাধুর নিকটে গিয়া পুরিবেক কাম।
বহু ধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা,
লোকেতে দুর্লভ যাহা সর্ব্বদুঃখ হন্তা।" (ভক্তমাল গ্রন্থ।)

মানুষ যাহা চাহে—ভগবানের নিকটে একমনে ব্যাকুল ভাবে যে দ্রব্যের আকাঙ্খা করে, নিতান্ত অপকারী বা ভববন্ধনের হেতুভূত হইলেও, ভগবান তাহা তাহাকে দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে তাহার অপকার না হইয়া উপকার হইয়া থাকে। কৃপাময় ভগবান সেই দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এমন আর একটি পদার্থ প্রদান করেন যাহাতে তাহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয়—ভালমন্দ, হিতাহিত বুঝিবার শক্তি জন্মে; সে সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সৎপথের পথিক হয়, আর অচির-কালমধ্যেই পবিত্র-চরিত্র সাধুরূপে জগতে বরণীয় হইয়া উঠে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শিব নশ্বর ধনের অভিলাষী ব্রাহ্মণকে নিত্য ধনের অধিকারী করিয়া দিলেন। তিনি প্রকারান্তরে জীবনকে জানাই-লেন,—'তুমি বৃন্দাবনে গোস্বামীর নিকটে গমন করিলে যে ধন পাইবে, তাহা অপার্থিব পরম ধন। সে ধনে তোমার সমস্ত দারিদ্র্য—পাপ তাপ

দূরীভূত হইবে। তুমি মুক্তিলাভ করিবে। আর ইহার পর কোনও লোকেই তোমাকে ক্লেশ পাইতে হইবে না। ভগবান যখন প্রসন্ন হয়েন, তখন এই-রূপই হইয়া থাকে, যথা ভক্তমালে—

"বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখিজনে,
গুগ্‌লি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে।"

ব্রাহ্মণ সাংসারিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য, গুগ্‌লিরূপ তুচ্ছ বিত্তের প্রার্থনা করিয়া ত্রিজগতের সার রত্ন—পরমার্থ ধন প্রাপ্তির বর পাইলেন। কিন্তু দারিদ্র্যদুঃখনিপীড়িত জীবন তাহা বুঝিলেন না। তবে মহাদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বর দিয়াছেন, আর সেই বরে তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইবেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনগণসহ পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবেন—তিনি এই চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণ-বিলম্ব ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সনাতন গোস্বামী একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে 'সাকর মল্লিক' নামে গৌড়ীয় পাতসাহ হুসেন সাহের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ও বিপুল বিষয়বিভব ও মানমর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সুখৈশ্বর্য্যের, প্রভাব প্রতিপত্তির তুলনা ছিল না। কিন্তু কলিপাবনাবতার শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়; তিনি সংসারের নশ্বরতা বুঝিতে পারিয়া, তৃণের ন্যায় সমস্ত ধনজন বিষয়সম্পদ পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, উন্মত্ত হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্য কঠোর হইতে কঠোরতর ছিল। তিনি একক্রমে দুই দিবসকাল এক স্থানে অবস্থিতি করিতেন না; পাছে স্থানের উপরে কোনও রূপ মমত্ব জন্মে—এই ভয়ে প্রত্যহ নব নব বৃক্ষতল আশ্রয় করিতেন এবং অহর্নিশ কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে ও শাস্ত্রানুশীলনে সময়াতিপাত করিতেন। এই বৈরাগ্যের অবতার সাধুপ্রবর সনাতন একদা যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া, পথে একটি স্পর্শমণি দেখিতে পায়েন। স্পর্শমণি সুবর্ণজনক মণি—ইহার স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়! এ সংসারে ইহা সুদুর্লভ। বিশেষ ভাগ্যবান পুরুষ ব্যতীত কেহ কখনও ইহা হস্তগত করিতে পারে না। কিন্তু সনাতন ইহাকে তৃণ হইতেও হীন, অপদার্থ বলিয়াই বোধ করিলেন। তবে এই বহুমূল্য ধনের দ্বারা

দীন দরিদ্রের উপকার করা যাইতে পারে ভাবিয়া, তিনি ইহাকে ত্যাগ করিলেন না; কোনও নির্দ্ধন দুঃখী লোককে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে কোনও নিভৃত স্থলে লুকাইয়া রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বিষয় সংস্পর্শ—অর্থ বিত্তাদি স্পর্শ করা ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য নহে। তবে কি করিয়া—স্পর্শ না করিয়া কি উপায়ে তিনি ইহাকে গোপন রাখিবেন? সাধু তাহার উপায় করিলেন, তিনি স্পর্শমণিটি—

"স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধরি' লৈয়া,
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া।"

অতঃপর সনাতন স্নান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সাধনভজন-প্রসঙ্গে—অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই মণির কথা ভুলিয়া যাইলেন।

কিছু দিন পরে জীবন বৃন্দাবনে আসিলেন এবং সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে কর-যোড়ে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সনাতন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার ন্যায় যুক্তকর হইয়া, অতি মধুর বিনীত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে
আগমন করি' কৃপা হৈল মোর মাথে।"

সাধুর বিনয়পূর্ণ নম্রভাব দর্শনে ও মিষ্ট বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে আপনার পরিচয় ও আগমনের কারণ প্রভৃতি একে একে বিবরিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সাধু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"আমি অর্থ কোথায় পাইব? আমি ভিক্ষাজীবী—ভিক্ষার দ্বারাই আমার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। আমার নিকটে কোথা হইতে অর্থ আসিবে?—আর মহাদেবই বা আপনাকে আমার নিকটে পাঠাইবেন কেন?" সাধুর বাক্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইলেন, নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তিনি দুঃখিত ভাবে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—

"হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিলা।
কিংবা মুই স্বপনে কি প্রলাপ দেখিলা॥"

ব্রাহ্মণের কাতরতা দর্শনে সাধুর মনে কষ্ট হইল। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে, সমস্ত গত কথা একে একে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আকাশ পাতাল,

নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার পূর্ব্বকথা—মণিপ্রাপ্তির বিষয় স্মরণ হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিলেন; শেষে বলিলেন—

"হয় হয় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল,
মিথ্যা নহে শ্রীমন্ মহাদেব যে কহিল।"

"আমার নিকটে বাস্তবিকই একটি মহামূল্যমণি আছে। নানা কারণে এতক্ষণ আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন চলুন, আপনাকে মণি দেখাইয়া দিয়া আসি।" ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া সাধু সনাতন যমুনার তীরে, যে স্থানে মৃত্তিকামধ্যে মণি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বামহস্তের তর্জ্জনীদ্বারা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে মণি তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এরূপ সংসারবিরাগ, ধনরত্নাদির প্রতি এতদূর স্পৃহাশূন্যতা—তাচ্ছিল্য বা ঘৃণাভাব যে, স্পর্শমণির দিকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী নির্দ্দেশেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না! পাছে অকিঞ্চিৎকর অর্থের প্রতি কোনও রূপ গৌরব বা সম্মানভাব প্রদর্শিত হয়—এই তাঁহার আশঙ্কা। এরূপ ত্যাগী বা বৈরাগ্য-সম্পন্ন না হইলে কি আর নিত্যধন লাভ হয়—ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে? ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট স্থলে গমন করিয়া মণি উত্তোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য সহসা হস্তগত হয় না। জীবন মণি পাইলেন না। তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি সনাতনকে মণি তুলিয়া দিতে মিনতি করিলেন। কিন্তু সাধু তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন,—"আমি স্নান করিয়াছি, এখন আর উহা স্পর্শ করিব না। আপনি একটু যত্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখুন। নিশ্চিতই পাইবেন।" ব্রাহ্মণ আবার মণির সন্ধানে মৃত্তিকা অপসারণ করিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহার আশা পূর্ণ হইল; তিনি মণি পাইলেন। ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি প্রফুল্লমনে পুনর্ব্বার সাধুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং মণি গ্রহণপূর্ব্বক আপনার ভাবী সুখ সম্পত্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বদেশ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। সনাতনও নিশ্চিন্তমনে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মনের আনন্দে মণি লইয়া জীবন পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব চিন্তার আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এমন মহামূল্য দুর্লভ রত্ন সাত রাজার ধন স্পর্শমণি সাধু

আমাকে দিলেন কেন? ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ত তিনি ইহা রাখিতে পারিতেন। কিন্তু রক্ষা করা দূরে থাকুক তিনি ইহাকে স্পর্শ করিতে এমন কি ইহার প্রতি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে—দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিলেন! ইহার কারণ কি? তবে কি তাহার নিকটে এমন কোন এক অমূল্য রত্ন আছে যাহার তুলনায় এই সাত রাজার ধন স্পর্শমণিও তুচ্ছাদপিতুচ্ছ, নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত? তাহা না হইলে—সেরূপ এক অলৌকিক অমূল্য ও অতুল্য ধন তাঁহার না থাকিলে, তিনি কি ইহাকে এরূপ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন? যদি তাহাই হয়, তবে আমিই বা ইহা কেন গ্রহণ করি?—সাধু যাহা ঘৃণা করিয়া স্পর্শ পর্য্যন্তও করিলেন না, আমিই বা তাহা লই কেন? সেরূপ উৎকৃষ্ট আপার্থিব ধন থাকিতে কেন আমি এই অকিঞ্চিৎকর মণির অনুরাগী হইলাম? এই সামান্য ধনের জন্য আমি কত না তপস্যা করিয়াছি—কত ক্লেশই না করিয়াছি। আমাকে ধিক্! যাহা হইবার হইয়াছে, আর প্রতারিত হইব না। এখন আমাকে, এই তুচ্ছ ধন ত্যাগ করিয়া, সাধুর নিকট হইতে সেই ধন—তাঁহার সেই চিরস্থায়ী দুর্লভ রত্ন—লইতেই হইবে—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

"অতএব হেন ধন দূরে তেয়াগিয়া,
গোসাইর চরণে শরণ লব গিয়া।
তেঁই যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল,
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল।"

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বটেশ্বর নামক স্থানে উপনীত হইলেন! কিন্তু আর অগ্রসর হইলেন না; সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং যথাসময়ে সনাতনের চরণে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এইরূপে নিজ অভিমত পরিব্যক্ত করিলেন,—

"এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম,
কৃপা করি প্রভু মোরে কর আত্মসম,
শরণ লইনু তব অভয় চরণে,
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে।"

ব্রাহ্মণের ঈদৃশ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দর্শনে সনাতন সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন,—"আপনি গৃহে গিয়া কৃষ্ণ ভজন করুন, ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবেন।" ব্রাহ্মণ সে কথা শুনিলেন না, দৃঢ়তা

সহকারে বলিলেন,—"না, প্রভো, আমি আর গৃহে ফিরিব না। আপনার চরণে শরণ লইলাম। আমি অতি মূঢ়,আমাকে কৃপা করুন।" ব্রাহ্মণের মনের দৃঢ়তা ও ভক্তিভাব প্রত্যক্ষকরিয়া সাধুর করুণা হইল, তিনি তাঁহার অন্তর পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—"তবে যদি আপনি স্পর্শমণিটি ত্যাগ করিতে পারেন তাহা হইলে বুঝিতে পারি, আপনি কৃষ্ণপ্রেমধন লাভের যোগ্য হইয়াছেন।" তখন

"এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে,
টান মারি' ফেলি' দিল যমুনা মাঝারে?"

জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সনাতন তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন এবং তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাদান করিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার সমস্ত পাপতাপ দুঃখদারিদ্র্য দূরীভূত হইল—সংসারবন্ধন চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া গেল।

মহাদেব জীবনকে যে স্পর্শমণির আভাস দিয়াছিলেন, এই সাধু শিরোমণি সনাতন গোস্বামীই সেই মণি। এই স্পর্শমণির সংসর্গে ব্রাহ্মণ জীবন সুবর্ণ হইলেন—নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার তুচ্ছ অর্থাকাঙ্ক্ষা, বিষয়-লালসা ক্ষণমাত্রেই অন্তর্হিত হইল. কঠোর তপস্যার দ্বারা শিবের কৃপালাভ করিয়া যে অমূল্যধন স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সাধু সনাতনের মুহূর্ত্তমাত্র-ব্যাপী সঙ্গপ্রভাবে সেই মণির প্রতিও তাঁহার ঘৃণা উপস্থিত হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎকট ভোগবাসনা প্রজ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে বিনিক্ষিপ্ত শুষ্ক তৃণগুচ্ছের ন্যায় নিমেষমধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া গেল। তিনি অচির-কালমধ্যেই সংসারে পূজ্য হইলেন।

সার্দ্ধত্রিশতাধিক বর্ষ অতীত হইল জীবন জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া নিত্য-ধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেই অলৌকিক সাধুসঙ্গের প্রভাবে তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, গোস্বামী উপাধিধারি জীবনের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

বিসর্জ্জন।

(১)

পরেশচন্দ্র 'বিদেশে' চাকরী করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর যখন সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জন প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন কিছুদিন বাঙ্গালায় চাকরীর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থচেষ্ট পরেশচন্দ্র পঞ্জাবে উকীল মাতুলের নিকট গমন করেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চাকরী জুটিয়া যায়। তিনি বুদ্ধিমান, চাকরী প্রায়ই ক্ষণভঙ্গুর ইহা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্পাদনে সর্ব্বদাই বিশেষ মনোযোগী থাকিতেন। ফলে—তাঁহার উন্নতি যেমন দ্রুত তেমনই আশাতিরিক্ত হইয়াছিল। তিনি 'বড় চাকুরিয়া' হইয়াছিলেন।

'বিদেশে' চাকরী করিয়া তিনি বর্ষান্তে একবার 'দেশে' আসিতেন। কোন কোন বার আসা ঘটিত না। পত্নী সর্ব্বমঙ্গলা প্রায়ই পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেন। যে বার ছুটীর সময় তাঁহার পক্ষে সুদীর্ঘ পথ গমন শঙ্কাজনক হইত, সেবার পরেশচন্দ্রের আর 'দেশে' আসা ঘটিত না। তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিতও হইতেন না। কারণ, একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছু দিন থাকিবার পর মানুষ আর সে পরিবারের ব্যবস্থায় আসিয়া বিশেষ সুখ বোধ করে না। সে পরিবারের একতাচ্যুত আর তাহার অঙ্গীভূত হইতে ভালবাসে না; কারণ, সে যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয় একান্নবর্ত্তী পরিবারে তাহাতে বিঘ্ন ঘটে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরেশচন্দ্রের সহিত পরেশচন্দ্রের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের জন্য পরেশচন্দ্রকে চেষ্টামাত্র করিতে হয় নাই। পাঞ্জাবপ্রবাসী একজন বাঙ্গালীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। পরেশচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, ছেলে মেয়ে সকলেরই বিবাহ সেইরূপ অনায়াসে সম্পন্ন হইবে। তাঁহার গৃহিণীই সে সরল বিশ্বাসে প্রথম ও প্রবল আঘাত দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিয়লতা যখন দশ বৎসর ছাড়াইয়া একাদশে পড়িল তখনই সর্ব্বমঙ্গলা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। পরেশচন্দ্র যতদিন পারিলেন, "হইবে," "ব্যস্ত" "কি ?" ইত্যাদি বলিয়া বিলম্ব করিলেন। কিন্তু ওজর অধিক দিন চলিল না। শেষে তিনি যখন সত্য সত্যই পাত্রের সন্ধান

আরম্ভ করিলেন, তখন গৃহিণী বলিলেন, তিনি এ বিদেশে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। দেশে যাইয়া "ঘটা করিয়া" মেয়ের বিবাহ দিবেন। দেশে ত মানসম্ভ্রম রক্ষা করা চাহি! কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ত দেশেই যাইতে হইবে। দেশে কায কর্ম্ম না করিলে লোক জানিবে কেন? গৃহিণী গৃহের সব ভার লইয়া পরেশচন্দ্রকে নিশ্চিন্ত থাকিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ পরেশচন্দ্রও কখন গৃহিণীর কথার প্রতিবাদ করিতেন না। তিনি দেশে বহু আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু প্রভৃতিকে প্রিয়লতার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে পত্র দিলেন। পত্র দিলেন না কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরেশচন্দ্রকে। যে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া কোনরূপে সংসার পালন করে, এমন একটা ভার কি তাহাকে দেওয়া যায়?

(২)

কয়মাস পরে ছুটী লইয়া পরেশচন্দ্র গৃহে আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, তিনি যাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহারা পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন, কেহই পাত্রের সন্ধান করেন নাই। কেবল অপরেশচন্দ্র "গায় পড়িয়া" কয়েকটা সম্বন্ধের কথা বলিলেন। কোনটাই পরেশচন্দ্রের বা সর্ব্বমঙ্গলার পসন্দ হইল না। দেখিতে দেখিতে ছুটী ফুরাইল। এবার পরেশচন্দ্র পরিবারবর্গকে দেশে রাখিয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন।

সর্ব্বমঙ্গলার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় একই সহরে। তাঁহার পিতা, মাতা বা ভ্রাতা ছিলেন না; ছিলেন এক জ্যেষ্ঠতাত। সর্ব্বমঙ্গলা তখন তাঁহাকেই 'মুরুব্বি' ধরিয়া মেয়ের বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়দিন পরে তিনি সেই সহরেই একটি পাত্রের সন্ধান দিলেন। তিনি তাহাকে বিশেষ ঈপ্সিত পাত্র বলিয়া বর্ণনা করিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিলেন ও পরেশচন্দ্রকে আসিতে লিখিলেন।

অপরেশচন্দ্র পত্নী কল্যাণীর নিকট এই সম্বন্ধের কথা অবগত হইয়া বলিলেন, "সে কি? ছেলেটা যে একেবারে বয়াটে!"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহাতে তোমার কি? কে তোমার মত চাহে? গ্রামে মানে না তবু আপনি মোড়ল! তুমি কোন কথা কহিলে, দিদি বলিবেন, তুমি ভাল পার না মন্দ পার। তুমি যেন কিছু বলিও না।"

অন্যমনস্কভাবে অপরেশচন্দ্র বলিলেন, "ভাল।"

তিনি পত্নীকে বলিলেন "ভাল", কিন্তু মন বুঝিল না। রক্তের টানের একটা আকুলতা তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না। তিনি পরদিন সর্ব্বমঙ্গলার মহলে যাইয়া ডাকিলেন, "প্রিয়লতা!"

দেবরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সর্ব্বমঙ্গলা ভূমিলুণ্ঠিত অঞ্চলখানি তুলিয়া বিপুল দেহ আবৃত করিয়া বলিলেন. "কে, ঠাকুরপো?"

অপরেশ কক্ষদ্বারে আসিলেন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পাড়ার মাধব ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে কি প্রিয়লতার বিবাহের কথা হইতেছে?"

সর্ব্বমঙ্গলা বলিলেন, "কথা ত হইতেছে। এখন মেয়ের কপালে অমন সম্বন্ধ থাকিলে বাঁচি।"

"সম্বন্ধটা কি বড় ভাল?—"

"সে আমার জ্যেঠা মহাশয় সব সন্ধান লইয়াছেন।"

"ঘরে কেবল বিধবা ভগিনী।"

সর্ব্বমঙ্গলা হাসিয়া বলিলেন, "সে ত ভালই। এক ঘরের এক গৃহিণী হইবে। এখন কি আর আমাদের কাল আছে? এখন মেয়েরা শাশুড়ীর 'তাঁবে' থাকিতে চাহে না।"

সর্ব্বমঙ্গলা শাশুড়ীর সহিত কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন অপরেশের তাহা মনে পড়িল। তিনি আবার বলিলেন, "ছেলেটি লিখাপড়ায় ভাল নহে।"

সর্ব্বমঙ্গলা বলিলেন, "এখনও ত পড়িতেছে। লিখা পড়া না হইলেও ঘরে ত অন্নের সংস্থান আছে। আর একটা জামাইকে একটা চাকরী করিয়া দিতে পারেন, এমন ক্ষমতা তোমার দাদার আছে। বলে—কত পর তাঁহাকে ধরিয়া তরিয়া গেল! বুঝিলে, ঠাকুরপো?"

অপরেশচন্দ্র আর কি বলিবেন?

পরেশচন্দ্র গৃহে আসিলে সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাকে বলিলেন, "শুনিয়াছ, তোমার ভ্রাতার কাণ্ড? যে-ই জ্যেঠামহাশয় সম্বন্ধটি স্থির করিলেন, অমনই ছেলের কুৎসা। সম্বন্ধটি ভাঙ্গিলেই যেন আনন্দ!"

পরেশচন্দ্র বলিলেন, "বটে?"

ইহার পর যখন অপরেশচন্দ্র শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে ভ্রাতার নিকট এ সম্বন্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন তখন যে ভ্রাতার ব্যবহারে

তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ফিরিতে ফিরিতে মনে মনে পত্নীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হইল তাহা বলাই বাহুল্য।

(৩)

যথাকালে সেই পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া পরেশচন্দ্র সপরিবারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইলেন। বর্ষাধিককাল পরে তিনি যখন আবার গৃহে আসিলেন, তখন জামাতা বিনোদবিহারী স্কুলের পাঠ ছাড়িয়া পাড়ার কন্‌সার্টের দলে বাঁশ বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পরেশচন্দ্র জামাতাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন ও শেষে তাহাকে তাহার আপনার সাংসারিক ও বৈষয়িক কাযে মন দিতে বলিলেন।

পরেশচন্দ্র সপরিবারে কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইলেন। প্রিয়লতা স্বামীগৃহে গেল। তথায় স্বামীর দুর্ব্বহারে ও নন্দনার অত্যাচারে তাহার প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া সর্ব্বমঙ্গলা কন্যা-জামাতাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। প্রিয়লতা পিতার নিকট গেল। বিনোদবিহারী আপনার বাটীতে কন্‌সার্টের আড্ডা করিল এবং একাধিক নেশায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিল।

পরবার যখন দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ দিতে পরেশচন্দ্র দেশে আসিলেন, তখন বিনোদবিহারীকে অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইয়া আনা অসাধ্যসাধন।

এবারও প্রিয়লতা স্বামীর গৃহে গেল; কিন্তু তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না।

ইহার দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় পুত্রের অপুত্রক শ্বশুরের মৃত্যুতে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি পরেশচন্দ্রের হস্তে আসিল। পরেশচন্দ্র পেন্সন লইয়া স্থায়ী হইয়া গৃহে আসিলেন।

(৪)

পাছে ভবিষ্যতে কোন গোল হয় এই অছিলায় পরেশচন্দ্র পৈত্রিক বাসভবন বাটোয়ারা করিয়া লইলেন ও আপনার অংশে আবশ্যক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া জাঁকাইয়া বসিলেন। তিনি কাযে ও কথায়, ব্যবহারে ও বিতর্কে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিতেন। কেবল জামাতার জন্য তাঁহার উচ্চ মাথা হেঁট হইত!

জামাতার কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, "উহার মৃত্যু হইলে আমিও বাঁচি, মেয়েটারও হাড় জুড়ায়।"

প্রিয়লতা পিতার এই কথা শুনিয়া কাঁদিত। স্বামীর সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার অপেক্ষা পিতার এই মন্তব্য তাহার পক্ষে অধিক বেদনার কারণ হইত। তাহার নববিকাশিত হৃদয় স্বামীকে কখনই ঘৃণার্হ মনে করিতে পারিত না। স্বামী ভ্রান্ত হইতে পারেন, সে তাহার অদৃষ্টের দোষ; কিন্তু স্বামী যে ঘৃণার্হ হইতে পারেন ইহা তাহার কল্পনায় আসিত না। সকলেরই জীবনের দুইটা দিক আছে, একটি উজ্জ্বল অপরটি অন্ধকার। প্রকৃত প্রেমময়ী পত্নী স্বামীর জীবনের সেই উজ্জ্বল দিকটাই লক্ষ্য করে।

প্রিয়লতা মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছায় ও পিতামাতার অনিচ্ছাসত্বেও স্বামীর গৃহে যাইত; আশা, যদি চেষ্টা করিয়া স্বামীর প্রেমলাভ করিতে পারে। কিন্তু স্বামীর ব্যবহারে ততোঽধিক ননন্দার অত্যাচারে অধিক দিন তথায় থাকিতে পারিত না। স্বভাবতঃ প্রখরা ননন্দা ভ্রাতার অধঃপতনের সমস্ত দোষ তাহারই স্কন্ধে চাপাইয়া নিরপরাধ ভ্রাতৃজায়াকে এমন নির্ম্মম নির্য্যাতন করিতেন যে, প্রিয়লতা কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিত না।

এই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন সন্ধ্যায় সহসা বিনোদবিহারীকে শিষ্ট শান্ত ভাবে শ্বশুরালয়ে দেখা গেল। শ্বশুরশাশুড়ী ভাবিলেন, বুঝি তাহার সুমতি হইয়াছে।

(৫)

পরদিন প্রভাতে যখন দেখা গেল, বিনোদবিহারী ও প্রিয়লতার গহনার বাক্স উভয়েই অন্তর্হিত, তখন বাড়ীতে বড় গোল হইল। ব্যাপার শুনিয়া অপরেশচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, পরেশচন্দ্র স্বয়ং পুলিশে এতালা করিতে যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "দাদা, যদি জামাই লইয়া থাকে?"

পরেশচন্দ্র উত্তর দিলেন, "জেলে যাইবে।"

বিস্মিত—স্তম্ভিত ভাবে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া অপরেশচন্দ্র বলিলেন, "সে কি? আমি যাই—বিনোদের সন্ধান লইয়া আসি।"

অপরেশচন্দ্র বিনোদবিহারীর গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইলেন। পরেশচন্দ্র থানায় গমন করিলেন।

অপরেশচন্দ্র বিনোদবিহারীকে কন্‌সার্টের আড্ডা ঘরে পাইয়া সব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় পুলিশ আসিয়া বিনোদবিহারীকে গ্রেপ্তার করিল। তাহার পর খানাতল্লাসিতে মালও পাওয়া গেল।

অপরেশচন্দ্র ভ্রাতার ব্যবহারে হতবুদ্ধি হইলেন।

(৬)

এই অতর্কিত বিপদে প্রিয়লতা বিষাদে অভিভূতা হইল না। বিপদ যেন তাহার রমণীহৃদয়ে নূতন বল সঞ্চারিত করিল। সে মনে মনে ভাবিল, আমার অলঙ্কার লওয়া আমার স্বামীর পক্ষে দোষের হইবে কেন? সে ত তাঁহারই। সে কাকীমা'কে ধরিয়া অপরেশচন্দ্রের নিকট হইতে কোথায় কাহার নিকট বিনোদ-বিহারীর বিচার হইবে সব জানিয়া হইল; তাহার পর আপনার কক্ষে আসিয়া গোপনে আপনার আঁকা বাঁকা লিখায় বিচারকে পত্র লিখিল,—"আমার স্বামী আমার গহনা লইয়া আপনার নিকট চুরীর জন্য অভিযুক্ত। তাঁহার দ্রব্য তিনি লইয়াছেন। ইহাতে কোন দোষ নাই। আপনি ধর্ম্মাবতার, তিনি নির্দ্দোষ—তাঁহাকে মুক্তি দিয়া আমার মান ও প্রাণ রক্ষা করুন।"

সে দাসীকে চারি আনার পয়সা দিয়া পত্রখানা ডাকে পাঠাইল এবং অপরেশচন্দ্রের দাসীকে দিয়া পাল্কী ডাকাইয়া তাহাকেই সঙ্গে লইয়া স্বামীগৃহে গেল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার স্বামীর কোন শাস্তি হইতে পারে না—হইবে না।

এ বার ননন্দার ব্যবহার কিরূপ অসহনীয় হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ বার প্রিয়লতা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল- সব সহ্য করিবে। সে ননন্দার কোন কথার উত্তর দিল না। এবার ননন্দা যখন তাহাকেই তাহার ভ্রাতার বিপদের কারণ বলিয়া গালি দিলেন তখন সে মনে করিল,—সে সত্য সত্যই অপরাধী। সে যখন অপরাধী তখন সে কেন না শাস্তি পাইবে?

(৭)

কারাগারে বিনোদবিহারী ভাবিতে লাগিল। সে এত দিন যে অবিরল উত্তেজনায় ভাবিবার অবকাশ পায় নাই এখন সে উত্তেজনা আর নাই। এখন সে তাহার সঙ্গীদিগের নিকট হইতে দূরে। এখন তাহার অবসর যথেষ্ট। তাই সে ভাবিতে লাগিল। সে কি ছিল—কি হইয়াছে; কি পাইয়াছে কি হারাইয়াছে; বংশে কি কলঙ্ককালিমালেপন করিয়াছে,—লোকের নিকট কিরূপ ঘৃণ্য হইয়াছে; পত্নীর প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে—সে এই সব ভাবিতে লাগিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল আর তাহার অনুতাপ ও আত্মগ্লানি বাড়িতে লাগিল। সে মনে করিল, সে বংশের কলঙ্ক—সংসারের আবর্জ্জনা, লোকালয়ে মুখ দেখানই তাহার পক্ষে অন্যায় হইবে। এই সময় তাহার প্রিয়লতাকে মনে পড়িল। তাহার সকল দুর্ব্ব্যবহার সে শান্ত ভাবে সহ্য করিয়াছে—কখনও মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে নাই। সে প্রিয়লতার একান্তই অযোগ্য।

(৮)

দেখিতে দেখিতে বিনোদবিহারীর বিচারের দিন আসিল। বিচারক প্রিয়লতার পত্র পাইয়াছিলেন ও তাহার কথায় একান্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। কি উপায়ে আসামীকে মুক্তি দিবেন, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, তাহার অপরাধের প্রমাণের কিছুমাত্র অভাব নাই। এ অবস্থায় তিনি কি করিতে পারেন?

আসামী আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কি দোষী?"

আসামী নতদৃষ্টি হইয়া ছিল; মুখ না তুলিয়াই স্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমি দোষী।"

বিচারকের হৃদয় হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আসামীর বয়স ও বংশ বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বিশেষ তাহার পত্নী তাহাকে অলঙ্কার গ্রহণের জন্য অপরাধী বিবেচনা করে না। একজন জামিন হইলেই তাহার মুক্তি হয়।

আদালতে সকলে এ উহার মুখে চাহিতে লাগিল।

অপরেশ জামিন হইয়া বিনোদবিহারীকে মুক্ত করিলেন।

(৯)

মুক্তি পাইয়া বিনোদবিহারী ভাবিল, "কোথায় যাই?" তাহার প্রথম প্রবল বাসনা হইল প্রিয়লতার নিকট যাইয়া ক্ষমা চাহিবে; কিন্তু প্রিয়লতা কোথায়? সে কেমন করিয়া আর শ্বশুরালয়ে যাইবে?

ভাবিতে ভাবিতে সে সহরের বাহিরে চলিয়া গেল। লোকালয় হইতে দূরে সহরের বাহিরে একটি ভগ্ন মন্দির ছিল। শ্রান্ত হইয়া সে সেই মন্দিরের সোপানে শয়ন করিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

সেই নির্জ্জন স্থানে শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বিচারকের সেই

কথা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"তাহার পত্নী তাহাকে অলঙ্কার গ্রহণের জন্য অপরাধী বিবেচনা করে না।"

ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল; ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, মলিনমুখী প্রিয়লতা তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া। তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এবার সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে প্রিয়লতার নিকট ক্ষমা চাহিবেই স্থির সঙ্কল্প করিয়া গৃহাভিমুখগামী হইল।

(১০)

এদিকে অপরেশচন্দ্রের নিকট স্বামীর মুক্তিসংবাদ পাইয়া প্রিয়লতার মলিন মুখ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কয় দিন ক্রমাগত তর্জ্জনগর্জ্জনের ফলে তাহার ননন্দার গালির স্রোত একটু মন্দগতি হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ ঝগড়া একতরফা অধিক দিন চলে না।

প্রিয়লতা স্বয়ং রন্ধনশালায় গেল। বিনোদবিহারী যাহা যাহা খাইতে ভালবাসিত সেই সব সযত্নে রন্ধন করিয়া তাহার আহার্য্য লইয়া অনাহারে অপেক্ষা করিতে লাগিল;—কখন সে আসিবে।

দিন গেল—সন্ধ্যা আসিল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তথাপি বিনোদবিহারী ফিরিল না। তাহাকে গালি দিয়া ননন্দা খাইয়া শয়ন করিলেন। গৃহ সুপ্ত। কেবল প্রিয়লতা জাগিয়া রহিল।

প্রিয়লতা ভাবিল স্বামী আসিলেন না। তাহার পিতৃগৃহে ফিরিবার প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং, সংসারে তাহার আর আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। তাহার সকল আশার শেষ হইয়াছে।

সে উঠিল। ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণীতে অবতরণ করিয়া খিড়কীর দ্বার মুক্ত করিল। সম্মুখে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে চন্দ্রালোক খেলা করিতেছে। সে জল কি স্নিগ্ধ—কি মোহন—কি আনন্দময়!

(১১)

নিশাশেষে বিনোদবিহারী গৃহে আসিল। দ্বার মুক্ত ছিল। সে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহ শূন্য! গৃহের পশ্চাতে গোলমাল শুনিয়া সে সেই দিকের ছাতে গেল; দেখিল, আলোক লইয়া বহু লোক সমাগত; শুনিল, তাহার ভগিনী সমাগত ধীবরগণকে বলিতেছেন, "তোরা জাল ফেল। আমি শব্দ শুনিয়া উঠিয়াছি। সে পোড়ামুখী নিশ্চয়ই জলে ঝাঁপ দিয়াছে। সে সারা দিন বিনোদের ভাত লইয়া বসিয়া ছিল।"

ধীবরগণ জাল ফেলিল; বহুক্ষণ চেষ্টার পর তাহারা প্রিয়লতার প্রাণহীন দেহ তুলিল।

বিনোদবিহারী দেখিল। সে বুঝিল, সে সংসারের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে সংসার এবার তাহার প্রতিশোধ লইতেছে। সে বিপথ হইতে ফিরিয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিতে আসিয়াছে তখন সংসার তাহার দ্বার বন্ধ করিয়াছে, তাহার আর প্রবেশের উপায় নাই। ঐ পুষ্করিণীতে তাহার সকল আশার বিসর্জ্জন হইয়াছে।

সে যেমন অন্যের অলক্ষিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই অলক্ষিতে বাহির হইয়া গেল।

দস্যুর পুরস্কার।

নাট্য-গল্প।

[স্থান—মবারকের উদ্যানবাটীর শয়নকক্ষ, কক্ষটি উচ্চ ফ্লোরের উপর অবস্থিত, বহুমূল্য আসবাবে সুসজ্জিত, চারিদিকে বড় বড় খোলা জানালা।

সময়—রাত্রি আট ঘটিকা। মবারক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, মমতাজ নিকটে দণ্ডায়মান।]

মবারক। তুমি জান, কাল আমার সে বন্ধুটি বিলাতে যাচ্ছেন আজ তাঁ'র বিদায় ভোজ—আজ আমাকে তা'র ওখানে একবার না গেলে নয়, মমতাজ।—কখন ফিরব তা'ত বল্‌তে পাচ্ছি না, মমতাজ।

মমতাজ। কেন?—অনেক রাত্রি হবে নাকি?—তবু ক'টার সময় ফির্‌বে?

মবারক। যত শীঘ্র পারি ফির্‌ব, মমতাজ—তবু বোধ হয় রাত্রি একটা হবে?—আমাদের বিবাহ হওয়া অবধি তোমা ছাড়া আমি এক দণ্ডও থাক্‌তে পারি না। আমি আমার স্ত্রী পুত্রের নিকট থেকে যতটা সুখ যতটা আনন্দ পাই ততটা বোধ হয় আর কিছুতেই পাই না।—মমতাজ, তুমি ত আমার হৃদয়ের কথা সবই জান।

মমতাজ। (দুঃখিত স্বরে) হাঁ, প্রিয়।

মবারক। না, না। তবে আজ আর আমার যাওয়া হ'ল না দেখ্‌ছি।

মমতাজ। (আশ্চর্য্য হইয়া)—কেন হটাৎ?

মবারক। তোমায় বড় দুঃখিত দেখ্‌ছি—আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কোথাও যেতে চাই না, মমতাজ।

মমতাজ। না কৈ আমার ত কিছুই হয়নি।

মবারক। ঠিক বল্‌ছ কিছু হয় নি?

মমতাজ। যাও যাও—আর বেশী দেরী কোরো না।

মবারক। তবে আসি মমতাজ। আমার জন্য বেশী রাত্রি অবধি জেগে বসে থেক না যেন—আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌ব।

[মবারকের প্রস্থান।]

[মমতাজ ঘরের চতুর্দ্দিক অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিক্রমণ করিল তাহার পর

বাক্স হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল; ঘড়ির শব্দে চমকিত হইয়া চিঠি রাখিয়া]

মমতাজ। ঐত এগারটা বাজ্‌ল—এই ত সময়।—এবার ত খসরু আস্‌বে—উঃ কেন আমি এত দিন পরে তা'র সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আবার রাজী হলুম—উঃ এই সাত বৎসর পরে আমার জীবনটা আবার দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি হায় এইবার আমার প্রাণ থেকে শান্তি একেবারে চলে যা'বে। কি কর্ব্ব—খিড়কির দরজা খুলে রাখ্‌ব—না বন্ধই থাক্‌বে—কি কর্ব্ব?—(পরিক্রমণ করিতে করিতে)—নাঃ—বন্ধই থাক্‌বে—না, না, তা'হলে আমার জীবনটা আরো দুর্ব্বহ আরো অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে—দেখা করাই ভাল। না হ'লে সে ভয়ানক প্রতিহিংসা নেবে, সব ছারখার হয়ে যাবে। আর কেন? যাই। খিড়কি দরজা খুলে রেখে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকিগে—নইলে চাকরবাকররা যদি জান্‌তে পারে?

[মমতাজের প্রস্থান।]

[একটি ছোট ব্যাগ, একটি গুলিভরা পিস্তল, একটি চোরা লণ্ঠন লইয়া মুখোসপরা দস্যু সলেমানের খোলা জানালা দিয়া প্রবেশ]

সলেমান (পিস্তলটি টেবিলের উপর একটা কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া ও ব্যাগ ও লণ্ঠন ও মুখোসটি মেজের উপর রাখিয়া) বাঃ—এরা ত বেশ মজার লোক দেখ্‌ছি—বড় জান্‌লাটা এত রাত্রে খুলে রেখে দিয়েছে—সকালে যে বড় কুকরটা দেখেছিলুম সেটাকেও ত কৈ বাগানে দেখ্‌লুম না।—এরা কি আমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছিল নাকি! তা বেশ—তা। বেশ এমন না হ'লে আমাদের ব্যবসা চল্‌বে কেন।

(ব্রাকেট হইতে একটা ফুলদানী হাতে লইয়া) বাঃ বেশ সুন্দর ফুল-দানটাত! রূপোর না গিল্টির? আজকাল গিল্টিওয়ালারা আমাদের বড় ঠকাচ্ছে; অবিকল ঠিক রূপোর মত করে। অনেক সময় কষ্ট করে বয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের আবার ফেলে দিতে হয়। আমাদের ত আর কসে দেখবার সময় হয় না! যা'ক বরাতটা একবার যাচিয়ে দেখা যাক্ [ফুলদানী-টাকে ব্যাগের ভিতর রাখিয়া দিল। তাহার পর একগোছা চাবি লইয়া সম্মুখের একটি ক্যাস বাক্সে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল।]

সলেমান (উৎকর্ণ হইয়া) ঐ বোধ হয় কে এদিকে আস্‌ছে। যাই ঐ খানে লুকিয়ে থাকিগে (ব্যাগ ও আলো লইয়া আলমারির পশ্চাতে লুকাইল পিস্তলটি টেবিলের উপর কাগজ চাপা ছিল, সেটি লইতে ভুলিয়া গেল।)

[মমতাজের প্রবেশ।]

মমতাজ। সাড়ে এগারটা বেজে গেল। কৈ খসরুত এখনও এল না এদিকে যে আমার স্বামীর আসবার সময় হয়ে আস্‌ছে! না খরুকে সম্মতি দিয়ে বড় ভাল করিনি। এত রাত্রি হ'ল যদি দুজনে এক সঙ্গে আসে—যদি দুজনে দেখা হয়—উঃ তবে আমার কি হবে—তখন আমি কোথায় যাব? উঃ—(বিছানার একপার্শ্বে দুই করে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল)—

[কিছুক্ষণ পরে খোলা জানলা দিয়া খসরুর প্রবেশ]

খসরু। এই যে আমার জন্যই বসে দেখ্‌ছি—আমায় আর কষ্ট কোরে তোমায় খুঁজে বার কর্ত্তে হল না। এমন না হ'লে কি স্ত্রী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

মমতাজ। (চমক ভাঙ্গিয়া) তুমি?—এখানে?—

খসরু। নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক বরাবরই কথার ঠিক রাখে। আমি এখানে আস্‌ব বোলে তোমায় চিঠি লিখ্‌লুম আর আমি আস্‌ব না?—সেটা কি একটা কথার কথা।

মমতাজ। তুমি এখানে কি কোরে এলে?

খসরু। আমার জন্য জানালাটি খুলে রেখেছিলে তা আমি কি আর বুঝিনি?—তবে তোমায় আমি পুরো বিশ্বাস করিনি। খিড়কি দরজা দিয়ে আসি আর তোমার দরওয়ান আমায় চোর বলে ধরুক আর কি?—পাঁচিল টোপ্‌কে জানলা দিয়ে ভদ্রলোকের মত সটাং চলে এলুম।

মম। না, না, চাকর বাকরেরা সব ঘুমুচ্ছে তোমার কিছু ভয় ছিল না।

খসরু। তবে ত বেশ কথা—দু' দণ্ড বসে কথা কইতে পার্ব্ব।—এই বস্‌লুম; আর উঠ্‌ছি না।

মমতাজ। তুমি যা চাও বল—তোমার এক মিনিটও এখানে বসে কায নেই।

খসরু। বাঃ—তুমি ত বেশ স্ত্রী দেখ্‌ছি! তোমার স্বামী কোথায় সেই

রেঙ্গুন থেকে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে তোমার নিকটে এই আট বৎসর পরে আজ উপস্থিত হ'ল—আর তুমি কি না বল্লে, তোমার একদণ্ডও থেকে কায নেই! এখন কি আর আগেকার কথা মনে পড়ে না, মমতাজ (টেবিলের উপর হইতে একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া—একবার দেখিয়া তাহার পর ঘৃণার সহিত রাখিয়া দিয়া) এই বুঝি দুয়ের নম্বর—সমস্তই আমি শুনেছি খপরের কাগজেও দেখেছি।

মমতাজ। হাঁ, উনিই আমার স্বামী।

খসরু। আমি ভাবছি, আমি একাই বুঝি তোমার স্বামী। আমার আবার একজন অংশীদার জুটেছে দেখ্‌ছি হাঃ হাঃ।

মমতাজ। তুমি কি চাও বল। অনর্থক ঠাট্টা কোরো না।

খসরু। থাক্ আর তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে না এখন আমার কাযের কথা হোক—আমি চিঠি লিখে তোমার সব কথা বলেছি—চিঠি পেয়েছ ত?—এখন তোমার কি মত?

মমতাজ। চিঠি পেয়েছি বই কি—তুমি লিখেছ তুমি আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা চাও। যদি না দি তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে বল্‌বে, তুমিই আমার স্বামী—তুমি জীবিত থাকৃতে আমি এবার আবার দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছি।—হায়! খসরু, তুমি জান না, তাহাতে আমার কতটা বিপদ তুমি জান না আমার স্বামী আমায় কতটা ভালবাসেন, আমি তাঁকে কতটা ভালবাসি—তুমি যদি জান্‌তে—

খসরু। যাক্—তোমায় আর ভালবাসা দেখাতে হবে না। তুমি যেমন কায করেছ তোমাকে তা'র ফল ভোগ অবশ্য কর্ত্তে হ'বে।

মমতাজ। আমি যেমন কায করেছি? সেটা কি আমার দোষ নাকি? তুমি যখন আমায় অসহায় অবস্থায় একা ফেলে আপনার প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালালে; নিরাশ্রয়া বিবাহিতা পত্নীর মুখের দিকে একবার চাইলে না—এক মুটো অন্নের জন্য আমায় প্রায় পথের ভিখারী হতে হয়েছিল, সেই দুর্দ্দিনে খোদা তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মোবারককে আমার নিকটে পাঠিয়েছিলেন। তাঁ'রই প্রেম আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। তার পর শুনি, তুমি সেই অপরাধের জন্য রেঙ্গুনে ধরা পড়েছ—তোমার বিচার আরম্ভ হয়েছে। তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ তাও শুনি। তার পর এক বৎসর পরে আমি তোমাকে মৃত জানে মবারককে বিবাহ করি।

খসরু। ফাঁসির হুকুম হওয়া আর ফাঁসি হওয়া দুটোতে অনেক তফাৎ, মমতাজ। আমি সেবার জেল থেকে অনেক কষ্টে পালালুম, তা'রপর অনেক জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে আমার জীবনটাকে অনের কষ্ট কোরে বাঁচিয়ে— তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে দেশে এলুম। সেখানে গিয়ে খোঁজ পেলুম, তুমি আবার বিবাহ করেছ, বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছ। (হটাৎ গম্ভীর স্বরে) দাও শীঘ্র টাকাটা দাও। যত শীঘ্র পারি আমাকে এখান থেকে আমায় পালাতে হ'বে। পুলিশ বোধ হয় আমার সন্ধান পেয়েছে।

মমতাজ। যদি টাকাটা না দি তবে তুমি কি কর্ত্তে চাও?

খসরু। কি কর্ত্তে চাই?—কতবার বলব তোমায়, মমতাজ?—সে কথা ত চিঠিতে সব লিখে দিয়েছি। কিছু কষ্ট স্বীকার কোরে মবারক সাহেবকে চিঠি লিখে দেব যে, তুমি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী হতে পার না; তোমার সত্যকার স্বামী বেঁচে আছে।

মমতাজ। তিনি তাহা বিশ্বাস কর্‌বেন কেন?

খসরু। রেজেষ্টারি করা দেন মোহরের নকল আমার কাছে আছে। সেটাও তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

মমতাজ। মবারক যদি পুলিশে খপর দেন?

খসরু। পুলিশে খপর?—তাতে আর আমার নতুন কি শাস্তি হবে, মমতাজ?—পুলিশ ত আমার পিছনে বরাবরই ঘুর্চ্ছে। তোমার স্বামীর হাতে চিঠি পড়বার পূর্ব্বে আমি অনেক দূরে থাক্‌বো। ও যা'ক সব বাজে কথা—এখন ভাল চাও ত টাকাটা দাও—তা-না হলে সমস্ত জগতের সাম্‌নে জানিয়ে দেব, তুমি মবারকের স্ত্রী নও—তোমার সন্তান জারজ।

মমতাজ। উঃ কি ভয়ানক! কি কাপুরুষ তবে শুধু আমার উপর অত্যাচার করে তোমার সাধ মিটবে না তোমার পৈশাচিক প্রতিহিংসা একটি নিরপরাধি নিষ্কলঙ্ক জীবনকেও রক্ষা কর্‌বে না!—যাক্ তোমার সঙ্গে আমি আর বেশী কথা কইতে চাই না। তোমার টাকা ফেলে দিচ্ছি— তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও।

খসরু। সেতো তোমারি হাতে। লক্ষীটির মত পাঁচশখানি টাকা আমার হাতে ফেলে দাও—আর আমি এ মুখো কখনো হব না।

মমতাজ। তোমার মত ঘৃণিত লোকের সঙ্গে আমি আর বেশী কথা

কহিতে চাই না—নাও এই দিচ্ছি। (বাক্স হইতে একতাড়া নোট খুব ঘৃণার সহিত খসরুর সম্মুখে ফেলিয়া দিল।)

খসরু। (লইয়া পকেটে রাখিয়া—) মমতাজ, এইত লক্ষ্মীটির কায।

মমতাজ। এখন ত টাকা পেয়েছ। এইবার সরে পড় আর কেন?

খসরু। কেন? এইখানে একটু বস্‌লুমই বা?

মমতাজ। যদি আমার স্বামী—

খসরু। আবার ঐ কথা—তোমার স্বামী—তোমার স্বামীত আমি। কতবার করে এক কথা মনে করে দিতে হ'বে?

মমতাজ। আচ্ছা মবারক যদি এসে পড়েন?

খসরু। দুদণ্ড এখানে বসি না। মবারকের পায়ের শব্দ পেলে যেখান দিয়ে এসেছি সেইখান দিয়েই চলে যাব। (নোটগুলি পকেট হইতে বহির করিয়া গুণিতে গুণিতে) নোট গুলি আবার ভাঙ্গান মুস্কিল হ'বে দেখ্‌ছি। আমার কাছে একটা পয়সাও নাই। পুলিশ ত বরাবর আমার সন্ধানে ঘুর্চ্ছে; এই নোট ভাঙ্গাতে গেলে হয় ত ধরা পড়ে যেতে পারি। যদি গোটা কতক কাঁচা টাকা দাও ত ভাল হয়। তা না হলে কেমন করে যাই, মমতাজ?

মমতাজ। যাও তুমি (বাক্‌স হইতে গোটাকতক টাকা ফেলিয়া দিয়া) যথা সর্ব্বস্ব আমার নিয়ে যাও। (বাক্‌স দেখাইয়া) এই আমার বাক্‌সে যাহা ছিল সব দিলুম। আর কেন? যাও।

খসরু। যাচ্ছি, মমতাজ, যাচ্ছি—অত তাড়াতাড়ি কর্চ্ছ কেন? আজ যাবইত—এখাতে ত আর আমি থাক্‌বার জন্য আসিনি। এখনো একটা কথা বাকী আছে তোমার গলার হার ছড়াটা বেশ; অনেক দামী পাতর বসান দেখছি—তোমার স্বামীকে তোমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ওটা তোমায় দিতে হবে, মমতাজ। যদি ধরা পড়ি আবার আমার ফাঁসি হয়, তবে ওটা গলায় দিয়ে মর্ত্তে পেলে অনেকটা শান্তি পা'ব।

[মমতাজ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর হারটি গলা হইতে খুলিয়া খসরুর হাতে ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিল।]

মমতাজ। এই নাও। এইবার সন্তুষ্ট হয়েছ ত? যাও।

খসরু। হচ্চে হচ্চে। তোমার হাতের হীরাখানা বেশ চমৎকার। বেশ চকচক্ কচ্চে। ঐ আংটিটা আমায় দিয়ে দাও!

মমতাজ। (দৃঢ়স্বরে) না। দেব না।

খসরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) দেবে না?

মমতাজ। না।

খসরু। ভাল চাও ত দাও, বল্‌ছি।

মমতাজ। ঐটি আমার-স্বামীর বিবাহের সময়ের দেওয়া আংটি। ঐটি আমি কিছুতেই দেব না।

খসরু। আবার ওই কথা? তোমার স্বামিত আমি। আমার বিবাহিতা স্ত্রী অন্যের দেওয়া আংটি পর্ব্বে সেটা আমি দেখতে পার্ব্ব না—ওটা দিয়ে দাও, বল্‌ছি।

মমতাজ। না দেব না (স্বর কঠোর ও স্থির।)

খসরু। দেবে না?—আচ্ছা নিতে পারি কি না দেখ্‌ছি। (হাত ধরিতে উদ্যত।)

মমতাজ। কাপুরুষ—খপরদার—এখনই চীৎকার কর্ব্ব।

খসরু। চীৎকার কর্ব্বে?—কর—নিজের পায়ে কুড়ুল মার্ত্তে চাও মার; নিষ্কলঙ্ক বংশের কলঙ্ককথা জগৎময় রাষ্ট্র কর্ত্তে চাও কর—এই বুঝি তুমি মবরককে ভালবাস? এই বুঝি তুমি তোমার ছেলেকে ভালবাস?

মমতাজ। তুমি যা কর্ত্তে পার কর। আমি কিন্তু কিছুতেই আংটি দেব না।

খসরু। আচ্ছা তোমার দিতে হয় কি না দেখ্‌ছি।

[আবার হস্ত ধরিয়া কাড়িয়া লইবার জন্য খসরু উদ্যত হইল ।]

মমতাজ। খপরদার তোমার হত্যাকলুষিত হাতে আমাকে (বলিতে বলিতে সরিয়া যাইতে যাইতে কাপড় লাগিয়া পিস্তল ঢাকা কাগজটি টেবিলের উপর হইতে পড়িয়া গেল) স্পর্শ কোরো না বল্‌ছি। (সহসা পিস্তলটি দেখিতে পাইয়া হাতে লইয়া) এই দেখ পিস্তল—ভরা আছে।

খসরু। (হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) অত রাগ কর কেন? আমি তোমাকে ঠাট্টা কচ্ছিলুম।

মমতাজ। আর অত ঠাট্টা করে কায নেই—ভাল চাওত এখান থেকে সরে পর বল্‌ছি।

[খসরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিস্তলটা কাড়িয়া লইবার জন্য হটাৎ লাফাইয়া মমতাজের হাত ধরিল। পিস্তলটা ধরিয়া কাড়াকাড়ি

করিতে পিস্তলের ঘোড়াটা পড়িয়া গিয়া গুলি বাহির হইয়া খসরুর হৃদয় বিদ্ধ করিল। খসরুর প্রাণহীন দেহ তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল।]

মমতাজ। (উন্মত্তভাবে) এ কি কর্‌লুম!—আমি হত্যা কর্‌লুম!—এ কি?

[সলেমান দস্যু আলমারির পশ্চাৎ হইতে বাহির হইল—মমতাজ পশ্চাতে ফিরিয়া ছিল; সলেমান দস্যুকে দেখিতে পাইল না, তাহার পর সলেমান দস্যু মমতাজের সম্মুখে আসিল।]

সলেমান। বলিহারি বিবিসাহেব তোমার ত খুব সাহস দেখ্‌ছি। আমি এতক্ষণ তোমার সাহায্যে আস্‌ব আস্‌ব বলে মনে কর্চ্ছিলুম। তার পূর্ব্বে তুমি কর্ম্ম ফতে করে দিয়েছ দেখ্‌ছি। তা বেশ।

মমতাজ। (আশ্চর্য্য হইয়া) তুমি এখানে? তুমি কে?

সলেমান। আমার নামটি শুনে আর কি কর্ব্বেন। আমায় আপনার গোলাম বলেই জান্‌বেন—তবে আপনার শোবার ঘরে না বলে ঢুকেছি, গোস্তাকিটা মাফ কর্ব্বেন।

মমতাজ। আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না। তুমি এখানে কি কর্ত্তে এসেছ?

সলেমান। আমরা ব্যবসা করি; সেই ব্যবসা কর্ত্তেই এসেছি, বিবিসাহেব। তোমার জান্‌লাটা খোলা দেখে অমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তে ঢুকে পড়েছিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বিশেষ আমার কিছু ইচ্ছা ছিল না; তবে কার্য্যগতিকে দেখাটা হয়ে গেল।

মমতাজ। ব্যবসা কর্ত্তে তুমি আমার এখনে এসেছ! কি বল্‌ছ? তাইত আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না—(একটু ভাবিয়া) ওঃ এবার বুঝেছি তুমি তুমি—

সলেমান। হ্যাঁ কেউ কেউ আমাকে চোর বলে আবার কেউ কেউ আমাকে ডাকাত বলে। লোকে কে কি বলে তাতে আমার বড় একটা যায় আসে না। তবে এটা ঠিক আমি ওটার (মৃতদেহের দিকে দেখাইয়া) মত অত কাপুরুষ নই। আমি অসহায় স্ত্রীলোককে কখন আক্রমণ করি না।

মমতাজ। আমি ওকে খুন করেছি।

সলেমান। আমি সব দেখেছি, বিবিসাহেব, সব দেখেছি। ওকে খুন

করা বলে না। আত্মরক্ষা কর্ত্তে হত্যা কল্লে সেটা খুন করা হয় না।

মমতাজ। (অস্থিরভাবে) আমি এখন কি কর্ব্ব কিছু ঠিক কর্ত্তে পার্চ্ছি না।

সলেমান। ভয় কোরো না, বিবিসাহেব, ভয় কোরো না। এ গোলাম যখন হেথা হাজির আছে তখন এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে যাচ্ছে না। তোমার স্বামী ত এখনই আস্‌বেন। তিনি এলে তুমি তাঁকে বোলো যে, একটা চোর পিস্তল নিয়ে চুরি কর্ত্তে এসেছিল; তুমি জেগে আছ দেখে তোমায় গুলি কর্ত্তে এসেছিল। তারপর পিস্তলটা কাড়াকাড়ি কর্ত্তে গিয়ে পিস্তলটা আপনাআপনি আওয়াজ হয়ে যায়; তাতেই চোরটা মরে। আমি আমার আলোটা, পিস্তলটা, মুখোসটা, ব্যাগটা রেখে যাচ্ছি; আর দুটো একটা জিনিষ ওটার পকেটে পুরে দিচ্ছি। এবার আর তোমাকে কোন সন্দেহ কর্ব্বে না। (দুই একটা জিনিষ খসরুর পকেটে পুরিয়া দিল।)

মমতাজ। (টেবিল হইতে নোটের তাড়া লইয়া) এই লও আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ তোমায় দিচ্ছি।

সলেমান। তবে আমি চল্লুম—খুব সাহস করে যা বোলে গেলুম ঠিক তাই বোলো।

সলেমান (জান্‌লা দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া) হাঁ ওর চিঠিখানা একেবারে পুড়াইয়া ফেল; আর এক-দণ্ডও রোখো না।

[মমতাজ দেয়াশলাই লইয়া চিঠি পুড়াইল এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল]

মমতাজ। (ভীতস্বরে) ওই কে আস্‌ছে! এবার আমার কি হবে (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) আমার কি হবে হায়! কি কর্ব্ব?

সলেমান। (ধীর অথচ কঠোর স্বরে) কোনো ভয় নেই; স্থির হয়ে থাকো।

[মবারক ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃতদেহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া নিস্পন্দ-ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তাহার পর ভয়ে ও আশ্চর্য্য হইয়া]

মবারক। একি একি?

সলেমান। (ফিরিয়া) ঠিক হয়েছে মশাই যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

মবারক। কি হয়েছে? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। (পত্নীর দিকে চাহিয়া)

মমতাজ। (সলেমানের দিকে চাহিয়া) এঁকে সব কথা বুঝিয়ে দিন। আমি আর কথা কইতে পার্চ্ছি না।

সলেমান। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম। এই ঘর থেকে স্ত্রীলোকের চীৎকারধ্বনি শুনে আর স্থির থাকতে না পেরে জান্‌লা দিয়েই লাফিয়ে পড়ে এই ঘরে এলুম—এসে দেখলুম, আপনার স্ত্রীকে গুলি করবার জন্য এই চোরটা পিস্তলটা ঠিক করে ধরেছে। আমি এসে ওর কাছ থেকে পিস্তলটা জোর করে কেড়ে নিতে গিয়ে পিস্তলের ঘোড়াটা পড়ে গেল—ওর নিজের পিস্তলের গুলিতে ওটা মরে গে।—এক আঘাতেই শেষ।

মমতাজ। মবারক (সলেমানের দিকে দেখাইয়া) আমার জীবন আজ ইনিই বাঁচিয়েছেন। উনি যদি না আস্‌তেন তুমি তা হ'লে আর আমায় জীবিত দেখ্‌তে পেতে না।

সলেমান। ওর পকেট দেখ্‌লে বোধ হয়—দু' একটা জিনিষ বেরুবে। (ফুলদানীটা মৃতদেহের পকেট হইতে বাহির করিয়া)—এই যে দেখ্‌ছি কাযও কিছু করেছিল।

মবারক। আপনি আমার যে কত উপকার কর্লেন তাহা আর এক-মুখে স্বীকার করা যায় না। আপনার নামটি কি?

সলেমান। আমার নামধাম প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্ব না; মাফ কর্ব্বেন। সামান্য উপকার করে তাহার জন্য বাহাদুরি নেওয়া অতি ছোটলোকের কায। আপনি আপনার স্ত্রীকে আর এ ঘরে রাখ্‌বেন না; অন্য ঘরে নিয়ে যান। উনি আর এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌লে মূর্চ্ছা যেতে পারেন। আমিও যেদিক দিয়ে এসেছি, সে দিক দিয়ে যাই।

মমতাজ। (হার হস্তে লইয়া) আপনার ধার আমি আর এ জন্মে শোধ কর্ত্তে পার্ব্ব না। তবে যদি অনুগ্রহ করে এই উপহারটি লন।

সলেমান। (স্থিরভাবে) আমি গরীব বটে, কিন্তু উপকারের প্রত্যুপ-কার স্বরূপ কিছু নেব না—তবে এই ঘটনার চিহ্ন স্বরূপ (হার হাতে লইয়া) উটিকে রাখিয়া দিতে রাজি আছি।

মবারক। তা বেশ। (আপন অঙ্গুলি হইতে আংটি খুলিয়া) আমার

এই যৎকিঞ্চিত দান এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দিলে আমি সুখী হইব। (সলেমানের আংটি গ্রহণ।)

(মূর্চ্ছিতপ্রায় মমতাজকে লইয়া মবারকের প্রস্থান।)

(সলেমানের জানালা দিয়া প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

সংগ্রহ

বিবিধ।

—:•:—

কর্ম্মফল।
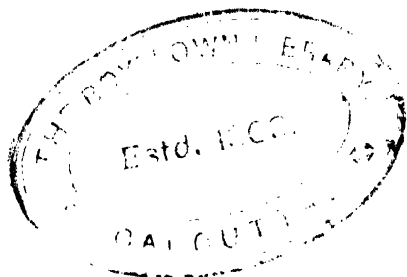
হিন্দুমাত্রই কর্ম্মফলে বিশ্বাসী। মানুষ যেরূপ কর্ম্ম করে, সেইরূপই ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহাই প্রাচীন ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। ইহজন্মের সুখ দুঃখ, ক্লেশ বিপাক সমস্তই অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই ফলস্বরূপ মানব কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ধনীর গৃহে জন্মিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে নানারূপ সুবিধা পাইতেছে; আর এক ব্যক্তি অতি দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়া-আমরণকাল প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতেছে,—ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। এই উভয়ের অবস্থাগত প্রভেদ,—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এই অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা, পাশ্চাত্য জড়বাদিগণের মতে অহেতুকী ঘটনা মাত্র। (mere accident) ইহার মূলে কোনও হেতু নাই। ঋষিগণের মতে ইহা অহেতুকী, নহে সহেতুকী ঘটনা। যে ব্যক্তি ধনীর ভবনে জন্মিয়া সমাজে নানারূপ আনুকূল্য পাইতেছে, সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই সেই সুবিধা লাভ করিয়াছে। আবার যে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বা বৃক্ষতলে জন্মিয়া জন্ম হইতেই প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতেছে,—সে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষেই আনুকূল্য লাভের সমস্ত দাবী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে পক্ষপাত নাই;—এখানে অকারণে কোনও ঘটনাই সংঘটিত হয় না, হইতে পারে না। কর্ম্ম ত্রিবিধ, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু যাহার ফল আরম্ভ হইতে বিলম্ব আছে, তাহাই সঞ্চিত কর্ম্ম। যে কর্ম্মে ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে কর্ম্মভোগের জন্ম দেহ ধারণ করা হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম বা প্রারব্ধ। আর যে কর্ম্মের ফল কতকটা ভোগ হইয়া গিয়াছে, কতকটা ভোগ হইতেছে, তাহাই ক্রিয়মান কর্ম্ম। এই কর্ম্ম রহস্ত অত্যন্ত বিস্ময়জনক। হিন্দুশাস্ত্রের বহু স্থানে এই কর্ম্মফলের বিষয় বর্ণিত আছে। য়ুরোপীয়-গণ কর্ম্ম-রহস্ত অবগত নহেন। কোন কোন য়ুরোপীয় ইদানীং হিন্দুর এই কর্ম্মফলবাদ অবগত হইয়া এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়াণ্টার কেরী নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়ার কর্ম্মফলবাদ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের বুঝাইবার প্রণালী অতি সুন্দর, এবং বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী। সেই জন্ম আমরা নিম্নে তাঁহার সুন্দর সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিলাম।

কাপ্তেন কেরী বলেন, কর্ম্মের সহিত অদৃষ্টের কারণ-কার্য্য সম্বন্ধ। শুভকর্ম্ম শুভা

দৃষ্টের জনক; অশুভ কর্ম্ম অশুভ অদৃষ্টের জনক। আমি অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করি, সেইরূপ ব্যবহারদ্বারা আমি সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্তির দাবীর সৃষ্টি করি। কিন্তু ঠিক যে কর্ম্মটি করিয়াছি, আমার প্রতি ঠিক সেই কর্ম্মটিই যে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা নহে। তবে আমি যে বেদনাটুকু দিয়াছি, ঠিক সেই পরিমাণ বেদনাটুকু আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। আমি যদি জন্মান্তরে কোন নিরীহ ব্যক্তির হাত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকি;—তাহা হইলে এ জন্মে যে আমার হাতই ভাঙ্গিবে তাহা নহে। কিন্তু হাতভাঙ্গার ফলে সে ব্যক্তি যে পরিমাণ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াছে, আমাকে সেই পরিমাণ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্মের দ্বারা মানব যে ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহা সে একেবারে অধিক পরিমাণে পাইতে পারে, অথবা অল্পে অল্পে বহুদিন ধরিয়া তাহা পায়। বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মদ্বারা মানুষ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের ফলকে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হয়।

কর্ম্মফলের রূপ।

কর্ম্মফল অধ্যাত্ম জগতের ব্যাপার। জড় বিজ্ঞানের নিয়মের ন্যায় আধ্যাত্মিক নিয়ম ঈশ্বরের সৃষ্ট। বিদ্যুৎ, উত্তাপ, জল প্রভৃতি সম্পর্কিত নিয়মগুলি যেমন বিধির বিধান,—কর্ম্মফলের নিয়মগুলিও সেইরূপ। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কি প্রকারে এই আধ্যাত্মিক নিয়মগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারে যায়? এ সম্বন্ধে কাহার উক্তির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে? ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে এই কথাই বলা যাইতে পারে, যেসকল মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছেন,—তাঁহারাই যেমন জড়বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর আবিষ্কর্ত্তা,—সেইরূপ যাঁহারা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় কালক্ষেপ করিয়াছেন,—তাঁহারাই কর্ম্মফলের নিয়মাবলীর আবিষ্কারক। যাঁহারা এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাহাদের যে দেশে উহার অনুশীলন হইয়াছে, সেই দেশে গমন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ইহার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য,—অথবা ঐ সম্বন্ধে পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও তদনুসারে উহা পরীক্ষা করা বিধেয়। যদি পরীক্ষাদ্বারা ঐ নিয়মানুযায়ী ফললাভ হয়, তাহা হইলে ঐ আধ্যাত্মিক নিয়ম সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইবে।

সত্যতার প্রমাণ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে আধ্যাত্মিক ব্যাপার অত্যন্ত রহস্যময়। উহা মানববুদ্ধিগম্য নহে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক ঐরূপ কথাই শ্রুত হইত। তখন লোক বলিত, মানবের পক্ষে প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ভিন্ন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। এখন ঐ উক্তি লোক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। প্রাচ্যখণ্ডে মহাত্মগণ কর্ত্তৃক যুগ যুগান্তর ধরিয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তথাকার লোক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে সেই সকল তথ্য সত্য কি মিথ্যা,তাহার পরীক্ষা করা যায়। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক নিয়মনির্দ্দেশকালে একথা কখনই বলেন। যে, যে সে সম্বন্ধে তাঁহারা তাঁহাদের শেষ কথা বলিয়াছেন। নূতন তথ্য পাইলে তাঁহারা তাহাদের উক্তির পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কারণ

বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম।

বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী মানবেরই আবিষ্কৃত। সময়ে সময়ে উহার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। রেডিয়ম আবিষ্কারের ফলে রসায়ন শাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কর্ম্ম-ফল সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে আমাদের মতও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কর্ম্ম-ফলে বিশ্বাস করিলে সংসারে অনেকে কষ্টের লাঘব হয়, সুখ বৃদ্ধি পায় ও মানব আপনাকে সাধুতার পথে পরিচালিত করিতে পারে।

অসভ্য ব্যক্তিরা যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকে, কর্ম্মফল সম্পর্কিত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞব্যক্তিরা সেইরূপ সভয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ দেখিলে অসভ্য জাতিরা উহা ভূতাদির কার্য্য মনে করিয়া ভীত হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা উহার কারণ অবগত আছেন, সেই জন্য তাঁহারা গ্রহণদর্শনে ভীত হয়েন না। কর্ম্মসম্পর্কিত-ব্যাপারের অনভিজ্ঞতার ফলে ঐরূপ বিভীষিকা জন্মিয়া থাকে। কর্ম্মফল সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুর্ভাগ্যের কারণ অনুমান করিতে পারে না; সেই জন্য তাহারা আপনার ও আত্মীয় স্বজনের বিপদাশঙ্কায় সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে। টাইটানিক জাহাজ বারিধি সলিলে সমাধিপ্রাপ্ত হইলে সেই জন্য অনেকে আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিলেন বিপৎপাতের সমস্যা যুগযুগান্তর ধরিয়া মনুষ্যবুদ্ধিকে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মফলবাদ জানিলে তাঁহারা এ কথা বলিতেন না।

অজ্ঞতার ফল।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভগবান কি উদ্দেশ্যে এই কর্ম্মফলসম্পর্কিত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন? কেনই বা তিনি উহা মানববুদ্ধির অগোচর রাখিয়া দিলেন? কাপ্তেন কেরী নাবিক জীবনের উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। নৌবিভাগে কতকগুলি বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তিত আছে। যুবক যখন নৌবিভাগে নাবিকের কার্য্য করিতে যায়, তখন সে কতকগুলি অদ্ভুত ও অপরিচিত নিয়মের অধীন হয়। সেই বিধি নিষেধের মধ্যে থাকিয়া, দেখিয়া ও ঠেকিয়া, তাহার নাবিক-জীবন গঠিত হইয়া থাকে। শিক্ষানবীশদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিয়া যাহাতে শিক্ষানবীশগণ আত্মচেষ্টায় দক্ষ নাবিক হইতে পারে, তাহারই জন্য ঐ সকল নিয়মকানুন রচিত হইয়াছে। শিক্ষকের ও শাসকের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষানবীশদিগকে,—কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা বলিয়া দেওয়া সম্ভবে না,—আর বলিয়া দিলেও তাহাতে চরিত্র গঠিত হয় না। যে মানুষ আত্মচেষ্টায় বিধিনিষেধ ও কার্য্যফল বুঝিয়া নিয়মানুবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে, তাহারই চরিত্র সুগঠিত হয়। সাধারণ পার্থিব ব্যাপারেই পরিলক্ষিত হয় যে যে ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, এবং যাহারা নিয়মপালন করে তাহাদিগকে পুরস্কৃত ও যাহারা নিয়মভঙ্গ করে তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন,—কিন্তু সকলকেই কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা দেন—সেই ক্ষেত্রেই বিশ্বস্ত ও যোগ্য ব্যক্তি প্রস্তুত হয়। ভগবানের নিয়মও ঠিক ঐরূপ।

কর্ম্মফলের উদ্দেশ্য।

নাবিকগণ যাহাতে বুদ্ধিমত্তার সহিত চিন্তা ও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই

পৃথিবী কর্ম্মভূমি।

নৌ-বিভাগের নিয়ম পরিকল্পিত। মানব যাহাতে বুদ্ধিমত্তার সহিত চিন্তা ও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত। সুশিক্ষিত নাবিক সৃষ্টি করাই নৌজীবনের উদ্দেশ্য; আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য। ক্রমোন্নতিই ভগবানের অভিপ্রেত। প্রাকৃতিক নিয়মের ফলেই ক্রমোন্নতি হয়; আধ্যাত্মিক নিয়মপ্রভাবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। এই নিয়মগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকেই সদাচার বলা যায়।

পুনর্জ্জন্ম বাদ স্বীকার করিলে কর্ম্মফলবাদ বুঝিয়া উঠা সহজ হইয়া পড়ে। এই উভয় মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে জগতের অনেক দুর্ব্বোধ্য সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। মানবাত্মার সুদীর্ঘ জীবনের তুলনায় মানব-জীবন অতি অল্পদিনস্থায়ী। শিক্ষার জন্য মানবাত্মাকে বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মানব আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মে এবং বিভিন্ন দেশে জন্মিয়া তাহার পার্থিব শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়া কোনও উন্নত স্থানে চলিয়া যায়। পুনর্জ্জন্মবাদ ও কর্ম্মফলবাদ দ্বারা মানব জাতির পার্থক্যের কারণ উপলব্ধ হয়। মানবের অমর আত্মার বিকাশের তারতম্য অনুসারে উহার বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই মানব প্রতিভাশালী, ধীমান, নির্ব্বোধ পীড়িত ও অঙ্গহীন হইয়া থাকে। এই দুইটি তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে কেহ আর ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্বের আরোপ করিতে পারে না।

পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফল।

কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করেন যে যদি পুনর্জ্জন্ম-বাদই সত্য হইবে তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি থাকে না কেন? কাপ্তেন কেরী ইহার উত্তরে বলেন,—জাতিস্মর হইবার যোগ্যতা আমাদের নাই। জন্মান্তরে যাহারা আমার মহৎ অপকার করিয়াছে, বিশেষ ক্লেশ দিয়াছে, ইহ জন্মে সে তাহার আমারই অধীন, আমারই আশ্রিত হইতে পারে। আমার যদি সেই পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে কি আমি ক্ষমা করিতে বা আনুকূল্য করিতে পারি? যে ভীষণ নারকী জন্মান্তরে বহুলোককে অতি নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়িত করিয়াছে, এবং সেই কর্ম্মফলে আশ্রয়হীন অবস্থায় জন্মিয়াছে,এবং জন্মিয়া তাহা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের অনুগ্রহভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, জন্মান্তরের স্মৃতি থাকিলে তাহার পক্ষে কি জীবন ধারণ করিয়া ইহজন্মের কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় করিবার সুবিধা জন্মিত? সুতরাং; এই বিস্মৃতই কি মঙ্গলজনক নহে? আমরা যখন আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত স্মৃতিলাভের যোগ্যতালাভ করিব,তখন ভগবান আমাদিগকে সেই স্মৃতি প্রদান করিবেন।

আপত্তি খণ্ডন

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভগবান স্বয়ং কি জীবের প্রত্যেক কার্য্যের বিচার করিয়া শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন? না। ঈশ্বর নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। অতিশয় বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও শক্তির উপর সেই নিয়ম অনুসারে দণ্ড বা শাস্তি দিবার ভার ন্যস্ত আছে। কোন্ কোন্

পুরস্কার ও তিরস্কার

কর্ম্মের ফল ইহ জীবনে ভোগ করিতে হইবে, কোন্ কর্ম্মের ফল জন্মান্তরে ভোগ করিতে হইবে, তাহা সেই ভগবানের নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মজনিত তিরস্কার বা পুরস্কার অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কতকগুলি লোক ইহজীবনের সমস্তই ভাগ্য বা কিস্‌মতের ফল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যদি কর্ম্মফলের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহা হইলে একথা অনেকটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রথম প্রারব্ধ কর্ম্ম; জীব জন্মান্তের যে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, সেই কর্ম্মের ফলে জীব ইহ জীবনের চরিত্র, জন্মগত অবস্থা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহার শক্তিকে প্রতিহত করিবার কাহারও সাধ্য নাই। দ্বিতীয়তঃ দৈনন্দিন অনুষ্ঠিত কর্ম্ম। প্রতিদিন বাক্য ও মনের দ্বারা আমরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশ কর্ম্মফল আমাদিগকে এই জীবনেই ভোগ করিতে হয়। অদৃষ্টের বার আনাই এইরূপ কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার উপর আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান।

কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। চিন্তাকে সংযত করিবার কথা অনেকের নিকট নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা সংযত না

চিন্তা ও কর্ম্ম।

হইলে কার্য্যও সংযত হয় না। কার্য্য চিন্তারই অনুরূপ হইয়া থাকে। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে গৃহের নক্সা মনে মনে 'ছকিয়া' লইতে হয়। চিন্তায় দোষ থাকিলে কার্য্যে সে দোষ প্রতিফলিত হইবে। দুষ্ট মতলব কখনও সুকার্য্য প্রসব করিতে সমর্থ নহে। যে যুদ্ধ জাহাজের নাবিকগণ অশিক্ষিত তাহারা যুদ্ধকালে লক্ষ্য না করিয়া বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া গোলানিক্ষেপ করে, তাহার ফলে তাহারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষিত নাবিকগণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া গোলার 'পাল্লা' ঠিক করিয়া কেবলমাত্র আবশ্যক পরিমাণ গোলা নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। ইহার ফলে তাঁহারা জয়যুক্ত হন। চিন্তাকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। চিন্তা কর্ম্মের প্রসূতি। সুতরাং চিন্তার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চিন্তাকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইলে ক্রমোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ভগবান মানুষকে ক্রমোন্নতির দিকে প্রধানতঃ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যে চিন্তা ক্রমোন্নতির সহায়ক, সে চিন্তাই সুচিন্তা ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

কাপ্তেন ওয়াল্টার কেরী য়ুরোপীয় হইয়াও কর্ম্মফলের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত

আমাদের মন্তব্য।

করিয়াছেন কিন্তু; শাস্ত্রে কর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা আমরা মুখবন্ধেই বলিয়াছি। কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের, যে কর্ম্মের ফলপ্রসবে বিলম্ব আছে সেই কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। আর এক কথা য়ুরোপীয়েরা (বিশেষতঃ মিশনরীরা) কর্ম্মফলবাদের বিরুদ্ধে এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে কোন ব্যক্তি যখন কুকর্ম্ম করে, তখন সে সেই কর্ম্মের ফলভোগ করে না। পরে যখন সে সেই কর্ম্মের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, সে সেই দেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, তখন ভগবান তাহাকে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য দুঃখ দিয়া

থাকেন। এক ব্যক্তি বাল্যকালে দুষ্কৃতি করিল, কিন্তু তখন তাহাকে তিরস্কার না করিয়া পুরস্কৃত করা হইল; পরে সে যখন বৃদ্ধ হইল, অনুষ্ঠিত কুকর্ম্মের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল, তখন যদি তাহাকে সেই বাল্যে অনুষ্ঠিত কুকর্ম্মের জন্য আচম্বিতে শাস্তি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে আমরা কি তাহাকে সুবিচার বলিব? কোন গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করিলে কি আমরা তাহাকে সুবিচারক গবর্ণমেণ্ট বলিতে প্রস্তুত? যাঁহারা এই আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটা কথা বিস্মৃত হয়। মানুষ যখন শত চেষ্টা করিয়াও কোনও দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার না পায়, তখন সেই দুঃখকে ভগবৎ প্রদত্ত শাস্তি (Divine decree) বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; ইহা মানুষের স্বভাব। তখন সে স্বতঃই মনে করে যে কোন না কোন পাপের ফলভোগ করিতেছে। সেই জন্য সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই দুঃখ পাপেরই ফল এই বিশ্বাস স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টানগণও দুঃখ পাপেরই ফল, ইহা অস্বীকার করেন না, করিতে পারেন না"। What soever man soweth that shall he reap" ইহা খ্রীষ্টানদিগেরই কথা। তবে খ্রীষ্টানগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। সেই জন্য তাঁহারা মানবজাতি। আদিজনক আদমের পাপ ভোগ করিতেছে ইহা বিশ্বাস করেন। সুতরাং দুঃখের মূলে কুকর্ম্ম আছে এ বিশ্বাস মানবের স্বভাবসিদ্ধ। পিতার পাপের জন্য যদি কোন গবর্ণমেণ্ট পুত্রকে শাস্তি দেন, তাহা হইলে সেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য আমরা অত্যন্ত দুষ্ট ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু "ভগবানের প্রদত্ত শাস্তিপ্রভাবে ইহজীবনের দুঃখক্লেশ পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপের শাস্তি মনে করে বলিয়াই জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসী খৃষ্টানগণ আদি পিতামাতার পাপ কল্পিত করিয়াছেন। সুতরাং মানবজাতির বিশ্বাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে দুঃখ ক্লেশ পাপেরই ফল; অর্থাৎ মানব অপরিহার্য্য দুঃখ ভোগ করিবার সময়ই পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছে, ভগবান ইহা স্মরণ করাইয়া দেন বলিয়াই সর্ব্বদেশের মানবজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। য়ুরোপ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, সেই জন্য এই তথ্যটা ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না;—ন্যায়বুদ্ধির সহিত দুঃখ ভগবৎ প্রদত্ত শাস্তি এই বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করিতে পারেন না। তাহারা মনে করেন, মানুষ কেন দুঃখ পায় এই সমস্যার সমাধান করা মানববুদ্ধি দ্বারা সম্ভবে না। কেহ কেহ সামাজিক ব্যবস্থার উপরে সকল দোষের আরোপ করিতে চাহেন সেইজন্য সমগ্র য়ুরোপ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সমাজ বিপ্লবের ফলে সামাজিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইতেছে, কিন্তু সমাজ হইতে দুঃখ নির্ব্বাসিত হইতেছে না। সমাজের গাত্রে দুঃখ জীর্ণ মন্দির গাত্রস্থ বটবৃক্ষের ন্যায় আপনার মূল দৃঢ় প্রোথিত করিয়া দিতেছে। ভগবান যদি মানুষকে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে সমাজে ঘোর গোলযোগের উদ্ভব হইত, ইহা কাপ্তেন ওয়াণ্টার কেরী সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিব না। ফলে ভগবানের নিয়ম কখনই অনর্থক হইতে পারে না। একটু নিবিষ্টচিত্তে এই দুরূহ বিষয় চিন্তা না করিলে ইহার সমাধান করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং সমস্যা সমাধানেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই বিষয়টি ঐকান্তিকতার সহিত আলোচনা করিয়া দেখিবেন।
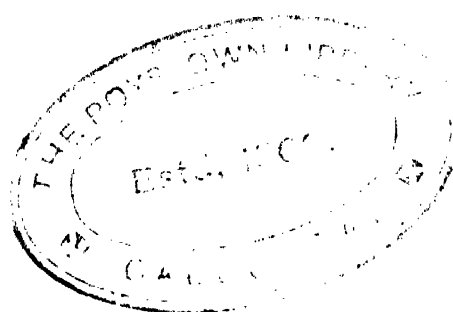
আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদিত।

তৃতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

১৩১৯

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবন্ধের বর্ণমালানুক্রমিক সূচী।

——:*:——

চ

জ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

স

বুদ্ধ গয়া

(১)

বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল তীর্থে ভারতের নানা স্থান হইতে হিন্দু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে সে সকলের মধ্যে গয়া আমাদের যত নিকটস্থিত এক বৈদ্যনাথ ব্যতীত আর কোন তীর্থই তত নিকটস্থিত নহে। পূর্ব্বে যখন ভারতে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই—বাষ্পীয় যানের বা বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাব সূচিতও হয় নাই তখনও বাঙ্গালার স্নিগ্ধ পল্লী হইতে বর্ষে বর্ষে বহু নরনারী বিহারের কঙ্করকণ্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া গয়ায় বিষ্ণুপাদে মৃত স্বজনাদির পিণ্ডদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও পরলোকগত স্বজনগণকে মুক্ত মনে করিত। তখন "সুফল" প্রদানের অধিকারী গয়ালীদিগের কর্ম্মচারীরা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া "যাত্রী" সংগ্রহ করিত। তাহার পর বহু যাত্রী একত্র বিঘ্নবহুল পথ অতিক্রম করিত। তখন গয়ালীর কর্ম্মচারীর আগমনে শান্ত পল্লীগ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত। অন্তঃপুরচারিকাদিগের গুপ্ত পরামর্শ—পুরুষ অভিভাবকদিগের সম্মতিলাভের উপায়নির্দ্ধারণ প্রভৃতি তখন মহিলাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। তাঁহারা পুণ্য লাভের আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় পথশ্রমে অনভ্যস্তার ক্লেশসম্ভাবনার কথা ভুলিয়া যাইতেন। বাস্তবিক মানুষ ধর্ম্মের জন্য যে ক্লেশ—যে যাতনা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে পার্থিব কিছুরই জন্য সে ক্লেশ—সে যাতনা সহ্য করিতে পারে না।

এখন দেশের সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করা দূরে থাকুক এখন আর কেহ সুগঠিত ও সুরক্ষিত রাজপথে অশ্বযানে বা গোযানে গয়ায় গমনের কথাও মনে করে না। রেলপথের বিস্তারহেতু গয়া এখন নিতান্তই "ঘরের কাছে" হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা হইতে যাইতে এখন গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে যাওয়াই সুবিধা। পথ রম্যদর্শন। প্রথমে দুই পার্শ্বে কেবল সমতল ভূমি—শ্যামশস্যপূর্ণ—প্রাচুর্য্যের পরিপূর্ণ প্রফুল্লতায় প্রহৃষ্ট,—দূরে চক্রবালরেখায় প্রান্তর ও অম্বর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ;—মধ্যে মধ্যে পল্লবশ্রীসুন্দর বৃক্ষ—বৃক্ষের শ্যাম শোভার মধ্যে বংশ-

গুল্মবেষ্টিত বাঙ্গালার গ্রাম ; স্নিগ্ধ—শান্ত—সুন্দর। মাঠে কৃষক কায করিতেছে—কৃষক-বালক গোপাল চরাইতেছে। সমস্ত পথে কোথাও মাঠে কোন রমণীকে কঠোর শ্রমে রত দেখিতে পাইবে না। গৃহ তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র—তাহারা গৃহের লক্ষ্মী। তাই পুরুষ তাহাকে গৃহের ভার দিয়া সানন্দে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতেছে। আপনার স্বেদে তপ্ত ভূমি সিক্ত করিয়া সে নিদাঘের মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডতাপেও ভূমি কর্ষণ করে,—বর্ষার অবিরল ধারায় সিক্ত হইয়া জলৌকাবহুল প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সে ধান্য রোপণ করে,—দারুণ হিমে সে বিনিদ্র হইয়া রজনীতে শস্যক্ষেত্র আগুলিয়া থাকে। সংসারের শ্রম তাহার, গৃহস্থালী রমণীর। এ উদারতা প্রতীচ্যে কোথায়? অবরোধ প্রথা পুরুষের স্বার্থপরতার পরিচায়ক, না স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়?

তাহার পর ভূমির মূর্ত্তি ও প্রকৃতি, বর্ণ ও বৈষম্য পরিবর্ত্তন প্রকাশিত করে। প্রান্তরে সরসতার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়, পাদপপত্রে বর্ণের গাঢ়তায় পরিবর্ত্তন দেখা যায়—গুল্মের বিরলতা ধরিত্রীর স্নেহের অভাব সূচিত করে। ক্রমে ভূমি কঙ্করাকীর্ণ দেখা যায়। আর দূরে মেঘের কোণে গাঢ়তর মেঘের মত গিরশ্রেণী দেখা দেয়। প্রকৃতি জীবের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রান্তরে কৃষিকার্য্য শ্রমসাপেক্ষ পর্জ্জন্যের পর্য্যাপ্ত অনুগ্রহও শস্যোৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নহে, তাই মানুষকে ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়া শস্যোৎপাদন করিতে হয়। যে স্থানে খালে বা খাতে জল নাই সে স্থানে কূপ হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্র সিক্ত করিতে হয়। এই দারুণ শ্রমে রমণী পুরুষের সাহায্য করে। ক্ষেত্রে মলিনবাস শ্রমজীবীর পার্শ্বে শ্রমশীলা রমণীর মূর্ত্তি দেখা দেয় ; তাহার রঞ্জিত বাস প্রান্তরদৃশ্যে বৈচিত্র্যসঞ্চার করে।

ক্রমে ট্রেণ পর্ব্বতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কোথাও পর্ব্বত কাটিয়া পথ—দুই পার্শ্বে উচ্চ গিরি, মধ্যে পথ ; গিরিগাত্রে লতাগুল্ম। কোথাও বা শীর্ণ জলধারা শিলা বাহিয়া ঝরিতেছে। কোথাও পর্ব্বতের পদে ঘুরিয়া, কোথাও পর্ব্বতের উপর দিয়া, কোথাও বা খাতপথে বা সুরঙ্গে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বৃহৎ উরগের মত ট্রেণ চলিতে থাকে।

প্রথমে পর্ব্বতাঙ্গে বৃক্ষলতাগুল্মের শ্যাম শোভা ; ক্রমে গিরিগাত্রে বৃক্ষলতার বিরলতা লক্ষিত হয়। শেষে ট্রেণ যখন গয়ায় আসিয়া উপনীত হয় তখন পর্ব্বতাঙ্গে শিলাখণ্ডেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

চারি দিকে গণ্ড শৈল গয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি—নানা পর্ব্বতে গয়া পরিবেষ্টিত। পর্ব্বতের শিরোদেশে প্রায়ই মন্দির দৃষ্ট হয়।

রামশিলা গয়ার উত্তরে অবস্থিত। এই গণ্ডশৈল ৩৭২ ফিট উচ্চ। ইহার চূড়ায় 'পাতালেশ্বর' মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের উপরার্দ্ধ দেখিয়া পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি দিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিম্নাংশে প্রায় ১০ ফিট পুরাতন—সম্ভবতঃ ১০১৪ খৃষ্টাব্দে (১০৭১ সম্বৎ) নির্ম্মিত। মন্দিরগাত্রে এই কালপরিচয় উৎকীর্ণ। পূর্ব্বে পর্ব্বতে উঠিবার সোপান সুগঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে সুগঠিত সোপানশ্রেণী পর্ব্বতমূল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত; ৩২৯ টি ধাপ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপনীত হইতে হয়। এই সোপান-শ্রেণী ১২৯২ সালে "টিকারির শ্রীযুক্ত রাজা রণবাহাদুর সিংহ নির্ম্মিত।" সোপানশ্রেণীর সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু মধ্যপথে বিশ্রামগৃহটির জীর্ণসংস্কার একান্তই প্রয়োজন।

রামশিলা হইতে একটি সুগঠিত রাজপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রেতশিলার পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বত ৫৪১ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতে প্রেত-শান্তির জন্য পিণ্ড প্রদত্ত হয়। পর্ব্বতোপরি অহল্যাবাইর প্রতিষ্ঠিত মন্দির বিদ্যমান।

গয়ার দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বত। ইহাই পুরাণ-প্রসিদ্ধ কোলাহল গিরি। পর্ব্বতের উচ্চতা ৪৫০ ফিটের অধিক নহে। পর্ব্বতোপরি শক্তিমন্দিরে শক্তির পঞ্চমুণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু দেব রাও ভাও সাহেবের ব্যয়ে পর্ব্বতমূল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দির-মধ্যস্থিত মূর্ত্তির বেদীতে উৎকীর্ণ শ্লোকে জানা যায়, বেদীটি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু মূর্ত্তি তত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে, শাক্যসিংহ বুদ্ধের অবস্থান স্মরণীয় করিবার জন্য বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এই গিরিশিরে শত ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিউয়েন্থ সাং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে গয়ায় আসিয়াছিলেন। তখন আর সে স্তূপের চিহ্নও বিদ্যমান নাই। তাহার পূর্ব্বেই ব্রহ্মযোনি শৈল হিন্দু তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

গয়ায় বাঙ্গালীরা ৪৫ স্থানে পিণ্ডদানাদি করিয়া থাকেন। এই কার্য্য

দীর্ঘকালসাপেক্ষ। তাই আজ কাল অনেকে ফল্গুর বালুবক্ষে, বিষ্ণুপাদে ও অক্ষয়বটমূলে পিণ্ড দিয়াই গয়ালীর নিকট "সুফল" (সফলতা) লইয়া থাকেন।

গয়া ফল্গুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ফল্গু পার্ব্বত্য নদী—অন্তঃসলিলা। নদীগর্ভে বালুবিস্তার—স্থানে স্থানে সামান্য জল বাধিয়া আছে। এই ফল্গুর পরপার হইতে গয়া সহর অতি সুন্দর দেখায়—কূলে গৃহশ্রেণী—মধ্যে মধ্যে মন্দিরচূড়া। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান মন্দির বহু দিনের নহে। ইহা অহল্যাবাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, এই মহারাষ্ট্রীয় রাণী গয়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠায় ১৬,০০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মন্দিরনির্ম্মাণে ৯,০০,০০০ টাকা ব্যয়িত হয়; অবশিষ্ট অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইয়াছিল।* এই মন্দির ধূসর প্রস্তরে গঠিত। মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান অংশ একটি মণ্ডপ মাত্র। গুচ্ছ গুচ্ছ স্তম্ভোপরি গম্বুজ—প্রতি গুচ্ছে চারিটি স্তম্ভ—স্তম্ভগুলি দুই স্তরে সজ্জিত। গর্ভগৃহ অষ্টকোণ ও চূড়াকৃতি। এই গৃহমধ্যে প্রস্তরে পদচিহ্ন—ইহাই গয়াসুরের শিরোপরিস্থ ধর্ম্মশিলায় বিষ্ণুর চরণচিহ্ন। মন্দিরের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বিরাজিত। ইহা নেপালের রাজমন্ত্রী রণজিত পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মন্দিরের প্রবেশপথে আর একটি ঘণ্টা আছে—তাহাতে লিখিত, "বিষ্ণুপাদে মিষ্টার ফ্রান্সিস গিলানডার্স কর্ত্তৃক অর্পিত। গয়া, ১৫ই জানুয়ারী, ১৭৯৮"। গিলানডার্স বহুদিন গয়ায় যাত্রী-শুল্কের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

বিষ্ণুপাদের সন্নিকটে গদাধরের মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি শীর্ষাভরণহীন স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ হইতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমণের পথ আরব্ধ।

অদূরে সূর্য্যমন্দির। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব-বাহিত যানে আসীন। কিছু দূরে "অক্ষয় বট"—মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

গয়ায় বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সকলের অধিকাংশই পাল রাজাদিগের সময়ের। পাল রাজগণ বারাণসী, মগধ ও বাঙ্গালা শাসন করিতেন। সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার প্রভুত্বচ্যুত করিলেও তাঁহারা মুসলমান বিজয়কাল পর্য্যন্ত মগধের অধিপতি ছিলেন।

* বুকানন বলেন, মন্দিরনির্ম্মাণে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

গয়ায় বৌদ্ধ মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল মূর্ত্তি গয়ার ছিল, কি নিকটবর্ত্তী বুদ্ধ গয়া হইতে আনীত তাহা স্থির করা অসম্ভব।

বাস্তবিক গয়ায় হিন্দুবৌদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতের স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য-সাধন। কিম্বদন্তীর ফেনপুঞ্জতলে ঐতিহাসিক সত্যের শীর্ণ ধারার চিহ্ননির্ণয় এত দিন পরে আর সম্ভব নহে। তবে গয়া যে বৌদ্ধ প্রাধান্যকালে বৌদ্ধদিগের প্রচারকেন্দ্র ও পুণ্যতীর্থ ছিল বর্ত্তমান গয়ানগরের উপকণ্ঠস্থিত বুদ্ধ গয়ার মন্দির, মূর্ত্তি, স্তূপ প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ।

বৌদ্ধদিগের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষে চারিটি তীর্থ বিশেষ সমাদৃত। বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে সমগ্র এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ছিল। এখনও এসিয়ায় নানা রূপে তাহার বিস্তার সামান্য নহে। বিশেষ বৌদ্ধধর্ম্ম এসিয়ায় শিল্পে ও সাহিত্যে যে প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছে তাহা অক্ষয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ, বহু শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনেও তাহার বিলোপ সংসাধিত হয় নাই। এই চারিটি স্থান সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রথম প্রচারক শাক্যসিংহের জীবনের চারিটি ঘটনার লীলাভূমি; (১) কপিলবস্তু—বুদ্ধের জন্মস্থান, (২) উরুবিল্ব—বুদ্ধের সন্ন্যাসভূমি, (৩) বারাণসী—বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারস্থান, (৪) কুশী—বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভভূমি। পঞ্চদশশত বৎসর বৌদ্ধগণ এই চারিটি তীর্থে গমন করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার উরুবিল্ব ও বারাণসী সমধিক সমাদৃত ছিল। বর্ত্তমান কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক নেপালে সে ধর্ম্ম আত্মপরিচয় দিতে পারে, অন্যত্র তাহা ক্রিয়াকলাপে বিকৃত অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তাহা যে হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা নহে, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধ পুরাণে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের উল্লেখ আছে, উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হইলেই প্রচলিত ধর্ম্মমতের সহিত তাহার বিরোধ অনিবার্য্য। যখন রাজ্যত্যাগী রাজপুত্রের প্রচারিত ধর্ম্ম প্রচলিত ক্রিয়া-কাণ্ডের নিন্দা করিয়া—বর্ণাশ্রমের মূল শিথিল করিয়া—গৃহস্থকে গৃহত্যাগী করিয়া—শত শত নরনারীকে নির্ব্বাণের কথা শুনাইতে লাগিল—আর নরনারী চূতকুলগন্ধাকৃষ্ট মধুমক্ষিকার মত সেই ধর্ম্মমতে আকৃষ্ট হইতে লাগিল তখন হিন্দু সমাজ যে চঞ্চল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজানুগৃহীত হিন্দু সমাজের সে চাঞ্চল্য যে একান্তই নির্ব্বিরোধীভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এমনও বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধনিপীড়নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘাতের প্রতিঘাত কিরূপ হইয়াছিল সে কথার উল্লেখ ইতিহাসে নাই। কিন্তু শিলালিপি ও শিল্পনিদর্শন সে বিষয়ে আর অধিক দিন সত্য গোপন রাখিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

ইহার পর বৌদ্ধ শ্রমণগণ তুষারমণ্ডিত হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়া, মরু পার হইয়া যে সকল দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন সে সকল দেশে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার কল্পনাও বোধ হয় শাক্যসিংহের মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন আরব্ধ হইয়াছিল। শাক্যসিংহ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে তাহাকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। রাজ্যত্যাগী রাজপুত্রের আদর্শে ও উপদেশে যে ধর্ম্মমত বিস্তারলাভ করিয়াছিল; সাধারণের বোধ্য ভাষায় যে ধর্ম্মমতের সার সত্য প্রচারিত হইত*, শাক্যসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আঘাতে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এদিকে সে ধর্ম্মে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানে ও ধ্যানে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ অসম্ভব; অজ্ঞানের জন্য দৃশ্যমান আদর্শের প্রয়োজন হয়। হিন্দুর সাকারোপাসনা সেই জন্যই নিরাকারের স্বত্বানুভবের সোপান। যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক ব্যবহারের বিরোধী হইয়াছিল সেই বৌদ্ধধর্ম্মেই ক্রমে মূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তন হইল; বুদ্ধ, বোধিসত্ত, পৃথিবী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা আরব্ধ হইল। বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—মন্দির ছিল না। প্রসিদ্ধ শ্রমণগণের দেহভস্মের রক্ষার্থ গৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। প্রথমে সে সকল গৃহ কারুকার্য্যহীন ছিল—ক্রমে তাহাতে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল—কারুকার্য্যের বাহুল্য তাহার অভাবের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। চৈত্যগাত্রে মূর্ত্তির স্থান হইল—চৈত্যমধ্যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের গৃহে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশাধিকার পাইল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবল হইতে লাগিল। শেষে শঙ্কর-বিজয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল। মাতৃকল্পা মহাপ্রজাপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মহিলাদিগকে স্বীয় প্রবর্ত্তিত

* কুল্লভগ্‌গ।

ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় শাক্যসিংহ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—আনন্দ, এই ধর্ম্মে যদি রমণীর প্রব্রজ্যার ব্যাবস্থা না থাকিত, তবে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত—সহস্র বৎসর অটুট থাকিত; কিন্তু যখন ইহাতে রমণীর প্রবেশাধিকার হইল তখন ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না—ইহার পরমায়ু পঞ্চশতবর্ষের অধিক হইবে না। শঙ্কর-বিজয়ে শাক্যসিংহের সেই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল।

কিন্তু তখন বৌদ্ধ মত সিংহদ্বারপথে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে না পারিলেও পশ্চাতের দ্বারপথে সে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের উদার বক্ষে স্থায়ী স্থান লাভ করিল; বৌদ্ধ তীর্থ হিন্দুর তীর্থে পরিণত হইল; শাক্যসিংহ হিন্দুর অবতারমধ্যে পরিগণিত হইলেন। জয়দেবের স্তোত্রে বুদ্ধের বর্ণনা—

"নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতি-জাতং
সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশু-ঘাতং
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর, জয় জগদীশ হরে।"

নিন্দা কর শ্রুতিজাত যজ্ঞবিধিচয়
লক্ষ্য করি' পশুঘাত সদয়-হৃদয়,
কেশব উরিলা যবে বুদ্ধরূপ ধরি'।
জয় জয়; তব জয়, জগদীশ হরি।

শাক্যসিংহের জীবনকথা সম্বন্ধে 'ললিত বিস্তর' বিশেষ প্রামাণ্য পুস্তক। তাহাতে প্রকাশ, ব্যাধিত, জরাগ্রস্ত ও মৃত মানব দেখিয়া শাক্যসিংহ সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন; এবং মানবকে এই সকল স্বাভাবিক বিকারমুক্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীর চিত্তে শান্তি বিরাজিত মনে করিয়া তিনি সেই শান্তির সন্ধানে সন্ন্যাসী হয়েন। তিনি প্রথমে কোন শাক্য ব্রাহ্মণীর আশ্রমে উপনীত হয়েন ও তথা হইতে পদ্মার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ব্রহ্মর্ষি রৈবতের ও রাজকের আশ্রম হইয়া ক্রমে বৈশালী নগরে কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। সে শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি রাজগৃহে আসিয়া পাণ্ডব পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া সপ্ত শত শিষ্যবেষ্টিত রুদ্রকের শিষ্য হয়েন। তাঁহার শিক্ষাতেও শাক্যের অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হইল না। তখন তিনি

গয়ায় গমন করেন। রুদ্রকের আর পাঁচজন শিষ্য তাঁহার সহগামী হয়েন। গয়ায় বা ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে অভীপ্সিত কার্য্যের সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব গ্রামে উপনীত হয়েন এবং ষড়বার্ষিক ব্রত পালন করেন। ব্রত উদ্যাপন করিয়াও যখন তিনি শান্তি পাইলেন না, তখন তিনি বুঝিলেন, তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন সে পথ প্রকৃত পথ নহে। তিনি আহার্য্যের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আহার্য্যের জন্য গৃহস্থের দ্বারে যাইতে হইলে বসনাবৃত হইতে হয়। তাঁহার জীর্ণ বাস নষ্ট হইয়াছিল। তিনি শ্মশানে শবদেহ হইতে বসন সংগ্রহ করিলেন।

তাহার পর নিরঞ্জনার জলে স্নানে স্নিগ্ধ ও সুজাতাপ্রদত্ত আহার্য্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তিনি বোধিদ্রুমতলে প্রাণপণ করিয়া মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মারপ্রদর্শিত সকল প্রলোভন পরিহার করিয়া তিনি এই স্থানে দিব্য জ্ঞান লাভ করেন; এবং এই স্থান হইতেই তিনি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জগৎকে জ্ঞানজ্যোতিতে ভাস্বর করিবার জন্য বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই উরুবিল্বই বর্ত্তমান বুদ্ধ গয়া।

এই স্থানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাই উত্তর কালে বৌদ্ধ নৃপতিবৃন্দ বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধের অবস্থান স্মরণীয় করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া উরুবিল্বকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এখনও তাহার নিদর্শন বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। এখনও ব্রহ্ম, সিংহলাদি বৌদ্ধপ্রধান স্থান হইতে বহু যাত্রী এই পুণ্য তীর্থে সমাগত হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধ গয়া হিন্দু মোহান্তের অধিকারে—হিন্দুর তীর্থে পরিগণিত।

সমাজনীতি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে "শক্তিশালীর প্রাধান্য" বা "Survival of the fittest" বলিয়া একটা কথা আছে। শুধু কথায় নহে, প্রতীচ্যবাসিগণের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি কার্য্যে, সমাজের প্রতি স্তরে, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অণু-পরমাণুতে ইহা এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে যে, যে দিকেই দৃষ্টি-পাত করা যায়, এই ভাবটি অতি উজ্জ্বল ভাবে চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া আমাদিগকে ইহার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র উপলব্ধ করাইয়া দেয়।

প্রধানতঃ পশুজগতেই আমরা এই প্রাধান্যনীতির দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাই। সিংহ মৃগশূকরাদি প্রাণী ধরিয়া আহার করে, যুথপতি প্রতিদ্বন্দীর ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকে। ডারউইনের মতে বানর আত্মরক্ষার্থ অনন্যোপায় হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদানকৌশল শিক্ষা করিয়াছে; বাজ, চিল প্রভৃতি হিংস্র পক্ষীর নিষ্ঠুর আক্রমণে অনেক প্রাণীকেই অকালে জীব-লীলা সম্বরণ করিতে হয়। "শক্তিই আমার স্বত্ব" এই নীতির বিষময় ফল বুঝিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত ইতর প্রাণীরা নিজ নিজ প্রকৃতিজাত ব্যবহার সংযত করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবগণ এই অনিষ্ট-কর নীতির দোষগুণ অবগত হইয়াও কি আপনাদের কার্য্যকলাপে অপেক্ষা-কৃত উদার নীতি অবলম্বন করিতে পারিয়াছে? শুধু জীবন ধারণের জন্য নহে, নিকৃষ্ট আমোদপ্রমোদের প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়াও, আমরা যে সব নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি, তাহা ভাবিলে অনেক সময় আমাদের সভ্যতায় ধিক্কার আসিয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য প্রাণী হইতে মানবই "শক্তিশালীর প্রাধান্য" এই নীতির শ্রেষ্ঠ উপাসক! কিন্তু ইতর প্রাণীদিগের সহিত ব্যবহারে মানব যে নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, স্বকীয় মঙ্গলার্থ তাহাকে সমাজে থাকিয়া অনেক সময়েই সংযত হইয়া চলিতে হয়। সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন প্রকার নৈতিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পৃথক পৃথক জাতিকে স্ব স্ব সুবিধানুরূপ নিজ নিজ সমাজে ন্যায়ের বিধান বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ এক দিকে চলিয়াছেন, আর আমরা প্রাচ্যদেশবাসী ভিন্ন পন্থা অবলম্বন

করিয়াছি। এই দুই পন্থার বিশেষত্ব প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, "শক্তিশালীর প্রাধান্য" এই নীতির উপরেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ও পারিবারিক জীবন গঠিত। আমরা পৃথক পৃথক ভাবে এই তিনটির আলোচনা করিব। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় জীবন। য়ুরোপ আজকাল শক্তিশালী, সসাগরা পৃথিবী তাহার পদানত। কিন্তু য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় জীবন কোন্ রীতি অবলম্বনে চলিতেছে? য়ুরোপ আমেরিকা আবিষ্কৃত করিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তথাকার আদি অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধিত হইল। আফ্রিকার অনেক প্রদেশে সেই সেই প্রদেশের লোকদিগের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই! পাশ্চাত্য দেশে "কালা আদমির" প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। এই সব কিসের অভিব্যক্তি? "শক্তিই আমার স্বত্ব," "তুমি অশক্ত অতএব তোমাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে" য়ুরোপ এই নীতির বিজয় ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

তাহার পর সামাজিক জীবন। য়ুরোপে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান না থাকিলেও স্ব স্ব অবলম্বিত বৃত্তি অনুযায়ী লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে হইয়াছে; যথা তন্তুবায় সম্প্রদায়, কর্ম্মকার সম্প্রদায় প্রভৃতি। কিন্তু এই সব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের বৃত্তির স্থিরতা আছে কি? আজ যদি কোন দেশে বর্ত্তমান বয়ন প্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর কোন প্রথা আবিষ্কৃত হয়, তবে ম্যান্‌চেষ্টারের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধিত হইবে। ঐ সম্প্রদায়ের কাহার কি হইল, কয়জন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিবে কি? অর্থাৎ আমি শক্তিশালী, অতএব আমাকে প্রাধান্য করিতে দাও তুমি যে দিন সমর্থ হইবে, আমাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিও—সমাজ ইহাই ঘোষণা করে।

শেষ পারিবারিক জীবন। আমরা ভাই, এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, একত্র প্রতিপালিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যদি দৈবগতিতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে না পার, তাহাতে আমার কিছুই ভাবিবার নাই। আমি সুখ ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিব, তোমার জন্য আমি কিছু করিতে বাধ্য নহি। পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবন এইরূপ ভাব লইয়া গঠিত।

প্রত্যেক কার্য্যেই দোষগুণ উভয়ই আছে; এই "প্রাধান্য নীতিতে"ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে এই নীতি অবলম্বন

করাতেই য়ুরোপ আজ পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছে। সামাজিক জীবনে এই নীতি অবলম্বন করাতে, প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠতর কিছু অবিষ্কার করিয়া অন্যের উপর প্রাধান্য-লাভের চেষ্টা করিতেছে; ইহাতেই শ্রমশিল্পে য়ুরোপ বর্ত্তমান যুগে প্রধান। আর পারিবারিক জীবনে এই নীতি অবলম্বিত হওয়াতে প্রত্যেকেই স্বীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। তাহাতে সমগ্র জাতিটা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কোন জাতি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি লইয়া আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন্ জাতি কতটা উদার ভাব পোষণ করে এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে কাহার কতটুকু দিবার আছে, তাহা প্রদর্শিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এখন আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। আর্য্যগণ মধ্যে এসিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা দিয়া যখন এ দেশে প্রবেশ করেন, তখন দ্রাবিড়, ভীল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে বাস করিত। আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইল; আর্য্যগণ তাহাদিগের পরিত্যক্ত দেশগুলি অধিকার করিয়া বসিলেন; অসভ্যগণ একটু দক্ষিণে সরিয়া নির্ব্বিবাদে বসবাস করিতে লাগিল। এইরূপে সরস্বতীতীরে প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু আর্য্যগণ তখন কি করিয়াছিলেন? ঘোর কৃষ্ণকায় অসভ্যদিগের মধ্যেও যাহারা তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাঁহারা তাহাদিগকে আপনাদিগের সমাজভুক্ত করিয়া লইলেন। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা অসভ্যদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে পরিতেন; কিন্তু "শক্তিশালীর প্রাধান্য" তাঁহাদের মূলমন্ত্র না হইয়া "দুর্ব্বলের রক্ষাই" তাঁহাদের নীতি বাক্য হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ আজ পর্য্যন্ত সেই নীতি বাক্যকে আপনার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়াছে।

আর্য্যদিগের রাষ্ট্রীয় জীবন সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। সরস্বতীতীরে যখন তাঁহাদের বংশ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তথায় আর তাঁহাদের স্থানসঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা আবার দেশজয়ে বহির্গত হইলেন। কিন্তু যতটুকু স্থান তাঁহাদের প্রয়োজন, কেবল ততটুকু অধিকার করিয়াই—তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন; অধিকন্তু অপরের জন্যও আপন সমাজে উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইরূপে আপনাদিগের আবশ্যক বোধে বহু শতাব্দীর অভিযানের ফলে তাঁহারা দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিকে বিন্ধ্যাচলের

পরপারে রাখিয়া আসিলেন ; কিন্তু আর অগ্রসর হইলেন না। "বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে আর্য্য যাইবেন না" এইরূপ একটা নিষেধবাক্য রচনা করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যত বংশধরগণকেও দক্ষিণাভিমুখী হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বোধ হয় তখন তাঁহারা ভবিয়াছিলেন, "আর লোকপীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই, এই বিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।" যদি "শক্তিই আমার স্বত্ব" ইহাই আর্য্যদিগের অবলম্বিত নীতি হইত, তবে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহাদের এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত না। ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, আর্য্যগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; যেন নিতান্ত প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে অভিযান করিতে হইয়াছিল। আবার তাঁহারা বিজিতদিগকে আপনাদিগের সমাজে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—আর্য্যদিগের সামাজিক জীবন। জাতিবিভাগ আজকাল একটা মহা অনর্থের মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে ; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আর্য্যবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক ব্যবসায়ে অধিকার জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিলে, যাহারা অশক্ত তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান হয় না; পাছে নিতান্ত অক্ষম, দুর্ব্বল ব্যক্তিও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া উপায়হীন হইয়া পড়ে, এই জন্য আর্য্যগণ সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নিয়ম হইল যে, কেহই জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। সমাজের অতি হেয় ব্যক্তির জন্যও এত সতর্কতা শুধু এই রক্ষণশীল সমাজেই সম্ভবপর। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত এই জাতি কিরূপ নির্ব্বিবাদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইহার ফলে বৃত্তিবিকাশে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল।

আর্য্যদিগের পারিবারিক জীবনের আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক পরিবারে বহু ব্যক্তিকে লইয়া একত্র বাস করা আমাদের প্রচলিত প্রথা। রক্ষণশীল নীতি হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি স্বচ্ছলতায় জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইব, আর আমার আত্মীয় অক্ষম বিধায় লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিবে, ইহা আমাদের নিকট ঘৃণ্য।

তাই আমরা সক্ষম, অক্ষম সকলে একীভূত হইয়া একই পরিবারে আসিয়া আশ্রয়স্থান খুঁজিয়া লই। হিন্দুসমাজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি সঙ্গতিপন্ন হইলে দূরবর্ত্তী আত্মীয়ের ত কথাই নাই, পাড়াপ্রতিবেশীও আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

এই উদারতার যেমন গুণ আছে তেমনই দোষও আছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে "শক্তিই আমার স্বত্ব" এই নীতি অবলম্বন না করাতে ভারতবর্ষ কখনও এক রাজার অধীনে দৃঢ়রূপে গঠিত পারে নাই। রামায়ণমহাভারতে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রায় শতাধিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজগণ যে, অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের রাজ্যবিস্তারলালসার অভাবই বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন রাজা অন্যান্য রাজ্যগুলি স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া রাজহত্যা ও লোকপীড়ন পূর্ব্বক নিজ অদমনীয় রাজ্যপিপাসার শান্তি করিতেন, এবং বিজিত রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতেন, তবেই আমরা এ দেশে দীর্ঘকালস্থায়ী রাজবংশ সকলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম। মহারাজ অশোক প্রথমজীবনে এই কার্য্য কিছু করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উত্তরকালে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি পথান্তর গ্রহণ করেন।

আর্য্যদিগের সামাজিক জীবন "শক্তিশালীর প্রাধান্য" এই নীতির উপর গঠিত না হওয়ায় সমাজের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধে এ দেশে প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল; ভারতের তৎ-পরবর্ত্তী ইতিহাস বড়ই অপরিস্ফুট। আর্য্য বীরত্ব প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পরে পুনরায় রাজপুতানার ইতিহাসে দেখিতে পাই। এইরূপে যদি কোন প্রকারে কোন সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধিত হয়, তবে জাতিভেদ প্রথায় গঠিত সমগ্র সমাজটা তাহার অভাবে অনেকটা নামিয়া পড়ে। তাহার পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকাকে তদন্তর্গত লোকগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে ইসপের গল্পের খরগোসের মত ঘুমাইবার অনেকটা অবসর পাইয়াছিল। তাহাতেই আমাদের দেশে শ্রমশিল্প আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়াতে তাহা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়।

অবশেষে আর্য্যদিগের পরিবারগঠন। রক্ষণনীতির প্রবর্ত্তন হওয়াতে

পরিবারে অনেক নিশ্চেষ্ট পুরুষের স্থান হইয়াছে। ইহা জাতির উন্নতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়।

কিন্তু এই সকল দোষ সত্বেও হিন্দুগণ তিন চারি সহস্র বৎসর কিরূপে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমাদের পক্ষে এখন আর সে স্থান অধিকার করিয়া থাকা সম্ভব নহে কেন? পরিবর্ত্তন আমাদের শিক্ষার ও দীক্ষার।

কিন্তু আজও হিন্দু সমাজের একপ্রাণতা শিখিবার জিনিষ। এত বড় একটা প্রকাণ্ড মহাসঙ্ঘ, কত শত সহস্র লোকের মিলনক্ষেত্র, অথচ ইহার অন্তর্ভুক্ত অতি দুর্ব্বল প্রাণীর সুখের জন্যও সমাজ যেরূপ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই মহান্ এবং বিস্ময়কর। যাহার হৃদয় আছে, সে-ই ইহার উদারতা উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

বিদায়।

জননী চাহিয়া আছে দূর নভো-পানে,
প্রবাসী পুত্রের তরে, আকুল পরাণ।
মনে পড়ে, বিদায়ের সকরুণ ছবি,
মনে পড়ে, সেই দুটি কাতর নয়ান,
অশ্রুভার সমাকুল। ম্লানমুখে আসি'
নীরবে নমিলা যবে চরণের তল;
ফুটিল না কোন কথা, চাহি' মুখপানে,
স্নেহভরা দুটি আঁখি করে ছল ছল॥

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু

কর্ণেল স্কিনার।

—:০:—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া ভারতের সম্রাট হইবার বাসনায় নানা দিকে নানাজন নানারূপ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন প্রধানতঃ রোহিলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণই দিল্লীর মোগল সম্রাটকে "সাক্ষীগোপাল" করিয়া প্রথমে তাঁহার নামে রাজ্য-শাসন করিয়া পরে—ক্রমশঃ ভারতসাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এ বিষয়ে মাধোজী সিন্ধিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের নামে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপীয় বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ও ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপনের সুযোগ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। চারি দিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চলিতেছিল। য়ুরোপীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন, তাহাদিগের মত সুশিক্ষিত সৈন্য না পাইলে তাহাদিগের সমকক্ষ হওয়া দুষ্কর। তাই ভারতবাসী স্বাধীন রাজারা য়ুরোপীয় যোদ্ধ‍্‌গণের আদর করিতেন। আর লাভের আশায় অনেক য়ুরোপীয় তাঁহাদিগের সেনাদলে কার্য্য করিয়া অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়—ইংরাজ মুসলমানের নিকট হইতে ভারত জয় করেন নাই; ভারতে সাম্রাজ্যসংস্থাপনে তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ মাহারাষ্ট্রীয় ও শিখ-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সে সময় ইংরাজ না আসিলে ভারতবর্ষ আবার হিন্দুর শাসনাধীন হইত। যে সকল য়ুরোপীয় অর্থলোভে ভারতীয় সেনাদলে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, স্কিনার তাঁহাদিগের অন্যতম।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে জেমস্ স্কিনারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তখন কোম্পানীর সেনাদলে এনসাইন। স্কটল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি। চেৎসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তিনি মির্জাপুর অঞ্চলের কোন রাজপুত ভূম্যধিকারীর দুহিতাকে বন্দী করিয়া স্বীয় প্রণয়িনী করেন। এই রাজপুত রমণীর গর্ভে স্কিনারের তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাত্রয়ের সহিত কোম্পানীর তিন জন ভদ্র কর্ম্মচারীর বিবাহ হইয়াছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডেভিড জাহাজে কায করিতেন এবং মধ্যম জেমস্ ও কনিষ্ঠ রবার্ট যুদ্ধব্যবসায়ী

ছিলেন। শিক্ষার্থ দুহিতাদিগের বিদ্যালয়বাসের প্রস্তাব হইলে তাঁহাদিগের জননী অবরোধ প্রথার বিলোপে সম্ভ্রমনাশের আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন! মাতৃহীন জেমস্ ও রবার্ট কোন দাতব্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েন। তাঁহাদিগের পিতা তখনও সামান্য বেতনভোগী লেফটেনাণ্ট—এতগুলি সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভারবহনে অক্ষম। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হইলে পুত্রদ্বয়ের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে বাসের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে প্রত্যেকের জন্য মাসিক ত্রিংশ মুদ্রা ব্যয়িত হইত।

দুই বৎসর পরে সাত বৎসরের জন্য চুক্তি করিয়া জেমস্‌কে কোন মুদ্রাকরের নিকট কায শিখিতে দেওয়া হয়। তিন দিন কায করিয়াই তিনি বিরক্ত হইয়া পলায়ন করেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠের মত জাহাজে যাইতে উদ্যত—সম্বল ছয় আনা। এই ছয় আনায় ছয় দিন আহার নির্ব্বাহ করিয়া তিনি রিক্তহস্তে কোন দিন বা মোট বহিয়া—কোন দিন বা দৈনিক তিন আনা মজুরীতে সূত্রধরের কার্য্যে সহকারিতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কয়দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কোন পরিচারক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর নিকট লইয়া যায়। ভর্ৎসিত বালক দলিল পত্র নকলের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিন মাস পরে তাঁহার Godfather কর্ণেল বার্ণ কলিকাতায় উপনীত হয়েন এবং জেমস্‌কে সৈনিককার্য্য গ্রহণপ্রয়াসী দেখিয়া তাঁহাকে তিন শত টাকা দিয়া তাঁহার পিতৃসমীপে প্রেরণ করেন। পিতা তখন সৈন্যদলসহ কানপুরে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেমস্ তথায় উপনীত হয়েন। তাহার এক পক্ষকাল পরে কর্ণেল বার্ণ তথায় উপনীত হইয়া সিন্ধিয়ার সেনাধ্যক্ষ দুবোয়াঁকে একখানি পত্র দিয়া জেমস্‌কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি জেমসকে মথুরায় কাপ্তেন পলম্যানের (Pohlman) অধীনে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে এনসাইন নিযুক্ত করেন।

দুবোয়াঁ অল্প দিন পরেই (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টমাস দিন) কার্য্য ত্যাগ করিলে দ্বিতীয় সেনাদলের সেনাপতি সাদারল্যাণ্ড সিন্ধিয়ার অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েন। জেমস্ স্কিনার তাঁহার অধীনে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। সাদারল্যাণ্ড ও লাকাদাদা তখন বুন্দেলখণ্ডে কতিপয় অবাধ্য রাজার ও সর্দ্দারের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত। জেমস্ তাঁহাদিগের অধীনে দুইটি যুদ্ধে ও পাঁচ ছয়টি দুর্গ আক্রমণে ও অধিকারে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহাতে তাঁহার যুদ্ধাসক্তি বর্দ্ধিত হয় ও তিনি ভারতীয় যুদ্ধপ্রথা অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

পরবৎসর পেরং সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলে জেমস্ ক্যাপ্টেন বাটারফিল্ডের অধীনে বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত হয়েন। প্রথম যুদ্ধে চাঁদঘোরীতে মার্হাট্টা অশ্বারোহী সৈন্যদল দলত্যাগ করিলে বাটারফিল্ডের পরাজয় হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে স্কিনার বিশেষ সাহস ও কৌশলের সহিত সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিলে সেনাপতি তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করেন ও প্রধান সেনাপতি তাঁহার বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত করেন।

ইহার পর সাদারল্যাণ্ডের পদে পলম্যান অধিষ্ঠিত হইলে যুবক স্কিনার তাঁহার অধীনে নানা যুদ্ধে ও অবরোধে ব্রতী হইয়াছিলেন। মালপুরার যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসে শত্রুর কামান দখল করেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষ সময় রাঠোরগণের পলায়নকালে তিনি আক্রান্ত হইলে তাঁহার অশ্ব নিহত হয় ও তিনি একটি কামানের নিম্নে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। যুদ্ধের পর তিনিই প্রথম শত্রুশিবির পরিদর্শন করেন ও নানা মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে জয়পুরের রাজার প্রধান রাজচিহ্ন মহিমার্ত্তব* আনিয়া স্বীয় মার্হাট্টা সেনাপতিকে দেন। সেনাপতি তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন ও তাঁহাকে একটি মূল্যবান খেলাত দেন।

ইহার পর পেরং সেনাদলসহ স্কিনারকে একজন রাজপুত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে তিনিই কর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ফলে কেরোলীর রাজা তাঁহার প্রতিবেশী উনিয়ারার রাজার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি ছয় দল পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী ও বিংশতি কামান সহ রাজার সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়েন। তখন বিদেশীয় সেনাপতিগণ অর্থসাহায্য লইয়া সচরাচর এরূপ পক্ষাবলম্বন করিতেন। ইহা তাঁহাদিগের আয়ের উপায় ছিল। স্কিনার কিন্তু বিপন্ন হইলেন। কেরোলীর রাজা প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদানে অসমর্থ হইলে অর্থাভাবে স্কিনারের সেনাদল অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সেনাপতি পলম্যানের নিকট সাহায্য প্রাথনা করিলেন। তিনি সে সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই উনিয়ারার রাজার ষড়যন্ত্রে অর্থলোভে সিন্ধিয়ার ও কেরোলীর

* এই মৎস্যচিহ্ন মোগলবাদসাহদিগের বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন ছিল।

সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শত্রুদলে যোগ দিল। বিপন্ন স্কিনার তিন ক্রোশ দূরস্থিত টঙ্কে আশ্রয়গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। বিপক্ষদলও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি প্রথম আক্রমণে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার পাঁচটি কামান শত্রুর হস্তগত ও তাঁহার অশ্ব নিহত হইল। বিপক্ষদল পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পশ্চাদ্গমন অসম্ভব বুঝিয়া তিনি সৈন্যদলকে বলিলেন—এক বার ব্যতীত কেহ দুই বার মরে না—অতএব যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। উৎসাহিত সেনাদল শত্রুদলকে আক্রমণ করিল। শত্রুসেনার সম্মুখভাগ পশ্চাদ্‌পদ হইল ও তাহাদের কামানগুলি স্কিনারের হস্তগত হইল সত্য; কিন্তু তাহাদের পশ্চাদ্ভাগের সৈনিকগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি পিছু হঠিয়া নিকটবর্ত্তী গিরিশঙ্কটে আশ্রয়গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে শত্রুদলের সাহস বাড়িয়া গেল; তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কামানগুলি অধিকার করিল। তিনি অবশিষ্ট তিন শত মাত্র সৈনিক লইয়া "মরিয়া হইয়া" তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি স্বয়ং—আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ও তাঁহার সেনাদল বিধ্বস্ত হইল।

তখন অপরাহ্ন। যখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন তখন প্রভাত হইয়াছে। তাঁহার পরিধেয় ইজার ব্যতীত আর সবই অপহৃত। চারি দিকে মৃত ও আহত সৈনিক; তাহাদের মধ্যে একজন সুবাদার—তাহার একখানি পদ গোলায় উড়িয়া গিয়াছে—আর একজন জমাদার—বর্শার আঘাতে কাতর। সকলেই তৃষ্ণায় পীড়িত। রৌদ্র যত প্রখর হইতে লাগিল তৃষ্ণা ততই প্রবল হইতে লাগিল। অথচ পিপাসা নিবারণের উপায় নাই। দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল; কিন্তু মৃত্যু বা সাহায্য কিছুতেই আহতদিগের যন্ত্রণানিবারণের উপায় হইল না। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল—জ্যোৎস্নালোকে রণক্ষেত্র প্রেতলীলাভূমির মত বোধ হইতে লাগিল। চারিদিকে নৈশ নিরবতা ভেদ করিয়া আহতের আর্ত্তনাদ—পিপাসা-কাতরের জলপ্রার্থনা। শিবাদল শব ভক্ষণ করিতে করিতে জীবিতদিগের সন্নিকটে আসিতে লাগিল; তাহারা দুর্ব্বল হস্তে উপলখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিয়া শবাহারীদিগকে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। দিবাভাগে ভীষণ রৌদ্রের পর নিশীথের শীতল বাতাসে অবসন্নদেহ আহতগণ কম্পিত হইতে লাগিল। স্কিনার সঙ্কল্প করিলেন,

এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে আর কখন যুদ্ধ করিবেন না, আর সারিয়া উঠিলে খৃষ্টান পিতার উপাস্য দেবতার উদ্দেশে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন।

পরদিন প্রভাতে এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা একটি ঝুড়িতে রুটি ও একটি কলসে পানীয় জল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং আহতদিগকে এক এক টুকরা রুটি ও জল দিতে লাগিল। রুটি খাইয়া ও জল পান করিয়া স্কিনার একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা চামার জানিয়া উচ্চবর্ণ রাজপুত সুবাদার আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন—যন্ত্রণার অবসানের অধিক বিলম্ব নাই—যন্ত্রণার সামান্য তারতম্য অকিঞ্চিৎকর; যন্ত্রণালাঘব করিবার জন্য জাতিধর্ম্মনাশ কখনই অভিপ্রেত নহে। এই সময় উনিয়ারার রাজার লোক মৃতের সৎকার করিতে ও আহতদিগকে শিবিরে লইতে আসিল। সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুবাদার তাহাদিগের প্রদত্ত জল পান করিলেন এবং স্কিনার ও অন্যান্য আহতদিগের সহিত শিবিরে প্রেরিত হইলেন।

এক মাস পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্কিনার স্বাধীনতালাভোদ্দেশে বিদায় লইয়া কলিকাতায় ভগিনীর নিকট আসিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে জলদাতৃকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়া বলিয়া পাঠান যে, তিনি তাহাকে মাতৃসম জ্ঞান করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণ যন্ত্রণায় স্কিনার সঙ্কল্প করেন যে, রক্ষা পাইলে তিনি আর যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না এবং সুস্থ হইলে গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা করিবেন। তিনি শেষ সঙ্কল্প রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রথম সঙ্কল্প সংরক্ষিত হয় নাই।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্কিনার সুস্থ হইয়া কার্য্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও মে মাসে সোণ্ডা আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধিয়ার তৃতীয় সেনাদলের সহিত প্রেরিত হয়েন। যুদ্ধে স্কিনারের সেনাদলের তিনজন সেনাধ্যক্ষ হত ও প্রায় একসহস্র সৈনিক হতাহত হইলেও* তিনি শক্রসেনাপতি লাকাদাদার কামানগুলি অধিকার করেন। ইহার পর স্কিনার সেনাদলসহ আলিগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

* কম্পটনের মতে এই সকল ঘটনার বিবরণ একটু অতিরঞ্জিত। কারণ, ইহা স্কিনারের আত্মজীবনী হইতে গৃহীত এবং স্কিনার এ সকল বিষয়ে একটু অতিরঞ্জনপ্রিয় ছিলেন।

দুই মাস পরে তিনি "হরিয়ানার রাজা" নামে খ্যাত বিখ্যাত জর্জ্জ টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হয়েন। স্কিনারের মতে জর্জ্জগড়ের যুদ্ধের মত আর কোন ভীষণ যুদ্ধে তিনি যোগ দেন নাই। জর্জ্জগড়ে পরাজিত টমাস্ হানসিতে আসিলে আবার যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে কনিষ্ঠ রবার্ট জেমস্ স্কিনারের সহকর্ম্মী ছিলেন। টমাসের বিক্রমে রবার্টকে পশ্চাদ্‌পদ হইতে হয়। এমন সময় জেমস্ আসিয়া টমাস্‌কে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে রবার্ট ও টমাস্ পরস্পরের এত নিকটে আসিয়াছিলেন যে, রবার্ট টমাসের অঙ্গে তরবারির আঘাত করিয়াছিলেন—বর্ম্মাবৃত থাকায় টমাস্ রক্ষা পাইয়াছিলেন। উদারহৃদয় টমাস্ শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণের পর রবার্টের বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করেন ও স্বীয় দেহে তাঁহার অস্ত্রাঘাতচিহ্ন দেখান। স্কিনার যেরূপ ব্যবস্থা করেন তাহাতে টমাস্ আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। এ ক্ষেত্রে স্কিনারের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে স্কিনার পেরংএর সহিত দৌলত রাও সিন্ধিয়ার প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মাধোজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র দৌলত রাও তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি তরুণবয়স্ক, হীনচরিত্র ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় শ্বশুর সূর্য্যরাও ঘাট্‌কের পরামর্শে পেরং ও তাঁহার পক্ষীয় প্রধান প্রধান সেনানায়কগণকে দরবারে আহ্বান করিয়া নিহত বা বন্দী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কর্ণেল সাদারল্যাণ্ড ও মেজর ব্রাউনরিগ এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন। কিন্তু প্রধান মাহারাট্টা সেনাপতি গোপাল রাও ভাউ পেরংকে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া দেন। তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া সিন্ধিয়ার ব্যবহারে সন্দিহান পেরং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দরবারে যাওয়ায় সিন্ধিয়ার দুরভিসন্ধি পণ্ড হয়। স্কিনার বলেন, দরবার শেষ হইলে পেরং স্বীয় তরবারি সিন্ধিয়ার পদতলে সংস্থাপিত করিয়া বলেন—বৃদ্ধ বয়সে তিনি কোনরূপ অপমান সহ্য করিতে অসমর্থ—তিনি কার্য্য ত্যাগ করিতেছেন। অতঃপর তিনি অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে বলেন, তাঁহারা আর তাঁহার অধীন নহেন—এখন হইতে সিন্ধিয়ার নির্দ্দেশমত কার্য্য করিবেন। তিনি সিন্ধিয়াকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিয়া বলেন,—সূর্য্যরাও কর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার এই কথায় প্রবীণ মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ যোগ দেন ও স্পষ্ট করিয়া এই কথা বলার জন্য পেরংকে সাধুবাদ করেন। কিন্তু স্মিথ বলেন,

স্বীয় ক্ষমতাহ্রাসাশঙ্কায় পেরং দৌলতরাওকে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দিয়া তুষ্ট করেন। ঐতিহাসিক কম্পটন এই কথাই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দৌলত-রাও যেরূপ চরিত্রহীন, হীনবৃত্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে একজন বিশস্ত কর্ম্মচারীর দুঃখে বিচলিত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু পেরংএর অর্থ পাইয়া তুষ্ট•হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। পেরংএর ক্ষুণ্ণ সম্মানজ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার প্রদত্ত অর্থই দৌলতরাওকে সঙ্কল্পচ্যুত করা অধিক সম্ভব।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধঘোষণা হইলে গভর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেস্‌লি মার্হাট্টা বেতনভোগী ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় ও পদোচিত পেনসন লইবার জন্য এক ইস্তাহার প্রচার করেন। অনেক ইংরাজ এই আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়েন। কার্ণেসী ও ষ্টুয়ার্ট নামক দুইজন ক্যাপ্টেন পেরংকে পদত্যাগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া অবিলম্বে মার্হাট্টারাজ্য ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। তাঁহার সহিত ইংরাজ কর্ম্মচারী-দিগের সদ্ভাব ছিল না; সুতরাং তাঁহার এই অবিশ্বাসে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই পদচ্যুত কর্ম্মাচারিগণের মধ্যে স্কিনার ও ষ্টুয়ার্ট যুরেশীয়। ছয়জন পদচ্যুত কর্ম্মচারী পরিজনগণের বাসভূমি আগ্রা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নে পথে আড্ডা লইয়া বিশ্রামলাভের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, মার্হাট্টা অশ্বারোহী সেনাদল যুদ্ধে পরাভূত সেনার মত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পলায়ন করিতেছে। তাঁহারা আলিগড়ে লেকের সহিত যুদ্ধে পেরংএর পরাজয়ের এই প্রথম আভাস পাইলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই পেরং বিশ্রস্তবেশে সেই পথে উপস্থিত হইলেন।

স্কিনার ইংরাজের অনুরক্ত থাকা দূরে থাকুক স্বীয় জননীর প্রতি পিতার ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিরক্তই ছিলেন। তিনি ইংরাজের অধীনে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক ছিলেন না—সেই জন্য অগ্রসর হইয়া পেরংএর নিকট তাঁহার পদচ্যুতির প্রতিবাদ করিয়া পুনরায় তাঁহার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পেরং বলিলেন, মর্হাট্টা অশ্বারোহীরা পলায়ন করায় জয়ের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, সুতরাং স্কিনারের পক্ষে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। স্কিনার পুনরায় বলি-লেন, তখনও জয়ের আশা শেষ হয় নাই—তিনি স্বয়ং সেনাদলসহ ইংরাজ-দিগকে পরাজিত করিতে প্রস্তুত। তদুত্তরে পেরং ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে

বলিলেন—"বিশ্বাস করিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখন স্কিনার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, কয়েকজন অবিশ্বাসী সেনানায়কের ব্যবহারে সমস্ত বিশ্বাসী সেনানায়ককে পদচ্যুত করিয়া ও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইয়া তিনিই অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা সিন্ধিয়াকে এ কথা জানাইবেন। পেরং আর কিছু না বলিয়া বিদায় অভিনন্দন করিয়া হাতরাসগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্কিনার চীৎকার করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর স্কিনার ও তাঁহার সহযাত্রীরা সংশয়াকুল চিত্তে লর্ড লেকের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। লেক তাঁহাদিগকে আশস্ত করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্কিনার বহুদিন সিন্ধিয়ার বেতন ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। লর্ড লেক যুবক স্কিনারের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কানপুরের পথে শান্তিরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। স্কিনার একদল অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ ও গঠন করিয়া পেরংএর একটি পূর্ব্বসেনাবাসে আড্ডা করিয়া চারি দিকে ব্যাপ্ত অশান্তির ও অরাজকতার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় তাঁহাকে অদূরে মাহাট্টা দস্যু মধুরাওয়ের বিরুদ্ধে ও দূরে পাঠান আমীর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হয়। উভয় অভিযানেই তিনি জয়ী হয়েন।

এই সময়ে যশোবন্তরাও হোলকারের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। হোলকার সিন্ধিয়ার চিরশত্রু। সুতরাং স্কিনার সানন্দে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পেরংএর পূর্ব্বসেনাদল হইতে দুই সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিয়া এক সেনাদল সংগঠিত করিলেন। লর্ড লেক ইহাদিগকে অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলে একবাক্যে "সিকন্দর সাহেবকে" অধ্যক্ষ পদে বৃত করিতে বলে। এই সেনাদল এখনও Skinner's Horse নামে পরিচিত। ইহারা পীতাভবর্ণ উর্দ্দী পরিত বলিয়া এখনও Yellow Boys বলিয়া বর্ণিত।

পিণ্ডারী আমীর খাঁ ও হোলকার এই অভিযানে পরাভূত হইলেন। হোলকার যোধপুরে আশ্রয় লইলেন ও পরবৎসর পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজ্যগঠনে নিযুক্ত পঞ্জাবকেশরী রণজিতের সহিত মৈত্রী সংস্থাপনচেষ্টায় পঞ্চনদাভিমুখে চলিলেন। তিনি লাহোরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই লেক তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও সন্ধিসংস্থাপনে বাধ্য করিলেন।

ইহার পর দশ বৎসর স্কিনার যোদ্ধৃবৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাষকার্য্যে মনোযোগ দিলেন। যে হারিয়ানায় তিনি জর্জ্জ টমাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্কিনার সেই হরিয়ানায় থাকিয়া সে অঞ্চল সুশাসিত করিলেন ও হান্‌সি অঞ্চলে ৬৭টি বিস্তৃত সম্পত্তি পুরষ্কার পাইলেন। বুলন্দসহর জিলায় বিলাসপুরেও তাঁহার সম্পত্তি ছিল। এখনও তথায় তাঁহারা উত্তরাধিকারীদিগের উদ্যান ও উদ্যানগৃহ আছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্কিনার পিণ্ডারীদমনে স্বীয় সেনাদলসহ লর্ড ময়রাকে সাহায্য করিয়া গভর্ণর জেনারল, প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির ধন্যবাদ অর্জ্জন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পুনায় আরববিদ্রোহদমনে সাহায্য করিয়াও তিনি ঐরূপ ধন্যবাদ অর্জ্জন করেন। ইহার পর তিনি আর একবার যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন।

এই সময় স্কিনারের সৈন্যসংখ্যা তিন সহস্র। যুদ্ধসম্ভবনা নাই দেখিয়া তিনি সহস্র সৈনিককে বিদায় দিলেন। সহস্র সৈনিক তাঁহার ভ্রাতা রবার্টের অধীনে নিমচে রক্ষিত হইল। অবশিষ্ট সৈনিকগণ তাঁহার অধীনে হান্‌সিতে রহিল। জেনারল ম্যালকমের সহিত তাঁহার বহুদিনের সৌহার্দ্দ ছিল; এবং প্রধানতঃ এই বন্ধুর চেষ্টায় স্কিনার হান্‌সির সম্পত্তি চিরস্থায়ী জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বে ইহা তাঁহার সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনাধ্যক্ষ দুবোয়াঁ ও বেগম সমরুও সেনাব্যয় নির্ব্বাহার্থ জায়গীর পাইয়াছিলেন। বেগমের মৃত্যুর পর তাহা বাজেয়াপ্ত করা হয়।* বুলন্দসহরের সম্পত্তি তাঁহার নিজস্বই ছিল।

এককালে কলিকাতায় তিনি ছাপাখানার কায করিতে যাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৮২২খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তিনি বিশেষ সমাদৃত হয়েন। এই সময় রাজনৈতিক গগনে আবার ঘনঘটা দেখা দিল। তখন গভর্ণর জেনারল লর্ড অ্যামহার্ষ্ট ব্রহ্ম অভিযানের উদ্যোগ করিতেছেন—রাজপুতানায় ও মহারাষ্ট্রদেশে অশান্তির সূচনা সপ্রকাশ। অথচ ইংরাজপক্ষে বিচক্ষণ সেনানায়কের ও বিশ্বস্ত ভারতীয় সেনাদলের একান্ত অভাব। স্কিনার পুনরায় সেনাদল সংগঠিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের দুর্গ অধিকারে সেনাদলসহ স্কিনার লর্ড কম্বারমিয়ারকে বিশেষ সাহায্য করেন। ইহাই তাঁহার শেষ যুদ্ধ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি

* 'সমরু বেগম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—'আর্য্যাবর্ত্ত'—আষাঢ়, ১৩১৭।

হান্‌সিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে মন দেন। এই সময় তিনি ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া ও কম্প্যানিয়ান অব দি অর্ডার অব বাথ উপাধি লাভ করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হয়েন। বহুদিন সসম্মানে হান্‌সিতে বাস করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তিনি তনুত্যাগ করেন।

পারিবারিক আচারব্যবহারে স্কিনার মুসলমানের মত ছিলেন। তাঁহার পত্নীসংখ্যা অন্ততঃ চতুর্দ্দশ ছিল! শেষ বয়সে—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার পর হইতে নিষ্ঠাবান খৃষ্টানের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও সদাচারের অনুষ্ঠানে অনন্ত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েন। শেষ বয়সে তিনি ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেন এবং ইংরাজী ভালরূপ বলিতে পারিতেন। কিন্তু দীর্ঘ রচনায় তিনি পার্শিই ব্যবহার করিতেন। বেগম সমরুর উত্তরাধিকারী ডাইস সম্বার য়ুরোপগমনোদ্যত হইলে তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য পার্শিতে এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। * তাঁহার আত্মজীবনীও পার্শিতে রচিত—ফ্রেজার কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংলণ্ডে শিক্ষিত হইয়া প্রধানতঃ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের চেষ্টায় সেনাদলে লেফটেনাণ্টের পদ পাইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। তিনি লর্ড লেক, সার জন ম্যালকম, লর্ড মেটকাফ, লর্ড মিণ্টো, লর্ড ময়রা, লর্ড কম্বারমিয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিতেন।

উনিয়ারার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তদনুসারে তিনি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দিল্লীতে সেণ্ট জেমস্ চার্চ্চ নামক গির্জ্জা নির্ম্মিত করান। তিনি বিশেষ বিনয়ী ও শিষ্ট ছিলেন। গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও চরিতকার ফ্রেজারের ভ্রাতার নিকট গির্জ্জার দ্বারদেশে সমাহিত হইবার বাসনা ব্যক্ত করেন—তাহা হইলে উপাসকবৃন্দ তাঁহার পাপ দেহের উপর দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভোজন-পাত্রের নিকট তাঁহার প্রথমজীবনের দারিদ্র্যস্মারক কাষ্ঠের চামচ রক্ষিত হইত।

* 'আর্য্যাবর্ত্ত'—ভাদ্র, ১৩১৮।

প্রথমে তাঁহার শব হান্‌সিতে সমাহিত করা হয়। কিন্তু সমাহিত হইবার সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছানুসারে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ শব মহাসমারোহে তাঁহার সেনাদলবেষ্টিত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে নীত ও সসম্মানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জার দ্বারদেশে সমাহিত হয়।

জেমসের কনিষ্ঠ বরার্ট ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সিন্ধিয়ার সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রাতার অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তরুণবয়স্ক ভ্রাতার সুবুদ্ধিতে সন্দিহান হইয়া জেমস স্বীয় সেনাদলকে সমবেত করিয়া বলেন,—"এই আমার ভ্রাতা। তোমরা সকলে ইহার রক্ষক হইবে।" চম্বল নদীর নিকট যুদ্ধে বরার্ট আহত হইয়াছিলেন। উনিয়ারার যুদ্ধের পর রবার্ট পুনরায় ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়া লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দুই ভ্রাতাই জর্জ্জগড়ের টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। দুই ভ্রাতা দুই পার্শ্বে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধান্তে পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া হতাহতপূর্ণ রণক্ষেত্রে ভ্রাতার শবান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। অন্ধকারে বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে স্ব স্ব সেনাদলের সংবাদের জন্য উভয়ে প্রধান সেনাপতির শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। দুইজন দুই পথে শিবিরে প্রবেশ করেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া যাইয়া সর্ব্বসমক্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ অধ্যক্ষগণ সিন্ধিয়ার সেনাদল হইতে পদচ্যুত হইলে তিনি প্রসিদ্ধ বেগম সমরুর সেনাদলে প্রবেশ করেন। বেগম যখন লর্ড লেকের নিকট ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন তখন রবার্টই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর রবার্ট পুনরায় জ্যেষ্ঠের অধীনে সেনাদলে লেফটেনাণ্ট পদে বৃত হয়েন। স্বতন্ত্র সেনাদলে ভ্রাতার উন্নতির সমধিক সম্ভাবনা বুঝিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল জেমস্ স্বীয় সেনাদল বিচ্ছিন্ন করিয়া ভ্রাতার অধীনে এক স্বতন্ত্র সেনাদল সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। গভর্ণর জেনারল এই প্রস্তাবের অনুমোদন না করায় রবার্ট ভ্রাতার সেনাদলেই স্থানীয় মেজর পদে উন্নীত হয়েন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে আলিগড় জিলায় একটি ক্ষুদ্র জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন উহা ভোগ করিতে পারেন নাই—১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* 'আর্য্যাবর্ত্ত'—আষাঢ়, ১৩১৭।

মধুপুর-জঙ্গল ও ব্রহ্মপুত্র নদ।

বাঙ্গালা দেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদ ডিব্রুগড় হইতে হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমে আসিয়া ধুবড়ির নিকট হইতে দক্ষিণে আসিয়াছে। ফুলছড়ির নিকট হইতে এই নদ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—প্রধান শাখা যমুনা বেশ পরিপুষ্ট ও বরাবর দক্ষিণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিশিয়াছে; অপর শাখা ব্রহ্মপুত্র অনেকটা পূর্ব্বে ঘুরিয়া ঢাকা জিলার উত্তরে মধুপুর-জঙ্গল নামে যে উচ্চ বনভূমি আছে তাহার পূর্ব্বপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া মেঘনার সহিত মিশিয়াছে। এই শেষোক্ত শাখা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমির আকার ধারণ করে। এই জন্য অনেক আধুনিক স্কুলপাঠ্য মানচিত্রে (যথা, The Royal Indian World Atlas) যমুনা নদীই ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক, যে স্থানে একটি নদীর দুই শাখা দেখা যায়, সে স্থানে যেটি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিপুষ্ট, তাহাকে নদীটির নামে অভিহিত করা হয়, ও অপরটির নূতন নামকরণ হয়। এই স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল কেন, দেখা যাউক।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এরূপ ছিল না। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রেনেল (Major Rennell) যখন ঢাকা জিলার পরিমাপ জরিপ করেন, তখন যমুনা নদী ক্ষুদ্র প্রশাখা মাত্র ছিল ও ব্রহ্মপুত্র নদের অপর শাখাই সবিশেষ পরিপুষ্ট ছিল। সে সময়ে এই শাখা মধুপুর জঙ্গলের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়া, শ্রীহট্টের নিকট যে কতকগুলি বিল বা জলাভূমি আছে সেগুলি পলিতে পূর্ণ করিত ও মেঘনা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িত।

ব্রহ্মপুত্রের এই গতিপরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে যে দুইটি মত প্রচলিত আছে তাহাই আমি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

পৃথিবীর অনেক স্থানে দেখা যায় যে, ভূমি বহু বৎসর ধরিয়া অল্পে অল্পে উত্থিত হইতেছে। ইটালীতে এমন দুই একটি সহর আছে যাহা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রোমসাম্রাজ্যের সময়ে বন্দর ছিল, কিন্তু এখন সমুদ্রপ্রান্ত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র নরওয়ে ও সুইডেন সমুদ্রগর্ভ হইতে এখনও উঠিতেছে।

ফারগুসন্ (Fergusson) বলেন যে, মধুপুর জঙ্গল পূর্ব্বে এত উচ্চ

ছিল না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রমশঃ উত্থিত হওয়াতে ব্রহ্মপুত্র নদ এই জঙ্গলের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। *

পূর্ব্বে এই মতই পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল। অনেক পুস্তকে, বিশেষতঃ সুস্ নামক অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত-লিখিত "পৃথিবীর আনন" নামক বিখ্যাত পুস্তকেও এই মত উল্লিখিত আছে।†

দুই বৎসর হইল, মিষ্টার লাটুশ্ এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ‡ তাহাতে তিনি বলেন যে, ফারগুসনের মত অনুসারে যদি মধুপুর জঙ্গল সত্য সত্যই উত্থিত হইত তবে ব্রহ্মপুত্র নদ আরও পূর্ব্বে সরিয়া যাইতে পারিত; উহা একেবারে পশ্চিমে চলিয়া আসিল কেন? বিশেষতঃ নিকটস্থ আর কোনও স্থান উত্তোলিত না হইয়া কেবলমাত্র মধুপুর জঙ্গল উত্তোলিত হইবে, ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক। তিনি এইরূপে ফারগুসনের ভ্রমনির্দ্দেশ করিয়া মধুপুর জঙ্গলের উচ্চতা ও ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপরিবর্ত্তনের কারণ অভিনব প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভূতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই জানেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে, পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাবের প্রায় সমসাময়িক কালে, কোনও অজ্ঞাত কারণে, পৃথিবীর বহিরাবরণ স্বরূপ যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহার তাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়। সেইজন্য যে তুষারনদ সকল (Glacier) এখন অতি উচ্চ পর্ব্বতে বা মেরুদ্বয়ের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল এই সময়ে অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে, উত্তরে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ন্যায় তুষারনদসমূহে আবৃত ছিল। হিমালয়েও তুষারনদ সকল অনেক নিম্ন পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। এইজন্য, ভূতত্ত্বে এই সময়ের নাম হিমযুগ বা Glacial Epoch।

---

* Fergusson—Recent Changes in the Delta of the Ganges—Quart. Journal—Geol. Soc. Vol XIX. (1863).

2. Hiouen Thsang's Journey from Patna to Bullair—Journal Royal Asiatic Soc. New Series VI (1873) &c. &c.

† Suess 'Das Antlitz der Erde.'

‡ Lecture on 'the Ice Age in India' by T. D. La Touche, Feb. 10, 1910.

পর্য্যবেক্ষণশালী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন যে, বৃষ্টির জলে পর্ব্বতের প্রস্তর ক্ষয় হইয়া নদীসমূহে পলির সৃষ্টি হয়। নদীর বেগ যতই অধিক হয়, তাহার পলিবহন করিবার শক্তিও ততই অধিক হয়। অতএব পার্ব্বত্য নদী অতিশয় বেগবতী হওয়াতে পর্ব্বতের পাদদেশে যে পরিমাণ পলি বহিয়া লইয়া আইসে, অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে আসিয়া আর তত পলি সরাইতে পারে না। সেইজন্য পর্ব্বতের পাদদেশে সর্ব্বত্রই অনেক পলি জমিতে থাকে।

আর এক কথা—জল প্রস্তর ক্ষয় করিয়া পলি সংগ্রহ করিয়া আনে, কিন্তু পর্ব্বতের গাত্র যদি বৃক্ষলতাসঙ্কুল হয় তবে, জলের প্রস্তর ক্ষয় করিবার শক্তি ও পলিবহন করিয়া আনিবার ক্ষমতা উভয়ই কমিয়া যায়।

হিমালয়ে আপাততঃ প্রায় ১৮০০০ ফুট উচ্চে পর্য্যন্ত লতাগুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়।* কিন্তু তুষার নদের সময়ে নিশ্চয়ই এত উপরে বৃক্ষ বা লতা জন্মিতে পারিত না। অতএব সে সময়ে বৃষ্টির জল ও গলিত তুষারের জল এখন অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রস্তর ক্ষয় করিতে পারিত এবং অনেক অধিক পরিমাণ পলি হিমালয়ের পাদদেশে জমিত। লাটুশ্ বলেন, মধুপুর জঙ্গল সেই পুরাতন পলির অবশিষ্টাংশ। "তুষার নদের" সময়ের" অবসানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল এই পলি ধুইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইতে লাগিল। মধুপুর জঙ্গলের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র ইহাদেরই অন্যতম ছিল। তৎকালে ব্রহ্মপুত্র স্বল্পায়তন ক্ষুদ্র নদ মাত্র ছিল। পাঠকবর্গ বাঙ্গালাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদের ফুলছড়ির নিকট হইতে বরাবর দক্ষিণে আসিয়া সমুদ্রে পড়াই স্বাভাবিক। পূর্ব্বকালে ইহার ব্যতিক্রম ঘটার কারণ এই যে, সেই ক্ষুদ্র-স্রোত স্রোতস্বতী পদ্মার রাশীকৃত পলির চাপের বাধা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে আসিতে পারিত না।

ব্রহ্মপুত্র নদের আয়তন এক্ষণে কিরূপে বিস্তৃতি লাভ করিল তাহা বুঝাইতে হইলে একটু বিশদ বর্ণনা আবশ্যক।

মনে করুন, দুইটি নদী একটি উচ্চ ভূমিভাগের দুই দিকে প্রায় সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। একটি নদী অপরটি হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে। এখন, যদি উভয় নদীর

* Imperial Gazetteer of India Vol 1. Art. Botany. Page 167.

শাখাদ্বারা মধ্যস্থ উচ্চভূমিভাগ ক্ষয় হইয়া একটি প্রণালীর দ্বারা উভয় নদীর সংযোগ হয়, তবে যে নদীটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সমস্ত জল অপর নদীটিতে চলিয়া আসিবে। ভূতত্ত্বে এই ঘটনার নাম প্রথমোক্ত নদীটির "মস্তকচ্ছেদন" বা Beheading।*

লাটুশ্ বলেন, তিব্বতের সান্‌পো নদী পুরাকালে পশ্চিম তিব্বতের একটি নদীর প্রশাখা ছিল। (এই শেষোক্ত নদীটি এখন তিব্বতের মরু-ভূমিতে অদৃশ্য হইয়াছে।) ডিহং নদী এই সান্‌পো নদীর "মস্তকচ্ছেদন" করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মপুত্রের আয়তন বেশ বড় হইয়া উঠে। তৎপরে তিস্তা নদীও পদ্মার কিয়দংশ পলি ধৌত করিয়া যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইল, তখন ব্রহ্মপুত্র পদ্মার পলিকে অগ্রাহ্য করিয়া মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিমপ্রান্তে নূতন পথ কাটিয়া লইয়া বরাবর দক্ষিণে আসিয়া সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। এই নূতন পথই কোন কোন মানচিত্রে যমুনা নদী নামে, কোন কোন বিলাতী মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কাশী।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা—উত্তর-বাহিনী ;
তীরে স্তরে স্তরে ঘাট, অসংখ্য দেউল,—
বিজড়িত কত স্মৃতি—কতই কাহিনী—
উদ্বেল ভক্তির স্রোত নাহি তা'র কূল।
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুস্থান—কাশী হৃদি তা'র—
স্পন্দিত ভারতভূমি তোমার স্পন্দনে।
কত রাজা, কত ধর্ম্ম বক্ষে তোমার
আঁকিতে আপন চিহ্ন অজস্র যতনে
করিয়াছে প্রাণপণ। আজি তা'রা সব
বিস্মৃতির অন্ধ গর্ভে লভেছে বিলয় ;
তুমি স্থির—অচঞ্চল। নিস্পন্দ নীরব
ইতিহাস পদে তব মাগিছে আশ্রয়।
ভক্তের আশ্রয় তুমি—মুক্তির আগার,
বিরাজিত বিশ্বেশ্বর হৃদয়ে তোমার।

* Russell's 'River Development'.

অদৃষ্ট-চক্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:—

বিদেশে।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণ চলিল। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। শেষে রাত্রি পোহাইল। বিনিদ্র ধরণীধর দেখিলেন, তিনি বঙ্গের শ্যাম প্রান্তর ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, জীবনে আর কখন বঙ্গজননীর স্নিগ্ধ অঙ্কে ফিরিতে পারিবেন কি? এই বিদায় শেষ বিদায়! তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে ট্রেণ বারাণসীর নিম্নে সেতুর নিকটবর্ত্তী হইল। বারাণসীর বর বপু নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জহ্নুকণ্যার পূত প্রবাহ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বারাণসীকে ঘিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কূলে ঘাটের পর ঘাট—মন্দিরের পর মন্দির—হর্ম্ম্যের পর হর্ম্ম্য। ঘাট স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীতে পূর্ণ। ঘাটের জনতায় ভারতের সকল স্থানের অধিবাসীর সমাবেশ। বারাণসীর পুণ্য ভূমিতে তনু ত্যাগ করিয়া মণি-কর্ণিকার মহাশ্মশানে ভস্মীভূত হইবার বাসনায় নানা দিগ্দেশ হইতে হিন্দুরা আসিয়া বারাণসীতে বাস করেন। মোক্ষকামীর এই মহাস্বর্গ ভারতের সর্ব্বস্থানের হিন্দুদিগের মহা সম্মিলনস্থান। বারাণসী হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র—হিন্দুধর্ম্মের হৃদপিণ্ড এই বারাণসীতে অবস্থিত। ইতিহাস ইহার আরম্ভসন্ধানে বিফলমনোরথ, কল্পনা ইহার প্রারম্ভকালের ধারণা করিতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কত নূতন নগরের উত্থানপতন হইয়াছে, বারাণসীর গৌরবশ্রী অন্তর্হিত হয় নাই। কারণ, সে গৌরব রাজৈশ্বর্য্যের সহচর নহে—পরন্তু ভক্তের ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাহা রাজার দান নহে, পরন্তু রাজরাজেশ্বরের বিভূতি। নির্ব্বাণকামী শাক্য রাজকুমার হইতে ধর্ম্মপ্রাণ শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার চৈতন্য হইতে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক দয়ানন্দ পর্য্যন্ত যিনি যখন

হিন্দুধর্ম্মের নূতন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তিনিই তখন স্বীয় মতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বারাণসীতে গমন করিয়াছেন। যে মত বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই হিন্দু সমাজে সে মত স্থায়ী হয় নাই। যিনি বারাণসীতে স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন হিন্দু ধর্ম্মের বিরাট ইতিহাসে তাঁহারই নাম লিখিত হইয়াছে। আর কতজন বারাণসীতে স্ব স্ব মতের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার বিফল চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাহাদের চেষ্টা গঙ্গাবক্ষোত্থিত এক একটি তরঙ্গের মত মিলাইয়া গিয়াছে; তাহাদের নাম বিস্মৃতির অতলতলে বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ইতিহাস অসাফল্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাহে না। বারাণসী-হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র, তাই বৌদ্ধগণ বারাণসীর উপকণ্ঠে, ধর্ম্মপ্রচারকেন্দ্র সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।—তাই বৈরীনির্য্যাতিত বারাণসীর রক্তসিক্ত বক্ষে ইস্লামের জয়ধ্বজা প্রোথিত করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি আরঙ্গজেব অশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কালের ভেষজে সে ক্ষতচিহ্ন আজও মিলায় নাই। বারাণসী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ট্রেণ হইতে বারাণসীর জয়ধ্বনিতে তীর্থযাত্রিগণের অসীম উল্লাস আত্মপ্রকাশ করিল। যাত্রিদল যে আশায় দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়াছে, সে আশা ফলবতী হইয়াছে। কত দরিদ্র কষ্টলব্ধ সামান্য সঞ্চয় হইতে কিছু কিছু স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল—আশা, বারাণসী দর্শন করিবে; কত বিধবা বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরদর্শনে পরকালের উন্নতির আশায় ইহকালের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নষ্ট করিয়াছে; কত বৃদ্ধ বারাণসী-দর্শনের উৎসাহে শারীরিক দৌর্ব্বল্য জয় করিয়াছে; কত খঞ্জ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ পরের দয়ায় ও বিশ্বেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ তাহারা সফলসাধন। আজ তাহাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী। বারাণসীর বর বপু তাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত। তাই তাহারা আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে। ভারতের কাশীকথা ধরণীধরের মনে পড়িল।

"পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি,
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ কানন নাম কেবল কৈবল্য ধাম,
শিবের ত্রিশূলপরি স্থিত॥

*   *   *   *

যাহে জীব ত্যজি জীব সেইক্ষণে হয় শিব
পুনঃ সহে জঠর-যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা।"

ধরণীধর পূর্ব্বে একাধিকবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ যেন বারাণসীর কমনীয় কান্তি তাঁহার নিকট অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। বারাণসী ত্যাগীর স্বর্গ—মায়ামুগ্ধ মায়াবদ্ধ মানবের মনে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। পূর্ব্বে যখন তিনি বারাণসীতে আসিয়াছেন তখন তিনি সংসারী—সংসারের সুখ তাঁহার অভীপ্সিত। আজ তাঁহার সে স্বপ্ন শেষ হইয়াছে,—আজ অদৃষ্ট নির্ম্মম হস্তে তাঁহার সে আশার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে—তাঁহাতে মুক্তি দিয়াছে। আজ তিনি মায়া হইতে মুক্তি পাইয়া মহামুক্তির সন্ধানে সচেষ্ট; তাই আজ বারাণসী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব ভক্তির রসে স্নিগ্ধ ও সরস হইল।

ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে স্থির হইল। পূর্ণ যান শূন্য করিয়া শত শত যাত্রী কাশীর পুণ্য ভূমিতে অবতরণ করিল। আবার বারাণসীর জয়ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। ধরণীধর সেই জনসঙ্ঘে মিশিয়া চলিলেন।

কাশীতে কয়দিন থাকিয়াই ধরণীধর বুঝিলেন, তিনি মুক্তির সন্ধানে আসিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি হৃদয় হইতে সংসারের মায়া দূর করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারা হৃদয় সময় সময় দূরস্থিত পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়—তাঁহার কল্পনা সেই দূর পল্লীভবনে ফিরিয়া যায়। ফলে হৃদয় কেবল হতাশার বেদনায় পীড়িত হয়।

তিনি ইহার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, নদীর প্রবাহমুখে বাধা সংস্থাপিত করিয়া তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য; কিন্তু অন্য পথ প্রস্তুত করিয়া প্রবাহকে সেই পথে প্রবাহিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি সেই চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কাশীতে শাস্ত্রানুশীলনের সুবিধাও যথেষ্ট। তত্ত্বজ্ঞানান্বেষীর পক্ষে কাশীর মত উপযোগী স্থান আর নাই। ধরণীধর বিষয়বাসনাবদ্ধ চিত্তকে বাসনাবন্ধনমুক্ত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই জ্ঞানের তৃষ্ণা একবার হৃদয়ে দেখা দিলে হৃদয়ে আর কোন আশার—আর কোন তৃষ্ণার স্থান থাকে না—জ্ঞানান্বেষী ইহারই মোহে মুগ্ধ হইয়া আর সব ভুলিয়া যায়। সংসারে সম্পদ, স্নেহ, প্রেম সব ত্যাগ করিয়া এই জ্ঞানতৃষ্ণাতুর ইহারই জন্য ব্যাকুল হয়। ধরণীধরেরও তাহাই হইল। তিনি অন্য চিন্তা ভুলিবার চেষ্টায় যাহাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল—তিনি ক্রমে ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের সম্বল পরাবিদ্যার চর্চ্চায় তন্ময় হইয়া আর সব ভুলিলেন। তাঁহার মায়াবন্ধন যত শিথিল হইতে লাগিল—শানগরের সেই পল্লীভবন তাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্র হইতে তত দূরে পরিধিরেখায় অস্পষ্টদৃষ্ট বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল।

হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে ধরণীধর জয়ী হইলেন। কিন্তু সংগ্রাম সর্ব্বদা—সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য। যখন রাজায় রাজায় বিবাদ বাধিয়া উঠে, তখন লোক ফলাফলের প্রতীক্ষা করে ও জয়ীর সাফল্যে তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু তাহারা যে গৌরবে মুগ্ধ হয়—সে জয়গৌরব কত দুর্ম্মূল্য তাহা জয়ী ব্যতীত আর কেহ জানে না; সে জয় হয় ত জয়ীর সর্ব্বস্ব দিয়া ক্রীত—তাহার সর্ব্বনাশে হয় ত সে জয়ের পরিণতি। হৃদয়ের সহিত সংগ্রামও সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য—কুত্রাপি সুলভ নহে। ধরণীধর আপনার স্বাস্থ্য—আয়ু ব্যয় করিয়া জয় লাভ করিলেন। তাঁহার বলসমুন্নত দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—স্বাস্থ্যসম্পদহেতু জরা এত দিন যে দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, এখন সে দেহে তাহার ক্ষয়চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংসার।

যে বারি উর্ব্বর ক্ষেত্রে বর্ষিত হইলে শস্যসম্পদ উৎপাদিত করে, তাহাই পঙ্কসার পল্বলে পড়িলে মৃত্যুবাষ্পমাত্র উৎপন্ন করে। যে কথায় শিষ্টের ত্রুটি সংশোধিত হয়—তাহাতে অনেক সময় দুষ্টের দোষ বর্দ্ধিত হয়। বৈবাহিকের নিকট ভট্টাচার্য্য মহাশয় বামাচরণের ব্যবহারে যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বামাচরণ লজ্জিত হইল না,

বরং তাহাতে তাহার স্বার্থপর ব্যবহারের স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়া পড়িল। এতদিন যে সঙ্কোচ—যে লোকনিন্দাভয়—যে পিতৃরোষাশঙ্কা তাহার স্বার্থপর ব্যবহার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল এখন তাহা দূর হইল—তাহার ব্যবহারও সঙ্কোচসীমা অবাধে অতিক্রম করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল।

তারাচরণ কখন কলিকাতায়—কখন গৃহে থাকিত। এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, তাহাকে বিদ্যালয়ে দেওয়া আবশ্যক। তিনি তাহাকে শিক্ষালাভার্থ গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। বামাচরণ তাহাতে আপত্তি করিল—গ্রামের বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক নাই; সে পুত্রকে কলিকাতায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইতে চাহিল; উদ্দেশ্য, তাহা হইলে সে সপরিবারে কলিকাতায় স্থায়ী হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিলেন; বলিলেন, "ভাল, তাহাই হউক।" কিন্তু এ ব্যবস্থায় পরিবারের আর সকলে কিছু বিস্মিত হইল। পার্ব্বতীচরণের পত্নী বড়বধূকে বলিলেন, "দিদি, এ সময় তারাকে লইয়া যাওয়া কি ভাল হইবে? ঠাকুর এই এত বড় শোক পাইয়াছেন, তারা কাছে থাকিলে তিনি ভাল থাকেন।" বড়বধূ বলিলেন, 'আখেরের' ভাবনা ভাবিতে হয়। তখন যে আদর গোবর হইবে? তখন ছেলেই আমাদের দোষ দিবে। এখন কি আর মূর্খ হইয়া কেবল দক্ষিণার কড়িতে সংসার চালান যায়? আর কি দুই দশ হাজার আছে যে, বসিয়া খাইবে?" কথাটাতে উপার্জ্জনবিরত পার্ব্বতীচরণের প্রতি যে একটু শ্লেষ ছিল না—এমন বোধ হয় না। মধ্যমা বুঝিলেন, তর্ক করা বৃথা। এসব পূর্ব্বেই 'গড়াপিটা' হইয়া আছে। পার্ব্বতীচরণ স্বয়ং পিতাকে বলিল, "তারার এখন কলিকাতায় যাইয়া কায নাই। আপনার বড় কষ্ট হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ম্লান হাসি হাসিলেন, "কষ্ট! জীবনে অনেক পাইয়াছি—অদৃষ্টে আরও কত কষ্ট আছে, জানি না। আমার দিন কাটিয়াছে। এখন তোমাদের সুখী দেখিয়া মরিতে পারিলে তাহাই পরম ভাগ্য মনে করিব। তোমাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। এখন আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে।"

বামাচরণ আসিয়া পত্নীপুত্রকন্যা লইয়া গেল।

রাধাচরণ পরীক্ষা দিল না—সে বুঝিয়াছিল, পরীক্ষায় তাহার সাফল্য-

সম্ভাবনা নাই। তাহার পর সে পশ্চিমে একটি চাকরীর সংবাদ পাইয়া দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সে কথা জানাইল। সে যে তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে ও বিদেশে চাকরী গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—ইহা জানিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যথিত হইলেন। শেষে যখন তিনি জানিলেন, সে পত্নীকেও সঙ্গে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে তখন তিনি তাহাতেও সম্মতি দিলেন; কেবল বলিলেন, "বধূমাতা কখনও স্বতন্ত্র সংসার করেন নাই, যদি ভাল বিবেচনা কর তোমার পিসীমা'কে কিছু দিনের জন্য সঙ্গে লইয়া যাও। তুমি সংসার পাতাইয়া বসিলে তিনি চলিয়া আসিতে পারিবেন।" কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার বিদেশে চাকরী গ্রহণে আগ্রহের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রূপসী পত্নীর রূপজ মোহমুগ্ধ যুবক গুরুজনবিরহিত গৃহে পত্নীকে একান্ত আপনার রূপে পাইবার প্রবল বাসনায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিতেছিল—তাই সে বিদেশে চাকরী লইয়াছিল। নহিলে—সে জানিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্যদিগের চেষ্টায় কলিকাতাতেই তাহার চাকরী জুটিতে পারিত। আর সেইজন্যই সে উন্মাদরোগগ্রস্তা জননীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহে নাই। সে তাহার চাকরী করিবার কথা তাহার ভগিনীপতিকে লিখিয়াছিল। তিনি তাহাকে পুনরায় পড়িতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। শৈলজা ভ্রাতাকে লিখিয়াছিল, "তুমি যাহাই কর জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ না লইয়া করিও না। তিনি যে তোমার বিদেশে চাকরী করার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এমন বোধ হয় না। তিনি তোমাকে দূরে রাখিতে চাহেন না। তাঁহার স্নেহে আমরা পিতার অভাব কখনও বুঝিতে পারি নাই। দেখিও, যেন তোমার কাযে তিনি কষ্ট না পায়েন।" রাধাচরণ সে সব কথা কাণে তুলে নাই। সে পিসীমা'কে লইয়া যাইবার সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠতাতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কায করিতে পারিল না বটে; কিন্তু স্থির করিল, কর্ম্মস্থানে যাইয়া সংসার পাতাইয়াই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

পিসীমা'র রাধাচরণের সঙ্গে যাইবার ব্যবস্থায় বামাচরণ বিরক্ত হইল। কারণ, তিনি সংসারে থাকিলে সংসারের সব ঝঞ্ঝাটই তাঁহার।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল যেন, দারুণ ভূমিকম্পে তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর তাহারই মধ্যে তিনি বিপন্ন—ব্যথিত—শঙ্কাকুল

হৃদয়ে আপনার প্রিয়জনদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন। সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কি? এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শান্তির শেষ সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল।

তিনি অকালজলদোদয়ে ম্লান কমলের মত বিধবা দুহিতাকে লইয়া যে দিন গৃহে ফিরিয়াছিলেন—সেই দিন বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার শেষ জীবনে অভীপ্সিত শান্তি লাভ ঘটিবে না। তিনি যাহার আশায় আশান্বিত ছিলেন সেই শান্তিলাভ তাঁহার ভাগ্যে নাই। তাহার পর সরোজার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুই দুহিতার জন্য দুশ্চিন্তা দুই বিষধরের মত দংশনজ্বালায় তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতেছিল। অদৃষ্টের এই অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত আঘাতে তিনি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। কেবল দুহিতৃদ্বয়ের প্রতি—পরিজনগণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিয়াই তিনি বক্ষে বল বাঁধিতেন—ভাবিতেন, —কর্ম্মেই যাহার অধিকার সে ফলাফল কেন চিন্তা করিবে? কর্ম্ম করাই তাহার নিয়তি; নিয়তিনির্দ্দিষ্ট পথে তাহাকে যাইতেই হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন—হৃদয়ে বল বাঁধিয়া সান্ত্বনালাভের প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু তিনি যখনই বিরজার ও সরোজার মলিন মুখ দেখিতেন তখনই তাঁহার পিতৃহৃদয় বিষম বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিত—সেই চাঞ্চল্য তাঁহার বহু আয়াসলব্ধ স্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া দিত।

বিরজা অপত্যস্নেহস্বাদবঞ্চিতা হিন্দুবিধবার অবলম্বন ধর্ম্মকেই জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সে ব্রতাদির আচরণে শরীরকে ক্লিষ্ট ও চিত্তকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চিত্তজয় সহজসাধ্য নহে। গম্ভীরবুদ্ধি জ্ঞানবান পুরুষের পক্ষে যাহা কষ্টসাধ্য কোমল-প্রবৃত্তিপরায়ণা জ্ঞানহীনা রমণীর পক্ষে তাহা কত দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই নরচরিত্রাভিজ্ঞ হিন্দু শাস্ত্রকারগণ রমণীর পক্ষে স্বামীকে দেবতা করিয়া দেবতারাধনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। রমণীর পক্ষে মনুর ব্যবস্থা—

নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

সে কেবল পতি-দেবতায় চিত্তার্পণ করিয়া ক্রমে ঈশ্বরলাভের উপায় করা;

সীমাবদ্ধ হৃদয়ে সহসা অসীমের ধারণা করা দুঃসাধ্য, তাই সসীম হইতে অসীমকে লাভ করিবার ব্যবস্থা। বিরজা স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার পূর্ব্বেই—তাহার মুকুলিত যৌবনের প্রেমপিপাসাতুর হৃদয়ে প্রেমতৃষ্ণার তৃপ্তির পূর্ব্বেই—স্বামীকে হারাইয়াছিল। তাই এখন সে দেবতার ধ্যান করিতে বসিলে স্বামীর দিব্যমূর্ত্তি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিত; তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিত। সে দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলে তাহার মনে হইত, সে যেন পতিপদে প্রণতা হইত। দেবপূজা শেষ করিয়া সে যখন পতির চিত্রকে প্রণাম করিত তখন তাহার মনে হইত, দেবতা তাহাকে সেই পরিচিত রূপে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সে পতি-দেবতায় ও ইষ্টদেবতায় মিশাইয়া ফেলিত। হায় রমণী হৃদয়!

আর সরোজা? তাহার বিকাশোন্মুখ হৃদয় অতর্কিত বিষম আঘাতে ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার মত দুঃখ কাহার? প্রসন্নসলিলা প্রবাহিনীর কূলে দাঁড়াইয়া যে তৃষ্ণাতুর হতভাগ্য নিম্নে তপ্ত বালুর ও উপরে দীপ্ত সূর্য্যের উত্তাপে পীড়িত হয় অথচ সলিল স্পর্শ করিতে পায় না, তাহার দুঃখের সীমা আছে কি? সে শ্বশুরের স্নেহে যে অনাবিল সুখ পাইয়াছিল সে সুখভোগ যে তাহার অদৃষ্টে নাই তাহা সে বুঝিয়াছে, বুঝিয়া কাঁদিয়াছে। যতীশচন্দ্রের পিতামহীর আদরে সে মাতৃহারা কন্যা আবার যেন জননীর স্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু সে কতদিন সে আদর হইতে বঞ্চিতা! যে গৃহ তাহার সে গৃহে সে আর যাইতে পায় না।

সর্ব্বোপরি স্বামীর কথা। তিনি কোন্ দোষে তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করেন? আবার সে আপনাকে আপনি বুঝাইতে চেষ্টা করিত, তাঁহার দোষ কি? তিনি ত তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কেন সব বুঝেন নাই? যাহাকে অন্য সকলে ঘৃণা করে সেও একেবারে গুণশূন্য নহে। তাহার সে গুণ অন্যে দেখিতে না পাইলেও তাহা তাহার প্রেমপরায়ণা পত্নীর দৃষ্টি অতিক্রম করে না। তাই যে অন্যের নিকট একান্ত ঘৃণ্য, সেও স্বীয় গৃহে পত্নীর প্রেমে স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে। সরোজার নিকট যতীশচন্দ্রের অপরাধ ক্রমে একান্ত মার্জ্জনীয় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার প্রেম যাহার উদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছিল সে কি তাহার দোষ দেখিতে পায়? তাই সে স্বামীর দোষ দেখিত না; বরং সময় সময় আপনাকেই অপরাধী মনে করিত। কিন্তু সে কি করিবে?

এখন তাহার কর্ত্তব্য কি ? সে ভাবিত, ভাবিত আর কাঁদিত তাহার মনে সুখ ছিল না ; অধরে হাসি ছিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে কেবল দুঃখ।

—০—

নীরব কবি।

কল্প-সিন্ধু-উপকণ্ঠে বিশ্বাস অচলে
পবিত্রতা-তপোবনে সাধনা-কুটীর,
ভকতির প্রবাহিণী পুষ্পিত কুন্তলে
যতনে মুছায় তা'র চরণ রুচির।
অঙ্গ বেয়ে ঝরে কিবা রস-নির্ঝরিণী,
মন্দ মন্দ শান্তি-বায়ু বহে নিরমল ;
রোষ-সিংহ নিদ্রাতুর, কাম-কুরঙ্গিণী
অঙ্কে তা'র রহে সুখে নিদ্রায় বিহ্বল।
সে কুটীরে ধ্যান-মগ্ন স্তিমিত-অন্তর
বিরাজে নীরব কবি নিশ্চল নয়ন,
খসিয়া পড়েছে দূরে ছাড়ি' কলেবর
মলিন বসন সম দেহের চেতন !
চিত্তে বহে ভাব-স্রোত মহান্ উদার,—
অজ্ঞাতে করিছে পান বিশ্ব সুধা তার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

(পঞ্চম অধ্যায়।)

নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমিতি সর্ব্বজনসমক্ষে রাজাজ্ঞা অবহেলা করিলেও ফরাসীরাজ শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলনে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। গার্ড ডি ফ্রান্স এবং অপরাপর সৈনিকদিগের বিদ্রোহিতা নিবন্ধন, তাঁহার সমিতির ইচ্ছানুসরণ ভিন্ন উপায়ন্তর ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে অকস্মাৎ দুর্ভাগ্যের নিম্নতম প্রদেশে নিপাতিত হইয়া সংসারে কোন ব্যক্তিই সুস্থির চিত্তে কালযাপন করিতে পারে না। যিনি এ যাবৎ কোটি কোটি মানবের অধীশ্বর রূপে বিরাজমান থাকিয়া বিশাল ফরাসীরাজ্যে একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন, অদ্য তিনি সহসা সর্ব্বশক্তিবিবর্জ্জিত হইয়া অদৃষ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সেই জন্য তিনি উদ্যম, অধ্যবসায় ও স্বীয় পুরুষকারের সাহায্যে অদৃষ্টের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত তিনি মার্সাল ডি ব্রলীকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ধনজনবিহীন নিঃসহায় রাজা অদ্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী। রাজসৈন্যগণ বিদ্রোহভাবাপন্ন; সুতরাং আপনার আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই। যাহারা চতুর্দ্দিক হইতে রাজসিংহাসনের প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে আপনি যদি শোণিত-প্রবাহে ধরাধাম কলঙ্কিত না করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।" মার্সাল জনৈক রণবিশারদ কৃতকর্ম্মা বীরপুরুষ। য়ুরোপ-খণ্ডে এ যাবৎ তিনি শৌর্য্য বীর্য্য ও রণনিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে জাতীয় ভাবের অভ্যুদয়ে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ সমগ্র ফ্রান্স অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি তাঁহার চিত্তে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সেই জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই। সুতরাং তাঁহার রাজভক্তি অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান। কিন্তু তিনি রাজভক্ত ও রণবিশারদ হইলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থাবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সমগ্র ফরাসীজাতি যে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজশক্তির সহিত শক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান তাহা

তিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেইজন্য ফরাসীরাজ তাঁহার শরণাপন্ন হইবামাত্র তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই রাজধানীর শান্তি সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি যদি উপস্থিত বিভ্রাটের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঈদৃশ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতেন কি না সন্দেহ।

ফরাসীরাজ সৈনিকগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেও, শোণিত-পিপাসু নৃপতিকুলের ন্যায় রুধিরপ্রবাহে ধরাধাম কলুষিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি মনে করিলেন যে, অস্ত্রবল প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। কিন্তু তিনি স্বয়ং পাশব শক্তি প্রয়োগের বিরোধী হইলেও রাজসভার অপরাপর সভ্যগণের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বলিলেন, "জাতীয় সমিতির সভ্যগণ এযাবৎ আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিহিংসার সময় উপস্থিত। তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত আমাদের কৃপাণ শাণিত হইয়াছে।" কেহ কেহ বা হৃদয়ের আবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া সভ্যগণকে গবাক্ষরন্ধ্র হইতে ভূতলে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। মার্সাল ব্রলী সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রগল্‌ভতাবশতঃ এই মত প্রকাশ করিলেন, "পঞ্চাশ সহস্র সৈনিকের সাহায্যে আমি অবলীলাক্রমে কার্য্যসিদ্ধি করিব।" বলা বাহুল্য, এতাদৃশ অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণের হস্তিমূর্খতাই রাজশক্তির অধঃপতনের প্রধান কারণ। মন্ত্রীবর নেকার সমর নীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না; কিন্তু রাজসভায় তাঁহার প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধায়োজনের গূঢ় রহস্য বিন্দুবিসর্গ অবগত ছিলেন না। কাহার আদেশক্রমে, কোন্ স্থান হইতে কি উদ্দেশ্যে সৈন্যগণ সমবেত হইতেছে, তিনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু এ দিকে সেনাপতিপ্রবর অপরিমিত উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জার্ম্মাণী ও সুইট্-জারলাণ্ড হইতে দলে দলে বিদেশীয় সৈন্যগণ আগমন করতঃ ভার্সেলিস নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। সংখ্যাতীত বারুদপূর্ণ শকট, বহুসংখ্যক কামান বন্দুক সঙ্গীন তরবারী প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রপুঞ্জ সংগৃহীত হইতে লাগিল। প্যারিস ও ভার্সেলিস নগরীদ্বয়ের

মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিংশতি সহস্র সৈন্যের উপযোগী সেনানিবাস নির্ম্মিত হইতে লাগিল। প্যারিসের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে সৈন্য সংস্থাপিত হইল। ফরাসীরাজ ধনজনবিহীন নিঃসহায় হইলেও মার্সাল ব্রলীর কার্য্য-কুশলতা নিবন্ধন, তাঁহার যুদ্ধায়োজনে কোন ত্রুটি হইল না।

কিন্তু এ দিকে ফরাসীরাজের সমরসজ্জায় বিশেষতঃ বিদেশীয় সৈনিকগণের আগমনে প্যারিস নগরী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। নিরক্ষর ইতর সাধারণ উন্মত্ত হইয়া দলে দলে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনশনক্লিষ্ট সংখ্যাতীত ব্যক্তি প্রতি গ্রাম ও নগর হইতে সমাগত হইয়া রাজধানীর উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণের সহিত সম্মিলিত হইল। রাজসৈন্যদল বিদেশীয় সৈনিকগণের আগমন দর্শনে রাজদ্রোহী হইয়া রাজদ্রোহী জনসাধারণের সহিত যোগদান করিল। সাধারণতন্ত্র শাসনের পৃষ্ঠপোষকগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাজসিংহাসন উৎপাটনকল্পে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা পথে ঘাটে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকারে রাজা ও মন্ত্রিবর্গের যদৃচ্ছাচার প্রতিপাদন করিতে লাগিল। সুতরাং অচিরে প্যারিস নগরীতে হুলস্থুল কাণ্ড আরম্ভ হইল।

জাতীয় সমিতির সভ্যগণের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উদারনীতি-পরায়ণ নেকার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ফরাসীরাজ কুমন্ত্রণাদাতাদিগের যুক্তির অনুসরণে ফরাসীজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, মন্ত্রিবরের সর্ব্বশক্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং দলে দলে বিদেশীয় সৈন্য আসিয়া জাতীয় স্বাধীনতায় হস্তার্পণের নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ করিতেছে, তখন তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন না। তাঁহারা বাগ্মীকুলতিলক মহামতি মিরাবোর প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মর্ম্মে রাজ-সকাশে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন :—

"চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যসম্মিলন, চতুর্দ্দিকে শিবিরনির্ম্মাণ এবং রাজধানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—ফরাসীজাতি কি রাজার অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে? নতুবা এ রণসজ্জার কারণ কি? রাজার শত্রু কোথায়? কাহাকে দমন করিতে হইবে? বিদ্রোহী বা ষড়যন্ত্রকারী কাহারা? প্রজাবাৎসল্যবশতঃ আপনি ফরাসী জাতিকে যে মহার্ঘ্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা

আপনার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ।। সুতরাং কুমন্ত্রণাদাতাদিগের যুক্তি অনুসরণ না করিলে আপনার কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। কুমন্ত্রণাদাতৃগণ আপনার চিত্তে কি প্রকার সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে জানি না। আপনি কি ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন যে, তজ্জন্য প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হইবেন? আপনি কি প্রজাশোণিতে ফরাসী-ভূমি প্লাবিত করিয়াছেন? আপনি কি ফরাসীজাতির প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন? প্রজাগণ কি কখনও আপনাকে তাহা-দের দুর্ভাগ্যের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে? তাহারা কি আপনার শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে? তবে এ বৃথা সমরসজ্জার কারণ কি?

"কিন্তু এস্থলে একটি কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে ফরাসীদেশে প্রেমমার্গ অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোন নীতি অবলম্বনে রাজ্যশাসন সম্ভবপর নহে। আপনি স্বয়ং যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ফরাসীজাতি আপনাকে তাহা ত্যাগ করিয়া পন্থান্তরে গমন করিতে কোন ক্রমে দিবে না। আমরা সৈন্যসমাগমে সমূহ বিপদ দৃষ্টি করিতেছি। রাজা ফরাসীজাতির স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রদেশবাসিগণ একবার ধৈর্য্যচ্যুত হইলে তাহা-দিগকে নিরস্ত করা সহজ ব্যাপার হইবে না। দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান হেতু তাহারা রাজধানীর প্রত্যেক ঘটনা বৃহদাকারে দৃষ্টি করিবে, সুতরাং বিপদের পরিসীমা থাকিবে না। প্যারিসবাসিগণও সৈন্য-সমাগম প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিবে না। কারণ, তাহারা দুর্ভিক্ষসমাগমে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহাতে যদি সৈন্যদল আসিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রাজধানীতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে খাদ্যসামগ্রী এককালে দুর্লভ হইবে, সুতরাং তাহাদের ক্লেশের পরি-সীমা থাকিবে না। আবার ভাবিয়া দেখুন, সৈন্যগণের আগমনে সর্ব্ব-সাধারণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং শান্তিরক্ষার নিমিত্ত কোন স্থলে বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে, ঘোরতর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন আরও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক আন্দো-লনের সন্নিকট সৈন্যগণের অবস্থিতি যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, ফরাসী সৈন্যগণ ফরাসী জাতি হইতে বিভিন্ন নহে। আবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে

রাজধানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিলে আমরাও স্বাধীন ভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইব না। সুতরাং আমরা সৈন্য-সম্মিলনে অশেষ প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিতেছি। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কারণ হইতে জগতে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র কারণ হইতে মহা প্রলয়ের উৎপত্তি হইয়া রাজা প্রজা উভয়ের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা ফরাসী জাতিকে অবহেলার সামগ্রী মনে করেন, আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না। আমাদের বিশেষ অনুরোধ— আপনি সৈন্যগণকে অচিরে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। তাহারা রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করুক। আর বিদেশীয় সৈন্যগণকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করুন। দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ রাজভক্ত ফরাসী যে রাজার প্রজা তাঁহার বিদেশীয় সাহায্যের প্রয়োজন কি?"

ফরাসীরাজ এই প্রাজ্ঞ আবেদনের উত্তরে বলিলেন:—

"সংপ্রতি প্যারিস নগরে যে সমস্ত কুৎসিত নাট্যের অভিনয় হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই জন্য রাজধানী ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে শান্তি-সংরক্ষণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, শান্তি-সংরক্ষণই রাজার প্রধান কার্য্য। সেই উদ্দেশ্যেই আমি প্যারিস নগরের চতুর্দ্দিকে সৈন্যসংস্থাপন করিয়াছি। রাজধানীর শান্তিরক্ষণ ও সমিতির সভ্যগণের স্বাধীনতা রক্ষা ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। খলপ্রকৃতি ব্যক্তি ভিন্ন কেহই আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না। তবে যদি সৈন্য-সমাগম দৃষ্টি করিয়া সভ্যগণ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, আমি স্থানান্তরে সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

রাজপ্রদত্ত উত্তর সমিতিগৃহে আলোচিত হইল। জনৈক সভ্য বলিলেন, "রাজা বলিয়াছেন, রাজধানীর শান্তি রক্ষার নিমিত্ত সৈন্য সমবেত হইয়াছে। সমিতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য; কারণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্যই যথেষ্ট।"

মহামতি মিরাবো বলিলেন:—

"রাজা বলিয়াছেন যে, তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি নাই। এ কথা

আমরা বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু মন্ত্রীদিগের কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিব? মন্ত্রী বারম্বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। দূরদর্শিতার অভাবপ্রযুক্ত রাজা পরবুদ্ধিচালিত হইয়া আমাদিগকে বারম্বার শঙ্কটাপন্ন করিয়াছেন,—ইহা কাহারও অবিদিত নাই। যদি চিরদাসত্ব পরিহারের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা একবার চক্ষুরুন্মীলন করুন। রাজা প্রকারান্তরে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সৈন্যগণকে স্থানান্তরে প্রেরণের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমরা স্থানান্তরিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি নাই। সৈন্যগণ রাজধানীসন্নিধানে উপস্থিত থাকিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সমিতি স্থানান্তরিত হইলে সেই বিপদের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কবি।

সদা ভাবে ভোলা মন,
কিবা পর, কি আপন,
সে চাহে না কোন দিন, কারো পরিচয়।
নাহি জানে কোন ভেদ,
নাহি মানে কোন খেদ,
প্রেম-যমুনার ধারা হৃদে সদা বয়।
তরু লতিকার সনে
কথা তা'র নিরজনে,
পুষ্পগুচ্ছ বুকে ধরে সোহাগে—আদরে;
দলিতে দূর্ব্বার দল
আঁখি তা'র ছল ছল,
করুণার উৎস যেন উথলে অন্তরে।
চাঁদ দেখি' ভরে বুক,
মনে ভাবে চাঁদমুখ,
মেঘে এলোকেশ দেখে, চপলায় হাসি।

কুলু-কুলু নদী ধায়,
তা'রি সনে গীত গায়,
কত কথা বলে তারে, ফুটে ভাবরাশি।
তার যে প্রাণের বীণা,
বাজে সে বিরামহীনা,
শুনে কেহ, নাহি শুনে—মিশে সন্ধ্যাকাশে।
কোন্ সে আরাধ্যা লাগি',
সারা রাতি রহে জাগি',
যদি তা'র শুভ স্পর্শ একবার আসে।
হোক্ সে ধরার প্রাণী,
নাহি তা'র জানাজানি,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে স্তুতি-নিন্দা-যশ;
গর্ব্ব তা'র— দীনতায়,
ঘৃণা তা'র—হীনতায়,
বসুধা কুটুম্ব তা'র, সর্ব্বভূত বশ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

জন্ম—
১৫ই চৈত্র, ১২৪৪ সাল।
1st. April 1838.

মৃত্যু—
৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল।
21st October 1912.

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

গত ৫ই কার্ত্তিক পরিণত বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে তাঁহার কৃতিত্বকথা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ জীবন শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তিন পুরুষ বাঙ্গালী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে। আর তাঁহার শিক্ষাদানপ্রণালীর এই বিশেষত্ব ছিল যে, তাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক যখন বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিল তখন শিক্ষকরূপে কৃষ্ণ বাবুর যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে—তখন তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি Phrases and Idioms "বঙ্গে যথা তথা।" তখন ছেলেকে হেয়ার স্কুলে কি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে সে কথা উঠিলে লোক বলিত, "যদি ছেলেকে ইংরাজী শিখাইতে চাহ, তবে হেয়ার স্কুলে দাও,--কেষ্ট বাবু আছেন।" বাস্তবিক কৃষ্ণ বাবুর শিক্ষাদানপদ্ধতি অতি বিস্ময়কর ছিল। তিনি খুঁটিনাটি লইয়াই হয় ত ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন—উচ্চারণের জন্য তিনি হয় ত ঘণ্টায় তিন চারি ছত্রের অধিক পড়াইতে পারিলেন না। শব্দ যাহাতে সুপ্রযুক্ত হয় সে জন্য তিনি সকল ছাত্রকে Webster's Dictionary হইতে শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিতেন; এ বিষয়ে কোনরূপ ওজর আপত্তি শুনিতেন না, এমন কি একবার একজন ছাত্র আর্থিক অভাব প্রযুক্ত ঐ অভিধান কিনিতে অক্ষমতা জানাইলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলে, "এবিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না—Buy, beg or borrow—ঐ অভিধান সংগ্রহ কর।" এক দিন একটি ছাত্র প্রশ্নের উত্তরে একটি কথার যে অর্থ বলিয়াছিল তাহা সঙ্গত, কিন্তু সে প্রতিশব্দটি ওয়েবষ্টারে নাই। কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "এ প্রতিশব্দ তুমি কোথায় পাইলে?" বালকটি বলিল, তাহার গৃহ-শিক্ষক বলিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "তোমার গৃহ-শিক্ষক আছেন! তুমি যদি আর কখনও অভিধান দেখিয়া স্বয়ং প্রতিশব্দ সংগ্রহ কর না দেখিতে পাই, তবে তোমাকে যে শাস্তি দিব তাহা কখনও ভুলিবে না।"

মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যখন হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিলাম তখন কৃষ্ণ বাবুকে দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হইল। কারণ, "মাইনর"

(মিড্‌ল্‌ ইংলিস) পরীক্ষার তাঁহার Middle Class Reader ও ভারত-বর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলাম। দেখিলাম—গৌরবর্ণ প্রৌঢ় মূর্ত্তি—আননে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা সপ্রকাশ। এই স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যহেতু ছাত্রদল তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিত; অলস বা বিলাসী ছাত্রদল হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলেই স্কুল ছাড়িয়া যাইত। অথচ কৃষ্ণচন্দ্র কখনও ছাত্রদিগের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন না। তাঁহার শাণিত বিদ্রূপই ছাত্রশাসনের পথে যথেষ্ট ছিল। একবার প্রশ্নোত্তরে একটি ছাত্র whether বানান করিয়াছিল wheather কৃষ্ণ বাবু ক্লাসে তাহাকে ঐ শব্দটি বানান করিতে বলিলেন। সে উত্তর করিল wheather; কৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "e ও a বলিলে—i, o, u তিনটি বাদ দিলে কেন?" বেচারা আর যাহাই করুক আর কখন ও whether বানান ভুল করে নাই।

কৃষ্ণ বাবু যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। হেষ্টিংসের চক্রান্তে যে নন্দকুমারের ফাঁসী হয়—যাঁহার বিচারকে কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক Judicial Murder বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, কৃষ্ণচন্দ্র সেই নন্দকুমারের দৌহিত্রের পৌত্র। মহারাজা নন্দকুমারের এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্র রাজা গুরুদাস অপুত্রক থাকিয়া লোকলীলা সম্বরণ করেন; কন্যা আনন্দময়ীরও অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। কন্যা সোনামণির সহিত জগৎচন্দ্রের ও কিণুমণির সহিত রাধাচরণের বিবাহ হয়। জগৎচন্দ্রের বংশধরগণ কুঞ্জঘাটার "রাজা" বলিয়া পরিচিত, কৃষ্ণচন্দ্র রাধাচরণের প্রপৌত্র।

নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার তখন রাধাচরণ মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ-স্থিত সৈদাবাদ হইতে আসিয়া ভট্টপল্লীতে বাস করেন। তাঁহারই গৃহের মর্ম্মরাবৃত বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে মহারাজ নন্দকুমারের দরবার বসিত। রাধাচরণ নবাব মবারকউদ্দৌলার উকীল ছিলেন এবং সেইজন্য পুরুষানু-ক্রমে "বাবু" ও "রায় রাঞা" বলিয়া অভিহিত হইবার অধিকার পাইয়া-ছিলেন। তখন "বাবু"—বর্ত্তমান সময়ের "বাবু" হইতে অনেক ভিন্ন প্রকারের সম্মান ছিল। ভট্টপল্লীতে তাঁহার জমীদারী "বাবুর আনি," তাঁহার বাজার "বাবুর বাজার," তাঁহার বাসপল্লী "বাবুর পাড়া" নামে এবং তমলুকে তাঁহার জমীদারী দোরো পরগণা "রায় রাঞা চক" নামে প্রসিদ্ধ।

রাধাচরণের পৌত্র তারকনাথ স্বধর্ম্মপরায়ণ ও অথিতিবৎসল লোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গঙ্গাপ্রবাহে দাঁড়াইয়া পূজা করিতেন। তিনি পুত্রদিগের শিক্ষা শেষ না হইলে তাঁহাদিগের বিবাহ দেন নাই; এবং বহু আত্মীয়স্বজনের আপত্তি সত্ত্বেও পুত্র গোপালচন্দ্রকে মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ডেপুটীগভর্ণর ম্যাডক ও লিট্‌লার, সার অ্যাসলি ইডেন, বোর্ড অব রেভিনিউর আর্থার গ্রোট প্রভৃতি য়ুরোপীয়ের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। সন ১২৮০ সালে ১৫ই ভাদ্র তারিখে হাওড়ায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

কৃষ্ণচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র ও তৃতীয় সন্তান। সন ১২৪৪ সালে ১৫ই চৈত্র তারিখে মাতুলালয় খাসবাটী—হালিসহরে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মের সাড়ে সাত মাস পরেই কৃষ্ণচন্দ্র মাতৃহীন হয়েন। প্রতিবেশিনী কায়স্থ মহিলা ব্রহ্মময়ী মাতৃহীন ব্রাহ্মণসন্তানকে লালন পালন করেন।

সাত বৎসর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র চুঁচুড়ায় হরচন্দ্র রায়ের ইংরাজী স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি যখন এই স্কুলের ছাত্র, সেই সময় এক দিন (১৮ই মে, ১৮৫৯) মিষ্টার লজ স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে ও রসিকলাল নিয়োগীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি বালক কৃষ্ণচন্দ্রের আবৃত্তিতে বিশেষ প্রীত হয়েন ও তাঁহাকে হুগলী কলেজে বিনা বেতনে পাঠের অধিকার দেন। এই কলেজে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মাসিক ৮৲ টাকা "জুনিয়ার" বৃত্তি লাভ করেন। হুগলী কলেজে তিনি মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দত্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী ও কার, থয়েটস, লজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শিক্ষকের ছাত্র ছিলেন। শ্রীনাথ বাবু ছাত্রদিগকে অভিধান ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন। ঈশান বাবুর গ্রের Elegy ও Eton College পড়াইতে ছয় মাস লাগিয়াছিল। মিষ্টার কার এক বৎসরে Vanity of Human Wishes শেষ করিয়াছিলেন। সব গুলিই ক্ষুদ্রায়তন কবিতা। অতএব দেখা যাইতেছে খুঁটিনাটি লইয়া সময় কাটাইয়া শিক্ষা স্থায়ী ফলপ্রদ করিবার অভ্যাস কৃষ্ণচন্দ্রের গুরুদত্ত সম্পদ। তখন বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক ছিল—নীলমণি বসাকের 'নবনারী'। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন

এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ সংস্থাপিত হইলে তথায় আইসেন। কবি হেমচন্দ্র ও সুধী শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সতীর্থ। কলিকাতায় তখন "রেতে মশা, দিনে মাছি।" এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠ ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইতে হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ শর্ষা স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হয়েন ও অল্পদিন পরেই বারাসতে আসিয়া সার অ্যাসলি ইডেনের স্কুল সংস্থাপিত করেন। ইহার পর তিনি পুলিশ দারোগা হয়েন, কিন্তু সে কার্য্য ভাল না লাগায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পুরী জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যায়েন। তখন পথের অবস্থা এরূপ ছিল যে, ভট্টপল্লী হইতে পুরী যাইতে তাঁহার দেড় মাস লাগিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বহরমপুরে বদলী হয়েন। তখন সাঁইতিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক মাসে তিনি পুরী হইতে বহরমপুরে পৌঁছেন। বহরমপুরে তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষকতা ও জিলার জজের অনুবাদকের কায করিতে হইত। অথচ এই দুই কার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচিত হয় (১৮৬০)। বরিশাল জিলা স্কুলের হেড মাষ্টারের কায করিতে অস্বীকৃত হইয়া তিনি রামপুর বোয়ালিয়ার স্কুলে বদলী হয়েন। তখন মিষ্টার মারে স্কুলের পরিদর্শক। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্যনিপুণতায় বিশেষ প্রীত হয়েন। তাহার পর তাঁহাকে আরায় যাইতে হয়। তখন অভিধানপ্রণেতা ডাক্তার ফ্যালন তথায় ইন্‌স্‌পেক্টর। তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় কৃষ্ণচন্দ্র চাকরী ত্যাগ করেন। কিন্তু ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকসান্ মিষ্টার আটকিসন তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করাইয়া আবার বহরমপুরে বদলী করেন। ইহার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সাবরেজিষ্টার হইয়া বালেশ্বরে যাইতে হয়। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে বহু সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় কায বাকি পড়িয়া গিয়াছিল। সেই কায শেষ করিয়া দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় বহরমপুরে আইসেন। অসুস্থ হইয়া তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে আইসেন। তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু স্কুলের ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার শরীর বহুদিন হইতেই অসুস্থ ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে

তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার রক্তামাশায় হইত। গত মহাপঞ্চমীর দিন তাঁহার রক্তামাশয় দেখা দেয় এবং সেই রোগেই একাদশীর দিন তাঁহার জীবনান্ত হয়। তাঁহার সাধ্বী পত্নী পতির সাত বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন।

শিক্ষাদানেই কৃষ্ণ বাবুর কৃতিত্ব; শিক্ষালাভেই তাঁহার আনন্দ ছিল। শেষ ব্যাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ রাত্রি ১২টা হইতে প্রাতঃকাল ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন। ইহার মধ্যে কেবল প্রত্যুষে ভ্রমণে এক ঘণ্টা ব্যয়িত হইত। আবার অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন চলিত। এ অধ্যয়ন কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য—জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে। তিনি যে পুস্তকই পাঠ করিতেন তাহা বিশেষ যত্নসহকারে করিতেন—পুস্তকের সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ রেখায় সে অধ্যয়নচিহ্ন থাকিত। আবার যখন যাহা পড়িতেন তাহার আবশ্যক অংশ—সুপ্রযুক্ত শব্দাদির ব্যবহারনিদর্শন খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। তিনি সমস্ত জীবন এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর ছয় দিন পূর্ব্বে লেখনী ত্যাগ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়াছিলেন—সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা। তাঁহার Phrases and Idiomsএর পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। উহার প্রকাশের পর ঐ প্রকারের বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই উহার সমকক্ষ নহে। Middle Class Readerএর সংগ্রহে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা হইতে আদর্শচরিত্রকথা বাছিয়া এই সংগ্রহ, অথচ রচনাপ্রণালীতে বৈষম্য অত্যধিক নহে। এ সংগ্রহে যে নিপুণতার পরিচয় আছে তাহা বাঙ্গালীর কেন, বহু ইংরাজের কৃত সংগ্রহেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এতদ্ভিন্ন Higher Class Reader উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত' সরল ভাষায় লিখিত। যখন একখানি পাঠ্য পুস্তকে "পর্ব্বতকটকে লৌহকীলক প্রোত করিয়া আরোহণ করিলেন" পাঠ করিতাম, তখন কৃষ্ণবাবুর ভাষা এত ভাল লাগিত যে তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

তিনি Lord Curzen's Work in India পুস্তকে লর্ড কার্জ্জনের কৃত কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন কমিশনের সময় তিনি যে দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন সেই

দুইখানিতে অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্মদর্শনের প্রমাণ এত অধিক যে, কমিশন দুইখানি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে Fraser Junior ছদ্মনামে লিখিত তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধের ফলে শিক্ষা বিভাগে বেতনের বিভাগের (grading) ব্যবস্থা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র হুগলী কলেজে বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য একটি ও নদীয়া জিলার ন্যায় পরীক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য একটি মেডল দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমটি তাঁহার পিতা তারকনাথ রায়ের নামে ও দ্বিতীয়টি তাঁহার পত্নী বিরাজমোহিনী দেবীর নামে প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি আহারে, ব্যবহারে, বেশে আড়ম্বরশূন্য ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছন্নতা ও উদ্ভিদপ্রিয়তা অসাধারণ ছিল। তিনি স্বহস্তে বৃক্ষলতাদি রোপণ করিতেন ও সময় সময় গৃহসম্মুখস্থ রাজপথের ফুটপাতেও ঘাস বসাইয়া জল দিতেন। এমন কি তিনি গৃহসম্মুখস্থ ফুটপাথ স্বয়ংই ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিতেন।

তাঁহার মত জ্ঞানান্বেষণপ্রয়াসী বাঙ্গালী অধিক নাই। তিনি Plain living and high thinkingএর যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাহা অনুকৃত হইলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম হইবে।

তাঁহার কৃতী ছাত্রের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহার ছাত্রগণ কি তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোন আয়োজন করিবেন না?

কবি।

দার্শনিক চাহে শুধু নীরস প্রমাণ;
বৈজ্ঞানিক মরে খুঁজে কারণ কেবল,
তবুও সন্তোষ হীন; সরস মহান—
কবি যাহা দেখে তাই—নবীন সরল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাক্ষসী না দেবী?

(১)

সুরেন্দ্রের ভাবী শ্বশুর শ্যামলাল বাবু যখন তাঁহার কন্যা নিরুপমার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হয়েন তখন সুরেন্দ্রের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তৎপূর্ব্বেও বহুলোক সুরেন্দ্রকে জামাতৃত্বে বরণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাপতি তাঁহাদের কাহারও কন্যার সহিতই তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন নাই। শ্যামলাল বাবুর সহিত সুরেন্দ্রের পিতার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল; কাযেই বংশপরিচয়াদি জানিবার আর প্রয়োজন হইল না। সেই প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র প্রজাপতির অদৃষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেতে সুরেন্দ্রের পিতা শ্যামলাল বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিতে সম্মতি দান করিলেন, তবে আত্মীয়স্বজনগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া পাকা জবাব দিতে পারেন না এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে চারিজন ভদ্র লোকের সম্মুখে দেনা পাওনার মীমাংসা হইয়া কথাবার্ত্তা স্থির হওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া পুনরায় শ্যামলাল বাবুকে চতুর্থ দিবসে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি আসিবার সময় শ্যামলাল বাবুকে তাঁহার কন্যার জন্ম-পত্রিকাখানি আনিতে বলিয়া দিলেন; কিন্তু শ্যামলাল বাবু তাঁহার কন্যার জন্ম-পত্রিকা নাই বলাতে অগত্যা সুরেন্দ্রের পিতা তাঁহাকে কন্যার জন্মের বৎসর, মাস, বার ও সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন।

(২)

সুরেন্দ্রের পিতা পরদিন গ্রাম্য আচার্য্য মহাশয়কে ডাকাইয়া পুত্রের কোষ্ঠীখানি দেখাইলেন, এবং যে কন্যার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক তাহার কোনও জন্মপত্র নাই সুতরাং এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য জানিতে চাহিলেন। গ্রহাচার্য্য মহাশয় সুরেন্দ্রের কোষ্ঠীখানি দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। মহাশয়, তিনি পূর্ব্বেই পাত্রপাত্রীর যোগাযোগ স্থির করিয়া রাখেন, কন্যার জন্মকোষ্ঠী যদি না থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই। পাত্রের লগ্ন প্রভৃতি দেখিয়াই শুভদিন ঠিক করিয়া দিব।" তৎপরে আচার্য্যপ্রবর সুরেন্দ্রের পিতাকে কাণে কাণে বলিলেন, "সুরেন্দ্রের

রাক্ষস গণ, সুতরাং কোষ্ঠীবিচার লইয়া গোলযোগে কোনও লাভ নাই। কন্যার যদি রাক্ষসগণ হয় সে ত উত্তম। আমার ত বিশ্বাস কন্যার রাক্ষস গণ, তাই কন্যার পিতা কোষ্ঠী গোপন করিতেছেন। আর দেখুন, যদি কন্যার দেব গণ হয় তাহা হইলেও কোনও ক্ষতি নাই; আর যদি নর গণ হয় তাহাতেও আপনার পুত্রের ত কোনও অনিষ্ট হইবে না। তবে আমার বিশ্বাস, কন্যাটির রাক্ষস গণ। যাহাই হউক, যদি আপনি তথায় বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন স্বচ্ছন্দে মত দিতে পারেন। তাহার পর এক দিন শুভদিন স্থির করিয়া দিব।" এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইলে আচার্য্য মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৩)

নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও সুরেন্দ্রের কতিপয় আত্মীয় সন্ধ্যাকালে পাত্রপক্ষের বাটীতে মজলিস করিয়া কন্যার পিতা শ্যামলাল বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং ঘন ঘন তাম্রকূট ধূমোদ্গীরণ করিয়া নানারূপ হাস্যপরিহাসে স্থানটিকে আনন্দ-কোলাহলমুখরিত করিয়া তুলিতেছেন, এমন সময় শ্যামলাল বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ সাদরে শ্যামলাল বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই চারিটি অবান্তর কথার পর বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বিধাতাপুরুষ পূর্ব্বেই যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাহা স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। উভয় পক্ষের দেনা পাওনার কথাবার্ত্তা সমাগত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে স্থিরীকৃত হইল। বিবাহের দিন পরে স্থির করা যাইবে, উভয় বৈবাহিকই এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তবে বিবাহসম্বন্ধে আর কাহারও কোনও অমত রহিল না। যথা-সময়ে সভাভঙ্গ হইল। সুরেন্দ্রের পিতার আগ্রহাতিশয়ে সকলেই একটু একটু 'মিষ্টমুখ' করিলেন। শ্যামলাল বাবু প্রথমতঃ কন্যার বাটীতে দৌহিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত আহার নিষিদ্ধ এই মত উত্থাপিত করিয়া জলযোগে দারুণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না,—সকলেই বলিলেন "বিবাহ হউক, তাহার পর সে কথা। আসুন একটু 'মিষ্টমুখ' করিয়া এই শুভকার্য্যের প্রারম্ভকে মধুর করিয়া দিউন।" অগত্যা শ্যামলালবাবুকে সম্মতিদান করিতে হইল। জলযোগের পর সকলেই বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

প্রথম যে দিন শ্যামলাল বাবু আসিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ সেই দিনই বুঝিয়াছিল, বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইবে। সে নিতান্ত 'ছেলেমানুষ' ছিল না, বিশেষতঃ এই উপন্যাসপ্লাবিত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেও নানা পাঠ্য অপাঠ্য উপন্যাস পাঠ করিয়া তাহার জীবনসঙ্গিনীর সম্বন্ধে একটা আদর্শ ইতঃপূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের কথাবার্ত্তা শেষ হইবামাত্র সে কন্যাটি দেখিতে কেমন, তাহার বয়স কত, সে লিখাপড়া জানে কি না ইত্যাদি তথ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। পাশ্চাত্যশিক্ষালোকপ্রাপ্ত তরুণ যুবা সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনসঙ্গিনীকে কেমনটি চাহে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সাধারণতঃ যুবকগণ বিবাহের পূর্ব্বে কল্পনারাজ্যে বিচরণকালে যেমন আদর্শ খাড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে সুরেন্দ্রনাথও তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রের আশা পূর্ণ হইবে কি? গোপনে তথ্যসংগ্রহ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ অবগত হইল যে, পাত্রীটি গৌরাঙ্গীও নহে লিখাপড়াও জানে না। বলিকার মুখ চক্ষু দেখিতে 'চলনসই' রকমের। কিন্তু সে অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা মাত্র। সুরেন্দ্রনাথ এতদিন হৃদয়ে যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, জানি না কাহার তুলিকাপাতে আজ তাহা সহসা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে অহরহঃ দুর্ব্বিষহ জ্বালায় পীড়িত করিতে লাগিল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া পিতার নিকট বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিল না। শিষ্ট শান্ত বলিয়া সুরেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। প্রকৃত পক্ষেও সে শিষ্ট শান্ত ছিল। হায় বিধাতা তোমার এ কি বিচার? তোমার রাজ্যে যে যেমনটি চাহে সে তেমনটি পায় না কেন? সুরেন্দ্রনাথ গোপনে হৃদয়ের এই অনুযোগ বিধাতার চরণে উপস্থিত করিল। জানি না, বিধাতা সুরেন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন কি না। সুরেন্দ্র কল্পনানয়নে যতই তাহার ভাবী গৃহিণীকে দেখিতে চেষ্টা করে, তাহার মনে ততই দুশ্চিন্তার দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে হতাশ হইয়া সুরেন্দ্র ভাবনা ত্যাগ করিল; স্থির করিল, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহার উপর কাহারও হাত নাই। তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। জীবনে যদি সুখলাভ থাকিত অবশ্যই সে মনোমত গৃহিণী লাভ করিয়া সুখী হইত। সে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহারাই নির্দ্দিষ্ট পথে

জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবে ইহাই সঙ্কল্প করিল। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া সুরেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? তাই আশা ও নিরাশার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার হৃদয় নিরন্তর বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।

(৫)

এদিকে সময়স্রোত পূর্ব্বেরই মত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিনের পর রাত্রি আবার রাত্রির পর দিন নিরঙ্কুশ গতিতে গতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বাদ্যকোলাহলের মধ্যে সুরেন্দ্র আশা ও নিরাশার আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে হইতে যথা-সময়ে কন্যাগৃহে উপস্থিত হইল। পাত্র সভাস্থ হইয়াছে। বিবাহ-বাটী আনন্দের কলকোলাহলে মুখরিত। পাত্রকে অপ্রতিভ করিবার জন্য কয়েকটি বালক ও যুবক নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত। সুরেন্দ্রের মন তখন নানা দুর্ভাবনায় পীড়িত।

"কন্যা পাত্রস্থ করিবার লগ্নকাল উপস্থিত, আর বিলম্ব করা হইবে না" বলিয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় পাত্রকে বিবাহ-মণ্ডপে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নাপিত পাত্রকে বিবাহ-মণ্ডপে আনয়ন করিল। সুরেন্দ্রের বক্ষঃ অজানিত আশঙ্কায় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

কন্যার পিতা শ্যামলাল বাবু কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। কন্যার আপাদমস্তক রক্তাম্বরে আবৃত। চিত্রপুত্তলীর মত সুরেন্দ্র মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। ক্রমে 'শুভ দৃষ্টির' সময় উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রের বক্ষঃ আরও বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। 'শুভ দৃষ্টি' হইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, একখানি সরল শান্ত মুখ; বালিকা যেন সংসারের কিছুই জানে না। সে যেন সংসারের সব ছাড়িয়া একটি মাত্র আশ্রয়ে আপনাকে ন্যস্ত করিয়া রাখিতে চাহে। সে মুখে বাহ্য সৌন্দর্য্যের আতিশয্য নাই; যাহাতে লোক বিমোহিত হয় এমন সৌষ্ঠব নাই। তবুও সুরেন্দ্র সে রূপে বিমোহিত হইল। বিধাতা বুঝি সুরেন্দ্রের সে দিনের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন। তাই আজ সুরেন্দ্রের নয়নে এই বালিকাকে সারল্যের ও শান্তির আদর্শ-স্বরূপিণী প্রতিভাত করিয়া দিলেন।

(৬)

বিবাহের পরও কয়েক দিন নানা উৎসবে কাটিয়া গেল। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ সহসা জ্বরে আক্রান্ত হইল। দুই দিন ভাল থাকে, আবার জ্বর হয়; এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল। প্রতিবেশিনীর দল কন্যাকে নিতান্ত কুলক্ষণা স্থির করিলেন; এবং সুরেন্দ্রের পিতা কন্যার কোষ্ঠী না দেখিয়া বিবাহে সম্মতিদান করিয়া ভাল কায করেন নাই বলিয়া তাঁহার দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে অতিশয় সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রের পীড়া কিছুতেই সারে না। জ্বর যায়; আবার জ্বর হয়। সে পিতামাতার একমাত্র জীবিত পুত্র, পিতামাতা তাহার পীড়ায় যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই রোগের শেষ গেল না। পরন্তু ক্রমশঃ রোগ প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে এক দিন সে জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্রের পিতা ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তার আসিয়া মুখ বিষণ্ণ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, অবস্থা ভাল নহে। ডাক্তার বলিলেন "প্রবল জ্বর; এক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার। রোগ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।" বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতিবেশিনীরা সুরেন্দ্রের পত্নীর উদ্দেশে নানারূপ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সকলেই এক-বাক্যে বলিলেন, "এমন 'অলক্ষণা'কনে ঘরে আনিয়াই এরূপ হইল। ও 'রাক্কুসে' মেয়ে নিশ্চয় বাছাকে খাইতে আসিয়াছে।" নিরুপমা এই তীব্র সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া অপরাধীর ন্যায় এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; কখনও বা নির্জ্জন কক্ষে নীরব অশ্রু-পাতে হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। বালিকার মর্ম্মব্যথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই, তাহার মনঃ-কষ্ট দূর করিবে কে?

(৭)

সুরেন্দ্রের জ্বর প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। রোগীর অবস্থা নিতান্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। চিকিৎসক বলিলেন, "অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; আর সামান্য উৎকট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। আজিকার দিনটা যদি ভালয় ভালয় কাটিয়া যায়, তবে জীবনের আশা করিলেও করা যাইতে পারে।" সমগ্র ভবন বিষাদে অন্ধকার

হইল। মহিলাকুল নিরুপমার উদ্দেশে অজস্র নিন্দাবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হতভাগিনী সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে যাহা লাভ করিতে লাগিল তাহাতে তাহার মর্ম্মব্যথা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অবশেষে বালিকা আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। সে দিন মধ্যাহ্নে সে তাহার ননন্দাকে একাকী পাইয়া তাহার হাত দুই-খানি ধরিয়া অবিরাম অশ্রুজলে তাহার হস্তদ্বয় প্লাবিত করিতে লাগিল। সে অশ্রু বাধা মানে না। ননন্দার শত প্রবোধবাণীও সে প্রবাহকে বন্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে বহু কষ্টে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সে কহিল,—"ভাই আমা হইতেই এই অমঙ্গল। আমার যদি বিবাহ না হইত"—বলিতে বলিতে বালিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। অশ্রুপাতে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া এত দিন সে যাহা রক্ষা করিয়াছে আজ আর তাহা কোনও মতেই রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার ননন্দা বালিকার অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "কি করিবে বৌ দিদি, আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তোমার দোষ কি, ভাই? দাদা যে বাঁচিবেন সে ভরসা নাই; পাঁচজন তোমার দোষ দিতেছে। কিন্তু কি করিবে? এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, দাদা যেন তোমার সিঁথির সিন্দূর অক্ষয় রাখিতে বাঁচিয়া উঠেন।"

ননন্দার কথায় নিরুপমা কতকটা আশ্বস্ত হইল। বিবাহের পর আজ পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত বালিকার ভাল করিয়া আলাপ পর্য্যন্ত হয় নাই। তথাপি কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সে স্বামীর রোগযন্ত্রণায় ব্যাকুল অন্তঃকরণে দিবানিশি দেবতার নিকট স্বামীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে। শান্ত সন্ধ্যায় সাঁঝের প্রদীপ হস্তে তুলসীমঞ্চের মূলে উপস্থিত হইয়া বালিকা তথায় প্রদীপ দান করিয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রার্থনা করে, "হে দেবতা, আমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দাও; এ অভাগিনীর জীবন লইয়া যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহ, তবে আমাকে লইয়া তাঁহার জীবন দান কর।" সুরেন্দ্রের প্রার্থনায় ভগবান এক দিন কর্ণপাত করিয়াছিলেন; জানি না নিরুপমার প্রার্থনা ভগবান্ কর্ণপাত করিলেন কি না।

কিন্তু সুরেন্দ্রের আর কোনও উৎকট লক্ষণ উপস্থিত হইল না। ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হইয়াছে।—এক দিন—

সুরেন্দ্রের বিধবা ভ্রাতৃবধূ তাহাকে বলিলেন, "নিরুকে কি পাঠাইয়া দিব?" সুরেন্দ্রনাথ বলিল, "কেন?" "কেন আবার, একটু বাতাস দিবে।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। সেই শান্ত স্নিগ্ধ মধুর মূর্ত্তিখানি বহু দিন পরে আবার সুরেন্দ্রের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় ও আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। এ দিকে সুরেন্দ্রের ভ্রাতৃবধূ দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী নিরুপমাকে লইয়া উপস্থিত। তাহাকে বসিতে বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। সুরেন্দ্র ক্ষণকাল পত্নীর দিকে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "নিরুপমা, দাঁড়াইয়া কেন?" নিরুপমা তাহার দীর্ঘাবগুণ্ঠন সম্মুখের দিকে আরও একটু টানিয়া লইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত সুরেন্দ্রের শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিল। সুরেন্দ্রনাথ বলিল "কাছে আইস, নিরু। অত দূরে কেন?" নিরুপমা অবগুণ্ঠনটি সম্মুখের দিকে আরও একটু টানিয়া দিয়া একটু পিছাইয়া গেল। সুরেন্দ্র বলিল "বেশ, মন্দ নহে। এই বুঝি কাছে আসা!" এই বলিয়া সে আপনার ক্ষীণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বালিকার বাহু ধারণ করিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলে নিরুপমা নির্জ্জীব পুত্তলিকার ন্যায় সুরেন্দ্রের নিকটবর্ত্তিনী হইল। তখন সুরেন্দ্র তাহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া কহিলে, "নিরুপমা, আমার যখন অসুখ তখন তুমি কি করিতে?" বালিকা কি একটা অস্ফুট কথা বলিয়া লজ্জিত হইয়া পুনরায় অবগুণ্ঠনটি টানিয়া দিল। সুরেন্দ্র বলিল, "ছি! ও কি, নিরু? আমার এই অসুস্থ শরীর এখন তোমার অত লজ্জা ভাল দেখায় না। বল, তখন তুমি কি করিতে?" তখন নিরুপমা অতি মৃদু স্বরে বলিল "কাঁদিতাম।" সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতে কেন? আর কেহ কি দেখিতে পাইত?" নিরুপমা বলিল, "ঠাকুরঝি দেখিয়াছিল।" সুরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতে কেন?" বালিকা আর কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

তখন সুরেন্দ্র পুনরায় তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে যাইয়া দেখিল, সে কাঁদিতেছে। সুরেন্দ্র বলিল, "এ কি! তুমি কাঁদিতেছ! আবার ক্রন্দন কেন, নিরু? আমার অসুখ ত সারিয়া গিয়াছে।" বালিকা এবার ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে তুমি সারিয়া উঠিবে? তোমার অসুখ না হইয়া আমার হইল না কেন?" বালিকার নয়নাশ্রু দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্র স্বীয় ক্ষীণ হস্তে তাহার চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "কাঁদিও না, নিরু, ছি! তোমার ক্রন্দন দেখিয়া আমার কষ্ট হয়। আর কাঁদিও না।" সে মনে মনে কহিল, ভগবান্, কি সুকৃতিবলে এই অমূল্য রত্ন আমায় দিয়াছেন? সেই দিন সুরেন্দ্রের স্বচ্ছ হৃদয়ে নিরুপমার যে মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল সে তাহাতে তন্ময় হইয়া গেল।

(৮)

এদিকে সুরেন্দ্র দিন দিন যেমন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল প্রতিবেশিনী মহলেও তেমনই নিরুপমার সুখ্যাতির কথা ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত জানিই নিরুপমার মত সতী লক্ষ্মীর সিঁথির সিন্দূর ভগবান কখনই মুছিতে দিবেন না।" কেহ বা বলিলেন "আর তাহাও বলি, বধূর সিঁথির সিন্দূরের বলেই সুরেন্দ্রের মাতা এ যাত্রায় সুরেন্দ্রকে ফিরাইয়া পাইলেন।" অপর এক জন কথা কড়িয়া লইয়া কহিলেন, "যে দিন বৌ আসিয়া এ বাটীতে পা দিল সেই দিনই আমি বৌ দেখিয়া বলিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ সাবিত্রী। আহা বাঁচিয়া থাকুক; উহার দৌলতে সুরেনের আমার মাথার চুলের সমান পরমায়ু হউক।" ফলতঃ এক দিন যে বধূটি পিশাচিনী, ভর্ত্তার পরমায়ুহন্ত্রী বলিয়া প্রতিবেশিনীমণ্ডলীর নিকট অবজ্ঞাত হইয়াছিল আজ সে অমর মহিমার উজ্জ্বলালোকে মণ্ডিত হইয়া দেবীর আসনে স্থান পাইবার যোগ্যা স্থির হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

—:০:—

মানব-প্রহেলিকা।

(৩)

জড়বাদ ও আত্মবাদ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্ব প্রাণীর আদি বীজ একই প্রকারের। রাসায়ণিক বিশ্লেষণদ্বারা উহার পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ উহাদের উপাদানগত কোন প্রভেদই নাই। বর্ত্তমান সময়ের জীববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়াছেন যে, ডিম্বকোষের ও শুক্রবীজের মধ্যে যে জৈব-উপাদান থাকে, তাহা সম্পূর্ণ তরল নহে,—অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি বিন্দু বৃহত্তর। ঐ বৃহত্তর বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন, বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর কোষস্থ প্রধান বিন্দুর আঁশগুলির সংখ্যাও বিভিন্ন। এই তথ্য নবাবিষ্কৃত; ইহার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। মানবের কোষস্থ বৃহৎ বিন্দুর মধ্যে কতগুলি আঁশ আছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মানবীয় বৈজিক বিন্দুতে ষোলটি আঁশ বর্ত্তমান; কেহ বলেন, চৌদ্দটি; আবার কেহ তের-টির অধিক গণিয়া পায়েন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, সকল মানবের কৌষিক বৃহত্তর বিন্দুস্থিত অংশুসংখ্যা সমান নহে, অথবা একই ব্যক্তির সকল কৌষিক মূল বিন্দুর অংশুসংখ্যা সমান নহে। অন্যান্য জীবের কৌষিক মূল বিন্দুস্থিত আঁশের সংখ্যা সম্বন্ধেও ঐরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোষস্থিত অন্যান্য বিন্দুগুলি বায়ুপূর্ণ থাকে। সেই জন্য ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন যে, উক্ত কৌষিক প্রধান বিন্দুর মধ্যস্থিত আঁশগুলির সংখ্যার উপরই বিভিন্ন জাতীয় জীবের জাতীয়ত্ব এবং উহার বিন্যাসের বিশেষত্বের উপরই উক্ত জাতীয় জীবের বিশেষত্ব নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র;—বৈজ্ঞানিক তথ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সেরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ এই মূল বিন্দুস্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুবৎ পদার্থসংখ্যা জীবভেদে বিভিন্ন হইলেও উহাতে উপাদানগত পার্থক্য নাই। সুতরাং একই উপাদান হইতে যে বিভিন্ন জীব আবির্ভূত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, একই উপাদান হইতে টিকটিকি, গিরগিটি হইতে রাম, শ্যাম, এমন কি শঙ্কর, চৈতন্য পর্য্যন্ত বিভিন্ন জীবসৃষ্টি হইল কি রূপে? সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন যে, জড় উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়াবিকৃতিপ্রভাবে জীবের আবির্ভাব হয় না, জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চৈতন্য-শক্তির দ্বারা জীবদেহ গঠিত হইয়া থাকে। জড় উপাদান ভিন্ন জীবে 'আত্মা' আছে। এ বিশ্বাস সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন। অবশ্য কোন কোন দেশীয় লোকের ধারণা যে, কেবল মানবেরই আত্মা আছে, তীর্য্যক প্রাণি-গণের আত্মা নাই। এ ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্ব জীবেরই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাবে মানসিক ব্যাপারসম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ই অনুভব করিয়া থাকে। সংজ্ঞার (Consciousness) অনুভূতির ন্যায় আত্মানুভূতি অন্তর্ম্মুখী। এ স্থলে জ্ঞাতা (Subject) ও জ্ঞেয় (Object) একই। যাহা-দের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, তাহারা অন্তর্ম্মুখী অনুভূতির দ্বারা যাহার উপলব্ধি করে, তাহা বড় জোর তাহাদের স্বজাতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে পারে। সেই জন্য তাহারা মানবের আত্মার অস্তিত্বমাত্র স্বীকার করে; তীর্য্যক প্রাণিগণের আত্মা স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তবে ইহার দ্বারা এই টুকু মাত্র সপ্রমাণ হয় যে, সর্ব্ব যুগে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পক্ষে মানবের জড়েতর সত্তাস্বীকার স্বাভাবিক। অন্ততঃ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত। কেহ কেহ এই সর্ব্বজনীন বিশ্বাসের হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্বাস প্রমাণের ভিত্তি হইতে পারে না। মানবের বিশ্বাস বহুস্থলেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হই-য়াছে। সেই জন্য উক্ত যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। আত্মার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির ও প্রমাণের প্রয়োজন।

কি প্রকারে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, ইহাই গুরুতর সমস্যা। অনেকে জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে চাহেন। জড় বিজ্ঞানের প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে সম্মত নহেন। যাঁহারা জড়বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদের নিকট আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস নিতান্তই নিষ্ফল। জড়বিজ্ঞান কস্মিন কালেও আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ

করিতে সমর্থ হইবে না—হইতে পারে না। আত্মা জড় পদার্থ নহে। সুতরাং উহা কখনই জড়বিজ্ঞানের আমলে আসিতে পারে না। বাহ্য বস্তুর পরিবীক্ষণের ও পরীক্ষণের উপরই জড়বিজ্ঞান দণ্ডায়মান। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, প্রাণিবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, এমন কি মনোবিজ্ঞানও বাহ্য বস্তুর পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষণদ্বারা বিকাশ লাভ করিয়াছে। আত্মার এরূপ বাহ্য পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষণ সম্ভবে না। সুতরাং উহা ঐরূপ বিজ্ঞানের আমলে আসিবে কি করিয়া তাহা আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। যাঁহারা আত্মবাদী তাঁহারা জড়বিজ্ঞানে নিয়মানুসারে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে যাঁহারা জড়বাদী যাঁহারা জড় ও আত্মা অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনীর তথ্য সন্ধান স্বাভাবিক। জড়বাদীরা আত্মার জড়ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ডাণ্ডি সহরের বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনে ডাক্তার সেফার (Dr. Schafer) জীবনীর বনিয়াদ (Origin of Life) শীর্ষক এক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, জড় পদার্থ হইতে জৈব উপাদান সৃষ্টি সম্ভবে। অনতিদূরবর্ত্তী কালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মন্দিরে জড় পদার্থের সম্মিলনে জৈব পদার্থের উদ্ভব করা যাইবে। তিনি বলেন, অনুকূল অবস্থায় আবশ্যক উপাদানের সংযোগফলে এই বিশ্বে মধ্যে মধ্যে জড় হইতে জৈব উপাদান উদ্ভূত হইতেছে,—মানব এখনও পর্য্যন্ত সেই রহস্য জানিয়া লইতে পারে নাই; সেই জন্য তাহারা জড় হইতে জীবের উৎপত্তি সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বর্ত্তমান সন্দর্ভে অধ্যাপক সেফারের সমস্ত উক্তির আলোচনা সম্ভবে না। আপাততঃ আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মন্দিরে জৈব উপাদান প্রস্তুত হইলেই যে অধ্যাত্মতত্ত্বের সকল সমস্যারই সমাধান হইবে এরূপ অনুমান করা নিতান্তই ভ্রম। জৈব উপাদান, protoplasm, bioplasm, pschycoplasm, প্রভৃতি যে নামেই ঐ পদার্থকে অভিহিত করা যাউক না কেন, উহা যে আত্মা এ কথা কোনও দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিকই বলিতে সমর্থ নহেন। জীবদেহ জড়পিণ্ড বলিয়াই অভিহিত। সেই দেহেরই অংশবিশেষও জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং জড়পদার্থসংযোগে তাহার সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। তবে জৈব উপাদান হয়ত আত্মিক শক্তি স্ফুরণের সহায়তা করে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে জৈব

উপাদান সৃষ্ট হইলে জড় হইতে আত্মার উদ্ভব করা হইবে, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না।

হিন্দুর মতে, এই বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্রই আত্মা জড়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যে স্থানে তমোগুণ অত্যন্ত প্রবল,—সেই স্থানেই জাড্য,—তাহাই জড়। প্রকৃতির ক্রোড়ে মায়া উপহত আত্মা বুদ্বুদের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। আত্মাশক্তি যত বিকশিত হইয়া উঠে, জড়ের শক্তি,—প্রকৃতির বা মায়ার শক্তি ততই কুণ্ঠিত হইয়া যায়। জৈব উপাদান জড়ই, কিন্তু জড়পদার্থ ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে চৈতন্যশক্তিস্ফুরণের সহায়তা করে। অর্থাৎ উহা চৈতন্য শক্তির,—বা জীবনীশক্তির অনুকূল আশ্রয়মাত্র—উহা জীবনীশক্তি বা চৈতন্যশক্তি নহে। অধ্যাপক সেফার হিন্দুর একটি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—আত্মা (Soul) ও প্রাণ (Life) এক নহে,—উহা স্বতন্ত্র; ভাষায় ঐ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখাই কর্ত্তব্য *। আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে ঐ কথাই বলিয়াছি। অধ্যাপক সেফার যাহা বলিয়াছেন, হিন্দু তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। কিন্তু যদি বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মন্দিরে জৈব উপাদান প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আত্মসম্পর্কিত সমস্যার যে সমাধান হইবে। এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। ইহা কেবল আমাদেরই কথা নহে। ডাক্তার সেফারের বক্তৃতা পাঠ করিয়া বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক অলিভার লজও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন †

* Not infrequenly they found the terms 'life' and 'soul' erroneously employed as if identical, but unless the use of the latter expression was extended to a degree which would deprive it of all special significance, the distinction between these terms must be strictly maintained.

† "It does not follow that the nature of life will be much better understood even when living protoplasm has been artificially put together ; the thing which by its interaction with matter confers on it what we know as 'vitality' will still in all probability elude us. It does not appear to be a form of energy but it certainly is a guiding principle utilising forces known to chemistry and physics and all the ordinary laws of nature for ends which appear to be outside the known laws of the physical world."

সার জেম্‌স ক্রাইটন-ব্রাউন ডাক্তার সেফারের বক্তৃতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জড়বাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতেছে। লোক আধ্যাত্মিক ভাবে বিশ্বপ্রহেলিকার সমাধানে অগ্রসর হইতেছে; আমি জড় হইতে জীবোৎপত্তিবাদে বিশ্বাস করি না। ডাক্তার সেফার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—তাহা অপেক্ষা প্রবলতর যুক্তি ভিন্ন আমি আমার মত পরিবর্ত্তিত করিতে পারিব না।* অধ্যাপক মেচনিকফ বলেন,—কৃত্রিম উপায়ে জীবোৎপত্তি বর্ত্তমান যুগের রসায়ণ শাস্ত্রের সাধ্যাতীত (not within the present range of practical chemistry)। ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জড়বাদিগণ এখনও আত্মবাদিগণের মত খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

সুতরাং আভাসে বুঝা যাইতেছে যে, জড়বাদদ্বারা অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত। উহা কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তবে কি প্রকারে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে? মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় এই বিষয়ের আভাস মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। মন ও মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইলেও আত্মার শক্তি মনের ভিতর দিয়া কার্য্য করে। যে সময় আত্মার শক্তি মনের ভিতর দিয়া কার্য্য করে, অথবা অনুভূতি মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মনের নিকট উপনীত হয়, সেই সময় মস্তিষ্কের আণবিক চাঞ্চল্য (molecular movement) জন্মে। সেই জন্য জড়বাদীরা উক্ত চাঞ্চল্যকে সংজ্ঞা বা চৈতন্য বোধের (Consciousness) কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। বিখ্যাত নাস্তিক হাক্সলিও বলিয়াছেন,—"I know nothing and never hope to know anything of the steps by which the passage from the molecul.r movement to states of consciousness is

* "Anything that Dr. Schafer says must be listened to with very great respect and deference, but at the same time I must say that the swing of the pendulum has been in a direction entirely opposite to that in which his views lead us. It has returned from the materialistic to a more spiritual conception of the universe. Do I believe in the theory of spontaneous origin of life? Certainly not, and it would need a very powerful argument to lead me to change my views."

effected." ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আণবিক চাঞ্চল্য হইতে সংজ্ঞার উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা আমি জানিও না, জানিতে পারিব বলিয়া আশাও করি না। বিখ্যাত নাস্তিক আর্ণেষ্ট হেকেল কিন্তু আণবিক চাঞ্চল্যকে সংজ্ঞার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতও বিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। * সংজ্ঞা হইতেই আত্মার স্বাতন্ত্র্যের আভাস পাওয়া যায়। জড় পদার্থই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। ইহা ভিন্ন Telepathy, Hypnotism, Clairovoyanc, Mediumistice phenomena, প্রভৃতির সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশঃ স্তূপীভূত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ সংজ্ঞা (Consciousness) ভিন্ন মানবের আর একটি অস্ফুট সংজ্ঞা আছে। ইংরেজী ভাষায় উহাকে Subliminal consciousness বলে। বর্ত্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জড়বাদীরা ইহার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে সমর্থ হইলাম না। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এইরূপ জটিল বিষয়ের আলোচনা করিলেও উহা প্রকাণ্ড গ্রন্থে পরিণত হয়। অথচ এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা সহজ নহে।

আমার মতে আত্মা সম্বন্ধীয় ব্যাপার জানিতে হইলে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পাঠ করাই কর্ত্তব্য। পুরাকালে আমাদের দেশে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হইয়াছিল। আমাদের দেশে এখন যে সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যার গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য অনাবশ্যক বিতণ্ডা নাই। সে সকলে উক্ত হইয়াছে, যোগদ্বারাই আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এখন অনেক অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতও এই কথা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, স্মৃতি, অনুভূতি, সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা আমাদের চৈতন্যবোধ নিরন্তর অনুরঞ্জিত হইতেছে। মানবের মানসমুকুরে স্মৃতি, অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির রাগ সর্ব্বদা প্রতিফলিত থাকে বলিয়া মানব আত্মার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকারের পথ সুগম হয়। সেই জন্য যোগিগণ যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া থাকেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"—যোগ চিত্ত বৃত্তির

* Vide the 'Coming Science' pp. 114-179.

নিরোধ। যোগিগণ যোগদ্বারা দেহকে ও দেহসম্ভব ইন্দ্রিয়দিগকে সম্পূর্ণ অসাড় ও নিস্পন্দ করিয়া মানস-মুকুরকে রাগশূন্য করিয়া ফেলেন। তখন ক্রমশঃ তাঁহার বহিঃসংজ্ঞা ও অন্তরস্থ অস্ফুট সংজ্ঞা একীভূত হইয়া যায়—সংজ্ঞা (Consciousness) বিষয়ান্তরব্যাবৃত হইতে পারে না,—সুতরাং অন্তরস্থ অব্যক্ত সংজ্ঞার (Subliminal consciousness) সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পায়। এই উভয় সংজ্ঞাই যখন একই ভাবে ভাবিত হয়, তখন আর তাহাদের দ্বৈধভাব থাকে না;—দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়। হিন্দুর এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের—এই সাধন-পদ্ধতির সত্যতা এখন কোন কোন পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের এই সনাতন সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য আধ্যাত্মিক পন্থার অভিনব পন্থী পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মত উদ্ধৃত করিতে হইল। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভবে কি না, তাহা অবগত নহেন; তবে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে নির্ম্মল মানস-মুকুরে প্রকৃত জ্ঞান প্রতিফলিত হইতে পারে, ইহার আভাসমাত্রই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন।

* এ সম্বন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক Edward MacNutty—Phenomena of Consciousness নামক সন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই:—

Above all, he (man) must disentangle himself from the intricate embraces of sensualism, the sleepless and all-pervading power which marches triumphantly over the prostrate forms of its myriad victims with its retinue of a thousand illusions. The accumulated refuse of unwholesome thoughts; the hunger for wealth, power, fame, hatred and pleasure must not only be abandoned but destroyed. Hitherto, he has known himself as a bundle of memories, sensations and habits. Divested of these he has nothing to recognise himself by, save a name which is a mere label, that must also be thrown aside. He now stands alone—conscious but uninfluenced by the world without or that within—a stranger to himself. From this close pre-occupation with secret springs of being arises the phenomenon of double consciousness, the sensation of being two persons in one body. For him who is resolved to develop, there is no escape from this unpleasant and dangerous condi-

য়ুরোপেও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিদ্যা এখনও তথায় পরিপক্কতা লাভ করে নাই। উহা Occult Science নামে অভিহিত। যে সকল মনস্বী এই অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধুনাতন জড় বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণে সহসা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই বিজ্ঞানের এখনও শৈশবাবস্থা। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু ইতোমধ্যেই এই বিজ্ঞান যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

আধুনা অনেক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে আস্থাস্থাপন করিতে চাহেন না, উহা অলৌকিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা জড় বিজ্ঞানের বাক্যগুলি আপ্তবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধানে জড় বিজ্ঞান একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। জড়বাদীরা জীবনীকে শক্তিবিশেষ (Vital force or energy) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহা নিতান্তই "গোঁজামিল"। *কারণ, শক্তি কি,

---

tion. * * * * * Into this arcanum of profound suspense and silence, doubt must not enter nor impurity of thought. There is no guiding light. Having parted from the phrases and knowledge which directed him in the world of men, he is alone with the unknown. Freedom arrives. As globules of mercury coalesce, so the two personalities merge into one, never again to be divided." Vide the 'Occult Review' July, 1912. pages 32-33. এক্ষণে বলা আবশ্যক যে, উক্ত মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত যোগসম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেন নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যেরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক, তাহারই কথা বলিয়াছেন। যোগসম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যায়। অন্যান্য দার্শনিকদিগের এইরূপ মতও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

* The actual nature of force—the thing in itself—is unknown to us. Our knowledge of force is confined to the conditions under which it is manifested and the effects which flow from it. We observe the changes brought about in the condition of matter under the influence of heat, electrecity etc. It is seen that given like conditions similar changes are invariably produced under such influeness. Of the intrinsic nature of the agent that brings about the change we are ignorant—Alfred Hook.

উহার প্রযোক্তা কে,—তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। তাঁহারা কেবল সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে শক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়া শক্তি-বিজ্ঞান রচনা করিতেছেন। যে সমস্যার সমাধানে জড়বাদ বারংবার আপনার সামর্থহীনতা প্রকাশ করিতেছে,—তাহার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে; বরং আত্মবাদীদিগের প্রমাণের উপর কতকটা নির্ভর করা চলে। কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত তথ্য সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার hypothetical হইতে পারে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানেও এইরূপ hypothetical ব্যাপার বহুস্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং মানব-প্রহেলিকার আলোচনায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সংগ্রহ।

—:•:—

ইতিহাস।

—:•:—

প্রাচীন কলিকাতা।

—:•:—

ইংলণ্ডের ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই স্থানান্তরের রাজনীতিক কারণ যাহাই হউক কেন না ইহা যে সকলের প্রীতিপ্রদ হয় নাই তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। দিল্লীর প্রান্তরে বহুবার ভারতের রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছে। মহাভারত-বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিকযুগে ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—এই স্থানেই ময়দানবগঠিত মণিময় সভায় অভিমানী দুর্য্যোধনের জলে স্থলভ্রমে যে বিষোদ্গার হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়। তাহার পর মুসলমানগণ বহুবার দিল্লীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দিল্লীতে সাতটি নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। দিল্লীর সহিত ইংরাজের রাজ্যস্থাপনের ইতিহাস বিশেষভাবে বিজড়িত নহে। কিন্তু কলিকাতার সহিত এদেশে ইংরাজাধিকারের স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। ইংরাজ যখন মুসলমানের কৃপায় নির্ভর করিয়া বাণিজ্যবিস্তারবাসনায় এ দেশে আসিয়াছিলেন তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজের সকল স্মৃতি কলিকাতার সহিত বিজড়িত। যব চার্ণক এই কলিকাতার জলা ভূমিতে মুষ্টিমেয় ইংরাজ লইয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই কলিকাতায় ইংরাজের লাঞ্ছনার ও বীরত্বের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত। ক্লাইব হেষ্টিংস, বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতির স্মৃতি এই কলিকাতার সহিতই বিজড়িত।

সংপ্রতি কলিকাতার সম্বন্ধে কয়খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাষ্টিড প্রথম কলিকাতার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তৎপূর্ব্বে মিষ্টার লং 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে কলিকাতার কথা বিবৃত করেন। তাহার পর হাইড, কটন, কার্মিঞ্চার, কুমারী ব্লিচেনডেন, ম্যাজ প্রভৃতির চেষ্টায় কলিকাতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

বার্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার প্রভৃতি ফরাসী লেখকদিগের রচনায় ভারতের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ডেঞ্জিল নামক একজন ফরাসী নৌকাধ্যক্ষ "গঙ্গাতীর' হইতে ৩১খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সকল পত্রে চিনির ব্যবসা হইতে সতীদাহ পর্য্যন্ত নানা বিষয় লিখিত হয়। লেখকের রচনা দেখিয়া মনে হয়, তিনি বুদ্ধিমান ও পর্য্যবেক্ষণশক্তিশালী ছিলেন। পত্রগুলি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয়।

সেগুলিতে কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটস্থ বহু স্থানের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাকপুর। যে সময় পত্রগুলি লিখিত হয় সে সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বারাকপুরের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বারাকপুর হইতে ঘনচ্ছায় বৃক্ষবীথি,মধ্যবর্ত্তী সুগঠিত পথ কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সহরে অনেকগুলি সুন্দর 'বাঙ্গলো' বিদ্যমান। বড় লাটের প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার নিকটেই পশুশালা। এই পশুশালা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাণ্টের সুপ্রসিদ্ধ Rural Life in Bengal পুস্তকেও ইহার উল্লেখ আছে। ডিভিল বলেন, বারাকপুরের প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য ও এই ছায়াবহুল স্থানের বাতাসের সুখদ ভাবহেতু ইহা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে বিশেষ রমণীয় ও বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামপুর। ডেনিস সহর শ্রীরামপুরকেও ডিভিল সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋণদায়ে বিব্রত হইলে লোক পলাইয়া শ্রীরামপুরে যাইত। ইহাতে ডিভিল অত্যন্ত বিস্মিত হয়েন। ডিভিল চন্দননগরের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমারদিগের এই সকল ক্ষুদ্র গ্রাম ও উপনিবেশ কেবল ইংরাজের প্রাধান্যের কথাই ভারতবাসীর চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

কলিকাতার সমাজ। তিনি বলেন, সে কালের কলিকাতার বণিকরা আফিস হইতে যাইয়া সন্ধ্যায় গাড়ীতে সস্ত্রীক ভ্রমণে বাহির হইতেন। কেল্লা হইতে সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথেই তাঁহাদের ভ্রমণ নিষ্পন্ন হইত। তবে তাঁহাদের ভ্রমণ নাকি নিরানন্দ ব্যাপার ছিল—শববাহক দিগের শকটশ্রেণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। গৃহে ফিরিয়া ইঁহারা আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ভোজনটাও কিছু অতিরিক্ত হইত। মধ্যরাত্রিতে তাঁহারা মত্ত অবস্থায় বাহির হইতেন। প্রায়ই ভৃত্যগণ প্রভুদিগকে গৃহে লইয়া আসিত, আর প্রভুরা তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেন। কলিকাতার বণিকদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব নহে।

পুলিশ। তখন রাত্রিদিন তরবারিধারী শাস্ত্রীগণ সহর পাহারা দিত। তাহাদিগকে চৌকিদার বলা হইত। কোন স্থানে শান্তিভঙ্গ হইলে তাহারা নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিত; ঘণ্টায় ঘণ্টায় "সব আচ্ছা হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করিত। চৌকিদাররা য়ুরোপীয় নাবিকদিগকে লইয়া বড় বিব্রত হইত। জাহাজ ভিড়িলেই এই নাবিকগণ সহরের নিকৃষ্টাংশে ছড়াইয়া পড়িত ও মারামারি করিত। ডিভিল বলেন, ধরা পড়িলে তাহারা প্রায়ই অব্যাহতি পাইত। বাঙ্গালীকে হত্যা না করিলে তাহাদের বড় শাস্তি হইত না; এ অপরাধেও সামান্য অর্থদণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। এ কথা, বোধ হয়, অতিরঞ্জিত। ডিভিল বলেন, কোন ভারতবাসীই কোন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না।

গোবসন্ত।

(২)

সময়ে সময়ে রোগাক্রান্ত পশুর উরুদেশে, পাঁজরায়, গলকম্বলের ত্বকে বসন্তের ন্যায় স্ফোটক দৃষ্ট হয়। ইহা কিন্তু সকল সময়ই দৃষ্ট হয় না। গ্রীষ্মকালে আক্রান্ত হইলে এই লক্ষণটি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হইবার একটি প্রধান চিহ্ন। এই স্ফোটক নির্গত হইলে ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয়। এ জন্য সাধারণ লোকে এই রোগকে বসন্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া "মাতা" বলিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি গোবসন্ত ভ্রম হইতে পারে।

১। গবাদির সংক্রামক শ্লৈষ্মিক জ্বর (malignant catarrhal fever of the ox).

২। এঁসো (Foot and mouth disease).

৩। রক্ত আমাশয় (Dysentry).

৪। তড়কা (Arthrax).

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি উত্তম প্রণিধান করিলে ভ্রম কম হইবার সম্ভাবনা।

পশুর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে মুখের অভ্যন্তরে, চতুর্থ পাকস্থলীতে, ক্ষুদ্র অন্ত্রে, গুহ্যদ্বারে এই ব্যাধির প্রধান ও মূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। চতুর্থ পাকস্থলী শ্লৈষ্মিক প্রদাহ জনিত রক্তবর্ণ হইতে নীলাভ ধারণ করে, স্থানে স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয়। Pylonus নামক ছিদ্রে এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সময় সময় অত্যধিক প্রদাহজনিত রস নির্গত হইয়া এই সকল ক্ষত বিশেষের উপর একপ্রকার কৃত্রিম আবরণ পড়ে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রদাহহেতু রক্তাধিক্য এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্ষতসকল দৃষ্ট হয়। Peycis patches নামক গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া উঠে। বৃহৎ অন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। গুহ্যদ্বারে ঝিল্লি অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয় এবং প্রায়ই তাহাতে রক্তবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ পড়ে। প্লীহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যকৃৎ অত্যন্ত নরম হয় একটু জোর দিলে গলিয়া যায়। কিন্তু কোষের ঝিল্লি-প্রদাহ ও স্থানে স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয়। ফুসফুসে রক্তাধিক্য হয় এবং বায়ুকোষে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করতঃ ফুসফুসকে নিষ্কাষিত করে।

কোন স্থানে গোবসন্তের আবির্ভাব হইলে, গরুগুলিকে আক্রান্ত, সন্দেহ-যুক্ত ও সুস্থ এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া, স্বতন্ত্র করিবে; এবং পীড়িত বা সন্দেহযুক্ত শুশ্রূষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকের বন্দোবস্ত করিবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উহাদের সহিত যেন নিরোগ গরুর সংস্রব না থাকে। যদি স্বতন্ত্র লোক রাখিবার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে রোগীর গোশালা হইতে নির্গত হইলে, গোবর মাটী বা ফিনাইল মিশ্রিত জলে হাত পা ধুয়াইবে, ও পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। যথাযথ চিকিৎসা করাইলে অনেক গরু আরোগ্যলাভ করিতে পারে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে, এই ব্যাধি য়ুরোপের ন্যায় মারাত্মক নহে। পল্লীগ্রামে বিলাতি ঔষধ না পাইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য দেশীয় ঔষধের কথা বলিব। রোগের প্রথম অবস্থায় যখন জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় তখন প্রত্যহ সকাল বিকাল দেড় হইতে তিন আউন্স পর্য্যন্ত লবণ বা Epsom Salt কিছু গরম ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিবে। প্রত্যহ এক হইতে দুই ড্রাম পর্য্যন্ত কুইনাইন ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে। জলীয় ভাতের মাড় দিবে। ইহাতে পিপাসা নিবারণ ও শরীরে বলবর্দ্ধন হইবে। মল পাতলা হইতে আরম্ভ হইলে, যত দিন না মল শক্ত হয় ততদিন নিম্ন লিখিত ঔষধটি দিনে চারিবার খাওয়াইবে।

খড়মাটীর গুঁড়া	½ ছটাক
খদির	এক কাঁচ্চা
শুট্	১ কাঁচ্চা
আফিং	৩ দোয়ানি।
দেশীমদ	১ ছটাক।
ভাতের বা তিসির মাড়	যথেষ্ট পরিমাণে

রোগীর ঠাণ্ডা লাগিতে দিবে না। তাহাকে কম্বলদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। গোয়াল সাধ্যমত পরিষ্কার রাখিবে এবং সন্ধ্যাবেলা গন্ধকের ধূম দিবে। আবর্জ্জনা সকল নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পোড়াইয়া ফেলিবে। পশু একটু আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে কচি কচি দুর্ব্বা ঘাস অল্প পরিমাণ খাইতে দিবে। ভাতের মড় যত বেশী খাইতে পারে দিবে। কিছুদিন কোন প্রকার কঠিন খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিবে না, কারণ মুখের ক্ষত জন্য খাইতে পারিবে না; এবং কিছু খাইলে অজীর্ণ হইবে।

সন্দেহযুক্ত ও সুস্থ গরুদিগকে প্রত্যহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। সন্দেহযুক্তের মধ্যে যদি কাহারও কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং কেহ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে রোগাক্রান্ত গরুর গোহালে সরাইয়া দিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিকিৎসা করিবে। প্রত্যহ সুস্থ পশুগুলির তাপ পরীক্ষা করিবে। জ্বর হইলে তাহাকে সন্দেহযুক্তের পালে পাঠাইয়া দিবে। সুস্থ পশুদিগের জন্য যত শীঘ্র পার টীকা দিবার আয়োজন করিবে। কলিকাতা বঙ্গদেশের পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে তিনি ইহার বন্দোবস্ত করাইয়া দেন। মফঃস্বলে স্থানীয় পশু চিকিৎসক, পুলিশ ইন্‌সপেক্টর, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কিম্বা বঙ্গদেশের পশুচিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের নিকট আবেদন করিতে হয়।

টীকা নানাপ্রকারের; আমাদের দেশের যে টীকার প্রচলন হইয়াছে তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রোগরস লইয়া টীকা দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগরস এক প্রকার সূক্ষ্ম পিচকারির দ্বারা প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহাদিগের কোনও অসুবিধা হয় না। জ্বর কিম্বা টীকার স্থানে কিছুই হয় না। গরুসকল নিয়মিত কায করে, দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা নাই। কোনও জন্তু মরিলে, তাহাকে ফেলিয়া দিবে না; দূরবর্ত্তী কোন স্থানে পুতিয়া ফেলিবে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুর দ্বারা এই ব্যাধি বিস্তারিত হইতে পারে আর একটি কথা, কোনও নূতন গাভী কিনিলে তাহাকে অন্ততঃ ১৫ দিনের জন্য স্বতন্ত্র রাখিবে, কারণ, নূতন গরুতে গো বসন্তের বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারে। কোনক্রমে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গোবসন্তের আবির্ভাব হইলে এক মাঠে, পালে গরু চরিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী গরু চরিয়া যাইলে, তথায় সুস্থ গরু চরিলে ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১৩)
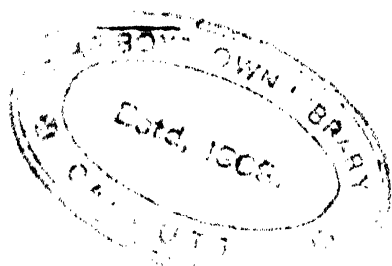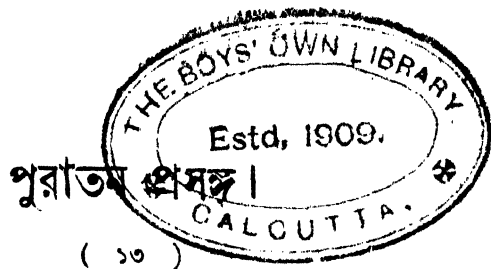
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩১৯।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দানের কথার উত্থাপন করাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "আমার মত তারককে যাহারা বিশেষ ভাবে জানে, তাহারা তারকের এই দানে বিস্মিত হইবে না।

"আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স সেই সময় হইতেই তারকের সহিত আমার বন্ধুত্ব। আমরা প্রায় সমবয়সী। বোধ হয় তারক আমার অপেক্ষা বছর খানেকের ছোট হইবেন। তিনি পড়িতেন হিন্দু কলেজে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে, আমি পড়িতাম সংস্কৃত কলেজে; আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা ত বড় কিছু ছিল না, কি গতিকে যে হইল তাহা আমার স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে গতিকেই হউক আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই তারকের প্রতি আমার একটু বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের অকুতোভয়তা, অল্পবয়সে ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ দখল, এই সব কারণে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যই বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতাম, অল্পবয়স হইতেই কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতাম। বিদ্যাসাগর কখনও কখনও লাইব্রেরীতে আসিয়া হাসিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমার দাদাকে তিনি চারি খণ্ড folio মহাভারত পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত মহাভারতের সমস্ত খণ্ডগুলি আমি দশ এগার বৎসর বয়সের মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় রত থাকিয়া ইংরাজীতে পারিপাট্য লাভ করিবার অবসর তখন হয় নাই; সেই অল্পবয়সে তারক, যেরূপ ইংরাজী কহিতে পারিতেন, সেরূপ পারিপাট্য আর কাহারও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল।

"সে আজ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। সেই সময়

অবধি এ পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও আমাদের উভয়ের মনোমালিন্য জন্মে নাই। আমরা 'সখা' শব্দের অর্থ মোটামুটি সহচর বা বন্ধু বুঝিয়া থাকি; কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ স্থলবিশেষে সখা শব্দের বিশিষ্ট অর্থ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি কোথা হইতে একটা শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়াছেন 'এক প্রাণঃ সখা প্রোক্তঃ' অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে মিল হইলে সখা হয়। তাহার মানে এই যে, তুমি ও সেক্সপীয়র ভালবাস আমিও সেক্সপীয়র ভালবাসি, তোমারও যাহাতে হাসি পায় আমারও তাহাতে হাসি পায়, তুমিও যাহা ঘৃণা কর আমিও তাহা ঘৃণা করি, এইরূপ নানা প্রকার মিল থাকিলে দুইজনে পরস্পর সখা হয়। তারকের সঙ্গে আমার সেইরূপ অনেক বিষয়ে মিল আছে; বিশেষতঃ হাসির কথা সম্বন্ধে। আমরা উভয়েই এক্ষণে রুগ্ন ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি; দেখা সাক্ষাৎ বড় কম; তথাপি এখন পর্য্যন্ত একলা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে যদি কোন হাসির কথা আমার মনে আইসে তৎক্ষণাৎ তারককে মনে হয়; ভাবি যে, সে এ কথাটা শুনিলে খুবই হাসিত।

"তারকের মত বিমলবুদ্ধি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। অল্পবয়স হইতেই তাহার ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তৎকালে স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টন নূতন চলন হইয়াছিল, তারক তাঁহার গ্রন্থ খুব পাঠ করিতেন ও তাঁহার খুব ভক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর গতে সে মিল ও স্পেন্সরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদিও দর্শন শাস্ত্র কতক কতক পড়িতাম বটে, কিন্তু তারকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভূতপূর্ব্ব চক্ষুরুন্মীলন হইয়াছে। একটা বিষয় অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে; আমার একটি বিশেষ অসুস্থতা আছে, সে অসুস্থতাটির বাহ্যিক কোনও লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না, কিন্তু আমি নিজের ভিতরে ভিতরে দুরন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করি। এক দিন তারকের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আমি বলিলাম যে, অনেকে ইহা imaginary (কাল্পনিক) বলিয়া আমাকে উপহাস করেন; তারক কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে বলিলেন, the imaginary is not the less real। এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লাগিল, এবং তদবধি আমার মানসক্ষেত্রে উহা উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

"ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারকের নিকট আমি যে কত জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না; তারকের ইংরাজী গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি যেরূপ মিষ্ট আমার

কাছে আর কাহারও আবৃত্তি কখনও সেরূপ মিষ্ট লাগে নাই। ইংরাজী গদ্য-পদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এক প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative, চীৎকার, হাতপা নাড়া, ইত্যাদি। আর এক প্রকার আবৃত্তি তরঙ্গবিহীন, একঘেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়েরই বহির্ভূত; ঠিক বুঝাইতে গেলে বোধ হয় তাহাকে serene বলা যাইতে পারে।

"তাঁহার বিমলবুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, Reason নামে আমাদিগের যে একটা attribute আছে উহার বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা, এই বৃত্তি তারকের যে প্রকার বলবতী দেখিয়াছি এরূপ আর আমি কাহারও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, Sentiment বা Impulse তাঁহার স্বভাবে কিছুমাত্র নাই। এতকালের সংসর্গের দ্বারা আমি ভালরূপই জানি, তাঁহার মধ্যে Sentiment কত প্রবল। এক দিনের কথা মনে পড়ে। চা বাগানের এক 'সাহেব' একজন কুলিরমণীর প্রতি এরূপ পাশব বলপ্রয়োগ করে যে, উহাতে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। সে সময়ে সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমার কাছে ঐ কথা বলিতে বলিতে তারকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। Impulseএর বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার মেজাজ কিছু গরম, তিনি অল্পেই চটিয়া উঠেন। ইহা নিতান্ত অমূলক নহে। সেরূপ মেজাজ গরম না হইলে বোধ হয় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট সমধিক সম্মানিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধেও আরও অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বভাবের দোষই বল আর গুণই বল, কোন রূপ অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারেন না; অন্যায় ছোটই হউক আর বড়ই হউক, দেখিলেই তিনি আগুন হইয়া উঠেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকরা হয় ত অনেক সময়ে মনের ভাব চাপিয়া যায়; তারক সেইটি আদৌ পারেন না।

"তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি; এ দান তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব। বন্ধুবান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ দায়ে পড়িলে, পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া

তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক একবারে দান করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন।

"বদান্যতা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুক্রমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতার একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান তারকেশ্বরের নিকট অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসত বাটী নির্ম্মান করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন You are the architect of many a man's fortune in town। কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার প্রধান বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, ঐ বাটী ৺ কালীকিঙ্কর পালিত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

"কালীকিঙ্কর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তোমাদের রিপণ কলেজের পুরাতন বাড়ীটির ঠিক পশ্চিম অংশে তারকের মাতামহপ্রদত্ত একখানি একতলা বাড়ী ছিল। কতদিন সেই বাড়ীতে তারকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি; তাহার বসিবার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কত নিভৃত বিশ্রব্ধ আলাপ, কত ভবিষ্যতের আশার কথা, দুইটি অশান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কত ব্যাকুল স্পন্দন!

"তারকের যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই স্বোপার্জ্জিত এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহাকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবরাই জানেন। এত পরিশ্রমের ধন অম্লান-বদনে অকাতরে দান করা অসামান্য মহানুভবতাসূচক এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।

"কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তারক যে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা প্রথমেই ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথম উদ্যমে একবার মুৎসুদ্দিগিরির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার কিছু টাকা লোকসান হইল। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে স্যর মর্ডণ্ট ওয়েল্‌স্ নামক দুর্দ্ধর্ষ জজের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তারকের অকুতোভয়তা, ইংরাজী বলিবার পারিপাট্য, straightforwardness ইত্যাদি দর্শন করিয়া জজ

এরূপ impressed হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রায়ের মধ্যে এই বাক্যটি তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, Here is a young man fresh from college who straightforwardly answers questions put to him, ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব? ইহার পর তাঁহার ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার বাসনা উপস্থিত হয়। তিন চার বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, কার্য্যাভিনিবেশ, অনন্যমনস্কতা, ও অক্লিষ্ট পরিশ্রমের গুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

"তোমরা বোধ হয় জান না যে, তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালাভাষার একজন লেখক হইবেন এ প্রকার প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত 'ভ্রমভঞ্জিনী' নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। তদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক সংস্থাপিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে কিছুদিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম—"আপনার নিকট হইতে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তিনি বলিলেন—

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এক উচ্চবংশের কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী এই নামটা কোন এক সময়ে বোধ হয় Prime Minister এই প্রকার এক উন্নত রাজপুরুষকে বুঝাইত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে মাঘ কবি আত্মপরিচয় প্রদানকালে এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন; 'অধিকার' শব্দটা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ State function; সেই অর্থ ধরিতে সর্ব্বাধিকারী বলিতে a state functionary who looked after all the departments of a stateএইরূপে বুঝাইতে পারে। ইংলণ্ড রাজ্যের Prime Minister বলিতে যদিও ঠিক তাহা বুঝায় না, তথাপি তিনি প্রধান অমাত্য এই অংশে সর্ব্বাধিকারী পদের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

"প্রসন্ন বাবু বসু বংশজ ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা বিশেষের রাজ্যে ঐ পদ পাইয়াছিলেন,

তদবধি তাঁহাদের বংশে নামটা স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে। যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, হাবড়ার সন্নিহিত শিবপুর সহরে একটি মুসলমান বংশ আছে, তাহারা অদ্যাপি 'কাজী' নামে অভিহিত হয় যদি চ এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কাজীপদস্থ নহেন।

"প্রসন্ন বাবুর জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ গ্রামটি হুগলি জিলার অন্তর্গত, এবং এক সময়ে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল; কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের অপরাপর অনেক স্থানের মত ম্যালেরিয়া দোষে নিতান্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। প্রসন্ন বাবুদিগের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল বোধ হয়, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় থাকিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে টাকাকড়ির অভাবে তাঁহাকে অনেক সময়ে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, এমন কি রাত্রিতে পাঠ করিবার জন্য প্রদীপের তৈল পর্য্যন্ত জুটিত না। তিনি রাস্তার লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া পাঠ্য গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্তেও তিনি বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন চারি বৎসর চল্লিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকবার সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর এই তিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত; সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা কম সুখ্যাতির কথা নহে। তখন যে সকল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত সেগুলি বাৎসরিক রিপোর্টে ছাপাইয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণের গোচর করাইয়া দিতেন। আমার মনে আছে, ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রের একটি উত্তর প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন; তাহা আমি রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম। সেবার সেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট নামক নাটক পরীক্ষার পুস্তক ছিল, প্রসন্ন বাবু তাহারই উত্তর লিখিয়াছিলেন; এবং তৎসম্বন্ধে ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ যশস্বী ছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার অল্প অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা পাটিগণিত ও বীজগণিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালা পাটিগণিত প্রসন্ন বাবুর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। যখন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালার মফঃস্বলপ্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতির জন্য ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর

প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিস্তর নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন,—আন্দাজ ১৮৫৪, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ,—সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে ইংরাজী ধরণের কতকগুলি নূতন গ্রন্থ শিশুদিগের পাঠোপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। পাটিগণিত রচনা করিবার ভার প্রসন্ন বাবু গ্রহণ করিলেন। এই গুরুতর কার্য্য তিনি কি প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় বোধ হয় দিতে হইবে না। তাঁহার পরিগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষণে বাঙ্গালা পাটিগণিত শাস্ত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার পরের সমস্ত পাটিগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সাহায্য না পাইলে অদ্যাবধি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ চলন নাই; কারণ, বোধ হয় সে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত। এবং আমাদিগের দেশে সকল কার্য্যই সুপারিশের দ্বারা চলে, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার সাহায্য লইয়াই তাঁহার গ্রন্থকে পদচ্যুত করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে,

তোর শিল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া,—

প্রসন্ন বাবুর পাটিগণিতের পদচ্যুতি ইহারই একটি দৃষ্টান্তস্থল! বাঙ্গালা পাটিগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া প্রসন্ন বাবুকে সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে দুই খণ্ড বহুবিস্তৃত বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাহার কারণ, বাঙ্গালাতে গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন বীজ-গণিত পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং সেই দুই খণ্ড এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু থাকিলে, গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধে ভাষার প্রতিষ্ঠা বিলক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিত।"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন। আমি বলিলাম "আপনার মুখে পূর্ব্বে শুনি-য়াছি যে, পাটিগণিত রচনা করিবার সময় প্রসন্ন বাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া-ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটিগণিত ও বীজ-গণিতের পরিভাষা সম্বন্ধে ঋণী ছিলেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লীলাবতী' প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না। তিনি নূতন ধরণে ইংরাজী প্রণালীতে অধ্যা-

পনার প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে 'লীলাবতী' প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট 'লীলাবতী' পড়ি; বিদ্যাসাগর ইঁহাকে পরে মুন্সেফ করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'লীলাবতী' পড়েন কলেজের এক খোট্টা পণ্ডিতের কাছে, তাঁহার নাম পণ্ডিত যোগধ্যান। পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিদ্যাসাগর জয়নারায়ণের ছাত্র। শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন--'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাঁহাদিগের নাম একটি শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছিল।

কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দসূরৌ
নাথুরামো প্রাপ্ত বর্দ্ধেপ্যানল্পং।
যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনায়॥

· পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম মল্লিনাথ প্রকাশিত করেন।

পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—"কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কল কব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।"

এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের Moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না; পয়সার লোভে সৎপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এ গুণটা সাধারণতঃ আছে। তবে জজ পণ্ডিতরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না, ঘুষ লইত।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বুদ্ধ গয়া।

—:০:—

(২)

বুদ্ধ গয়া কত দিন পূর্ব্বে প্রথম হিন্দুর অধিকারে আসিয়াছিল, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে পুরাবস্তুর সাক্ষ্যে মনে হয়, বুদ্ধ গয়ার প্রাধান্য-লোপ গয়ার প্রাধান্য-লাভের কারণ।

বায়ু পুরাণান্তর্গত 'গয়া মাহাত্ম্যে' গয়ার উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত আছে।—বিষ্ণুর নাভিপদ্মসম্ভূত ব্রহ্মা বিষ্ণুর অনুমতি অনুসারে জীবসৃষ্টি করেন—সুরাসুর তাঁহারই সৃষ্ট। অসুরদলমধ্যে গয়া মহাবল ও পরাক্রমশালী ছিল। সে ১২৫ যোজন দীর্ঘ ও ৬০ যোজন বিস্তৃত ছিল; সেই বৈষ্ণব কোলাহল গিরিশিরে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া বহু সহস্র বৎসর সুদারুণ তপ করিয়াছিল। তাহার তপশ্চারণে ভীত দেবদল ব্রহ্মার নিকট অভয় প্রার্থী হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কৈলাশশিখরাসীন মহেশ্বরের নিকট গমন করেন। মহেশ্বর উপায়নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া দেবগণসহ ক্ষীরাব্ধি-শয়নে শয়ান বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিপ্রায়বিজ্ঞাপন করেন। বিষ্ণু স্বয়ং পশ্চাদ্গামী হইবেন বলিয়া অন্য দেবতাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তখন কেশব গরুড়-পৃষ্ঠে ও অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া গয়াসুর-সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেন আর তপশ্চারণ করিতেছ? আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি বর চাহ, বল; আমরা তাহাই দিব।" শুনিয়া গয়া বলিল, "যদি আমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করেন তবে আমার দেহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দেহাপেক্ষা—দেব, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, তীর্থ হইতেও পবিত্র করুন।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ফলে জীবগণ গয়ার দেহ স্পর্শ বা দর্শন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে লাগিল; যমালয় শূন্য হইল। তখন পুরন্দরাদি-সহায় যম বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু গয়ার দেহোপরি যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দেবগণকে উপদেশ দিলেন। গয়া সমাগত দেবগণকে সম্মুখে দেখিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। তখন ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ তাহার দেহ প্রার্থনা করিলে গয়া সানন্দে নিজ দেহ প্রদান করিল। সে নৈঋতে হেলিয়া কোলাহল গিরিতে পতিত হইল; তাহার

মস্তক উত্তর দিকে রহিল ও পদ দক্ষিণে প্রসারিত হইল। তখন ব্রহ্মা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। কিন্তু যজ্ঞশেষে দেবগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, গয়াসুর যজ্ঞ-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে! তখন ব্রহ্মা যমকে বলিলেন, "তোমার গৃহ হইতে ধর্ম্মশিলা আনয়ন করিয়া উহার মস্তকোপরি সংস্থাপিত কর।" এই ধর্ম্মশিলা সমাগত ব্রহ্মার পূজার উদ্দেশ্যে স্বামীর পদসেবাবিরতা কোন ব্রাহ্মণীর পাষাণ দেহ। মস্তকে ধর্ম্মশিলা স্থাপিত হইলে ও দেবগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেও যখন গয়ার গতিরোধ হইল না, তখন ব্রহ্মা আবার বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু দেহোদ্ভূত মূর্ত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিলেন। তাহাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায় বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া আদি গদাধর রূপে গদাঘাতে গয়াসুরকে নিশ্চল করিয়া সকল দেবদেবীসহ ধর্ম্মশিলায় অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন গয়াসুর বলিল, "আমি নিষ্পাপ দেহ ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দিবার পর আমার প্রতি এ নির্য্যাতন কেন? আমি ত হরির আদেশেই নিশ্চল হইতাম। আমাকে কৃপা করুন।" দেবগণ গয়ার এই উক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সে বলিল, "যাবচ্চন্দ্রদিবাকর দেবগণ এই শিলায় অবস্থান করুন; পঞ্চক্রোশব্যাপী এই ক্ষেত্র গয়াক্ষেত্র নামে কীর্ত্তিত হউক—ইহার এক ক্রোশ আমার মস্তক অবস্থান করিবে। আর এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বলোক যেন পূর্ব্বপুরুষসহ ব্রহ্মলোকে গমন করে।" গয়ার এই প্রার্থনা শুনিয়া বিষ্ণুসনাথ দেবগণ বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে ও পিণ্ডদান করিলে শ্রাদ্ধকারী স্বয়ং ও তাহার ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।"

কে এই পরম বৈষ্ণব গয়াসুর যাহার দেহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দেহাপেক্ষাও পবিত্র এবং যাহাকে নিশ্চল করিতে বিষ্ণুসনাথ সমগ্র দেবকুলের সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল? যিনি সব্যসাচী রূপে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে একদিকে প্রচলিত ভ্রান্ত মত বিনষ্ট করিয়া অন্য দিকে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—এই গয়াসুর প্রচলিত প্রবলবল বৌদ্ধধর্ম্ম; আর গয়াসুরবিজয় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বায়ুপুরাণের গ্রন্থকার জটিল দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। তিনি কিরূপে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে গয়াসুরের [illegible]বপু স্থাপিত করিবার কল্পনা করিলেন? গয়াসুরের অপরাধ—সে

মুক্তির পথ অত্যন্ত সুগম করিয়াছিল। সে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পালন করিত না। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই লক্ষণ। বৌদ্ধগণ ধর্ম্মাত্মা, আত্মত্যাগী ছিলেন। গয়াসুর বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহার দেহ ৫৭৬×২৬৮ মাইল। কলিঙ্গ হইতে হিমালয় ও মধ্য ভারত হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত যে ভূভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ইহার কিছু অধিক। দেবগণের গয়াসুরদমনচেষ্টা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বৌদ্ধ ধর্ম্মের দমনচেষ্টার রূপক; আর বিষ্ণুর গদাঘাত বৌদ্ধধর্ম্মনির্য্যাতন। গয়ার মস্তকে শিলাসংস্থাপন বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানে আঘাতের পরিচায়ক। আবার দেবতার আশীর্ব্বাদেই বৌদ্ধ গয়া হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। বুদ্ধের পদচিহ্ন গয়ায় সম্পূজিত। ভারতে আর কোন তীর্থে পদচিহ্নপূজা প্রচলিত নাই। আবার 'গয়া মাহাত্ম্যেই' বিষ্ণুকে বুদ্ধ আখ্যা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গয়ামাহাত্ম্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—পুণ্যকামী বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুমমূলে পূজা করিবেন। এই পূজার বিশেষ মন্ত্রও আছে,—"আমি চলদল, স্থিতিকারণ, যজ্ঞ, বোধিসত্ত্ব অশ্বত্থকে নমস্কার করি। হে বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, তুমি রুদ্রগণমধ্যে একাদশ, বসুগণ মধ্যে পাবক, দেবগণমধ্যে নারায়ণ। নারায়ণ সর্ব্বদা তোমাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া তুমি বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তুমি ধন্য ও দুঃস্বপ্নবিনাশন। আমি অশ্বত্থরূপী দেব—শঙ্খচক্রগদাধর, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃক্ষরূপধর হরিকে নমস্কার করি।"

এত দিন পরে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মতপ্রকাশ সহজসাধ্য নহে। কারণ, রূপক কল্পিত—তাহা ক্রমেই অতিরঞ্জনে বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিশালবপু হইয়া উঠে। শেষে কি জন্য সে রূপকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তবে আমাদের পুরাণে রূপকের অভাব নাই। আর গয়ায় যে বৌদ্ধপ্রাধান্য প্রণষ্ট করিয়া হিন্দুপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। বুদ্ধ গয়ায় এমনও দেখা যায় যে, মন্দিরে সম্পূজিত প্রতিমার পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পঞ্চপাণ্ডব মন্দির তত প্রাচীন নহে। মন্দিরে কয়টি বুদ্ধমূর্ত্তি ও মায়াদেবীর মূর্ত্তি আছে—ঐ গুলি পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী বলিয়া কথিত। প্রধান মন্দিরের নিকটে একটি পুরাতন মন্দির বিদ্যমান। ইহা প্রধান মন্দিরের আদর্শে গঠিত। উভয় মন্দিরের ইষ্টকও একইরূপ। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবী "তারা দেবী" নামে কীর্ত্তিতা; কিন্তু মূর্ত্তি স্ত্রীমূর্ত্তি নহে—পরন্তু পদ্মপাণি

বোধিসত্বমূর্ত্তি। পরবর্ত্তীকালে হিন্দু মোহন্তগণ যে সকল মন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন সে সকলে প্রধান মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যানুকরণযোগ্যতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই মনে হয়, এ মন্দির প্রাচীন—বোধ হয় হিউয়েন্থ সাং সে সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন সে সকলের একটি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে তারার পূজা হইত। হয় ত এ মন্দির সেই তারার। সেই ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত মন্দির পরিশেষে হিন্দু তারা দেবীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বোধিসত্বের মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হয় নাই। *

চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ গয়ায় গিয়াছিলেন। তখন নগর যেন "পরিত্যক্ত ও নিরানন্দ।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তৎ-পূর্ব্বেই বুদ্ধ গয়া হিন্দুর অধিকারে আসিয়াছে। তাহার পর ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্থ সাংও দেখেন,—বুদ্ধ গয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিকৃত—একই ঋষিবংশীয় সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। ইহাঁরা বোধ হয় গয়ালী। গয়ালীরা আপনাদিগকে ব্রহ্মাসৃষ্ট পুরোহিতের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইহাঁদিগের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। কারণ, ইহাঁরা অন্য পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন ঘৃণার্হ বিবেচনা করিয়া স্বজনমধ্যেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এরূপ বিবাহে বংশবৃদ্ধি হয় না। মিশরের পুরাকালীন রাজবংশেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে বুদ্ধ গয়া কতকাল পূর্ব্বে হিন্দুর হস্তগত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। হিউয়েন্থ সাংএর আগমনের পূর্ব্বেই যে বুদ্ধ গয়ার সমৃদ্ধিসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনহেতু বজ্রাসন বালুকায় ও মৃত্তিকায় আবৃত হইয়াছে। উহা আর দৃষ্ট হয় না।—বাস্তবিক কোন প্রকৃতিক পরিবর্ত্তনে ফল্গুর গর্ভ হইতে বালুকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়াছিল। সে বালুকাস্তর ১।।০ ফিট উচ্চ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধেও কিম্বদন্তী আছে।—এই স্থানে দশ সহস্র সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহারা দুশ্চিন্তাপীড়িত হইলে প্রত্যূষে উঠিয়া নদীনীরে যাইয়া আনন পর্য্যন্ত জলে অগ্রসর হইতেন ও নদীগর্ভ হইতে মুষ্টিমেয় বালুকাসংগ্রহ করিয়া একটি থলীতে রাখিতেন। তাহার পর তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া সমবেত সন্ন্যাসীদিগের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার

* বৌদ্ধমতে তারার একবিংশ রূপ আছে।—Waddell—Buddhism of Tibet.

করিয়া ঐ বালুকা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ষোড়শ মাইল ব্যাপী বালুপ্রান্তর সৃষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে মন্দির-প্রাঙ্গণ বালুকায় ও মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শেষে ভারত গভর্মেণ্টের চেষ্টায় জেনারেল কানিংহামের নির্দ্দেশমত মিষ্টার বেগলার এই সঞ্চিত আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করিয়া মন্দিরের স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

কানিংহাম বলেন, যে স্থান বর্ত্তমানে বুদ্ধ গয়া নামে পরিচিত তাহা পূর্ব্বে মহাবোধি নামে পরিচিত ছিল। হিউয়েস্থ সাং মন্দিরকে মো-হো-পু-তি (মহাবোধি) এবং ঐ স্থানের বিহারকে মহাবোধি সঙ্ঘারাম বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সকল চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারাও ঐ নামই ব্যবহার করিয়াছেন। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা ধর্ম্মপালের শিলালিপিতেও ঐ নাম পাওয়া যায়। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা অশোকবল্লও ঐ নামের ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৩৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সকল লিপিতেই ঐ নাম পাওয়া যায়।

যে বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করেন প্রথমে তাহাকেই বোধি বা মহাবোধি আখ্যায় আখ্যাত করা হইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উইলমট এই স্থানে একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হয়েন। উহা সার চার্লস উইলকিন্স কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'এ প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম অমরদেব কর্ত্তৃক কীটক প্রদেশে এই মন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিত আছে। এই শিলালিপির উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া বহু প্রত্নতাত্ত্বিক মন্দিরের কালনির্ণয়ে ভ্রম করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিতে 'বুদ্ধ গয়ার' উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের সময় বোধি নামই প্রচলিত ছিল এবং বরহুতের ভগ্নাবশেষে (খৃঃ পূঃ ২০০) দেখা যায়—"ভগবতো শক মুনিনো বোধি"—লিখিত আছে। ইহার অর্থ—ভগবান শাক্যমুনির বোধিদ্রুম।

তাহার পর হিউয়েন্থ সাংএর সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক কাল 'মহাবোধি' নাম ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। বৃক্ষের নাম—বোধিদ্রুম; বুদ্ধের আসনের নাম—বোধিমণ্ড; আসনোপরি নির্ম্মিত মন্দিরের নাম—মহাবোধি বিহার; আর নিকটবর্ত্তী বিহারের নাম—মহাবোধি সঙ্ঘারাম। আবার ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের লিপিতে স্পষ্টই দেখা যায়—

মনাবোধি-নিবাসীদিগের কল্যাণার্থ চতুর্মুখ মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ হইতে বোধ হয়, উরুবিল্ব বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক মহাবোধি নামে অভিহিত হইত। বুদ্ধগয়া নাম—গয়ার প্রাধান্যের পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হয়।

বোধিদ্রুমকে কেন্দ্র করিয়াই বুদ্ধ গয়ার প্রতিষ্ঠা। ইহারই ছায়ায় বসিয়া শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন। তাই বৌদ্ধদিগের নিকট ইহা পূজার যোগ্য। ইউয়েন্থ সাং এই বৃক্ষের কথায় বহুবিধ অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই বৃক্ষ পিপ্পল জাতীয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ইহা বহুশত ফিট উচ্চ হইয়াছিল। বহুবার ছেদিত হইলেও বর্ত্তমানে ইহা ৪০।৫০ ফিট উচ্চ। বুদ্ধ এই বৃক্ষতলে সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বোধি বলা হয়। ইহার কাণ্ডের বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত—শাখা ও পত্র কৃষ্ণাভ হরিৎ; হিমে বা নিদাঘে ইহার পত্র বৃন্তচ্যুত হয় না। তবে তথাগতের নির্ব্বাণ-সময় পত্রগুলি পড়িয়া গিয়াছিল। তখন বহু লোক আসিয়া বৃক্ষমূলে গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিল। তখন ইহার চতুর্দ্দিকে সঙ্গীত শ্রুত হইয়াছিল; দীপাবলি প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল। তথাগতের নির্ব্বাণলাভের পর ভ্রান্তমতে আস্থাবান নৃপতি অশোক সৈন্যসহ এই স্থানে আসিয়া বৃক্ষটিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্তূপাকার করেন। তাঁহার আদেশে একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ করেন। অগ্নি নির্ব্বাণের পূর্ব্বেই শিখামণ্ডলমধ্যে পত্রবহুল দুইটি বৃক্ষের আবির্ভাবে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। অশোক এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়া বৃক্ষের অবশিষ্ট মূলে সুগন্ধি দুগ্ধ প্রদান করেন। পর দিন প্রত্যুষেই বৃক্ষ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।* ইহাতে অশোক আনন্দে বিহ্বল হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইলে তাঁহার পত্নী গোপনে লোক পাঠাইয়া মধ্যরাত্রির পর বৃক্ষচ্ছেদন করান। প্রভাতে অশোক বৃক্ষের পূজা করিতে আসিয়া ইহার এই অবস্থা দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া উপাসনা করিলে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হয়।

* সংপ্রতি পুরাবস্তু বিভাগের যে বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৮—৯ খৃষ্টাব্দ) তাহাতে ডাক্তার ব্লক বলেন, অশোক বৃক্ষপূজার বিরোধী ছিলেন এবং এরূপ পূজা বিদ্রাই ও নিষ্ফল মনে করিতেন। তাঁহার পক্ষে বৃক্ষচ্ছেদন অসম্ভব নহে। তিষ্যরক্ষিতার বৃক্ষনাশপ্রয়াস অশোকের কৃতকর্ম্ম গোপন করিবার উদ্দেশ্যে পরে রচিত।

রাজা প্রায় দশ ফিট উচ্চ বৃতি দিয়া বৃক্ষটি বেষ্টিত করিয়া দেন। এই বৃতি এখনও বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী কালে রাজা শশাঙ্ক ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হইয়া বহু বৌদ্ধবিহার ভগ্ন করেন ও বোধিদ্রুম ছেদন করেন। তিনি বোধিদ্রুমের মূলোৎপাটনোদ্দেশ্যে ভূমি খনন করান। খনিত ভূমিতে জল দেখা দিল—তথাপি সকল মূল উৎপাটিত হইল না দেখিয়া তিনি ঐ ভূমির উপর অগ্নি প্রজ্বালিত করান এবং ইক্ষুরস ও শর্করা ছড়াইয়া দেওয়ান। কয় মাস পরে মগধের রাজা অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণব্রহ্ম এই সংবাদ পাইয়া বহু বিলাপ করিয়া যে স্থানে বৃক্ষ দণ্ডায়মানছিল,তথায় পতিত হয়েন ও বহুসহস্র গাভীর দুগ্ধ ঢালিয়া দেন। এক রাত্রির মধ্যে ১০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ জন্মে। পাছে কেহ আবার বৃক্ষ ছেদন করে এই আশঙ্কায় তিনি ২৪ ফিট উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দিয়া বৃক্ষটি বেষ্টিত করান। তাই আজও বোধিদ্রুম ২০ ফিটের অধিক উচ্চ বৃতিবেষ্টিত।*

অশোকের বৃক্ষচ্ছেদনের কথা 'অশোকাবদানে' নাই। কিন্তু তাঁহার মহিষী তিষ্যরক্ষিতা কর্ত্তৃক বৃক্ষচ্ছেদনে কথা 'অশোকাবদানে' আছে। অশোক প্রথমা মহিষীর মৃত্যুর পর তিষ্যরক্ষিতাকে বিবাহ করেন। এই তিষ্যরক্ষিতাই সপত্নীপুত্র কুনালের প্রতি আসক্ত হয়েন এবং কুনাল কর্ত্তৃক তাঁহার পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে কুনালের চক্ষুরুৎপাটন করান। 'অশোকাবদানে' লিখিত আছে, অশোক বহুমূল্যরত্নাদি ও সুশোভন কুসুম বোধিদ্রুমের সজ্জায় ব্যবহার করেন দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশে রাণী এই বৃক্ষ নষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি চণ্ডাল রমণী মাতঙ্গীকে, সে যাহা চাহিবে তাহাই দিতে স্বীকৃতা হইয়া, তাঁহার সপত্নী এই বোধিদ্রুমের বিনাশকার্য্যে

* ডাক্তার ব্লক বলেন শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া বোধিদ্রুম নষ্ট করেন—ইহার প্রমাণ নাই। পূর্ণ বর্ম্মার 'বর্ম্মা' উপাধি হইতে বোধ হয়, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। বুদ্ধগয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌখারী বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা কুমারগুপ্ত, দামোদরগুপ্ত ও মহাসেনগুপ্তের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধেরও প্রমাণ বিদ্যমান। প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থায় রাজ্যস্থিত মন্দিরের বা তীর্থস্থানের আয়ের একাংশ রাজার প্রাপ্য। সুতরাং বুদ্ধ গয়া যে মগধের রাজার আয়ের প্রশস্ত উপায় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে তাঁহার শত্রু মগধের রাজার অনিষ্ট সাধনোদ্দেশ্যে বোধিদ্রুম নষ্ট করাই সঙ্গত।

নিয়োজিত করেন। মাতঙ্গী মন্ত্রপ্রভাবে বৃক্ষটিকে দগ্ধ করে। রাজকর্ম্মচারীরা রাজার নিকটে বোধিদ্রুমের বিনাশবার্ত্তা নিবেদন করিলে অশোক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়েন। তাঁহার জ্ঞানসঞ্চারের পর তিনি বৃক্ষের জন্য বিলাপ করিতে থাকেন। তখন তিষ্যরক্ষিতা তাঁহাকে বলেন, "ইহাতে বিলাপ না করিয়া আমার সহিত সংসারের সুখ ভোগ করুন।" কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না। তখন তিষ্যরক্ষিতার চৈতন্যোদয় হয় এবং তিনি পুনরায় মাতঙ্গীর সাহায্যে বৃক্ষটির পুনরুদ্ধার করান।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন বলেন, বৃক্ষটি সতেজ অবস্থায় বিদ্যমান; কিন্তু ইহার বয়স শত বর্ষের অধিক বলিয়া মনে হয় না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কনিংহাম যখন বৃক্ষটিকে দেখেন তখন ইহা জরাগ্রস্ত—পশ্চিম পার্শ্বে তিনটি শাখা ব্যতীত আর সবই শুষ্ক। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃক্ষের অবশিষ্ট অংশ বাত্যাহত হইয়া নিপতিত হয়। আবার নূতন বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কানিংহামের বিশ্বাস পূর্ণব্রহ্ম (বর্ম্মা) কর্ত্তৃক বৃক্ষের পুনসংস্থাপন খৃষ্টীয় ৬০০ হইতে ৬২০ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হয়। তখন হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক শশাঙ্কের ক্ষমতানাশ সম্পন্ন হইয়াছে। কানিংহাম ও বেগলার উভয়েরই বিশ্বাস, প্রস্তরপ্রাচীর দিয়া বৃক্ষবেষ্টন ভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ মন্দিরের রোয়াকের উপর নূতন তরুর প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরের পাশ্চাদ্ভাগে যখন বজ্রাসন বাহির করা হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী বৃক্ষের চিহ্ন পাইবার আশায় কানিংহাম বজ্রাসনের পশ্চিমে ভূমি খনন করান। আসনের পদতল হইতে ৩ ফিট ও পরবর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে ৩০ ফিট নিম্নে তিনি প্রাচীন পিপ্পল বৃক্ষের দুই খণ্ড অবশেষ পাইয়াছিলেন। একটি ৪ইঞ্চ ও অপরটি ৬॥০ ইঞ্চ মাত্র। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের পোস্ত দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক কাল এই স্থানে বিদ্যমান। তাই অনুমান হয়, এই দুইখণ্ড ৬০০ হইতে ৬২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্ক কর্ত্তৃক কর্ত্তিত বোধিদ্রুমের ধ্বংসাবশেষ।

বাস্তবিক এই স্থানের বৃক্ষ যে কতবার বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। তারানাথ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে "পশ্চিম প্রদেশের রাজা" হুনিমন্ত কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি মন্দির বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বোধিদ্রুম যে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল, এমন মনে হয় না। কানিংহামের বিশ্বাস, এই হুনিমন্ত হয় ত হুণরাজা মিহিরকুল। ইহার পর

হর্ষবর্দ্ধনের পর হইতে বৃক্ষবিনাশের প্রমাণ নাই। তখন বহু সিংহলীয় পরিব্রাজক বুদ্ধ গয়ায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বোধিদ্রুমের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৭০০ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোধিদ্রুমের বিনাশ না হইয়া থাকিলে পালরাজাদিগের রাজত্বাবসান পর্য্যন্ত ইহার কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই বৌদ্ধরাজগণ অনুমান ৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্বারম্ভ করেন। তখন হইতে ১২০১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত বোধিদ্রুমের বিনাশ সম্ভবপর নহে। তবে মুসলমানগণ যখন পেশোয়ারে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিনষ্ট করে নাই, তখন সম্ভবতঃ মহাবোধির বোধিদ্রুমও রক্ষা পাইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশীয় প্রচলিত বিবরণে দেখা যায়, রাজা পসেনদী (প্রসেনজিৎ) দুই প্রস্ত প্রাচীরে বোধিদ্রুম পরিবেষ্টিত করান; ধর্ম্মাশোক আর একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। এ কথা সত্য হইলে মনে হয়—প্রসেনজিতের প্রাচীর কাষ্ঠ বৃতিমাত্র। তাঁহার সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী পরে অশোক যখন সিংহাসনারূঢ় হয়েন তখন সে বৃত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। অশোক কর্তৃক বোধিদ্রুমের পূর্ব্ব পার্শ্বে বিহার নির্ম্মাণকালে এই বৃতি উন্মূলিত হইয়াছিল।

পিপ্পল তরু দ্রুতবর্দ্ধনশীল ও অল্পকালজীবী। তাই অনুমান হয়, অশোকের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় ক্রমে ক্রমে বিংশটি বৃক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী বৃক্ষের স্থান অধিকৃত করিয়াছে। দ্রুমের পর দ্রুম প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাক্যসিংহের সম্বোধিলাভের পূত ভূমিকে ছায়াসুশীতল করিয়া আসিতেছে।

সনাতন ধর্ম্ম।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

এই বিশ্ব সুবিশাল পবিত্র মন্দির তাঁর,
নিরমল হৃদিখানি সকল তীর্থের সার;
অজর অমর হেথা সত্য শুদ্ধ চিরন্তন,
সৃজন পালন লয়ে বিকার নাহিক কোন।
মন যাহা 'লয় মানি' তাই ধর্ম্মমূলাধার,
প্রীতি মন্ত্র জগতের সকল সাধনসার।
স্বার্থ গেলে মন হ'তে বৈরাগ্য উপজে তথা
এই ধর্ম্ম সনাতন জেন মনে সার কথা।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতে বৈদ্যনাথে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

"জন্মিলে মরিতে হ'বে অমর কে কোথা র'বে ;
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে ?"

কিন্তু যখন বার্দ্ধক্যের বহু পূর্ব্বে কর্ম্মবহুল জীবনের আরব্ধ কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া কোন কর্ম্মবীরের তিরোভাব হয়, তখন শোক আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ করে। সখারামের মৃত্যুতে আমরা কেবল যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালা লেখক হারাইয়াছি তাহা নহে। আমাদের আশঙ্কা হয়, বুঝি বা যে চিতায় সখারামের শবদাহ হইয়াছিল সেই চিতাগ্নিশিখায় মহারাষ্ট্রের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রও ভস্মসাৎ হইয়াছে।

সখারাম মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ'র সহিত নাগপুরের রঘুজী ভোঁশ্লার যে সন্ধি হয় তাহার সর্ত্ত অনুসারে নবাব বাঙ্গালার চৌথ হিসাবে উড়িষ্যা প্রদেশ রঘুজীকে দেন। সেই সময় কৃষ্ণভট্ট রায়কর রঘুজীর দূতরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া কিছু দিন মুর্শীদাবাদে বাস করেন। এই সময় নবাব কোন কারণে বীরভূমির শাসনকর্ত্তা বাদিয়াৎ জামা খাঁ'র উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হয়েন। বাদিয়াৎ জামা খাঁ কৃষ্ণভট্টের সাহায্যে নবাবের কোপানল হইতে অব্যাহিত লাভ করিয়া তাঁহাকে বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী করোঁ গ্রাম জায়গীর দেন। কৃষ্ণভট্ট তদবধি করোঁতেই বাস করেন। সখারামের পিতামহ এই রায়কর পরিবারে বিবাহ করিয়া কিছু ভূসম্পত্তি যৌতুক পাইয়া করোঁগ্রামেই আসিয়া বাস করেন। বাঙ্গালা সখারামের জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমি।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যনাথে সখারামে সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তখন সখারাম দেওঘর স্কুলের ছাত্র—মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্র বাবু স্কুলের হেড মাষ্টার। তাহার চারি বৎসর পরে আমি আবার দেওঘরে গমন করি। তখন সখারাম স্কুলে শিক্ষক। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ তখনই আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। তিনি অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসুমহাশয় পরম ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিসী

স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর।

লোক ছিলেন। সখারাম নানাবিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সেই মজলিসে সখারামের সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়।

এই সময় আমার কোন আত্মীয় 'প্রতিভা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পত্রখানি বর্ষমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। আমি তাহার লেখক, সখারামও অন্য-তম লেখক। তখনও সখারামের বাঙ্গালা রচনার "আড়" ভাঙ্গে নাই। কিন্তু একাগ্র সাধনার ফলে তিনি অল্পকালমধ্যেই বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে প্রধান লেখকদিগের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিলেন। সখা-রামের সকল কার্য্যেই এই একাগ্র সাধনা সপ্রকাশ।

ইহার পর অদৃষ্ট চক্রের অতর্কিত আবর্ত্তন সখারামকে দেওঘরের নিভৃত নিবাস হইতে কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় আনিয়া শিক্ষকের শান্তিস্নিগ্ধ কার্য্য হইতে সর্ব্বগ্রাসী সংবাদ-পত্রসেবায় নিযুক্ত করে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টা-চার্য্য মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি "আদর্শ সংবাদ পত্র" 'হিতবাদীর' পরিচালনে অসক্ত হইয়া তখন তাহার ভার ত্যাগ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় তখন 'হিতবাদীর' ভার লইয়াছেন। বিশারদ অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। মিষ্টার হার্ড তখন দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা 'হিতবাদীতে' প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্র বাবু ও সখারাম দুইজনেরই বাঙ্গালা লেখক "অপবাদ" ছিল। তাই দুইজনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সখারাম 'হিতবাদীতে' লিখিয়াছিলেন সেই সন্দেহে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বিশারদ তাঁহাকে 'হিতবাদীতে' চাকরী দিলেন। সখারাম সংবাদপত্রসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বিস্ময়কর একাগ্রতার ফলে তিনি ক্ষমতাশালী সম্পাদক, ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাতৎপর বিশারদের জীবনের শেষ সময় তাঁহার প্রধান অব-লম্বন ছিলেন। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে—"তৃষ্ণা জুড়ায় যা'র জলে" তাঁহার সেই জন্মভূমি হইতে দূরে বারিধিবক্ষে বিশারদের মৃত্যুর পর সখারাম 'হিতবাদীর' কর্ণধার নিযুক্ত হয়েন। তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন—দলাদলির বাত্যায়—রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ-তাড়নে তিনি কিরূপ নিপুণতাসহকারে 'হিতবাদী' পরিচালিত করিয়া-ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মধ্যে একবার 'হিতবাদীর সহিত'

তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। সে বিচ্ছেদও সখারামের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সুরাটে কন্‌গ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। 'হিতবাদী'র কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তিলকপ্রমুখ ব্যক্তিদিগকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন। সখারামের বিশ্বাস অন্যরূপ। তাই তিনি বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া কার্য্যত্যাগ করিলেন। দরিদ্রের পক্ষে এ কার্য্য সহজ নহে।

বাস্তবিক সখারামের সমস্ত জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম।

প্রতিকূল অবস্থাহেতু তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রম করিতে হইত। সংবাদ-পত্র সেবার বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। 'এটা কোন্ যুগ?' ব্যতীত তাঁহার আর সকল পুস্তকই এইরূপ অবসরকালে লিখিত। পুস্তক ব্যতীত তিনি গত বিংশবর্ষ কালে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। সাময়িক সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইয়া সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। তিনি 'সাহিত্য' পত্রে "মহারাষ্ট্র সাহিত্যে" মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যিক ভাব বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বহু প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র ইতিহাস বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। 'আর্য্যাবর্ত্ত' প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কি লিখিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাজীরাও যখন নর্ম্মদার কূলে পানিপথযুদ্ধের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তখন তাঁহার সেনাদল এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনে। সে দাক্ষিণাত্যে আওরাঙ্গাবাদের কোন মহাজনের দিল্লীস্থ গদি হইতে মহারাষ্ট্রবাহিনীর বিনাশবার্ত্তা লইয়া যাইতেছিলেন; তাহার নিকট বাজীরাও প্রথম আপনার সর্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়াছিলেন। গ্র্যাণ্ট ডাফ লিখিত ইতিহাসপাঠক সে কথা অবগত আছেন। আমি তাঁহাকে সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলাম। তাহার পর টেব্‌লে একখানি 'হিন্দুস্থান রিভিউ' দেখিয়া সখারাম তাহা তুলিয়া লইলেন। তাহাতে মস্তানীসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া সখারাম বলিলেন, "আমি বাজীরাওয়ের কলঙ্ক মোচন করিব।" দুই তিন দিন পরে তিনি 'আর্য্যা-বর্ত্তের' প্রথম সংখ্যার জন্য "বাজীরাও ও মস্তানী" নামক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। শিবাজীর একখানি বিস্তৃত চরিত রচনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সে জন্য তিনি বহুদিন ধরিয়া বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থরচনা

হয় নাই। তিনি তাঁহার সেই ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। আর কাহারও দ্বারা সেই উপহৃত উপাদানসাহায্যে বাঙ্গালায় শিবাজীচরিত রচিত হইবে কি না, তাহাও জানি না।

কিন্তু কেবল মহারাষ্ট্র ইতিহাস অধ্যয়নে নহে—সকল বিষয়ের অধ্যয়নেই তাঁহার শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা তাঁহাকে যত্নসহকারে উপাদানসংগ্রহে প্রবৃত্ত করাইত।' তিনি বিনাপ্রমাণে কোন কথা বলিতেন না; তাই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। তাঁহার 'দেশের কথায়' এই শ্রমশীলতার পরিচয় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। তিনি কিরূপ যত্নসহকারে উপাদান সংগ্রহ করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—সখারাম যখনই আমার গৃহে আসিতেন তখনই টেব্‌লের উপর নূতন পুস্তকগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেন। একবার তিনি সার ফ্রেডরিক ট্রীভসের The Other Side of the Lantern দেখিয়া পুস্তকখানি কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, উহা ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাহার পর পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া নামকরণের কারণ দেখাইয়া দিয়া আমি বলিলাম, ইহাতে "দেশের কথা" আছে;—গ্রন্থকার ভারতের দারিদ্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে এক দিন সখারাম আসিয়া বলিলেন, 'দেশের কথা'র নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে—সার ফ্রেডরিক ট্রিভসের উক্তিটুকু লিখিয়া দিতে হইবে। সার ফ্রেডরিকের উক্তি 'দেশের কথার' অন্তর্ভূত হইল। বাস্তবিক 'দেশের কথায়' তিনি অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনে 'দেশের কথার' আদর হয় নাই। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে পুস্তকখানির সমালোচনা করিবার জন্য অনুরোধকালে সখারাম বলিয়াছিলেন—অনেকে পাঠাগার প্রভৃতির জন্য বিনামূল্যে পুস্তক প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু তিনি ছাপাখানার ও কাগজের দেনা শোধ করিতে পারিতেছেন না। তাহার পর এ পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হয়;—সন ১৩১১ সাল হইতে সন ১৩১৪ সাল—এই চারি বৎসরে 'দেশের কথা' চারি সংস্করণে ১০০০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। তাহার পর সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন! কিন্তু পুস্তকের প্রচার যত বাড়িতে লাগিল শিক্ষাব্রত সখারাম তাহার মূল্য তত কমাইতে লাগিলেন। কাযেই ইহাতে তাঁহার অধিক আর্থিক লাভ হয় নাই।

'এটা কোন্ যুগ ?' ও 'দেশের কথা' ব্যতীত সখারাম আর পাঁচখানি পুস্তক প্রচার করেন—'ঝান্সির রাজকুমার' 'তিলকের মোকদ্দমা' 'মহামতি

রানাড়ে', 'বাজীরাও' 'আনন্দী বাই'। 'তিলকের মোকদ্দামার' প্রচারও বন্ধ হয়। 'বাজীরাও' পুস্তকের পুনঃপ্রচারও তিনি বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

সখারাম বাঙ্গালীকে মহারষ্ট্রের কথা বুঝাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রথমবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বঙ্গবাসী যে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সখারামের চেষ্টার বিষয় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। তাহার কারণ, তিনি কায করিতেই ভালবাসিতেন; কোন অনুষ্ঠানেই আপনাকে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেন না। মুসলমান ইতিহাসে শিবাজীর যে চিত্রিত চিত্রিত হইয়াছে সখারাম তাহা বিকৃত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্গে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, শিবাজী, তুমি যখন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে "এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে" বাঁধিতে চাহিয়াছিলে—

"সে দিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা।"

তাহার পর—

"এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"—ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি!
বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি?"

যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে শিবাজীর জয়ভেরি ধ্বনিত করিয়াছিলেন—বৈদ্যনাথের নদীকূলে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু শিবাজী উৎসবে তাঁহার চেষ্টা কয়জন অবগত আছেন?

বাঙ্গালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে রানাড়েপ্রমুখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল। তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত

তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না; আর ম্যান্‌চেষ্টারে উৎপন্ন মিহি বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্তা বঙ্গাঙ্গনার পক্ষে সে কাপড় ভিজিলে টানা দায় হইত। সখারাম সেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। আপনার মতমত কার্য্য করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বিলাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সখারামের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার উপর তিনি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি নানারূপে বিপন্ন হইতে থাকেন। 'হিতবাদী'র সহিত সংশ্রবত্যাগের পর তিনি "জাতীয় শিক্ষাপরিষদে" অধ্যাপনা করিতেছিলেন। কিন্তু সরকার হইতে তাঁহার সামান্য আয়ের উপায় 'দেশের কথা' ও 'তিলকের মোকদ্দামা' পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে "জাতীয় শিক্ষাপরিষদের" শঙ্কিত কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপকপদ ত্যাগ করিলেন।

এই সময় হইতে তিনি আর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়েন নাই। সাময়িক সাহিত্যেও আর তাঁহার অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার পর বিধাতার বজ্র সখারামের দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত পুত্রশোককাতর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল; তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইল।

ভগ্নস্বাস্থ্য সখারাম হৃতপল্লব রিক্তশাখ তরুর দশাগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য শঙ্কিত হইলেন। সে আশঙ্কা অতি অল্প দিনেই সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সখারামের মত দুর্ভাগ্য কাহার? তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে সাহিত্যে তাঁহার স্থায়ী চিহ্ন থাকিল কোথায়? সংবাদপত্রের রচনায় যতই প্রতিভাস্ফুরণ থাকুক না কেন, তাহার স্থায়ীত্ব-সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল—'দেশের কথা'র প্রচার বন্ধ হইয়াছে। যে শ্রমশীলতা প্রতিভার স্ফুরণে প্রধান সহায় সেই শ্রমশীলতা সত্ত্বেও দারিদ্র্যদুঃখে তিনি স্বাধীনভাবে রচনার যথেষ্ট অবকাশ পায়েন নাই। তাঁহার জীবনসাধন শিবাজীচরিত রচিত হয় নাই। তিনি সংসারে সম্পদ লাভ করেন নাই; শোকের পর শোক তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল।

সব গেল—রহিল কেবল বন্ধুজনের চিত্তে তাঁহার পুণ্য স্মৃতি:—সে স্মৃতি মুছিবার নহে। তাঁহার আন্তরিকতা—তেজস্বিতা ভুলিবার নহে। রোগের

কণ্টকশয়নে তিনি শোকবিক্ষত হৃদয়ে যে শান্তির কামনা করিয়াছিলেন, আশা করি, মৃত্যুর পরপারে তিনি সেই শান্তি লাভ করিয়াছেন।—

"তাই হোক হোক! নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
ভব-জনমের হাহা!
লহ লহ, বন্ধু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা!"

যবন হরিদাস।

ক্রুদ্ধ বাদশা দেখি' হরিদাসে—হইয়া মুসলমান্
কাফের হিন্দু তাহার ধর্ম্মে করিল আত্মদান?
ঘৃণিত হিন্দু গোলামের জাতি তা'দের আবার ধর্ম্ম?
তাই কিনা শেষে করিল বরণ; যবনের এই কর্ম্ম?
ডাকিয়া বাদশা মূঢ় হরিদাসে দিলা এ সদুপদেশ,
"এখনও ছাড় দুর্ম্মতি হেন, ঘুচাও কাফের বেশ।
"তা'নহিলে তোমা দুর্গতি বহু সহিতে হইবে শুন,
"মুসল্‌মানের পূত ধর্ম্মে দীক্ষা লওগে পুনঃ!
"অভাব তোমার ঘুচাইব আমি, রাখ আমাদের মান
"বাদ্‌শার জাতি, গৌরব কত, কেন লহ অপমান?"
ধীরে ধীরে কহে পরম ভক্ত। "ক্ষমা কর মোরে প্রভু
"অমৃতের স্বাদ পেয়েছি হেথায় ছাড়িতে নারিব কভু।
"তুমি কি বুঝিবে অভাব আমার? পারিবে না দিতে তাহা
"ভাণ্ডারে তব নাহি সে রত্ন জান নাও তুমি যাহা।

"একটি বিন্দু পাও যদি তা'র তুমিও দেখিবে তবে
"দীন্ দুনিয়ার বাদ্‌শাহগিরি চরণে পড়িয়া র'বে।
"কোরান্ পুরাণ নহেত ভিন্ন. খোদা হরি দুই নয়
"ভক্ত সে জানে গঙ্গা যমুনা সিন্ধুতে এক হয়।
"চরমের সেই এক—শুধু এক পরম পুরুষ হরি।
"কেন তবে মিছে যাপিতেছ কাল মিথ্যা কলহ করি'?
শুনিয়া বাদ্‌শা অজ্ঞান ক্রোধে আদেশিলা দাসগণে
"বাইশ বাজারে প্রহারে প্রহারে শিক্ষা দাও এ জনে।
"মারিতে মারিতে হয় যেন শেষ ভণ্ডের হরিভজা
"বাঁচাক্ আসিয়া দেবতা উহার, দেখুক্ কেমন মজা!"
বাদ্‌শা আজ্ঞা রক্ষা করিতে ছুটিল লক্ষ দাস
শ্রোতৃবৃন্দ চমকি উঠিল পাইল বিষম ত্রাস।
জল্লাদ সেও পালিতে আজ্ঞা ফেলিল দীর্ঘশ্বাস
মৃত্যু আদেশে অটল কিন্তু নির্ভীক হরিদাস!!
প্রহার দেখিয়া দর্শকগণ শক্রমিত্র সবে
"আর না আর না মেরো না সেপাই" বলিছে উচ্চ রবে।
ধরণীর ধূলা রক্তেতে কাদা, প্রসন্ন বদন হরি—
পীড়কের তরে আশীষ মাগিছে হাত দু'টি যোড় করি'।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-চক্র।

—:০:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•—

চিন্তারম্ভ।

—•—

ধরণীধর চলিয়া যাইলে যতীশ গৃহে আসিল, উদ্দেশ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবে। পূর্ব্বে সে কখনও অর্থের অভাব অনুভব করে নাই। তাহার ব্যয় অল্প ছিল—সে পিতার নিকট ও পিতামহীর নিকট হইতে আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ পাইত। এখন ব্যয় বাড়িয়াছে—অথচ আয়ের পথ রুদ্ধ। সে যখন পিতার অবাধ্য হইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়াছিল তখন হইতে তাহার ব্যয় কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। একবার বাসা করিয়া সে আর 'মেসে' ফিরিয়া যাইতে পারিল না। বাসা রহিল—ব্যয়বাহুল্য চলিতে লাগিল। অমূল্যচরণ তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিত—প্রাপ্ত অর্থের সম্পূর্ণ ভাগ যতীশচন্দ্রের হস্তগত হইত না। উপস্থিত প্রয়োজন—ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করিয়া ঋণ শোধের আশা সমুজ্জ্বল। এ অবস্থায় যতীশও ঋণ করিত। ঋণের মত রক্তশোষী শত্রু আর নাই। সে কখন যে আসিয়া সুপ্ত মানবের বক্ষে বসিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। শেষে যখন সে জাগিয়া আপনার অবস্থা উপলব্ধি করে—তখন তাহার দেহ বলশূন্য—সে নিরুপায়। সংসারজ্ঞানহীন যুবক যখন ভবিষ্যতে উপার্জ্জনের আশায় উৎসাহিত হইয়া ঋণজালে জড়িত হয়, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না যে, হয় ত জীবনে সে আর সে জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না ; এই বন্ধন তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির গতিরোধ করিবে, তাহার সকল আশা বিনাশের কারণ হইবে। যতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল।

আপনার প্রতিভা সম্বন্ধে তাহার ভ্রান্ত ধারণা তাহার যুবজনসুলভ আশা আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। সে যে সহজেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে

পারিবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। আঘাতের পর আঘাতে তাহার আশার ঔজ্জ্বল্য মলিন হইতেছিল বটে, কিন্তু তখনও সে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হিসাবে তাহার মত বিদ্বান সামান্য বেতনে কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত। যতীশচন্দ্র তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিত; বুঝিত না—সেও তাহাদেরই একজন।

ক্রমে সংসারে অস্বচ্ছলতা যত বাড়িতে লাগিল যতীশচন্দ্র ততই বিপন্ন ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল। স্বচ্ছলতার সময়—সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিবার পূর্ব্বে—যখন জীবনে অস্বচ্ছলতার সম্ভবনা কল্পনাও করা যায় না তখন স্বাবলম্বনের প্রশংসা করা অতি সহজসাধ্য। কিন্তু স্বাবলম্বন সর্ব্বথা সুখের নহে। তাহার জন্য যে সাধনার ও যে সংযমের প্রয়োজন, যতীশচন্দ্র সে সাধনা-পরাঙ্মুখ—সে সংযমে অনভ্যস্ত। এ অবস্থায় সে পিতাকে পত্র লিখিবার সময় স্বাবলম্বনের যে সুরম্য মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিল—কার্য্যকালে তাহা দেখিতে পাইল না। তাই সে চিন্তিত হইল—কিছু ভীতও যে না হইল এমন নহে।

উপস্থিত প্রয়োজনের প্রাবল্যহেতু যতীশচন্দ্র গৃহে আসিয়াছিল। তাহার সে উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইল। তাহার অর্থাভাব জানিয়া স্নেহশীলা পিতা-মহী তাহাকে কিছু অর্থ দিলেন। সে অর্থে দিন কয়েক চলিবে; কিন্তু তাহার পর? যতীশচন্দ্র তাহা ভাবিল; ভাবিয়া পিতামহীকে বলিল, "তুমি একাকী এই স্থানে থাকিয়া কায নাই। কলিকাতায় ত বাসা রহিয়াছে; তুমি চল।" পিতামহী বলিলেন, "বুড়া বয়সে কি আর এ ভিটা ছাড়িয়া যাইতে পারি? আমি যাইলে বার ভূতে সব লুটিয়া খাইবে। বাড়ীখানিও নষ্ট হইবে। আর কলিকাতায় যাইয়া কি আমি থাকিতে পারি? তোর বয়স আমি কলিকাতায় যাই নাই। সেবার কালীঘাটে গিয়াছিলাম। কলিকাতা কি অপরিষ্কার, কি দুর্গন্ধ! এই স্থানেই গঙ্গাতীরে থাকি। তুই আর কেন কলিকাতায় থাকিস্? কেবল কষ্ট! তুই ফিরিয়া আয়। আমি বৌদিদিকে আনাই। তোর বাপকেও পত্র লিখি। সে কি তোর উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে? আমি পত্র লিখিলেই সে ফিরিয়া আসিবে। কি বলিস্?"

পিতামহীর প্রস্তাব যে সাধু যতীশ তাহা বুঝিল; বুঝিবার বিশেষ

কারণও ছিল—তাহার যে অবস্থা তাহাতে এ প্রস্তাব প্রলোভনীয়। কিন্তু? কিন্তু পিতার নিকট স্বাবলম্বনের অত কথা বলিয়া—আপনি আপনার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবে বলিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসা করিয়া—পত্নীকে আনিতে চাহিয়া আজ সে কি বলিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে? অমূল্যচরণ তাহার সব কথা জানে; সে কি ভাবিবে? তাহার নিকট সে কি করিয়া মুখ দেখাইবে? যতীশ কিছু স্থির করিতে পারিল না; বলিল, "আমি আবার আসিয়া বলিব।"

পিতামহী বলিলেন, "আমি বৌদিদিকে আনিতে পাঠাইতেছি।"

যতীশ বলিল, "আমি ফিরিয়া আসি। তখন যাহা হয় করিও।"

যতীশচন্দ্র চলিয়া গেল। উপস্থিত অভাবমোচনের উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে—কিছু দিন অভাবের দংশন হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে। তাহাই সে যথেষ্ট লাভ মনে করিল।

কলিকাতায় আসিয়া সে আবার পরিচিত জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হইল; অমূল্যচরণের অসার উপদেশে কুপথে চালিত হইতে লাগিল। পল্লীভবনে পিতামহীর সেই প্রস্তাবের কথা সে ভুলিতে লাগিল। যখন তাহা মনে পড়িত, তখন সে ভাবিত—সে যত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই। উদ্‌ভ্রান্ত যুবক—উদ্ধত গর্ব্বে মনে করে, তাহার ফিরিবার পথ রুদ্ধ। সে ভুলিয়া যায়, ফিরিবার পথ রুদ্ধ হয় না; যে পথ স্নেহকুসুমাস্তৃত—প্রেমবারিসেচিত—শতস্মৃতিচ্ছায়াস্নিগ্ধ—সে পথ তাহারই প্রত্যাবর্ত্তনপ্রতীক্ষায় থাকে। ফুল মলিন হয়, বারি শুকাইয়া যায়, ছায়া আর থাকে না—তখনও সে পথে তাহার গমনাধিকার থাকে। এই কথা ভুলিয়াই সে দুঃখ ভোগ করে।

সে আর সব ভুলিল; কিন্তু শ্বশুরালয় হইতে পত্নীকে আনিতে যাইয়া সে যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে কথা সে ভুলিতে পারিল না।

হিন্দুর সংসারে সমষ্টিই সমাজের উপাদান। হিন্দু পরিবার অনেকের মিলন ক্ষেত্র; তাই হিন্দু পরিবারের গঠন স্বতন্ত্র, তাহার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। সে পরিবারে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে—পুত্রবধূ অল্প বয়সে পরিবারে প্রবেশ করিয়া সেই পরিবারের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্তা হয়—সে পরিবারের বিশেষত্বে শিক্ষিতা হয়; ক্রমে সে যখন শাশুড়ীর স্থান অধিকার করে তখন সে সে সংসারের অঙ্গীভূতা। বধূ

হইতে গৃহিণীতে পরিণতি এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হইয়া যায় যে, কেহ তাহা বুঝিতেও পারে না, সংসারেও কাহারও অভাব হয় না; শ্বাশুড়ী সংসারের ভার পুত্রবধূর উপর দিয়া পৌত্রপৌত্রী লইয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্ন যাপন করেন—শেষে যে দিন তিনি মহাযাত্রা করেন সে দিন সংসারের যন্ত্রচালনের কোনই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। প্রতীচ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় ব্যক্তিই সমাজের উপাদান। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতাইয়া বসে—সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই যে সংসারে সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে সংসারে আর তাহার স্থান হয় না। প্রতীচ্য উপন্যাস পাঠ করিলে প্রতীচ্য সমাজের যে আদর্শ আমাদের মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়,—তাহাতে বোধ হয় যেন জগতে মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই—আছে কেবল নায়ক আর নায়িকা। প্রতীচ্য গ্রন্থকার সেই নায়কনায়িকার প্রেমকে পুস্তকের ভিত্তি করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, বিরহমিলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্ণনার ধারাটিতে প্রবাহিত করিয়া লয়েন—সেই নায়কনায়িকার সংসারের—সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পরিবারের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার বক্তব্যও সীমাবদ্ধ হয়। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমাজের আদর্শ স্বতন্ত্র। একে স্বার্থকতা উদার আত্মত্যাগে, অপরে স্বার্থকতা সঙ্কীর্ণ আত্মোন্নতিতে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক যখন প্রতীচ্য উপন্যাসে প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাব দেখে, তখন সে অনেক সময় তাহাতে আকৃষ্ট হয়। যতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। যে শতাধিক উপন্যাসের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া সমাজ দর্শন করে, সে কি কখন সমাজের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে? সে কল্পনায় বাস্তবের স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে—উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রপূর্ণ জগতে বাস করে। যতীশচন্দ্র পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শে পত্নীর কল্পনা করিয়াছিল। তাই সে সরোজার ব্রীড়াসঙ্কুচিত ব্যবহারে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। আর তাই সরোজা তাহার সহিত না আসায় সে তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে ক্রোধ অক্ষমের ক্রোধ—তাহা নিরপরাধের উপর নিপতিত হয়। সে যে সমাজে জন্মিয়াছে সে সমাজে যে হিন্দুকন্যার পক্ষে পিতৃগৃহে পিতার আদেশ বা অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কার্য্য করা অসম্ভব, সে তাহা বুঝিল না। সে কেবল মনে করিল—কেন সরোজা সব ত্যাগ করিয়া—তাহার সহিত আসিল না?

সে এ বিষয়ে অমূল্যচরণের পরামর্শ লইল। অমূল্যচরণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া অনুকূল পরামর্শ দিল। ফলে সে পত্নীকে আর একখানি পত্র লিখিল। তাহাতে সে লিখিল, যদি সরোজা পত্র পাইয়া তাহার নিকট চলিয়া না আইসে তবে তাহার সহিত সে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে।

এই পত্র পাইয়া সরোজা কাঁদিল; পত্র বিরজাকে দেখাইল। বিরজা পিতাকে পত্রের কথা বলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "উন্মাদের প্রলাপ! তবে দেখিতেছি, সরোজার কপালে সুখ নাই। কি জানি চঞ্চল-চিত্ত যুবক কি করিয়া বসে! কিন্তু সরোজা কি আপনি যাইবে? আর যাইবে কোথায়? শ্বশুরালয়ে হয়—আমি পাঠাইয়া দিব। কলিকাতায়—অভিভাবকহীন অবস্থায় সে কেমন করিয়া থাকিবে?" বিরজা বলিল, "যতীশ যখন তাহা বুঝিল না, তখন আর আমরা কি করিব? সে যাহা ভাল বুঝে সরোজাকে ত তাহা করিতেই হইবে!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এ বড় সমস্যা। আমি বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করেন—সেইরূপ হইবে।" তিনি ধরণীধরকে পত্র লিখিলেন।

ধরণীধর বৈবাহিকের পত্র পাইলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতে লাগিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নে কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সরোজা স্বামীর পত্র হস্তে লইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল; মনে মনে বলিল, হে আমার দেবতা, হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমি কোন্ অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী যে তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। কিন্তু কোন উপায়ে আমি তোমার কাছে যাইব? তুমি আমাকে লইয়া যাও। তোমার নিকট থাকিলেই আমি জীবন স্বার্থক মনে করিব। তাহার পর সে বাক্স খুলিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিল। মনের এই কথা পত্রে লিখিল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই অশ্রুপাতহেতু সে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না;—অক্ষরগুলি বড় অসমান—ছত্রগুলি আঁকা বাঁকা হইতেছিল; অশ্রুপাতে অক্ষরগুলি একান্তই অস্পষ্ট হইতেছিল।

সরোজা ভাবিল, এ পত্র কেমন করিয়া পাঠাইব? তিনি কি ভাবিবেন! তাহার পর যে আবেগে সে পত্র লিখিয়াছিল সে আবেগ একটু প্রশমিত

হইলে সে ভাবিল,—এ কি লিখিতেছি? তিনি নিশ্চয়ই আমাকে একান্ত লজ্জাহীনা মনে করিবেন।

সে আরও ভাবিল, পিতার মত—শ্বশুরের অভিপ্রায়, এ সকল না জানিয়া—না বুঝিয়া সে কেমন করিয়া এরূপ পত্র লিখিবে?

ভাবনায় ভাবনা বাড়িল। সরোজা পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজের টুকরাগুলি বাতায়নপথে বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে আবার কাঁদিল।

—:*:—

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন-শেষে।

আকাশ মেঘহীন—বায়ুমণ্ডল অনাবিল—প্রকৃতি প্রসন্নাননা। পূর্ব্ব গগনে দিবালোকবিকাশ শিশিরস্নাত প্রান্তরদৃশ্যে নূতন সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়াছে। বসন্তাগমপ্রফুল্ল তরুর পত্রাগ্রে দোদুল্যমান শিশিরবিন্দু তরুণ রবিকরে হীরকের মত জ্বলিতেছে; তৃণদলে শিশিরবিন্দু—যেন দিবালোকভয়ত্রস্তা বিভাবরী চঞ্চলপদে গমনকালে ছিন্নসূত্র মুক্তাহারের মুক্তাগুলি ফেলিয়া গিয়াছে, তৃণ-পুষ্পে সঞ্চিত শিশির এখনও টল টল করিতেছে—যেন তরুণীর প্রেম এখনও অনাদরে—উপেক্ষায় শুকায় নাই। বসন্তের আরম্ভ—প্রান্তরে স্থানে স্থানে শিমুলের বিরাট বপু কোমল—মাংসল রক্ত পুষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছে—যেন হরিৎ প্রান্তরে অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; আর কিছু দূরে একটি অনতি-উচ্চ স্তূপের উপর কয়টি পলাশ তরু গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম-শোভায় সুন্দর। চারি-দিকে সৌন্দর্য্য—চারি দিকে বিহগবিরাব। প্রান্তরের পার্শ্বে নদী—নদীবক্ষে বালুকাবিস্তার—মধ্যে জলধারা। নদীর পরপারে গিরিশ্রেণী—রবিকরে পর্ব্বতাঙ্গে নানাবর্ণের বিকাশ লক্ষিত হইতেছে। একজন যুবক ও একজন যুবতী নিকটস্থ গ্রাম হইতে নদীতীরবর্ত্তী পথে আসিয়া প্রান্তরে উপনীত হইল। উভয়েই মুগ্ধনেত্রে প্রান্তরদৃশ্য দেখিল। উভয়েই আননে হর্ষদীপ্তি—সে হর্ষ প্রেম-সহচর—জীবনে তাহার স্বাদ যে পায় না সে দুর্ভাগ্য।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যুবতী শ্রান্তা হইয়াছিল। তাহার চামীকরতপ্তগৌর ললাটে স্বেদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। তাহার নিশ্বাস কিছু দ্রুত পড়িতেছিল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "চারু, চল একটু বিশ্রাম করিবে।"

যুবতী কোন কথা কহিল না। সে এই অভিনব সৌন্দর্য্যের রাজ্যে—অভি-

নব জীবনে স্বামীর প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে তাহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সে যুবকের সঙ্গে যাইয়া অদূরে নদীতীরস্থ একখণ্ড শিলার উপর উপবেশন করিল, তাহার পর শালখানি খুলিয়া রাখিল। পত্নীকে বসাইয়া রাধাচরণ তাহার পার্শ্বে বসিল, সাদরে পত্নীর মুখ চুম্বন করিল। তাহাদের পদতলে তৃণগুলি রক্তাভ হরিদ্রা কুসুমে সজ্জিত--সম্মুখে নদীর শীর্ণ প্রবাহ প্রভাত পবনে বীচিবিক্ষুব্ধ—পশ্চাতে প্রান্তর হইতে প্রবাহিত পবনের স্পর্শ সুখদ। রাধাচরণ ও চারুশীলা মনে করিল, এই পৃথিবীই স্বর্গ।

কর্ম্মস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াই রাধাচরণ পিসীমা'কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। এখন সে আর চারুশীলা—আর কেহই নাই। তাহার মনে হইত, যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্ভার কেবল তাহাদেরই দুইজনের জন্য, জীবনের—যৌবনের অমৃতউৎস তাহাদেরই দুইজনের জন্য উৎসারিত।

সে প্রভাতে পত্নীকে লইয়া গ্রামের বাহিরে প্রান্তরে বেড়াইতে আসিত। তাহার পর আফিসের নির্দ্দিষ্ট কায কোনরূপে সম্পন্ন করিয়া বা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে অপরাহ্নে গৃহে আসিত। গৃহে আসিয়া সে আবার পত্নীকে লইয়া কোন দিন নদীর পরপারে—কোনদিন নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে—কোন দিন বা গ্রামপ্রান্তস্থিত শালবনের দিকে বেড়াইতে যাইত। জীবনের যে সুধা যৌবন তাহাদের জন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিল তাহা তাহারা অকুণ্ঠিত ভাবে পান করিত—তবুও যেন পিপাসা মিটিত না।

আজ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতে লাগিল—গৃহে তাহারা এই সুখ হইতে বঞ্চিত ছিল! জীবনে যে সুখ প্রেমের দান—যাহাতে যুবক যুবতীর স্বাভাবিক অধিকার সমাজের ব্যবস্থায় তাহারা তাহা ভোগ করিতে পারে না—জীবন দুঃখময় করে। যে সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করে সে ব্যবস্থায় ধিক।

চারুশীলা মুগ্ধ হইয়া স্বামীর এই সব কথা শুনিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কত সময় কাটিয়া গেল কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না, শেষে চারুশীলা স্বামীকে বলিল, "চল বাড়ী যাই।"

রাধাচরণ ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা প্রায় নয়টা! সে উঠিল—দণ্ডায়মানা পত্নীর অঙ্গে শালখানি সযত্নে জড়াইয়া দিল। উভয়ে গৃহাভিমুখগামী হইল। আফিসের সময় হইয়া আসিতেছে; রাধাচরণ একটু দ্রুত চলিল। কিন্তু অল্প দূর যাইয়াই সে দেখিল, পথশ্রমে অনভ্যস্তা চারু-

শীলা শ্রান্ত হইয়াছে—তাহার কপালে স্বেদচিহ্ন—মুখে রক্তাভা।

তাহার মুগ্ধ নয়নে পত্নীকে যেন আরও সুন্দর দেখাইল। সে আবার পত্নীর মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার শ্রান্তি বোধ হইতেছে—তাহা কি বলিতে নাই?"

সে ধীরে চলিল। তাহারা নানা কথায় - নানা গল্পে হাসিতে হাসিতে গৃহে চলিল। যখন হৃদয় আনন্দে পূর্ণ থাকে তখন হাসির উৎস আপনি মুক্ত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা যে স্থানে পৌঁছিল সেই স্থানে রাস্তা ঘুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। সেই বাঁকের নিকট পথিপার্শ্বে একটি ঝোপে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল ফুটিয়া ছিল। চারুশীলা বলিল, "কি সুন্দর ফুল!" রাধাচরণ ফুল তুলিতে হাত বাড়াইল। সে জানিত না, গাছটি কণ্টকময়! তাহার করে কয়টি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া গেল। সে একগুচ্ছ ফুল তুলিয়া পত্নীকে দিল। ফুলে রক্তচিহ্ন দেখিয়া চারুশীলা বলিল, "একি?" সে দেখিল, স্বামীর হাত হইতে রক্ত ঝরিতেছে। সে ফুল ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার জন্য তোমার এই কষ্ট।" রাধাচরণ বলিল, "কষ্ট কি? এ সামান্য একটু ছড়িয়া গিয়াছে।" চারু সযত্নে স্বামীর হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিল--কণ্টক বিদ্ধ হইয়া মাংসে গভীর ক্ষত হইয়াছে! সে রাধাচরণের রুমাল লইল। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটি কূপ। একজন কৃষক সেই কূপ হইতে জল তুলিতেছিল। চারুশীলা তাহার নিকট জল চাহিয়া লইয়া রুমাল ভিজাইয়া স্বামীর হস্তে জড়াইয়া দিল।

সে দিন রাধাচরণের আফিসে যাইতে বিলম্ব হইল। সে চিন্তিত হৃদয়ে আফিসে গেল—কারণ পূর্ব্বদিন সে কায অসম্পূর্ণ রাখিয়া আসিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, পরদিন যাইয়াই সে কায শেষ করিয়া রাখিবে। কিন্তু আজ সে করতলে বেদনাহেতু কলম ধরিতে পারিতেছিল না।

আফিসে আসিয়াই রাধাচরণ শুনিল, 'সাহেব' তাহাকে ডাকিয়াছেন। সে সশঙ্কিত চিত্তে 'সাহেবের' নিকট গেল। "সাহেব' সেলামবিমুখ বাঙ্গালী কেরাণীর উপর বড় প্রসন্ন ছিলেন না; তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়াছ।"

রাধাচরণ কোন উত্তর দিল না।

"তোমার আসিতে প্রায়ই বিলম্ব হয়।"

রাধাচরণ বলিল, "মধ্যে মধ্যে হয় ?"

"কাল যে কায দিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে ?"

যে অভাবের তাড়নায় লোক সময় সময় সত্য গোপন করিবার জন্য অসত্যের আশ্রয় লয়—রাধাচরণ সে অভাবপীড়িত নহে। সে অসত্যে অভ্যস্ত নহে। সে বলিল, "না।"

প্রশ্ন হইল, "কেন ?"

রাধাচরণ বলিল, "গৃহে কায ছিল—আমি চলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তোমাকে লইয়া আমার চলিবে না। আজ মাসের ২৫শে—মাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার কার্য্যকাল শেষ হইবে জানিও।"

রাধাচরণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল 'সাহেবের' কৃপাভিক্ষা করে; কিন্তু সে তাহা পারিল না। রাধাচরণ যখন গৃহে ফিরিল তখন চারুশীলা গৃহকর্ম্ম সারিয়া—ভৃত্যের সাহায্যে প্রাঙ্গণে রোপিত ফুল গাছগুলির মূলে জল দিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাধাচরণ হস্তমুখ প্রক্ষালিত করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। চারুশীলা "জলখাবার" আনিয়া দিল। তাহার আহার শেষ হইলে চারুশীলা বলিল, "আজ কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবে ?" রাধাচরণ বলিল, "যে দিকে হয় চল।"—দুঃসংবাদ দিয়া পত্নীর হৃদয়ে আনন্দালোক নির্ব্বাপিত করিতে তাঁহার মন সরিল না। দুইজনে নদীকূলে বেড়াইতে গেল। কিন্তু রাধাচরণ কেমন অন্যমনস্ক। কিছুক্ষণ পরে যখন পল্লবরাগতাম্র তপন পশ্চিম গগনে মেঘমালায় রক্তাভা বিকীর্ণ করিয়া অস্তগমনোন্মুখ হইল, তখন তাহারা শ্যামায়মান বনপথে গৃহে ফিরিল।

রাত্রিতে ভ্রমণশ্রান্ত চারুশীলা শয়ন করিয়াই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রাধাচরণের নয়নে নিদ্রা নাই। পত্নীকে সুপ্ত বুঝিয়া সে ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। বাতাস শীতস্পর্শ—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; কিন্তু দিগন্তের পুঞ্জীভূত মেঘমালার প্রান্তে উদীয়মান চন্দ্রের রজত কিরণ ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে আলোকবিকাশ হইতে লাগিল। দূরে বৃক্ষগুল্ম স্বচ্ছান্ধকারে গাঢ় অন্ধকারস্তূপবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল;—ক্রমে তাহারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল।

মেঘমালার মধ্য দিয়া চন্দ্রের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি গগনে উদিত হইল। রাধাচরণ

ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনে চারুশীলা ঐ চন্দ্রেরই মত উদিত হইয়াছে। মাসাধিক কাল সে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রেমের কিরণে অসীম তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছে। আজ কোথা হইতে কাল মেঘ আসিয়া তাহাকে সে তৃপ্তি— সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহার মনে হইল, তাহার জীবনে আনন্দ নির্ব্বাপিত ও তাহার হৃদয় হইতে সুখ নির্ব্বাসিত হইতেছে। তাহার হৃদয় বিষাদবেদনায় যেন কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সে তখন আর আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দ্রুত-পদে কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

শয্যায় চারুশীলা নিদ্রিত। রাধাচরণ প্রবল আবেগে—উন্মাদের মত তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুদিত নেত্রে, অধরে, গণ্ডে, কপালে চুম্বনদান করিল। চারুশীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার বোধ হইল, স্বামীর নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাহার আননে পতিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদিতেছ?"

তখন রাধাচরণ তাহাকে সব কথা বলিল

চারুশীলা উঠিয়া বসিল। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল। কিন্তু রোগে—শোকে—বেদনায় রমণীর সান্ত্বনাদায়িনী কল্যাণী মূর্ত্তি আত্ম-প্রকাশ করে। সে আপনার বেদনা গোপন করিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন? আবার চাকরী পাইবে।"

এ আশার কথা এতক্ষণ রাধাচরণের মনে হয় নাই। সে যেন অকূলে কূল পাইল। সে শান্ত হইল।

তাহার পর চাকরীর চেষ্টা করিয়া পশ্চাতে বিফলমনোরথ রাধাচরণ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাকে দূরে যাইতে দেওয়া তাঁহার অভি-প্রেত ছিল না। বিশেষ বিদেশে চাকরী করিতে যাইয়া তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা কিরূপে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাধা-চরণের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মনে আশঙ্কা হইত। তাই তাহার প্রত্যা-বর্ত্তনে তিনি আনন্দিত হইলেন।

রাধাচরণ লজ্জায় গৃহে থাকিল না—কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(ইতর সাধারণ কর্ত্তৃক ব্যাস্‌টাইল
দুর্গ অধিকার—১৭৮৯খৃঃ জুলাই।)

এদিকে সর্ব্বজনপ্রিয় সচিবশ্রেষ্ঠ মহানুভব নেকার রাজাজ্ঞায় কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। সমরনীতিপরায়ণ অদূরদর্শী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুচক্রিগণ সমাভিব্যাহারে রাজনৈতিক গগন হইতে ধূমকেতুর ন্যায় ফরাসী জাতির প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নেকারের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী রাজ্যের শাসননীতি এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সমগ্র ফরাসী জাতির সহিত অচিরে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে মনে করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ তদনুরূপ আয়োজনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, পদাতিক দলে দলে অহর্নিশ রাজবর্ত্মে ধাবিত হইতে লাগিল। কামান, সঙ্গীন্, বন্দুক, গোলা, গুলি ও তরবারী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হওয়ায় প্যারিস রণসাজে সজ্জিত হইল।

অকস্মাৎ এইরূপ বিরাট আয়োজন দেখিয়া প্যারিসবাসিগণের হৃদয়ে প্রথমতঃ আতঙ্ক ও ত্রাস উপস্থিত হইল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহারা ভীরুতা পরিহার পূর্ব্বক প্রতিহিংসাবৃত্তিপরিচালিত হইয়া উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার আয়োজন করিল। অচিরে নগরের যাবতীয় নাট্যশালা অবরুদ্ধ হইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উৎসব পরিত্যক্ত হইল। বিপ্লবনেতৃগণ সর্ব্বসাধারণকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১২ই জুলাই তারিখে ইতর সাধারণ প্যালে রয়াল ভবনে সম্মিলিত হইলে জনৈক নেতা সর্ব্বসাধারণকে অস্ত্র ধারণের নিমিত্ত বলিলেন:—"প্যারিসবাসিগণ, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় উপস্থিত। মাননীয় নেকারের পদচ্যুতিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বদেশসেবকগণের সংহারসাধনের সময় উপস্থিত। জাতীয় সমিতির ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত সমিতিগৃহের নিম্নভাগে রাশীকৃত বারুদ সংস্থাপিত হইয়াছে। প্যারিস নগরের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া শতাধিক কামান শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবণিতা কাহারও নিস্তার নাই। অদ্য সন্ধ্যাকালে চ্যাম্প ডিমার সৈন্যাগারস্থিত বিদেশীয় সৈন্যগণ আমাদিগের সকলকেই হত্যা করিবে। নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায় অস্ত্রধারণ"।

নেতৃবরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্যারিসের ইতরসাধারণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সংখ্যাতীত ব্যক্তি পদচ্যুত মন্ত্রিবরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি লইয়া রাজবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের নিমিত্ত একদল পদাতিক তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা পদাতিকবৃন্দের প্রতি অজস্র প্রস্তর বর্ষণ করিল। তখন পদাতিকগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে একদল অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইল দেখিয়া, ইতর সাধারণ স্থান ত্যাগ করিয়া টুইলারি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই গার্ড ডি ফ্রান্স নামক রাজসৈন্যদল প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিগণের সহিত যোগদান করিল। সুতরাং ফরাসীরাজার বিপত্তির পরিসীমা রহিল না।

পরদিবস (১৩ই জুলাই, ১৭৮৯খৃঃ) প্রত্যুষে সংখ্যাতীত ব্যক্তি মুদ্গর, বল্লম, তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া সেণ্ট লাজার নামক ধর্ম্মাশ্রম পরিবেষ্টন পূর্ব্বক খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অধিবাসিগণ যৎপরোনাস্তি ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ভাণ্ডারস্থ যাবতীয় খাদ্য তাহাদিগকে বিতরণ করিল; কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া আগন্তুকগণ বলপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করতঃ পরিশেষে ধর্ম্মাশ্রমে অগ্নিপ্রদানের আয়োজন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তথায় একদল সৈন্য উপস্থিত হইলে তাহারা ধর্ম্মাশ্রম ত্যাগ করিয়া গার্ড মিউবল্ নামক অস্ত্রাগারাভিমুখে ধাবমান হইল। বলপূর্ব্বক দ্বার ভগ্ন করতঃ অস্ত্রাগারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা রাশি রাশি বন্দুক, সঙ্গীন, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র লুণ্ঠন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা লাফোর নামক সুপ্রসিদ্ধ কারাগৃহ আক্রমণ করিয়া কারাবাসিগণকে মুক্তিপ্রদান করিয়া যদৃচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। কারাবাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া মহানন্দে শান্তিভঙ্গকারিগণের সহিত সম্মিলিত হইল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, প্যারিস ও ফবর্গ নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয়

নগরীর বিদ্রোহদমনকল্পে যে দুর্জ্জেয় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা ব্যাসটাইল দুর্গ নামে অভিহিত। ব্যাসটাইল দুর্গ সুগভীর সুপ্রশস্ত পরিখাবেষ্টিত; তদুপরি কয়েকটি অস্থায়ী সেতু; সেতুগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত্তে পরিখা-সংলগ্ন অথবা স্থানান্তরিত হইতে পারিত। দুর্গের চতুর্দ্দিকে কতিপয় উচ্চ গুম্বজ গৃহ; তদুপরি পঞ্চদশটি অতি বৃহৎ কামান সংস্থাপিত। দুর্গপ্রবেশের সর্ব্বপ্রধান দ্বারের উপরিভাগে অস্ত্রাগার। দুর্গাভ্যন্তরে তিনটি প্রাঙ্গণ। বহির্দ্দেশ হইতে দুর্গে প্রবেশ করিয়াই প্রথম প্রাঙ্গণ। প্রথম প্রাঙ্গণের বহির্দ্দিক উচ্চ সুপ্রশস্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাঙ্গণে দুর্গ-রক্ষকের অশ্বশালা এবং সৈনিকবৃন্দের অবস্থিতির নিমিত্ত কয়েকটি সুদীর্ঘ বারাক। প্রথম প্রাঙ্গণের পার্শ্বেই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি শুষ্ক পরিখা, তদুপরি একটি অস্থায়ী সেতু। সেই সেতু সংরক্ষণের নিমিত্ত তৎসন্নিকটে একটি প্রহরিশালা; তৎপার্শ্বে দুর্গ-রক্ষকের ভবন। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ হইতে একটি সুবৃহৎ লৌহ নির্ম্মিত দ্বার দিয়া তৃতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। তৃতীয় প্রাঙ্গণ ১০০ ফিট দীর্ঘ এবং ৭০ ফিট প্রশস্ত; ইহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদিগের আবাস গৃহ। দুর্গের বহিস্থ পরিখা সীন নদীর সহিত সম্মিলিত। সুতরাং ব্যাসটাইল দুর্গ যে অতি দুর্গম ও দুর্ভেদ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্যারিস নগরে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইতে দেখিয়া রাজমন্ত্রিগণ দুর্গ-রক্ষক ডেলানিকে দুর্গ সংরক্ষণের নিমিত্ত আদেশ প্রদান পূর্ব্বক জনৈক দূত-দ্বারা একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লিপিখানি বিপ্লব প্রহরিগণের হস্তে পতিত হওয়ায় তাহারা তৎক্ষণাৎ উহা হোটেল ডি ভিলা ভবনে বিপ্লব সমিতি সমীপে প্রেরণ করিল। বিপ্লব সমিতি রাজা ও মন্ত্রিগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে ব্যাসটাইল দুর্গ আক্রমণের নিমিত্ত ১৩ই জুলাই তারিখে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী প্রেরণ করিলেন।

১৩ই জুলাই রাত্রিকালে আক্রমণকারিগণ দুর্গস্থ প্রহরিবৃন্দের প্রতি কয়েকবার মাত্র অগ্নিবর্ষণ করত: সন্নিহিত স্থানে যামিনী যাপন করিল; কিন্তু দুর্গস্থ সৈন্যগণ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। পরদিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় আক্রমণকারিগণ প্রধান দ্বারে সমবেত হইয়া উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে দুর্গ প্রবেশের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দুর্গ-রক্ষক আক্রমণকারিগণের প্রতি অগ্নিবর্ষণের আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু অগ্নিবর্ষণ আরব্ধ হইবামাত্র আক্রমণকারীরা স্থান ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরে গমন করিল। তখন গুম্বজ গৃহের বৃহৎ কামানগুলি রিউ সেণ্ট এণ্টনি নামক স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সংস্থাপিত হইল। কিন্তু সেরূপ ভাবে কামান সংস্থাপিত হইলে, প্যারিস নগরের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত বিপদ নিরাকরণমানসে দুর্গসন্নিধানে সমাগত হইল। জাতীয় সমিতির দুইজন সভ্য দুর্গ-রক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কামানগুলি অন্য ভাবে সংস্থাপিত করিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্গ-রক্ষক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আক্রমণনিবারণকল্পে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রমণকারিগণের দলপুষ্টি হইতে দেখিয়া ডেলানির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এদিকে আক্রমণকারিগণ সর্ব্বপ্রধান দ্বার দিয়া দুর্গপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া দুর্গ-রক্ষক সৈনিকগণ অন্যকোন দিকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সেই দ্বার সংরক্ষণের প্রয়াস পাইতে লাগিল। শত্রুগণের দুর্গপ্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত পরিখা-সেতু ইতঃপূর্ব্বে শৃঙ্খলসাহায্যে পরিখাচ্যুত করিয়া উপরিভাগে রক্ষিত হইয়াছিল। আক্রমণকারীদিগের দলে টুর্নি ও বনমারী নামক দুইজন বহুদর্শী সৈন্য ছিল। তাহারা দুর্গরক্ষক সৈন্যগণের অজ্ঞাতসারে কৌশলে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিখা-সেতু পরিখাসংলগ্ন করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারিগণ সেই সেতুর উপর দিয়া দলে দলে দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ-রক্ষকের আবাসগৃহ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দৃষ্টে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ আগন্তুকগণের প্রতি অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি হত হইলে আক্রমণকারিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সেতুসন্নিধানে সমবেত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে রাজদ্রোহী গার্ড ডি ফ্রাঙ্ক দলভুক্ত বহু সংখ্যক সৈন্য ইনভালিড অস্ত্রাগারলুণ্ঠিত কামান ও অন্যান্য অস্ত্রাবলী সমভিব্যাহারে আক্রমণকারিগণের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল। গার্ড ডি ফ্রাঙ্কের আগমনমাত্র আক্রমণকারিগণের সমগ্র যুদ্ধপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল। তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগে এবং গবাক্ষ-প্রদেশে বহুসংখ্যক বন্দুকধারী দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গ-রক্ষক সৈন্যগণের প্রতি অজস্র অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলাবর্ষণে দুর্গের প্রাচীরসমূহ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। আক্রমণকারিগণ গার্ড ডি ফ্রাঙ্কের আগমনে উৎসাহিত হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক

দুর্গ-রক্ষকের গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। কামানের ভীষণ নিনাদে দিগ্-দিগন্ত নিনাদিত এবং প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের প্রচণ্ড প্রতাপে দুর্গের চতুর্দ্দিক ভস্মীভূত হইতে লাগিল। আক্রমণকারীরা দুর্গ-রক্ষকের গৃহে একটি বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে দুর্গ-রক্ষকের কন্যা মনে করিয়া অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত করিতে লাগিল। তাহারা বালিকাটির হস্ত ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "দুর্গ-রক্ষক এই মুহূর্ত্তে দুর্গ সমর্পণ না করিলে তাহার কন্যাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।" বালিকা ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল কিন্তু পাপাত্মগণের হৃদয়ে করুণার লেশমাত্র সঞ্চার হইল না। তাহারা তাহাকে তৃণরাশির মধ্যে শয়ন করাইয়া তৃণে অগ্নি-প্রদানের আয়োজন করিতে লাগিল। বালিকার পিতা মনস্বীন এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবলোকন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কন্যার জীবন রক্ষার নিমিত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইলেন। কিন্তু বন্দুকের গুলির আঘাতে তিনি অচিরে ভূতলশায়ী হইলেন। সুতরাং বালিকার জীবন রক্ষার কোন সম্ভাবনা রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে গার্ড ডি ফ্রাঙ্ক দলস্থ জনৈক সৈনিক পুরুষ বালিকার জীবন রক্ষার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? বালিকাটি দুর্গ-রক্ষকের কন্যা নহে।" এই বলিয়া তিনি বালিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন।

তিন ঘণ্টাকাল উভয়পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হইল, তথাপি ডেলানি দুর্গ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। চাম্প ডি মারস্থ সেনাপতি তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিবেন এইরূপ আশা করিয়া তিনি অতুল বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির বিনানুমতিতে সৈন্য প্রেরণ করিতে অক্ষম। সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি দুর্গসংরক্ষণবিষয়ে উদাসীন। সুতরাং ডেলানির সকল চেষ্টাই বিফল হইল। এ দিকে দুর্গ-রক্ষক সৈন্যগণ আক্রমণকারিগণের সহিত গার্ড ডি ফ্রাঙ্কের সম্মিলন দৃষ্টে ডেলানিকে পুনঃ পুনঃ দুর্গ সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ডেলানি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে যখন তিনি সেনাপতিপ্রবরের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তিবিষয়ে নিরাশ হইলেন; যখন দেখিলেন যে, মুষ্টিপরিমিত সৈন্যের সাহায্যে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারীর আক্রমণ নিবারণ অসম্ভব, তখন তিনি মনে করিলেন, শত্রুর হস্তে সমর্পণ

অপেক্ষা দুর্গের ধ্বংসসাধন সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এইরূপ চিন্তা করিয়া দুর্গ ও দুর্গবাসিগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তিনি দুর্গস্থ বারুদ-রাশিতে অগ্নি প্রদানকল্পে প্রজ্জ্বলিত দীপ-শলাকা হস্তে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন। কিন্তু দুর্গস্থ সৈন্যগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করি সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি আক্রমণকারিগণের হস্তে দুর্গসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে ভার্সেলিস নগরে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে। সভ্যগণ ব্যাসটাইল দুর্গবিজয় অথবা প্যারিস নগরের ঘটনাবলী বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন। রাজা অনুধারণ করিয়াছেন, রাজধানীতে না জানি কি কি ভীষণ নাট্যের অভিনয় হইতেছে। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে ফরাসী জাতির দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না, এই চিন্তায় সকলেই ম্রিয়মাণ। কামা-নের ভীষণ নিনাদ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে অথচ ব্যাপারটি কি তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বিদেশীয় সৈন্য-গণকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত বারম্বার রাজাকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ফরাসীরাজ নিরুত্তর।

ফরাসীরাজ সপরিবারে ভার্সেলিস প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দলন-নীতি পরিচালিত হইয়া অনুধারণ করিয়াছেন ; কিন্তু ইনভ্যালিড অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অথবা ব্যাসটাইল দুর্গ বিজয় ইত্যাদি কোন ব্যাপারই অবগত নহেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে ডিউক্ ডি লিয়ান কোর্টের প্রমুখাৎ প্রাগুক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করতঃ তিনি বিশুষ্ক বদনে বলিলেন, "হাঁ দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত।" লিয়ান কোর্ট বলিলেন, "বিদ্রোহ নহে মহারাজ, বিপ্লব।" তখন ফরাসীরাজ অনন্যোপায় হইয়া পরদিবস ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে জাতীয় সমিতিগৃহে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"সভ্য মহোদয়গণ, একটি গুরুতর প্রসঙ্গে আপনাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত আমি এই স্থানে আসিয়াছি। রাজধানীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি আশু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিষম বিভ্রাট দেখিয়া ফরাসী জাতির নেতৃস্বরূপ আমি শান্তি সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবনকল্পে বিশ্বস্ত জাতীয় প্রতিনিধিবর্গসন্নিধানে প্রহরিবিহীন হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমার অভিসন্ধিসম্বন্ধে নানাবিধ অলীক জনরব প্রচারিত হইয়াছে, তৎ সমস্তই আমি অবগত হইয়াছি। দুষ্ট ব্যক্তিগণ এরূপ রটনা করিতেও ত্রুটি

করে নাই যে, আমি আপনাদের দৈহিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু আমার নিষ্পাপ চরিত্রই আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ। আমি যে প্রহরিবিহীন হইয়া আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি ইহাই আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ। আমি ফরাসী জাতির প্রতিনিধিবর্গসন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য হইতে চিরদিনের নিমিত্ত আমি ফরাসী জাতির সহিত সম্মিলিত হইলাম। জাতীয় সমিতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমি ভার্সেলিস ও প্যারিস হইতে সৈন্যগণকে স্থানান্তরে প্রেরণের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনারা আমার অভিপ্রায় রাজধানীতে প্রচারিত করিবেন।"

রাজার বক্তৃতা শ্রবণে সভ্যগণ প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার সহিত রাজ-ভবনে গমন করিলেন। এই শুভ সংবাদ প্যারিসে প্রচারিত হইলে, উন্মত্ত ইতরসাধারণ প্রকৃতিস্থ হইল। ইহার অব্যবহিত পরে ফরাসীরাজার সম্মতিক্রমে মহামান্য বেলি প্যারিস নগরের অধ্যক্ষ পদে এবং ল্যাফাইটি জাতীয় সৈন্যগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন।

অনন্তর ১৭ই জুলাই তারিখে ফরাসীরাজ কতিপয় প্রহরী সমভিব্যাহারে প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাতীয় সমিতির বহুসংখ্যক সভ্য তৎসঙ্গে গমন করিলেন। রাজা প্যারিস নগরে উপস্থিত হইলে মাননীয় বেলি মিউনি-সিপালিটীর সভ্যগণসমভিব্যাহারে রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ফরাসীরাজ হোটেল ডি ভিলায় গমন করিয়া জাতীয় ত্রিবর্ণ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিলেন। তদ্দৃষ্টে সংখ্যাতীত ব্যক্তি জাতীয় ভাবে উন্মত্ত হইয়া "ফরাসী জাতি দীর্ঘজীবী হউক" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিল। অনন্তর কয়েক ঘণ্টা কাল রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়া ফরাসীরাজ ভার্সেলিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে জাতীয় সমিতির আদেশক্রমে ব্যাসটাইল দুর্গ ভূমিসাৎ করা হইল।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভারতের প্রথম নীলকর।

নীল ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার ইতিহাসে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। সুতরাং সে বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার নাই। তবে ভারতে সর্ব্বপ্রথম যিনি নীল-বীজ বপন করিয়া অঘটন ঘটাইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে সেই প্রথম নীলকর লুই বোনাডের কথাই কিছু বলিব।

মুসো লুই বোনাড ফরাসীস। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের মার্সেলিস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বোনাডের সংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্য-পরীক্ষার্থ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলিয়া যায়েন। তথায় বোনাডের সুবিধাই হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। এই দ্বীপে থাকিতে থাকিতেই বোনাড সর্ব্বপ্রথম নীল-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করেন। কিছু দিন পরে তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া বুরবনে যাইয়া বাসস্থাপন করিলেন; কিন্তু বুর্বনে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন নাই। তথা হইতে তিনি তিন জাহাজ পণ্য ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাণিজ্যসম্ভারপূর্ণ তিন-খানি জাহাজই পথিমধ্যে জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহার বিস্তর লোকসান হইয়া যায়। ভগ্নাশ বোনাড ধ্বংসাবশিষ্ট মূলধন লইয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একেবারে ভারতে—কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা তাঁহার ভাল লাগিল না। তথা হইতে তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলিয়া গেলেন। নূতন দেশে নূতন আসিয়া বোনাড নীলের ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ে হুগলী জিলার তালডাঙ্গা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড বাগান জমা লওয়া হইল; কিন্তু তথায় ব্যবসায়ের উপযুক্ত বিস্তৃত জমী না পাওয়ায় এবং বাগানটি নদী হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি চন্দননগরের দক্ষিণ ও তেলিনীপাড়ার নিকটবর্ত্তী নদীতীরস্থ গোন্দল-পাড়ায় বিস্তৃত জমী জমা করিয়া লইয়া তথায় কুঠি স্থাপন করতঃ নীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে এডাম্‌স্‌প্রমুখ তিনজন অর্থশালী ইংরাজ ব্যবসায়ীর সহিত

বোনাডের পরিচয় হয়। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মালদহে যায়েন এবং তথায় নীলকুঠি স্থাপিত করেন। কুঠির জন্য ইষ্টক ও সুরকি তথায় সহজেই প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু চুণ পাওয়া যাইত না বলিয়া বোনাডকে প্রথমে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইল। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ ইহারও এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন। মুসলমান-প্রধান মালদহে কবরের অভাব ছিল না। বোনাড এই সমস্ত কবর খুঁড়িয়া নরকঙ্কাল বাহির করিয়া তাহাই পোড়াইয়া চুণের অভাব পূর্ণ করিলেন।

ইহার পর বোনাড যশোহরের প্রসিদ্ধ নহাট্টা ও নদীয়ার কালনা ও মীর্জাপুর নামক স্থানের কুঠিগুলির সত্ত্বাধিকারী হয়েন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মীর্জাপুর কুঠি পরিত্যাগ করিয়া যায়েন। এই বৎসর মীর্জাপুর কণসাণ হইতে ১৪০০ শত মণ নীলের রপ্তানি হয়। এত অধিক পরিমাণ নীল এক বৎসরে এ কুঠি কেন বোধ হয় সমগ্র বাঙ্গলার কোনও কুঠি হইতে পাওয়া যায় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে বোনাডের মৃত্যু হয়। বোনাডের বংশে কেহ আছেন কি না এবং থাকিলেও কোথায় কি অবস্থায় আছেন সে সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

চিররুদ্ধা।

(ম্যাক্সমূলারের German Text হইতে)

তুমি যে আমারি ওগো, তোমারি আমি,
হৃদিমাঝে ভরা আছ দিবসযামী।
হৃদয়ে রুধিয়া তোমা হারায়ু চাবি,
রুদ্ধ রহিলে চির ;—কি হবে ভাবি ?

শ্রীকালিদাস রায়

সমালোচনা।

—০—

এষা।*

—:০:—

টেনিসনের In Memoriam গ্রন্থের সমালোচনা করিতে যাইয়া সমালোচক ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলিয়াছেন, এই পুস্তকের রচনাকালে কবির স্বাভাবিক রচনাশক্তি অনুশীলনফলে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ক্ষমতায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'এষা' সম্বন্ধেও আমরা সেই কথা বলিতে পারি। অক্ষয়কুমার যখন যৌবনের 'ভুল' লইয়া ভারতীর কুঞ্জে দেখা দিয়াছিলেন তখনই বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'তে সে ক্ষমতার ক্রমবিকাশ; আর 'শঙ্খে' তাহার পূর্ণ পরিণতি। 'ভুলে' বিদেশী কবিদিগের প্রভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু অক্ষয়কুমারের ক্ষমতার পরিচয়ও সপ্রকাশ। পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কবির বিশেষত্বের ও নিজস্বেরই পরিচয়। 'এষা' শোক-গীতি। উভয় পুস্তকই শোককাতর হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস—উভয় পুস্তকই বিচ্ছিন্ন কবিতার সমষ্টি।—In Memoriamএর সহিত 'এষার' সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। টেনিসনের পুস্তকের সকল কবিতাই একরূপ ছন্দে রচিত, অক্ষয়কুমারের 'এষার' কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত। টেনিসন বন্ধুবিয়োগাবিধুর হইয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন; অক্ষয়কুমারের বেদনা জীবনসর্ব্বস্ব পত্নীর মৃত্যুশোক—

"সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী—
চিরোজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি কবিত্ব-মন্দিরে।
লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে।"

মৃত্যুর নিষ্ঠুরতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া টেনিসন সংশয়ের কঙ্কর-

* এষা, গীতি কাব্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। কলিকাতা ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

কণ্টাকিত পথে যাইয়া—দার্শনিক নিরাশার মধ্য দিয়া ভক্তির গিরিশিরে বিশ্বাসের দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।" অক্ষয়কুমার মৃত্যুর অন্ধকারে প্রেমের দিব্যদীপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; বুঝিয়াছেন, প্রেমমৃত্যুঞ্জয়ী—"ইহকাল—পরকাল।" টেনিসনের কবিতা পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্য হইতে উত্থিত জয়ের ও জীবনের তূর্য্যনিনাদ। অক্ষয়কুমারের কবিতা মৃত্যুর মধ্য হইতে উত্থিত প্রেমের জয়গান। তবে উভয়েরই শোক শান্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উভয়েরই শোকগীতি সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবে। যদি সাহিত্যে অমরতা মৃতের সান্ত্বনার বা সুখের কারণ হয়, তবে টেনিসনের বন্ধুর ও অক্ষয়কুমারের পত্নীর সে সান্ত্বনার ও সে সুখের অভাব হইবে না।

মমূর্ষু পত্নীর মৃত্যু-শয্যায় 'এষার' আরম্ভ আর মৃত্যুর পরপারে অমর প্রেমের স্বরূপ বর্ণনায় 'এষার' শেষ। প্রথমাংশ পড়িতে পড়িতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না; শেষাংশের গম্ভীর ভাব হৃদয়ে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আনিয়া দেয়। প্রথম অংশের দারুণ শোক ও বেদনা দ্বিতীয় অংশে শান্তি ও সান্ত্বনা।

মরণাহতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামীর নিকট "কর্ম্মস্থল হ'তে" পত্র আসিল। মাতৃস্নেহও বুঝি মৃত্যুঞ্জয়ী। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—'একি প্রবাসী পুত্রের পত্র?'—

"অশ্রুভরা কাতর নয়ন
এক-দৃষ্টে চায়;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর-আশায়।
"হে দেবতা, লই তব নাম,
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম
পড়িতেছে বেশ।'

"বক্ষ হ'তে নেমে গেল তার—
গভীর নিশ্বাস;
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।
"শান্ত—তৃপ্ত কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন;
শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন।

মৃত্যু! সে কি এইরূপ?

"এই কি মরণ?
এত দ্রুত—সহসা এমন!
চিরতরে ছাড়াছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন!

বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন!
মন কি গো কাঁদিছে না? প্রাণে কি গো বাধিছে না—
যেতেছ যে জন্মের মতন!"

কিন্তু যে কি ছিল স্থির করা যায় না—"প্রেয়সী না কৃতদাসী? দুটি হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি" যে—

"একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরুক"

তাহাতে ছাড়িয়া জীবন যাপন কি সম্ভব?

"মেল আঁখি, সর্ব্বস্ব আমার!
ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি,' প্রাণেশ্বরি, নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার!
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান
শ্বাস-শ্বাসে অধরে তোমার।"

বৃথা আশা।—

"ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, ওঠে শূন্যে ধূম-ভার;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সুধু মোহ, কে কাহার!
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।
"চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ!
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন!
ভ্রমিতেছি শোক-রুদ্ধ দীন হীন উদাসীন।
"চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল,
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।
"বিদায়—বিদায় তবে! দিবা হ'ল অবসান;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান!
যেথা থাক—সুখে থাক! ঝরে তপ্ত অশ্রুভার:
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।"

যে জীবনে সর্ব্বস্ব ছিল তাহাকে হারাইয়া জীবনে কি আর আকর্ষণ থাকে? তখন জীবন যাতনাভার! ভাবনার সূত্রও ছিন্ন।—

"ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়।
নহে দূর—নহে দূর
ওই মরণের পুর!
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।"

"নাহি আশা, নাহি তৃষা, জীবন যন্ত্রণা,
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই!
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।"

শোক বিশ্বাসের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। দেবতায় আর বিশ্বাস নাই, প্রকৃতির নিয়ম—"এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।" জড় প্রকৃতি নিরানন্দ। পূর্ব্বে—

"হেরি নরে—মম হ'ত ঋষি ভ্রম;
নারী ছিল দেবীসমা;
মন্দার-কলিকা বালক বালিকা:
বিধাতা সাক্ষাৎ ক্ষমা!

"আজ প্রেম-হারা এরা সব কারা?
স্বার্থ-ভরা নারী নর!
জগৎ নরক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক;
মৃত্যু এক সর্ব্বেশ্বর।"

কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইতে পারে না; স্থায়ী হইলে শ্মশান বৈরাগ্য দূর হইত না—সংসার শ্মশান হইত। তাই শোকান্তে হৃদয়ে "শান্তিজল" আপনি বর্ষিত হয়; মনে হয়, ভ্রম আমাদেরই—"প্রকৃতির নাহি ব্যাভিচার।"

"বীজে তরু ফুলে ফল, ফলে পুনঃ বীজদল;
ঝরে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে।"

মৃত্যু কি নিরর্থক নিষ্ঠুরতা মাত্র?

"কভু দেখি,—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট— ধরিত্রীর পাদপীঠ;
শম্বুকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ় উদ্দেশ্য তরে মরিতেছে স্তরে স্তরে
দিয়া আত্ম, করি বিশ্বজয়?"

তবে প্রকৃতি কোন মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত—বিধাতার বিধান মঙ্গলময়।

মনে যখন এই ভাব আইসে তখন শোকে সান্ত্বনা আইসে। মনে হয়—

"সতী,

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি!
তুমি যাহে দেহ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ!
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি?"
"হে মরণ ধন্য তুমি না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!"

তখন জাগ্রত স্বপ্নে মনে হয়, মৃতা বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিতা—মর প্রেম অমরতা লাভ করিয়াছে। সংশয়ের স্থানে বিশ্বাস—নিরাশার স্থানে ভক্তি অধিষ্ঠিত হইল—

"ভাঙ্গিতে পড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নাহিত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেয় সম্বন্ধ অক্ষয়।
শোকে শুধু হৃদি-মরু,
আছে তায় কল্পতরু!
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়।"

"দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন—মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!"

মূঢ় মানব শোকের আবেগে সংশয়সঙ্কুলিত চিত্তে অবিশ্বাসকে আশ্রয় দিয়াছি—"ক্ষম এ ক্রন্দন-গীতি—শোক অবসাদ।"

আমরা 'এষার' পরিচয় দিলাম। ইহা বঙ্গ সাহিত্যের অলঙ্কার।

'এষা' শোককাব্য। কিন্তু ইহাতে প্রকৃতির সহিত গ্রন্থকারের যে পরিচয়ের প্রমাণ আছে—স্বভাবের চিত্র ভাষায় প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা দেখা যায় তাহার উল্লেখ না করিয়া এ সমালোচনা শেষ করিতে পারি না। কবি প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"প্রকৃতি—জননী—জননী !
করিয়া তোমার স্তন-সুধাপান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ !
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী !"

পুস্তকে দুইটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম-

"রবি নিরুজ্জ্বল
আকাশের এক প্রান্তে করে টল্ টল্।
সমস্ত আকাশ ভরি'
ছিন্ন ভিন্ন মেঘ পড়ি'—
নিশীথে চলেছে শূন্য যেন দৈত্যদল !"

দুর্দ্দিনের বর্ণনা—

"ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে ;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে।
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরুছায়ান্তরে,
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্তপদে শূন্য দিন আসে।
"অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায় ;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায়।
"জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দ্দমে পিচ্ছল ;
গলিত বর্জ্জন-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত।
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে কাণে' জল,
কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত।

"ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি'
পড়ে' আছে গতিহীনা হরিত-বরণা ;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তালতরী ;
বংশসেতু পরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।
"তীর বেণুবনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার পিপাসী ;
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।
"কচিৎ তড়িৎ মুখে ম্লান হাসি ফুটে ;
কচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি ;
কচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
কচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিশ্বাসি।"

প্রকৃতির এইরূপ যথাযথ বর্ণনা পুস্তকে অনেক আছে। কবি নিপুণতা-সহকারে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; চিত্র দেখিলে বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়।

'এষা' কবি অক্ষয়কুমারের যশোমুকুটে সমুজ্জ্বল রত্নদীপ্তিবিকাশ করিয়াছে।

মাথার খুলি।

সুবোধচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মাতুল হরিমোহন ঐ কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। উভয়ে কলেজের ছাত্রাবাসের নিম্নতলে একটি প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করেন।

গৃহের দুই পার্শ্বে দুইখানি কেওড়া কাঠের তক্তোপোষ, তদুপরি শয্যা আস্তীর্ণ। উভয়ের শিয়রে একখানি করিয়া ক্যাম্প টেব্‌ল; তদুপরি বহি, খাতা, কাগজ, কলম, ছুরী, কাঁচি, পেন্সিল এবং মস্যাধার। পার্শ্বে দেওয়ালের গাত্রে ছোট শেল্‌ফ, তাহাতে বিবিধ পাঠ্য পুস্তক সজ্জিত। পশ্চাতে একটি করিয়া ষ্টীল ট্রাঙ্ক এবং তাহার পার্শ্বে দেওয়ালের গাত্রে ছোট আলনায় নিত্যব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি লম্ববান। গৃহের মধ্যস্থলে একটি কেরসিনের ঝুলান ল্যাম্প দোদুল্যমান।

সুবোধচন্দ্রের তক্তপোষের নিম্নে তাহার পাদুকা এবং তৎপার্শ্বে এক বাক্স মানুষের হাড়। হরিমোহনের শয্যানিম্নে দুই তিনটি কাঠের এবং কাগজের বাক্সে নানাবিধ ঔষধ, এসিড এবং রাসায়নিক পরীক্ষোপযোগী যন্ত্রাদি।

সুবোধচন্দ্র কৃশাঙ্গ এবং তাহার বর্ণ ফ্যাকাশে; দেখিলে বোধ হয় "ডিস্‌পেপটিক." অর্থাৎ অম্লরোগী। তাহার পরিপাকশক্তি কিছু অল্প এবং রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না। হরিমোহনের দেহ স্থূল, বর্ণ শ্যাম; আহারে যেমন রুচি, নিদ্রায় তেমনই পটুতা। উভয়ের আকৃতি প্রকৃতিতে বিষম বৈষম্য।

সুবোধচন্দ্রের বরাবর রাত্রি জাগিয়া পড়া অভ্যাস। হরিমোহন অধিক রাত্রি অধ্যয়নের বিপক্ষবাদী।

সুবোধচন্দ্রের বাৎসরিক পরীক্ষা সন্নিকট, সেই জন্য সে প্রতিদিন রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিত। হরিমোহন দশটা বাজিলে শয়ন করিত এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠাভ্যাস করিত।

একদিন রাত্রিতে সুবোধচন্দ্র "এনাটমি" (দেহবিজ্ঞান) পড়িতেছিল। হাড়ের বাক্স হইতে মানুষের মাথাটি বাহির করিয়া তাহার গঠনপ্রণালী, অক্ষিকোটর এবং মস্তিষ্কাধার উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতেছিল।

রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে; জানি না কি কারণে সুবোধচন্দ্রের চিত্ত

বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল,—কাহার এ মাথার খুলি; স্ত্রীলোকের, কি পুরুষের? তাহার অদৃষ্টের গতি কি আমাদের অদৃষ্টের গতির মতই ছিল?

সুবোধচন্দ্র আর পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিল না; সেই কোন বহু দিন মৃত অজ্ঞাত ব্যক্তির মস্তকের হাড় নাড়িয়া চাড়িয়া সে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার অবসন্ন অঙ্গ ও ক্লান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিবার জন্য মনুষ্য-মস্তকটি শয্যানিম্নে রাখিয়া সে শয়ন করিল।

সে বহুক্ষণ শয়ন করিয়া রহিল; কিন্তু তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যখন একটু তন্দ্রাবেশ হইল তখন শয্যানিম্নে খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সেই মনুষ্যমস্তকটি নড়িতেছে। একে সে তন্দ্রালু ও ক্লান্তদেহ; তাহার উপর কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময়, অথবা ভয়, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অবসাদ এবং জড়তা এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে, সুবোধচন্দ্র সম্মোহনাভিভূত স্বেচ্ছাবিবর্জ্জিত ব্যক্তির ন্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

ক্রমে শব্দ যেন ধীরে ধীরে শয্যানিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া মাতুলের শয্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল।

সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সেই নরকপাল ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিল; এবং ক্ষণকালমধ্যে পূর্ণাবয়ব নরকঙ্কালে পরিণত হইল। সুবোধচন্দ্রের ললাটে স্বেদসঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন সে কোন এক ভৌতিক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

নরকঙ্কাল ক্রমে তাহার মস্তক-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যেন হস্তোত্তলন পূর্ব্বক তাহার ললাট স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। সুবোধচন্দ্র চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

তখন শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই নরকঙ্কাল তাহার পাদদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল—"যুবক আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? কিন্তু চাহিয়া দেখ আমি আর এখন নরকঙ্কাল মাত্র নাই।"

সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সে যেন চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার শয্যাশেষে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি!

তাহার মুখ সুন্দর; তাহার চক্ষু আয়ত। মুখাবয়বের তুলনায়

তাহার নাসিকা কিঞ্চিত দীর্ঘ; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই। রমণীর বর্ণ গৌর। তাহার অবেণী-সংবদ্ধ কেশ নিতম্ব স্পর্শ করিয়াছে। পরিধানে শুভ্র শাটী, তন্নিম্নে যেরুণা রঙ্গের জামা। প্রশান্ত চক্ষুর্দ্বয়—তাহার ক্ষীণ মৃদু দৃষ্টি সুবোধচন্দ্রের ভীতিবিহ্বল মুখপ্রতি ন্যস্ত। তাহার সৌন্দর্য্য যৌবনে পরিপূর্ণতা পাইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তরঙ্গ নাই। তাহা শান্ত, ধীর, স্থির। ভয়ে—বিস্ময়ে সুবোধচন্দ্র এক স্বপ্ন-রাজ্যের অলৌকিক প্রভাবে হৃতশক্তি; দেহ আছে, কিন্তু তাহার কোন সামর্থ্য নাই; সংজ্ঞা আছে, কিন্তু বুদ্ধি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা নাই।

নারীমূর্ত্তি বলিল,—"যুবক, এই আমি। এক দিন ঠিক এমনই ছিলাম। তোমাদের মত সংসারের সুখ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, অভাব অভিযোগ আমাকে বিচলিত করিত। কখন মনে হইত সংসার স্বর্গ; কখন মনে হইত সংসার নরক।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আজ আমার মাথার হাড় লইয়া তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ; তোমার পূর্ব্বে আরও কত যুবক ক্রীড়নকরূপে আমার মস্তকাস্থি ব্যবহার করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে। যতবার আমার অস্থি মনুষ্যের হস্ত স্পর্শ করে ততবার আমি সজীব হইয়া উঠি,—প্রতি অস্থিখণ্ডের মধ্যে আমার বিলুপ্ত প্রাণ জাগিয়া উঠে, সুপ্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠে। পৃথিবীর সুখ—মনুষ্যের সঙ্গলাভ করিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে।"

মনে হইল যেন নারীমূর্ত্তি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সুবোধ-চন্দ্রের হৃদয়ে সহানুভূতির বেদনা বাজিয়া উঠিল।

নারীমূর্ত্তি বলিতে লাগিল,—"মরিয়াছি—সে কত দিন, কত বৎসর পূর্ব্বে! কিন্তু এখনও সংসারের লালসা ত্যাগ করিতে পারি নাই; ভোগেচ্ছা এখন সম্পূর্ণ বলবতী। বাসনা বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই, তাই এখন,—এত দিন প্রেতলোকে বিচরণ করিতেছি।

"কতবার চেষ্টা করিয়াছি, বিদ্যার্থিগণকে আমার পরিচয় দিব; কিন্তু চেষ্টা বিফল হইয়াছে; বিফল চেষ্টার নৈরাশ্যে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। জানি না কেমন তাহাদের ধাতু প্রকৃতি; তোমাকে যেমন আমার ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা আয়ত্ত করিয়াছি তাহাদের কাহাকেও তেমন বশীভূত করিতে পারি নাই। মনে হয়, কাহাকেও আমার জীবন-কথা শুনাইতে পারিলে

আমার অন্তর্জ্জালার নিবৃত্তি হয়। শুনিবে আমার কাহিনী! ভয় পাইও না, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।

"চাহিয়া দেখ,—এই আমি দাঁড়াইয়া আছি; আমার কি কিছু রূপ ছিল বলিয়া মনে হয়? রূপ—রূপ—রূপ—; যে রূপের জন্য প্রতি নারী লালায়িত, সে রূপ তাহার সর্ব্বনাশের মূল,—পাপের কারণ। হায়! কয়-জন অভাগিনী তাহা ভাবিয়া দেখে!

"আমার রূপ ছিল না? ছিল!—বল, বল, আবার বল, আমার রূপ ছিল। ছিল; যথার্থই ছিল। তুমি যে রূপ ভালবাস তাহা না থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি আমার রূপ ছিল। সে রূপে কতজনের মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়াছিল—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল;—আমার রূপে তাহারা আত্মহারা হইয়াছিল। অন্ততঃ একজন একদিন এই রূপের মোহে পাগল হইয়াছিল! সয়তান—বিশ্বাসঘাতক—"

যেরূপ তীব্র, তীক্ষ্ণ, কর্কশ কণ্ঠে সেই নারীমূর্ত্তি—"সয়তান—বিশ্বাস-ঘাতক," উচ্চারণ করিল তাহাতে ভীতিবিহ্বল সুবোধচন্দ্রের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিবার উপক্রম হইল; তাহার নিস্পন্দ হৃদয় নিশ্চল, স্থির হইবার মত বোধ হইল। তাহার মনে হইল, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসি-তেছে। সুবোধচন্দ্র দেখিল, সেই রমণীয় রমণী-মূর্ত্তির শান্ত, স্নিগ্ধ, চক্ষু পিশাচীর জীঘাংসা-জ্বালায় প্রজ্বলিত।

"সয়তান—বিশ্বাসঘাতক, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে সুখী হইয়া-ছিল। কিন্তু পৃথিবীর সুখ কয় দিনের জন্য? পাপের ফল যে পৃথিবীর পরপার পর্য্যন্ত আইসে দুষমন তখন তাহা বুঝিতে পারে নাই; এখন আমার মত এই প্রেতলোকে আসিয়া তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। কাফের—দুষমন্, দূর হ', আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না।" বঙ্কিম গ্রীবা বক্র করিয়া নারীমূর্ত্তি যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল যেন নারীমূর্ত্তির পশ্চাৎ হইতে একটি পুংপ্রেত-মূর্ত্তি অপসৃত হইয়া গেল।

নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"কাফেরের প্রলোভনে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম: তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া, তাহার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম; তাহার কপটতায় প্রলুব্ধ হইয়া কায়মনোবাক্যে জীবন—যৌবন তাহার ভোগবাসনার জন্য উৎসর্গ করিয়া-

ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, জীবন-নদীতে যৌবন-নৌকা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ভাসিয়া বেড়াইবে। কে জানিত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে—উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নে ভরা ডুবি হইবে?"

নারীমূর্ত্তি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল; তাহার হিংসাপ্রদীপ্ত কঠোর মুখভঙ্গী ক্রমে কোমল হইয়া আসিল; চক্ষুর প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। তাহার পর সে অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"যুবক, আমি তোমার মত হিন্দু নহি—মুসলমান। সত্যধর্ম্মে আমার জন্ম হইয়াছিল; কাফেরের প্রেমে পড়িয়া আমি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম,—হিন্দুর বেশভূষা, আচারব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলাম। তাই আমার এই কঠোর শাস্তি; মরিয়াও আমার সুখ নাই, কারণ আমি মুসলমানের মত মরিতে পারি নাই, মুসলমানের চিরাচরিত কবর আমার ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। আমি বাদশাহজাদি—বাদশাহের ঘরে আমার জন্ম হইয়াছিল। বিশ্বাস করিতেছ না? তবে চাহিয়া দেখ;—দেখ,—দেখ, কি সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমার জন্ম হইয়াছিল।—"

সুবোধচন্দ্র দেখিতে পাইল,—সুবৃহৎ সৌধাবলী সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত। চারিদিকে চারিটি মহল, তন্মধ্যে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে স্ত্রী-প্রহরী। বিবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, সুসজ্জিত সুরম্য হর্ম্মমালা। সম্মুখ মহলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ মণ্ডপ। মণ্ডপে নবাবের দরবার বসিয়াছে; রাজা প্রজা এবং উজীর পরিবেষ্টিত হইয়া নবাব রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বের মহলে রাজকর্ম্মচারী এবং কারকুনরা কর্ম্ম করিতেছে, বামদিকের অট্টালিকা কর্ম্মচারী এবং অভ্যাগতজনের বাসস্থান। পশ্চাদ্ভাগের দৃঢ়ভিত্তি লৌহপ্রাচীরবেষ্টিত; প্রকোষ্ঠাবলীতে সেনানিবাস এবং কারাগার।

সর্ব্বাপেক্ষা সুচারু অন্তঃপুর—বেগম মহল; গৃহে গৃহে অসূর্য্যম্পশ্যা পারিজাতপুষ্পসদৃশ নয়নাভিরাম রমণীমূর্ত্তি; গৃহ কলকণ্ঠের মৃদু গীতে এবং মধুর হাস্যপরিহাসে মুখরিত।

সুবোধচন্দ্র শুনিতে পাইল—"ঐ আমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ-পরিপূর্ণ—সুখস্মৃতিবিজড়িত বাসভবন। আমিও ঐ গৃহে জন্মিয়াছিলাম; কিন্তু তখন উহার এরূপ শ্রী ছিল না। তখন ইংরাজ রাজত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। কালের কুটিল প্রবাহে ঐ সৌধাবলী, স্থানে স্থানে

ভগ্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। নবাবী 'চাল' বজায় ছিল—পূর্ব্বেরই মত দরবার বসিত, কিন্তু সে পূর্ব্বদরবারের ছায়া মাত্র! বিরল-প্রহরিপরিবেষ্টিত ঐ গৃহে আমার শৈশব, কৈশোর অতীত হইয়াছিল; যৌবনের প্রারম্ভে এক হিন্দু কর্ম্মচারীর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার পিতা পিতামহ আমার পিতা এবং পিতামহের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। নবাবের গৃহে সস্নেহে প্রতিপালিত হইয়া তরলমতি যুবক কেবল বিলাস-ব্যসন শিখিয়াছিল। বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীর পুত্র; অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশাধিকার ছিল। উভয়ে অনেক সময় একত্র ক্রীড়া করিতাম। যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম তখন মাতার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিত মিশিতাম; ওস্তাদের নিকট গান শিখিয়া তাহাকে না শুনাইলে তৃপ্তি হইত না। সে কি সুখের দিন ছিল!"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিয়া নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"সে তখন কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিত। ফিরিয়া যাইয়া আমাকে কত প্রলোভনের কথা বলিত—বিলাসব্যসনের কত পাপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমার অসংযত মনকে আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিত।

"নবাবের গৃহে জন্মিয়াছিলাম, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিবাহে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং পিতামাতার ভর্ৎসনায় সয়তানের সহিত প্রকাশ্য ভাবে সাক্ষাৎ না করিয়া গোপনে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। তখন কলিকাতায় প্রথম থিয়েটার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে আমাকে থিয়েটার দেখাইবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু বাদসাহ-কন্যা আমার পক্ষে অন্দরের বাহিরে আসা একেবারে নিষিদ্ধ, তাই সয়তান আমাকে ফুসলাইয়া, সমাজ——ধর্ম্ম এবং মর্য্যাদার মস্তকে পদাঘাত করাইয়া কূলের বাহির করিল।

"মর্য্যাদাহানির ভয়ে পিতামাতা আমাকে আর গৃহে লইলেন না, দুষমনও আমাকে যাইতে দিল না। ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ ও রোষপরবশ হইয়া পিতা আমার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে আমার মিথ্যা কবর দিলেন। আমি সয়তানের আশ্রয়ে হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু কুলকলঙ্কিনীদিগের সহিত কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলাম।

"কিছু দিন বেশ সুখে কাল কাটিয়া গেল। সে সুখ যে সুখ নহে, অনন্ত

দুঃখের আপাতরম্য প্রারম্ভ, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণী যেমন বহুদিন আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তি পাইলে স্বাধীনতার প্রাণোন্মাদকারী রসাস্বাদন করিয়া আত্মবিহ্বল হয় এবং অস্থিরভাবে পক্ষ উচাটনপূর্ব্বক মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায়; মনে করে, সেই স্বাধীনতাসুখের নিকট সুবর্ণপিঞ্জর এবং সযত্নসঞ্চিত অনায়াসলব্ধ আহার অতি তুচ্ছ, আমিও তেমনই শুদ্ধান্তের পবিত্র তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সংযমহীন বিলাসব্যসনে আত্মহারা হইয়াছিলাম।

"সর্ব্বনাশের মূল, ক্ষণভঙ্গুর সেই সুখ আলেয়ার আলোকের ন্যায় মুহূর্ত্ত-জ্বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল! দুঃখের অনন্ত অন্ধকারের প্রথম আভাস আমার জীবনপথে বিভীষিকা দেখাইল। ধর্ম্মবন্ধনবিহীন বন্ধু আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া লঘুহৃদয় প্রজাপতির ন্যায় পুষ্পান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন জানিতাম না যে, পাপের পথে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; সুতরাং প্রণয়ের প্রথম নৈরাশ্যে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম। ঘৃণায়, লজ্জায়, শোকে—নবাবনন্দিনী আমি, মৃত্তিকায় বুক পাতিয়া অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিলাম।"

অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল,—"কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কি গভীর দুঃখ, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা? অবৈধ প্রণয়ের প্রথম নৈরাশ্য যে কত তীব্র,—আন্তরিক ভালবাসার প্রথম উপেক্ষা যে কত জ্বালাময় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বোধ হয়, বৈধ প্রণয়াপেক্ষা অবৈধ প্রণয়ের আসক্তি অধিক, নতুবা তখন সেই সয়তানের বিশ্বাস-ঘাতকতায় হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িবে কেন, প্রতি অণুপরমাণুতে ব্যর্থ প্রণয়ের তীক্ষ্ণ-বেদনা বাজিয়া উঠিবে কেন?

"সে ত অনেক দিনের কথা। তাহার পর কত উপেক্ষা, কত লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিয়াছি; হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিসকল সমূলে উৎপাটিত করিয়াছি—তথাপি এই যুগ-যুগান্তর-পরে—এই প্রেতলোকে, এই ছায়া-মূর্ত্তির পঞ্চভূতপরিবর্জ্জিত হৃদয়ের নিভৃত কোনে সেই পিশাচের প্রতিবিম্ব লাগিয়া রহিয়াছে। কত চেষ্টা করিয়াছি—দুঃখের পর দুঃখ পুঞ্জীভূত করিয়া হৃদয়কে অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি তথাপি সেই প্রথম প্রণয়ের প্রতিচ্ছবি বিদূরিত করিতে পারি নাই।

সে যে আমার হৃদয়ফলকে অকৃত্রিম প্রণয়ে উৎকীর্ণ,—আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা, আমার যৌবন-প্রভাতের প্রথম অরুণরাগ, আমার সুখ-জীবনের প্রথম মধুর স্বপ্ন; সে ত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারি না। ত্যাগ করিলে যে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এই দগ্ধ জীবনের সেই অকপট প্রণয় ব্যতীত আর সব যে মসীময়, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন! সেই প্রণয়ের জন্য যে আমি সর্ব্বত্যাগী।

"প্রণয় সুখের, কিন্তু প্রণয়হেতু প্রণয়ীর প্রতারণা দুঃখের; তাই তাহাকে দেখিলে—তাহার কথা মনে হইলে হৃদয়ে হিংসাপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তাহাকে যেমনটি ভালবাসিয়াছিলাম,—যখন সে আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তখন ত সে তেমন ছিল না। তাহার দেবত্বকে ভালবাসিয়াছিলাম—সেই দেবত্বকে কেন না পূজা করিব? তাহার দানব প্রকৃতিকে ভালবাসি নাই—তাই সেই দানব-প্রকৃতিকে হৃদয়ের সহিত, অন্তরের সহিত, ঘৃণা করি। তাই যখন সে প্রেত-মূর্ত্তিতে আমার নিকটে আইসে তখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়া থাকি। ইহা কি আমার দোষ? দোষ হয়, আমি এ দোষ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। দুর্ব্বলতা!—ভাল, এ দুর্ব্বলতা যেন আমার চিরসঙ্গী থাকে।"

নারীমূর্ত্তি মৌন হইয়া রহিল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সে যেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তির করুণকাহিনী বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু একি! আবার সেই কণ্ঠস্বর, সেই করুণস্বর; আরও বিষাদবিজড়িত, আরও বিনীত।

অনুরুদ্ধ হইয়া সুবোধচন্দ্র যেন পুনরায় চক্ষুরুন্মীলন করিল। কি ভয়ানক দৃশ্য! নারীমূর্ত্তির আর সে রূপ নাই, সে বিশীর্ণ, বিবর্ণ, অস্থি-চর্ম্মসার কঙ্কালমাত্র—রোগ শয্যায় শায়িত। সেই যে শান্ত সুন্দর কমনীয় রূপ তাহার কিছুমাত্র নাই!

"দেখ, যুবক, রূপ দেখিয়াছিলে; এখন রূপের বিকৃতি দেখ। রূপ পুণ্যের ফল, পাপসংস্পর্শে রূপ বিকৃত হইয়া যায়। আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন দুর্ম্মন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন আমি অর্থহীন, সহায়হীন, অশ্রুমাত্র আমার সম্বল। এক পক্ষ অনাহারে অনিদ্রায় এবং অশ্রুজলে অতিবাহিত করিলাম।

"যে কুলকলঙ্কিনীদিগের সহিত বাস করিতেছিলাম তাহাদের এক-

জনের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল। সে আমাকে অনেক বুঝাইল, অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে উপদেশ দিল—অনুরোধ করিল; কিন্তু আমি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতে পারিলাম না। আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছিলাম; সে শিক্ষার ফল আমি সহজে ভুলিতে পারিলাম না।

"আমার স্খলিত চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া আমার সঙ্গিনী আমাকে এক নূতন পথ দেখাইয়া দিল। এক দিন সে আমাকে বলিল—'একজন বাবু থিয়েটারের জন্য একজন নৃত্যগীতকুশল স্ত্রী-লোকের অনুসন্ধান করিতেছেন। তুমি লিখিতে পড়িতে জান, এবং তোমার গলাও বেশ মিষ্ট, তুমি যদি বল, আমি তোমাকে সেই বাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিব।' সে আমাকে বুঝাইল, আমি যে বেতন পাইব তাহাতে আমি স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আমি সম্মত হইলাম।

"বাবুর সহিত পরিচয় হইল। তিনি ভদ্রবংশজাত। আমার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে থিয়েটারে আমার চাকরী হইল। তিনি আমাকে আরও অধিক অর্থের প্রলোভন দেখাইলেন; কিন্তু আমার রুচি ভিন্ন বুঝিতে পারিয়া কলা বিদ্যায় পারদর্শিতা অনুসারে ভবিষ্যতে আমার যথেষ্ঠ উন্নতি হইবে এইরূপ ভরসা দিলেন।

"অনন্যমনে অধ্যবসায়ের ফলে অল্পদিনে রঙ্গালয়ে আমার সুযশ হইল। মুসলমান নায়িকার অংশ অভিনয় করিতে আমার সমকক্ষ আর কেহ রহিল না।

"মনে হয় প্রথম অভিনয় রজনী। সেই জনবহুল, দীপালোকোজ্জল নাট্যশালা; দর্শকদিগের আগ্রহ এবং সোৎসুক প্রতীক্ষা। যখন নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম দর্শকদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম—তখন মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় বড় দুর্ব্বল বোধ হইল;—মনে হইল,ঐকান্তিক শিক্ষা এবং সাধনা বুঝি সব বিফল হইয়া যায়! মনে মনে ডাকিলাম—'আল্লা, আমাকে বল দাও।' অনেক দিন আল্লাকে এমন প্রাণ ভরিয়া ডাকি নাই। খোদা মেহেরবানি করিয়া আমার কাতর আহ্বান শুনিলেন। দুই অঙ্ক অভিনয়ের পর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

"তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আমার গীত। সেই আমার প্রথম প্রকাশ্যে গীত। সে গীত কি ভুলিবার ?

'ওসে কেন আসে না ?

আসি বলে চলে গেল আর এলোনা।'

"ভৈরবী রাগিণীর কোমল মধুর প্রাণস্পর্শী মূর্চ্ছনা রঙ্গালয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন স্তরে স্তরে ঢেউ খেলিয়া দর্শক-মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া তুলিল, ঘন ঘন—'বাহবা', 'বহুৎ আচ্ছা' প্রভৃতি উৎসাহ-সূচক শব্দে তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলক-প্রবাহ বহিয়া গেল। সেই গীতের ধ্বনি এবং করতালির প্রতিধ্বনি যেন এখনও আমার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে।

"সেই ক্ষুদ্র একটি সঙ্গীতেই আমার যশঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। সে যে আমার প্রাণের গীত। আমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে সেই গীতের প্রতি শব্দ যে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল তাহা কয়জন অনুভব করিয়াছিল ? সর্ব্বান্তঃকরণে যখন আমি সেই গীত গাহিতেছিলাম, তখন যে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম ; তদ্গত ভাবে আমার প্রণয়াস্পদের উদ্দেশে গাহিতে-ছিলাম—

'ও সে কেন আসে না ?

আসি বলে চলে গেল আর এলোনা !'

সে যে আমার প্রাণের নিদারুণ নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া সেই করুণ কাতর আহ্বান সমুত্থিত হইয়াছিল। অতীত বর্ত্তমান ভুলিয়া ; স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া আমি যে প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলাম—'তারে বড় ভালবাসি।' হায়, লাঞ্ছনা !"

সুবোধ চন্দ্রের মনে হইল, সেই রোগশয্যাশায়িনী কঙ্কালাবশিষ্টা রমণীর নেত্রযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আসিল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া হত-ভাগিনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

"এমনই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার যশঃসূর্য্য উত্তরো-ত্তর অধিকতর ভাস্বর হইতে লাগিল। একদিন অভিনয়ান্তে রজনী-প্রভাতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমাদের পরিচারিকা বলিল, এক-জন বাবু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। এমন অনেক ভদ্রলোক

মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন এবং আমাকে বিরক্ত করিয়া অপ্রিয় কথা শুনিয়া ক্ষুন্নমনে চলিয়া যাইতেন। আমি দাসীকে বলিয়া দিলাম—'আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা, আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি; বাবুকে ফিরিয়া যাইতে বল।' দাসী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—বাবু আমার পূর্ব্বপরিচিত, বিশেষ আবশ্যক আছে, সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন না। অগত্যা তাঁহাকে আমার কক্ষে আহ্বান করিলাম।

"বাবু আর কেহ নহেন, সেই বিশ্বাসঘাতক—সয়তান—দুষমন। কেমন করিয়া বলিব, বৎসরাধিক কাল পরে সেই দুরাচারকে দেখিয়া আমার হৃৎপিণ্ড কত দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আবার কেন আসিয়াছ?' শুনিলাম, 'আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; আমাকে ক্ষমা কর।' বলিলাম, 'ক্ষমা,—এতদিন পরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? কিন্তু তুমি যে ক্ষমার অযোগ্য।' উত্তর শুনিলাম, 'যোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমা ত সকলেই করিয়া থাকে। তাহাতে বিশেষত্ব কি? অযোগ্যকে যে ক্ষমা করে—তাহার ক্ষমায় মনুষ্যত্ব আছে।' আবার বলিলাম, 'মনে আছে তোমার প্রতিজ্ঞা? সেই যে দিন অমাবস্যার অন্ধকারে পিতামাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, লাজধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, তোমার হাত ধরিয়া কুলত্যাগ করিয়াছিলাম, মনে আছে সেই দিনের প্রতিজ্ঞা? উভয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিব?' শুনিলাম, 'আমাকে আর লজ্জা দিও না। আমার অপরাধ হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা কর, মেহের।'

"মেহের—মেহের! মেহের মরিয়াছে—অনেক দিন মরিয়াছে। আবার কেন মেহেরকে ডাক? না, না; ডাক, আবার আমার সেই পুরাতন নাম ধরিয়া—সেই পুরাতন, পরিচিত চিরবাঞ্ছিত সুধামাখা স্বরে ডাক। প্রতারক তোমার কপটতায় অনেক দুঃখ যাতনা সহ্য করিয়াছি;—তবু ডাক। ঐ নামের সহিত আমার বাল্যস্মৃতি বিজড়িত। সে বড় সুখের স্মৃতি—বড় মধুর।

"আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মা'র কথা মনে হইল। মা ডাকিতেন—মেহের। সে কি স্নেহের ডাক! পিতার কথা মনে হইল। পিতা ডাকিতেন—মেহের। অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল।

"সে সুযোগ বুঝিয়া আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া আমাকে চুম্বন করিল। আমি তখন যেন আত্মহারা হইয়াছিলাম। স্বর্গগত পিতামাতার স্নেহ-স্মৃতি আমার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছিল; মনে হইতেছিল, সেই সুখের শৈশব, সেই সুধাময় কৈশোর,—তাহার পর সেই স্বপ্নময় প্রথম যৌবন; সেই বিকাশোন্মুখ যৌবনের প্রথম অনাবিল প্রণয়। তখন চিত্তের স্থৈর্য্য—হৃদয়ের দার্ঢ্য শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। তাই সেই ভণ্ডের আলিঙ্গন, চুম্বন আমার বিভ্রম বিদূরিত করিতে পারিল না। আমি ভুলিয়া গেলাম। সে যখন ছল ছল নেত্রে প্রার্থনা করিল,—'মেহের—মেহের, আমাকে ক্ষমা করিবে না?'—তখন অতীত ভুলিয়া গেলাম—অবজ্ঞা, উপেক্ষা, লাঞ্ছনা সব ভুলিয়া গেলাম। হায়, নারীর দুর্ব্বল হৃদয়!"

সেই মুমূর্ষু মায়ামূর্ত্তি আবার নীরব হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার রোগক্লিষ্ট মুখে শান্তির ছায়া পরিলক্ষিত হইল। সুবোধচন্দ্রের মনে হইল, সে বুঝি মৃত্যুর ছায়া। কিন্তু ক্ষণপরে আবার সেই বিশীর্ণ, বিবর্ণ—মুখে বিকট ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল। নারীমূর্ত্তি পুনরায় বলিতে লাগিল—"তাহার পর কিছুদিন পরে আমাকে কালরোগে ধরিল। সে রোগ কিছুতেই সারিল না। যত দিন অর্থসামর্থ্য ছিল তত দিন রোগের সহিত যুদ্ধ করিলাম। অবশেষে হাসপাতালে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। তথায় মৃত্যু আসিয়া আমার সকল পার্থিব যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল।

"বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, যাহার জন্য আমার এই দুর্দ্দশা—যাহার জন্য সব বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম—যাহাকে ত্যাগ করিয়াও গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যে বার বার আমাকে লাঞ্ছিত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া চলিয়া যাইত,—যে রোগের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে একবার দেখা দেয় নাই, সংবাদও লয় নাই,—মৃত্যুর পূর্ব্বে হাঁসপাতালের রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছিল। মনে হইত, যদি একবার তাহাকে দেখিয়া মরিতে পারি তাহা হইলে বুঝি জীবনের সকল অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হয়—সকল দুঃখের জ্বালা ভুলিতে পারি। দিনের পর দিন তাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছি—বিন্দু বিন্দু অশ্রু গণ্ডে গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিয়াছে, ধাত্রীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু

যাহার সহানুভূতি ও সেবার উপর অধিকার আছে মনে করিতে পারিতাম, সে একটি দিন—একটি বারও দেখিতে আইসে নাই।'

"যুবক, আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তোমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে—তোমার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু যাহার এক বিন্দু অশ্রুর জন্য আমি অকাতরে জন্ম জন্ম নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিতাম এবং যাহার অশ্রু আমার দুঃখে স্বতঃউৎসারিত হওয়া উচিত ছিল, তাহার চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল কি নিবিয়া গিয়াছিল তাহা একবার জানিবার অবকাশ পাই নাই। এখন ঘৃণার আবরণে প্রণয় আবৃত করিয়াছি—হৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বালিত করিয়াছি—তবুও সেই কালপ্রণয়কালকূটের প্রদাহ সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে—তুষের আগুনের ন্যায় এখনও হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। এ আগুণ কি কখন নিবিবে না—এ বিষের মোহ কি কখন কাটিবে না? রমণীর প্রণয় কি এত গভীর!"

মায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে শয্যোপরি বসিল; তাহার পর আবেগভরে বলিতে লাগিল—"যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বার দেখা দিত, অন্ততঃ মৃত্যুর পর আমার সৎকার করিত, তাহা হইলে আমার দেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইত না,—আমার হাড় বিদ্যার্থিগণের নিকট বিক্রীত হইত না এবং তাহা হইলে আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতাম।

"যুবক, তুমি আমার একটি উপকার করিবে? কল্য প্রত্যুষে আমার বিচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ডসকল একত্রিত করিয়া জনৈক মৌলবীসাহায্যে আমায় কবর দিবে? কবর হইলে আমি বোধ হয় মুক্ত হইব; মুক্ত হই না হই, তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

তাহার পর সুবোধচন্দ্র দেখিল—সে শয্যা নাই, সে নারীমূর্ত্তি নাই;—আছে একটি সংযুক্ত সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল। আর সেই কঙ্কাল বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। ভয়ে সুবোধচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই শব্দে হরিমোহনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। হরিমোহন ডাকিল—"সুবোধ, সুবোধ।"

ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে সুবোধ উত্তর দিল, "কি, মামা।"

"তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ,—ভয় পাইয়াছ কি?"

তখন মেজের উপর খট্‌খট্ শব্দ হইতেছিল। সুবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"মামা কিসের শব্দ হইতেছে।"

হরিমোহন বলিল—"মাথার হাড়ের ভিতর বোধ হয় আবার ইন্দুর ঢুকিয়াছে।"

হরিমোহন আলো জ্বালিল। মনুষ্যমস্তকাস্থি শয্যানিম্ন হইতে বহু দূরে নীত হইয়াছে। হরিমোহন সেইটি হাতে করিয়া তুলিবামাত্র তন্মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র ইন্দুর নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

প্রত্যূষে সুবোধচন্দ্র সেই অস্থিখণ্ডসকল মৌলবীসাহায্যে কবরস্থ করিয়াছিল কি না সে সংবাদ জানা যায় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগ্রহ

বিবিধ।

হেষ্টিংস হাউস।

আলিপুরের হেষ্টিংস হাউস সরকারের সম্পত্তি। ইহার সহিত অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। কেবল কাহিনী নহে, পরন্তু একটি অলৌকিক রহস্যও ইহার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। এ পর্য্যন্ত সেই রহস্যের উদ্ভেদ হয় নাই। সংপ্রতি সরকার এই ঐতিহাসিক উদ্যান বাটীকাটি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের চেষ্টায় লর্ড ক্রু আপাততঃ সেই চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে হেষ্টিংস হাউস সম্বন্ধে নানা কথাই বিলাতী ও এদেশী সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে। এফ্, এচ, টি, সাক্ষর করিয়া জনৈক লেখক সংপ্রতি এই ঐতিহাসিক উদ্যান বাটিকা সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

কলিকাতার উপকণ্ঠে, আলিপুরে হেষ্টিংস হাউস অবস্থিত। কর্ম্মকোলাহলমুখরিত কলিকাতার কলরব তথায় প্রবেশ করে না। কেবল পার্শ্বস্থিত রাজপথে মোটরকার ও ট্রামগাড়ির ঘর্ঘরধ্বনি এখন মধ্যে মধ্যে ইহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকে। ইহার চারিদিকেই সমুচ্ছ্রিত শাখিরাশি সুশোভিত। সম্মুখে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র ও বক্র রাজপথ। বাতায়নসান্নিধ্যে সরল তালতরু যৌন শান্ত্রীর ন্যায় দণ্ডায়মান। গৃহসান্নিধ্যেই একটি সুন্দর পুষ্করিণী। হেষ্টিংস যখন ঐ গৃহ নির্ম্মিত

হেষ্টিংস হাউস।

করিয়াছিলেন,—তখন ও তাহার বহুদিন পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত উহা উক্ত গৃহবাসী লোকদিগের জল সরবরাহ করিত। ইহার পশ্চাদ্ভাগে তরুরাজি সজ্জিত,—উহাদের ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীর অবকাশমধ্য দিয়া স্থানে স্থানে মন্দুরাদি লক্ষিত হয়।

কলিকাতায় অনেকগুলি প্রাচীন সৌধ বর্ত্তমান আছে,—কিন্তু সেগুলি যত পুরাতন তাহাদিগকে তত পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। দুই শত বৎসরের পুরাতন বাড়ী কলিকাতায় অনেক আছে। হেষ্টিংস হাউস তাদৃশ পুরাতন নহে। তবে উহা ক্রমশঃ পুরাবস্তুর মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্যতালাভ করিতেছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেখিলে সন্নিহিত অনেক আধুনিক বাড়ী অপেক্ষা ইহাকে নূতন বলিয়াই মনে হয়।

অবস্থা।

এই গৃহখানির ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সম্ভবতঃ হেষ্টিংস স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে ভালবাসিতেন। কলিকাতায় ও তাহার সান্নিধ্যে অনেক গৃহেই তিনি বাস করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে এখন বার্ণ কোম্পানীর আফিস, সেই বাড়ীই হেষ্টিংসের অন্যতম বাসভবন ছিল। ঐ বাড়ীর বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে হেষ্টিংসের আমলের পাখা এখনও দোদুল্যমান। উক্ত গবর্ণর জেনারেল যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সহিত ভোজনে বসিতেন, তখন ঐ পাখাই তাঁহাদিগের নিদাঘতাপতপ্ত দেহ শীতল করিত। উহা এখন কৌতূহলোদ্দীপক পুরাবস্তু বলিয়াই তথায় রক্ষিত আছে। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে যে সৌধে এখন লোয়েলিন কোম্পানীর অফিস, উহা এক সময় 'গবর্ণমেণ্ট হাউস' ছিল। উহার যে গৃহে ব্যবস্থাপক পরিষদের বৈঠক বসিত সে গৃহ এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। হেষ্টিংস কিছু দিনের জন্য রিষড়ার হেষ্টিংস মিল গৃহে ও বেলভেডিয়ারে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় নাই। সেইজন্য তিনি তরুচ্ছায়াসমন্বিত আলিপুরে উদ্যান বাটিকার ন্যায় একটি গৃহ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। উহার চারি দিকেই পল্লীশোভা বিরাজমান। সামাজিক সম্মিলন-ব্যাপারে কিছুকাল বেলভেডিয়ার প্রাসাদই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে হেষ্টিংস বেলভেডিয়ার প্রাসাদ ভাড়া দিয়াছিলেন। যে সময় হেষ্টিংসের সহিত ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বৈরথযুদ্ধ হইয়াছিল,—সেই সময় বেলভেডিয়ার মেজর টলি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। এই মেজর টলির নাম আদিগঙ্গার নামের সহিত জড়িত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ; আলিপুরের প্রান্তবাহিনী আদিগঙ্গার অন্য নাম টলির নালা।

হেষ্টিংসের বিভিন্ন ভবন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হেষ্টিংস হাউস বৃহৎ গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সে সময়ের সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে,—ইহাতে একটু বিস্মিত হইতে হয়। মিসেস্ কে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিসেস হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উহাকে সুন্দর ক্ষুদ্র বাটিকা বলিয়াছেন। ঐ বৎসর ম্যাক্‌রেবী লিখিয়াছেন,—"কর্ণেল মন্‌সন্ আমাদের সহিত পল্লীভবনে ভোজন করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে আমরা পদচারণ করিতে করিতে গবর্ণরের নবনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে গেলাম। বাড়ীখানি সুন্দর ও ক্ষুদ্র; কিন্তু উচ্চ। ইহাতে বায়ুপ্রবাহের

ক্ষুদ্র গৃহ।

অবাধ গতি। উহার অতুজ্জ্বল দুগ্ধফেনশুভ্রকান্তি নয়নে ধন্ধ উৎপাদন করে।” লেখক ঐ বৎসর বলিয়া কোন্ বৎসরকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন? তাঁহার লিখা পড়িলে মনে হয়, তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আলেক-জাণ্ডার ম্যাকৃরেবী ও জর্জ্জ মন্‌সন্ উভয়েই ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। ঐ সময় হেষ্টিংস হাউস কেবল মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং উহা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দেরই কথা।

প্রায় সমস্ত আলিপুরটাই হেষ্টিংসের সম্পত্তি ছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উহা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রথম ভাগে পুরাতন গৃহ ও তৎসংলগ্ন উদ্যান, দ্বিতীয় ভাগে নূতন গৃহ ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি এবং তৃতীয় ভাগে বৃতিবেষ্টিত মাঠ। সম্ভবতঃ মেজর টলি বেলভেডিয়ার খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। যে য়ুরোপীয় হেষ্টিংসের শকটচালকের কার্য্য করিত তাহার ভাগেও অনেক জমী মিলিয়াছিল। সে ব্যক্তি কলিকাতায় বাস করে। ঐ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহার বংশধরগণ বেশ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

হেষ্টিংসের সম্পত্তি।

এই প্রাচীন বাটীতে অনেক লোক বাস করিয়াছেন। অনেকে সপরিবারে ইহাতে বাস করিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গৃহে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বাস করিয়াছিলেন। অনেক সুপ্রসিদ্ধ পরিদর্শক ও ভারতীয় রাজন্য এই বাড়ীতে রজনী যাপন করিয়াছেন। তিব্বতের দলই লামাও এই গৃহে কয়েক দিন ছিলেন।

ইদানীন্তন অধিবাসী।

হেষ্টিংস কি কারণে এই গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। সম্ভবতঃ ব্যারণেস্ ইম্‌হফের বসবাসের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই রমণীকে উত্তরকালে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বুঝিয়া উঠা কঠিন। হেষ্টিংসের সহিত উক্ত রমণীর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায়না। সাধারণ লোকের এই সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটিই এখন অতীতের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। নৈতিক দৃষ্টিতে হেষ্টিংস ও ইম্‌হফ দম্পতির আচরণ দুষ্ট বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্যাপারটি মূলতঃ এইরূপ। ইম্‌হফ জাতিতে জর্ম্মাণ। তিনি মান্দ্রাজ সেনাবিভাগে একটি সামান্য পদ পাইয়া বিলাত হইতে সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন। যে জাহাজে ইম্‌হফ দম্পতি ভারতে আসিতেছিলেন, সেই জাহাজেই হেষ্টিংস লণ্ডন হইতে মান্দ্রাজে আসিতেছিলেন। হেষ্টিংস উক্ত জাহাজে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইম্‌হফপত্নী সযত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সঞ্চার হয়। মান্দ্রাজে আসিয়া ইম্‌হফ দেখিলেন যে, সামান্য পতাকী সেনার বেতনে তাঁহার সংসার চলা অসম্ভব। সেই জন্য তিনি সেনাবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ‘তসবীর’ অঙ্কিত করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এই কার্য্যে ব্যারণ ইম্‌হফের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে হেষ্টিংস শ্রীমতী ইম্‌হফের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী ইম্‌হফ তাঁহার স্বামীর সহিত কলিকাতেই আসিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ও পরে

ইম্‌হফ ও হেষ্টিংস।

গবর্ণর জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ইহা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শুনা যায়, তাহার পর ইমৃহফ, তাঁহার পত্নী ও হেষ্টিংস তিন জনে মিলিত হইয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, শ্রীমতী তাঁহার পতির সহিত বিবাহ বন্ধন 'নাকচ' করিয়া লইবেন এবং পরে হেষ্টিংসকে বিবাহ করিবেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারণ ইমৃহফ লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। তিনি দশ হাজার পাউণ্ডের (তদানীন্তন লক্ষ টাকা) অধিক টাকা লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে ঐ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইমৃহফ পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সামান্য কোনও পল্লীতে ব্যারনেস ইমৃহফের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। সেই বিবাহচ্ছেদ-সংবাদ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে গিয়া পৌঁছে নাই। তাহার পর হেষ্টিংস সেণ্ট জন্ গীর্জ্জায় তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপার অনেকগুলি সমস্যাবিজড়িত। প্রথমতঃ তাঁহারা তিন জনই যদি পরামর্শ করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইমৃহফ তৎপরে দুই বৎসর কাল ভারতে থাকিয়া পরে বিলাতে গেলেন কেন? ঐ দুই বৎসর তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত সদ্ভাবে একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ইমৃহফ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কেন? তৃতীয়তঃ হেষ্টিংস ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইমৃহফ-ঘরণীকে বিবাহ করেন নাই কেন? চতুর্থতঃ ইমৃহফের ঔরসে হেষ্টিংস-পত্নীর অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল; এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতায় বিবাহের রেজিষ্টারীতে মিস্ আন্না মেরিয়া আপলোনীয়া চাপুসেটিন এই কুমারী অবস্থার নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছিল কেন? পঞ্চমতঃ উক্ত ইমহফের সহিত তাঁহার কবে বিবাহ হইয়াছিল?

সমস্যা ও সন্দেহ।

হেষ্টিংস হাউসের সহিত কোন কলঙ্কের কথা বিজড়িত থাকুক আর নাই থাকুক, (সার চার্লস লসন ও মিস সিডনী গ্রিয়ার উভয়েই বলেন যে, ব্যারণেস্ ইমৃহফের ব্যভিচার-কথা অলীক) উহাতে যে একটি বা একাধিক ভূত আছে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। প্রচলিত গল্পগুলির মধ্যে একটু একটু পার্থক্যও আছে। গল্পটি কৌতূহলোদ্দীপক। একটি গল্পের মর্ম্ম এইরূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেরূপ বেরুস গাড়ী প্রচলিত ছিল, সেইরূপ একখানি গাড়ী দুইটি বৃহদশ্ব কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে ঐ বাড়ীর দিকে আগমন করে। উহার উচ্চ কোচবক্সে সাবেক ধরণের সাড়ম্বর পরিচ্ছদ পরিহিত জনৈক কোচম্যান্ বসিয়া থাকে। অশ্বের ক্ষুরশব্দ গৃহের দ্বিতলবাসীরা স্পষ্টই শুনিতে পায়। গাড়ীখানি তীরবেগে আসিয়া গাড়ীবারান্দায় প্রবেশ করে। গৃহস্থিত লোকগণ উহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দ্বারদেশে আগমন করে; আসিয়া দেখে কোথাও কিছুই নাই। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দ্বারা এই গল্প সমর্থিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন।

অলৌকিক কাণ্ড।

আর একটি গল্প এইরূপ।—গাড়ী দেখা যায় না,—উহার ঘর্ঘর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া

যায়। দ্বিতলের লোকগণ একখানি গাড়ী আসিতেছে এইরূপ শব্দ শুনিতে পায়। দ্রুতগতি অশ্বের পদশব্দ ও শকটচক্রে নিষ্পিষ্ট কঙ্করের মড় মড় শব্দ স্পষ্টই শ্রুত হয়। ক্রমে অশ্বের গতি মন্দীভূত হইয়া শেষে থামিয়া যায়। বোধ হয় যেন গাড়ীখানি গাড়ীবারান্দায় নিয়ে থামিল। তখন কেবল অশ্বের দীর্ঘশ্বাস ও নাসিকাধ্বনির অনুরূপ ধ্বনি, দণ্ডায়মান অশ্বের পদাঘাতশব্দ, মস্তকসঞ্চালন-জনিত সাজের শব্দ, গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে শুনা যায়। কে আসিল দেখিবার জন্য লোক দ্বারদেশে আসিয়া দেখে কোথাও কিছুই নাই!

দ্বিতীয় কথা।

প্রথম ব্যাপারটি অপরাহ্নে ও দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভোজের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সংঘটিত হয়।

প্রবাদ, এই স্থানে একটি ভোজের আয়োজন হয়; কিন্তু কোনও ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু বা হত্যার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহার হয় নাই। কিন্তু এই বাড়ীতে এমন কোনও ঘটনা ঘটিয়াছিল, এরূপ প্রমাণ নাই। তবে কি হেষ্টিংস ও তাঁহার পত্নী আগমন করেন? অথবা যাহারা ঐ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের কেহ? ইনি কি নন্দকুমার? কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভবে না। তবে এই ভৌতিক গল্প বাড়ীটিসম্বন্ধে কৌতুহলকে বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত করে।

ব্যাপার কি?

রাধা।
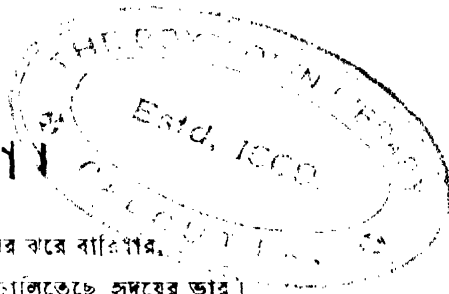
গম্ভীর বরষা-রাতি ঝর ঝর ঝরে বারিধার,
যামিনীরে মেঘমালা ঢালিতেছে হৃদয়ের ভার।
অপহৃত-চন্দ্রজ্যোতি তারাকুল দেখা নাহি যায়,
সলজ্জ আকুল আঁখি আর নাহি চাহিতে সরায়;
শুধু ঘন মেঘময় সীমাহীন অনন্ত গগন,
সান্ধ্য অন্ধকারপাতে অন্তহীন অর্ণব যেমন।
মাঝে মাঝে চপলার দীপ্তিময় আলোক চঞ্চল
আঁধার গগন-বক্ষ তুলিতেছে করিয়া উজ্জ্বল।
মাঝে মাঝে শুনি যেন জলদের স্তনিত গভীর,
নদীকূলে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে হইয়া অধীর।
সে অন্ধ অম্বরতলে অন্ধকার যমুনার জল,
কোন্ দূর সিন্ধুপানে ছুটিয়াছে করি কল কল;
বিরহান্তে মিলনের সুখ সম বর্ষাবারিরাশি,
প্লাবিয়া হৃদয় তার দুই কূলে উঠিছে উচ্ছ্বসি।
উঠিছে তরঙ্গরাশি বরষার চল সমীরণে;
শত খণ্ডে ভাঙ্গি পাড় বরষার বরষতাড়নে।
নবস্ফুট কদম্বের মৃদু বাস করিয়া বহন
বহিছে শীকর-সিক্ত বরষার তীব্র সমীরণ।
বিকচ কদম্বকুল ছড়াইছে সৌরভ বাতাসে,
বরষার বনভূমি পূর্ণ তার সুরভিনিশ্বাসে।
আঁধার বরষা-রাতি প্রাণিকুল সুষুপ্তিমগন—
শুধু জাগে কুঞ্জগৃহে রাধিকার তৃষিত নয়ন।
বিপ্রলব্ধা একাকিনী কুঞ্জগৃহে সজল নয়নে,
জাগরণশ্রান্ত আঁখি কার আশে চাহে পথপানে!
বরষার বায়ুবেগে কাঁপি' উঠে বৃক্ষপত্রচয়,
কার পদশব্দ ভাবি কাঁপি' উঠে তৃষিত হৃদয়!
বারিপাতে বনভূমে জাগি' উঠে মৃদু মর মর,
হৃদয় চমকি' উঠে ভাবি কা'র বাঁশরীর স্বর!
কোলে মালা শোভে তাহে সর্ব্ব ঋতু কুসুমের শোভা,
বিকশিত ফুল নীপ মধ্যভাগে শোভে মনোলোভা।

ব্যর্থ অভিসারসাজে বসি' একা শুধু পড়ে মনে
বিশদ কদম্বমূলে পীতাম্বর মুরলীবদনে ;
সজল জলদ অঙ্গে ক্ষণপ্রভা নেহারি' চঞ্চল,
মনে পড়ে শ্যাম-অঙ্গে পীতধড়া শোভে সমুজ্জ্বল :
শুনি' বনে বৃক্ষপত্রে পবনের মৃদু মর মর,
মনে পড়ে মাধবের মুরলীর মধুময় স্বর ;
কদম্বসৌরভভরা পবনের মৃদু পরশনে
মনে পড়ে কেশবের স্নেহভরা সাদর চুম্বনে ;
হেরি' বাতবিকম্পিত দীপশিখা নিকুঞ্জ-ভবনে
কৃষ্ণের চঞ্চল প্রেম তাই আজ পড়ে শুধু মনে।
অমলকমলদল তৃষাতুর নয়নযুগল
অশ্রুপূর্ণ : পদ্মপর্ণে শোভে যেন নিরমল জল।
ব্যথিত তৃষিত দৃষ্টি কুঞ্জদ্বারবদ্ধ দু'নয়নে,
হৃদয়ের ভাব যেন প্রকাশিত নয়ন-দর্পণে।
প্রণয়কমলকলি ফুটিয়াছে হৃদয়-সরসে
কার সে বাঞ্ছিত পদে সাধ যায় সঁপিতে হরষে।
এমনি নিষ্ঠুর সে কি লবে না এ প্রেম উপহার :
এমনি পাষাণ-হৃদি চাহিবে না ফিরি' একবার ?
ব্যর্থ অভিসারসাজে কুঞ্জগৃহে বসি একাকিনী,
এমনি কি যা'বে কাটি' বরষার বিরহ-যামিনী ?
পরাণে সুখের আলো নিবে যায় নিরাশা আঁধারে ;
পরাণে প্রেমের সুখ ডুবে যায় বিষাদ-পাথারে,
পরাণের শত আশা মিশাইয়া যায় হতাশায়,
জোছনা আলোক যথা মেঘময় বরষা-নিশায়।
হতাশায়—বেদনায়—আশঙ্কায় মলিন আনন,
মধুর বসন্ত-অন্তে তপ্ত বায়ে কুসুম যেমন।

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে বেদনায় সকরুণ স্বরে
কহিতে লাগিলা দেবী ধীরে ধীরে স্মরি' পীতাম্বরে
কমলনয়নযুগে অশ্রু বহি' অবিরল ধারে,
সিঞ্চিল সলিল যেন অঙ্কদেশে কুসুমের হারে :—
"হে প্রভু, হে বনমালি, যদুকুলনলিনীদিনেশ,
রাধায় নিদয় কেন আজি তুমি রাধার প্রাণেশ ?

গুণহীনা অবলার গুণহীন হৃদি উপহার
নিজগুণে কৃপা করি রেখেছ ও চরণে তোমার ;
কৃতার্থ হয়েছি আমি লভি' ওই রাজীব-চরণ,
আজি কেন কৃপাময় মোর প্রতি নিদয় এমন ?
ধারণা-অতীত তুমি যোগিকুলসাধনদুর্লভ,
জ্ঞানের অতীত তুমি রাধিকার পরাণ বল্লভ,
কে আমি—তোমায় পা'ব হৃষীকেশ কোন্ পুণ্যফলে,
তোমার করুণা, হরি, তাই আমি ও চরণতলে।

"তুমি কি দিয়াছ, শৌরি, স্থান মোরে তোমার চরণে
ধনী যথা অর্থ দেয় গৃহিজনারে না হেরি নয়নে ?
প্রেমপূর্ণ হৃদি মোর দেখ নাই তুমি পীতাম্বর ;
ও প্রেমপিপাসী হৃদি দেখ নাই তুমি, দামোদর ?
কুল, মান, লজ্জা, ভয় ডুবেছে যে প্রেম-পারাবারে
তুমি কি দেখনি তাহা ? তবে তুমি দেখ নি আমারে।
সে প্রেম না নেহারিয়া, দিয়া মোরে পদতলে স্থান
করিও না, হে মাধব, প্রণয়ের ঘোর অপমান।
প্রণয়ের অপমান সহিবে না হৃদয়ে রাধার,
তা' চেয়ে মরিব বরি হৃদিভরা যাতনার ভার।

"তুমি সে সকলি জান অন্তর্যামী পুরুষপ্রধান
তোমার প্রেমের লাগি' ব্যাকুল এ সেবিকার প্রাণ।
এস তুমি—তোমা তরে রচেছি এ হৃদয়-আসন,
হৃদয়ে আসিয়া, প্রভো, কর মোর সার্থক জীবন।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজে শোভে বিমোহন ;
ভক্তিজেয়, ভক্তপ্রিয়, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ ;
খঞ্জনগঞ্জন দু'টি প্রেমপূর্ণ বঙ্কিম নয়ন ;
অধরে মুরলীখেলা ভকতের নয়নরঞ্জন ;
পীতধড়া পীতাম্বর প্রেমপূর্ণ কোমল হৃদয়,
বর গলদেশ বেড়ি বনমালা শোভে শোভাময়।
ভকতবৎসল হরি, ভকতের হৃদয়রঞ্জন
তৃষিত নয়ন মোর, আজি মোরে দাও দরশন।
হের আজ একবার, প্রাণনাথ, হৃদয় রাধার
বরষা-আকাশ সম আলোহীন—অনন্ত আঁধার ;

আজি মোর দু'নয়নে ঝরিতেছে নয়ন আসার
বরষা বারিদে যথা ঝরিতেছে বারি অনিবার।
এস প্রভু, দয়াময়, কর মোর সার্থক জীবন
রাধিকার আঁখি-আলো রাধিকারে দাও দরশন।
হেরিয়া তোমায়, হরি, ঘুচিবে এ বেদনা রাধার
চন্দ্রোদয়ে ঘুচে যথা নিশীথের ঘন অন্ধকার।

"না—না কায নাই, সখা, আর আর আসিয়া হেথায়
তিমিরমগন বনে কত ব্যথা পা'বে পায় পায়!
কণ্টক-আকীর্ণ পথে, ক্ষত হ'বে রাতুল চরণ
বেদনাব্যথিত হ'লে ম্লান হ'বে কমল-আনন
তবে আজ থাক্ সখা, র'ব আমি বেদনা সহিয়া
কৃতার্থ হইবে রাধা যবে পা'বে চরণ পূজিয়া।"

বুদ্ধ গয়া।

(৩)

হিউয়েন্ সাং বলিয়াছেন, অশোক বোধিদ্রুমটি ১০ ফিট উচ্চ পাষাণ বৃতি বেষ্টিত করিয়াছিলেন। যে ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তির উপর এই বৃতি অবস্থিত ছিল তাহার পরিমাণও হিউয়েন্ সাং প্রদত্ত পরিমাণের অনুরূপ। এখনও বুদ্ধ গয়ায় প্রাচীন পাষাণবৃতির অবশেষ আছে। পূর্ব্বে এই বৃতির কতকাংশ মন্দিরপ্রাঙ্গণে ও কতকাংশ মন্দিরপার্শ্বস্থ মোহান্তের গৃহ-প্রাঙ্গণে ছিল। লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশানুসারে, সার উইলিয়ম ডিউকের ও মন্দিররক্ষক পরলোকগত শ্রীগোপাল বসু মহাশয়ের চেষ্টায় সকলগুলি সংগৃহীত ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে সংস্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ বৃতি অন্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। বৃতির স্তম্ভগাত্রে, বোধিদ্রুম, ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মচক্র, কল্পদ্রুম, বোধিদ্রুমাভিমুখগামী মাল্যবাহী দেবমূর্ত্তি, লক্ষ্মী, জেতবন, নৌকা, ভূমিকর্ষণ, প্রভৃতি চিত্র ক্ষোদিত। দুই একটি স্তম্ভে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহাও অশোকের রাজত্বকালে ব্যবহৃত লিপি।

রাজেন্দ্রলাল ও কানিংহাম উভয়েই এই বৃতি অশোকের দান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ডাক্তার ব্লক বলেন, বর্ত্তমানে বুদ্ধ গয়ায় অশোকের কোন কীর্ত্তিচিহ্নই নাই। তিনি অশোককর্ত্তৃক বোধিদ্রুমপূজা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন; এবং বলেন, বুদ্ধ গয়ার বৃতি অশোকের শতবর্ষ পরবর্ত্তী। তিনি বলেন, বৃতি-গাত্রে পঞ্চদশটার যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ সকল বৃতি মাহয়সা মাহিলা কুরঙ্গীর উপহার। দুইটি সমরূপ লিপিতে প্রকাশ ইনি ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের পত্নী। একটি বিভগ্নলিপিতে এই ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের নামও পাওয়া যায়। আর এক স্থানে লিখিত, ইহা ব্রহ্মমিত্রপত্নীর দান। ব্লকের বিশ্বাস, উত্তর ভারতে বহু তাম্র মুদ্রায় যে ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের ও ব্রহ্মমিত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে—ইঁহারা সেই ইন্দ্রাগ্নিমিত্র ও ব্রহ্মমিত্র। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধ গয়ার বৃতি অশোকের শতবর্ষপরবর্ত্তী।

এই সকল লিপিই কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। তিনিও এই সকল লিপি-সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বৃতি অশোকের উপহার। কুরঙ্গীর অর্থ কুরঙ্গ নয়না। পালি সাহিত্যে কুরঙ্গী মৃগজাতকও আছে। সারী-পুত্রের জননীর নয়ন সারীর নয়নের মত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম সারিকা হইয়াছিল।* কানিংহাম লিপির অক্ষরের আকারে নির্ভর করিয়া বলিয়া-ছিলেন, বৃতি অশোকের সময়ের। ডাক্তার ব্লক সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। বৃতির লিপিতে উল্লেখিত ব্রহ্মমিত্র ও ইন্দ্রাগ্নিমিত্রই যে মুদ্রাঙ্কিতনাম ব্রহ্মমিত্র ও ইন্দ্রাগ্নিমিত্র, তাহাও তিনি প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় পর্য্যাপ্ত প্রমাণে পূর্ব্বপ্রচলিত মত খণ্ডিত না হইলে আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারি না। মিষ্টার মার্সাল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর 'জার্ণালে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডাক্তার ব্লকের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পূর্ব্বমত পরিহারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যে স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধানও করেন নাই—ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের স্থানে ইন্দ্রমিত্র লিখাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভিনসেণ্ট স্মিথও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কোন কারণদর্শন প্রয়োজন মনে করেন নাই!

হুউয়েন্থ সাং বলিয়াছেন, বুদ্ধ গয়ায় অশোক একটি ক্ষুদ্র বিহার নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন (খৃঃ পূঃ ২৩০—৪১); তাহার পর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে কোন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়।

* কানিংহাম বলেন, ভ্রাতৃজায়া জীবার কন্যা কুরঙ্গী।

সিংহাসনারোহণকালে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; পরন্তু তাঁহার স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কথা বলার অপরাধে তিনি স্বহস্তে পঞ্চশত মন্ত্রীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। একদিন পুরাঙ্গনারা তাঁহার শ্রীহীনতায় বিদ্রূপ করিয়া উপবনস্থ অশোকতরুর পত্র ছিন্ন করিলে তিনি পঞ্চশত রমণীকে দগ্ধ করাইয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মতের প্রচারকার্য্যে অকাতরে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উপগুপ্তের সহিত বুদ্ধের স্মৃতিপূত স্থানগুলিতে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। লুম্বিনী উদ্যানে ১০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া ও স্তূপনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া তিনি কপিলবস্তু হইয়া বুদ্ধ গয়ায় আগমন করেন এবং তথায় ১০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন ও চৈত্যনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই মন্দিরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বরহুতের ভগ্নস্তূপে অশোকের এই মন্দিরের দুইটি প্রতিকৃতি ক্ষোদিত আছে; উভয়েরই পশ্চাতে বোধিদ্রুম দণ্ডায়মান। একটিতে লিখিত আছে—"ভবগতো শক মুনিনো বোধি"। চিত্রে দেখা যায়, এই মন্দিরের ছাদ স্তম্ভোপরি অবস্থিত; মন্দিরের মধ্যস্থলে বজ্রাসন; বজ্রাসনের পশ্চাতে বোধিদ্রুমের কাণ্ড দৃষ্ট হইতেছে; দ্রুমের দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ স্তম্ভোপরি ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মচক্র; বজ্রাসন-গৃহের দুই পার্শ্বে দুইটি কক্ষ। বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কারকালে যখন হর্ম্ম্যতল খনিত হয় তখন দেখা যায়, বর্ত্তমান আসনের পশ্চাতে আর একখানি আসন বর্ত্তমান। তাহার পশ্চাতে আর একখানি আসন দৃষ্ট হয়। এই আসন বর্ত্তমান মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে—ইহা মন্দিরের উত্তর প্রাচীর হইতে ৩৯ ইঞ্চ ও দক্ষিণ প্রাচীর হইতে ২০ ইঞ্চ দূরবর্ত্তী। কানিংহাম অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির অবশেষ পাইয়াছিলেন। তাহার সহিত বরহুতে ক্ষোদিত মন্দিরের সাদৃশ্যে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

বুদ্ধ গয়ার বর্ত্তমান মন্দির কত দিনের তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে বিশেষ মতান্তর লক্ষিত হয়। চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিউয়েন্ত সাংএর বর্ণনাই বিস্তৃত।—তিনি মন্দিরের যে বর্ণনা ও পরিমাণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি বর্ত্তমান মন্দিরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘকালে মন্দির বহু বার সংস্কৃত হইয়াছে এবং সংস্কারে পরিবর্ত্তনও যে না হইয়াছে এমন নহে।

কানিংহামের বিশ্বাস খৃষ্টীয় ৩০০ বা ৪০০ বৎসর হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ফাগুর্সন যে বলিয়াছেন ব্রহ্মদেশীয়গণ উহা পুনর্গঠিত করে, তাহা প্রামাণ্য নহে। লিপিতে দেখা যায়, তাহারা মন্দিরের সংস্কারমাত্র করিয়াছিল।

ফাগুর্সন প্রথমে বলেন, বর্ত্তমান মন্দির খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।* পরে তিনি ঐ মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন, বহুবিধ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বর্ত্তমান মন্দির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত নবতল মন্দিরের আদর্শ। বোধ হয় চীন প্রভৃতি দেশের নয় তল মন্দির ইহারই আদর্শে গঠিত।× ফাগুর্সনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই সত্য; কিন্তু রিজ ডেভিডস্ সত্যই বলিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়াও ভারতীয় শিল্পীদিগের কীর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁহার চেষ্টা অসাধ্যসাধনচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দুই এক স্থানে ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এ স্থলে তিনি যে প্রমাণে নির্ভর করিয়া মন্দিরটিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়াছিলেন,সে প্রমাণ বিশেষ বিচারের ফলে কানিংহাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সংপ্রতি মিষ্টার বার্জ্জেস ফাগুর্সনের প্রসিদ্ধ পুস্তকের যে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতেও পূর্ব্বমত পরিত্যক্ত হয় নাই।

যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কানিংহাম এই মন্দিরটিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বুদ্ধ গয়ায় প্রাপ্ত ৯৪৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে উল্লেখিত আছে, এই মন্দির অমরদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই অমরদেব বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের অন্যতম এবং বিখ্যাত 'অমর কোষ' অভিধান প্রণেতা। ইনি বরাহমিহির ও কালিদাসের সমসাময়িক; সুতরাং প্রায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এই শিলালিপিতে প্রকাশ, অমরদেব বুদ্ধ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই গল্পের সহিত হিউয়েন্থ সাং লিখিত গল্পের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। দুই বিবরণেই প্রকাশ, দেবাদেশে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হয়। কেবল হিউয়েন্থ সাং দেবতাকে মহাদেব বলিয়াছেন, আর শিলালিপিতে বুদ্ধেরই উল্লেখ আছে।

---

* J. A. S. B. Vol III.

× *Indian and Eastern Architecture.*

কিন্তু এ লিপির কথায় আর বিশ্বাস সংস্থাপনের উপায় নাই।

হিউয়েন্থ সাং বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের কথায় বলিয়াছেন ;—"বোধি-দ্রুমের পূর্ব্বদিকে একটি বিহার বিদ্যমান। উহা ১৬০ হইতে ১৭০ ফিট উচ্চ ;—উহার তলদেশ ২০ পাদ (৫০ ফিট) হইবে। এই বিহার নীলাভ ইষ্টকে গঠিত এবং প্রলেপাস্তৃত। ইহাতে স্তরে স্তরে কুলঙ্গী আছে। প্রতি কুলঙ্গীতে বুদ্ধের স্বর্ণরঞ্জিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত। চারি দিকে প্রাচীর সুন্দর স্থাপত্যকার্য্যে, মুক্তামালো ও ঋষিদিগের মূর্ত্তিতে শোভিত। চূড়ায় স্বর্ণ-রঞ্জিত তাম্রনির্ম্মিত আমলক ফল। পরে ইহার পূর্ব্বদিকে (বা সম্মুখে) একটি দ্বিতল মণ্ডপ গঠিত হইয়াছিল। মন্দির মুক্তারত্নখচিত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারে শোভিত। বহির্দ্বারের দক্ষিণে ও বামে দুইটি বৃহৎ কুলঙ্গী—দক্ষিণে অবলোকিতেশ্বরের ও বামে মৈত্রেয়র মূর্ত্তি। মূর্ত্তিদ্বয় রৌপ্যনির্ম্মিত ও প্রায় ১০ ফিট উচ্চ।"

এই বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান মন্দিরের বর্ণনার সাদৃশ্য এমনই সুস্পষ্ট যে, হিউয়েন্থ সাং যে বর্ত্তমান মন্দিরই দেখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাদৃশ্যের বিশেষ বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) বর্ত্তমান মন্দিরের আকার হিউয়েন্থ সাং বর্ণিত মন্দিরের আকারের সমান। ইহারও ভিত্তি ৪৮ ফিট, উচ্চতা ১৬০ হইতে ১৭০ ফিট। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভগ্ন অবস্থায় ইহা ১৬০ ফিট উচ্চ ছিল ; এক্ষণে, সংস্কারের পর, ১৭০ ফিটের কিছু অধিক হইয়াছে।

(২) বর্ত্তমান মন্দির নীলাভ ইষ্টকনির্ম্মিত ও প্রলেপাস্তৃত।

(৩) বর্ত্তমান মন্দিরের চারি দিকে স্তরে স্তরে কুলঙ্গী আছে। পূর্ব্বে এই সকল কুলঙ্গীতে বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল। কানিংহাম যখন প্রথম মন্দির দেখিয়াছিলেন তখন তিনটি মাত্র মূর্ত্তি ছিল।

(৪) পূর্ব্বদিকে প্রবেশ-মণ্ডপ যে পরে নির্ম্মিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার ইষ্টকের সংস্থাপনরীতি মন্দিরের ইষ্টকের সংস্থাপনরীতি হইতে স্বতন্ত্র।

পরবর্ত্তীকালে গঠিত পোস্তগুলিতে মন্দিরের প্রাচীর আবৃত হইয়াছিল। সেগুলি অপসৃত হইলে হিউয়েন্থ সাং বর্ণিত মন্দিরের সহিত বর্ত্তমান মন্দিরের সাদৃশ্য সপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

হিউয়েন্থসাং আরও বলিয়াছেন, নালন্দার বালাদিত্য মন্দির বুদ্ধ গয়ার

বুদ্ধগয়ায় অশোকের মন্দির
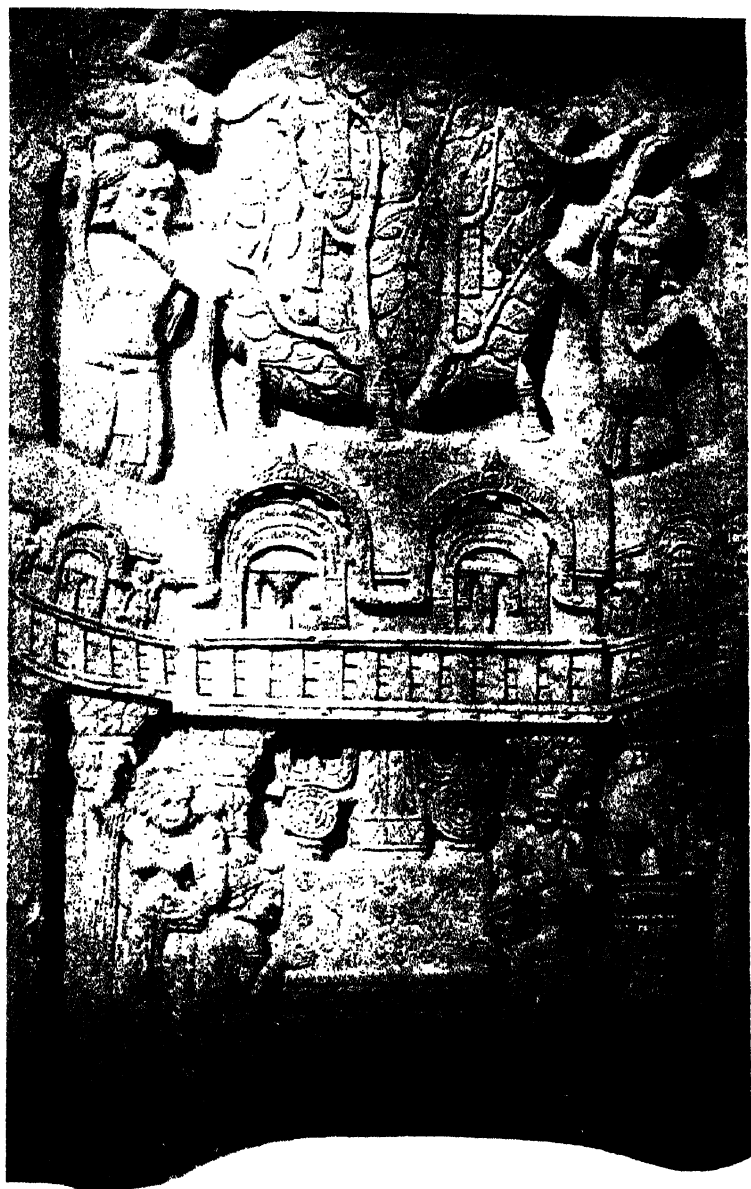
মন্দিরের অনুরূপ ছিল। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিম্নাংশ (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) এখনও বিদ্যমান, সুতরাং দুই মন্দিরে তুলনার সুবিধা আছে। বাস্তবিক দুই মন্দিরের গঠনরীতিগত সাদৃশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হিউয়েন্থ সাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়,—নালন্দার মন্দিরের উচ্চতা ৩০০ ফিট; কিন্তু তাঁহার জীবনীতে লিখিত আছে, উহার উচ্চতা ২০০ ফিট। নালন্দার মন্দিরের তলদেশ ৬৩ ফিট ও বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের তলদেশ ৪৮ ফিট। উভয় মন্দিরের গঠনরীতি এক প্রকারের হইলে বুদ্ধ গয়ার মন্দির যখন ১৬০ বা ১৭০ ফিট উচ্চ, তখন নালন্দার মন্দির ২০০ ফিট উচ্চ হওয়াই সম্ভব।

এই সকল কারণে মনে হয়, ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্থ সাং যে মন্দির দেখিয়াছিলেন, বুদ্ধ গয়ায় অদ্যাপি সেই মন্দিরই বিদ্যমান এবং বৃটিশ গভর্মেণ্ট প্রায় ২০০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তাহারই সংস্কার করাইয়াছেন।

কিন্তু এই মন্দির যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে গঠিত তাহার প্রমাণ কি? মন্দির যদি সত্য সত্যই অমরদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত তবে হিউয়েন্থ সাংএর আগমনকালে তাহা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইত না এবং তাহার নির্ম্মাতার নামও হয়ত উল্লিখিত হইত। হিউয়েন্থ সাংএর বর্ণনায় মনে হয়, মন্দির তখন বহুদিনের।

মন্দিরের সংস্কারকালে কানিংহাম একটি মৃৎপিণ্ড পাইয়াছিলেন। সেই পিণ্ডমধ্যে যে সকল দ্রব্য দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর এবং স্বর্ণে হুবিষ্কের মুদ্রার ছাপ খৃষ্টীয় ১২০ হইতে ১৬০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কালের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সময়েই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিতর দক্ষিণ দ্বারের নিকটস্থ একটি ভগ্ন মন্দিরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তির বেদী পাওয়া গিয়াছে। সেখানে যে লিপি আছে তাহার অক্ষর ও ভাস্করকার্য্য গুপ্ত-কালীন। ইহা ৬৪ সম্বতের। সুতরাং ইহা যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কানিংহামের গণনায় এই বৎসর খৃষ্টীয় ১২২। এই সময় হুবিষ্ক রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সময় হুবিষ্কের অর্থসাহায্যে বুদ্ধ গয়ার বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়।

ইহার পর মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বুদ্ধ

গয়ায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত মন্দিরই দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারতে এরূপ প্রাচীন মন্দির আর নাই।

বুদ্ধ গয়ায় কেবল স্থাপত্যনিদর্শন নহে, পরন্তু ভাস্করকার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃতিগাত্রে ও মন্দিরগাত্রে ভাস্করকার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাস্তবিক বুদ্ধ গয়ার বিরাট মন্দির বিবিধ ভাস্করকার্য্যে পূর্ণ। এই সকল ভাস্করকার্য্যে শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ভাস্করকার্য্য লইয়া অভিজ্ঞদিগের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। চারিটি অশ্বসংযুক্ত রথে আসীন মূর্ত্তি—সঙ্গে দুইজন ধনুর্ধারী। কানিংহাম বলেন, ইহা সূর্য্যমূর্ত্তি। হিন্দুমতে সূর্য্যের রথ সপ্তাশ্বসংযুক্ত। বেদেও ইহাই দেখা যায়; আর সর্ব্বত্র শিল্পনিদর্শনে সপ্তাশ্বরথই দেখা যায়। অতএব এই মূর্ত্তি গ্রীকপ্রভাবের পরিচায়ক। রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করিয়াছেন, এ মূর্ত্তি সূর্য্যের নহে। বিস্ময়ের বিষয়, সংপ্রতি মিষ্টার মার্শালও কোনরূপ যুক্তি না দেখাইয়া কানিংহামের মতেরই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

কানিংহাম যথার্থই বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পে বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের তুলনা নাই। এই মন্দিরে ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। বরহতের ভাস্করকীর্ত্তি সুঙ্গদিগের সময়ের; কিন্তু বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে অশোকের সময়ের শিল্প-নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কানিংহাম দেখাইয়াছেন, জরাসন্ধের বৈঠকে বুদ্ধের সমসাময়িক প্রস্তর স্থাপত্যের নিদর্শন বর্ত্তমান। আর এত দিনও যে উহা বিদ্যমান আছে তাহাতেই পুরাতন ভারতীয় শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য সপ্রকাশ। রিজ ডেভিড্‌স বলিয়াছেন, গিরিব্রজে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাচীরের অবশেষ দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের সহিত এ সকলের তুলনা হয় না। উভয় স্থানেই প্রস্তরগুলি সুপরিষ্কৃত নহে। আর বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকটিত হইয়াছে তাহা আজও জগতের সর্ব্বস্থানের শিল্পসমালোচকের বিস্ময় উৎপাদিত করিতেছে।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানের ফলে এই মন্দিরে প্রাপ্ত উপাদান হইতে ভারতীয় শিল্পের বহু সমস্যার সমাধান হইবে।

উপাসনা।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—ইহা উপাসনারাজ্যের এ একটি গূঢ় কথা। যাহার মন দুর্ব্বল ঈশ্বর তাহার লভ্য নহেন। উন্নত হইতে হইলে আপনাকে একটা উচ্চ আদর্শের নিকটে লইতে হয়। ঈশ্বর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। প্রথমতঃ আমরা জগৎ-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই যে বিটপী-সমাচ্ছন্ন শ্যামল উদ্যান, নক্ষত্রখচিত নীলাম্বর, তরঙ্গতাড়িত তটিনী, উন্নতকায় গিরিশ্রেণী, এগুলি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে একটু ভাবের আবেশ হয়। এইগুলি কি, কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে সকলেই সেই চিন্তা করিয়া থাকে। সকলের চিন্তা একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলেও একটি ভাব প্রত্যেক উপাসকের সাধারণ সম্পত্তি; তাহা দর্শকের বিস্ময়। এই বিস্ময়ের কারণ চিন্তা করিয়া আমরা ইহাই পাই, প্রকৃতিরাজ্যে কতকগুলি দুরধিগম্য বিষয় আছে। যাঁহারা উহা তত্ত্বতঃ দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়,—এই রহস্যময়ী প্রকৃতিকে তত্ত্বতঃ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হওয়ার নামই উপাসনা।

সুনীল অম্বরে যখন নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া জ্বলিতে থাকে, চন্দ্রের অমল ধবল কিরণ পৃথিবীর গাত্রে পড়িয়া হাসিতে থাকে, তখন উহাদের দিকে চাহিয়া কি আমরা বিস্মিত হই না? প্রথম বিস্ময়ের কারণ, চন্দ্রের প্রভাময়ী শক্তি, দ্বিতীয় বিস্ময়ের কারণ স্রষ্টার শিল্পচাতুর্য্য। চন্দ্র যদি আমার অপেক্ষা সুন্দর, বৃহৎ, দীপ্তিশালী না হইত, তাহা হইলে কি সে আমার এত বিস্ময়ের কারণ হইত?—কখনই নহে। আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সে আমার বিস্ময়ের পাত্র। যখন এই বিস্ময় স্থিরতর হইয়া উঠে, তখন চন্দ্র আমার উপাস্য। এইরূপে জগতের যাবতীয় সুন্দর, বৃহৎ, পদার্থ কোন না কোন সময় মনুষ্যের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, মনুষ্যমণ্ডলীও উহাদের উপাসনা করিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, চন্দ্র, সূর্য্য, বসুন্ধরা, পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতি বিরাট পদার্থগুলি কোন এক সময় ভারতের লোকের উপাস্য ছিল—এখনও আছে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ নহে।

মনুষ্যের সঙ্গে উহারা সমধর্ম্মী নহে বলিয়া মানুষ চিরকাল উহাদের উপাসনায় পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। উপাস্যের বিরাট ভাব স্তম্ভিত

করে বলিয়াই উপাসক উপাসনাদ্বারা তাঁহার ন্যায় বিরাট হইবার কল্পনা করে।

প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটি দিক আছে, একটি ভিতর, অপরটি বাহির। যে এই দুইটি দিকের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত দর্শক। উপাসক উপাস্যের এই দুইটি দিক দর্শন না করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। কেবল পরিতৃপ্ত নহে, উপাস্যের নিকট হইতে উপাসক মনোরাজ্যের উন্নতির জন্য যে উপদেশ চাহেন. উহা উপাস্যের কেবল বহির্ভাগ দর্শনে লাভ করিতে পারেন না। উপাস্যের সঙ্গে উপাসকের হৃদয়ের বিনিময় থাকা প্রয়োজন। যে উপাসনায় তাহা হয় না, সে উপাসনা অসম্পূর্ণ। এই জন্য জড়ের উপাসনা অসম্পূর্ণ। হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, সাগরের ন্যায় শক্তিশালী অথচ ভাব-রাজ্যের যে সর্ব্বসুখাবহ—রাজরাজ্যেশ্বর যাঁহার সঙ্গে আমার মনের বিনিময় চলে, এমন যদি কেহ থাকেন, তিনি আমার উপাস্য।

মনুষ্য যতই ইন্দ্রিয়-রাজ্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিবে, ততই উপাস্যের দৈহিক সৌন্দর্য্যের পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া উহার ভাবের পিপাসা প্রবল হইবে,এবং ততই সে জড়ের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একধর্ম্মী শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপাসনার আকিঞ্চন করিবে। মনুষ্যই যদি মনুষ্যের প্রকৃত উপাসক হয়, তবে কোন্ প্রকার মনুষ্যের উপাসনা করিলে আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক হইতে পারে? মনুষ্যের ভিতর যাহারা মুক্ত পুরুষ তাহারাই আদর্শ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির দুইটি পথ; একটিকে দেবযান ও অপরটিকে ধূমযান কহে। যাঁহারা দেবযান ধরিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা আর পুনরাবর্ত্তন করেন না, আর যাঁহারা ধূমযান অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে উপাসকের জন্য এই দুইটি পথ স্থিরীকৃত রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানান্বেষণ করিয়া উপাসক দেবযান প্রাপ্ত হয়েন, আর ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যাদি-দ্বারা উপাসক ধূমযান প্রাপ্ত হয়েন। এই দেবযান ও ধূমযানের কথা গীতা ও প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়, বেদান্তেও ইহাদের উল্লেখ আছে।

যখন কোন উপাসকই ব্রহ্ম প্রাপ্তির পর পুনরাবর্ত্তন করিতে চাহেন

না, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে সাম্যতা লাভ করিয়া চিরকাল যাহাতে সেই ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তজ্জন্য ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল উপাসকের কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের অনেক পন্থা আছে। তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ প্রশস্ত। ঈশ্বর জ্ঞানময় সুতরাং তাঁহার গুণগুলির আলোচনা করিতে হইলে সাধককে জ্ঞানার্জ্জন করিতেই হইবে। এই জ্ঞান দ্বিবিধ—পরা ও অপরা। পরাবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান, অপরাবিদ্যা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভে এই দুইটি বিদ্যাই সাহায্য করে। তাঁহার স্বরূপত্ব ঐ দুই বিদ্যার সাহায্যে ধারণা করিতে পারিলে তৎপ্রতি সাধকের ভক্তি জন্মিয়া থাকে। এই ভক্তি যে সময় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ভক্ত তখন উপাস্যকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি ও কর্ম্মের এত নৈকট্য সম্বন্ধ আছে যে, জ্ঞান হারাইলে ভক্তি স্থায়ী হয় না, ভক্তি হারাইলে কাহার তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিবে? এই জন্য উপাসনাপথে জ্ঞান সর্ব্বদাই কার্য্যোপযোগী। উহার নূতনতায় সাধনের অন্তরায় হয়।

জ্ঞানের ফলে যখন ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন ভক্তি অচলা রাখিবার জন্য সাধকের সর্ব্বদা উন্নত হইবার প্রবল বাসনা থাকা চাহি। যে সর্ব্বদা নীচ থাকিতে চাহে, সে কদাপি উন্নত আদর্শের ধারণা করিতে পারে না।

উপাস্য সাকার হইলে তিনটি বিভাগের প্রতি সাধকের দৃষ্টি রাখিলেই চলে। যথা শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক। উপাস্য বলবান হইলে দুর্ব্বল তাহার উপাসনায় আনন্দ পায় না। তদ্রূপ উপাস্য সংযমী হইলে অসংযমী তাহার উপাসনায় স্ফূর্ত্তি পায় না। কেবল ইহাই নহে, উপাস্য যদি সহস্র প্রলোভনজয়ী বীর হয়েন, তাহা হইলে সেই সংযমী পুরুষ তাঁহার বীরত্বে—আনন্দিত হইতে পারেন যে, অন্ততঃ একটি প্রলোভন জয় করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে পরিয়াছেন। স্থূল কথা, উপাস্যকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে সব বিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ সেই সব বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করা চাহি। অনেকে বলেন, উপাসনার সময় উপাস্যের নিকট প্রার্থনা করিলে উপাসক ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে পারেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় পূর্ব্বের প্রার্থনাগুলি স্মরণ করিয়া

উন্নতির ও অবনতির পরিমাণ করিয়া লওয়া উচিত। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উপাসক যদি তদনুযায়ী সৎ হইতে আন্তরিক চেষ্টা না করেন, ভগবান তাহা হইলে সে প্রার্থনা শ্রবণ করেন না। দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা আন্তরিক ও ক্রমোন্নতিবিধায়ক হওয়া চাহি। উপাসনার এগুলি অঙ্গ হইলেও পূর্ণাঙ্গ নহে। এইরূপ উপাসনার নিয়ম অবলম্বনে উপাস্যের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, নিজের উন্নতি হয়, কিন্তু উপাস্য সাক্ষাৎ হয়েন না। উপাস্যকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে হয়। এই যোগসাধন ভিন্ন কেহই চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হয়েন না। কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তৎ সম্বন্ধে কঠোপনিষদ বলিতেছেন, যচ্ছেদ্বাঙ্‌ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেদ্জ্ঞান আত্মনি জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবাত্মাতে সংযত করিবেন, এবং ইহাকে শান্ত অর্থাৎ সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাতে সংযত করিবেন।

এইরূপে যখন মন বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া উপাস্যের প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখনই ধ্যানের অবস্থা। এই ধ্যান তৈলধারার ন্যায় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রবাহমান থাকা চাহি। এই অবস্থা দুই এক দিনের সাধনায় হয় না, ক্রমশঃ এই অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য সাধনা করিতে হয়। এই অবস্থায় উন্নীত হইলে চতুর্ব্বেদ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি গহন বিষয়গুলিও অবোধ্য থাকে না। এই জন্য ধ্যান অপরা ও পরাবিদ্যার মূল। একমাত্র যোগী ইহার সাহায্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারেন। বিষয় হইতে মনকে ভগবৎ রাজ্যে লইবার জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন, আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে লাগাম বলিয়া জান। কিরূপ স্থানে বসিয়া কিরূপ ভাবে ধ্যান করিতে হইবে, উহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

গীতায় এই যোগের স্থান উচ্চতম। যোগের চরম উপদেশ এই—

আমাতে মন অর্পিত কর, আমাকে যাজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর, এইরূপ যোগ করিলে আমাতে মিলিত হইবে। যোগের ইহা সার উপদেশ, উপাসনারও ইহা চূড়ান্ত কথা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

জীবন-বৈচিত্র্য।

প্রেম।

(২)

প্রেম হৃদয় দিয়া দেখে বলিয়া রূপের অপেক্ষা কোমল হৃদয়ের অধিক পক্ষপাতী। সে কুলমর্য্যাদার পরিবর্ত্তে প্রীতি-প্রবণ অন্তঃকরণ অন্বেষণ করে এবং যথায় এরূপ অন্তঃকরণ দেখিতে না পায় তথায় রূপের হাটবাজার বসিলেও সে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। ডেস্‌ডিমোনা বলিয়াছিলেন, "আমি ওথেলোর মুখশ্রী তাঁহার মানস-পটে দেখিয়াছিলাম।" একজন প্রেমিক কবি বলেন, "যে চক্ষু আমার প্রতি প্রেম-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে আমি তাহাতে কোনও জ্যোতি দেখিতে পাই না।" এ কথা প্রেমিকমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। প্রেমিক নিজ প্রণয়িনীর নয়নে যে হৃদয়হারী প্রেমালোক দেখিতে পায়েন তাহা অন্য কোনও সুন্দরীর চক্ষুতে দেখিতে পায়েন না বলিয়া তাহাদের রূপ তাঁহার নজরে লাগে না। এইজন্য নারী মাত্রেই তাহার প্রণয়ীর নয়নে স্বর্গের দেবী এবং অপরের নিকট নারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোক বলে যে, বিবাহকালে বর ও বধূর দেহে হর গৌরীর আবির্ভাব হয়; এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

প্রেম হৃদয় দিয়া শুধু দেখে না, শুনেও হৃদয় দিয়া; এই জন্য প্রেমের শ্রবণ-শক্তি নিরতিশয় তীক্ষ্ণ। তোমার জীবিতেশ্বরী যতই মৃদুপাদবিক্ষেপে তোমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করুন না কেন, তোমার হৃদয় তাঁহার সেই নিঃশব্দকল্প পদসঞ্চার শুনিতে পায়। তিনিও সংসারের যে কোনও কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকুন না কেন, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাগ্রে তোমার যানের শব্দ শুনিতে পায় এবং তখন তিনি তোমায় দর্শনোন্মুখী হইয়া বাতায়নের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায়েন। একজন তরুণবয়স্ক সাহিত্য-সেবক অর্থাভাব বশতঃ তাঁহার স্বল্পায়তন শয়নকক্ষেই সাহিত্য-সেবা করিতেন। তাঁহার তরুণী সহধর্ম্মিণীকে সাংসারিক নানাকার্য্যব্যপদেশে ঐ গৃহে দণ্ডে দণ্ডে যাতায়াত করিতে হইত; পাছে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে স্বামীর স্বাস্থ্যনাশ হয় এই উৎকণ্ঠাও যে তাঁহার আনাগোনার একটি মুখ্য কারণ ছিল না তাহা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, পাছে স্বামীর লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তিনি

প্রবেশনিষ্ক্রমণক্রিয়া রুদ্ধশ্বাসে ও নিঃশব্দপদসঞ্চারে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার কর্ম্মগতচিত্ত স্বামীর হৃদয়ের অগোচর থাকিত না। তিনি যতক্ষণ ঐ গৃহে উপস্থিত থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার স্বামীর লেখনী কি এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে বিদ্যুদ্বেগে চলিত এবং নব নব ভাব লিপিবদ্ধ করিত। জগতের সাহিত্য প্রেমের এইরূপ অতর্কিত সাহায্যে কত বাড়িয়া যায় কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দুইটি প্রেমিক হৃদয় পরস্পরকে একটি মাত্র বিলোল কটাক্ষ বা মৃদু স্মিতের তারযোগে কি সুস্পষ্ট সংবাদ প্রেরণ করে! যিনি এরূপ সংবাদ কখনও পাইয়াছেন তাঁহাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমি যাহাকে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বলিয়া পূর্ব্বে অভিহিত করিয়াছি তাহারই চলিত নাম গুণ। প্রেমবিহঙ্গ রূপের ফাঁদে ধরা পড়িলেও কেবল গুণের পিঞ্জরে জন্মের মত বন্দী হয়। জোয়ারের জলের ন্যায় রূপ ও যৌবন দেখিতে দেখিতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রূপ যতই কালক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, গুণ ততই আরও বদ্ধমূল হয়। কাল নারীর দেহ হইতে যে সৌন্দর্য্য অপহরণ করে তাহা উঁহার হৃদয়পুটে অকাতরে ঢালিয়া দেয়। বিবাহের দিন স্মরণ করিলে কাহার না আনন্দ হয়? আহা সেই ব্রীড়াবনতমুখী বালিকাটির সুখ দুঃখ যখন জন্মের মত আমার হস্তে ন্যস্ত হইল, তখন শুভ-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কি এক বর্ণনাতীত মমতার উদয় হইল! কিন্তু তখন তাহার গুণের কোনও পরিচয় পাই নাই। বহুদিন একত্র সহবাস না করিলে সে পরিচয় কখনই লাভ করা যায় না। এই জন্য নবোঢ়া যতই আদরের হউক না কেন, সে সম্যক পরিচিতা পত্নীর ন্যায় কখনই স্বামীর হৃদয়ের হৃদয় ও প্রাণের প্রাণ হয় না।

এ দেশের বিবাহপ্রথা পাশ্চাত্য পরিণয়প্রথা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। আমরা যেমন বিনা নির্ব্বাচনে পিতা, মাতা, সোদর, সোদরা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ লাভ করি এবং প্রকৃতির অনতিক্রম্য বিধানে তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিখি, সেইরূপ বিনা নির্ব্বাচনে স্ত্রীলাভ করি ও অল্প বয়স হইতেই তাহাকে ভালবাসিতে শিখি। স্ত্রী-নির্ব্বাচনে আমাদের নিজের হাত থাকে না বটে; কিন্তু আমাদের কোনও বিশেষ হিতৈষী গুরুজন প্রায় ঐ ভার গ্রহণ করেন। আমি সমাজ-সংস্কারকের উচ্চ আসন গ্রহণেচ্ছু নহি এবং আমাদের বর্ত্তমান বিবাহপ্রথার দোষ গুণ বিচার এই প্রবন্ধের

উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি এই দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, যদিও আমরা স্বয়ম্বর প্রথার কবিত্বে বঞ্চিত; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের বিবাহিত জীবনের সুখ মোটের মাথায় পাশ্চাত্য পরিণীত জীবনের সুখাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, এবং বাল্যবিবাহ যতই দোষাবহ হউক না কেন, উহার দ্বারা দুইটি চিত্তের একীকরণ যত সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এমন আর কিছুতেই নহে। নদী যেমন সমুদ্রে পড়িলেই সমুদ্রের স্বভাব পায়, সেইরূপ বালিকার তরল হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত অতি সহজ ও সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। প্রেমের প্রথম সঞ্চার কি মধুর! একটি দীর্ঘনিশ্বাস উহার প্রধান পরিচায়ক, সুতরাং উহাতে যে যাতনা নাই, তাহাও বলিতে পারি না। একটি সরল-হৃদয়া বালিকা একবার বিশেষ পীড়াপীড়িতে স্বীকার করিয়াছিল যে, বিবাহের অল্পদিন পরে সে তাহার স্বামীর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার স্বামীর জন্য তাহার "মন কেমন" করিয়াছিল। ঐ বালিকাটি নিশ্চয়ই নবোদিত প্রেমের যাতনাময় সুখ অনুভব করিয়াছিল। কিশোরীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে প্রেম একটি ক্ষীণ দীপশিখারূপে উদিত হয় তাহাই আবার যুবতীর হৃদয়ে জ্বালামুখীরূপে প্রকাশ পায়। প্রেমের বিকাশ দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীদ্বারা ক্রমশঃ সংসাধিত হয়। দাম্পত্যজীবনের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখি, একটি যুবক ও একটি যুবতী প্রেমে আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে। তাহাদের মুখ দেখিলেই বোধ হয়, তাহারা কল্পনা-রাজ্যের প্রজা, সংসারের সুখদুঃখে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। কয়েক বৎসর পরে দেখি, তাহারা আর কেবল পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া নাই; দুই জনে একটি পরম সুন্দর শিশুকে আদর করিতেছে, বারম্বার উহার মুখচুম্বন করিতেছে এবং উহাকে ক্রমান্বয়ে একজনের ক্রোড় হইতে অপরের অঙ্কগত করিতেছে। কিন্তু দুইজনের মুখ দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, এই নূতন জীবটি উহাদের প্রেমে ভাগ বসাইয়া তাহাকে শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে এবং উহারা এখন সমসুখে সুখী হইয়া পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। আর কয়েক বৎসর পরে দেখি, সেই শিশুটি আর নাই, এবং তাহার বিয়োগে উভয়ে কাতর নয়নে পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহারা দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে যেমন দুইটি মাত্র ছিল এখন আবার তেমনই; কিন্তু জীবনের সুখদুঃখ সমভাবে

ভোগ করিয়া তাহাদের যুগল হৃদয়ের বন্ধন এখন কত দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহাদের প্রেম কত ঘনীভূত হইয়াছে! দাম্পত্য প্রেম কৃত্রিম পুষ্পের ন্যায় "গ্ল্যাসকেসে" সংরক্ষিত হইবার বস্তু নহে। উহা নিত্য "ঘর সরিবার" জিনিস। উহা যেমন জীবন-সংগ্রামের প্রধান সহায়, সেইরূপ উহা জীবনের সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া না যাইলে পরিপুষ্ট ও বলীয়ান্ হয় না। আমরা যেমন প্রথম বয়সে প্রেম-পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হই, সেইরূপ মধ্য বয়সে প্রেমের পরিণত ফল ভোগ করি এবং মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া শেষ বয়সের সম্বল করি।

প্রথম যৌবনে প্রেমের সহিত রূপজ মোহ মিশ্রিত হইয়া প্রেমের শুভ্র জ্যোতিকে বিবিধ রমণীয় বর্ণে রঞ্জিত করে। এ বয়সের প্রেম সেই জন্য অতীব মনোরম তাহাতে সন্দেহ নাই এবং উহার স্মৃতি কোনও কালে বিলুপ্ত হয় না। দম্পতী নিবিড় আলিঙ্গনে পরস্পরের হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটি পর্য্যন্ত শুনিতে পায়েন ও অনুভব করেন, পরস্পরকে দেখিয়া ও পরস্পরের কথা শুনিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করেন না এবং তিলেক বিচ্ছেদ ঘটিলে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়েন। কিন্তু মধ্য বয়সে হৃদয়ের যেরূপ পরিণতি হয় যৌবনে কদাপি সেরূপ হয় না। এই বয়সে রূপজ মোহের ঘোরও কাটিয়া যায়। সুদীর্ঘ পরিচয়ে হৃদয়ের আবরণগুলিও একে একে খসিয়া পড়ে এবং প্রেম স্নেহসারে পরিণত হয়। যৌবনের প্রখর প্রেম সৌর কিরণের ন্যায় দাহিকাশক্তি-বিশিষ্ট; মধ্য বয়সের প্রেম জ্যোৎস্নার ন্যায় হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও সুশীতল করে। আমি এই জন্য মধ্য বয়সের প্রেমের সমধিক পক্ষপাতী। বৃদ্ধ বয়সের প্রেম বড়ই বিরল ও বিঘ্নবহুল। যোটের পারাবতের একটি খসিলে অপরটির প্রাণ বাঁচান ভার। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রেমিকযুগলের একত্রাবস্থান প্রায় ঘটে না, কিন্তু যদি ঘটে, তবে সে দৃশ্য বড়ই মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ। বুড়া-বুড়ীর প্রেম দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রেম রূপ বা শারীরিক শক্তির অধীন নহে। উভয়েরই রূপ গিয়াছে, শরীরে শক্তি নাই এবং মৃত্যুও আসন্নপ্রায়; কিন্তু তবুও বুড়াবুড়ীর পরস্পরের প্রতি প্রেম কিরূপ অটুট ও অটল! তাঁহারা নবীন যৌবনের প্রেমের স্মৃতি বুকে করিয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়েন। আমি এক প্রাতঃস্মরণীয় স্থবির-মিথুনকে জানিতাম। তাঁহারা পঁয়ষট্টি বৎসরকাল নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রেম শেষ পর্য্যন্ত অটল ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

যাঁহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়াছে তিনি যেমন জ্ঞানবিষয়ক বৃথা বাগাড়ম্বর করিতে ভালবাসেন না, সেইরূপ প্রকৃত প্রেমিকের মুখে প্রেমের কথা বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমরা পুরুষ জাতি প্রেমসম্বন্ধে যত কথা কহি তাহার এক সহস্রাংশও কি নারীর মুখে শুনিতে পাই? বলিহারি নারীর প্রেম! নারীর ন্যায় কে ভালবাসিতে পারে? পুরুষের প্রেম পুরুষের জীবনের ও হৃদয়ের একদেশমাত্র অধিকার করে। কিন্তু নারীর প্রেম নারী জীবনের একমাত্র ব্রত এবং নারী-হৃদয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এই জন্যই বুঝি প্রেমের রাজধানী নারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত! কিন্তু অবলার কোমল হৃদয়ে বাস করিয়াও প্রেমের কি প্রবল প্রতাপ! প্রেমের অস্ত্র মৃদু হইলেও কি সাংঘাতিক! একটি কোমল কটাক্ষ, একটি মৃদু স্মিত, একটি মধুময় চুম্বন কত বিশ্ববিজয়ী বীরের হৃদয় ভেদ করিতে পারে! প্রেমের কণ্ঠস্বরও কি বিচিত্র। মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার বলেন যে, যখন প্রেম কথা কহে তখন সকল দেবতার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং সেই সঙ্গীতের প্রভাবে স্বর্গের নিদ্রাবেশ হয়। গল্প আছে যে, রুডল্‌ফ্‌ নামক একজন জল্লাদের এরূপ হস্ত-লাঘব ছিল এবং তাহার অস্ত্রও এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, সে রাজাজ্ঞায় যাহার শিরশ্ছেদ করিত সে ব্যক্তি কোনও যন্ত্রণাই অনুভব করিত না! উক্ত ঘাতুক একদা এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিলে সে বলিল, "আমার এখনও শিরশ্ছেদ হয় নাই, কারণ তাহা হইলে আমার মস্তক গ্রীবাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইত এবং আমিও যাতনা বোধ করিতাম।" এই কথা শুনিয়া রুডল্‌ফ্‌ ঈষদ্ধাস্য করিয়া ছিন্নশিরের নাসাগ্রে এক টিপ নস্য ধরিল। যেমন একটি হাঁচি হইল অমনই ছিন্ন মস্তক গ্রীবা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল এবং দর্শককগুলী হইতে রুডল্‌ফের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। একজন ভাবুক বলেন যে, রুডল্‌ফ্‌ যেমন লোকের অজ্ঞাতসারে শিরশ্ছেদ করিত সেইরূপ কামিনীগণ আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লয়েন এবং আমরা তাঁহাদের প্রেমে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বপ্নেও ভাবি না যে, আমরা মরিয়াছি। কিন্তু আমি বলি, আমরা যেমন রমণীর প্রেমে প্রাণ হারাই তেমনই রমণী আবার তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কি যেন এক নূতন প্রাণের বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করেন। রমণী আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লয়েন বটে, কিন্তু উহার বিনিময়ে নিজের অমূল্য মধুভরা হৃদয়টি আমাদিগকে সমর্পিত করেন। এ বিনিময়ে কোন্ পক্ষের লাভ হয়, সে প্রশ্নের উত্তর

প্রেমিক দিবেন। রমণী-হৃদয়ের কি মূল্য আছে? এক একটি ভোগবিলাস-বিরতা রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যাহাকে হৃদয়সমর্পণ করেন তাহাকে ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজা করেন। এরূপ প্রকৃতির নারীরত্নের প্রেম ধর্ম্মের উচ্চতম শিখরে উঠে এবং কিছুতেই বিচলিত হয় না। যিনি এরূপ প্রেম ভাগ্যক্রমে লাভ করেন, তিনি ধন্যাদপি ধন্য। আমার এক পরলোক-গত বন্ধু এইরূপ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছিলেন। সেই ললনাকুলললাম মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমি সকলের মায়া কাটাইয়াছি; কেবল তোমার মায়া কাটাইতে পারিতেছি না।" আমার আর একটি বন্ধুর পত্নীও স্বামীকে ইষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। একবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কিয়দ্দিবসের জন্য বৈদ্যনাথে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথা হইতে স্বামীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, "আমি এখানে আহ্নিক পূজায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না, পূজায় বসিলেই আমার কেবল তোমাকে মনে পড়ে।" বাহুল্য-ভয়ে এরূপ অপর দৃষ্টান্তের আর উল্লেখ করিলাম না। রুগ্নশয্যায় নারী-হৃদয়ের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ পরিচয় আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সেই দেবদুর্লভ সেবা পাইবার লোভে রোগকেও আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়।

একজন কবি নিজের ভাগ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে যত উৎপীড়িত করিতে চাহ কর, কেবল আমার প্রিয়তমাকে আমার করিয়া দাও।" বাস্তবিক যিনি বহুপুণ্যফলে একটি প্রেমময়ী গুণবতী রমণীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন, তিনি সেই স্বর্ণতরীখানির সাহায্যে রোগ, শোক, দারিদ্র্য প্রভৃতি দুস্তর সংসার-পাথারের সকল দুঃখই অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, বঙ্গসাহিত্যের চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্রচিত সূর্য্যমুখীর অমর চিত্রে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চরিত্রের ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রেম সকল অবস্থায় অনুকূল হইলেও সম্পদের অপেক্ষা বিপদে বিশেষ সহায়। প্রণয়িনীর সহিত দিনান্তে এক ঘণ্টাকাল বিশ্রম্ভালাপে কাটাইতে পারিলে মানুষের সকল দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। হৃদয়ভরা সহানুভূতির কাছে কি কোনও কষ্ট তিষ্ঠিতে পারে? দুরবস্থা ঘটিলে লোক স্বভাবতঃ

এমনই অভিমানপরতন্ত্র হয় যে, কেহ তাহাকে সৎপরামর্শ দিতে আসিলেও সে আপনাকে অপমানিত বোধ করে। কিন্তু তাহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী যখন প্রণয়বিকম্পিত সুধামাখা স্বরে তাহার দুরবস্থা মোচনের উপায় বলিয়া দেন তখন সে বিনা বিতর্কে সে উপদেশ পালন করে।

আমি এতক্ষণ রমণী-হৃদয়ের যে সকল গুণ ব্যাখ্যা করিলাম তাহা সাধারণতঃ সকল দেশের পক্ষেই খাটে। কিন্তু চিরপ্রচলিত অবরোধপ্রথা-বশতঃই হউক অথবা জাতীয় প্রকৃতিপ্রভাবেই হউক আমাদের দেশের ললনাগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ শালীনতা তাঁহাদের প্রেমকে ব্রীড়াজনিত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভূষিত করে। ভারতচন্দ্র এ দেশের গৃহলক্ষ্মীর কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

"নয়ন অমৃতনদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না॥"

বাস্তবিক আমাদের কুললক্ষ্মীরা যাহা কিছু করেন, তৎসমস্তই সীমাবদ্ধ; কেবল তাঁহাদের প্রেমের কোনও অবধি নাই।

"সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্ণঃ পরং লক্ষ্যতে।"

আমাদের কুলাঙ্গনাদের লজ্জার কথা আর অধিক কি বলিব? একটি কুলাঙ্গনা বিবাহের পর অন্যূন তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শয়ন কক্ষের আলোক যতক্ষণ না নির্ব্বাপিত হইত ততক্ষণ স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এরূপ লজ্জাশীলতা ভালই হউক বা মন্দই হউক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। আমার আশঙ্কা হয়, পাছে সেই সঙ্গে প্রেমের খর্ব্বতা হয়। সে ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করিতে পারিবে না। প্রেমের ন্যায় অমূল্য নিধি রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন। কখন এরূপ ঘটে যে, একখানি জাহাজ প্রবল ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অবশেষে তীরের অনতিদূরে আসিয়া জলমগ্ন হয়। সেইরূপ প্রেম অনেক গুরুতর কষ্ট বা অপমান অকাতরে সহ্য করিয়া কখন কখন অতি

তুচ্ছ কারণে ভগ্ন হয়। অপরের হৃদয়বীণার তারগুলি কখন কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা আমরা জানিতে পারি না বলিয়া আমরা কখন কখন একটি সামান্য শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়া অথবা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া প্রেমের কোমল প্রাণে এরূপ দারুণ আঘাত করি যে, তাহার অশুভ পরিণাম আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। যাঁহারা বিবাহিত জীবন সুখে কাটাইতে ইচ্ছা করেন আমি তাঁহাদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন প্রণয়িনীর দোষ সংশোধন করিতে গিয়া প্রেম-তরুর মূলে কুঠারাঘাত না করেন। একসঙ্গে ঘর করিতে গেলে দম্পতীর বড় একটা সাজগোজের দিকে লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং পরস্পরের দোষগুণ পরস্পরের অবিদিত থাকে না। ছোট ছোট দোষ প্রেমের ঔদার্য্যগুণে না ধরাই শ্রেয়ঃ। প্রণয়িনীর গুরুতর দোষ দেখিলে উহার সংশোধনের বিধিমত চেষ্টা অতি সন্তর্পণে ও বিশেষ সহৃদয়তার সহিত করিতে হইবে। কিন্তু সাতদোহাই প্রেমের, রসিকতার খাতিরেই হউক অথবা রোগ বা আকস্মিক বিরক্তিবশেই হউক, তোমার প্রাণের প্রাণকে কদাচ অবজ্ঞা বা ব্যঙ্গ করিও না। ব্যঙ্গ শয়তানের ভাষা, প্রেমের অভিধান হইতে একেবারে বর্জ্জিত। প্রেমের বীণা বড় দরদ করিয়া বাজাইতে হয়—

"তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি, তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার।"

প্রেমের একাধিপত্যে ভাগ চলে না—

"প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ. সয় না কথার টান,
প্রেম সরু সুতায় বাঁধাবাঁধি, বাতাসের তো ভর সবে না।"

এক একজন লোক এরূপ আত্মপ্রিয় যে তাহারা যখন কাহারও প্রতি আসক্ত হয় তখন তাহার বিষয় যত না ভাবে তাহাদের নিজের প্রেমের কথা তদপেক্ষা অধিক ভাবে। এরূপ লোক কখনও প্রকৃত প্রেম লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রণয়িনীর নিকট আত্মগোপন করে এবং আপনাকে রহস্যজালে আবৃত রাখিতে ভালবাসে সেও কখন প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হয় না। হীরকের ন্যায় স্বচ্ছপ্রকৃতিবিশিষ্ট না হইলে প্রেম লাভ করা দুর্ঘট। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীপুরুষের কেহই যেন স্বাধীন চিন্তার অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত না হয়েন। দম্পতী পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। সন্দিগ্ধচিত্ততা প্রেমের একটি প্রধান প্রত্যূহ।

প্রকৃত প্রেমের লক্ষণই আত্মলোপ; যাহার আত্মলোপ হইয়াছে সে কখনই সন্দিগ্ধচিত্ত হয় না।

দম্পতীর কলহ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ সচরাচর উদাহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়-কলহ যদি এরূপভাবে নিষ্পন্ন হয় যে, উহাতে প্রণয়ের পূর্ণ মর্য্যাদা বজায় থাকে, তাহা হইলে দম্পতীর কলহে প্রেম বাড়ে বই কমে না। সেক্‌সপীয়ারের একজন সমসাময়িক কবি বলেন যে, এরূপ কলহের পর চুম্বনে দম্পতী দ্রাক্ষার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়েন। কবি-কল্পিত অমর লোকে প্রেমে গতস্য শোচনা নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও কোনওরূপ উদ্বেগ নাই। কিন্তু মর্ত্ত্যমানবের হৃদয় এরূপ প্রেমে তৃপ্তিলাভ করে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমার বোধ হয় যে, কলহবিচ্ছেদাদি আছে বলিয়া মানব-প্রেম এত বিচিত্র ও মধুর। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দুই স্ত্রী-পুরুষের কখনও মনান্তর ঘটে নাই শুনিয়া একজন তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াছিলেন, "এরূপ দাম্পত্য জীবন কি নীরস ও স্বাদবিহীন!"

কলহবিচ্ছেদাদি যেমন প্রেমের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে, সেইরূপ মৃত্যুর তামসরজ্জু প্রেমের রত্নশৃঙ্খলের সহিত গ্রথিত হইয়া প্রেমকে প্রিয়তমাদপি-প্রিয়তম করে। মৃত্যুঞ্জয় প্রেম মৃত্যুর স্পর্শে অমরত্ব লাভ করে। যিনি প্রেমের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়াও আজীবন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারেন নাই তিনিই এই কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

কবিতা।

সেই এক শুভক্ষণে বাল্মীকির পূত রসনায়
স্বর্গ ত্যজি' পরদুঃখে প্রকটিত প্রথম ধরায়
সেই হ'তে পরদুঃখে নির্য্যাতিতে দিতে আশীর্ব্বাদ
হে কবিতা, নানাছন্দে বিলাইছ সান্ত্বনা—প্রসাদ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর।*

জীবের জীবন নলিনীদলগত জলের সহিত তুলিত হইয়া থাকে। নিত্য শত শত মানব লোকলীলা শেষ করিয়া মৃত্যুর অধিকারে চলিয়া যায়। স্বজনগণ ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের স্মৃতি রক্ষা করে না, ইতিহাসে তাহাদিগের নামোল্লেখও থাকে না। কিন্তু জীবন যাইলেও কীর্ত্তি যায় না। তাই কীর্ত্তিমান পুরুষের তিরোভাবে সমাজ বা জাতি শোক প্রকাশ করে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন।

তিনি ধনবান ভূম্যধিকারিসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বংশের সমৃদ্ধি-সমাগম বহুদিনের কথা নহে। দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হইলেই কতকগুলি সমৃদ্ধ বংশের অধঃপতন ও কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তির উন্নতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে কতকগুলি পরিবার সম্মানে ও সম্পদে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। এই সকল পরিবারের মধ্যে কাশীমবাজার, শোভাবাজার, নশীপুর, কান্দি (পাইকপাড়া)—এই সকল স্থানের রাজ-পরিবারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোভাবাজার রাজবংশের বংশপতি নবকৃষ্ণ ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন এবং দীন অবস্থা হইতে ক্রমে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশে রাজা রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলন করাইয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাজা কালীকৃষ্ণ, মহারাজ কমলকৃষ্ণ ও মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সমসাময়িক সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কালীকৃষ্ণ ও কমলকৃষ্ণ উভয়েই—রাধাকান্তের মত—হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ মহারাজ কমলকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র।

অল্পবয়স হইতেই বিনয়কৃষ্ণ সভাসমিতিতে যোগ দিতেন ও জনহিতকর অনুষ্ঠানে কার্য্য করিতেন। প্রধানতঃ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ন্যাসনাল লিগের" সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সভা কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। তাহার পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন ও একবার কংগ্রেসের ধনাধ্যক্ষের কার্য্যও করিয়াছিলেন। সার আলেকজাণ্ডার

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ম্যাকেঞ্জীর শাসনকালে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল—রাজা বিনয়কৃষ্ণ সে আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন; প্রতিবাদকারিগণের মন্ত্রণাসভার অধিবেশন তাঁহার গৃহেই হইত। তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যভাবে, রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা কখনও সমাজের প্রতি উপেক্ষায় বা সমাজ-শাসনের প্রতি ঘৃণায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও সমুদ্রযাত্রা প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিধানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য-সাধনের চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার সাফল্যবিচারের বিতর্কে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু যদি সে চেষ্টা সাফল্যলাভ না করিয়া থাকে তবে তাহার বিবিধ কারণ আছে। সমাজে একতার ও ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্বের অভাব—সেসকল কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্প্রদায় বিশেষকে "জল আচরণীয়" করিয়াছিলেন। এখন সে অধিকার বা ক্ষমতা কাহারও নাই।

সমাজে রাজার সম্মান ছিল। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্যক্তি-বিশেষের, সভাবিশেষের, সংবাদপত্রবিশেষের যে উপকার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলনে বা সমাজসংস্কার-বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার কোন স্থায়ী নিদর্শন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব সাহিত্যে—কীর্ত্তি সাহিত্যক্ষেত্রে। সাহিত্য-সেবা তাঁহার পক্ষে মৌলিক না হইলেও কৌলিক বটে। কিন্তু তিনি যে বিলাস-ব্যসনে ব্যাপৃত না হইয়া সাহিত্যালোচনায় বিমল আনন্দ উপ-ভোগ করিতেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। তিনি সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যামোদী ছিলেন; এবং সাহিত্যসেবকগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি স্বয়ং ইংরাজীতে কলিকাতার একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বহু প্রবন্ধও রচিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার আর একটি কার্য্যের উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শোভাবাজার রাজবংশের বংশপতি নবকৃষ্ণ ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন। নন্দকুমারের বিচারবিষয়ক পুস্তকে ঐতিহাসিক

বেভারিজ নবকৃষ্ণের চরিত্রে যে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছিলেন বিনয়কৃষ্ণ তাহার অপনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেভারিজ তাঁহার পুস্তক রচনাকালে নবকৃষ্ণের বংশধর রাজা সার রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়নের নিকট বহু উপাদান চাহিয়াছিলেন, বহু বিষয়ের সন্ধান লইয়াছিলেন। রাজার ভাগিনেয় অগাধপাণ্ডিত্যশালী আনন্দ-কৃষ্ণ বসু মহাশয় সে সব উপাদান যোগাইয়াছিলেন, সে সকল সন্ধান দিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের নিন্দা করিতে হইয়াছিল বলিয়া পুস্তক রচিত হইলে বেভারিজ স্বয়ং আসিয়া আনন্দ বাবুকে নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য শুনাইয়া নবকৃষ্ণের সমর্থনে তাঁহার কিছু বলিবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। আনন্দ বাবু বলিয়াছিলেন, সমসাময়িক আদর্শে বিচার করিলে নবকৃষ্ণের অপরাধের গুরুত্বহ্রাস হইবে; তখন সকলে যেমন নবকৃষ্ণও তেমনই ছিলেন। বিনয়কৃষ্ণ কিন্তু নবকৃষ্ণকে নির্দ্দোষ মনে করিতেন। সে কথা তিনি আমাকেও বহুবার বলিয়াছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণের কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষরচিত নবকৃষ্ণের চরিত সেই চেষ্টার ফল। নগেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থরচনায় রাজার নানারূপ সাহায্যের কথা তাঁহার বন্ধুবর্গের অবিদিত নাই।

রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে রাজার কৃত কর্ম্ম স্থায়ী হইবে কি না—ইতিহাসে তাহার কোন চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁহার কৃত কর্ম্ম যে স্থায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও পরে সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি।

পরিষদের মত সভাসংস্থাপনের কল্পনা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। একবার দেওঘরে অবস্থানকালে রাজা বাহাদুর রাজনারায়ণ বাবুর নিকট এই কল্পনার কথা জানিতে পারেন ও কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। তখন আমিও দেওঘরে। এই কার্য্যে মিষ্টার লিওটার্ড, পরলোকগত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজার সহকর্ম্মী। রাজা বাহাদুরের গৃহে বেঙ্গল একাডেমী অব লিটরেচার প্রতিষ্ঠিত হইল। নাম ইংরাজী, কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে লিখিত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মধ্যে কে যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নাম স্থির করেন, ঠিক স্মরণ নাই। তবে পর-

বর্ত্তীকালে আবার পরিষৎ ও পরিষদ্ লইয়াও তর্ক হইয়াছিল। রাজা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবর্ত্তক। পরিষদ তাঁহারই গৃহে সংস্থাপিত ছিল।

ইংরাজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক টেন লিখিয়াছেন, সাহিত্য ক্রমে পাঠকসম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে গঠিত হয়। সেক্সপিয়ারের নাটকে সমসাময়িক ইংরাজ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় আছে; ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমান শাসনের অবসানকালে বাঙ্গালার বিলাসী সমাজের বিলাসের চিত্র দেখা যায়। কিন্তু সকল দেশে ও সকল সমাজেই লেখকগণের আবির্ভাব পাঠকসম্প্রদায় সংগঠনের অপেক্ষা রাখে না; বরং অনেক স্থলে লেখকের আবির্ভাব পাঠকের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী—রচনা পাঠকসম্প্রদায় সংগঠিত করে। তাহার পূর্ব্বে অনেক স্থলে কমলার বরপুত্রগণ বাণীর সেবকদিগের সাহায্য করিয়াছেন। সাহিত্যিকদিগের রচনায় তাঁহারা যে অমরতালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধন বা প্রতাপ তাঁহাদিগকে সে অমরতা দিতে পারিত না। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশমাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নব প্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সদ্যস্ক; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী।" আমাদের বাঙ্গালায় বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত রাজসভায় থাকিয়া—রাজানুগ্রহে দারিদ্র্যদংশনমুক্ত হইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনও পাইকপাড়ার রাজাদিগের ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাভারতের ও রামায়ণের এবং সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারতের যে অনুবাদ করাইয়া গিয়াছেন তাহাতে এবং রাজা সার রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলনে এইরূপ সাহিত্যানুকূল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে জনসনের অভিধান প্রকাশ হইতে এইরূপ সাহিত্যানুকূল্যের শেষ। জনসন এই অভিধান প্রণয়নকালে কোবিদ-সুহৃদ লর্ড চেষ্টারফিল্ডের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলেন। লর্ড চেষ্টারফিল্ডও তাঁহাকে আনুকূল্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। জনসন সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষকাল এই অভিধান প্রণয়নকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি লর্ড চেষ্টারফিল্ডের নিকট কোনরূপ সাহায্য পায়েন নাই। শেষে যখন গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন গ্রন্থখানি যাহাতে তাঁহাকেই উৎসর্গ করা হয় সেই আশায় চেষ্টারফিল্ড উহার

প্রশংসা করিয়া 'ওয়ারল্ড' পত্রে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। জনসন তাঁহাকে যে পত্র লিখেন, ইংরাজী সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। কার্লাইল বলিয়াছেন, সেই পত্রে জনসন জানাইয়া দেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে আর ধনীর আনুকূল্য প্রয়োজন হইবে না। বাঙ্গালায় যেরূপ শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে ও বাঙ্গালার পাঠক-সম্প্রদায় যেরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি, বাঙ্গালায়ও আর সাহিত্যে ধনীর আনুকূল্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখনও বোধ হইতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সে আনুকূল্যপ্রদানের অবকাশ আছে। সমগ্র বাঙ্গালার যে ব্যয়ভার বহন করিবার কথা বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারকল্পে সেই ব্যয়ভার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় বহন করিতেছেন। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই দুইজনের সাহায্য স্মরণীয়। মহারাজ বহু সাহিত্যসেবকের আশ্রয়। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্কের কথা হইতে পারে; কিন্তু এ সত্য গোপন করিবার উপায় নাই। সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় ও পরিপোষণে রাজা বিনয়কৃষ্ণের কীর্ত্তিও স্মরণীয়। পরিষদকে তিনি যে বিশেষ স্নেহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পরিষদসম্পর্কেই আমার সহিত রাজা বাহাদুরের পরিচয়।

সন ১৩০৬ সালে আমি পরিষদের সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলাম। সেবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুপণ্ডিত ও কোবিদসুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক। যতীন্দ্র বাবুর সাহিত্যপ্রীতি যেরূপ অধিক অবসর সেরূপ অধিক নহে। সেই জন্য তিনি অনেক সময় সহকারীদিগের উপর কার্য্যভার দিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় পরিষদ স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বিচারার্থ আমাকেই সভা আহ্বান করিতে হইয়াছিল। সাধারণ সভা ব্যক্তিবিশেষের গৃহে থাকিলে কিছু অসুবিধাভোগ অনিবার্য্য। আমাদিগকেও সময় সময় সেইসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সেই কারণে পরিষদকে কোন স্বতন্ত্র ভবনে সংস্থাপিত করিবার প্রস্তাব হয়;—প্রস্তাবকারিগণের মধ্যে আমি ছিলাম। এ বিষয় লইয়া বিচার হয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া আমি পরিষদ স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব বিচারার্থ সভা আহ্বান করি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই স্থানান্তর কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও পরিষদকে স্থানান্তরিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। তখন রাজা বাহাদুর ও সম্পাদক যতীন্দ্রবাবু কেহই কলিকাতায় ছিলেন না।

১৮ই ফেবরারী (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) বুধবার অপরাহ্নে পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হয়। যতীন্দ্রবাবু সেই দিন কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। পরিষদের অধিবেশনে যাঁহারা সাধারণতঃ যোগ দিতেন না এমন অনেক সভ্যও সে দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, রমানাথ ঘোষ ও হেমচন্দ্র বসু মল্লিক ছিলেন। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সভাধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। এ সভাধি-বেশনের আহ্বানপত্র সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রচারিত হওয়ায় তাঁহারা আপত্তি করিলে যতীন্দ্র বাবু তাঁহার সহকারীর কৃত কর্ম্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৪৯ জন সভ্য সভাধিবেশনের পক্ষে ও ৩৯ জন বিপক্ষে মত দিলে সভার কার্য্য আরব্ধ হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত গ্রহণকালে বিপক্ষদল সভাগৃহ ত্যাগ করেন; প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা পরিষদকে নানাপ্রকার সাহায্যের জন্য রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং পরিষদগৃহে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করেন। রাজাবাহাদুরের অনিচ্ছাহেতু শেষোক্ত প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আশা করি, পরিষদ এবার প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন করিবেন।

রাজা বাহাদুর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার এই কার্য্যে যাঁহারা ব্যথিত হইয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে তাঁহাদের সে বেদনা অপনীত হইয়াছিল। পরিষদ রাজা বাহাদুরের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হইলে পরিষদের বন্ধুবর্গ গৃহনির্ম্মাণের জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া বাঙ্গালার ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছিলেন। ধনবানদিগের বদান্যতায় সে পাত্র যে অল্প দিনেই পূর্ণ হইয়াছিল এমন শ্লাঘার কথা বলিতে পারি

না। কিন্তু যেরূপেই হউক কাশীমবাজারের মহারাজদত্ত ভূমির উপর পরিষদের স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষদের গৃহপ্রবেশোৎসবে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। যদি তিনি কখন পরিষদের প্রতি বিরূপভাব পোষণ করিয়া থাকেন, তবে সে দিন তিনি তাহা পরিহার করিয়াছিলেন।

এত দিন পরে—যখন কালের ভেষজে সকলেরই হৃদয়-ক্ষত দূর হইয়াছে এবং মৃত্যুর শীতল প্রলেপ সাময়িক উত্তেজনার তাপ নষ্ট করিয়াছে তখন ধীরভাবে বিবেচনা করিলে সাহিত্য সভার সংস্থাপনকার্য্য প্রতিহিংসা-প্রণোদিত না বলিয়া তাহাতে অন্যবিধ উদ্দেশ্যের আরোপ করাও অসম্ভব বোধ হয় না। হয়ত সাহিত্যামোদী রাজা বাহাদুর যে সাহিত্যিক সঙ্গ ভালবাসিতেন পরিষদ স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহার অভাব আশঙ্কা বা অনুভব করিয়াই তিনি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি যে সাহিত্য সভার কার্য্যপ্রবাহ ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিয়া পরিষদের সহিত সভার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে এই মতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পরিষদ পুরাবস্তুর সংগ্রহে, প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় ও ইতিহাসের উদ্ধারে শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সাহিত্য সভা বর্ত্তমানকে অবহেলা না করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের আলোচনায় ও উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল।

রাজা বাহাদুরকে পরিষদের গৃহপ্রবেশোৎসবে যোগ দিতে দেখিয়া কেহ কেহ আশা করিয়াছিলেন, মুক্ত বেণী আবার যুক্ত হইবে। কিন্তু পরিষদের ও সভার কার্য্য বিবেচনা করিলে উভয়ের সংযোগ অভিপ্রেত কি না বলা দুষ্কর হইয়া উঠে। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুতে যদি সাহিত্য সভার কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস না হয়, তবে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বোধ হয় সঙ্গত হইবে এবং তাহার সহিত রাজা বাহাদুরের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত রহিবে।

রাজা বাহাদুর অত্যন্ত বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সকল প্রকারের লোক সকল সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। কিন্তু তিনি সাহিত্যালোচনায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক বিষয়ে তিনি বহু তথ্য অবগত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকায় তিনি জীবনের শেষ পীড়া পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম ছিলেন।

তাঁহার নানা সদ্‌গুণের মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতান্তরকে তিনি মনান্তরের কারণ করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন না। পরিষদ স্থানান্তরিত করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অনেকের সহিতই তাঁহার বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হয় নাই বা পুনরায় সংস্থাপিত হইয়াছিল।

তাঁহার সদ্‌গুণের স্মৃতি তাঁহার বন্ধুবর্গের স্মৃতিতে নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্য-সুহৃদদিগের মধ্যে তাঁহার নাম সমুজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিবে। পরিষদের পুণ্য পীঠে দাঁড়াইয়া আমরা এ আশা করিতে পারি যে, পরিষদ চিরস্থায়ী হইবে আর পরিষদের সহিত বিজড়িত রাজা বাহাদুরের নামও কালজয়ী হইয়া থাকিবে।

কামনা।

সাযুজ্য চাহি না, নাথ, শুধু দাসীরূপে।
চরণ পূজিতে চাহি শুধু চুপে চুপে॥
চাহি ভালবাসিবারে ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়া।
চাহি, প্রভো, সর্ব্বজীবে তোমারে হেরিয়া
বিলাইতে সবাকারে স্নিগ্ধ অনাবিল
মৌন ভালবাসা। চাহি হেরিতে নিখিল
ভাস্বর তোমায় প্রেমে, হে জগৎস্বামি,
তুমি থাক প্রভু হ'য়ে, দাসী থাকি আমি।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আজ যে বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন্ তাঁহার নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আপন সত্তা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে বহুল পরিমাণে ঋণী। ইহার প্রাথমিক গঠনকালে বিদ্যানিধি মহাশয় একজন প্রধান মিস্ত্রী ছিলেন—অনেক উপাদান তাঁহার যত্নে ইহার দেহগঠনে তাঁহার হস্তেই সংযোজিত হইয়াছে। অনেক ফাটা-চটা মেরামতেও তাঁহাকে সে সময় বিষম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যতকাল থাকিবে ততকাল বিদ্যানিধি মহাশয়কে আপনার অন্যতম গঠনকর্ত্তা বলিয়া স্মরণ রাখিতে বাধ্য এবং পরিষদের বর্ত্তমান হিতৈষিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত ইহার গঠনকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে কোন দিনই ভুলিবেন না,—ভুলিতে পারিবেন না। আর যাঁহারা পরিষদ্-গঠনে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক যত্ন দেখেন নাই তাঁহারা, (এই পরিষদের অপর গঠনকর্ত্তৃগণের সঙ্গে) সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নামটি স্মরণ রাখিলে বাধিত হইব। পরিষদের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি আছে যাঁহারা পরিষদকে বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালীর সমাজের—এক কথায় বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল ও উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করেন, এই পরিষদের জন্মেতিহাসের সহিত একাত্মভাবে জড়িত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নাম যদি তাঁহারা স্মরণ না রাখেন, তাহা কেবল তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে।

পরিষদের সম্পোষণার্থ সদস্যসংগ্রহ, পরিষদের পালনার্থ সহকারীসম্পাদক-রূপে নানাভাবে পরিশ্রম, পরিষদ্ পুস্তকাগারের জন্য পুস্তকসংগ্রহ, পরিষদ্ পত্রিকার উন্নতির জন্য লেখকসংগ্রহ, অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ-সংগ্রহ, অধিবেশনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ, অনুরোধ প্রভৃতি পরিষদের উন্নতিকর ও সদস্যগণের প্রীতিবর্দ্ধক সকল কার্য্যেই বিদ্যানিধি মহাশয় অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। তৎকালীন সাহিত্য-সংসারে ও সাহিত্যিক-সমাজে তাঁহার নানাবিধ কার্য্য ছিল। সেই সকল কার্য্যসূত্রে যাঁহারই সহিত, যে জন্য, যখনই দেখা হইত, প্রসঙ্গতঃ পরিষদের কথা উত্থাপিত করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার

চেষ্টা করিতে তাঁহাকে সর্ব্বদা সচেষ্ট দেখিতাম। শ্রাদ্ধ-সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগমেও তাঁহাকে এরূপ চেষ্টায় বিরত থাকিতে দেখি নাই। সাহিত্য পরিষদ্ যখন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হয়, সেই দিন হইতে কোন সতীর্থ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি কিছু দিন পরিষদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইহার প্রতি প্রীতি ও স্নেহ বর্জ্জন করেন নাই। সাহিত্য তাঁহার চিরপ্রিয়; সাহিত্য তাঁহার আনন্দ—সাহিত্য তাঁহার প্রাণ ছিল। সাহিত্যানন্দদিগের সহিত আলাপে যাহাকে যে ভাবে অনুপ্রাণিত দেখিতেন, তিনি তাহাকে সেই মার্গ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি মুখ্যতঃ সাহিত্যসভার গঠন-কার্য্যে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার ব্যাখ্যাত সাহিত্যসেবাপদ্ধতি শ্রবণ করিয়া অনেক সাহিত্যানুরাগী বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাহায্যসংশ্লিষ্ট সাহিত্য সভায় যোগদান না করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাহিত্যযাজক বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপে পরিষদের অনেক সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

সাহিত্য সভার গঠনযুগে বিদ্যানিধি মহাশয়ই তাহার উন্নতির কেন্দ্রশক্তি স্বরূপ কার্য্য করিতেন। পরিষদের ন্যায় সাহিত্য সভাও নিজ জীবনের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই। সাহিত্য সভার পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় নিজের আবাল্য সঞ্চিত বহু পুস্তক, পুঁথি, মাসিকপত্র তথায় দান করিয়াছিলেন। সাহিত্য সভায় বর্ত্তমান পুস্তক-ভাণ্ডারের অর্দ্ধাংশ কেবল তাঁহার দত্ত বিপুল গ্রন্থরাশিদ্বারাই গঠিত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বিদ্যানিধি মহাশয় 'আর্য্যদর্শনে' প্রথমে লেখক ও পরে সহকারী সম্পাদক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত হয়েন। তিনি টোলে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ইংরাজীও জানিতেন। অনেক প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান পণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে স্বনামধন্য কৃতী ও সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চায় তিনি প্রথম হইতেই মৌলিকতা প্রকাশ করিয়া যশোলাভ করেন। হোমিওপ্যাথীর আবিষ্কারকর্ত্তা হ্যানিমানের জীবন-চরিত তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

একজন কাব্য শাস্ত্রের "টুলো" পণ্ডিত মাতৃভাষাসেবায় ব্রতী হইয়া ভাষাদেবীর চরণে প্রথম যে অঞ্জলী প্রদান করিলেন, তাহা একেবারে তাঁহার শিক্ষিত বিষয়ের বাহিরের বস্তু। ঐ সময় তিনি 'আর্য্যদর্শনের' সহকারী সম্পাদক। উহার সম্পাদক সুপণ্ডিত স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তখন গ্যারিবল্‌ডী, ম্যাটসিনী প্রভৃতির জীবন-চরিত প্রকাশ করিতেছিলেন। সহকারী সম্পাদক বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহারই প্রদর্শিত পথে (তবে সম্পূর্ণ নূতন দিকে) এক জন নববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাকারী চিকিৎসকের জীবন-চরিত লিখিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন ইহা অল্প বিস্ময়ের কথা নহে। তাহার পরে তাঁহার যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমরা পাই, তাহাও নবীনত্বে এবং মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ—সেখানি প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের বৃত্তান্ত। বঙ্গসাহিত্যের পাঠক ও ইতিহাসলেখক সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখেই এই পুস্তিকাখানিদ্বারা আমাদের বৈদিক কালের গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, ও পৌরাণিক কালের দেবহূতি প্রভৃতি বিদুষী মহিলার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই কিছু না কিছু মৌলিক গবেষণামূলক। আজ মদীয় সোদরপ্রতিম নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশ করিতেছেন, তৎসম্পর্কিত বংশাবলীর আলোচনা যে বাঙ্গালীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'কল্পনা' নামক অধুনালুপ্ত তদানীন্তন সুপরিচিত মাসিক পত্রে প্রকাশিত পৌরাণিক ঋষি ও রাজবংশাবলীর আলোচনামূলক "বংশাবলী" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতেই যাহা প্রথম প্রকটিত হয়। বাঙ্গালা সাময়িক (মাসিক ও সাপ্তাহিক) পত্রের ইতিহাস সঙ্কলন, তাঁহার মৌলিক গবেষণার আর একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। এই প্রবন্ধ যদিও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তদধিক আর কিছু কাহাকেও করিতে হইলে, তাঁহাকে বিভিন্ন জিলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া নূতন উপায়ে নূতন অনুসন্ধান করিতে হইবে। নতুবা তিনি আর বিশেষ কোন কিছু নূতন তথ্য সংযোগ করিতে পারিবেন না। বিদ্যানিধি মহাশয়ের আর একটি মৌলিক গবেষণার কথা বলিব। তাহার বিষয়টি এমন অদ্ভুত ধরণের যে, সে বিষয়ে যে আবার জ্ঞাতব্য কিছু আছে, লেখ্য কিছু আছে, তাহার ইতিহাস যে

সমাজের কোন প্রয়োজনে আসিতে পারে বলিয়া রক্ষিতব্য, এ ধারণা তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহারও মনে উঠে নাই। সেটি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

বিদ্যানিধি মহাশয় যখন নাট্যশালার ইতিহাস অনুসন্ধানের কল্পনা করেন, তখন পর্য্যন্ত নাট্যশালা এই "কলির সহর কলকেতাতেই" ভদ্র শিক্ষিত লোকের নিকট আজকালকার ন্যায় আদর পাওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘৃণ্যই ছিল। সেই সময়ে তিনি কলিকাতার প্রধান প্রধান নাট্য-শিল্পীর সহিত দেখা করিয়া উহার ইতিহাসসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্গের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অনেকেই তখন জীবিত ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত দেখা করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের এত চেষ্টা—এত উৎসাহ জাগিয়াছিল, দেশের লোকের নাট্যশালার প্রতি তখনকার ভাব অনুধাবন করিয়া তাঁহারাই অনেকে সে সময়ে তাঁহার আগ্রহে মনোযোগ করেন নাই। মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় এবং আদি নাট্য-মঞ্চশিল্পী ৺ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় তাঁহার অভিলাষ সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ করেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বিদ্যানিধি মহাশয় ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺মহেন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর, ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট কথা প্রসঙ্গে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ সম্পাদিত 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন' পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এমনই কালের বিচিত্র গতি যে, এক দিন যাঁহারা এইসকল বিবরণ দিতে কিছুমাত্র উৎসাহ দেখান নাই, উত্তরকালে তাঁহাদেরই মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা উৎপন্ন হইয়া নাট্যশালার গঠন-যুগের ইতিহাসকে ইহারই মধ্যে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন হঠাৎ তাহা হইতে সত্যনির্ণয় করা বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ব্যতীত বিদ্যানিধি মহাশয় 'নব্যভারতে' রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতখানিকে প্রায় পূর্ণতা দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল তথ্য সমসাময়িক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত করিয়া তিনি বাঙ্গালীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক; সকলগুলির উল্লেখ করিবার স্থল ইহা নহে। অতঃপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট

হইবে যে, তিনি গ্রন্থকার, মাসিক পত্রের সম্পাদক, সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, প্রবন্ধলেখক প্রভৃতি সাহিত্য-সেবকের সকল মূর্ত্তিতেই আমরণ মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিতখানি তখনকার কালে জীবন-চরিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক ছিল।

বিদ্যানিধি মহাশয় যখন 'বিদ্যানিধি' হয়েন নাই, তখন বাগবাজারে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষক তখনকার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরল এল্, পি, ডি, ব্রাউটনের নামে "ব্রাউটন ইন্‌ষ্টিটিউশন" নাম দিয়া এক প্রবেশিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। তখন তাঁহার 'হ্যানিমান' কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি নিজে কেবলমাত্র বংশগত উপাধিদ্বারা মহেন্দ্রনাথ রায় নামেই পরিচিত। এই স্থানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় ও রাজা রামমোহন রায় একই বংশোদ্ভূত, মহেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ শাখার সন্তান এবং উভয়ের নিবাসও একই স্থানে—খানাকুল কৃষ্ণনগরে। এই ব্রাউটন ইন্‌ষ্টিটিউশনেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও এই স্থানেই আমাদের গুরুশিষ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমি তখন ঐ স্কুলে পড়িতাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাছেই আমার 'উপক্রমিকা ব্যাকরণ' হইতে সংস্কৃত শিক্ষার এবং 'যুধিষ্ঠিরের সততা' নামক সে শ্রেণীর উপযুক্ত প্রবন্ধ রচনা হইতে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সে বোধ হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের কথা। তদবধি বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার চিরদিনের নিমিত্ত যে ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন বাঁধা হইয়াছিল, তাহা কোন দিন শিথিল হয় নাই; আর আজ তাঁহার দেহান্ত হইলেও আমার দেহান্ত পর্য্যন্ত তাহা অটুট থাকিবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের শিষ্যত্ব আমার ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই; কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধিক বেতনে অন্যত্র কর্ম্ম করিতে গমন করেন, আমিও শিক্ষার্থ ওরিএণ্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হই ও ব্রাউটন ইন্‌ষ্টিটিউশনও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কটন ইনিষ্টিটিউশন নামে অন্যত্র উঠিয়া যায়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে একত্র কাজ করিয়াছি, এই পরিষদের গঠনকার্য্যে একত্র পরিশ্রম করিয়াছি, মাসিক পত্রাদি সম্পাদনে ও প্রবন্ধাদির গবেষণায় যখন একত্র খাটিয়াছি,—

তখন তাঁহার যে স্নেহ, যে প্রীতি এবং যে কার্য্যকুশলতা ও পরিশ্রম-ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা অপূর্ব্ব। তাহা অনেক সময় আমার আদর্শ স্বরূপ হইয়া আছে। তিনি তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুগণকে সাহিত্য-সেবায় যে ভাবে উৎসাহিত করিতেন, যেরূপে সাহিত্য-সেবীদিগের নিকট পরিচিত করিতেন এবং যে ভাবে সাহিত্য-শিক্ষায় সাহায্য করিতেন, তাহাও অপূর্ব্ব এবং অতি মনোহর। এ বিষয়ে এত সহৃদয়তা অল্প লোকেরই দেখা যায়। তিনি তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নিকট যেরূপ অমায়িক এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাহা আমায় বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। আজ তাঁহার বিয়োগে তাঁহার শত শত বন্ধু তাঁহারা অন্য শত গুণের মধ্যে সেই গুণই স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় চিরদরিদ্র ছিলেন, কিন্তু পরিশ্রমের কষ্টার্জ্জিত উপার্জ্জন ব্যতীত তিনি অন্যভাবে বড় বেশী লোকের কাছে সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেন না। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হইয়া অশেষ প্রকারে তাঁহাকে পীড়ন করিয়াছে, এমন এক এক দিন গিয়াছে যে, দিনান্তেও তাঁহার অন্ন জুটে নাই। পারিবারিক সুখও তাঁহার ছিল না। তাঁহার পুত্র হয় নাই। তিনি অর্থাভাবে কন্যাগুলিকে দরিদ্র পাত্রে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মানসিক কষ্ট আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর শেষে স্ত্রীবিয়োগে ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বৈধব্যে তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়াছিল। অবশেষে দারিদ্র্যের নিষ্পেষনে শেষ কয়েক বৎসর তিনি সাহিত্যচর্চ্চাও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার অকালবিয়োগবেদনা তাঁহাকে আর স্থির থাকিতে দেয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় দুর্দ্দশার ও দুশ্চিন্তার ভারে জ্বরাতিসারে পীড়িত হইয়া শয্যা লয়েন। অতঃপর সে দিন মৃত্যু আসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের সকল জ্বালার শান্তি করিয়া দিয়াছে। মাতৃভাষার এই একজন নিষ্ঠাবান চিরবিশ্বস্ত সেবকের স্মৃতিটুকু যাহাতে লোপ না পায়, তাঁহার কোন না কোনরূপ স্মৃতি তাঁহারই যত্ন ও পরিশ্রমের একাংশভূত ভাষাজননীর এই শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার আয়োজন করাই আমাদের কর্ত্তব্য; আর তাহা করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহার অসংখ্য সাহিত্য-বন্ধু, ছাত্র ও সঙ্গীর দ্বারা তাঁহার ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাচেষ্টা সফল হইবে।*

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সাহিত্যিক।

১

বাল্যকাল হইতে একটির পর একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বাধাগুলি উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে তাহাতেই যেন নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যেই যেন জীবনের সমস্তখানি আনন্দ—সমস্তটুকু সার্থকতা নিহিত ছিল; তাই এম্, এ, পরীক্ষার শেষে সংসারের লক্ষ্যহীন প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়া জীবনটা কেমন যেন খাপছাড়া বোধ হইতে লাগিল। এতকাল পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই শিখি নাই, পুস্তকের রাশি ছাড়া আর কিছুই ভালবাসি নাই,—এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির হইতে বিদায় লইয়া নিতান্তই অসহায় হইয়া পড়িলাম। জগতের সঙ্গে সহানুভূতির অভাব প্রতি পদেই অস্তিত্বটা বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাই একটু নূতনত্বের আশায় পুরী গেলাম।

সমুদ্রতীরে বালুকাপ্রান্তরের মধ্যে আমার ছোট্ট বাসাটি—আর তাহারই সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি যায়, নীল বারিরাশি; আর তাহারই বক্ষে শ্বেতকুসুম-দামের মত শুভ্র ফেনপুঞ্জ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মাথায় চড়িয়া কোন্ দেশ দেশান্তরের বাণী বহিয়া আনিতেছে! সে কি আকুল আবেগময় উচ্ছ্বাস—শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, বাধা নাই, বিরক্তি নাই, ঢেউএর পর ঢেউরাশি কি ব্যাকুল আগ্রহেই ধরাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া আসিতেছে! সারাদিন জানালার ধারে বসিয়া আমি সেই দিগন্তপ্রসারিত নীল বারি-রাশির নৃত্য দেখিতাম আর কেন যেন প্রাণের মধ্যে প্রত্যাখ্যাত সাগরেরই মত একটা গভীর হাহাকার ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিত। হৃদয়ে কি যেন একটা মহাশূন্যতা সদাই অনুভব করিতাম, বিশ্বসংসার খুঁজিয়া তাহার কারণ পাইতাম না। উদার সাগরের তটে বসিয়া বীচিমালার সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে—উপরের নীল আকাশে নক্ষত্র-মালার শোভা দেখিতে দেখিতে কত সন্ধ্যায় মনে হইত, কি যেন আমার ছিল তাহা হারাইয়াছি, কি যেন আমায় চাহি তাহা খুঁজিয়া পাই না। সম্মুখে নীল সাগর; উপরে নীল আকাশ, তাহারই গাত্রে চাঁদিনী রজনীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, আর তাহারই বিমল আভায় যখন নীল সাগরের সর্ব্বাঙ্গে

একটা স্বপ্নরাজ্যের শোভা দিগ্‌দিগন্তে মাখাইয়া দিত, তখন কেবলই মনে হইত, সবাই ত হাসে কেবল আমি কেন মন খুলিয়া হাসিতে পারি না? জগতের সহিত এমনই সহানুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মনের এমনই অবস্থায় বিমলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার বাসার নিকটেই একটা বড় বাড়ী হরিপদবাবু ভাড়া লইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখিতাম, শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ সমুদ্রতীরে বসিয়া একমনে কি চিন্তা করিতেছেন। ভদ্রলোকটির প্রশান্তভাবপূর্ণ আকৃতি অজ্ঞাতে আমার শ্রদ্ধার অনেকখানি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। যাচিয়া আলাপ করিবার অভ্যাস বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু এই সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধের পরিচয় লাভের ব্যগ্রতা দমন করিতে পারিলাম না। কয়েক দিন চেষ্টার পর এক দিন তাঁহাকে একাকী সমুদ্রতীরে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমি যাইয়া পাশে বসিলাম। সহজেই পরিচয় হইয়া গেল—তিনি নাগপুরে ওকালতি করেন, গ্রীষ্মের অবকাশ উপলক্ষ করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, পথে পুরীতে কিছুদিন কাটাইয়া কয়েক মাস বাঙ্গালায় বাস করিয়া যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা। স্বাস্থ্য ভিন্ন যে তাঁহার দীর্ঘ অবকাশ লইবার অন্য কারণও ছিল তাহা প্রকাশ করিতে সরল হৃদয় বৃদ্ধ এতটুকু ইতস্ততঃ করিলেন না।

"আমার মেয়েটি—বিলিও বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা বিবাহের চেষ্টাও দরকার। দূরদেশে থাকি, নিজে না দেখিলেও হয় না—" বলিয়াই তিনি বাতি ঘরের দিকে চাহিলেন। দেখিলাম একটি বর্ষীয়সী মহিলা একটি চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা ও একটি দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত ঝিনুক কুড়াইতেছেন। বালির উপর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ঝিনুক ছড়ান রহিয়াছে, বালিকা আঁচল পূরিয়া সেগুলি খুঁটিয়া তুলিতেছে। তাহার ত্রস্ত সলজ্জ ভাব, সতর্ক চপলতা এবং আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী আমার হৃদয় মরুভূমিতে হঠাৎ যেন এক মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া দিল। আমি বহুদিনপরে মনের মধ্যে যেন একটা ভাবের উন্মেষ অনুভব করিলাম—অনেক দিনের হারানো আমিকে যেন চকিতে ফিরিয়া পাইলাম। নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেরই হাসি পাইল; কিন্তু তাহাতে আনন্দিত ভিন্ন বিরক্ত হইলাম না। বুঝিলাম, এই বালিকাই বিলি। হরিপদবাবু তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিলেন, আমাকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিলকধারী যুবক, আমার অধিক পরিচয় আবশ্যক হইল না।

সেই দিন হইতে হরিপদবাবুর বাসায় নিত্য অতিথি হইতে লাগিলাম। বিলি আমার সম্মুখে বাহির হইত, অথচ আমার সহিত কথা বলিত না। তাহার এই সলজ্জ নীরবতাই তাহাকে আমার কাছে আরও মাধুর্য্যময়ী করিয়া তুলিল, মনে মনে তাহাকেই জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ করিলাম।

হরিপদবাবু একটু নব্যতন্ত্রের লোক হইলেও বাড়ীর মেয়েদের সহিত নিঃসম্পর্কীয় যুবকের স্বাধীন আলাপ পরিচয় পছন্দ করিতেন না; সুতরাং আমি বিলিকে দেখিতে পাইতাম বটে, হঠাৎ কখন তাহার মুখের দিকে চাহিলে সেও যে আমার দিকে সময় সময় চাহিয়া থাকে তাহাও বুঝিতাম বটে, কিন্তু আলাপের সুযোগ পাইতে একটি বিপদের অপেক্ষা রহিল।

সেবার রথযাত্রার সময় যাত্রীদের মধ্যে কলেরা দেখা দিল। এক দিন রাত্রিতে ঘুমাইতেছি, হঠাৎ হরিপদবাবুর কম্পিত আহ্বানে নিদ্রাভঙ্গ হইল; শুনিলাম, বিলির কলেরা হইয়াছে। শশব্যস্তে উঠিয়া তখনই যাইয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলাম—তখন আর আত্মপর ভেদ রহিল না। আমার নিকট একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স ছিল, সেটি অসময়ে বড় কায দিল। অত রাত্রিতে অন্য ডাক্তার পাওয়া গেল না, আমারই ঔষধে বিলি ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। পরদিন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলির মাতা বলিলেন, "বাবা, বিলি আমার বাঁচিয়া উঠিলে তোমাকেই লইতে হইবে।"

তখন বিলির বেশ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখিয়া আমি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। গৃহে জননীর শত অনুরোধে ও অশ্রুবর্ষণেও যে হৃদয় দ্রব হয় নাই আজ এক অজ্ঞাত মহিলার সামান্য প্রস্তাবেই যে তাহা উদ্বেলিত হইল তাহার মূলে অন্য কারণও ছিল। বিলির সহিত বিবাহে যে আমাদের কুলশীলে কোন বাধা ছিল না হরিপদ বাবু পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলেন।

অল্পদিনের আলাপেই বুঝিলাম, এই বয়সেই বিলি বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশেষ আনন্দ হইল। আমিও কয়েক বৎসর বঙ্গ-বাণীর চরণে অনেক অর্ঘ্য ঢালিয়াছি, কিন্তু সে অর্ঘ্য কোমল পুষ্পপত্ররচিত কবিতা নহে, কঠোর কণ্টকময়—গবেষণাপূর্ণ গদ্য রচনা। তদুপরি আমার কয়েকটি প্রতিবাদে তীব্র শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা

শক্তির পরিচয় পাইয়া 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' পত্রের সম্পাদক আমাকে তাহার সমালোচক শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন এবং "বেথাতির" নামে আমার যে সব কঠোর কশাঘাত নবীন গ্রন্থকারদের পৃষ্ঠে বর্ষিত হইত তাহা মাসান্তে অনেক পাঠকের নিকটই চাটনির মত উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের মনে ব্যথা দিয়াই আমার তৃপ্তি হইত, তাই সমালোচকের লেখনীতে মনের বিষ ছত্রে ছত্রে ছড়াইয়া দিয়া নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করিতাম।

যে দিন হইতে বিলির কবিতার সহিত পরিচিত হইলাম, লেখিকার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তাহার কবিতার আবৃত্তি শুনিলাম, সেই দিন হইতে বাঙ্গালা কবিতাকে এক নূতন ভাবে দেখিতে শিখিলাম। বুঝিলাম, কবিতা হৃদয়ে উপভোগ করিবার জিনিস; যাহার হৃদয় নাই তাহার পক্ষে কবিতার রসাস্বাদন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি এমনই বিড়ম্বনায় অনেকবার পড়িয়াছি। তাহা মনে করিয়া অনুতপ্তও হইতাম। ক্রমে আমার মানস-রাজ্যেও একটু একটু কল্পনার চিত্র জাগিয়া উঠিতে লাগিল, নীরস গবেষণা ছাড়িয়া কবিতার চর্চ্চা আরম্ভ করিলাম। বিলি আমার ছন্দোহীন কবিতা পড়িয়া খুব হাসিত, আমিও হাসিতাম।

২

আমাদের বিবাহের আর এক মাস বাকি। মা'কে সব উদ্যোগ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছি। বিলি তখনও খুব দুর্ব্বল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র-তীরে দুই বেলা বেড়াইবার ভার আমার উপরই পড়িয়াছিল। সে দিন ভ্রমণশেষে বাসার সমুদ্রধারের বারান্দায় বসিয়া আমি ও বিলি গল্প করিতেছি,—এমন সময় বিলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাণ চট্ করিয়া একখানা চক্‌চকে বাঁধান বই আমার কোলে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে বইখানির আবরণ দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম; মনের মধ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে একটা চিন্তাপরম্পরা জাগিয়াই নিবিয়া গেল। তখনই সে ভাব দমন করিয়া বিলিকে আলো আনিতে অনুরোধ করিলাম। সে একটু হাসিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছাবশে লণ্ঠনটা সমুখে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল: উদ্বেগপূর্ণ আগ্রহে পড়িলাম, বইখানির নাম 'অশ্রুলেখা' —লেখিকা শ্রীমতী বিমলাবালা দেবী। আমার শিরায় শোণিত দ্রুত বহিতে লাগিল। মলাট উল্টাইয়া দেখিলাম, গোটা গোটা অক্ষরে বিলির হাতের লেখা—"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় শ্রীচরণেষু"। আমাকে বিলির সেই প্রথম

প্রণয় উপহার। আমি অতি কষ্টে মনের ভাব চাপিয়া হাসিমুখে কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে শত প্রশংসাবাদে বিলিকে অস্থির করিয়া তুলিলাম এবং তাহার এ উদ্যম আমার কাছে গোপন রাখিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিলাম। বিলি আনন্দোদ্বেলিত চিত্তে আমার প্রশংসা অতিরঞ্জিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। হায়, আমার সে সময়ের মানসিক অস্থিরতা কে বুঝিবে?

বিলিদের বাসা হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া ষ্টেশনে গেলাম। তখন রাত্রি আটটা। রিপ্লাইপ্রিপেড এক্স্প্রেস্ টেলিগ্রামে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' সম্পাদককে জানাইলাম,—"যেরূপেই হউক শ্রাবণের 'ব্রহ্মাবর্ত্তে' 'অশ্রুলেখার' বেখাতির সমালোচনা প্রকাশ বন্ধ করুন।" আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই 'অশ্রুলেখার'ই তীব্র সমালোচনা লিখিয়া 'ব্রহ্মাবর্ত্তে' পাঠাইয়াছি। তখন কে জানিত তাহা বিলির লেখা?

অনিদ্রায়—উদ্বেগে রাত্রি কাটিল, সকালে উত্তর পাইলাম, "অসম্ভব। ছাপা সব শেষ। ক্ষমা করিবেন।" পত্রিকাখানির ঠিক সময়ে বাহির হইবার সুনাম ছিল, আর চার দিন পরেই 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বিলির হস্তগত হইবে! নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কিছুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া রহিলাম; প্রাতে আর বিলিদের বাসায় গেলাম না। কিছুক্ষণ পরে বাক্স খুলিয়া সমালোচনার খাতাখানি বাহির করিলাম; তাহার পর সেখানি খণ্ডে খণ্ডে ছিঁড়িয়া সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। মনে একটু নিশ্চিন্ততার ভাব আসিল।

বৈকালে বিলির সহিত বেড়াইতে গেলাম, বিলির ভ্রাতা হারাণও সঙ্গে আসিল। আমাদের বাসার সম্মুখে সমুদ্রতীরে আমি ও বিলি একটু বসিলাম। হারাণ কি দেখিয়া ছুটিয়া গেল। আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; ব্যগ্র—ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, সে একতাড়া ছেঁড়া কাগজ হাতে ফিরিতেছে। কাগজগুলি যে আমারই খাতার পাতা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না, অকৃতজ্ঞ সাগর সেগুলি লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই; ঢেউ সরিয়া যাওয়াতে সেগুলি বালির উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আমি শশব্যস্তে "ফেলে দাও" "ফেলে দাও" বলিতে বলিতে কাগজগুলি বিলির হাতে আসিয়া পৌঁছিল। ঘৃণায়—লজ্জায়—ক্ষোভে আড়ষ্ট হইয়া আমি ভ্রাতাভগিনীর কৌতুক দেখিতে লাগিলাম। বিলি সতর্কতার সহিত

অনেক লেখাই প্রায় অবিকল পড়িয়া গেল ও আমার হস্তাক্ষরের সহিত সেই লেখার সাদৃশ্যে বিস্মিত হইয়া উঠিল। শেষে মলাটের পৃষ্ঠায় আমার নামও তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের অনুসন্ধিৎসা তবুও ক্ষান্ত হইল না, ক্রমে 'অশ্রুলেখা'র সমালোচনার পৃষ্ঠাও বাহির হইয়া পড়িল। দুই চারি লাইন পড়িতেই বিমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুরন্ত হারাণ আমার মর্ম্মঘাতী শ্লেষপূর্ণ সমালোচনাটি বিলিকে পড়িয়া শুনাইল। পাঠশেষে বিমলা তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদুটিতে আমার দিকে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিল, "আমার লেখা আপনি এতই বিশ্রী মনে করিয়াছেন, তবে মিথ্যা প্রশংসা করিলেন কেন?" সে স্বরে করুণতা ও বেদনার ভাব জড়িত ছিল। আমি কি উত্তর দিব? নানা কথায় সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। আমার প্রতি কথায় একটা চেষ্টার ভাব প্রকাশ পাইতে পাইল। সে আর বেশী কথা কহিল না। বুঝিলাম, বালিকা বড় ব্যথা পাইয়াছে। সেই রাত্রিতেই তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বিশেষ বাড়িয়া উঠিল; চিকিৎসক তাহাকে খুব সাবধানে রাখিবার উপদেশ দিয়া গেলেন—কোন কারণেই যেন আকস্মিক চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। আমি রোগিণীর ঘরে বসিয়া রহিলাম।

সে দিন শ্রাবণ মাসের ২রা তারিখ। প্রাতঃকাল হইতেই বিলি বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল; বার বার, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজকার ডাকে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' আইসে নাই? আজই ত আসিবার কথা।" আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম। পূর্ব্বদিন বৈকাল হইতে বিলি আর আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে নাই, একবার শুধু বলিয়াছিল, "আমি মিথ্যা ব্যবহারকে ঘৃণা করি।" তাহার অতিরিক্ত আগ্রহে বেয়ারা পাঠাইয়া পোষ্ট আফিস হইতে ডাক আনান হইল; 'ব্রহ্মাবর্ত্তে'র সুপরিচিত মোড়কটি দেখিয়াই চিনিলাম। কাগজ বিলির হাতে পড়িল, অধীর আগ্রহে সে সমালোচনাস্তম্ভ বাহির করিয়া ফেলিল। এক একবার মনে হইল সে পৃষ্ঠাটি ছিঁড়িয়া ফেলি; কিন্তু উঠিবার চেষ্টা করিয়াও নড়িতে পারিলাম না, সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। রুগ্না বিলি ছত্রে ছত্রে সমালোচনাগুলিতে চোখ বুলাইয়া গেল। শেষে 'অশ্রুলেখা'র সমালোচনা দেখিয়া সে মাতাকে পড়িতে দিল; বলিল, "মা, পড়ত।" সেই তীব্র শ্লেষ পড়িতে পড়িতে তাহার মাতার মাঝে মাঝে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল,

অর্দ্ধেক পড়িয়াই তিনি বলিলেন, "এখন থাকুক্।" অবাধ্য বিলি নিষেধ মানিল না, নীরবে সবটুকু শুনিয়া গেল। সমালোচক "বেখাতির"। তাহার পর—তাহার পর সে একবার আমার দিকে চাহিল, অশ্রুতে তাহার চক্ষু ভরিয়া গেল, কম্পিতকণ্ঠে বিলি বলিল, "তবে আপনিই বেখাতির?—" সেই তাহার শেষ কথা—অতিরিক্ত উত্তেজনায় বালিকার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, সকলে কাঁদিতে লাগিল। 'ব্রহ্মাবর্ত্তের' সমালোচনায় সাহিত্য হিসাবে স্থান অতি উচ্চে, তাই সে নিষ্ঠুর কশাঘাত বালিকার কোমল হৃদয়ে বড় বাজিয়াছিল।—আর আমি?

পুরীর স্বর্গদ্বারে বিলির কুসুম কোমল দেহখানি শান্তিলাভ করিল—সে-ই আমার সাহিত্যিক জীবনের শ্মশান।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরি।

বিরহে

—:—

(সংস্কৃত হইতে)

তনু তনু না পেয়ে সে
সুতনুর পরশন।
অশ্রুভারে নত নেত্র
বিনা তা'র দরশন।
কিন্তু এ চঞ্চল চিত্ত
কেন দুঃখনীরে ভাসে।
রয়েছে সতত সে ত
দিবানিশি প্রিয়াপাশে।

শ্রীমতী সু—ঘোষ।

অদৃষ্ট-চক্র।

দশম পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

বৈশাখের প্রভাত। পূর্ব্ব গগনে উষার শোণিমা-সঞ্চারে দিবাগম সূচিত হইতে না হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্যস্তভাব পরিলক্ষিত হইল। গৃহ পূর্ণ; বামাচরণ সপরিবারে গৃহে আসিয়াছে, শৈলজাকে ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া শৈলজার স্বামী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, রাধাচরণও সস্ত্রীক গৃহে আসিয়াছে। নীরজার ও দেবীচরণের বিবাহ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছুদিন হইতে "হিসাব নিকাশ" করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার মনের আশঙ্কা যত বাড়িতেছিল, তিনি আপনার কায শেষ করিবার জন্য তত ব্যাকুল হইতেছিলেন। পাঁচ দিনের ব্যবধানে তিনি কন্যার ও পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তিনি জামাতৃদ্বয়কে আসিতে লিখিয়াছিলেন। শৈলজার স্বামী আসিয়াছেন। যতীশচন্দ্র এখনও আইসে নাই। বৈবাহিকের পত্র পাইয়া কাশী হইতে ধরণীধর নীরজাকে ও দেবীচরণকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; লিখিয়াছেন—তিনি আসিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত; তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার বৈবাহিক অবশ্যই তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

দেবীচরণের বিবাহে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার মত মতই কার্য্য করিয়াছেন—কোন রূপ যৌতুক চাহেন নাই—নগদ অর্থও লয়েন নাই। যতীশচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এমনই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, সংসারজ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞ পাত্রে কন্যাসমর্পণ অভিপ্রেত মনে করিয়া যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, সে চাকরী করিতেছে; পশ্চিমে বাস—পশ্চিমে চাকরী তাই বয়স কিছু অধিক হইয়াছে—বিবাহ হয় নাই।

আজ নীরজার গাত্র-হরিদ্রা। তাই আজ প্রভাত হইতে না হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্যস্তভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিরজা প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া পূজা করিতে বসিল। এ উৎসবে যোগ দিবার অধিকার তাহার নাই। ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া সে ব্রজেন্দ্রের আলেখ্য পূজা করিল। আজ গৃহে এই উৎসবানন্দের মধ্যে তাহার হৃদয়

অব্যক্ত যাতনায় ব্যথিত হইতেছিল। পতির চিত্রপ্রণামকালে তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে চিত্রখানি চুম্বন করিল। দালান হইতে তারাচরণ ডাকিল "মেজ পিসীমা"। বিরজা দ্বার খুলিল; তারাচরণ একখানি রেজেষ্টারী করা পত্র আনিয়াছিল। বিরজার বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ তাহার শাশুড়ীর পত্র। সে রসিদে সহি করিয়া রসিদখানি তারাচরণের হস্তে দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল ও বাক্স হইতে কাঁচি লইয়া খাম কাটিয়া ফেলিল। পত্রমধ্যে এক শত টাকার নোট ছিল—তাহা রাখিয়া বিরজা সাগ্রহে শাশুড়ীর পত্র পড়িতে লাগিল। শাশুড়ীর পত্র বিরজার পক্ষে একাধারে বেদনা ও সান্ত্বনার কারণ। তাঁহার পত্রের প্রতি কথায়—প্রতি জিজ্ঞাসায় সে তাহার প্রতি শাশুড়ীর আন্তরিক অপরিম্লান মাতৃস্নেহের পরিচয় পাইত। তাঁহার সমস্ত স্নেহ যেন এখন বিরজাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার কি দুর্ভাগ্য—সে তাঁহার নিকটে থাকিয়া সে স্নেহ ভোগ করিতে পাইল না—তাঁহার সেবা করিতে পাইল না! আর সেই পত্রে যে স্নেহ আত্মপ্রকাশ করিত সে স্নেহে সে নিষ্ফল জীবনের বিষম বেদনায় কিছু সান্ত্বনা পাইত। তাই শাশুড়ীর পত্র পাইলেই বিরজা সাগ্রহে তাহা পাঠ করিত—একবার নহে, বার বার পাঠ করিত। এ পত্রেও তিনি পূর্ব্বের সকল পত্রের মত বিরজাকে কত কথা জানাইয়াছেন—কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—কত উপদেশ দিয়াছেন। আর তিনি তাহার ভ্রাতাভগিনীর বিবাহে যৌতুকাদির জন্য এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিরজা দুইবার পত্রখানি পড়িল—তাহার পর পত্র ও নোট বাক্সে রাখিয়া দালানে আসিল।

দালান দিয়া যাইবার সময় বিরজা দেখিল, পার্শ্বের কক্ষে সরোজা একাকিনী বসিয়া আছে। আজ গৃহে উৎসবের সময় তাহাকে একাকিনী সেই কক্ষে দেখিয়া বিরজা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল;—দেখিল, সে একখানি পত্র হস্তে লইয়া কাঁদিতেছে।

বিরজা যাইয়া ভগিনীর নিকটে বসিল। ব্যথার ব্যথী ভগিনীকে পাইয়া সরোজার অশ্রু দ্বিগুণ ঝরিতে লাগিল। বিরজা পত্রখানি লইয়া পড়িল। পড়িয়া সে-ও কাঁদিল। দুই ভগিনীতে কিছুক্ষণ কাঁদিল। তাহার পর শান্ত হইয়া বিরজা পত্রখানি লইয়া পিতার সন্ধানে গেল। সেই পত্রে যতীশচন্দ্র সরোজকে লিখিয়াছিল, সে যখন তাহার কথা শুনে নাই—তখন সে আর

পতির কর্ত্তব্যে বাধ্য নহে। সে পুনরায় বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে। সেই দিনই তাহার বিবাহ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রোয়াকে দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন এমন সময় বিরজা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। আজ গৃহে আনন্দোৎসব। এই উৎসবের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কেবল পত্নীকে ও ব্রজেন্দ্রকে মনে পড়িতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, বিরজার জননী তাঁহার অপেক্ষা কত পুণ্যবতী—তাঁহাকে কন্যার বৈধব্যদুঃখশেল বক্ষ পাতিয়া লইতে হয় নাই। সম্মুখে বিরজাকে দেখিয়া তিনি দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি কন্যার বেদনায় আপনার বেদনা বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মা?" বিরজা পিতাকে যতীশচন্দ্রের পত্র দিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্র পাঠ করিলেন। তিনি রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন—কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। যেন তিনি বজ্রাহত—বাহ্যজ্ঞানহত। তাঁহার মনে হইল, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই কেন?

দেখিতে দেখিতে গৃহে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল—অন্ধকার গৃহ নির্ব্বাপিত দীপের ধূমে আরও অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ পিতাকে বলিল, তাহারা কলিকাতায় চলিল। পার্ব্বতীচরণ বলিল, সে যেমন করিয়াই হউক যতীশচন্দ্রের বিবাহ বন্ধ করিবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও যাইতে চাহিলেন,—বামাচরণ বলিল, "আমরা তাহাকে পাইলে না লইয়া আসিব না। আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ আপনি আজ গৃহ হইতে যাইলে গৃহে সব বিশৃঙ্খল হইবে। এ দিকেও ত সব দেখিতে হইবে।"

বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ কলিকাতায় পৌঁছিয়া যতীশচন্দ্রের বাসায় গেল। যতীশচন্দ্র তথায় নাই। অমূল্যচরণ আশঙ্কা করিয়াছিল, এ বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তাহার পরামর্শে যতীশচন্দ্র আপনার বাসা হইতে যাইয়া তাহার বাসায় উঠিয়াছিল।

বাসায় যতীশচন্দ্রকে না পাইয়া বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ তাহার বন্ধু অমূল্যচরণের গৃহে গেল। তথায় যতীশচন্দ্রের সন্ধান চাহিলে অমূল্যচরণ তাহাদিগকে যেরূপে অপমানিত করিল—পূর্ব্বে কখনও তাহারা সেরূপ অপমান ভোগ করে নাই। বামাচরণ ক্রুদ্ধ হইল, ভ্রাতাকে বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে। এখন চল।" পার্ব্বতীচরণ ভ্রাতাকে শান্ত করিল; বলিল, "আমা-

দের অপমানে দুঃখ কি? যদি সরোজার সর্ব্বনাশ নিবারণ করিতে পারি, তবে কোন অপমানই অপমান মনে করিব না।”

দুই ভ্রাতা অনাহারে সমস্ত দিন অমূল্যচরণের গৃহের সম্মুখে রাজপথে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈশাখের সূর্য্য অগ্নিময় কর বর্ষণ করিয়া রাজপথ দুঃসহ তাপে তপ্ত করিয়া দিল—পথিপার্শ্বস্থিত গৃহগাত্র হইতে দারুণ উত্তাপ নির্গত হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতা দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে বৈশাখের দীর্ঘ দিনও শেষ হইয়া আসিল; রাজপথে ছায়া পড়িল, বিরলপথিক পথে আবার পথিকের বাহুল্য লক্ষিত হইল। দুই ভ্রাতা দাঁড়াইয়া রহিল। বামাচরণ বিরক্ত হইতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ স্থির—ধীর।

তাহার পর গৃহদ্বারে দুইখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কয়জন যুবক গৃহ হইতে আসিয়া একখানিতে উপবিষ্ট হইল। দুই ভ্রাতা গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমূল্যচরণ গৃহদ্বারে বামাচরণের ও পার্ব্বতীচণের অবস্থান লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার আদেশে গাড়ির সহিস রূক্ষ কণ্ঠে—ভ্রাতৃদ্বয়কে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। বামাচরণের ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছিল। এবার সে সীমা অতিক্রান্ত হইল। রাজপথে দাঁড়াইবার অধিকার সকলেরই আছে বলিয়া সেও রূক্ষ কণ্ঠে উত্তর দিল। দুইজনে বচসা আরব্ধ হইল। পার্ব্বতীচরণ আর ভ্রাতাকে স্থির রাখিতে পারিল না।

এই বচসার সুযোগে অমূল্যচরণ যতীশচন্দ্রকে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্বরিতপদে শকটে আরোহণ করিল। গাড়ী চলিয়া গেল, সহিস গাড়ীর পশ্চাতে উঠিল। পার্ব্বতীচরণ উন্মাদের মত শকটের পশ্চাদ্ধাবনপর হইল; কিন্তু গাড়ী ধরিতে পারিল না। সে যখন শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন বামাচরণ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার মুখ বৈশাখের ঝঞ্ঝাভীষণ অপরাহ্নের মত অন্ধকার; তাহার চক্ষুতে ক্রোধদীপ্তি।

সেই দিনই দুই ভ্রাতা কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রদিগের অবস্থা দেখিয়াই তাহাদের অসাফল্যের পরিচয় পাইলেন। পার্ব্বতীচরণ সব কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বামাচরণ কোন কথা কহিল না, বিষম বেদনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল।

কোনরূপে নিয়ম রক্ষা করিয়া নীরজার ও দেবীচরণের বিবাহ হইয়া গেল। মনে যখন সুখ থাকে না তখন গৃহে উৎসবে আনন্দ আসিবে কোথা হইতে?

ভট্টাচার্য্য-পরিবারে দুর্দ্দশার ঘন মেঘ ঘনীভূত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল, যে বজ্র সরোজার বক্ষে পতিত হইয়াছে সেই বজ্রেই তাঁহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। বিরাজার বৈধব্য বিধাতার শাস্তি—অদৃষ্টের দণ্ড। কিন্তু সরোজার দুর্দ্দশা—এ যে মানুষের স্বকৃত বিষম বেদনা! হায় বিধাতার দণ্ড অপেক্ষা মানুষের দণ্ড কত অধিক বেদনাদায়ক!

সরোজা এ সংবাদ শুনিল। এ সংবাদ এমনই মর্ম্মভেদী যে, সে আপনার দুর্দ্দশার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে উপলব্ধি সময়সাপেক্ষ—যত দিন যায় তত দুর্দ্দশার বেদনা পরিস্ফুট হয়—তত বেদনার স্বরূপ সপ্রকাশ হয়।

বিরহিনী।

সাঁঝের তারাটি গোধূলি-গগনে
নীরবে ফুটেছে হাসিয়া,
উপবনে ফুল হেসে পড়ে লুটে
মলয়-সোহাগে দুলিয়া,
বিহগ ফিরেছে আপন কুলায়ে
কাকলি থেমেছে কাননে।
ফেরে নিক বঁধু কেন গো এখনো
হাসিসুধা নিয়ে আননে?
সুনীল গগন ছাইয়া গিয়াছে
সুপ্ত জ্যোছনা-কিরণে,
কাননে কুসুম ঘুমায়ে পড়েছে
বিভোর প্রণয়-স্বপনে,
নিঝুম নিশীথ, ঘুমায় তটিনী
মলয়া পড়েছে ঢুলিয়া,
ছল ছল আঁখি নিরালা কুটীরে
বধূয়া কেবল জাগিয়া।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ

জিন্নতুন্নিসা বেগম।*

জিন্নতুন্নিসা নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ'র একমাত্র কন্যা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জিন্নৎ বেগমের জীবনের বিশেষ গৌরবময় কাহিনী লিপিবদ্ধ না থাকিলেও তাঁহার জীবন নানাবিধ ঘটনার অধীন হইয়াছিল। সে ঘটনাগুলি সহজে পাইবার উপায় বড় কম। আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

যৎকালে মুর্শিদ কুলি খাঁ হায়দ্রাবাদের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার কন্যা জিন্নতুন্নিসার সহিত দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী সুজা খাঁ'র পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সুজা খাঁ খোরাসানাধিবাসী তুর্কজাতীয় 'আফ্‌-সার' বংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি জিন্নতুন্নিসাকে বিবাহ করিয়া নবাব মুর্শিদ কুলির পরিবারমধ্যেই বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে শ্বশুরের যত্নে ও চেষ্টায় সুজা খাঁ উড়িষ্যার সুবাদারপদে অধিষ্ঠিত হয়েন; কিন্তু অত্যল্প-কাল পরে শ্বশুরের সহিত তাঁহার দুর্দ্দমনীয় মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। উভয়ের মনোভাব বিভিন্ন থাকায় ও শাসনকার্য্যে নানাবিধ মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় এই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে সুজা শ্বশুরের নিকট হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া, উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিতে লাগি-লেন ও স্বয়ং শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

সুজা খাঁ ন্যায়প্রিয় ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত লোক ছিলেন ও কখনও ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। তাঁহার এই সমস্ত গুণই তাঁহাকে প্রজাপ্রিয় করিয়াছিল।

পিতার সহিত মনোবিবাদের জন্য ও স্বামীর চরিত্রহীনতার কথা শুনিয়া, সুজার সহিত ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা জিন্নতুন্নিসার বিবাদ আরব্ধ হইল। ইহারই ফলে বেগম সাহেবা স্বীয় পুত্র সরফরাজকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে † আসিয়া শান্তিময় প্রাণে পিত্রালয়েই জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

সুজার উড়িষ্যায় অবস্থানকালে মীর্জ্জা মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। মির্জ্জা আফ্‌সার বংশীয়া সুজার কোন আত্মীয়াকে

---

* ইঁহার অপর নাম আজামুন্নিসা বা আজামাতুন্নিসা।

† মুর্শিদ কুলি খাঁর নামানুসারে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন।

বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে দুইটি পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ হাজি অহম্মদ ও কনিষ্ঠ আলিবর্দ্দী। মীর্জ্জা মহম্মদ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দিল্লী হইতে পত্নীকে লইয়া সুজার নিকট ভাগ্য পরীক্ষার্থ উপস্থিত হয়েন। সুজা তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়া নিজাধীনে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর ঘটনাচক্রচালিত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁও উড়িষ্যার নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সাহস ও বুদ্ধিবলে সুজার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। দিন দিন আলিবর্দ্দীর উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাজি অহম্মদকে সাজাহানাবাদ হইতে সপরিবারে উড়িষ্যায় লইয়া আসিলেন। উভয় ভ্রাতাই যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে ও রাজ্যপালননীতিতে বিচক্ষণ ছিলেন। ইঁহারা নানা বাধা বিঘ্ন বিদুরিত করিয়া সুজা খাঁ'র শাসনশক্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় প্রতিভাবলে সুজার অধীনে সর্ব্বোচ্চ রাজপদ লাভ করিলেন।

মুর্শিদ কুলি আপনার মৃত্যু নিকট দেখিয়া ও জামাতা সুজার প্রতি পূর্ব্ববৎ বিরূপ থাকায়, স্বীয় কন্যা জিন্নতুন্নিসার পুত্র সরফরাজকে বাঙ্গালার নিজামৎ প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করেন। এই কথা সুজার কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি আলিবর্দ্দী ও হাজি অহম্মদের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নিজামতি প্রাপ্তির জন্য দিল্লীর বাদশাহের নিকট নানাবিধ বিচিত্র উপঢৌকন পাঠাইলেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনের জন্য আরজীও পেশ করিলেন।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই মহাপ্রতাপশালী নবাব মুর্শিদ কুলির নশ্বর দেহ শীতল সমাধিতলে বিশ্রাম লাভ করিল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বেই সুজা, আলিবর্দ্দীকে সঙ্গে লইয়া, মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন; পথিমধ্যেই তিনি দিল্লী হইতে পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলেন ও শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের পথ ধরিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্রই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্না হইয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন। সুজা খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইলেন। মুর্শিদাবাদের স্বর্ণখচিত মসনদ তাহার দেহভার বহন করিয়া সৌভাগ্য বোধ করিল;

যথাসময়ে এই সংবাদ সরফরাজের কর্ণে পৌঁছিল। জিন্নতুন্নিসা তখন মুর্শিদাবাদ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সরফরাজ তখনই পিতৃসকাশে আগমন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন ও তাঁহার মসনদ

অধিকারে কোনরূপ বিষণ্নচিত্ত না হইয়া বরং প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিলেন: পিতাপুত্রে এই ভাবেই মিলন হইল।

এই সময়ে আজিমাবাদ (পাটনা) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার অধীনে আসিল, ও তাহার শাসনভার সুজার হস্তে পড়িল। সুজা খাঁ তাঁহার দুই পুত্র সরফরাজ ও তকী খাঁ'র মধ্যে কাহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জিন্নতুন্নিসা স্বীয় পুত্র সরফরাজকে পাটনায় পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু অসূয়াপরবশ হইয়া সপত্নীপুত্র মহম্মদ তকীকেও* প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে বাধা দিলেন। সুজা পত্নীর অমতে কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি আলিবর্দ্দীকেই প্রতিনিধিরূপে পাটনায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। জিন্নতুন্নিসা এই প্রস্তাবের সম্যক্ অনুমোদন করিলেন। তিনি আলিবর্দ্দীর নিয়োগে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কক্ষদ্বারে ডাকাইয়া আনাইয়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন ও তিনি নিজেই যেন তাঁহাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, আভাসে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।†

নাদির শাহ যখন দিল্লীর দ্বারে উপস্থিত, সেই সময়ে বাঙ্গালার লোকপ্রিয় প্রজাহিতৈষী নবাব সুজা খাঁ পরলোক গমন করিয়া রোশনীবাগে চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র সরফরাজ মসনদে অধিরূঢ় হইলেন। আলিবর্দ্দী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের শ্রীবৃদ্ধিতে সরফরাজের দরবারে তাঁহার কতকগুলি শত্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিনিয়ত সরফরাজকে মীরজা মহম্মদ, আলিবর্দ্দী, ও হাজি অহম্মদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। ইহার ফলে হাজি অহম্মদকে প্রধান দেওয়ান বা মন্ত্রীর পদ হইতে বিচ্যুত করা হইল ও তাঁহার জামাতা আতাউল্লা খাঁ'র হস্ত হইতে রাজমহলের ফৌজদারী গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে

* Holwell বলেন—মহম্মদ তকী জিন্নতুন্নিসার গর্ভজাত ও জ্যেষ্ঠ পুত্র।

† *She* appointed him to the government of Behar, as from herself.

এই স্থলের পাদটীকায় মুতাক্ষরীণকার লিখিয়াছেন:—

Zinet-en-nissa seems to have insisted on her husband recognising her as the heiress to the government, and considered him rather as the vice-roy consort than viceroy in his own right.

Siyar-ul Mutakharin, Translated by John Briggs. Vol. I p. 385.

পদচ্যুত করিবার মন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে হাজি অহম্মদ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রতীকার বিধানের জন্য স্বীয় ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে পত্র লিখিলেন।

আলিবর্দ্দী এই সংবাদ শ্রবণে ও সরফরাজের নানারূপ অত্যাচারে সসৈন্যে পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন ও গিরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে সরফরাজকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিলেন। যুদ্ধের দুই দিবস পরে আলিবর্দ্দী বিশেষ সমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মস-নদে বসিবার পূর্ব্বে তিনি জিন্নতুন্নিসার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন ও সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া বেগম সাহেবার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কহিলেন; পরে ধীর স্বরে বলিলেন—"অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে এবং এই হতভাগ্য গোলামের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্জল্যমান রহিবে; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যত দিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আপ-নার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিব না। আশা করি, এই হতভাগ্য সন্তপ্ত গোলামের অপরাধ সময়ে আপনার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে।"

ইহা শুনিয়া জিন্নতুন্নিসা আর কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

ইহার পর বেগম সাহেবার বিষয় ইতিহাসে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

আজিমনগরের প্রাসাদ হইতে আধ মাইল উত্তরে, বেগম সাহেবা যে, মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহি-য়াছে। এই মসজিদের অনতিদূরে তিনি সমাহিতা আছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

নীলাম্বরী*।

সকল দেশেই সময়ে সময়ে এক একজন শক্তিশালী লেখক আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রের যে দিকেই বিচরণ করেন, সেই দিকেই সোণা ফলাইতে পারেন। তাঁহারা ধূলামুঠা ধরিলে তাহা প্রতিভার পরশপাথরস্পর্শে সোণামুঠা হইয়া যায়। আমাদের দেশে ৺বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর লেখকের অগ্রণী। সাহিত্যের নানা বিভাগেই ইঁহারা উভয়ে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা দেখাইয়াছেন। জনসনের কথার উপর একটু রং চড়াইয়া একজন আধুনিক সমালোচক গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন (He was a very literary Midas ; he could transmute to gold whatever he touched) তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিলে কিঞ্চিন্মাত্র অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও আরও কোন কোন লেখক আমাদের সাহিত্যের নানা বিভাগে বিচিত্র কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র অতি অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্যের নানা বিভাগে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনিও এই শ্রেণীভুক্ত হইবার বিলক্ষণ দাবী রাখেন। তিনি দর্শন-শাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপক। গত কয়েক বৎসরে তিনি যে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার বিদ্যাবত্তা, চিন্তাশীলতা, যুক্তিপ্রয়োগ-কৌশল ও ভাবপরিস্ফুটীকরণ-ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দেয়। তবে দর্শন-শাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপকের পক্ষে দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব লাভ তাদৃশ বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তিনি শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলনে একাধিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, সেগুলিও তাঁহার চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তির পরিচায়ক। তাঁহার প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষজ্ঞের পুস্তককেও পরাস্ত করিয়াছে। তাঁহার ভাষার এমন

* নীলাম্বরী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আকর্ষণী-শক্তি, ইতিহাসের কাহিনী বলিবার তাঁহার এমন কৌশল যে, তাহাতে শিশু চিত্তে ত উৎসাহের সঞ্চার হইবেই, মাদৃশ মাতামহত্বপ্রাপ্ত জরদ্গবের হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে; একাসনে বসিয়া একমনে একধ্যানে গ্রন্থখানি আগুন্ত—আদ্যোপান্ত নহে, কেন না শেষ রাখি নাই—পড়িয়া ফেলিয়াছি। আবার তিনি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদসম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে ভাষাতত্ত্বজ্ঞের প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

খগেন্দ্র বাবু যদি এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যে কবিকল্পনাকুশল—এ অপবাদ লোক সাহস করিয়া দিতে পারিত না। কিন্তু তিনি 'আর্য্যাবর্ত্ত' 'মানসী' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে যে ছোট গল্পগুলি লিখিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়কে উষর ক্ষেত্রে পরিণত করে নাই। ইহা ছাড়া অল্প অল্প স্মরণ হয়, 'মানসীর' পত্রের আবডালে তাঁহার দুই একটি কবি-কাকলীও শ্রুতিগোচর হইয়াছে, সেগুলির কেমন একটা মোহময়, স্বপ্নময়, ভাবের আবেশে চিত্ত মোহিত হয়। আবার এমন কথাও কাণাঘুঁষা শুনিয়াছি যে, খগেন্দ্র বাবু সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতকলাকুশল, তাঁহার গীতগোবিন্দ-গান রসিক সুজনের উপভোগ্য। বাস্তবিকই খগেন্দ্র বাবুর গুণের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়
একাধারে এত গুণ বিরাজিত রয়।

যাক্, আর বাড়াবাড়ি করিব না, শেষে পাঠকবর্গ না ভাবিয়া বসেন যে, সমালোচকের অবস্থা 'নীলাম্বরী' গল্পের নায়কের ন্যায়!

সম্প্রতি খগেন্দ্র বাবু নানা মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বপ্রকাশিত আটটি গল্প একত্রে বাঁধিয়া, "বিচ্ছিন্ন পল্লবগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া", 'নীলাম্বরী' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, কালী, get-up, সমস্তই পরিপাটী। 'নীলাম্বরী' নীলাম্বরীতে মোড়া, সেই নীলাম্বরীর উপর আবার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের সোণার চুম্‌কি বসান। পাঠকদিগকে অনুরোধ করা বেয়াদবী হইবে, পাঠিকা-সুন্দরীরা—হেমবরণীই হউন আর শ্যামবরণীই হউন—এক একখানি

কিনিয়া পড়ুন (পরুন!)। পাঠিকাদিগকে লইয়া একটু রসিকতা করিলাম, কুরুচি হইল না ত!

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে—এ পুস্তকখানিরও দোষ আছে। এমন সুন্দর সুদৃশ্য পুস্তকে একখানি ছবি নাই। পাঠকবর্গ ডরাইবেন না, ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির কথা তুলিতেছি না। লাহা মহাশয়ের অঙ্কিত 'নীলাম্বরী সুন্দরী'র একখানি চিত্র থাকিলে ষোল কলা সম্পূর্ণ হইত। অনুকল্পে, গ্রন্থকারের ফুটফুটে চেহারাখানির একটি ফোটো থাকিলেও মন্দ হইত না। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে না কি?

পুস্তকখানি কাহার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, "তিনি হন কে—Who is S H E?" সে এবা—অর্থাৎ কি না, অন্বেষণ আমাদের অধিকারবহির্ভূত। আমরা কেবল ন The greatest art is to hide art!

প্রথম গল্পটির নাম 'নীলাম্বরী'। সেই গল্পটির নামে গোটা বহিটার নামও নীলাম্বরী। মায়ের অনেকগুলি সন্তান হইলেও প্রথম সন্তানের নামেই আমাদের সমাজে মায়ের পরিচয় দেওয়া রীতি। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, পুস্তকের নামকরণে কোন অসঙ্গতি হয় নাই।

এই পর্য্যন্ত গেল মলাট সমালোচনা। এক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করি।

প্রথম গল্পটিতে ব্যঙ্গের একটি চাপা সুর বড় মিঠে বাজিয়াছে। প্রেমের পথে যাত্রী হইতে হইলে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে অসঙ্গতি ঘটে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ কোন কোন কবিতায় ও 'গোড়ায় গলদে' সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। "নলিনীর মত হৃদয় তাহার, নলিনী যাহার নাম," ললিতমোহন নাম যা'র সে রমণীমনমোহন, আর নিমাই নামের নায়ক গড়ো গোয়ালা হইবেই হইবে, ইত্যাকার কবিত্বময়ী যুক্তির দুর্গতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে বিলক্ষণ ঘটিয়াছে। খগেন্দ্র বাবুও এই গল্পে, কল্পনা ও আসলে গড়মিল হইয়া কি বীভৎস কাণ্ডের সৃষ্টি করে, তাহা প্রকৃত দার্শনিকের মতই দেখাইয়াছেন। আশা করি, খগেন্দ্র বাবু নিজেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন এবং তাহার ফলে, তাঁহার নায়কের ন্যায়—তাঁহারও দাম্পত্য জীবন সুখময়—শান্তিময় হইয়াছে। ছার বাঙ্গালী-জীবনে এই অসঙ্গতিই যে একটা নিষ্ঠুর Irony.

এ গল্পের অধিক প্রশংসা না করিলেও চলে, কেননা 'প্রবাসী'র কষ্টি-পাথরেও ইহাতে এক রতিও খাদ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় গল্প—'হতভাগ্য'—একটি করুণ কাহিনী। "যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তা'র পাশে"—এই চিরন্তন বিধি ও সেই বিধির উপর বিধির চিরন্তন অভিশাপের কথা। সমাজতত্ত্ব হিসাবে এ গল্পে শিক্ষণীয় আছে।

তৃতীয় গল্প—'প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী'— আরও করুণ। রমণীপ্রেম ও বন্ধুত্বের মধ্যে নিষ্ঠুর সঙ্ঘর্ষ ও তাহার ফলে নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

চতুর্থ গল্প—'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'—বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের একটি মধুর চিত্র —idyll। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে একটু ভয় হইয়াছিল, বুঝি 'নীলাম্বরী'র ন্যায় এখানেও বাস্তব ও আদর্শের অসঙ্গতি একটা ঘোর বিড়ম্বনায় পরিণত হয়, অথবা শিল্পী নায়ক গ্রীকপুরাণোক্ত Pygmalion এর দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ঠাকুর রক্ষা করিয়াছেন এবং মধুর উপাখ্যানটির শুভদৃষ্টিতে মধুর উপসংহার হইয়াছে।

Soft eyes looked love to eyes which spake again,
And all went merry as a marriage-bell.

পঞ্চম গল্প—'আশার সমাধি'—আরম্ভে হাস্যরস, অবসানে করুণরস। পুরীতে সমুদ্র-বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে অতি সুন্দর ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকের মেশামিশি আমার ধাতে বড় সহে না। সুতরাং গল্পটি ভাল লাগিল না। তবে সে জন্য অবশ্য খগেন্দ্র বাবু অপরাধী নহেন—আমারই রুচির দোষ। (এই অধম সমালোচকের রুচির দোষ বিলক্ষণ আছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।) শিক্ষিতা যুবতীর নিকট শিক্ষিত যুবকের বিদ্যাগর্ব্ব কবিত্বগর্ব্ব ইত্যাদি ও অবশেষে দর্পচূর্ণ—এইরূপ আর একটি গল্প যেন কয় বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতীতে' পড়িয়াছিলাম মনে হয়। তবে এরূপ ঘটনা এমন অসাধারণ নহে যে, দুইজন লেখক পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই প্রকারের ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন না।

সপ্তম গল্প—'প্রত্যাবর্ত্তন'। এই নামে প্রভাত বাবুরও একটি গল্প আছে। তবে প্রভাত বাবুর প্রত্যাবর্ত্তন—পরকীয় সমাজ হইতে স্বকীয় সমাজে, ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে; আর খগেন্দ্র বাবুর—শ্রীবিষ্ণুঃ—রামশরণের প্রত্যাবর্ত্তন প্রবাস হইতে গৃহে। 'Home? What home? Had he a home?' গল্পটির Enoch Arden এর সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে,

অথচ যথেষ্ট অমিলও আছে। সুতরাং মৌলিকতার হানি হয় নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। রামশরণের কাহিনীটি করুণ নহে—নিষ্করুণ। আমরা এরূপ সামাজিক চিত্রের পক্ষপাতী নহি। জানি, জগতে আলো আছে, ছায়াও আছে; পূর্ণিমা আছে, অমাবস্যাও আছে; দেবী আছে, পিশাচীও আছে। কিন্তু কল্পনাকুশল কবির মুখে আমরা সে কঠোর সত্য শিখিতে চাহি না। আমরা নারীকে দেবীরূপে, গৃহলক্ষ্মী-রূপে, দেখিতে চাহি, তাঁহার পিশাচীমূর্ত্তি দেখিতে চাহি না; তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিকারিণী বলিয়া জানিতে চাহি, তাঁহার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে চাহি না। Enoch Arden এর কাহিনী বিলাতী সমাজে বেশ খাপ খায় কিন্তু আমাদের সমাজে এবংবিধ কাহিনী বড় বিসদৃশ লাগে। গ্রন্থকার সমাজতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকের দিক্ হইতে কলঙ্কিনীর উপর যথেষ্ট অনুকম্পা বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকলই ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই দুইটি গল্পসম্বন্ধে যে মন্তব্য করিলাম, তাহা হিন্দু-'কুসংস্কারের' বশবর্ত্তী হইয়াই করিলাম—কেন না আমার Personal idiosyncrasy সেই দিকে। সম্ভবতঃ মার্জ্জিতরুচি পাঠকবর্গ উভয় গল্পই উপভোগ করিবেন।

'ঘুমের পাহাড়' ও 'বাঁশীচোর' দুইটি গল্প জনপ্রবাদ অবলম্বনে লিখিত। যিনি ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষেত্রান্তরে কৃতিত্ব-লাভ করিয়াছেন, তিনি যে জনপ্রবাদ অবলম্বনে মনোমদ কাহিনী রচনা করিতে পারিবেন, সে আর বিচিত্র কি? কেন না জনপ্রবাদের মূলে অনেকখানি কবিত্বরস in a crude form সঞ্চিত থাকে। দুইটি গল্পই বড় করুণ, বড় মধুর। 'ঘুমের পাহাড়ে' প্রেমিক যুগলের জীবনের অবসান বড়ই মর্ম্মভেদী। গল্প দুইটির ভাষাও অপূর্ব্ব আবেশময়।

'বাঁশীচোর' গল্পটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর In small proportions we just beauties see—এই কবিবচন স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা একটি নিটোল মুক্তা, ভাষা ভাব রস সবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। গল্পটির ভাষা এমন পরিপাটী, বর্ণনার ভঙ্গী এমনই মনোহর, শব্দচয়নকৌশল এমন সুন্দর যে একটি শব্দ বা বাক্য বাদ দেওয়া যায় না। স্থানাভাবে নিদর্শনস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, বড় দুঃখ রহিল। তবে দুঃখের মধ্যে এই

সান্ত্বনা যে, একটু আধটু উদ্ধৃত করিয়া মনের খেদ মিটিত না, কোন অংশ ছাড়িবার যো নাই। মিলটন Simple, Sensuous Passionate বলিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে নির্দ্দেশ যদি যথার্থ হয়—তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব, 'বাঁশীচোর' গল্পে প্রকৃত কবিত্ব আছে।

'নীলাম্বরী,' ও 'বাঁশীচোর' পুস্তকের আদিতে ও অন্তে বসাইয়া গ্রন্থকার সুন্দর নির্ব্বাচন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

এতক্ষণ গল্পগুলি ব্যষ্টিভাবে দেখিলাম। এক্ষণে সমষ্টিভাবে দেখিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম গল্পটি ছাড়া অন্য সমস্ত গল্প করুণরসে অভিসিক্ত। প্রথম গল্পেও হাস্যরসের মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় করুণরস রহিয়াছে। দর্শনের অধ্যাপক গল্প লিখিয়াছেন শুনিলেই পাঠকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে, বুঝি George Eliot বা George Meredith বাঙ্গালী সমাজে আবির্ভূত হইলেন—বুঝি রবিবাবুর 'গোরা' আবার সঙ্গীন খাড়া করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাঠকবর্গকে অভয় দিতেছি যে, এই আটটি গল্পে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা দর্শনের জটিল তত্ত্ব কাব্যাকারে প্রকটিত হয় নাই।

ছোট গল্পের রাজা রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পার্শ্বেই বোধ করি প্রভাত বাবুর স্থান। ইহা ছাড়া সাহিত্যাকাশের এই অংশে আরও অনেক জ্যোতিষ্ক কিরণ বিতরণ করিতেছেন। খগেন্দ্র বাবু এই আকাশের কোন্ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা বিচার করিতে পারি, এমন শক্তি আমাদের নাই। আমরা গল্পখোর। সকল শ্রেণীর সকল রসের গল্পই আমাদের ভাল লাগে। সাহিত্যফলাহারে আম, জাম, লিচু, গোলাপ জাম, কমলা লেবু, মর্ত্তমান কলা সবই আমরা নির্ব্বিকারচিত্তে উপভোগ করি। সাহিত্যরুচির এরূপ সার্ব্বভৌমিকতা বোধ হয় নিতান্ত দোষের নহে।

পুস্তকের ভাষাসম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থকার সাধুভাষার পক্ষপাতী। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, অক্ষয়কুমার দত্তের পর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও রজনীকান্ত গুপ্ত সাধুভাষার দিকে খুব ঝুঁকিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বর্ত্তমান কালে এই Schoolএর একমাত্র exponent; খগেন্দ্র বাবুও সেই পথ ধরিয়াছেন। তবে তিনি ও মৈত্রেয় মহাশয় প্রয়োজনমত চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সাধুভাষা সামলাইয়া লেখা

একটু হুঁসিয়ারি কায। অনেকেই তাল রাখিতে না পারিয়া 'মড়াদাহ' করিয়া বসেন। কিন্তু খগেন্দ্র বাবু পাকা ওস্তাদের মত কলমের রাশ ধরিয়া রাখিয়াছেন। কোথাও গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে নাই। তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার বিচিত্র লীলাময়ী ভাষার নিবিড় বন্ধন লিপি-কুশলতার পরিচায়ক।

* * * * * * *

এরূপ সমালোচনায় পাঠকবর্গ চটিবেন, তাহা জানি। সর্ব্বত্র আভাসেই সারিলাম, গল্পগুলির সংক্ষিপ্তসার দিলাম না; পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিলাম, কিন্তু তাহা নিবৃত্ত করিলাম না। তাঁহাদিগকে ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে। গুরুতর অপরাধ বটে!

এরূপ সমালোচনায় সম্পাদক চটিবেন, তাহাও জানি! সত্যবানের ন্যায় কুঠারহস্তে (সাহিত্যের) জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম না, দুই হাতে কুঠার উঠাইয়া কুবৃক্ষ সুবৃক্ষ সাবাড় করিলাম না, গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় সর্ব্বজ্ঞতার ভান করিলাম না; শুধু নিজের কি ভাল লাগিল কি মন্দ লাগিল, ইত্যাদি নিতান্ত ঘরোয়া কথায় তাঁহার অমূল্য পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিলাম, ইহাও কম অপরাধ নহে।

এরূপ সমালোচনায় নিপুণ সমালোচক চটিবেন, তাহাও জানি। কেন না, আটটি গল্প পড়িয়া অন্ততঃ আট মাস না যাইতেই সমালোচনা করিয়া বসিলাম। 'অচলায়তনের' বেলায়ও এইরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম। নিপুণ সমালোচক সেজন্য লেখককে চপলতাদোষে দোষী করিয়াছিলেন। এবারেও খগেন্দ্র বাবুর দোহাই—তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ। একখানা কৌতুকনাট্য বা কয়েকটি ছোট গল্প সমালোচনা করিতে যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ইত্যাদি দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী কঠোর সাধনার প্রয়োজন, বুদ্ধদেবের ন্যায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বা শুকদেবের ন্যায় কঠোর গর্ভবাস না করিয়া সাহিত্য সমালোচনা 'পত্রস্থ করা' যে নিতান্ত হঠকারিতার কায, এই সহজ কথাটা আজও প্রণিধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বাকী রহিলেন—গ্রন্থকার। বর্ত্তমান সমালোচক গ্রন্থকারের নায়িকা নমীবালার ন্যায় অনুকূল সমালোচক নহেন। তথাপি যদি গ্রন্থকার প্রীত হয়েন, তাহা হইলে বলিব—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আর যদি তিনি তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হয়েন, তবে বলিব—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতে

কোঽত্র দোষঃ? কোন দিক্ দিয়াই অনুষ্টুপের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। আর যখন অনুষ্টুপ্ হইলেই শাস্ত্রীয় বচন, তখন শাস্ত্রের বাণী গ্রন্থকারকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতেই হইবে। ইত্যলং বিস্তরেণ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতার রূপ।

১

প্রেমে হয় ভাব-রস-বোধ,
জ্ঞানে হয় ভাবের বিকাশ;
যেথা জ্ঞান প্রেমের মিলন,
সেথা ভাব-রসের প্রকাশ।

২

কবি হৃদি জ্ঞান পারিজাত,
মাখি' অঙ্গে প্রেম সুধাধার;
ফুটে যবে সাহিত্য নন্দনে,
ধরে চারু রূপ কবিতার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যৌবনাবসান।

১

কোথা গেল সাধের যৌবন ?
কোথা গেল সেই হাসি,
বিকসিত ফুলরাশি,
একি ঘোর অবসাদ-জড়তা-বেষ্টন !
প্রাণে আর নাহি স্ফুর,
সে মত্ততা চুর-চুর
নাহি সে কল্পনা ভ্রান্তি, কবিত্ব-স্বপন।
কোথা গেল সাধের যৌবন !

২

সেই শশী, সেই রবি,
সেই সমুজ্জ্বল ছবি,
শ্যামল আঁচল পাতি' ধরণী তেমন ;
নবীন নীরদ-কোলে,
তেমনি বিজলী দোলে,
তেমনি বসন্তে ফুল, ভ্রমর-গুঞ্জন।
কোথা গেল সাধের যৌবন !

৩

নদী সেই কূলে কূলে
জল-কল-তান তুলে
উছলি 'উছলি' চলে করিয়া নর্ত্তন ;
সেই রৌদ্র পড়ে তীরে,
সোনালী কলসে নীরে,
সেই মেঘচ্ছায়া জলে নিকষ-বরণ।
কোথা গেল সাধের যৌবন !

৪

সেই প্রকৃতির হাসি,
বিশ্বভরা শোভারাশি
সেই মত ঋতুচক্র করে আবর্ত্তন।
সেই মধু, সেই পিক
মুখরিত করে দিক্,
আম্র-মঞ্জরীর গন্ধে আকুল পবন।
কোথা গেল সাধের যৌবন !

৫

মোর তরে নহে কেহ,
কেন তবে এ সন্দেহ ?
আমি বুঝি সেই নহি, কি পরিবর্ত্তন !
আপনার পানে চাহি—
সে হৃদয় আর নাহি ;
জীবনে উৎসব বুঝি মোর সমাপন।
কোথা গেল সাধের যৌবন !

৬

ভাঙ্গিছে স্বপন-ভ্রান্তি,
বুঝে নিবে কড়া ক্রান্তি
যে দিয়েছে, হবে তা'রে করিতে অর্পণ ;
মিছে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি,
মিছে আপনারে ছলি,
অ তীতের তীরে বসি' বৃথা এ ক্রন্দন ;
কোথা গেল সাধের যৌবন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায়।

অরাজকতা।

ফরাসীরাজ বিদ্রোহ দমনকল্পে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুগ্রহ নিবন্ধন অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে ফরাসীজাতি পাশব শক্তিপ্রভাবে পরাজিত হইয়া অচিরে অবনত মস্তকে তাঁহার পদানত হইবে, ভাবিয়াছিলেন তাহারাই বাহুবলে রাজশক্তি পরাভূত করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান। সেইজন্য প্রগুক্ত ঘটনাপরম্পরায় ফরাসীদেশের রাজশক্তি এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু রাজশক্তির অন্তর্ধান মানব-সমাজের কল্যাণকর নহে। প্রজাপীড়ক ভূপতিবৃন্দের যথেচ্ছাচার এবং অরাজকতা উভয়ই তুল্য। বিদ্রোহিগণের সহিত গার্ড ডি ফ্রান্সের যোগদান, ইনভ্যালিড্ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ব্যাসটাইল দুর্গ বিজয় ইত্যাদি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরায় প্যারিস নগরের অশিক্ষিত ইতর সাধারণ যৎপরোনাস্তি প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপন সহজ ব্যাপার নহে। রাজা ফরাসী জাতির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন; বিদেশীয় সৈন্যগণ স্থানান্তরিক হইয়াছে; ব্যাসটাইল দুর্গ ভূমিসাৎ হইতেছে—তথাপি ইতর সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে না। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক —অর্থাগমের চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সশস্ত্র যথাতথা ভ্রমণ করিতেছে; স্ত্রীপুত্র-গণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় চিন্তা না করিয়া অহোরাত্র রাজপথে জয়োল্লাস প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে। ব্যাস্টাইল দুর্গের নিবিড় তমসাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠা-বলী আগ্রহ সহকারে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও তাহাদের হৃদয়ের আবেগ নিবারিত হইতেছে না। রাজনীতিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া তাহারা জগৎ সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে।

উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র দেশ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম দেখিয়া স্বদেশসেবক নেতৃগণ অভিনব প্রকারে শাসন-শক্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। প্যারিস নগর ৬০ ভাগে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক বিভাগের অধিবাসিগণ পঞ্চজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন। এইরূপে তিন শত প্রতিনিধি লইয়া নগরের মিউনিসিপালিটী

অভিনব প্রকারে সংগঠিত হইল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিভাগে একটি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। শাখা সমিতিগুলি প্রধান মিউনিসিপালিটীর সহিত সংস্রব রাখিয়া স্ব স্ব বিভাগসংক্রান্ত যাবতীয় শাসন-শক্তি পরিচালনে প্রবৃত্ত হইল। প্যারিস নগরের আদর্শে সমগ্র দেশে মিউনিসিপালিটী ও শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রামে ও প্রতি নগরে জাতীয় সৈন্যদলের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র শাসন-শক্তি ফরাসী রাজের হস্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া সমগ্র জাতির হস্তে ন্যস্ত হইল। জাতীয় সমিতি মিউনিসিপালিটীর কার্য্যকলাপের অনুমোদন করিলেন।

প্রাগুক্ত রূপে শাসন-শক্তি পুনঃ প্রতিষ্টিত হইল বটে; কিন্তু পিশাচ-প্রকৃতি ইতর সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ রাজনীতিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ইহারা যথেচ্ছাচারকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করিয়া মানব সমাজে ঘোরতর অনর্থ উৎপাদিত করে। প্যারিসের ইতর সাধারণ দুর্দ্দমনীয় রিপুবর্গের বশবর্ত্তী হইয়া উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যগ্রে ফরাসীরাজ সমরনীতিপরিচালিত হইয়া মন্ত্রিবর নেকারকে অবসর প্রদান পূর্ব্বক ব্রিটীলকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফুলন নামক অশীতিপর বৃদ্ধ তৎকালে অন্যতম বিভাগের মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ফুলন এবং ব্রিটীল উভয়েই অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুনর্ব্বার মহানুভব নেকার প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু তথাপি জনসাধারণের মনস্তুষ্টি হয় নাই। ব্রিটীল এবং ফুলনের প্রতি ইহাদের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। একদা অকস্মাৎ এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ফুলন জনসাধারণের প্রতি গালি বর্ষণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত ইতর সাধারণ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিবরকে বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত মিউনিসি-পালিটী গৃহে বিচারার্থ লইয়া উপস্থিত হইল। সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইট কৌশলে বৃদ্ধের জীবন রক্ষার্থ বলিয়া উঠিলেন, "ফুলন এইক্ষণ কারাগৃহে অবস্থিতি করুন। তাঁহার সহিত এই অপরাধে অন্য কেহ সংসৃষ্ট আছে কি না দেখা যাউক। পরে সকলের বিচার একত্রে হইবে।" কিন্তু উন্মত্ত জন-সাধারণের তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব সহিল না। এক ব্যক্তি বলিল, "ইহারা শঠতা পূর্ব্বক ফুলনের জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।" অপর একজন বলিল, "ফুলনের আবার বিচারের প্রয়োজন কি?" এই কথা শুনিয়া অপর কয়েক

ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বৃদ্ধকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। মিউ-নিসিপালিটীর শাসন-সমিতি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিবারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু পামরগণ ফুলনকে হত্যা করিয়াও তৃপ্ত হইল না। তাহারা তাঁহার জামাতা বার্থিয়ারকে ধরিয়া আনিল। অনন্তর বার্থিয়ারের হৃদয়ে বেদনা প্রদানের নিমিত্ত তাহারা ফুলনের ছিন্ন মুণ্ড তৎসমক্ষে রাখিয়া দিল। বার্থিয়ার শ্বশুরের ছিন্ন মস্তক দৃষ্টে সজল নয়নে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। মহানুভব বেলি ও ল্যাফাইট বার্থিয়ারের পরিণাম চিন্তা করিয়া অধীর হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন ক্রমে তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। উন্মত্ত ইতর সাধারণ বার্থিয়ারকে একটি আলোকস্তম্ভের নিকট ধরিয়া আনিয়া উদ্বন্ধনে তাঁহার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত রজ্জু প্রস্তুত করিতে লাগিল। বার্থিয়ার তদ্দৃষ্টে এক ব্যক্তির নিকট হইতে বল পূর্ব্বক একটি বন্দুক লইয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটি বন্দুকের সাহায্যে সংখ্যাতীত ব্যক্তিকে নিরস্ত করা যায় না। বার্থিয়ার অচিরে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন পিশাচগণ ফুলন ও বার্থিয়ারের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া মহানন্দে রাজপথে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

শস্যব্যবসায়ীদিগের প্রতি ইতর সাধারণের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। ইহাদের বিশ্বাস যে, শস্যব্যবসায়ীরা অপরিমিত অর্থলালসাপ্রযুক্ত সমগ্র দেশের উৎপন্ন শস্য রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই জন্য অন্নাভাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতেছে। এক দিন উন্মাদগণ স্যাভেজ নামক শস্য ব্যবসায়ীকে বন্ধন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিল :—

"রাজা এবং তৃতীয় সম্প্রাদায়ের আদেশক্রমে অদ্য বেলা তিন ঘটিকাকালে স্যাভেজের ফাঁসি হইবে।"

যথা সময়ে হোটেল ডি ভিলার সন্নিধানে সংখ্যাতীত লোক সমাবেত হইল। অচিরে তাহারা স্যাভেজকে একটি আলোকস্তম্ভে ঝুলাইয়া দিল। দেহের গুরুত্ব বশতঃ হতভাগ্য ব্যক্তি ছিন্নরজ্জু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কিন্তু তথাপি সে পাপাত্মাগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহারা অপর একটি রজ্জুর সাহায্যে তাহাকে পুনর্ব্বার সেই আলোকস্তম্ভে ঝুলাইল। তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহারা সঙীন ও তরবারীদ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল। এইরূপে স্যাভেজের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল।

তখন পামরগণ তাহার হস্তপদাদি ও মুণ্ড লইয়া আনন্দে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

কেন্ এবং নরম্যাণ্ডি নগরের ইতর সাধারণ প্যারিস নগরের উচ্ছৃঙ্খলতার অনুসরণ করিয়া যথায় তথায় নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। বুর্বন নগরে বেলজন্স নামক তরুণবয়স্ক যুবক একদল রাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে সেই সৈন্যগণ এযাবৎ বিদ্রোহিদলের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই, সেই জন্য তৎপ্রতি বিপ্লবনেতৃগণের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। মুরাট নামক নেতৃপ্রবর একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বীয় সংবাদপত্রে বেলজোন্সকে উচ্চবংশসম্ভূত বংশমর্য্যাদাভিমানী দেশের শত্রু ইত্যাদি আখ্যা প্রদানে তৎপ্রতি ইতর সাধারণের ক্রোধ উৎপাদনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই মুরাটের উদ্দেশ্য সফল হইল। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ উত্তেজিত হইয়া বেলজন্সের প্রাণ সংহারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। শান্তিরক্ষকগণ তাঁহার উপস্থিত বিপদ দৃষ্টে তাঁহাকে স্থানীয় হোটেল ডি ভিলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি প্রহরিবেষ্টিত হইয়া হোটেল ডি ভিলায় গমন করিলেন। কিন্তু তথায়ও বিপদাশঙ্কা দৃষ্টি করিয়া তিনি নগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সম্পাদকপ্রবর বেলজন্সের সংহারের নিমিত্ত পুনর্ব্বার লেখনি ধারণ করিলেন। চলচ্চিত্ত ইতর সাধারণ আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষকে দুর্গের বাহিরে আনিয়া নগরের প্রকাশ্য স্থানে, শান্তিরক্ষকগণের সমক্ষে, তাঁহার প্রাণ সংহার করিল।*

ষ্ট্রাসবর্গ, ট্রয়, নিসমে প্রভৃতি নগরসমূহে বিপ্লবব্যাধিগ্রস্ত ইতর সাধারণ রুধিরপ্রবাহে ধরাধাম কলুষিত করিতে লাগিল। সেণ্টডেনিস নগরের শ্রমজীবিগণ নগরাধ্যক্ষের শিরশ্ছেদন করিল। তাঁহার পত্নী এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবলোকনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া একটি কূপের মধ্যে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ম্যান নগরে মণ্ডস্থ নামক এক ব্যক্তি তদীয় শ্বশুর কুরিয়ানের সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দুরাত্মগণ তাঁহাদিগকে ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কর্ণ ও নাসিকা এবং পরিশেষে তাঁহাদের

*কর্দ্দে নাম্নী পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া যুবতী বেলজন্সের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। বেলজন্সের মৃত্যু না ঘটিলে তিনি কর্দ্দের পাণিগ্রহণ করিতেন। কর্দ্দে কিয়ৎকালপরে মুরাটকে হত্যা করিয়া এই ঘটনার প্রতিশোধ হইয়াছিলেন।

মস্তক ছেদন পূর্ব্বক রুধির-লালসা পরিতৃপ্ত করিল। ষ্ট্রাসবর্গ নগরের হোটেল ডি ভিলা লুণ্ঠিত হইল। ট্রয় সহরের নগরাধ্যক্ষ ইতর সাধারণের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাস্রোতে উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইল।

সমগ্র জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এবম্বিধ যথেচ্ছাচারের ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মানবত্ববিবর্জ্জিত না হইলে, কোন ব্যক্তি সহস্র উত্তেজনায়ও নরপ্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া নরমুণ্ড লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে পারে না। একম্বিধ পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের কারণ কি? ফরাসী দেশের ন্যায় ইংলণ্ড দেশেও মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ জাতি কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়া বৃথা রক্তপাতে ধরা কলঙ্কিত করে নাই। ফরাসী দেশের ইতর সাধারণ দুর্দ্দমনীয় রিপুবর্গের বশীভূত হইয়া জাতীয় ইতিহাসে কালিমা লেপন করিল কেন? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে আমরা যাহাকে "পুণ্য" বা "সুকৃতি" বলি তাহা দ্বিবিধ কারণপ্রসূত—জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস। জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস একাধারে বিদ্যমান থাকিলে দেবে ও মানবে প্রভেদ থাকে না। কিন্তু তদ্রূপ সম্মিলন সর্ব্বত্র না ঘটিলেও অনেক স্থলে একটির অভাব অপরটির দ্বারা পূর্ণ হয়। কিন্তু অজ্ঞতা-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে যদি ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাব হয়,—যদি বিচারশক্তিবিহীন, হ্রস্বদীর্ঘবোধবিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ ভগবানের রাজ্যে বাস করিয়া ভগবানকে "নিশার স্বপন" জ্ঞানে নিরবচ্ছিন্ন ঐহিক সুখের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়, তাহা হইলে মানবসমাজে বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কি দৃষ্ট হইবে? ইতঃপূর্ব্বে ভলটেয়ার প্রভৃতি ফরাসী দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মব্যবসায়ী অধর্ম্মাচারী মানবমণ্ডলীর প্রতি অবজ্ঞা উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। সেই অসাবধানতার বিষময় ফলে কোটি কোটি মানবের ধর্ম্মবন্ধন এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস উৎপাটিত হইলে সমাজে দুর্দ্দৈব ঘটিবে ইহার বিচিত্র কি?*

* "That the revolutionary movement while headed by Voltaire and his co-adjutors was directed against the Church and not against the State. Unfortunatly they at the very outset committed a serious error. In attacking clergies they lost their respect for religion." Buckle's *History of Civilisation.*

সমগ্র দেশে উচ্ছৃঙ্খলতাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে দৃষ্টি করিয়া ভূস্বামীরা ক্রমে ক্রমে দেশত্যাগী হইয়া য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা দেশে থাকিলেন, তাঁহারা বংশগত মর্য্যাদা ও বিশিষ্ট অধিকার পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বহু-সংখ্যক ধর্ম্মযাজকও স্ব স্ব বিশিষ্ট অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজিত ভূসম্পত্তি জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশে সাম্যের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তি সংস্থাপনকল্পে জাতীয় সমিতি মানবাধিকারপ্রসঙ্গীয় ব্যবস্থাবলী প্রণয়ন করিলেন—তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) মানব মাত্রেই তুল্য এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তুল্য অধিকার।

(২) সমগ্র জাতি রাজশক্তির আধার। সমগ্র জাতি হইতে (রাজ-নীতিক) সর্ব্বশক্তির উৎপত্তি।

(৩) অন্য কোন ব্যক্তির কোন অনিষ্ট না করিয়া যদৃচ্ছানুরূপে কার্য্য করার নাম স্বাধীনতা। যে কার্য্য হইতে সমাজের অনর্থ উৎপাদিত হয় ব্যবহার শাস্ত্র শুদ্ধ তাহাই নিবারণ করিতে পারে।

(৪) সর্ব্বসাধারণের প্রকাশিত ইচ্ছার নাম ব্যবহার শাস্ত্র বা আইন।

(৫) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অবস্থানুসারে রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য।

(৬) সভ্য নির্ব্বাচনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তুল্য অধিকার।

(৭) ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির তুল্য অধিকার; কিন্তু ফরাসী দেশের অধিবাসীরা প্রতিনিধিগণদ্বারা ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ন করিবেন।

(৮) ব্যবহার শাস্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তুল্যরূপে প্রযোজ্য।

(৯) যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

প্রাগুক্ত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি ন্যায় ও যুক্তির অনুমোদিত হইলেও, সকলগুলি তদ্রূপ নহে। মানব মাত্রেই সমান ইহা অর্ব্বাচীনের কথা। ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য্য। কোন ব্যক্তি সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস ও সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন এবং সুবর্ণ-

পাত্রে সুসংস্কৃত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পার্থিব সুখ সম্ভোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, কোন ব্যক্তি জরাজীর্ণ পর্ণকুটীরে অবস্থিতি এবং ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে শরীর পোষণ করিয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেছে। কেহ বা জ্ঞানার্ণব মন্থন করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রসঙ্গীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জ্ঞানের অপূর্ব্ব রশ্মি বিস্তার করিতেছে, আবার কেহ বা হ্রস্বদীর্ঘবোধবিবর্জ্জিত "উত্তর দক্ষিণ"জ্ঞানবিরহিত মূর্খাদপি মূর্খ। কোন ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশীয় প্রথানুসারে প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, আবার কেহ বা নীচকুলোদ্ভব বলিয়া জনসমাজে অনাদৃত হইতেছে। কোন ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছেন; আবার কেহ বা সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হইয়া জনসমাজে তদুপযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সুতরাং সকল মানবই তুল্য এ কথাটি প্রকৃত নহে। তবে উন্নতিশীল জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে বংশগত পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গুণানুসারে ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

বুদ্ধের জন্মস্থান।

—:—

কথিত আছে, বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক বুদ্ধের স্মৃতিপূত সকল তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ও প্রত্যেক স্থানে স্তূপনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। উপগুপ্ত তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। লুম্বিনী উদ্যানে স্তূপের অস্তিত্ব নাই; কিন্তু অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এখনও কেহ কেহ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এই প্রাচীন স্তম্ভ দেখিতে যাইয়া থাকেন। অল্প দিন পূর্ব্বে কয়জন য়ুরোপীয় এই স্তম্ভ দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

পথে। গোরখপুর হইতে পথ রম্যদর্শন। পথে করেন্দা; তথায় গুরখা সৈন্য সংগ্রহের আড্ডা আছে। তাহার পর শালবন—শালবনে নীলগাই নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গোরখপুর হইতে যাইয়া নওগড়ে বিশ্রাম করিতে হয়। আবার প্রভাতে উঠিয়া যাত্রার আরম্ভ। ডাক বদলাইয়া বৃদ্ধপুরে পৌঁছিতে হয়। পথ ঘনপল্লব তরুছায়াবৃত ও সুরক্ষিত। এই স্থান হইতে অদূরে নওগড়ের বাজার—বাজারে চাউলের যথেষ্ট আমদানী, মাড়োয়ারী মহাজনও যথেষ্ট। পথে একটি নদী আছে—নদীর উপর সুগঠিত সেতু। বৃদ্ধপুরে চা-কর য়ুরোপীয়দিগের বাঙ্গলো আছে। সেগুলি অতি পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য। বৃদ্ধপুর হইতে দুলা সাত মাইল পথ। রাস্তা কাঁচা; কিন্তু সুরক্ষিত—তিন ভাগে বিভক্ত, মধ্যভাগ উচ্চ, তাহা কেবল য়ুরোপীয়দিগের জন্য—দুই পার্শ্বে রাস্তায় ভারতবাসী যাত্রী ও যান চলে। দুলার সীমায় তেলার নদী। এই নদীর উপরও একটি সুগঠিত সেতু আছে। এইবার যানপরিবর্ত্তন করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিতে হয়। অদূরে ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত। তথা হইতে নেপাল রাজ্যের আরম্ভ। মধ্যে ৬০ ফিট জমী—কাহারও নহে। সীমান্তে কতকগুলি পিলপা গাঁথা আছে। এই স্তম্ভকে লাঠ্‌ঠা বলে—"লাঠ্‌ঠাপার" অর্থে নেপালের আরম্ভ।

তীর্থ। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিলে ভগবানপুরে পৌঁছান যায়। পথে দ্রষ্টব্য বড় কিছু নাই। ভগবান পুরে কাছারী, মালখানা, জেলখানা ও থানা আছে। এই স্থানে কর্ম্মচারী বা সুবা আগন্তুকের ছাড়পত্রাদি পরীক্ষা করেন। আগন্তুকগণ এত কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া অশোক স্তম্ভ দেখিতে আসি-

ছেন, শুনিয়া সুবা বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। ভগবানপুর হইতে এক মাইল দূরে একটি অনুচ্চ পাহাড়। গিরিগাত্র ঘন বৃক্ষলতায় আবৃত। মোড় ফিরিলেই অশোক-স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তম্ভ দেখিবার জন্য কত চীনদেশীয়, তিব্বতীয়, জাপানী, শ্যামদেশীয় ও সিংহলী যাত্রী এই তীর্থে আসিয়াছে।

স্তম্ভাদি।

স্তম্ভটি প্রায় ১০ ফিট উচ্চ। ইহার পরিধি প্রায় ৩৬ ইঞ্চ। পাদমূলে লিখিত আছে, বুদ্ধের জন্মস্থানে এই স্তম্ভ অশোকের আদেশে স্থাপিত। স্তম্ভের শিরদেশ ভগ্ন ও স্তম্ভটি ফাটিয়াছে—ইহা বজ্রপাতের ফল। যে অনুচ্চ গিরিতে স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বে উচ্চ পর্ব্বত ছিল; কালক্রমে তাহার উচ্চতার হ্রাস হইয়াছে। পর্ব্বতচূড়ায় একটি মন্দির, শ্যাম শোভার মধ্যে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। প্রাঙ্গণে বেদীতে রক্তচিহ্ন—পশুবলির পরিচায়ক। এই মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলেরই নিকট সমাদৃত। মন্দিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। বেদীর উপর একটি ঘণ্টা; ঘণ্টাগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ। প্রাচীরগাত্রে নানা চিত্র ক্ষোদিত ও লিপি উৎকীর্ণ।

মন্দির।

গর্ভগৃহ অন্ধকার। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দেখা যায়, প্রাচীর-গাত্রে নানা চিত্র ক্ষোদিত। তন্মধ্যে মৎস্যের বাহুল্য বিস্ময়কর। আগন্তুকদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুরোহিত মধ্যস্থলের ক্ষোদিত ভাস্করকার্য্যের উপরিস্থিত আবরণ অপসৃত করিলে বুদ্ধের জন্মগ্রহণচিত্র দেখা গেল। জননীর কুক্ষীভেদ করিয়া বুদ্ধ বাহির হইতেছেন—একজন দাসী শিশুকে ধরিতেছে। মূর্ত্তিগুলি স্বাভাবিক আকারের ও সুগঠিত। কিন্তু পুরোহিত দেখিতে দেখিতে আবার চিত্রগুলি আবৃত করিয়া দিলেন। যে সকল শিল্পী এইরূপ মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিল, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যের কি কোন অবশেষই নাই?

সরোবর।

মন্দিরের পর দ্রষ্টব্য—অমৃত সরোবর। এই সরোবর বুদ্ধ-জননীর স্নানপুণ্যোদক। সরোবর স্বল্পায়তন—স্বচ্ছজলশালী—স্থির। সরসীবক্ষ তরঙ্গতাড়নে বিচলিত নহে—তাহাতে তীরতরুর প্রতিবিম্বও স্থির—অচঞ্চল।

যে ধর্ম্ম একদিন পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া কোটী কোটী মানবকে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর করিয়াছিল, সংসারীকে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থকে গৃহত্যাগী করিয়াছিল; যে ধর্ম্ম ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় শিল্প এসিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়াছিল—এই তীর্থ সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ বুদ্ধের জন্মভূমি। এখন এই লুম্বিনী উদ্যান পরিত্যক্ত—অযত্নবর্দ্ধিত লতাগুল্মে দুর্গম। কিন্তু এক দিন এই উদ্যান নৃপতির বিরাম স্থান ছিল—আর এই উদ্যান শাক্যসিংহের জন্মভূমি বলিয়া জগতের পুণ্যতীর্থ।

সে গেছে চলিয়া।

১

সে গেছে চলিয়া।
গেছে—না ফুরাতে বেলা অসমাপ্ত রাখি' খেলা
কোন্ নিরুদ্দেশ দেশে—কোন্ পথ দিয়া!
আছে সেই বসুন্ধরা ফুলফলশস্যভরা,
আছে সেই স্রোতস্বিনী, আছে সে বাতাস;
আছে সেই কলগান বনের মর্ম্মর তান
সেই আলো সেই ছায়'—আছে সে আকাশ।
এ বিশ্বের কোন ঠাঁই কোন অপূর্ণতা নাই,
তবু যেন শূন্য সব,—শূন্য এই হিয়া।
সে গেছে চলিয়া।

২

সে গেছে চলিয়া।
ভুলে' গৃহে ফিরে যাই, আছে স্মৃতি—সেতো নাই,
অশ্রুর সাগর তাই উঠে উছলিয়া!
সে যে লতিকার সম ব্যর্থ এ জীবন মম
জড়ায়ে—ফুটায়েছিল মাধুরি বিমল;
নির্ঝরের মত বহি' শত অনাদর সহি'
করেছিল এ হৃদয় সরস কোমল।
পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করি', দীপ তা'র
আমার কুটীরখানি ছিল উজলিয়া।
সে গেছে চলিয়া।

৩

সে গেছে চলিয়া।
জীবনের পর পারে অনন্তের কোন্ ধারে
কোথায় আশ্রয় তা'র—কে দিবে বলিয়া।
উষার হাসিতে আর মিশেনাকো হাসি তা'র
পাখীর সঙ্গীত সনে তা'র কণ্ঠস্বর।
ফুলদল ফুটে ঝরে, শোভে না তাহার করে,
মিশেনা ফুলের গন্ধে তাহার সৌরভ।
আর নাহি বাজে বীণা, ধরা যেন প্রাণহীনা,
যত শোভা—যত গান—সব হরি' নিয়া
সে গেছে চলিয়া!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

রামটেক্।

"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এবার পূজার সময় রামটেক্ যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী ত ছিলেনই, তাহার উপর ছিলেন, সোদরপ্রতিম—সদা হাস্যানন, সুধীশ ও সিদ্ধীশ; আর ছিলেন হাস্যরসের অবতার নেড়াদা। ফাউয়ের মধ্যে এক কাছাকোঁচা দেওয়া দাসী। তাহাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে পাছে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর কোন কষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহাকে যাত্রিশ্রেণিভুক্ত করা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সুধীশ কিছু গম্ভীরপ্রকৃতি, কিন্তু নির্ভীক্ ও স্পষ্টবক্তা; কথাগুলা ওজন করিয়া সব সময়ে ঠিকঠাক্ বলিতে পারে; তাহার উপর চরিত্রবলে সর্ব্বদা বলীয়ান্। আর কনিষ্ঠ সিদ্ধীশ বা খোকাবাবু বয়সে নিতান্ত কাঁচা হইলেও নামের সার্থকতা রাখিয়া রবারের বলের মত রাতদিন লাফাই-তেছে; তাহার অধরোষ্ঠে হাসি লাগিয়াই আছে। কোনও কাযে সে "না" বলে না। সে-ই আমার এই তীর্থযাত্রার প্রধান উদ্যোগী। মনে করিয়াছিলাম, নির্ব্বিবাদে ছুটীর বারটা দিন নাগপুরে বসিয়াই কাটাইয়া দিব; কিন্তু তাহার দৌরাত্ম্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সে আমাকে কেবলই তীর্থযাত্রায় প্রণোদিত করিতে লাগিল; আমারও বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষীণ আশা তাহার অজস্র অনুরোধে মুকুলিত হইয়া উঠিল। বাড়ীর সকলেরই এ তীর্থদর্শন ঘটিয়াছে; হয় নাই কেবল আমার ও আমার স্ত্রীর। কাযেই প্রস্তাব উঠিবামাত্র আমাদের দুইজনের যাওয়া স্থির হইয়া গেল; তবে "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই" এই পুরাতন সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া জুটিলেন; কিন্তু নানারূপ অসুবিধায় কেহই শেষরক্ষা করিতে পারিলেন না।

২৬এ অক্টোবর শনিবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যাত্রা করা স্থির হইল। পৌনে সাতটায় গাড়ী ছাড়িবে; কাযেই শীতে হি হি করিতে করিতে সাড়ে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ না করিলে সে দিন যাওয়া সম্ভবপর হইত না। পূর্ব্বদিন হইতেই রসদের যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছিল। এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে হয় নাই; একা সিদ্ধীশ একশত; সে-ই

সমস্ত গুছাইয়া লইয়াছিল। কোথায় কাহার কাপড়, কোথায় কাহার ঘটি, কোথায় কাহার জামা,—এ সব একত্র করিয়া সে দুইটি বৃহদাকার পুঁটুলি বাঁধিল। শনিবার ভোর ৫ টায় উঠিবার কথা; কিন্তু তাহার আগ্রহাতিশয্যে ৪ টার সময় সে আমার দরজায় ঘা মারিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া উঠিলাম, এবং সব ঠিক করিয়া লইলাম। ও দিকে গাড়ীর জন্য পূর্ব্বাহ্নেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু, ভাগ্যক্রমে ঘোড়ার সাজের কোন স্থান "টুটিয়া" যাওয়ায় কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িল। সহিস্ হিন্দু, সে বোধ হয় পূজার সময় তাহার প্রিয় বস্তুটিকে জীর্ণ সাজে লোকসমক্ষে আনিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। শেষে যখন কড়া হুকুম গেল তখন গত্যন্তর না দেখিয়া সে একেবারে বাঙ্গালার সম্মুখে গাড়ী আনিয়া হাজির করিল। তখন ৬টা বাজিয়া মিনিট দশ হইয়াছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেসনে পৌঁছিয়া টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে; কিন্তু ষ্টেসনে পৌঁছিতেই আধ ঘণ্টা লাগিবে। যাহা হউক, রামজীর নাম করিয়া আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া লইলাম। গাড়ী ছাড়িবার মিনিট চার থাকিতে আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কাম্‌রায় ঢুকিলাম। তখন উত্তরের বাতাস প্রভাতী সূর্য্যকিরণে মন্দ লাগিতেছিল না। সহযাত্রীদিগের মধ্যে মারহাট্টার সংখ্যাই অধিক, এবং একটি গুর্জ্জর পরিবারও সেই দলভুক্ত দেখিলাম। দুইজন গুর্জ্জর রমণী পার্শ্বের কাম্‌রায় বসিয়া আমার স্ত্রীর সহিত অলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, তাঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয়া। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার স্ত্রী তাঁহাদের সহিত "দোস্তি বানাইয়া" লইলেন।

গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে কলিকাতার পথে ছুটিল; মাঝে এক বার ইতোয়ারী ষ্টেসনে হাঁফ্ ছাড়িয়া ইংরাজ সেনানিবাস কাম্‌টি সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই কাম্‌টি সহরের মধ্য দিয়াই একটি পাকা রাস্তা বরাবর উত্তরে জব্বলপুরের দিকে গিয়াছে; মাঝে মান্‌সর হইতে একটি শাখাপথ রামটেকে গিয়া মিলিয়াছে। পূর্ব্বে এই পথ ধরিয়াই লোক এই দুর্গম তীর্থে আসিত। পথের দুই দিকেই নিবিড় জঙ্গল; সময় সময় দিবালোকেও "কোলের মানুষ" দেখা যায় না। স্থানে স্থানে বহু পুরাতন প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত মারহাট্টা অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, এ প্রশস্ত পথ ভোঁস্‌লা রাজাদিগের বিরাট কীর্ত্তি। রেলের পথে কাম্‌টি পার হইয়াই বিস্তৃত কান্‌হান্ নদীর

উপর যে সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু আছে, তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যশিল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেতুটি ছবির মত রেলপথের পার্শ্বে কান্‌হান্ নদীর উপর পড়িয়া আছে। জাফরীর মত উহার বৃতিগুলি সূর্য্যালোকে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করে! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার জীর্ণসংস্কার আরদ্ধ হয় এবং চার বৎসর ধরিয়া ১২।০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার সম্পূর্ণ হয়। ইংরাজ এই সেতুর সংস্কার করিয়াছেন মাত্র; রাজারাই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। ভারতে এরূপ সুদৃশ্য সেতু আর আছে কি না সন্দেহ। ইহার এক একটি প্রশস্ত খিলান দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সেতুর উপর দিয়া ক্রমাগত মানুষ ও গাড়ী নাগপুরের পথে যাতায়াত করিতেছে। আমরা দক্ষিণে এই সেতু রাখিয়া আরও কিছু দূর ডাকগাড়ীর রাস্তায় অগ্রসর হইলাম। পরে কান্‌হানে আসিয়া একটি শাখা রেলপথে গাড়ী রামটেকের দিকে ছুটিতে লাগিল। পথের দুই ধারেই অড়হরক্ষেত্র; মনে হইল, ক্ষেত্রের বুঝি সীমা নাই—শেষ নাই। স্থানে স্থানে কৃষকরা শস্য কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ হইল; আনন্দ ফসলের আতিশয্যে, আর দুঃখ—এমন দেশেও দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে! ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরায় কোন স্থানের লোককেই এত স্বল্পে পরিতুষ্ট হইতে দেখা যায় না। কিন্তু এত অপর্য্যাপ্ত ফসল হইয়াও দৈববিড়ম্বনায় আমাদের "ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলায় না।" ইহা কি কম আক্ষেপের কথা? যাহা হউক, পথে একবার দুম্‌রীখড়ে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া আবার হাঁফাইতে হাঁফাইতে গাড়ী রামটেকে যাইয়া পৌঁছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া বুঝিলাম, নাগপুর হইতে সাড়ে বার ক্রোশ আসিয়াছি। ক্রমে আমরা ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সহযাত্রী অধিক ছিল না; সর্ব্বসমেত ২০।২৫টি হয় কি না সন্দেহ। বাহিরে কয়েকখানি গোশকট ছিল। এগুলি দেখিতে মন্দ নহে; জমী হইতে এক হাত ঊর্দ্ধে দুইখানি চাকার উপর ইহার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত; মঞ্চটি দৈর্ঘ্যে চারি হাত পরিমিত, আর প্রস্থে দেড় হাত। মাথায় কেবল দরমার আচ্ছাদন। কোন রকমে তিনটি লোক কষ্টে তাহার মধ্যে বসিতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া আমার স্ত্রীকে একখানি শকটে উঠাইয়া দিলাম; সঙ্গে তাঁহার দাসী রহিল, আর থাকিল সিদ্ধেশ। অবশিষ্ট আমরা তিন জনে

নানা বাগবিতণ্ডার পর স্থির করিলাম যে, শকটে ঝাঁকি খাইতে খাইতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, ষ্টেসন হইতে রামগিরি পাহাড়ের পাদদেশ দুই ক্রোশেরও কিছু অধিক হইবে। এতটা পথ রৌদ্রে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। সুধীশ কিছু "একরোকা" লোক; সে আমাদের কথায় সম্মত হইল না। ইতোমধ্যেই বৈরাগ্যের অনেক চিহ্ন তাহাতে দেখা দিয়াছে। সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল; সমস্ত রাস্তা "আয় ভাই, আয় ভাই" করিয়া ডাকিয়া আমার গলা শুকাইয়া গেল; জলের জন্য আকুল হইলাম। পথিপার্শ্বে এক কূপ হইতে গ্রাম্য স্ত্রীলোকরা জল তুলিতেছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের নিকট জল ভিক্ষা করিলাম। তাহারাও সাদরে আতিথিসৎকার করিল। আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। পথে শ্রমাপনোদনের আশায় চালকের নানা সুরের গান শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা রামটেক্ সহরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। ১১২৯ বর্গ মাইলব্যাপী তহশীলের মধ্যে ইহাই প্রধান সহর।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটি মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছবির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার ১১ জন সদস্যই বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। আয়ের পরিমাণও বিশেষ আশাপ্রদ; মোটামুটি হিসাবে ১৯০১ সালের আয় ছিল ৮৪০০৲ টাকা, কিন্তু ছয় বৎসর পরে উহা ১৪৬০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; ইহার অধিকাংশ টাকাই octroi tax ও বাজার হইতে আদায় হইয়াছে। নগরে একটি হাঁসপাতালও আছে; শুনিলাম ইহার উন্নতিকল্পে স্থানীয় একটি ম্যাঙ্গানীস্ খনির স্বত্বাধিকারী যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। এ সব কীর্ত্তি লুপ্ত হইবার নহে; জরা মরণ যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে ততদিনই এই পুণ্যস্মৃতি মানুষের মনে জাগিয়া রহিবে। পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে ২।৩টি ইংরাজী, মারাঠী ও উর্দ্দু বিদ্যালয় দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গলাদেশে থাকিয়া মনের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা আসিয়া পড়িয়াছিল যে, আমরা ব্যতীত আর বুঝি কেহ স্ত্রীশিক্ষার বিপুল আয়োজনের পক্ষপাতী নহে। সে "জারী" এ পার্ব্বত্যদেশে নিমিষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল; স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই স্থানে যথেষ্ট আয়োজন দেখিলাম। বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীবর্গের বসিবার স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়াছে। বাঙ্গলায় থাকিয়া স্ত্রীশিক্ষার কত আস্ফালনই না করিয়াছি, কিন্তু সে সমস্ত এখন অসার বলিয়া মনে হইল।

ক্রমে আমরা বাজারের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তথায় কেনাবেচা বেশ চলিতেছে দেখিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা হইবে। ডাউল,ঘৃত, কাঁকর মিশান চাউল ও তরীতরকারীর মধ্যে বেগুন ও বর্ব্বটি রাশি রাশি মিলিল। আমাদের আবশ্যকমত বেগুন, বর্ব্বটি ও কিছু আতা লইয়া আমরা আবার পথ চলিতে লাগিলাম। বাজারে নপাট্ বা ছাঁচি পানও যথেষ্ট দেখিলাম; এই পানের জন্যই রামটেক্ প্রসিদ্ধ। চতুর্দ্দিকে এই পান রপ্তানী হইয়া থাকে; পাতাগুলি বেশ মোলায়েম ও সুগন্ধযুক্ত। আমরাও আমাদের প্রিয়জনের জন্য একটি মোট পান লইলাম। স্থানীয় লোকের নিকট শুনা গেল যে, এই স্থানে আঙ্গুরের চাস আছে; কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই; দেখিলে বোধ হয় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিতাম না। এখন আমরা লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; বাড়িগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বোধ হয় দীপালী নিকট বলিয়া সকলগুলিতেই রং করা হইয়াছে: ঝক্‌ঝকে রাস্তায় অনেকগুলি "রেঙ্গী" এ গলি ও গলি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কিছু বুঝা গেল না। অদূরে রাস্তার বাম দিকে দুরারোহ পর্ব্বত রাখিয়া আমরা ক্রমশঃ লোকালয় হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম; শেষে দুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। জনকোলাহল একেবারে থামিয়া গেল; মনে আশঙ্কা হইল, পাছে দস্যুহস্তে পড়ি। তাহার পর দুই দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, মাঝে কেবল আঁকা বাঁকা রাস্তা। তথা হইতে কিছু দুর যাইয়া এক প্রকাণ্ড দরজা দেখা গেল; ইহাই আম্বালা পুষ্করিণীর দ্বার। প্রথমেই পুলীস প্রহরী আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইল। ইহার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না, বুঝিতে চেষ্টাও করিলাম না। আম্বালার কাছে কেবলই পাণ্ডাদিগের ঘর দেখা গেল। দোকান পসারের নামমাত্র নাই; এক পয়সার জিনিস কিনিবার দরকার হইলে এক ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া বাজারে যাইতে হইবে। মনে হইল, পাণ্ডাদের কি কোন অভাব নাই? ভাগ্যে আমরা বাজার হইতে রসদ যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা না হইলে সে দিনটা বোধ হয় অনশনেই কাটিত। দেখিলাম, পুষ্করিণীর পাহাড়ে মানুষের সহিত অসংখ্য বানর নির্ব্বিবাদে বসিয়া আছে। ক্রমশঃ উত্তরে আম্বালা রাখিয়া আমরা আমাদের নির্ণীত বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডামহারাজ আসিয়া আমাদিগের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কেবল আট আনা মুনাফায় যে এত হয় তাহা আমার ধারণা ছিল না।

বাসায় নেড়াদা ও সুধীশ খিচুড়ি রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিলেন; আমাদের সাহায্য তাঁহাদের আবশ্যক হইল না। আমি সস্ত্রীক, খোকাবাবু ও ঝি সমেত বাহির হইয়া পড়িলাম।

আম্বালা সরোবরে স্নান করিলে সকল পাপ বিধৌত হয় বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। কুষ্টরোগগ্রস্ত রাজপুত রাজা অম্বার নাম হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। জনশ্রুতি এই যে, পুরাকালে মৃগয়ায় তৃষ্ণাতুর হইয়া অম্বা এই স্থানে হস্তমুখপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন ও এই জল পান করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার কুষ্টরোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ইহার ফলে তিনি এই সুদীর্ঘ সরোবর কাটাইয়া দেন। শুনিলাম, পাতাল হইতে নাকি ইহার সহিত ভোগবতী বা গঙ্গার যোগ আছে; সেই কারণে অনেকে এ তীর্থে আসিয়া মৃতের অস্থি জলগর্ভে নিক্ষেপ করেন। প্রেতাত্মার মুক্তির নিমিত্তই এ সমস্ত ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। সরোবরে মাছ অজস্র; কিন্তু ধরিবার হুকুম নাই। আমরা স্নান করিতে নামিয়া গামছা ফেলিয়া রাশি রাশি মাছ তুলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই একজন মারহাট্টা ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে অপ্রস্তুত হইয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিলাম। আম্বালার চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দির ও সুদৃশ্য সোপানশ্রেণীতে সুশোভিত। তাহার উপর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য স্থানটি বাস্তবিকই মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। চারি দিকে পাহাড়, আর মধ্যে স্বচ্ছ সরোবর,—এ দৃশ্য বস্তুতঃই চিত্রশিল্পীর তুলিকায় প্রতিফলিত হইবার যোগ্য। জীবনে এ নৈসর্গিক চিত্র আর দেখিব কি না বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার স্মৃতি সত্য সত্যই আমার এক শ্লাঘার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই বার পাহাড়ে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বাসা পশ্চাতে রাখিয়া সরোবরের কিছু উত্তরে যাইয়াই পাতরের বড় বড় ধাপ দেখা গেল। কত যুগ পূর্ব্বে যে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। কয়েকটা ধাপ বিচ্ছিন্ন হইয়া এ দিকে ও দিকে পড়িয়া আছে। এই পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম রামগিরি; বাল্যকালে 'মেঘদূতে' ইহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম; সে শ্লোক এখনও কাণে বাজিতেছে;

"কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।"

মন্দিরের পাণ্ডাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, ইহার আরও দুইটি নাম আছে—একটি সিন্দূরগিরি, অপরটি তপোগিরি। বিষ্ণু নরসিংহ-মূর্ত্তিতে এই স্থানে হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া পাহাড়ের রক্ত-বর্ণ হইয়াছে—তাই গিরির নাম সিন্দূরগিরি। আর সুতীক্ষ্ণের আশ্রম এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ইহার অপর নাম তপোগিরি হইয়াছে। লক্ষ্মণের মন্দিরের কোন প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত বৃত্তান্ত হইতে এই তথ্য জানিতে পারিয়াছি। চতুর্থ শতাব্দীতে ক্ষোদিত হইলেও এখনও মন্দিরের মহারাজের সাহায্যে উহা পড়া যায়। অনেক অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পুরাতত্ত্ববিদ্ কেহ সঙ্গে থাকিলে হয় ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেন। পর্ব্বতশৃঙ্গটি ৫০০ ফিট উচ্চ; আর সাড়ে সাত শত সোপান লঙ্ঘন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। শুনিয়াই আমার "আক্কেল গুড়ুম্" হইয়া গেল। আমার স্ত্রী কিন্তু নাছোড়বন্দা; সকাল হইতে তিনি জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করেন নাই, আর এখন প্রায় একটা বাজিতে যায়। আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলাম; বলিলাম, আহারাদির পর পাহাড়ের উপর উঠিব। কিন্তু কে আমার কথা শুনে? তিনি দ্রুত সোপানাবলী লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। দেবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পুরুষ যতই কেন উদাসীন হউন না, হিন্দুরমণী কখনও "পিছপাও" নহেন। আমি খানিকটা ধাপের উপর বসিয়া রহিলাম,শেষে যখন তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন তখন আবার উঠিয়া সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলাম। ধাপগুলি সোজাসুজি উঠে নাই, বাঁকিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রশস্ত চাতাল; কিয়দ্দূরে গিয়াই খোকাবাবু ও আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম। তাঁহারা ধাপের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় দুই শত ধাপ অতিক্রম করিবার পর এক প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই জনশূন্য স্থানে এক সন্ন্যাসী একটি বিগ্রহ লইয়া বসিয়া আছেন, দেখিলাম। এই প্রথম তোরণের নাম—এক্রমজীউকি দরজা। শুনিলাম, উজ্জয়িনীর রাজা এক্রম সিংহ ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। আবার উঠিতে লাগিলাম; পর্ব্বতশৃঙ্গের কি অপূর্ব্ব শোভা! আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহার চতুর্দ্দিকে বিশাল পর্ব্বতরাজি, আর অরণ্যানীর ত কথাই নাই। পুস্তকে যাহা পড়িয়াছিলাম, "woods over woods in gay theatric pride," আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। খোকাবাবু ও আমি এক স্বরে চীৎকার করিলাম, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইল।

কেবলই আতাগাছ, ডালগুলি ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। খোকা বাবু পাকা আতাগুলি ক্রমাগত ছিঁড়িতে লাগিলেন, আর আমি আবশ্যকমত দুই চারটি বেল পাড়িয়া লইলাম। তীর্থে আসিয়াছি, একটা কিছু করা চাহি; খেদ থাকিবে কেন? বেল পাড়িয়াই তাহা মিটাইলাম। আবার কিছু দূরে গিয়াই পথের দক্ষিণে একটি আশ্রমসংলগ্ন জলাশয় দেখা গেল। প্রবাদ এই যে, হিরণ্যকশিপু বধের পর বিষ্ণু এত বেগে গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, গদাঘাতে পর্ব্বতগাত্রে গর্ত্ত হইয়া এই জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তীরে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃশ্য স্তম্ভপরিবেষ্টিত একটি ধর্ম্মশালাও রহিয়াছে, দেখিলাম। দুই একটি পথশ্রান্ত যাত্রী সুবৃহৎ বটবৃক্ষের নিম্নে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছে। এই স্থানে আমাদের সহযাত্রী সেই গুর্জ্জর রমণী দুইটির সহিত আবার সাক্ষাৎ হইল। আমার স্ত্রী তাঁহাদের পাইয়া বেশ দুই দণ্ড গল্প জুড়িয়া দিলেন। অনন্যমনা হইয়া আমরা পার্শ্বে জলাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে খোকাবাবু "উঠুন" বলিয়া এক হাঁক্ দেওয়ায় আমি সচকিতে দাঁড়াইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

আহ্বান।

"অসীমে সসীমটুকু করিবারে দান,
ত্যজিয়া পাষাণমূল
আয় ছুটি' নদীকূল;"
গরজি গম্ভীরে সিন্ধু করিছে আহ্বান।
"আমার প্রশান্ত অঙ্কে জুড়াইতে প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবগণ!
ক্ষান্ত দিয়ে, আয়, রণ;"
মরণ নীরবে স্নেহে করিছে আহ্বান।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চন্দ্রমণ্ডল।

সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থিত। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনস ও নেপচুন এই আটটি গ্রহ এই বিশাল অগ্নিময় কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া শূন্যমার্গে নিয়ত ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণ্যমান গ্রহগুলি স্বয়ং এক একটি গোলাকার পৃথিবীর ন্যায়। তাহার মধ্যে কতকগুলি আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক বড়। সূর্য্যের আয়তন প্রায় ১৩,০০,০০০ গুণ পৃথিবীর আয়তনের সমান। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

গ্রহসকল যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তেমনই উপগ্রহসকল গ্রহগুলিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। বৃহস্পতির ৫টি, শনির ৮টি, উরেনসের ৪টি ও নেপচুনের ১টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সৌরজগতের সমুদায় গ্রহ ও উপগ্রহাদির আবর্ত্তনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আছে। গ্রহসকল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আবর্ত্তন করে। উপগ্রহসকলেরও আবর্ত্তন সেইরূপ। কেবল উরেনস ও নেপচুনের উপগ্রহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে আবর্ত্তন করে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, প্রায় ৪৯টি চন্দ্র একত্র করিলে একটি পৃথিবীর সঙ্গে সমান হইতে পারে। তথাপি অন্যান্য তারকা হইতে চন্দ্র বৃহত্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার কারণ, অন্যান্য তারকার অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২,১৬০ মাইল। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২,৩৮,৭৯৩ মাইল।

সহজ দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই যে, চন্দ্রমণ্ডলের কতকটা অংশ অন্ধকারময় ও অবশিষ্ট অংশ উজ্জ্বল। এই ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশসকল বিশুষ্ক সমুদ্রতল এবং উজ্জ্বল স্থানগুলি গিরিশ্রেণী—ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাৎবেগে ভগ্ন এবং সহস্রধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান।

বস্তুতঃ কালে চন্দ্রমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীর ন্যায় আংশিকভাবে জল ও স্থলে বিভক্ত ছিল। সেই স্থলদেশ সুদীর্ঘ এবং উন্নত গিরিশ্রেণী, শষ্পাচ্ছাদিত অধিত্যকা ও অতি বৃহৎ আগ্নেয়পর্ব্বতে পূর্ণ ছিল। চন্দ্রমণ্ডলস্থ আগ্নেয়গিরির সহিত পৃথিবীর কোন আগ্নেয়গিরির তুলনা হয় না। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিসকল চন্দ্রস্থ আগ্নেয়গিরির হিসাবে অতীব ক্ষুদ্র।

সম্প্রতি ঐ সকল অগ্নিপর্ব্বত নির্ব্বাপিত হইয়াছে; সমুদ্রসকল লোপ পাইয়াছে; উপত্যকা তাহার উর্ব্বরতা হারাইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; এমন কি এই ক্ষুদ্র-উপগ্রহের চতুঃপার্শ্বস্থিত বায়ু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে। চন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে কখনও মেঘ দৃষ্ট হয় না। তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অতীব সুক্ষ্ম এক বায়বীয় আবরণ বিদ্যমান; সুতরাং, যে সুদৃশ্য উপগ্রহ এককালে নানারূপ জীব এবং উদ্ভিদের জন্মস্থান ছিল, তাহা বর্ত্তমানে জনশূন্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

চন্দ্রের এইরূপ মৃতাবস্থা প্রাপ্তির যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কাণ্ট ও লাপ্লাস অনুমান করিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত জগৎ একটা উত্তপ্ত বাষ্পময় নিহারিকারূপে বর্ত্তমান ছিল। ক্রমশঃ তাপবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের সৃষ্টি হইল। তাহার পর কি এক মহাশক্তির প্রভাবে সেই বিশাল নিহারিকা একটি গোলাকার পিণ্ডে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে এক আবর্ত্তগতিরও সৃষ্টি হইল। এই পিণ্ড ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার স্ফীত নিরক্ষদেশ হইতে কতিপয় অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যমার্গে প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তন করিতে করিতে সেই কেন্দ্রস্থ বিশাল পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সঙ্কুচিত হইয়া এক একটি গ্রহে পরিণত হইল। এই গ্রহগুলি তাহাদের স্ফীত নিরক্ষদেশ হইতে কেন্দ্রাপসারণবলে কতিপয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া উপগ্রহের সৃষ্টি করিল।

সুতরাং এই উপগ্রহ সকল, বিশেষতঃ চন্দ্র, আদিতে উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড-রূপে বর্ত্তমান ছিল, তাপবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল। পরে যখন উহার পৃষ্ঠদেশ জীব ও উদ্ভিদের বাসের পক্ষে যথেষ্ট শীতল হইল, তখন উহার চতুর্দ্দিকস্থ জলীয় বাষ্প তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র, নদ, নদী প্রভৃতির সৃষ্টি করিল। অধিত্যকা প্রদেশে ক্রমে উদ্ভিদরাজি জন্মগ্রহণ করিল।

অপরাপর গ্রহাদির অপেক্ষা চন্দ্র আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সুতরাং, ইহার তাপের পরিমাণও কম ছিল। সেই জন্য বহুকাল ধরিয়া তাপবিকিরণের পর এই উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত এত শীতল হইল যে, জল ও বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্পরাশি কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সমস্ত উদ্ভিদ এবং জীবশ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং আগ্নেয়গিরি সকল নির্ব্বাপিত হইল।

গ্রহের ন্যায় চন্দ্রও আপনার অক্ষের উপর আবর্ত্তন করে। সমস্ত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে চন্দ্রের প্রায় ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট ১১½ সেকেণ্ড সময় লাগে। চন্দ্রের অক্ষের উপর এক আবর্ত্তনেও প্রায় এইরূপ সময় লাগিয়া থাকে।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্র ও সূর্য্যের কক্ষ এক সমতলে অবস্থিত নহে। চন্দ্রের কক্ষ সূর্য্যের কক্ষের সমতলের উপর ঈষৎ হেলিয়া রহিয়াছে এবং দুইটি বিন্দুতে সূর্য্যকক্ষের সমতলকে ছেদন করিতেছে। এই বিন্দুদ্বয়কে ইংরাজীতে node বলে।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, আবার চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। সুতরাং, চন্দ্রও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের গতি মোটামুটি ভাবে সহজেই বুঝান যাইতে পারে। যদি একখানি চক্রের নেমিতে একটি পেন্সিল লাগাইয়া দিয়া চক্রখানি একটি দেওয়ালের গাত্রসন্নিকটে ঘুরাইয়া লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে দেওয়ালের গাত্রে মালার আকারে কতকগুলি বৃত্তের চিত্র অঙ্কিত হইবে। সূর্য্যের হিসাবে চন্দ্রের গতিও ঠিক সেইরূপ।

মোটামুটি প্রায় ২৭ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই ২৭ দিনে এক চান্দ্রমাস ধরা যায়। এই সময়ের মধ্যে আমরা চন্দ্রের আকার নানারূপ দেখিয়া থাকি। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্র প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একই সময়ে এবং একই স্থানে উদিত অথবা অস্তমিত হয় না।

বহুকাল পূর্ব্বে চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই। আমরা চন্দ্রের যে আলোক অনুভব করিয়া থাকি, উহা চন্দ্রের নিজের আলোক নহে। সূর্য্যরশ্মি চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্বীয় গতি অনুসারে চন্দ্রের যে অংশ যেরূপে সূর্য্যের দিকে থাকে, সেই অংশ সেইরূপে আলোকিত হয়। সুতরাং, আমরা প্রতিদিনই চন্দ্রের এক এক নূতন আকার দর্শন করিয়া থাকি। চন্দ্র যখন সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করে, তখন উহার ঠিক যে অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর দিকে থাকে সেই অংশ সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গোলাকার দেখিয়া থাকি। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থায় অমাবস্যা হয়। ঐ তিথিতে চন্দ্র সূর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়; অর্থাৎ

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়। এই অবস্থায় চন্দ্রের অন্ধকারময় অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর দিকে থাকে বলিয়া অমাবস্যা তিথিতে আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। শুক্লপক্ষে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দূরে গমন করিতে থাকে এবং উহার আয়তনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে ঠিক উহার বিপরীত হয় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের নিকটে আসিতে থাকে এবং উহার আয়তনেরও ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী এই তিনই যখন এক সরলরেখাবর্ত্তী হয়, তখন গ্রহণ হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, অর্থাৎ পৃথিবী যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় এবং আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া থাকি। পরন্তু যদি অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী এক সরলরেখাবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ যদি ঐ সময়ে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যালোকের গতিরোধ করে। সেই কারণে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পৃথিবী সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক ছোট এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষাও ছোট। সুতরাং এত ছোট চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের সমস্ত আলোকের গতিরোধ সম্ভবপর নহে। সেই জন্য সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ পৃথিবীর স্থান বিশেষে দেখা যায়; একই সময়ে পৃথিবীর সকল স্থান হইতে উহা দেখা যায় না।

এইরূপে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া সৌরজগতের ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। তাপবিকিরণ হেতু জগৎ হইতে তাপের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং প্রথমে ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে বৃহত্তম গ্রহ ও উপগ্রহাদি এবং এমন কি সূর্য্য পর্য্যন্ত শীতল হইয়া যাইবে। এই উত্তাপনাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবকুলেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। উত্তাপের আধিক্য যেমন জীবের জীবনের প্রতিকূল, উত্তাপের অভাবও ঠিক সেইরূপ।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

সবজী

বেগুন।

পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই ২।১ বিঘা জমী আছে। সেইটুকু কেহ বা খুব কম হারে প্রজাবিলি করিয়া থাকেন—কাহারও বা তাহার উপর ২।১টা এরূপ গাছ আছে যাহা হয় ত কখন ফল দিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই—কেহ বা সেইটুকু ফেলিয়াই রাখিয়াছেন। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, "চাকরীলোলুপ" বাঙ্গালীকে চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া সংসারপ্রতিপালনার্থ একটা কিছু করিতেই হইবে।

সওদাগরী বা অন্য কোন আফিসে ১৫।২০ টাকা বেতনে প্রত্যহ প্রভুর তাড়নায় সন্তুষ্ট থাকিয়া "দেশের" "জায়গা জমীতে" অমনোযোগী থাকিলে আর চলিবে না। এমন অনেককে দেখা যায় যে, নিজের গ্রামের কথা এমন কি নিজের গ্রামের নাম পর্য্যন্ত বলিতে লজ্জা বোধ করেন। এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ২।১ বিঘা জমী আমাদের গৃহস্থের সংসারে কতটা সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আলু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সবজী ; ইহার পরেই বেগুন—আমাদের কথাতেই বলে "ঝোলে বেগুন, অম্বলে বেগুন।" ইহা হইতেই বেগুনের প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝা যায়।

এই প্রবন্ধে বেগুনের চাষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

দুই প্রকারের বেগুন সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে—প্রথম বড় বেগুন ও দ্বিতীয় কুলি বেগুন—বড় বেগুনের মধ্যে "এলোকেশী" ও "মুক্তাকেশী" বেগুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের দেশে ইহাদেরই আবাদ অধিক হইয়া থাকে। কুলি বেগুন বড় বেগুন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মৃত্তিকা—উচ্চ উদ্ভিজ্জপদার্থঘটিত জমীই বেগুনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জমী এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য যেন তাহার উপর জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে। কারণ দাঁড়ান জল (Stagnant water) বেগুন গাছের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী। অনেকে নদীর তীরের জমী এই আবাদের জন্য পছন্দ করিয়া থাকেন—এবং শুনা গিয়াছে, এইরূপ জমীতে ফসলও যথেষ্ট হয়। কাদা জমীতে (Clay soil) বেগুন ছোট হইয়া থাকে ;

কিন্তু সাধারণতঃ অধিক মিষ্ট হয়। বেগুনের জমীতে সার দিবার ব্যবস্থা অনেকে দিয়া থাকেন বটে; কিন্তু পরলোকগত কৃষিতত্ত্ববিদ্ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শিবপুর সরকারী কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে গোবর ও সোরার সারপ্রযুক্ত জমী অপেক্ষা বিনা সারযুক্ত জমীতে ফসল অধিক হইয়াছে। অন্য অন্য কৃষিতত্ত্ববিদ্‌রা এই কথার সমর্থন করেন না। বীজ রোপণের ও বীজ-জমী (seed-bed) হইতে চারা গাছ তুলিয়া পুতিবার সময় চুন (gypsum) ও ছাই দেওয়া খুব ভাল।

গোবর খৈল প্রভৃতি যবক্ষারজানঘটিত সার (Nitrogenous manure) বেগুনের জমীতে প্রয়োগ করিলে ফুল এবং ফলের পরিবর্ত্তে পাতাই অধিক উৎপাদিত হয়—সেইজন্য এই সারের সহিত অন্য ধাতুঘটিত সার মিশ্রিত করা উচিত।

আমরা যখন ২।১ বিঘায় চাষ করিতে বসিয়াছি তখন সারসম্বন্ধে এত কথা না বলিলেও চলিত। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে গোবর ও ছাই যাহা আমাদের অনায়াসলব্ধ তাহা দেওয়াই উত্তম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বেগুনের বীজ গ্রহণ ও তাহার রোপণ প্রণালী।—গাছের প্রথমকার বড় ফলগুলি হইতেই বীজনির্ব্বাচন করা নিয়ম। বেগুন বেশ বড় হইলে ও পাকিলে তাহা গাছ হইতে লইয়া মাঝামাঝি কাটিতে হয়। এইরূপ অনেকগুলিকে এক সঙ্গে ২।৩ দিন ধরিয়া পচাইলে বীজ অনায়াসেই ছাড়িয়া আসিবে। সেগুলিকে পরে জলে পরিষ্কার করিয়া শুকান আবশ্যক।

বীজ জমী (Seed-bed)—যে স্থানে সূর্য্যতাপ প্রখর নহে সেইরূপ স্থানে করা উচিত। কারণ, বীজ রোপণের পর সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অনিষ্ট করে এবং এমনও দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যতাপে চারা গাছ আদৌ বাহির হয় নাই।

চারা গাছ (Seedling)—প্রস্তুত করিবার জন্য জমীর পাট বিশেষ ভাবে করা দরকার। আল্‌গা ও নরম মাটী না হইলে গাছ ভাল হয় না। আমাদের দেশী কোদালে ২।১ বিঘা জমী প্রস্তুত করা চলে; তবে যাহারা বেশী জমীতে বেগুন দিতে চাহেন তাঁহাদের লাঙ্গল ব্যবহার করাই উচিত। কারণ, লাঙ্গলে খরচ কম হয়। বীজ-জমীতে সার দিলে চারা গাছগুলি বেশ তেজী ও বলিষ্ঠ হয়। বীজ-জমীতে পচা গোবর, ছাই ও সামান্য পরিমাণে চুণ দেওয়াই বিধি। পৌষ, মাঘ মাস হইতে জমী প্রস্তুত আরম্ভ

করা উচিত এবং চৈত্র, বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে যদি এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যায় তাহা হইলে আর জলসেচন করিয়া জমী ভিজাইয়া লইতে হয় না। বীজ বপন করিয়া সেগুলি মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করাই প্রথা। বপনের পর যদি মাটী ভিজা না থাকে কিম্বা বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে প্রতি সন্ধ্যায় অল্প পরিমাণে জল সেচন করা বিশেষ দরকার —কারণ, মাটী ভিজা রাখাই প্রয়োজন। বীজ-জমী যদি ঠাণ্ডা জায়গায় না হয় তাহা হইলে বপনের পর তালপাতা কিম্বা কলাপাতা দিয়া জমী আবৃত রাখা উচিৎ। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ নিবারণের ইহাই সহজ উপায়। ৩।৪ দিনের মধ্যেই চারা গাছ বাহির হয়। যদি বেশী বৃষ্টি হয় তাহা হইলে জমী হইতে জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা প্রয়োজন। চারা গাছ বাহির হইলে অনেক পোকা আসিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে—ইহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছাই ও চূণের গুঁড়া গাছের ও জমীর উপর ছড়াইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

চারাগাছ উঠাইয়া অপর জমীতে রোপণ—(Transplantation)—যে জমীতে চারা গাছ লাগাইতে হইবে সেই জমীও পৌষ, মাঘ মাস হইতে প্রস্তুত না করিলে জমী বেগুনের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। এই স্থানে পলীহার করা নিয়ম। ছোট জমী হইলে কোদালী দিয়া প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু বড় হইলে লাঙ্গল দিতে হইবে—এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সময় হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত যদি মাসে এক একবার করিয়া জমীতে চায দিয়া রাখা যায় তাহা হইলে জমীর অবস্থা অতি সুন্দর, অর্থাৎ উর্ব্বর এবং আগাছা ও কীটশূন্য হইয়া থাকে। এইরূপ মাসিক একবার চাষ দিয়া জমী আলা ভাবে ফেলিয়া রাখিলে জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। বায়ু হইতে উর্ব্বরতাদায়ক কয়েকটি সামগ্রী আলা মাটীর মধ্যে সহজেই প্রবেশ করিয়া ঐ মাটীকে আরও উর্ব্বর করিয়া দেয়। জমী মাসে একবার ওলট পালট করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়; বিশেষতঃ এরূপ করাতে আগাছা ও কীটের পুত্তলি (Pupa) সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। বৈশাখের মাঝামাঝি জমী চোস্ত করিয়া চারাগাছ পুঁতিবার জন্য প্রস্তুত করা উচিত। জমীর চারিদিকে নালা রাখা আবশ্যক; কারণ, জমীতে জল দাঁড়াইলে এই নালাগুলির সাহায্যে অতিরিক্ত জল বাহির করিতে হইবে। ৩ ফিট্ অন্তর জুলি করিয়া এই জুলির মধ্যে ৩ ফিট্

অন্তর চারাগাছ লাগান দরকার—কারণ, বেশী ঘন করিয়া পুতিলে পরে অনিষ্ট হইতে পারে। গাছ লাগানর পর প্রত্যেক গাছের তলায় গুঁড়া খৈল, ছাই ও চুণ দিলে গাছগুলি শীঘ্র লাগিয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গোবর ও খৈলে ফলের পরিবর্ত্তে পাতাই অধিক উৎপন্ন হয়। যাঁহারা জমীতে সার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে প্রতি বিঘায় ২ মণ খৈল, ১ মণ ছাই, ১৫ সের চুণ গুঁড়া করিয়া ছিটাইয়া দিলে জমীতে যথেষ্ট সার দেওয়া হইল। এই সার প্রয়োগ করিলে ফসল খুবই ভাল হয়। ১০।১৫ দিন পরে গাছের মধ্যে জমীটুকুকে কোদালী দিয়া সমতল করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং আরও ১০।১৫ দিন পরে কোদালী দিয়া জুলিগুলিকে উঁচু করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

চারাগাছ লাগাইবার পর জলসেচন বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যদি বৃষ্টি হয়, কিম্বা হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে জলসেচন না করিলেও চলে। জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব বৃষ্টির পর যদি গাছ রোপণ করা হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জলসেচন না করিলে চলিতে পারে। কিন্তু যদি চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে রোপণ করা হয় তাহা হইলে মাসে একবার করিয়া জলসেচন আবশ্যক। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মাসে একবার জল-সেচনই যথেষ্ট। শ্রাবণ মাসে গাছ ফল দিতে আরম্ভ করিবে এবং শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে গাছের তলায় একবার মাটী দিলে গাছ বেশ শক্ত হইয়া উঠিবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেগুন গাছ রোপণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা শীতকালের ফসল বলিয়া ধার্য্য হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে চারাগাছ প্রস্তুত হয় এবং মাঘ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল ফলিতে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে গাছ লাগাইয়া সারা বৎসর বেগুন পাওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্ত আশ্বিন ও বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। আবার কখন কখন ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করিয়া বৈশাখ মাসে চারাগাছ তুলিয়া রোপণ করা যায়। এই গাছগুলি ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফল দিয়া থাকে। যেসকল গাছ প্রথমে অর্থাৎ ফাল্গুনের প্রারম্ভে ফল দেয় নাই, সেগুলিকে ছাঁটিয়া তাহাদের তলায় সার প্রয়োগ ও মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।* জুলি

* Vide Mr. Sen's Report on Agriculture in the Burdwan District.

বেগুনের পোকা।
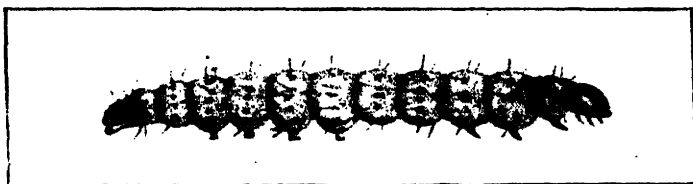
প্রথম চিত্র (তিনগুণ বর্দ্ধিত আকারে)।

বেগুনের পোকা।

দ্বিতীয় চিত্র

Mohila Press, Cal
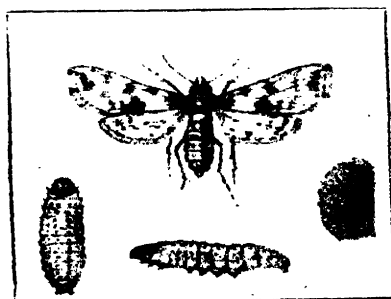
বেগুনের বীজ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপন করিয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে চারা গাছ লাগাইতে হয় এবং তাহারা ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ফল দেয়।

বেগুন গাছ অনেকরূপ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়—এবং ইহাতে প্রায়ই ধসা (fungus) ধরিয়া থাকে। "তুলসীমারা" বলিয়া একরূপ রোগ ইহাকে আক্রমণ করে। যে গাছগুলিতে ধসা ধরে সেগুলিকে উপড়াইয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। একরূপ জীবাণু হইতেই এই রোগের উৎপত্তি এবং দাঁড়ান জলে এই জীবাণু বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য বেগুনের জমিতে জল রাখা নিষিদ্ধ।

বেগুনের পোকা :—বেগুন গাছ প্রায়ই শুকাইয়া যাইতে ও বেগুন কাণা হইতে দেখা যায়। দুই প্রকার পোকার দ্বারা গাছ ও ফলের এই অনিষ্ট হইয়া থাকে। এক জাতীয় পোকার কীড়া (caterpillar) ফল ও গাছের ডগা উভয়ই নষ্ট করে; তবে ফলের ক্ষতিই অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। এই জাতীয় স্ত্রী প্রজাপতি ফল কিম্বা ডগার উপরে ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিবার পর কীড়াগুলি ছিদ্র করিয়া ফল ও ডগার ভিতরে প্রবেশ করে ও শাঁস খাইয়া ফেলে। প্রথম চিত্রে এই জাতীয় কীড়া দেখান হইয়াছে।

অপর জাতীয় পোকার কীড়া কেবল মাত্র গাছই নষ্ট করে। ইহার স্ত্রী প্রজাপতি গাছের ডাঁটার উপর ডিম পাড়িয়া যায়—ডিম ফুটিলে কীড়ারা ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং গাছের শাঁস খাইয়া গাছটিকে একেবারে মারিয়া ফেলে। দ্বিতীয় চিত্রে এই জাতীয় প্রজাপতি, কীড়া ও গুটী দেখান হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের চাষীরা শুষ্ক ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া কিম্বা কাণা বেগুনগুলি বাছিয়া ক্ষেত্রের ধারে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে পোকাগুলি না মরিয়া আবার প্রজাপতি হইতে পায় ও পুনরায় ডিম পাড়িয়া অনেক গাছ ও ফল নষ্ট করে। শুষ্ক ডগা ও কাণা বেগুনগুলি সময় মত তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। প্রথম হইতে এইরূপ করিলে তত অনিষ্ট হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া বেগুন গাছের আরও দুই একটি অনিষ্টকর পোকা আছে। তবে তাহারা এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

এক বিঘায় বেগুন আবাদ করিলে কত খরচ পড়ে ও তাহা হইতে কত

আয় হইতে পারে নিম্নে তাহা দেখান যাইতেছে। তালিকাটি মোটামুটি ধরা হইয়াছে—সুতরাং ইহা হইতে কিছু বেশী বা কিছু কম ব্যয় হইতে পারে—তবে ইহা হইতে পাঠকগণ আয় ব্যয়ের ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

বিঘা প্রতি আয় ও ব্যয়।

লাঙ্গল, চৌকী প্রভৃতির সাহায্যে জমী প্রস্তুত করিবার খরচ	...	২৲
জমীতে জুলি প্রস্তুত করিবার খরচ	... ...	১৲
জলসেচনের জন্য নালী নির্ম্মাণের খরচ	... ...	॥০
চারাগাছ তুলিয়া পুতিবার খরচ	... ...	১॥০
সারের ব্যয়	... ...	৪॥০
গাছের তলায় মাটী দিবার খরচ	... ...	২
ঘাষ উঠাইবার খরচ	... ...	১
জমী উস্কানর ব্যয়	... ...	১৲
জলসেচনের ব্যয়	... ...	৩৲
ফল তুলিবার খরচ	... ...	৩৲

বাঙ্গালায় পারিশ্রমিকের হিসাব ধরিলে ব্যয় ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক হওয়া সম্ভব। মোটামুটি ২০৲ টাকা খরচ করিলে এক বিঘা জমী হইতে যথেষ্ট ফসল আশা করা যাইতে পারে।

এখন লাভের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখা যাউক। ৩ ফিট্ অন্তর গাছ রোপণ করিলে এক বিঘায় প্রায় ১,৬৫০টি গাছ পুতিতে পারা যায়। এই ১৬৫০টি গাছের মধ্যে আমরা ৩৫০টি গাছ ছাড়িয়া হিসাব করিব—কারণ, সকল গাছই যে ফল দিবে এবং সকল গাছই যে বাঁচিবে তাহার সম্ভাবনা নাই—কতকগুলিকে পোকা কিম্বা অপর জন্তু নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৩০০ গাছ হইতে আমরা ফসল পাইতে পারি।

দেখা গিয়াছে, গড়ে প্রত্যেক গাছ ৩ সের করিয়া ফল দিয়াছে। তাহা হইলে ১৩০০ গাছ হইতে আমরা ৩৯০০ সের অর্থাৎ ৯৭ মণ ২০ সের বেগুন পাইব—মোটামুটী ৯০ মণ পাইবার আশা সকলেই করিয়া থাকেন। আড়াই পয়সা করিয়া বেগুনের সের ধরিলে অর্থাৎ ১।৴০ করিয়া মণ ধরিলে আমরা ৯০ মণ হইতে ১৪০॥৴০ পাইতে পারি—ইহা হইতেও যদি আমরা

১০৲ টাকা ছাড়িয়া দিই—তাহা হইলে ১৩০৲ টাকা আসিবে। দেখা যাইতেছে, ২০৲ টাকা খরচ করিয়া আমরা ১৩০৲ টাকা পাইব এবং আমাদের খরচ বাদে ১১০৲ টাকা লাভ থাকিবে। গৃহস্থের সংসারে ১১০৲ টাকা আয় কম নহে।

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে, অনেকের কিচেন্ গার্ডেন (গৃহস্থালী তরকারীর ক্ষেত্র) আছে—এবং ইহা হইতে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে আমোদ লাভ করিয়া থাকেন। মহিলাগণই ইহার তত্ত্বাবধান করেন এবং অনেকে স্বহস্তে সেই বাগানে কায করিয়া "তরিতরকারী"গুলি বেশ তাজা পাইয়া থাকেন। সেগুলি যে বাজারের জিনিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থেরই এইরূপ বাগান করা উচিত এবং মহিলাদিগকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যেন তাঁহারা বাগান দেখিতে পারেন। আজকাল সহরে ও মফঃস্বলে অনেক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যদি এইরূপ বিদ্যালয়সংলগ্ন একটি করিয়া ছোট বাগান থাকে এবং তাহাতে আমাদের ছোট মেয়েরা কি করিয়া আলু, বেগুন, কপি, শাক প্রভৃতি রোপণ করিতে হয় তাহা শিখিতে পারে তাহা হইলে আমাদের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সে শিক্ষাপ্রণালীও আলোচ্য।*

গভর্ণমেণ্ট কৃষিকলেজ,
সাবোর, বিহার। } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

* সাবোর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক ও আমাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, এম, এস, এ (Cornell) আমার এই প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত দেখিয়া বহুস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। লেখক।

চিত্রগুলি Imperial Entomologist মহাশয়ের অনুগ্রহে পাওয়া গিয়াছে। সম্পাদক।

অদৃষ্ট-চক্র।

তৃতীয় খণ্ড

বেদন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাণ।

যতীশচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ ধরণীধর পাইয়াছিলেন। অমূল্যচরণ ইচ্ছা করিয়া—তাঁহার হৃদয়ক্ষতে বেদনার ক্ষার নিক্ষেপ করিবার জন্য কৌশলে সে সংবাদ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই কার্য্যের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই; উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। যে ধরণীধর পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিতে হৃদয় পূর্ণ রাখিয়া দীর্ঘ জীবন পুণ্যপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন; যিনি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যেমন যত্নে অগ্নি রক্ষা করেন—তেমনই যত্নে প্রেমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন;—যিনি বিজনে পত্নীর ধ্যানে—নিশীথে নয়নজলে প্রেম পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে পুত্রের এই ব্যবহার যে কিরূপ ক্লেশের কারণ হইবে অমূল্যচরণের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। যতীশচন্দ্রও তাহা অনুমান করিতে পারিত না।

অমূল্যচরণ কৌশলে তাঁহাকে এ সংবাদ পাঠাইয়াছিল; আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে এ সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এ সংবাদ ধরণীধরের পক্ষে বজ্রাঘাতের মত হইল।

ধরণীধর যে দারুণ চেষ্টায় হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন, সেই চেষ্টার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বিদেশে চাকরী করিবার সময় একজন ভৃত্য দীর্ঘ বিংশবর্ষকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সে তাঁহার সহিত শ্বাপদসঙ্কুল কাননে, প্লাবনভীষণ নদীকূলে, জনহীন গিরি-গাত্রে বিপদেও শঙ্কা বোধ করে নাই। কত অন্ধকার নিশায় সে প্রভুর শিবিরসম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া জাগিয়াছে! কতবার সে প্রভুর পীড়ায় তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে! সে ছায়ার মত প্রভুর অনুসরণ করিত। ধরণীধর যখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তাহাকে তাহার বাস-গ্রামে কিছু জমী কিনিবার উপযুক্ত অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। প্রভুকে

পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে সে কাঁদিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, যেন এত দিনে তাহার আর কোন কার্য্য নাই। সে প্রভুর সহিত যাইতে চাহিয়াছিল। ধরণীধর অনেক বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, হয় ত তাঁহাকে কক্ষ্যচ্যুত—লক্ষ্যহীন তারকার দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। সে অবস্থায় তিনি আপনার অনিশ্চিত অদৃষ্টের সহিত আর কাহাকেও জড়াইতে চাহেন নাই। কিন্তু বারাণসীতে আসিয়া যখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, যখন তিনি আবার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তখন প্রথমেই সেই পুরাতন ভৃত্য হরদয়ালের কথা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িবার কারণও ছিল; সে মধ্যে মধ্যে প্রভুকে পত্র লিখিত এবং প্রতি পত্রেই তাঁহার নিকট আসিবার অনুমতি চাহিত। ধরণীধর যখন তাহাকে লিখিলেন, সে তাঁহার নিকট আসিতে পারে, তখন সে যেন স্বর্গ হস্তে পাইল। সে বারাণসীতে আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ প্রভুর সংসারের সকল ভার লইল—সে ভার বহনেই সে অভ্যস্ত। ধরণীধরও আবার তাহাকে পাইয়া অনেক বিরক্তিকর ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তিনি প্রভাতে ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া—অপরাহ্নে কোন ধর্ম্মশিক্ষকের নিকট ধর্ম্মালোচনার পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতেন, তাঁহার আবশ্যক সকল দ্রব্যই যথাস্থানে স্তস্ত।

একদিন হরদয়াল তাঁহাকে দুইখানি পত্র আনিয়া দিল। সে দুইখানিতে যতীশচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ ছিল। পত্র দুইখানি পাঠ করিতে করিতে ধরণীধরের মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। পত্রপাঠ শেষ হইল। তিনি কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানহতের মত বসিয়া রহিলেন—যেন অতর্কিত দারুণ আঘাতে তাঁহার বেদনানুভবশক্তিও লুপ্ত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ধরণীধর আবার পত্র দুইখানি পাঠ করিলেন। পত্রে যে কথা লিখিত ছিল তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

ধরণীধর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বক্ষে বিষম বেদনা অনুভূত হইল;—সে বেদনা—যাতনা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হরদয়াল দাঁড়াইয়া ছিল। ধরণীধর তাহাকে শয্যারচনা করিতে বলিলেন। সে ক্ষিপ্রহস্তে প্রভুর শয্যারচনা করিয়া দিল। ধরণীধর ধীরে ধীরে যাইয়া সেই শয্যায় শয়ন করিল।

সে দিন ধরণীধর আর শয্যাত্যাগ করিলেন না, কেবল একবার

উঠিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া আবার শয়ন করিলেন। তিনি জলস্পর্শ করিলেন না।

হরদয়াল প্রভুর এই ভাবান্তরের কারণ জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু বুঝিল—পত্রে কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে। সে রাত্রিতে সে ঘুমাইল না; দেখিল, সমস্ত রাত্রি ধরণীধরের নয়নপল্লব নিদ্রায় মুদ্রিত হইল না। প্রভাতে ধরণীধর উঠিতে চেষ্টা করিলেন। মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে বক্ষে কেমন বেদনা বোধ হইতে লাগিল। হরদয়াল প্রভুর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইল।

অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সংসারই আর মানুষের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া থাকিতে পারে না; যখন জীবনের পর মৃত্যুর কথা মানুষের মনে পড়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে পরপারের অনিশ্চিত কথা স্বতঃই হৃদয়ে সমুদিত হয়। তখন নাস্তিকের মনে আস্তিক্য বুদ্ধির সঞ্চার হয়—মানুষ মনে কেমন একটা আকুলতা অনুভব করে। এদিকে যৌবনাপগমে শারীরিক শক্তি যত ক্ষুণ্ণ হয়, সেই অনিশ্চিতের সন্ধানকামনা ততই প্রবল হইয়া উঠে। সে সন্ধানকামনার তৃপ্তির জন্য যে ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন, তাহার সুবিধা বারাণসীর মত আর কোথায় আছে? আবার বারাণসী স্বাস্থ্যকর স্থান। তাই অনেক বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অর্থোপার্জ্জনচেষ্টায় কাটাইয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। এই বারাণসীবাস মহাযাত্রার—মহামুক্তির সোপান। ইহাতে মানুষ সংসারী হইয়াও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শিখে—সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত হইতে দূরে আসিয়া ক্রমে সংসার ত্যাগ করিতে শিখে। এই সকল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আবার স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে দল গঠিত করেন; কয়েকজন একত্র ভ্রমণ করেন—ভ্রমণান্তে এক স্থানে উপবেশন করেন—একই মঠে বা আশ্রমে ধর্ম্মালোচনা করেন। এইরূপে যাঁহাদিগের সহিত ধরণীধরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—রমাপ্রসাদ ও ভবদেব। রমাপ্রসাদ কোন জিলায় উকীল সরকার ও ভবদেব সংজ্ঞ ছিলেন। উভয়েই অবসর লইয়া আসিয়া কাশীতে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ও পরদিন প্রভাতে ধরণীধরের সাক্ষাৎ না পাইয়া প্রভাতে ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরিবার সময় উভয়ে ধরণীধরের

গৃহে আসিলেন। তাঁহারা ধরণীধরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—এক দিনে মানুষের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়! কিন্তু কেন এরূপ হইল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ধরণীধরের নিকট বসিয়া চিকিৎসক ডাকাইতে পরামর্শ দিয়া উভয়ে উঠিলেন। হরদয়াল তাঁহাদের সহিত নিম্নে আসিল এবং তাঁহাদিগকে জানাইল, পূর্ব্বদিন দুইখানি পত্র ধরণীধরের হস্তগত হইয়াছে—আর সেই পত্র পাঠ করিয়াই তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছেন। শুনিয়া, রমাপ্রসাদ ও ভবদেব এ উহার মুখে চাহি লে ন। ধরণীধর স্বীয় স্বভাবগুণে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ধরণী-ধরের জীবনের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেন না—তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে বুঝিতে পারিতেন না। তাহার পর হরদয়াল সাশ্রুনয়নে তাঁহা-দিগকে বলিল, "আপনারা বাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।" অপরাহ্নে পুনরায় আসিবেন বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন—ধরণীধরের কথার আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অপরাহ্নে তাঁহারা আবার আসিলেন। সে দিনও ধরণীধর জলস্পর্শ করেন নাই। তাঁহারা জিদ করিয়া তাঁহাকে সামান্য দুগ্ধপান করাইলেন। কিন্তু ধরণীধর শয্যায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—বিষম কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। ধরণীধরের অবস্থা দেখিয়া উভয়েই বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র হরদয়াল বিনিদ্র প্রভুর সেবা করিল।

পরদিন প্রভাতে রমাপ্রসাদ ও ভবদেব একজন চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া আসিলেন। চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া রোগীর প্রকৃত অবস্থা বলিবার জন্য ভবদেবকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় ধরণীধর বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার অবস্থা আমি অবগত আছি। আমাকে গোপন করিবেন না। আমার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আর ব্যবস্থা? এখন ব্যবস্থা—'নারায়ণ ব্রহ্ম'।"

ডাক্তার অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না। আমি পথ্যের ও শুশ্রূষার কথা বলিতে যাইতেছিলাম। অসুখ সামান্য। কেবল, হৃদয় কিছু দুর্ব্বল।"

ধরণীধর হাসিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার চলিয়া যাইলে ধরণীধর বন্ধুদ্বয়কে বলিলেন, "জীবনে আপনা-দিগকে কষ্ট দিয়াছি, মরিয়াও একটু দিব। আমার একটু অনুরোধ

আছে। আমার উইল, রেজেষ্টারী করিয়া সরকারী আফিসে জমা আছে; আমার হাতবাক্সে তাহার নকল আছে। আপনারা আমার মৃত্যু সংবাদ যথাস্থানে দিবেন। আমার দাহের ও শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি—আর যাহা থাকিবে তাহা হরদয়ালকে দিয়া দিবেন। আর আমার মৃত্যু সংবাদ—"

ধরণীধর মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? দুই দিনে সারিয়া উঠিবেন। এত ভয় পাইতেছেন কেন?"

ধরণীধর মৃদু হাসি হাসিলেন; বলিলেন, "জীবনে কখনও মৃত্যুকে ভয় করি নাই; আর শেষে কাশীতে আসিয়া মৃত্যুভয়! এখন মৃত্যুই ত মুক্তি।"

তাহার পর ধরণীধর বলিলেন, "আমার মৃত্যুসংবাদ আমার বৈবাহিককেও দিবেন—তাঁহার ঠিকানা আমার বাক্সে আছে।"

তিনি বন্ধুদ্বয়কে বাক্সের চাবী দিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহারা লইলেন না। তখন তিনি সে চাবী হরদয়ালকে রাখিতে দিলেন। ভবদেব তাহাতে অনেক আপত্তি করিলেন ও ধরণীধরকে অনেক আশ্বাস দিলেন। তাহার পর অপরাহ্নেই আসিবেন বলিয়া বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

বন্ধুদ্বয়ের গমনের পরই ধরণীধর হরদয়ালকে বলিলেন, "তুই স্নান আহার করিয়া আয়।"

হরদয়াল অতি অল্পক্ষণমধ্যেই স্নানাহার সারিয়া প্রভুর নিকটে আসিল। ধরণীধর বলিলেন, "দয়াল, দুই দিন ঘরের বাহির হই নাই। বারান্দায় একটা মাদুর বিছাইয়া দে।"

ধরণীধরের বক্ষে যাতনা বর্দ্ধিত হইতেছিল।

হরদয়াল বারান্দা ঝাঁট দিয়া তথায় একখানি মাদুর বিছাইয়া তদুপরি একটি বালিশ দিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল। ধরণীধর ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া অতি কষ্টে কক্ষ হইতে বারান্দায় আসিলেন। বারান্দায় একটি টবে হরদয়াল একটি তুলসীগাছ রোপণ করিয়াছিল। ধরণীধর শয়ন কালে দেখিলেন, শিয়রে তুলসীতরু। তিনি হাসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "দয়াল, শেষ সময় বৈষ্ণবের বড় কায করিলি।" হরদয়াল প্রভুর কথার অর্থ বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ।

ধরণীধর শয়ন করিলেন। হরদয়াল প্রভুর পদসেবা করিতে লাগিল।

মুদ্রিতনেত্র ধরণীধর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ধরণীধরের যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল—বক্ষে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর যাতনাকুঞ্চিত মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল—তাঁহার গতপ্রাণ দেহ শয্যায় পতিত হইল। ধরণীধরের সকল বেদনার শেষ হইল।

যে জননীকে তিনি জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন সেই জননীর শুশ্রূষায় বঞ্চিত—যে পুত্রের জন্য তিনি দীর্ঘ জীবন শ্রম করিয়াছিলেন সেই পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত—ধরণীধর বিশ্বেশ্বরের পুণ্যভূমিতে আশাহত জীবনের সকল বেদনা হইতে মুক্তি পাইলেন। মণিকর্ণিকার মহা শ্মশানে তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

সরোজা শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ পাইল। সে যখন স্বামীর পুনরায় বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিল, তখন সে আপনার দুর্দ্দশার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ক্রমে সে সেই দুর্দ্দশার স্বরূপ বুঝিতেছিল। এই সংবাদে তাহার সে উপলব্ধির সহায়তা হইল। সে বুঝিল, নারীজীবনে যে দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সে সেই দুর্ভাগ্য ভোগ করিবে। তবুও যত দিন শ্বশুর ছিলেন, তত দিন শ্বশুরগৃহে তাহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল—অধিকার ছিল, এখন সে স্থান গেল—সে অধিকার শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের স্নেহসিক্ত ব্যবহার মনে পড়িল; মনে পড়িল, তিনি পুত্রের ব্যবহারে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে যখন গৃহ হইতে দূরে বিদেশে এই মৃত্যুর সন্ধানে গিয়াছিলেন তখনও তিনি তাহার কথা ভুলেন নাই। তিনি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া তবে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সে বিরজাকে বলিল, "দিদি, আমার কপালেই তাঁহার মৃত্যু হইল।" সে শ্বশুরের জন্য অনেক কাঁদিল।

যতীশচন্দ্রের কলিকাতার ঠিকানা ধরণীধরের বাক্সে ছিল না। ভবদেব ও রমাপ্রসাদ শানগরের ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। পিয়ন ধরণী-ধরের জননীকে পত্র দিয়া গেল। তিনি অপরাহ্নে গ্রামের ছেলেরা যখন গ্রামের নিকটস্থ বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিতে ছিল, তখন তাহাদের

একজনকে ডাকিয়া পত্রখানি দিলেন; জানিলেন, পত্র কাশী হইতে আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে পত্র খুলিতে বলিলেন—বুঝি ধরণীধরের রাগ পড়িয়াছে। আহা! পড়িবারই কথা। যতীশের উপর সে কি রাগ করিয়া থাকিতে পারে? তিনি যতক্ষণ এইরূপ ভাবিতে-ছিলেন বালক ততক্ষণ খাম খুলিয়া পত্র পড়িতেছিল। সে তাঁহাকে পত্র পড়িয়া শুনাইল। বৃদ্ধার আর্ত্তনাদে প্রতিবেশিনীরা আসিলেন; সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে সচেষ্ট হইলেন। বালক ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গ্রামে এ কথা রাষ্ট হইয়া গেল। গ্রামের "ঠাকুরদাদা" হরিনাথ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া পত্রখানি—কলিকাতায় যতীশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

যতীশচন্দ্র পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইল। এই সংবাদ তাহার পক্ষে অত-র্কিত আঘাতের মত অনুভূত হইল। সে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছে—করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেছিল। সে মনে করিয়াছিল, সে পিতার সহিত সকল সম্বন্ধ কাটাইয়াছে। কিন্তু আজ যখন শোকের প্রবল বাত্যা তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত অভিমানের ও অবিমৃষ্যকারিতার মেঘ উড়াইয়া দিল, তখন তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে যে দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছিল তাহাও কেবল তাঁহারই ভরসায়। আজ তাহার সমস্ত হৃদয় কেমন একটা অব্যক্ত—অজ্ঞেয় বেদনায় একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আপনার কৃত কর্ম্মের কথা ভাবিতে লাগিল।

আজ যতীশচন্দ্রের মনে হইল, সে যে আশ্রয়ের আশায় এত দিন যাহা ইচ্ছা করিয়াছে ও করিতে পারিয়াছে সহসা সে সেই আশ্রয়চ্যুত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে শানগরের ভবনে তাহার স্নেহশীলা পিতামহীর কথা তাহার মনে হইল। তিনি কেবল তাহারই জন্য পুত্রের সহিতও যাইতে সম্মতা হয়েন নাই। আজ তাঁহার কি দুর্দ্দশা! তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই শানগরে চলিয়া যাইবে।

সে দিন মধ্যাহ্নের পরই অমূল্যচরণ তাহার গৃহে আসিল। তখন যতীশ-চন্দ্র শানগরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। অমূল্যচরণ সকল কথা শুনিল—কপট বিলাপে যতীশচন্দ্রের বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল। তাহার পর তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। সে বুঝাইল, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার পক্ষে কাশী যাওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ,

ধরণীধরের কোন নির্দ্দেশ থাকিলে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আবার তিনি সম্পত্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহাও কাশীতে না যাইলে জানা যাইবে না।

শোকের আবেগে এ কথাটা এতক্ষণ যতীশচন্দ্রের মনে হয় নাই। সে স্বীয় কর্ম্মদোষে যে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছে—এইবার সে তাহা হইতে মুক্তি পাইবে।

সে সেই দিনই কাশীযাত্রা করিল। অমূল্যচরণ সঙ্গে গেল। অমূল্যচরণ মনে মনে বড় আনন্দিত, এইবার ধরণীধরের অর্থ যতীশ পাইবে। যতীশ তাহার হস্তগত।

পরদিন যতীশচন্দ্র কাশীতে পৌঁছিল ও খোঁজ করিয়া ভবদেবের বাসায় উপস্থিত হইল। ভবদেব তাহার পরিচয় পাইয়া সাদরে তাহাকে লইয়া তাহার হবিষ্যান্নের ও অমূল্যচরণের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে সে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিল। জীবনে সে এ অভিজ্ঞতা কখনও লাভ করে নাই।

এ দিকে ভবদেব রমাপ্রসাদকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুগৃহে আসিলেন। উভয়ে যতীশচন্দ্রকে লইয়া ধরণীধর যে গৃহে বাস করিতেন সেই গৃহে চলিলেন। অমূল্যচরণ সঙ্গে গেল।

ধরণীধরের মৃত্যুর পর ভবদেব ও রমাপ্রসাদ তাঁহার শয়ন-কক্ষ চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় তাঁহারা তাঁহার দ্রব্যাদির কোন ব্যাবস্থাই করেন নাই। হরদয়াল প্রভুর সম্পত্তি আগলাইয়া সেই গৃহে বাস করিতেছিল। সে দ্বারেই বসিয়া ছিল। নগ্নপদ—বিশদবাস যতীশচন্দ্রকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পর রমাপ্রসাদ ও ভবদেব যতীশচন্দ্রকে সকল কথা বলিলেন। উইলের কথা শুনিয়া অমূল্যচরণের কেমন চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে লাগিল। ভবদেব হরদয়ালের নিকট হইতে চাবি লইয়া হাতবাক্স খুলিলেন। ধরণীধরের উইল উপরেই ছিল। রমাপ্রসাদ সেই উইল পাঠ করিতে লাগিলেন। উইলে যতীশচন্দ্রে নামোল্লেখও নাই! ধরণীধর লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর ভরণপোষণের আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থে তিনি কোম্পানীর কাগজ করিয়াছিলেন! সে অর্থে পরিমাণ যতীশচন্দ্রের অনুমানাতিরিক্ত। সেই অর্থ তিনি স্বগ্রামের উন্নতিকর

অনুষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটি বিদ্যালয় ও মাতৃদেবীর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইবে। সমস্ত অর্থ সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইবে; সরকার হইতে তাঁহার উইলের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করা হইবে। কাগজগুলি ব্যাঙ্কে জমা ছিল।

অমূল্যচরণ আর চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া কেহ এরূপ উইল করিলে সে উইল কি টিঁকে?"

ভবদেব বলিলেন, "উইলের নির্দ্দেশ বিস্ময়কর বটে; কিন্তু উইল অসিদ্ধ বলিবার কোন উপায় ত দেখিতেছি না। সমস্ত অর্থই ত দেখিতেছি, ধরণীধরের স্বোপার্জ্জিত। এ অর্থের যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার ছিল।"

যতীশ কোন কথা বলিল না। কিন্তু অমূল্যচরণ বলিল, "বাঙ্গালীর উইল—রথী মহারথীর উইলও ত দেখি শেষ টিঁকে না।"

ভবদেব হাসিয়া বলিলেন, "তাহা সত্য। আমরাও অনেক উইল নাড়াচাড়া করিয়াছি; কিন্তু এ উইল নাকচ করিবার কারণ ত দেখি না। ইহাতে যে একেবারেই কোনরূপ জটিলতা নাই—সবই সোজা। কি বল, দাদা?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "ইহা ত একরূপ দানপত্র"।

যতীশচন্দ্র ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যে অবলম্বন ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—আজ সে সেই অবলম্বনচ্যুত। এইবার তাহাকে সত্য সত্য স্বাবলম্বন অবলম্বন করিতে হইবে। এতদিন সে সংসার-সংগ্রামের নামে ছেলেখেলা করিয়াছে; এইবার সে সত্য সত্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহার হৃদয় শঙ্কাকুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় সে বিচলিত। ভবদেব যখন বলিলেন, "শ্রাদ্ধাদির ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত আর প্রায় দুই শত টাকা রহিয়াছে। এ টাকা ধরণীবাবু ভৃত্য হরদয়ালকে দিতে বলিয়াছেন। দিব কি?" তখন যতীশচন্দ্র কেবল মস্তক-সঞ্চালনে সম্মতি জানাইল।

সেই অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় হরদয়ালের মনে হইল যেন সে শূন্য হৃদয়ে শূন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

ধরণীধরের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া যতীশচন্দ্রও সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া চলিল। সে যদি আপনার দুর্ভাবনায় আপনি অভিভূত না থাকিত,

তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিত, অমূল্য চরণের ব্যবহারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অমূল্যচরণ তাহার জন্য যেরূপ ব্যস্ততা দেখাইত এখন তাহার ব্যবহারে সে ভাবের অভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ধরণীধরের উইলের নির্দ্দেশ শুনিয়া এবং সেই উইল সম্বন্ধে রমাপ্রসাদের ও ভবদেবের মত জানিয়া অমূল্যচরণ বুঝিয়াছিল, আর যতীশচন্দ্র হইতে কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। বরং এতদিন সে যে তাহারই আশায় অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করে নাই সে জন্য সে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনি লজ্জিত ও যতীশচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইতেছিল।

কিন্তু যতীশচন্দ্র কপটবন্ধুর ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল না ; সে কেবল ভাবিতেছিল। সে ভাবনার অন্ত নাই। সে এখন কি করিবে? এতদিন পর্য্যন্ত সে কিছুমাত্র উপার্জ্জন করিতে পারে নাই—ঋণে ও পিতামহীর সাহায্যে সংসার চলিয়াছে। এমন—তাহার অবস্থা জানিলে কে তাহাকে ঋণ দিবে? পূর্ব্বের ঋণ শোধ করিবার ও সংসার চালাইবার উপায় কি? সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

ক্রমে ট্রেন কলিকাতায় পৌছিল। যতীশ গৃহে উপস্থিত হইলেই—অমূল্যচরণ বিদায় লইয়া গৃহে চলিয়া গেল। যতীশচন্দ্র সেই দিনই শানগর যাত্রা করিল।

মানব-প্রহেলিকা।

(৪)

চৈতন্য ও দেহ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জীব-প্রহেলিকার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত আত্মার নাস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অধ্যাত্ম ব্যাপার জড়বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত। জড়বিজ্ঞান কেবল এইটুকু-মাত্র দেখিতে পায় যে, জড়কে অবলম্বন করিয়াই আত্মার শক্তি স্ফুরিত হইয়া থাকে। কারণ, দেহ ভিন্ন জীব নাই। জীব যতই ক্ষুদ্র, অনুবীক্ষণেরও অগোচর হউক কেন, উহার একটা দেহ আছে। সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া উহার চৈতন্য বিকাশ পাইতেছে। দেহ নষ্ট বা বিকৃত হইলে চৈতন্য বিলুপ্ত হয়। দেহ জড়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জড়-বাদীরা বলেন, যখন জড়ের অবস্থাবিশেষের সহিত চৈতন্যের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন চৈতন্য জড়েরই শক্তিবিশেষ। চৈতন্য-বাদীরা বলেন, চৈতন্য আত্মারই শক্তি; কেন না আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কেন না এই জড়বিজ্ঞানপ্রধান যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে প্রকার প্রমাণ চাহেন, আমি সে প্রকার প্রমাণদ্বারা উহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করি নাই। আমি যে প্রমাণদ্বারা উহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সেইরূপ অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া জড়বিজ্ঞানকেও অনেক সিদ্ধান্ত করিতে হয়। নতুবা বিজ্ঞান এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। ইথার, আলোকতরঙ্গ, পরমাণুর (atom) মৌলিক উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মত (theory) এখনও অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যক্ষবাদমূলক, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বিষয়ীভূত তথ্যসম্মত জড়বিজ্ঞানকেই যখন আলোক, ইথার, তড়িৎ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক hypothesis বা অনুমান স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন অতীন্দ্রিয় ব্যাপারসম্পর্কে এরূপ অনুমান নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট কখনই অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

আত্মা একটি স্বতন্ত্র শক্তি (energy *per se*) বা সত্তা, ইহা স্বীকার

করিলে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি তাহা বুঝা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। দেহকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ চৈতন্যের কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। চৈতন্য আত্মারই শক্তি। আত্মা না থাকিলে চৈতন্য থাকে না। কিন্তু চৈতন্য না থাকিলে যে আত্মা নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। চৈতন্য যখন আত্মশক্তির বাহ্য স্ফুরণ, তখন কোন কারণে সেই বাহ্যস্ফুরণ শুদ্ধ বা রুদ্ধ হইলেই চৈতন্য লুপ্ত হইবে,—যাহাকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্য স্ফুরিত হইতেছিল, তাহা বিকৃত হইলেই চৈতন্যের বাহ্য প্রকাশ বন্ধ হইবে। আমার সম্মুখে যে আলোকটি জ্বলিতেছে উহার কাচাধারের মধ্যে দীপশিখা জ্বলিতেছে বলিয়াই উহার মধ্য দিয়া আলোক বাহির হইতেছে। দীপশিখা না থাকিলে ঐ আলোক প্রকাশ পাইত না। কিন্তু আলোক-প্রকাশ রুদ্ধ বা শুদ্ধ হইলেই যে মধ্যের দীপশিখাটি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। চিমনীতে অত্যন্ত কালি পড়িলে ভিতরের দীপশিখাটি সত্ত্বেও আলোকনির্গমণ রুদ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ বাহ্যতঃ চৈতন্যের লোপ দেখিয়াই অন্তরস্থ আত্মার অভাব অনুমান করা সকল ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে।

কিন্তু সাধারণতঃ চৈতন্যই দেহমধ্যে আত্মার অস্তিত্ব সূচিত করে। চৈতন্যের অত্যন্তাভাবই জীবের মৃত্যু। মৃত্যুতে চৈতন্য একেবারে লুপ্ত হয়, আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ জানিতে হইলে দুইটি পন্থা আছে। একটি পন্থা জড়বিজ্ঞান-সম্মত, আর একটি অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সম্মত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত নহে। সুতরাং জড়বিজ্ঞান জড়ের দিক হইতে জীবনী শক্তি বুঝাইবার চেষ্টা পায়। 'সচেতন জীবমাত্রই ক্রিয়াশীল। ক্রিয়া করিতে শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি কোথা হইতে আইসে? জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, এঞ্জিন যে ভাবে শক্তি-সংক্রমণ করে জীবদেহও ঠিক সেই ভাবেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকে। এঞ্জিনের যেমন কয়লা ইন্ধন, জীবদেহের তেমনই খাদ্যই ইন্ধন। খাদ্যদ্রব্য দেহমধ্যে গৃহীত হইলে উহা উদরে পরিপাক হইতে আরব্ধ হয়। এই পরিপাকক্রিয়ার ফলে দেহমধ্যে অক্সাইড জন্মে। এই অক্সাইড উৎপত্তিক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হইয়া দেহকে সচল ও জীবকে ক্রিয়াশীল করে। অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যই রূপান্তরিত হইয়া জীবের শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। অন্নই জীবনী শক্তি।

এঞ্জিনের সহিত জীবদেহের এই সাদৃশ্য-কল্পনা সমীচীন নহে। খাদ্য-দ্রব্য হইতে মানবের শক্তি উপচিত হয়, এ বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে ক্ষয় পাইতেছে। কেরিংটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভুক্ত দ্রব্য হইতে জীবের বলাধান হয় না।* সম্পূর্ণ বিভিন্ন উৎস হইতে জীবনীশক্তি ও বল উদ্ভূত হইয়া থাকে। খাদ্য পরিপাকের সহিত দৈহিক শক্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান যুগে পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উপবাসে লোক দুর্ব্বল হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ব্বল রোগী এক মাস দেড়মাস উপবাসের পর সবল হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে রোগী দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হইত না, সে কয়েক দিন উপবাসের পর চারি পাঁচ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।† রোগ বিশেষ ও ক্ষেত্র বিশেষে উপবাসই যে উপকারী ইহা চিকিৎসকগণ চির-কালই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমরা নিজেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, জল পানমাত্র করিয়া উপবাস করিলে প্রথম তিন চারি দিন অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তাহার পর কষ্ট বোধ হয় না, বা অধিক পরিশ্রম না করিলে শরীর দুর্ব্বল হয় না। ইহাতে মনে হয় যে, খাদ্য ভিন্ন অন্য কোন উৎস হইতে জীবনীশক্তি ও দৈহিকশক্তি উচ্ছ্বাসিত হয়। খাদ্য জীবনী শক্তির উৎপাদক নহে, অংশতঃ দৈহিক বলের উৎপাদক, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। খাদ্য যদি জীবনীশক্তিরও দৈহিক বলের কেবলমাত্র উৎপাদক হইত, তাহা হইলে উপবাস করিয়া লোক অধিক দিন বাঁচিত না। সুতরাং কয়লা যে ভাবে এঞ্জিনের শক্তি উৎপন্ন করে, খাদ্য ঠিক সেই ভাবে জীবনী শক্তি ও দৈহিক শক্তি উৎপন্ন করে, এ উক্তি সত্য নহে।

সকলেই অবগত আছেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। ক্লান্তি সেই ক্ষয়ের সূচনা করে। ক্লান্ত লোক নিদ্রা চাহে,—নিদ্রার দ্বারা ক্লান্তি অপগত ও ক্ষয় উপচিত হয়। মানুষ আহার না করিয়া

* 'Vitality, Fasting and Nutrition by Hereward Carrington.

† "If the daily food supplied the strength of the body and its vital energy, it should weaken when this food is withdrawn, but the facts are that in all diseased conditions at any rate—that is not the case and that patients who enter upon a fast so weak and debilitated that they cannot walk down stairs, are strong enough to be walking at its conclusion and after having fasted forty or fifty days."

Death Appendix B.

কিছু দিন থাকিতে পারে,—নিদ্রা না যাইয়া অধিক দিন থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির নিদ্রা হয় না সে ভূরি ভোজন করিলেও দুর্ব্বল হয়। দেহ আপনা আপনি আপনার ক্ষয় পূর্ণ করিয়া লইতে পারে, সেই ক্ষয় পূর্ণ করিবার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। সজীব জীবদেহের স্বশক্তি বলে ক্ষয়ের পূরণ করিবার শক্তি আছে—এঞ্জিনের তাহা নাই। নিদ্রাকালে দেহীর দেহক্ষয় পুষ্ট হইয়া থাকে, এঞ্জিনের তাহা হয় না। সুতরাং শরীর-বিজ্ঞান-বিৎগণ দৈহিক বলের সহিত এঞ্জিনের শক্তির যে তুলনা করিয়া থাকেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এ সম্বন্ধে মার্কিণে ও য়ুরোপে আবার নূতন করিয়া বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

নিদ্রাকালে দৈহিক ক্ষয়ের উপচয় হয়। যে শক্তিবলে ঐ শক্তির উপচয় হয়, তাহা দেহের শক্তি নহে, দেহীর শক্তি,—কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে দেহ আত্মার যন্ত্র। এই দেহ-যন্ত্র সাহায্যে জীবাত্মা জগতে তাহার শক্তিপ্রকাশ করিয়া থাকে। আত্মা আপনার শক্তিবলে দেহ গঠিত করিয়া লয়; এই দেহ যদি বিকৃত হয়, অর্থাৎ জীবাত্মার শক্তিপ্রকাশের অযোগ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জীবাত্মাকে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। এই দেহপরিত্যাগের নাম মৃত্যু। দেহান্তর গ্রহণের নাম পুনর্জ্জন্ম। অধুনাতন পুনর্জ্জন্মবাদী য়ুরোপীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এই সত্য স্বীকার করিতেছেন,—কিন্তু ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমী হিন্দুরা তাঁহাদের উক্তি আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ জীবদেহ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। যে জৈব উপাদানদ্বারা উহা গঠিত, রাসায়নিক উপাদান-সংযোগে তাহা প্রস্তুত করা যায় না। জীবদেহে অবিশ্রান্ত ক্ষয় (combustion) পাচন (fermentation) ও পুনর্গঠন (reconstruction) চলিতেছে। ইহার অনেকগুলি ব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা মন্দিরে প্রদর্শিত হইতে পারে সত্য,—কিন্তু সমস্ত দৈহিক ব্যাপারটি যে ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে উহার সকল তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা কঠিন। অ্যামিবার ন্যায় ক্ষুদ্র এককোষ জীবের দেহমধ্যে যে প্রহেলিকা নিহিত রহিয়াছে,—তাহা বিংশ শতাব্দীর দাম্ভিক বৈজ্ঞানিকের নিকট ও

একটা বিরাট রহস্যরূপে বর্ত্তমান। আবার কোন কোন জীবের দেহে জটিলতার লেশমাত্র নাই,—অথচ তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, এককোষ জীবগুলি (protozoa) অমর। কিন্তু তাহাদের সেই অণুতুল্য দেহের কার্য্য প্রণালী এখনও মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত রহিয়াছে। সমুদ্রজলে জেলীফিস্ বা মেডিউসা নামে এক প্রকার জীব দৃষ্ট হয়। ঐ জীব অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লিবৎ আবরণে আবদ্ধ সাগর-জল মাত্র। দুইসের আড়াইসের ওজনের জেলীফিস্ ভূমিতে তুলিয়া রাখিলে যখন উহার জলীয় পদার্থ শুষ্ক হইয়া যায়,—তখন উহাতে দুই রতি আড়াই রতির অধিক অন্য পদার্থ থাকে না। অথচ এই জীবের ক্ষুধা আছে, ক্রোধ আছে, জিঘাংসা আছে। ইহারা অন্য জীবকে হনন করিয়া আপনা-দের উদর পূর্ণ এবং আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। হয়ত বা উহাদের সুখদুঃখ বোধও আছে। ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার তেজঃস্ফুরণ হইয়া থাকে। এই জীব জীববিজ্ঞানের এক বিরাট প্রহেলিকা। ইহাদের দেহ সাগর জল ভিন্ন প্রায় আর কিছু না হইলেও সেরকরা একরতি পরিমাণ জৈব উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়াফলেই ইহা এত বড় একটা বিরাট জীবে পরিণত হইয়াছে,—একথা যেন মন সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই ধরাপৃষ্ঠে এইরূপ অনেক বিস্ময়জনক জীব আছে। তাহা-দের গঠনের সহিত কার্য্যপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই জেলীফিস্ সম্পর্কে আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। জেলীফিস্ হইতে যে জীব জন্মে, তাহা ঠিক জেলীফিসের অনুরূপ নহে। উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব। ঐ জীব তাহার জন্মকালীন আকৃতি পরিবর্ত্তন করে না। আবার ঐ জীব হইতে যে জীব উৎপন্ন হয়, তাহাই জেলীফিস্। অর্থাৎ জেলী ফিসের এক পুরুষ অন্তর জেলী ফিস্ হইয়া থাকে। জীব বিজ্ঞানের ইহা একটি বিষম রহস্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকগণ জৈব প্রহেলিকার সমাধান করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত,—তাঁহারা কেবল জৈব পদার্থের উদ্ভব-তথ্য লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন। কিন্তু উহাও জড় পদার্থ। কালে রসায়ন শাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি হইলে হয়ত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে জৈব পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু উহার সংযোগফলে উদ্ভাবনী প্রতিভা, ব্যবস্থাজননী প্রতিভা, শাসন-বিধায়িনী প্রতিভা, উন্নতিজননী প্রতিভা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসাধিনী প্রতিভা

প্রভৃতি অশেষবিধ প্রতিভার কি প্রকারে স্ফুরণ হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ হইবে না। জড়বাদীরা উহা জড় হইতে উদ্ভূত হয়, বিনা প্রমাণে ইহা কল্পনা করিয়া লয়েন। কিন্তু এই অহেতুকী কল্পনা করিয়াও তাঁহারা এই প্রহেলিকার সমাধানে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, একজন কর্ত্তার অধীনে পরিচালিত কারবার যেরূপ অখণ্ডভাবে পরিচালিত হয়, জীবদেহের কার্য্য ঠিক সেইরূপ অখণ্ডভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারে সম্মত নহেন। যেন উহা স্বীকার করিলে ঘোর প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি পাদটীকায় অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডস্ ও অধ্যাপক আর্থার টমসনের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

সর্ব্ব যুগে ও সর্ব্ব সময়ে সাধারণ লোক আত্মার অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই অধ্যাত্মতত্ত্ব এক সময় এই দেশেই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। মনীষাসম্পন্ন মহর্ষিরা যোগগম্য জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভোগের জন্যই জীব শরীর ধারণ করিয়া থাকে। শরীর ত্রিবিধ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল দেহ, যদ্দ্বারা আমরা কার্য্য করিয়া থাকি,—ইহা অন্নময় কোষ। ইহা জীবের ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ। যন্ত্র বিকৃত হইলে ভোগে বাধা ঘটে। চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিয়া থাকে, কর্ণের দ্বারা শুনিয়া থাকে,—কিন্তু চক্ষু কর্ণ না থাকিলে জীবাত্মা জড়দেহে থাকিয়া কিছু দেখিতে পায় না। মনে করুন একজন লোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা কোন

* Indeed we may compare protoplasm to a successful firm which owes its success to an unusually fortunate combination of partners—of inventive organizing, administrating, pushing, competitive and other geniuses. But there is something more. The firm works as a unity, this is its essential secret. It is unified from within, whether by a common purpose or by the predominant will of its leading partners or by something of both. And the organism has likewise its secret, its internal unity, which we are still far from understanding.

বলা বাহুল্য, জড়ের purpose (উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়) বা will ইচ্ছা বা বাসনা থাকিতে পারে না। উহার ক্রিয়াসামঞ্জস্য ও অভিপ্রায় সাধনের অনুকূলতা যে আত্মারই অস্তিত্ব সূচনা করে, তাবায় উহা ব্যক্ত হইয়া পড়িলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা উহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

দ্রব্য দেখিতেছে কিন্তু সেই অনুবীক্ষণের কাচখানি (lens) যদি কোনরূপ বিকৃত অথবা অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা আবৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দ্রষ্টা আর উহা চক্ষুতে সংযুক্ত করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। সে অন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই যন্ত্রটি যদি চক্ষু হইতে সরাইয়া লয়,—তাহা হইলে সে দেখিতে পায়; তবে অনুবীক্ষণসাহায্যে যেরূপ দেখিতে পায় ঠিক সেরূপ দেখিতে পায় না। সেইরূপ চর্ম্মচক্ষু অবিকৃত থাকিলে জীব তাহার সাহায্যে দেখিতে পায়, চক্ষু নষ্ট বা বিকৃত হইলে অন্ধ হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথাই প্রযোজ্য। যাহার দর্শন শক্তি আছে সে-ই চসমা, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা দেখিতে পাইয়া থাকে। সেইরূপ আত্মার দর্শনশক্তি আছে বলিয়াই সে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে পায়। পাশ্চাত্য জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন,—মস্তিষ্কের সামান্ত বিকৃতি হইলে যখন সংজ্ঞা লুপ্ত, হয়, স্নায়ু-মণ্ডল বিকল হইলে যখন অনুভূতির শক্তি থাকে না,— তখন মস্তিষ্কের ও স্নায়ু মণ্ডলের বিনাশ হইলে আত্মার চৈতন্ত বা অনুভূতির শক্তি থাকিবে কি প্রকারে! জড়বাদীদিগের ইহা একটী প্রবল যুক্তি। কেবল হিন্দুরাই এই সমস্তার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—আত্মা নির্ব্বিকার কিন্তু সকল শক্তির উৎস। কর্ম্মফল প্রভৃতি লইয়া প্রকৃতি সেই আত্মাকে উপহত করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপহত আত্মাই জীবাত্মা। জীবই সুখদুঃখের ভোক্তা। দেহই ভোগায়তন। দেহেই জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। দেহ ভোগেরই যন্ত্র। চৈতন্ত আত্মারই শক্তি। কিন্তু আত্মা যখন জড়দেহকে আশ্রয় করে, তখন জড় মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া চৈতন্ত সংজ্ঞারূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। যেমন আলোকের চিমনী শ্বেত, লোহিত, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণে অনুরঞ্জিত হইলে তাহার ভিতর হইতে বিভিন্ন বর্ণের আলোক নির্গত হয়,—অন্ততঃ যে আলোক নির্গত হয়, তাহা কথঞ্চিত বিকৃত,—সেইরূপ আত্মা যখন জড়দেহের ভিতর অবস্থিতি করে,—তখন সে বিশ্বের স্বরূপ দেখিতে পায় না,—সে কতকটা উহা বিকৃত ভাবেই দেখিয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টির বৈকল্যহেতু, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম জন্মে,—সেইরূপ আত্মার দৃষ্টিশক্তি যখন জড় পদার্থ নির্ম্মিত নয়নের মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয়, তখন এই জগতের যাবতীয় বস্তুই তাহার নিকট একটা অলীক মূর্ত্তি ধরিয়াই প্রকাশ পায়। ইহাই মায়া। মস্তিষ্করূপ জড় পদার্থের ভিতর দিয়া যে চৈতন্ত শক্তি স্ফুরিত হয়,—যাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত,—

তাহা আত্মার প্রকৃত চৈতন্যের বিকার বা বৈকল্যমাত্র,—সেইজন্য স্বপ্নের সহিত উহার তুলনা করা হইয়াছে। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ জীবনকে স্বপ্নময় বলিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখনই ঐরূপ বিকৃত জ্ঞান জন্মে। যখন উহা বিকৃত হয়, তখন সেই দৃষ্টি ও সেই জ্ঞান আরও বিকৃত ও ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। আবার যখন উহা অতিমাত্র বিকৃত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান একেবারেই জন্মে না। চক্ষু নষ্ট হইলে দৃষ্টি শক্তি লুপ্ত হয়,—মস্তিষ্ক নষ্ট হইলে সংজ্ঞা লোপ পায়। কারণ জড়াধিষ্ঠিত আত্মার দৃষ্টি শক্তি ও সংজ্ঞা তখন স্ফূর্ত্তি পাইবার পথ পায় না। সুতরাং দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐ শক্তি থাকিলে উহা লুপ্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যখন আত্মা দেহ হইতে বিচ্যুত হয়, তখন তাহার ঐ শক্তি আবার প্রকাশ পায়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আত্মা যখন এই অন্নময় কোষ বা স্থূল শরীর ছাড়িয়া যান,—তখন তিনি কি নির্ম্মল আত্মরূপ পরিগ্রহ করেন? ভগবান ব্যাস শারীরিক মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, জীব পরলোকে গমন সময় পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বেষ্টিত হইয়া যায়! উহা তাঁহার ভাবী দেহের অপ্রকট বীজস্বরূপ। উহাই সূক্ষ্ম শরীর। উহার অন্য নাম প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ। ইহাতে জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি বীজরূপে নিহিত থাকে। দার্শনিকগণ বলেন,—"তস্মাৎ বীজৈর্বেষ্টিত এব পরলোকং গচ্ছতীতি।" অর্থাৎ জীব স্বীয় ভাবী জন্মের স্থূল শরীরের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূত পরিষ্টিত হইয়া দেহ ত্যাগ করে। অত্যন্ত স্থূল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দেহভিন্ন আত্মা নিজের কর্ম্মফলাদি অর্জ্জিত শক্তি অনুসারে পুনরায় দেহ গঠন করিয়া লয়। দেহমুক্ত আত্মার শক্তি সেই সূক্ষ্ম দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।

হিন্দুর এই অধ্যাত্মতথ্য জড় বিজ্ঞানের গম্য নহে, সুতরাং জড়বিজ্ঞান দ্বারা এই তথ্য সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস নিষ্ফল। কথাটি পরে একটু কাজে লাগিবে বলিয়া এই স্থানে এইটুকু বলিয়া রাখিলাম।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আরতির শেষ।

(১)

মুন্‌সেফ্ প্রাণকৃষ্ণ বাবু দ্বিতীয় মুনসেফ্ শরৎ বাবুকে "রিলিভ" করিতে আসিলেন। সঙ্গে পত্নী কমলা, পুত্র সুধীরকৃষ্ণ ও কন্যা ঊষা।

সুধীর কিশোর বয়স্ক; একটু চিন্তাশীল; বোধ হয় একটু আধটু কবি। পিতামাতা সে খোঁজ রাখিতেন না; কিন্তু দুষ্ট ঊষা মাঝে মাঝে দাদার খাতা চুরি করিয়া পড়িত ও তাহার সঙ্গিনী 'ললিতা'কে শুনাইত। 'ললিতা' একটা কাবুলী বিড়াল! 'ললিতা' কবিতা না বুঝুক, ঊষার আদর বুঝিত। আর ঊষাও তার্কিক শ্রোতা অপেক্ষা এই মুক শ্রোতাই অধিক পসন্দ করিত।

দ্বিতীয় মুনসেফ বাবুর কন্যা সুহাসিনী, ঊষার চেয়ে বয়সে প্রায় এক বৎসরের বড়, অর্থাৎ প্রায় একাদশ বর্ষীয়া।

সুধীর তাহাকে একবার মাত্র দেখিল। কুঞ্চিত কালো চুলে আধ ঢাকা সুন্দর মুখখানি; মেঘান্তরিত শশাঙ্কের মত শান্ত পুলকোদ্ভাসিত। সে মুখশ্রীর একখানি নিখুঁৎ ফোটো বহু দিন পর্য্যন্ত কিশোর কবির তরুণ হৃদয়ফ্রেমে আঁটা রহিল!

তিন দিন পরে শরৎ বাবু পত্নীকন্যাসহ চলিয়া গেলেন। আর দুই দিন পরে ইঁহাদের কথা সকলেই এক প্রকার ভুলিয়া গেল, ভুলিল না শুধু ঊষা,—সে সুহাসিনীকে তিন দিনের পরিচয়েই নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল।

সুধীর সে দিন কলেজে চলিয়া গিয়াছে; ঊষা যথারীতি দাদার খাতা চুরি ও গোপন পাঠরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইল। কিন্তু এ কি? এ কি ছন্দ কবির হৃদয়ে ঝঙ্কত হইয়া উঠিয়াছে! ঊষা ভাল করিয়া বুঝিল না; তবু এটুকু বুঝিল, কবির হৃদয়ে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! কতবার খাতা চুরি করিয়া আনিয়া ঊষা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নূতন সুর এমন করিয়া ত কোনও দিনই তাহার কাণে উঠে নাই! কাবুলী বিড়ালটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ঊষা জিজ্ঞাসা করিল—"বলিতে প্যারিস্, ললিতা, কি এ?"

সকালে ডাক আসিয়াছে; সুধীর কতকগুলি চিঠি হাতে করিয়া ভিতরে আসিল—বলিল "ঊষা তোর চিঠি আছে রে" আগ্রহের সহিত ঊষা চিঠি চাহিয়া লইল।

"কা'র চিঠিরে—নূতন হাতের লেখা দেখছি যে৷" সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

"ইস্ তাই বলি আর কি; তুমি খাতায় কি লেখ,—আমায় বলে থাক ?—কথাটা বলিয়া উষা একটু কেমন হইয়া গেল। হঠাৎ খাতার কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া ত ভাল হয় নাই। যদি চুরি ধরা পড়ে!

সুধীর জানিত, উষা তাহার খাতা চুরি করিয়া পড়ে; গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, তাহার যে একজন 'সমজদার' পাঠক আছে, সুধীর তাহা মনে করিয়া একটু গৌরব ও তৃপ্তি অনুভব করিত।

"আচ্ছা তোকে খাতা দেখাব—বল্ কে লিখেছে চিঠি!"

"চাই না আমি তোমার খাতা দেখ্‌তে" বলিয়া উষা ফিরিয়া দাঁড়াইল—চিঠি মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—"ছিঃ, পরের চিঠি বুঝি দেখ্‌তে আছে!" আজ তাহার ধর্ম্মজ্ঞানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সুধীর মনে মনে একটু হাসিল। পলকের মধ্যে উষা ছুটিয়া রান্নাঘরে মাতার কাছে উপস্থিত হইল, এবং "মা—'সু—র' চিঠি এয়েছে" কথাটা এমন ভাবে বলিল যে, বাহিরে সুধীর স্পষ্টই তাহা শুনিতে পাইল। তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত কেন যে আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

চুরি করিতে যাইয়া, একজন চোর নাকি অন্য একজন চোরকে ধরাইয়া দিয়াছিল। সুধীর আজ তাহার দেরাজের তালা চাবি বদলাইয়া ফেলিল; কি জানি যদিই বা উষা চুরি করিতে আসিয়া চোর ধরাইয়া দেয়।

(২)

সুধীর স্থানীয় কলেজের ছাত্র। কলেজে "Little Brothers of the Poor" নামে একটি ছোট সমিতি ছিল। প্রতি বৎসর 'সেশন্' আরম্ভের সময়ে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইত। প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্রগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। সমিতির সভ্যগণের কর্ত্তব্য ছিল, পীড়িতের সেবা ও দুঃস্থের অভাব-মোচন। সমিতি ছোট হইলেও, সভ্যগণ এক গুরু কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। সহরে সাধারণ গৃহস্থ স্রোতের জল ব্যবহার করে। রাস্তার পাশে পাশে অপরিসর পয়ঃপ্রণালী চলিয়া গিয়াছে; পয়ঃপ্রণালীগুলি নদীর সহিত সংযুক্ত; এবং প্রত্যেক পুষ্করিণী এই প্রণালীসমূহের সহিত যুক্ত। প্রত্যেক পুষ্করিণীতেই জোয়ার ভাঁটায় জল বাড়ে ও কমে। তাই সহরটিতে প্রায় প্রতি বৎসরই কলেরার প্রকোপ দেখা যায়। যিনি এই সমিতির সম্পাদক

বা প্রাণ সহরের কেহ কলেরায় আক্রান্ত হইলে, তাঁহার নিকট সংবাদ আসিত। সকলেই জানেন, কলেরা রোগীর সেবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না। যে স্থানে লোকাভাব বা যে সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করিত, সম্পাদক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে তথায় 'সেবক' পাঠাইতেন। কলেজের যুবকগণই স্বেচ্ছায় এই সেবাভার গ্রহণ করিত।

সুধীর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সে তাহার নাম "কলেরা শাখায়" লিখাইয়া দিল। সমিতির দুইটি শাখা ছিল। একটিকে আমরা "কলেরা শাখা" বলিতে পারি। যাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ভীক তাহাদিগকেই কলেরা শাখায় গ্রহণ করা হইত। অন্য শাখার সভ্যগণকে জ্বর ইত্যাদি সাধারণ রোগেই সেবা করিতে হইত। কে কোন্ শাখায় প্রবেশ করিবে তাহা ছাত্রদের নিজের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিত। কলেজ হইতে আসিয়া সুধীর বলিল "বাবা, আমি 'Little Brothers of the Poor' সমিতির কলেরা শাখায় নাম দিয়াছি।"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু পত্নী কমলার মুখের দিকে চাহিলেন।

"তোর ভয় করবে না?"—কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুধীরের চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল, বলিল, "ভয় কি, মা? তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে কিছু গ্রাহ্য করি না।"

"শুন, পাগল ছেলের কথা—"বলিয়া কমলা হাসিলেন। কমলার মুখের সে হাসিতে জগন্মাতার করুণ মুখের হাসিরাশির এতটুকু আভাস বুঝি ফুটিয়া উঠিল।

"তা বেশ, আমার কিছু অমত নাই, তবে খুব সাবধানে কাজ করিস্। মানুষ অনর্থক ভয় পায়—কলেরা ছোঁয়াচে নহে।" প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথায় একটা বিশ্বাস ও নির্ভীকতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সমিতির নিয়ম অনুসারে সুধীর প্রথম প্রথম রোগের প্রথমাবস্থায় সেবা করিতে যাইত, তাহার পর সে ক্রমে ক্রমে সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কঠিন অবস্থাতেও যাইতে আরম্ভ করিল। সেবাকার্য্যে সুধীরের তৎপরতা অতুলনীয় ছিল; রোগগ্রস্তকে একটু আরামে রাখিবার জন্য তাহার প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহ অপর সেবকগণের আদর্শ হইয়া উঠিল। কত রোগীর শিয়রে বসিয়া সে বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে! প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন সুধীর দেখিত, রোগীর মুখে শান্তি ও আরামের চিহ্ন ধীরে ধীরে

ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে দিন তাহার অন্তর তৃপ্ত হইয়া উঠিত,—তাহার প্রসন্ন অন্তরে দেবতার আশীর্ব্বাণী যেন সেদিন নিতান্ত সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিত।—আর আত্মীয়গণের করুণ ক্রন্দনরোলের মধ্যে যে দিন রোগগ্রস্তের অবিনশ্বর আত্মা মৃত্যুর চির-রহস্যময়-রাজ্যে প্রবেশ করিত, সে দিন তাহার নয়নযুগল অশ্রুতে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

(৩)

সুধীর এফ, এ, পাশ করিল; বিশ্ববিদ্যালয় ছেলের মুখের দিকে চাহে না; বাঙ্গালীর ছেলের বাবাপও বুঝি বড় একটা চাহেন না। ভদ্রলোকের ছেলের পরীক্ষায় পাশ করা দরকার; সুধীরও প্রশংসার সহিত পাশ করিল।

মা কমলা চাহিয়া দেখিলেন, সুধীর পাশ করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের কতকটা অবনতি হইয়াছে।

ঊষা পিতার কাছে 'আবদার' করিল, "বাবা, দাদার বে' দাও—আমার সইয়ের সঙ্গে"—

সই,—সুহাসিনী, শরৎ বাবুর কন্যা।

বাবা হাসিলেন। মা চুপ করিয়া রহিলেন।—কারণ, ঊষার কথাটা তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার মৌনাবস্থা অনুমোদনসূচক। সুহাসিনী মেয়ে ভাল, তিন দিনের পরিচয়েও সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু আর একটু হাসিলেন; সেটুকু পত্নীর মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া। তিনি বলিলেন, "সুধীরের শরীরটা একটু খারাপ দেখ্ছি, একবার পশ্চিম বেড়িয়ে আসুক;—কালই যাবে, বন্দোবস্ত করেছি।"

ত্রস্তভাবে ঊষা বলিল,—"বাবা, আমার কথাটার উত্তর?"

যেন দাদার বিবাহ সরিয়া গেল, ভাবটা এমনই!

"দিদি;—দাওতো টেবিলের উপর থেকে একটা চিঠির কাগজ, আর পেনটা"—প্রাণকৃষ্ণের ওষ্ঠাধর হাস্যরঞ্জিত করিয়া উঠিতেছিল।

কমলা বুঝিলেন চিঠির কাগজে কি হইবে। ঊষা উৎসুক দৃষ্টিতে মা'র ও বাবার মুখে চাহিয়া ভাবিল "ব্যাপার কি?"—

প্রায় দশ মিনিট কাল প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি লিখিলেন; তার পর চিঠিখানা ঊষার হাতে দিয়া কহিলেন, "এই নে তোর উত্তর!"

ঊষা চিঠি পড়িল; আনন্দে তাহার সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

"বাবা, এই আমি তোমায় 'আশীর্ব্বাদ' কচ্ছি"—প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও কমলা হাসিয়া উঠিলেন।

"না বাবা 'প্রণাম' কচ্ছি"—পিতার পায়ের কাছে 'ঢিপ' করিয়া এক প্রণাম করিয়া ঊষা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভুলের লজ্জা ও প্রার্থিত-লাভের আনন্দ তাহাকে চঞ্চল, অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

"পাগলি মা আমার"—প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

কমলা সব বুঝিয়াছিলেন, তবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গা!"

"এই শরৎ বাবুর কাছে তাঁর মেয়েটির জন্ত প্রস্তাব করে পাঠালুম—হ'ল ত? এখন বোধ হয় রেতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দেবে?"

কমলা হাসিলেন। প্রফুল্ল পঙ্কজের উপর প্রথম সূর্য্যরশ্মিপাতের ন্যায় সে হাসিটুকু বড় উজ্জ্বল—বড় মধুর।

পত্নীর তৃপ্তি দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু তৃপ্ত হইলেন।

(৪)

যথাসময়ে সুধীর পশ্চিমে চলিয়া গেল। স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সুধীর দেশভ্রমণদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সে ইচ্ছা ছিল, এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্তও তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। সুধীর এক স্থানে বসিয়া রহিল না, পশ্চিমের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে শরৎ বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। শরৎ বাবু এই বিবাহ-প্রস্তাবে যেন অনুগৃহীত হইয়াছেন, এমনই কৃতজ্ঞতার সহিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

"জানি আমি শরৎ বাবুকে, অমন উদারপ্রকৃতির লোক দুটি দেখিনি; দেখেছ চিঠি?"—প্রাণকৃষ্ণ হাসিয়া চিঠিখানি পত্নী কমলার হাতে দিলেন।

কমলা চিঠি পড়িলেন; ঊষা পিতার পশ্চাৎ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পূর্ব্বেই চিঠি পড়িয়াছিল; এখন বলিল—"তবে এই মাসেই দাদার বে' দাও"—

প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিলেন, কহিলেন, "সে বটে—কিন্তু তার যে এক বাধা রয়েছে; দুবার তো আর খরচ করে পেরে উঠ্‌বো না—একেবারেই—"

কমলার চক্ষু দুইটি প্রসন্নতাপূর্ণ হইয়া হাসিতেছিল। ঊষা কথাটা বুঝিল, কি বলিবে 'দিশা' না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার মাথার সামনে ক' গাছি চুল পেকেছে দেখছি—তুলে দিই?"

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই উষা পাকা চুল তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

(৫)

মানুষ কল্পনাই করিতে পারে, কিন্তু সে কল্পনাকে সার্থকতা দিবার ভার ভগবানের হাতে !

কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট একটু হাসিয়াছিল, তাহা আর উভয় পক্ষের কেহই জানিতেন না। বিবাহের প্রস্তাব সুস্থির করিয়া ফেলিবার জন্য উভয় পক্ষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহা আর এখন এক প্রকার কাহারও অবিদিত ছিল না যে, সুধীরের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ এক প্রকার স্থিরই হইয়া গিয়াছে। তবু আজ কাল করিয়া পুরা দুই বৎসর কাটিয়া গেল, আর সুহাসিনী চতুর্দ্দশ বৎসর পার হইয়া পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিল। যাহাকে শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় উভয় পক্ষেই এমত বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। আর বিলম্ব করা চলে না। কিন্তু এমন সময়ে দেবতার বজ্রের মত আকস্মিক ও নিষ্ঠুর এক বিপদপাৎ হইল! সে বিপদ এতই অপ্রত্যাশিত যে, উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণই একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সেদিন অপরাহ্নে কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু বারাণ্ডার বসিয়া হাতমুখ ধুইতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল; মুখে চক্ষুতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ও ক্লান্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। প্রাণকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নী কমলাকে সঙ্কেত করিলেন; কমলা স্বামীর অবসন্ন দেহ জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু সাধ্বী পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সেই বারাণ্ডায়ই শুইয়া পড়িলেন। উষা মাতার চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছিল; পিতার অবস্থা দেখিয়া জল ও পাখা লইয়া আসিল। কিন্তু জলসেক ও পাখার বাতাস ব্যর্থ হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে অমূল্য ডাক্তার আসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিলেন—আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "Eh—past hope !"—কমলার মূর্চ্ছিত দেহলতা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন ধরণীর উজ্জল শোভা ম্লান করিয়া দিতেছিল, তখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু মহাপ্রস্থান করিলেন।

(৬)

গ্রামের বাড়ীতেই শুদ্ধিকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুকালে সুধীর কাছে ছিল না, এই ক্ষোভ তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। পল্লীর শান্ত মধ্যাহ্নে যখন সুধীর জননী কমলার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে দূর আম্রকুঞ্জের শ্যামপল্লব-শোভার দিকে চাহিয়া থাকিত, তখন তাহার চক্ষুর কাছে পিতার স্নেহদীপ্ত মুখখানির স্মৃতি জাগিয়া উঠিত!—তখন আর অশ্রু কোন মতেই বাধা মানিত না। জননী তাঁহার স্নেহহস্ত পুত্রের ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত; উভয়ের তীব্র শোক, যে পবিত্র নিস্তব্ধতার সৃষ্টি করিয়া তুলিত—তাহা অপার্থিব। যে শোকে গুঞ্জন নাই, ভাষা নাই, প্রকাশ নাই, সেই শোকই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র।

যেদিন উষা কাছে থাকিত, সে দিন সেই বুদ্ধিমতী বালিকা, আবদারে কথায় মা'র ও দাদার শোকের দারুণ নীরবতা ভঙ্গ করিত।

শোক-প্রবাহ যখন হৃদয়মধ্যে একান্তই উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন সান্ত্বনা লাভের জন্য বুকের কাছে একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠে। কমলার ও সুধীরের স্নেহ উন্মুখভাবে উষাকেই বুকের কাছে টানিয়া আনিল; উষা প্রলেপের মত এই দুই শোকদিগ্ধ হৃদয়ে লাগিয়া রহিল।

কিন্তু এই শোকের তীব্র আঘাতে পুনরায় সুধীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। আতপতপ্ত কমলপত্রের মত সুধীর শোকের তীব্র সন্তাপে ক্রমেই শুকাইয়া যাইতেছিল। কমলা অস্থির হইয়া উঠিলেন,—সুধীরকে পুনরায় পশ্চিম প্রদেশে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ধরিলেন;—কিন্তু সুধীর মা'কে রাখিয়া আর কোনও মতে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন সুধীর মা'কে ও উষাকে লইয়া পশ্চিমে কিছু কাল বাস করিয়া আসিবে, এমনই একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

তাঁহারা কোথায় কিছু অধিক দিন বাস করিবেন, তাহা আর স্থির হইল না; যে স্থান জননীর ভাল লাগিবে সুধীর সেই স্থানেই কিছু দীর্ঘকাল বাস করিবে, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রাখিল।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে সুধীর মাতা ও ভগিনীকে লইয়া পশ্চিম চলিয়া গেল।

কালাশৌচের জন্য এক বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া শরৎ বাবু এই শোকের সময়ে বিবাহসম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতিসূচক চিঠি লিখিতেন; সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যে চিঠি লিখা যায়, তাহার প্রত্যেকখানির উত্তর কেহই আশা করে না; কারণ, শোকের কাছে ভদ্রতার তুচ্ছ খুঁটী নাটী হিসাবগুলি প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। শরৎ বাবু প্রায়ই সুধীরের পারিবারিক সংবাদ পাইতেন না; সুতরাং কবে তাহারা পল্লীগ্রামের বাড়ী হইতে পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে, সে সংবাদ শরৎ বাবু পাইলেন না।

শরৎবাবু যখন ছুটী লইয়া পল্লীগ্রামের বাড়ীতে সুধীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তখন তাহারা তথায় ছিল না। প্রতিবেশী কেহই তাহাদের সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না। শরৎ বাবু ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমের নানা স্থানে সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়াও, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাইলেন না।

সুহাসিনী এখন আর ছোট্টটি নহে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, আর কত দিন রাখা যায়? শরৎ বাবুর আত্মীয়গণ বলিলেন, "আর মেয়ে রাখা চলে না, সুধীরের যখন খোঁজই নাই, তখন সে অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। ভাল ছেলে দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেল।"

শরৎ বাবু প্রথম প্রথম কথাগুলিতে কাণ দিলেন না, কিন্তু যাঁহারা আত্মীয়তা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা সহজে পরামর্শদানে বিরত হইবেন কেন?

এমনই করিয়া কিছু দিন কাটিয়া গেল; শরৎ বাবুর পত্নী চারু আসিয়া বলিলেন, "ও গো মেয়ের দিকে তো আর চাওয়া যায় না। সুধীরের আশায় আর কত দিন বসিয়া থাকিবে? মেয়ের অদৃষ্টে সুখ থাকিলে হইবে; একটা ঠিক করিয়া ফেল।"

শরৎ বাবুর কেমন যেন একটা বিশ্বাস ছিল যে, সুহাসিনীর প্রতি সুধীর বোধ হয় একটু আকৃষ্ট। সেই পিতৃহীন যুবক, সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গেলে যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপটুকু পাইবে, তাহা মনে করিয়াও শরৎ বাবু বুকের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু সুধীরের পক্ষে এই মনস্তাপ ও হতাশার পরিমাণ কতটুকু, তাহা শরৎ বাবু বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা করিতে পারি না; সুতরাং পত্নীর কাতর নিবেদন ও

আত্মীয়গণের অযাচিত পরামর্শ তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিলেও, সাংসারিক হিসাবে তিনি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

পুরুষ পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, বিশ্বের চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহার একটা কিনারা করিতে চাহিবার স্পর্দ্ধাও রাখিতে পারে; কিন্তু এতটুকু বালিকার কোমল হৃদয়ের মধ্যেও যে আকর্ষণ, যে বিশ্ববিপ্লাবী প্রেম গোপন রহিয়াছে, তাহা পুরুষের নিকট চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। শরৎ বাবু ভাবিলেন, সুহাসিনীর হৃদয়ে যদি সুধীরের জন্য এতটুকুও আকর্ষণ থাকিয়া থাকে, তাহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন হইতে সুহাসিনীর বিবাহের চেষ্টা ও আয়োজন সবেগেই চলিতে লাগিল।

আর সুহাসিনী? হিন্দুকন্যার 'বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না'—সুতরাং সে নীরবেই সব সহ্য করিতেছিল।

(৫)

"আর কোন তীর্থে যাইবে, মা?"

"কোথাও আর যাইব না, বাবা বিশ্বেশ্বর চরণে স্থান দিন, এখানেই কিছুদিন থাকিয়া যাইব। আর যদি তুই বাড়ী ফিরিতে স্বীকার করিস্, চল। কাশীও বুঝি আমার বাড়ীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে—যদি তুই ফিরিস্।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুধীর ডাকিল, "মা!"

মাতা কমলা বুঝিলেন, কোথায় পুত্রের আঘাত লাগিয়াছে,—তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল তিনি বলিলেন,—"কি বাবা!"

"মা, তুমি যদি বল আমি বাড়ী ফিরিব; যেখানে তুমি, সেখানেই আমার কাশী।"

কমলা সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহকোমল স্বরে কহিলেন, "না বাবা আমি কাশীতেই থাকিব, তোর যদি গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা হয়, তাই ও কথা বলিতেছিলাম"—মাতার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল।

সুহাসিনীর বিবাহ-সংবাদ সুধীর ও কমলা পাইয়াছিলেন।

সুধীরের শোকদুর্ব্বল হৃদয়ে এই আঘাত তীব্র ভাবেই লাগিয়াছিল।

মাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, গ্রামে ফিরিয়া গিয়া সুধীরের বিবাহ দেন, —কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া সে কথার উল্লেখ করিতে পারিতেন না। গ্রামে

ফিরিবার প্রস্তাবের অর্থই যে সুধীরের বিবাহে স্বীকার হওয়া, এটা সুধীর বুঝিত।

কত দিন অকারণ অশ্রু আসিয়া সুধীরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়াছে; মাতার অঞ্চবর্গে সুধীর বালকের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; মাতা কমলা শোকের সে নীরবতা ভঙ্গ করেন নাই। বুক ভাঙ্গিয়া যখন দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চাহিত, তখন নীরবে সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতেন।

মাতার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ এমনই করিয়া নীরবে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া, সকল দুঃখ ও কষ্টের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিত। হায়, মাতার স্নেহ!

সে দিন অপরাহ্নে মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; দিনের আলো নিবিয়া যায় নাই; তবু এক বিষাদমাখা ম্লান আলোকে সমস্ত কাশী সহরটি আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

বাহিরের ঘরে বসিয়া সুধীর একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সদর দরজা হইতে একটা লোক ডাকিল, "বাবুজি, এ বাবুজি—"

সুধীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, টেলিগ্রাফ্ অফিসের একটা পিয়ন; হাতে টেলিগ্রামের খাম।

সুধীর খামখানি গ্রহণ করিয়া দেখিল, তাহার নামেই আসিয়াছে। কে এ টেলিগ্রাম করিল? কম্পিত হস্তে টেলিগ্রাম খুলিয়া সুধীর পড়িল। মর্ম্ম এই,—

"যাঁকে লইয়া তীর্থে আসি, স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত, তুমি নিকটে আছ। শীঘ্র আইস।

বিজয়।"

নাম সহি করিয়া দিয়া সুধীর বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল—

পিয়নটা বলিতেছিল—"বাবুজি বক্‌সিস্,"—তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে চাহিয়া দেখিল, 'বাবুজি' অদৃশ্য হইয়াছেন। "খবর তো জরুরি হায়"—বলিতে বলিতে পিয়ন চলিয়া গেল,—আজি আর সে কিছু পায় নাই—'সিকির' কটা পয়সাও নহে।

"আমাদের সঙ্গে পড়ত বিজয়, তাকে তোমার মনে আছে ত, মা।

তার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সে প্রয়াগে এসেছে, স্ত্রীর কলেরা, আমাকে যাওয়ার জন্ত তার করেছে,"—সুধীর এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ, তারা ত বিদেশে ভারি বিপদে পড়েছে,—তা, তুই যাচ্ছিস্‌ত ?"—কমলা দেবীর কথার মধ্যে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব

"তা,' মা, তুমি বল্‌লেই যেতে পারি"—

—"ও মা, তা আর বল্‌ব না! এ বিদেশে তা'দের দেখ্‌বে কে ?"

কুন্তীদেবী যে বিশ্বাস লইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন, কমলার পক্ষে অবলম্বন করিবার মত ততটুকু বিশ্বাস ছিল কি ? তবু কি প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি একমাত্র পুত্রকে, রাক্ষসের অপেক্ষাও নির্ম্মম ও ভীষণ এক অদৃশ্য দানবের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন! তাঁহার মাতৃহৃদয় সুধীরের সহপাঠীর বিপদ সংবাদে ব্যগ্র ও প্রতীকারপরায়ণ হইয়া উঠিল। রমণীর এ মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। ইহার তুলনা অসম্ভব।

যথা সময়ে মাতার আশীর্ব্বাদরূপ অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া সুধীর তাহার সংগ্রামক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

(৮)

প্রয়াগে আসিয়া বিজয়ের বাসা খুঁজিয়া লইতে সুধীরের প্রায় রাত্রি দশটা বাজিল।

"বড় বিপদে পড়েছি, সুধীর,—মা'রও বোধ হয় কলেরা হয়েছে।"—ঘরের বাহিরে আসিয়া সুধীরের হাত ধরিয়া বিজয় কহিল।

"তোমার স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ, বিজয় ?"—সুধীরের স্বর সহানুভূতিপরিপূর্ণ।

"এখনও বেঁচে আছে,—তবে বোধ হয়, শেষ অবস্থা। আমি মা'র কাছে যাই; তুমি তা'র কাছে যাও। সঙ্কোচ ক'রোনা সুধীর, শুধু তুমি আর আমি। দেখ, যদি রক্ষা কর্ত্তে পার। এমন বিপদে আর আমি পড়িনি!"

"কলেজে পড়বার সময় 'Little Brothers of the Poor' সভ্য হয়ে যে শিক্ষাটা হয়েছিল এবার দেখ্‌ছি তা' কাজে লেগে গেল!"

সুধীর চির দিনই একটু লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু সেবাকার্য্যে যখন সে ব্রতী হইত, তখন তাহার সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা কোথায় চলিয়া যাইত; রোগীর অবস্থার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের উৎসাহ বাড়িয়া চলিত।

কলেজে থাকিতে বিজয় ও সুধীর কত কলেরা রোগীরশয্যাপার্শ্বে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে; তখন তাহারা স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, কলেজের বাহিরেও এমন একটা দিন তাহাদের জীবনে আসিবে, যে দিন সুদূর প্রবাসক্ষেত্রে তাহাদেরই আপন জনের সেবায় তাহাদের দুই সতীর্থকে এমন ভাবে মিলিত হইতে হইবে!

সুধীর•ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একখানি ছোট চৌকির উপর ঔষধের শিশিগুলি সাজান রহিয়াছে। পার্শ্বে কয়েকটা কাচের বাটীর মধ্যে প্লেট্ দিয়া ঢাকা, কিছু লেবু, বেদানা ইত্যাদি। আর একখানি কাগজে কখন্ কোন্ ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে এবং খাওয়াইতে হইবে, তাহারই একটা 'চার্ট' লিখিত রহিয়াছে। একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই সুধীর বুঝিল, সবই ঠিক আছে; বিজয় "সেবা সমিতির" সেবাপ্রণালীর এতটুকুও ভুলিয়া যায় নাই!

সেই অতীত দিনের মত আজ আবার সুধীর সেবা করিতে পাইবে, ইহা মনে করিয়া, তাহার প্রাণে তেমনই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল।

একটা ওয়ালল্যাম্পের মৃদু আলোকে গৃহটি অনুজ্জল ভাবে আলোকিত ছিল,—সুধীর আলোক উজ্জল করিয়া দিয়া, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ভূনত জানু হইয়া উপবেশন করিল; নাড়ী দেখিবার জন্ত রোগিণীর হাতখানি তুলিয়া লইল। সে হস্ত শীতল দেখিয়া সুধীর সেকের বন্দোবস্ত, করিবার জন্ত উঠিল।

অস্পষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে "প্রাণ যায়—মা গো—জল"—বলিয়া রোগিণী একবার মস্তক চালনা করিল।—তখন তাহার অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখখানির উপর সুধীরের দৃষ্টি পড়িল; একটা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ যে সুহাসিনী!

কিন্তু তখন ত আর তাহার বিস্ময় প্রকাশের অবসর নাই!

আপনাকে সংযত, স্থির করিবার জন্ত যে শক্তিটুকু সে তাহার দীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রয়োগ করিল, সেই শক্তিই তাহাকে যেন মূর্চ্ছাতুর করিয়া তুলিতেছিল!

তাহার পদতল হইতে যেন হর্ম্ম্যতল সরিয়া যাইতেছিল; সে একটা আল্‌নার কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। হায়, কি সংগ্রাম তাহার বুকের মধ্যে

এই এক মুহূর্ত্তকাল চলিয়াছিল, কে তাহা বুঝিবে? বিশ্বের ঠাকুর কি মানুষের এই দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা করিবেন?

"জল,"—আবার রোগিণীর মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল।

সুধীর চমকিয়া উঠিল; অনুতাপ ও লজ্জা আসিয়া যেন তাহাকে কশাঘাত করিল। বন্ধুপত্নী,—এবং বন্ধু বিশ্বাস করিয়া, এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সঙ্কোচ না করিয়া তাহার উপর মৃত্যুপথযাত্রিণী পত্নীর শুশ্রূষা ভার অর্পণ করিয়াছেন,—ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? বড় একটা গর্ব্ব, একটা সংযত আত্মবোধ তাহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আজ তাহাকে এ সংগ্রামে, পরীক্ষায় জয়লাভ করিতেই হইবে।

একটু লেবুর রস করিয়া সে রোগিণীর মুখের নিকটে লইল—রোগিণী প্রায় সংজ্ঞাশূন্য; কি বলিয়া সে ডাকিবে?

সুধীর দন্তে আপনার ওষ্ঠ চাপিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল—তাহার পর হৃদয়ের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া বলিল—"খাও ত লক্ষ্মী দিদিটি আমার।"

ঐ একটি আহ্বানেই যেন তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতা কাটিয়া গেল;—তখন সে সহজ শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিবার অধিকার পাইয়া, যেন একটি পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিল।

সুধীর যখন লেবুর রসটুকু সুহাসিনীর মুখে ঢালিয়া দিতেছিল, তখন সে একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, স্বামী নহে—আর কেহ,—কে সে?

সেই আধ জাগরণ, আধ তন্দ্রার মধ্যে, সেই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও সুহাসিনী চিনিল, সে কে।

সে যে সুধীরকে চিনিতে পারিল, সে অপরাধ তাহার নহে। তাহার জীর্ণ নারীহৃদয়ের অন্তরালে, যে মূর্ত্তিখানি সে বিস্মৃতির নিম্নে সবলে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, আজ সেই মূর্ত্তি, তাহাকে দুর্ব্বল পাইয়া, বিস্মৃতির স্তূপ ঠেলিয়া, বাহির—হইয়া আসিয়াছে কি? সে শুনিয়াছে, বিকারের ঘোরে মানুষ নানা প্রকার মূর্ত্তি দেখে, স্বপ্ন দেখে; তবে কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

তন্দ্রার ঘোরে তাহার চিন্তার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; তবু সে বুঝিতেছিল, স্বামীর হস্ত হইতেও সেবানিপুণ দুইখানি হস্ত তাহার শুশ্রূষায় প্রাণপণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

ছুইবার সে নিষেধ করিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু তখনই রোগ-যাতনার আকুলতায় সে ভুলিয়া গিয়াছে, কি বলিবে।

শুধু পিপাসা;—আর সেই পিপাসার শান্তির জন্য জল—একটু জল। —ইহা ব্যতীত তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না!

শেষ রাত্রিতে সুহাসিনীর অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল। বিজয় মৃদুস্বরে আসিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, ডাকিল, "সুধীর!"

সুধীর তখন একটা কেটলিতে সেক্ দিবার জন্য জল গরম করিতেছিল— ফিরিয়া উত্তর দিল—"কি, বিজয়?"—তাহার পর ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল "মা'র অবস্থা কেমন?"

"বুঝিতে পারিতেছি না, একবার যাইও।"—পীড়িতার কাণে কথা না যায় এমনই মৃদুস্বরে বিজয় কথা কহিল।

সুহাসিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল; স্বামীর অস্পষ্ট কথার স্বর তাহার কাণে গেল। সংজ্ঞালুপ্তির আবেশ তখনও তাহার দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান।

এই স্বামী—কি প্রেমময় তাঁহার হৃদয়! বিবাহিত জীবনের এই বৎসরাধিক কাল সে তাঁহাকে তাঁহার আদর ও যত্নের এতটুকুও প্রতিদান করে নাই! স্বামী যখন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ লইয়া তাহার কাছে আসিয়া ডাকিয়াছেন, তখন সে কতবার কাযের 'অছিলা' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়, কেন সে গিয়াছে? সে নিজেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

স্বামীর হৃদয়ের পরিপূর্ণতা তাহাকে একান্ত ভাবে কুণ্ঠিতই করিয়া তুলিয়াছে—তাহার হৃদয়ের দৈন্য আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যে অকপট চিত্তে স্বামীকে সবটুকু দিতে পারে নাই! কেন পারে নাই, কোথায় তাহার বাধা, তাহা ত বলিবার নহে!

জীবন ও মরণের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া আজ তাহার দুর্ব্বল হৃদয় আরও কাতর হইয়া উঠিল; সুধীর কাছে আছে, আজই স্বামীকে সবটুকু দান করিবার উপযুক্ত মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—ইহার পরেই হয় ত পৃথিবীর সঙ্গে তাহার সব সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইবে; তাহা হইলে এ জীবনে ত আর স্বামীকে সবটুকু দেওয়া হইল না!

সুহাসিনী একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিল; ক্লান্তির আবেগে

তাহার চক্ষুর পাতা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, তবু সে আবার স্বামীর মুখে দৃষ্টি স্থির করিল। পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল।

ঘরের আলোটা যেন নিভিয়া গিয়াছে; এমনই ভাবে একটা কালো ছায়া তাহার চক্ষুর উপর নাচিয়া উঠিল!—এই বুঝি মৃত্যু!—

ওগো, তাই কি? তবে ত আর অবসর হইল না!—সুহাসিনী প্রাণপণ করিয়া ডাকিল—"বড় পিপাসা, একটু জল দিন্ দাদা!"—

তাহার অন্তরে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা কি কেহ বুঝিয়াছে? তখন তাহার তন্দ্রার মোহ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

চমকিত সুধীর শয্যার পার্শ্বে সরিয়া আসিল; তাহার চরণ, টলিতেছিল—মাথা ঘুরিতেছিল; সে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া,—বলিল, "এই জলটুকু খাও, লক্ষ্মী, দিদি আমার,"—

সুধীরের দেওয়া জল এবার সুহাসিনীকে তৃপ্ত করিল,—তাহার নিশ্বাস সহজ হইয়া আসিল; তাহার মুখে চক্ষুতে একটা আরামের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

বিজয় কহিল "সুধীর, ও ঘরে একবার মা'কে দেখ্‌তে যেও"—তার পর সেই দেবপ্রকৃতি যুবক মাতার সেবার জন্য পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল।

সুধীর ও সুহাসিনীর হৃদয়ের উপর দিয়া যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে বিজয় তাহার কিছুই জানিল না।

প্রবল ঝটিকান্তে পৃথিবী যেমন শান্ত, স্থির হইয়া নবোদিত সূর্য্যকে অভিনন্দন করিতে থাকে, সুধীর ও সেদিনকার প্রভাতকে তেমনই করিয়া অভিনন্দন করিল। আজ তাহার হৃদয় শান্ত, স্থির, সম্ভ্রমময়।

(৯)

চার দিন পরে সুধীর বারাণসী ধামে ফিরিয়া আসিয়া জননীর চরণে প্রণাম করিল, কহিল, "মা বাড়ী চল।"—

জননী কমলা মনে মনে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিলেন—তবে কি অনাদিনাথ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন?

জননী বলিলেন "বাবা, সুধীর"—বাড়ী কি আমার বারাণসী হবে?"—

"তা' তুমি জান, মা। আমার মা যেখানে, সেখানেই আমার বারাণসী"—বলিয়া সুধীর একটু হাসিল।

"আর আমার মা,"—জননীর ভুক্ত কণ্ঠের বাণী শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঊষা কোথা' হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল "দাদা, বিজয় বাবুর স্ত্রী কেমন?"

"আরাম হয়েছে,—সে যে সুহাসিনী, উষা,"—সুধীর একটু হাসিল।

উষা ও কমলা দেবী চমকিতা হইয়া উঠিলেন;—জননী আর একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সে মুখ নির্ম্মল, প্রশান্ত, গরিমাময় হাস্যদীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

চীনের ভারত আক্রমণ।

—:০:—
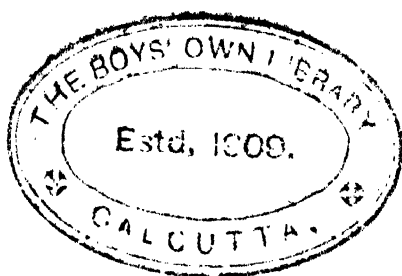
অনেকেই হয়ত প্রাচীন ভারতে দারিয়সের, আলেকজেণ্ডার, হুন, শক প্রভৃতি সিন্ধু পরপার্শ্বস্থিত বৈদেশিকের আক্রমণ বিবরণ ও তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চীন দেশীয়গণ যে এক সময় হিমাদ্রি অতিক্রম করতঃ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন একথা সর্ব্বজনবিদিত নহে।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—"There's Reason to think that the Chinese who doubtless had been formerly Master of Industan had left some Pieces of which it's impossible to discover the Antiquity." *

কিন্তু এতৎসম্বন্ধে অন্য সমস্ত ঐতিহাসিকই প্রায় নীরব। অনেকে বলেন, ভারতের সহিত চীনের এককালে বাণিজ্যাদি চলিত এবং এই দুইটী মহারাজ্যের অধিবাসীরা "হিমানীমণ্ডিত হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ্য শৃঙ্গ তুচ্ছ করিয়া" পরস্পরের দেশে গমনাগমন করিতেন। এমন কি আসামের আবিষ্কৃত বারুদ চীনে যাইয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।*

চীনের রাজধানী পিকিন নগরে রাজপরিবারের সমাধি প্রাসাদের তোরণে একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি বহু শতাব্দী হইতে বিরাজিত দেখা যায়। প্রবাদ আছে, "ভারতের "অর্জ্জুন" নামক নরপতি চীন সম্রাটের সামন্ত-নৃপগণ মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহারই স্মৃতি ও সম্মানের নিমিত্ত এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।"

ডাক্তার বুশেল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে "তাং" বংশের দুইখানি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখেন যে, ঐ দুইখানি গ্রন্থেই চীন সেনাপতির দ্বারা ভারত আক্রমণের বিষয়ের উল্লেখ আছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক

* See Manouchi's General History of the Mogol Empire. (Bangabasi Edition P. 136.)

† See Tavernier's Travel in India, (*Bongabasi* Edition. Book III. P. 453.)

রেভিনস্ বোধগয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটি প্রাচীন তাম্র লিপি প্রাপ্ত হয়েন ও ঐ সকল তাম্রলিপি পাঠে জানিতে পারেন যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একজন চীন সেনাপতি ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সকল তাম্রলিপি তাঁহার দ্বারাই লিখিত।

কর্ণেল ইয়ং হাসব্যাণ্ড যখন তিব্বতে অভিযান করেন, সেই সময় তাঁহার সহিত ডাক্তার ওয়াডেল গমন করেন। তিনি লাসাতে কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থপাঠ করিয়া অবগত হয়েন যে, চীন ভারত আক্রমণ করে এবং তিব্বতীয় ও নেপালী সৈন্যের সহায়তায় সেই আক্রমণ সফল হইয়াছিল। ডাক্তার ওয়াডেল এই আক্রমণের একটি বিবরণ Asiatic Quaterly Reviewতে প্রকাশিত করেন।

পূর্ব্ব লিখিত সন্ধানকারীদিগের ও আধুনিক ঐতিহাসিকবর্গের বাক্য একত্রিত করিলে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হই।

সম্রাট হর্ষের সময় চীনের সহিত ভারতের সখ্যতা ছিল এবং তজ্জন্যই চীন ও ভারতের মধ্যে গতায়াত চলিত। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন একবার চীন সম্রাট সমীপে কোন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। এই ব্রাহ্মণ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট প্রেরিত দূত সহ সম্রাট হর্ষের পত্রের উত্তর লইয়া আগমন করেন। এই চীন দূত ভারতে বহুকাল যাপন করিয়া ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রত্যাগমন করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে ওয়াং-হিয়েন-শি চীন-সম্রাট প্রেরিত হইয়া ৩০ জন অশ্বারোহী সহ ভারতের সম্রাট হর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি মগধে আসিতে না আসিতেই সম্রাট ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন (৬৪৮ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতি ভীষণ। চারিদিকেই প্রবলের হুঙ্কার, চারিদিকেই দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ।

অর্জ্জুন নামে হর্ষবর্দ্ধনের একজন মন্ত্রী অবিলম্বে প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিলেন। যখন চীন দূত রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন তখন অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে শত্রুবৎ গ্রহণ করিলেন। ওয়াং হিয়েনশির শরীর রক্ষকবর্গ নিহত হইল ও তাহাদের বাহিত ধনাদি লুণ্ঠিত হইল। তিনি কতিপয় সহযোগী সহ সৌভাগ্য ক্রমে রাত্রিযোগে নেপালে পলায়ন করিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ তিব্বত রাজের গোচর হইল। তিব্বত রাজ স্রোং-সান-গ্যাম্পো চীনরাজ জামাতা ছিলেন। তিনি চীনরাজ দূতকে উদ্ধার করিলেন ও প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহী প্রদান

করিলেন। নেপাল রাজদূত ও তাঁহাকে সপ্ত সহস্র সৈন্য দান করিলেন। এই সৈন্য লইয়া চীনরাজ দূত ওয়াং-হিয়েন-শি ভারতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ও তিন দিবস যাবৎ তীরহুত (তীরভুক্তি) অবরোধ করিলেন। তথাকার দুর্গের তিন সহস্র রক্ষী মৃত্যু মুখে পতিত হইল এবং দশ সহস্র লোক গণ্ডকনদ সলিলে লুপ্ত হইল। অর্জ্জুন পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহ করতঃ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এবারও হিন্দু সৈন্য পরাজিত হইল এবং দ্বাদশ সহস্র রাজপুরবাসী বন্দী হইয়া চীনে নীত হইলেন। কিন্তু চীনরাজ দয়া পরবশ হইয়া অর্জ্জুনকে পুনঃ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অর্জ্জুনও আপনাকে চীন সম্রাটের অধীন সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন।*

এই অর্জ্জুনকে চীন ভাষায় "অ-লো-না-সোয়েন" বা "ওলো-না-সোয়েন" বলিত।†

চৈনীক ঐতিহাসিক বর্গ বলেন,—"এই যুদ্ধ সমস্ত ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে ৫৮০টি সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্টিত নগর শত্রুপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল, আসাম ও পূর্ব্বভারতের (কামরূপ) রাজা চীন রাজদূতকে কর প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

ডাক্তার ওয়াডেল বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে চীন রাজ দূতই মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। যদি চীনসেনার হস্তে মগধ ধ্বংস না হইত, তাহা হইলে আজ ভারতের অবস্থা হয়ত অন্যরূপ হইত। অর্জ্জুন যদি চীনরাজদূতের লাঞ্ছনা না করিতেন তাহা হইলে বিক্রমাদিত্য সমুদ্রগুপ্তের ও হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সিংহাসনে মোগল বাদসাহগণ উপবেশন করিতে পারিতেন না।

এই চীন অভিযানের পূর্ব্বেও ভারতে আর একবার চৈনিক আক্রমণ হয়।

৯০—১০০ খ্রীঃ মধ্যে চীনে "উইচি" নামক একজন ভুবন বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে কাশী পর্য্যন্ত ভারতে রাজ্য বিস্তৃত করেন।

---

* See Vincent A. Smith's *Early History of India.*

† I bid P. 302.

এই ভারত আক্রমণের বিষয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, —" * * Yuechi's dominion was gradually extended (90-100 A. D.) all over North Western India, with the exception of Southern Sind, probably as far as Benares. The conquered Indian Provinces were administered by military viceroys, to whom apparently should be attributed the large issue of coins known to numistmatists as those of the Namders King. These pieces,mostly copper,but including a few in base silver are certainly contemporary with Kadphises II (officer to adminster the Indian territory), and are extremely common all over Northern India from the Kabul valley to Benares and Gazipur on the Ganges.*

এই উইচির ভারত আক্রমণ ভারত রাজ্য ও রোম রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রচলিত করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীতারানাথ রায়।

See Vincent A. Smith's *Early History of India.*

চিত্র।

১

সবে নব যৌবনের মধুর আবেশে
ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন;
আধ ফোটা ওষ্ঠাধরে সরাইয়া কেশে
এঁকেছিনু একটি চুম্বন।
সেইটুকু সঙ্গোপনে তুলিতে চতুর
তুলেছিনু সুখে চিত্র-পটে;—
আজি তাই যৌবনের প্রমাণ প্রচুর,
এল জরা যদিও নিকটে।

শুষ্ক-দল মধুহীন হেরি' বাসি ফুল
কলি-ভাব নাহি পড়ে মনে,
যবে সে সৌরভে মোরে করিত আকুল
বৃন্ত-পরে ফুটি ফুল-বনে।
গৃহিণী করেছে গ্রাস প্রেমিকার লাজ,
চন্দ্র-করে গোপন মিলন;
কবিতার ছন্দে শুধু সঞ্জীবিত আজ
প্রণয়ের চিত্র পুরাতন।

৩

গেছে সব প্রেম-খেলা যৌবনের সনে
যায় যথা জোয়ারের জল;
আছে মাত্র নিশিদিন কলহ দু'জনে,
পদে পদে অভিমানছল।
একি তব নিন্দা-কথা করিনু প্রচার?
যাও তাই বাঁকাইয়া গ্রীবা?
রূপ পুষ্প উপচিয়া হৃদয়ে তোমার
ফলরূপে উদিয়াছে কিবা?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সংগ্রহ।

ধূমপান।

তাম্রকূট সেবনের অপকারিতার কথা লইয়া বৈজ্ঞানিকমহলে অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে অনেকে নানারূপ স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হয়েন, ইহাই অনেকের ধারণা। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণও প্রায় এই মতের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, তামাকে নিকটিন (nicotine) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে; উহা মানব-শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার ফলেই তামাকের ধূমপায়ীদিগের বুক ধড়ফড়ানি (Palpitation), স্নায়বিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ঐকমত্য জন্মে নাই। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া যে কত সন্দর্ভই লিখিত হইতেছে,—তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সম্প্রতি বিলাতের একখানি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় ধূমপানসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা প্রকাশ পাইতেছে। এ দেশে 'গুড়ুক খোরের' অভাব নাই, চুরুট, 'বাদসাই' প্রভৃতিও এ দেশে আসর জাঁকাইয়া তুলিতেছে,—তাহার উপর 'খৈনী', 'পানে তামাক' নস্য প্রভৃতি ত আছেই,—সুতরাং, তামাকের এই বৈজ্ঞানিক কথা জনসমাজের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে. এবং হয় ত কচিৎ কাহারও উপকারে আসিবে এই ভরসায় আমরা নিম্নে সেই সন্দর্ভের সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

অধ্যাপকের পরীক্ষা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্থির করেন যে, ধূমপানের ফলে জরা শীঘ্র মানব শরীরকে আক্রমণ করে। মানুষ বৃদ্ধ হইলে শরীরের শিরাসকল যেরূপ অবনত হইয়া পড়ে,—ধূমপানে শিরার সেই অবনতি অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি করে। সুতরাং, ধূমপানের ফল আয়ুক্ষয়। যে দুইজন নামজাদা অধ্যাপক এই তথ্য সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন চুরুটসেবী,—আর একজন চুরুটবিদ্বেষী; যিনি ধূমপানে অভ্যস্ত তাহার নাম অধ্যাপক মেণ্ডেল। তিনি বলেন, তাম্রকূট আয়ুর্নাশ করে সত্য, কিন্তু তিনি এই সদ্যসন্তাপহারিণী, সদ্যশান্তিপ্রদায়িনী তাম্রকূটরূপিণী নায়িকার প্রেমের নিগড় ভগ্ন করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি বলেন যে, এই দুঃখজ্বালাময় সংসারে ত্বরিতানন্দদায়িনী তামাকুসুন্দরীর প্রেমের দায়ে কিছুদিন পূর্ব্বে কালভবনে যাওয়াও ভাল, তথাপি তাহার বিরহ-ব্যথা ভোগ করা ভাল নহে। অধ্যাপক জুনলিভেনন তামাকের সহিত কোন সংস্রবই রাখেন নাই। সুতরাং, তিনি অধ্যাপক মেণ্ডেল অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিবেন, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশালতা সফলা হইয়াছিল। অধ্যাপক মেণ্ডেল তাঁহার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।

তাহার পর কথা উঠিল, তামাকের ধূমপানে যদি শিরার কোনও বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে মানবের শিরা পরীক্ষায় নিশ্চয়ই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সম্প্রতি মিশরের মামী বা রক্ষিত শব পরীক্ষায় দ্বারা এই বিষয়ে অনেক বিস্ময়জনক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার রাফার নামক একজন ইংরাজ রোগ-নিদানবিৎ পণ্ডিত সম্প্রতি মিশর হইতে কতকগুলি পুরাতন শবের শিরা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যেসকল শব হইতে ঐ শিরাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা খৃঃ পূর্ব্ব ১৬০০অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের। অর্থাৎ যে সকল লোকের শব হইতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহারা আড়াই হাজার হইতে সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। এই পরীক্ষার ফল তিনি গত বৎসর ইংলণ্ডের Journal of Pathology and Bacteriology নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তিনি অনুসন্ধানে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে মানবের শিরায় যেরূপ অনুপাতে অবনতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, প্রাচীন মিশরীয় মানবের শিরায় ঠিক সেইরূপ অনুপাতে অবনতির চিহ্ন দেখা যায়। বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে যে সমস্ত স্নায়বিক অবনতি ও ক্ষয় সংঘটিত হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—তাহার লক্ষণ যে অনুপাতে এখনকার মানবদেহে সপ্রকাশ,—তখনকার মানবদেহেও উহা সেই অনুপাতে সপ্রকাশ। ইহাতেই মনে হয়, প্রাচীন মিশরে বর্ত্তমান সময়ের মতই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রবল ছিল। কিন্তু প্রাচীন মিশরের লোক তাম্রকূট সেবন করিত না,—এবং অতি অল্প মাত্রায়ই মদ্য প্রভৃতি পান করিত। তখন জীবন-সংগ্রামেও এত তীব্রতা ছিল না। ডাক্তার রাফার এই তথ্য হইতে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে; তামাকের প্রভাবেই যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, তাহার প্রমাণাভাব।

পরীক্ষায় সন্দেহ।

এ কথা সত্য যে, অনেকে ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়াও স্নায়ুমণ্ডল অক্ষুন্ন রাখিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করেন। কিছুদিনপূর্ব্বে একখানি চিকিৎসা-সম্পর্কিত পত্রিকায় প্রকাশ পায় যে, মার্কিণের রিচমণ্ড নিবাসী জনৈক নিগ্রো এক শত পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল। এই প্রকার দীর্ঘজীবীর কথা সকল ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, এইরূপ দীর্ঘজীবী ব্যক্তিরা তাহাদের জন্মসময় বিস্মৃত হয়, অথবা তাহারা তাহাদের জন্মসময় কস্মিনকালে জানে না, সুতরাং তাহারা অজ্ঞতানিবন্ধন তাহাদের বয়স অধিক করিয়া বলে। কিন্তু এই নিগ্রোটির দৃষ্টান্ত সেরূপ নহে। তাহার বয়স যে শতাধিক হইয়াছিল সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও কারণ নাই। সে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে ধূমপানে ও শেষ পঁচাত্তর বৎসর 'দোক্তা' খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহাকে যিনি চিকিৎসা করেন তিনি বলেন, সে যদি ঐরূপ তামাকের নেশায় অভ্যস্ত না হইত, তাহা হইলে আরও দীর্ঘজীবী হইত। ধূমপায়ীর এরূপ দীর্ঘ জীবনের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। যাহারা বাল্যকাল হইতে তাম্রকূটের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অশীতি বা নবতিবর্ষ কাল জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

ধূমপায়ীর দীর্ঘজীবন।

সম্ভবতঃ ধূমপান সকলের সহ্য হয় না। অতি অল্পেই অনেকে ধূমপানের অপকারি-

তায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর লোকরা তাম্রকূটসেবনে বুক ধড়ফড়ানি, স্নায়বিক উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগে অতি শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। 'তামাকে বুক'ওয়ালারা বড় কষ্ট পায়। ইহাদের হয় ত রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে না, কিন্তু অন্ত রোগে ইহারা ভুগিয়া থাকে। এই প্রকার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হয়। কতকগুলি লোকের অল্প তামাক খাওয়া সহ্য হয়, কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তাহারা আর উহা সহ্য করিতে পারে না। কাহার কি পরিমাণ তামাক খাওয়া সহ্য হইবে, তাহা তাহার ব্যক্তিগত ভাবের উপর নির্ভর করে। কোন কোন ব্যক্তির বদনে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আধিক্য লক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মুখে অধিক পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে। কাহারও 'আলজিব' অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। এই শ্রেণীর লোকের তাম্রকূট সেবন পরিত্যাগ করাই ভাল। অন্ততঃ ইহাদের এ বিষয়ে কতকটা সংযত হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্তিভেদে ফলভেদ।

আরও কোন কোন অবস্থায় তামাক লোকের পক্ষে অপকারী হইয়া থাকে। চুরুটে ছিদ্র, চুরুটের পাইপে ময়লা, হুকার ও গড়গড়ায় 'কাইট' জন্মিলে তাহার জন্য তামাকে অপকার হয়। চুরুটের বহিরাবরণটি বেশ অক্ষুণ্ণ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত। কিন্তু চুরুটটি বেশ টানা যাইতেছে, ইহা দেখিলে কেহ বড় একটা সে দিকে লক্ষ্য করেন না।

রোগোৎপাদনে তাম্রকূট কি পরিমাণে সহায়তা করে, তাহা এখনও নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। যাহারা তামাক সেবনের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা তামাকের অপকারিতাটা অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই সকলকেই তামাক খাইতে নিষেধ করেন। উহা ঠিক নহে। তামাক সেবার পর যাহাদের চাঞ্চল্য জন্মে, যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের তামাক খাওয়া উচিত নহে। তামাক খাইলে যাহাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দূর হয়, যাহারা তামাকের নেশায় বেশ একটু সাত্ত্বানন্দ উপভোগ করে, তাহাদেরই তামাক খাওয়া উচিত। পরিশ্রমে লোক অল্পায়ু হয় না। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, প্রভৃতিই অকালে জরা ও বার্দ্ধক্য আনয়ন করে।

কে ধূমপান করিবে।

তাম্রকূট সেবন যে অপকারী তাহা যেন সহজেই মনে হয়। তবে সকলের পক্ষেই যে উহা অপকারী তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে যে প্রকার হুকায় ও গড়গড়ায় তামাক খাইবার ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেক ভাল। উহাতে হুকার জলে অনেক নিকটিন মিশিয়া যায়। কিন্তু হুকা প্রভৃতির জল ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করা উচিত। কারণ জলে কিয়ৎপরিমাণ নিকটিন মিশিলে আর সেই জল নিকটিন গ্রহণ করিতে পারে না। হুকা গড়গড়া ও কলি প্রভৃতির নলিচা পরিষ্কৃত রাখা আবশ্যক। গুলুক্ অপেক্ষা তাওয়ায় তামাক খাওয়া ভাল।

মন্তব্য।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

অষ্টম অধ্যায়।

(ইতর সাধারণ কর্ত্তৃক ভার্সেলিস প্রাসাদ আক্রমণ)

কৃষক ও শ্রমজীবিগণের কর্ম্মত্যাগ, রাজকোষের শোচনীয় অবস্থানিবন্ধন বেতন ও বৃত্তিভোগিগণের অর্থাভাব, অজন্মা ইত্যাদি কারণ পরম্পরায় দুর্ভিক্ষ পুনর্ব্বার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফরাসী দেশে উপস্থিত হইল। সংখ্যাতীত ব্যক্তি জঠর-যন্ত্রনায় প্রপীড়িত হইয়া "হা অন্ন হা অন্ন" রবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিল। সংখ্যাতীত ব্যক্তি অনশনক্লেশে যৎ-পরোনাস্তি ক্লিষ্ট হইয়া অহর্নিশি উন্মত্তের ন্যায় রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্তিমানসে রুটি বিক্রেতা দিগের বিপণিসন্নিধানে দলবদ্ধ হইয়া বিকট রবে চীৎকার আরম্ভ করিল। ক্ষুৎপীড়িত মানবগণের চলচ্চিত্ততা দৃষ্টে চক্রান্তকারিগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অশেষবিধ ভিত্তিহীন জনরব প্রচারে জনসাধারণের মন উত্তেজিত করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষগণের ইঙ্গিতক্রমে কৃষকগণ অপক্ক শস্য নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে; রুটি বিক্রেতারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া অলসতায় কালক্ষেপণ করিতেছে। সেইজন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, সেইজন্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে ইত্যাদি প্রকার জনরব শ্রবণে অনভিজ্ঞ ইতর সাধারণ পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ফরাসীরাজ বিপদাশঙ্কা করিয়া রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষার নিমিত্ত ভার্সেলিস নগরের সৈন্যবল-বৃদ্ধি করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজার অভিসন্ধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া জন সাধারণ ঘোরতর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইল। রাজা ফরাসী জাতিকে পদ-দলিত করিবার নিমিত্ত সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়াছেন; অচিরে তিনি সসৈন্যে প্যারিস আক্রমণ করিবেন; সেনাপতি বৌলির সাহায্যে তিনি জাতীয় সমিতির ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যদৃচ্ছ শাসনের প্রতিষ্ঠা করিবেন—রাজপথে, প্রতি গৃহে এবং প্রকাশ্য স্থানে অহরহ এইরূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

কতিপয় ব্যক্তি ষোড়শ লুইকে পদচ্যুত করিয়া ডিউক ডি অর্লিয়নকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ডিউক প্রবরও

বুর্বন বংশসম্ভূত, সম্বন্ধে ষোড়শ লুইই জ্ঞাতি। ইতর সাধারণ প্রাগুক্তরূপে উত্তেজিত হইলে, ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদিগকে ভার্সেলিস রাজভবন আক্রমণের নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, প্রাসাদ আক্রান্ত হইলেই, রাজা সপরিবারে পলায়ন করিবেন, তাহা হইলে শূন্য সিংহাসনে অবাধে ডিউকপ্রবর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

রাজমন্ত্রিদল ষড়যন্ত্রসংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজসকাশে নিবেদন করিলেন। আসন্ন বিপদে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের নিমিত্ত রাজসভার অধিবেশন হইল। তথায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, ভার্সেলিস প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজার সপরিবারে স্থানান্তরে গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফরাসীরাজ ঈদৃশ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ষড়যন্ত্রকারিগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে ষড়যন্ত্রকারিগণ সাতিশয় উদ্যমসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা সপরিবারে পলায়নের নিমিত্ত এবং জাতীয় সমিতির ধ্বংস-সাধনকল্পে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এইরূপ জনরব 'মনিটর' নামক সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল। অচিরে প্যারিস নগরে হুলস্থুল কাণ্ড পড়িয়া গেল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসীরাজ প্রাগুক্ত জনরবের ভিত্তিহীনতা প্রতিপাদন না করিয়া বরং একটি নির্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়া বসিলেন। তিনি রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষার্থে ইতঃপূর্ব্বে ভার্সেলিস নগরে যে সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই নবাগত সৈনিকদলের নেতৃগণকে অন্যান্য দলের নেতৃগণ নগরের রঙ্গালয়ে প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অসাধারণ আড়ম্বর হইল। রাজা, রাজ্ঞী, রাজপুত্র এবং উচ্চবংশীয়া রমণীমণ্ডলী উৎসব দর্শনের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপরিবারবর্গকে দেখিয়া সৈনিকগণের হৃদয়ে রাজভক্তির উদয় হইল। তাহারা পুনঃ পুনঃ রাজপরিবারবর্গের মঙ্গলসূচক নিনাদে রঙ্গালয় নিনাদিত করিতে লাগিল। বিপ্লবসমাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফরাসিরাজ এ যাবৎ অকৃত্রিম রাজভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। অদ্য অকস্মাৎ সৈনিকমণ্ডলীর সহৃদয়তা দর্শনে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি মনে করিলেন বুঝি এতদিন পরে তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। কিন্তু সৈন্যগণের রাজ-

ভক্তি হইতে যে সমগ্র দেশে বিপ্লবানল প্রজ্জ্বলিত হইবে,—অমৃত হইতে যে হলাহলের উৎপত্তি হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

প্রাগুক্ত প্রীতিভোজনপ্রসঙ্গ অতিরাঞ্জিত আকারে প্যারিস নগরে প্রচারিত হইলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। প্যালে রয়ালভবনে রাজনীতিক সভাসমিতিসমূহে প্রতি গৃহে প্রতি স্থানে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। রাজভক্ত সৈন্যগণ স্পর্দ্ধাসহকারে জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা পদদলিত করিয়া জাতীয় সমিতির ধ্বংস সাধনে প্রতিশ্রুত হইয়াছে; তাহাদের হস্ত হইতে প্যারিসবাসীদিগের নিষ্কৃতিলাভ দুর্ঘট ইত্যাদি প্রকার জনরব নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শত সহস্র ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সহসা যেন ঘোর ভূকম্পনে সমগ্র নগর আলোড়িত হইল।

অনন্তর ৫ই অক্টোবর তারিখে প্যারিস নগরে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল। জনৈক ইতরবংশীয়া রমণী উচ্চকণ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। তৎপশ্চাৎ সংখ্যাতীত বালক ও রমণী চলিল। তাহারা হোটেল ডি ভিলা হইতে অস্ত্রপুঞ্জ সংগ্রহ করিয়া বিপদ ঘোষণা ঘণ্টাধ্বনি করিল। সেই নিনাদ শ্রবণমাত্র শত সহস্র অস্ত্রধারী ঊর্দ্ধশ্বাসে হোটেল ডি ভিলা সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। ডিউক ডি আর্লিয়নের গুপ্তচরগণ অস্ত্রধারী মানবগণকে ভার্সেলিস রাজভবন আক্রমণের নিমিত্ত উৎসাহ প্রদানকল্পে তথায় কতকগুলি সুরাপানামত্ত, স্খলিতচরিত্র নরনারী প্রেরণ করিল। তাহারা অস্ত্রধারিগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া "ভার্সেলিস" "ভার্সেলিস" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া অস্ত্রধারিদল ভার্সেলিসাভিমুখে যাত্রা করিল।

ভার্সেলিস নগরে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে। ফরাসিরাজের সহিত সভ্যগণের সংঘর্ষণের উপক্রম হইয়াছে। সমিতি "ব্যক্তিগণের অধিকার" প্রসঙ্গীয় যে ব্যবস্থাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, রাজা তাহার অনুমোদন করেন নাই; রাজ্ঞী সৈনিকগণের প্রীতিভোজন উপলক্ষে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন; রাজপারিষদবর্গ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাজা জাতীয় সমিতি সমভিব্যাহারে টাওয়ার অথবা মেজ নগরে গমন করিবেন ইত্যাদি কারণ পরম্পরায় সমিতির সভ্যগণ রাজপরিবারবর্গের প্রতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে যে ঘোরতর বিদ্রোহানল

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা রাজা অথবা সভ্যগণ' কেহই অবগত নহেন। রাজা বন্ধুবর্গসমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থে গমন করিয়াছেন। রাজ্ঞী একাকিনী ত্রিয়ানন উদ্যানের সুরম্য উপবনে উপবিষ্টা। আজ সেই সুবর্ণদ্যুতি "প্রভাতী তারা" * ক্ষীণদ্যুতি খদ্যোতিকা অপেক্ষা বিবর্ণা। সেই অনিন্দ্য বদনেন্দু নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। রাজ্ঞী রাজার সহিত বিপ্লবসমাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপরিণামদর্শিতানিবন্ধন ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে দৃষ্টি করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন? তিনি অষ্ট্রীয়া সম্রাটের দুহিতা এবং ফরাসী রাজ্যের মহারাণী হইয়াও অদ্য হইতে ভিখারিণী। তাঁহার ইন্দ্রতুল্য পতি অদ্য দানবদল পরিবেষ্টিত। কুগ্রহনিবন্ধন কোন্ মুহূর্তে কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তিনি সেই চিন্তায় ম্রিয়মাণা হইয়া অহোরাত্র পতি ও পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু অদ্যই যে ঘোরতর বিপত্তি উপস্থিত হইবে, অদ্য হইতে তাঁহার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা আশাভরসা সমস্তই অন্তর্হিত হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পরেন নাই। তিনি ত্রিয়ানন উদ্যানে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্না। অকস্মাৎ পার্শ্বস্থ রাজপথে কোলাহল শ্রুত হইল। রাজ্ঞী কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া চকিতা হরিণীর ন্যায় উদ্যান হইতে প্রাসাদে পলায়ন করিলেন। রাজা মৃগয়ান্তে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অকস্মাৎ কোলাহল শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া রাজভবনে আগমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ দ্বারগুলি সমস্তই রুদ্ধ; রাজ-সৈন্যগণ প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। প্রাঙ্গণের বহির্দ্দেশে লক্ষাধিক অস্ত্রধারী; তৎসমভিব্যাহারে "ডাকিনী যোগিনী সমা" সংখ্যাতীত ভীমাকৃতি রমণী দণ্ডায়মান। সেই লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতা, সুরাপানোন্মত্তা, বামাকুলের আকৃতিপ্রকৃতি ভাবভঙ্গী ও কার্য্যকলাপ দৃষ্টি করিলে সমগ্র নারীজাতির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহারা প্রাসাদ-সমক্ষে দাঁড়াইয়া

---

*"I saw her just above the horizon—glittering like the morning star"—Burke.

উচ্চৈস্বরে খাদ্য সামগ্রী প্রার্থনা করিতেছে, কেহ কেহ বা রাজপরিবারবর্গের প্রতি অশ্রাব্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিতেছে। ফরাসিরাজ উপস্থিত বিপদ দৃষ্টে স্তম্ভিত হইলেন।

ইতর সাধারণের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে রাজভবনস্থ মন্ত্রণাদাতৃগণ রাজপরিবারবর্গের পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রাজা কোনও ক্রমে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, ডিউক ডি অর্লিয়নের ষড়যন্ত্রই উপস্থিত বিদ্রোহের কারণ। তিনি পলায়ন করিলেই তৎক্ষণাৎ ডিউক সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিবেন। বিদ্রোহিগণ ষড়যন্ত্রকারীদিগের উত্তেজনায় অস্ত্রধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহারা ষড়যন্ত্রকারীদিগের অভিসন্ধি অবগত নহে। তাহারা শুনিয়াছে যে, ভার্সেলিস প্রাসাদ আক্রমণ করিলেই তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর অভাব মোচন হইবে। সেইজন্য তাহারা সদস্ত্রে ভার্সেলিসে আগমন করিয়াছে। ফরাসিরাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন কি ডিউক প্রতিষ্ঠিত হইবেন তৎসম্বন্ধে তাহারা বিন্দুবিসর্গ অবগত নহে।

অস্ত্রধারী ইতর সাধারণ অনতিবিলম্বে প্রসাদাভিমুখে গমন করিল। রাজা তাহাদের প্রাসাদে প্রবেশকালে বাধাবিঘ্ন প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা অবাধে দলে দলে প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইল। রাজা ও রাজ্ঞী তাহাদিগকে এরূপ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন যে, তাহারা বৈরিভাব বিস্মৃত হইয়া রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে করিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কিন্তু ইতর সাধারণ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও রাজপরিবারবর্গের আশঙ্কা দূরীভূত হইল না; কারণ, তাহারা প্রসাদের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই সুরাপানোন্মত্তা রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজপরিবারবর্গের প্রতি কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। অচিরে প্রাসাদ আক্রান্ত হইবে বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। ফরাসিরাজ পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত দুইখানি শকট প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাণী রাজাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "এরূপ বিপৎকালে আমি কোন ক্রমে রাজসঙ্গ ত্যাগ করিব না। আমি জানি, বিদ্রোহিগণের হস্তে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু আমি মেরিয়া

থেরেসার কন্যা, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।" রাজভবনস্থ মন্ত্রণাদাতৃগণ অস্ত্রধারীদিগের প্রতি অগ্নিবর্ষণের আদেশ দানের নিমিত্ত রাজাকে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সহিত বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক বিদ্যমান থাকায় সে যুক্তি খাটিল না। রাজা বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "আপনাদের কথা শুনিয়া আমি কি স্ত্রীজাতির সহিত যুদ্ধ করিব?"

এদিকে ইতর সাধারণ রাজভবন আক্রমণের নিমিত্ত ভার্সেলিস যাত্রা করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণে সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইট রাজপরিবারবর্গের রক্ষার্থে জাতীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে প্যারিস হইতে শশব্যস্তে ভার্সেলিস যাত্রা করিয়াছিলেন। ল্যাফাইট ভার্সেলিসে পৌঁছিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজভবনে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমি আমার সৈন্যগণের প্রশান্তভাব বিলক্ষণ অবগত আছি। তাহারা নিশ্চয়ই শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। আপনারা তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না"। এই বলিয়া তিনি প্রসাদ হইতে কিয়দ্দূরে নোয়ালি নামক ভবনে বিশ্রামের নিমিত্ত গমন করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী ল্যাফাইটের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। রাজ্ঞী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অচিরে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এ দিকে বিদ্রোহিদলের আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত ল্যাফাইটের অধীনস্থ জাতীয় সৈন্যগণ প্রসাদের বহির্দ্দেশ সংরক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে; রাজার শরীররক্ষক সান্ত্রিগণ প্রাসাদপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। ফলতঃ রাজভবন সংরক্ষণের নিমিত্ত যদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, সাধ্যানুসারে তাহার ত্রুটি হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ল্যাফাইট কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশান্তে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। যদি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বিপ্লবসমুদ্ভূত জাতীয় সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিদ্রোহিদলের সহিত যোগদান করে, তাহা হইলে রাজপরিবারবর্গ কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন তৎসম্বন্ধে কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না। রাত্রি তিন ঘটিকা হইতে প্রত্যূষে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কোন উপদ্রব ঘটিল না বটে; কিন্তু অস্ত্রধারী ইতর সাধারণের ভাবভঙ্গি ও কার্য্যকলাপ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, ঝটিকারম্ভের আর বিলম্ব নাই। রাজপথে বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি নরনারী ভিন্ন ভিন্ন দলে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপানে ও বৈপ্লাবিক সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়াছে। এক স্থানে তাহারা একটি অশ্বারোহী সৈনিকের শবদেহোপরি উপবেশন করিয়া

একটি মৃত অশ্ব দগ্ধ করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতেছে; তাহাদের চতুঃপার্শ্বে কতকগুলি মাংসলোভী পুরুষ ও রমণী বিকট হাস্য করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঈদৃশ বিভৎস ব্যাপার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বলক্ষণ ভিন্ন কিছুই নহে।

প্রত্যূষে ছয় ঘটিকা কালে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারী ভৈরব রবে দিগদিগন্ত নিনাদিত করিতে করিতে সেনানিবাস আক্রমণ করিল। সেনানিবাসে অত্যল্প সংখ্যক শরীররক্ষক প্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু আক্রমণকারীরা তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া পঞ্চদশ ব্যক্তিকে বন্দী করিল। ভার্সেলিস রঙ্গালয়ে প্রীতিভোজনের পর হইতে রাজার শরীররক্ষকগণের প্রতি ইতর সাধারণের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সুতরাং বন্দীরা আক্রমণকারীদলের হস্তে পতিত হওয়ায় তাহাদের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। সেনানিবাস আক্রমণকালে ঘটনাক্রমে প্রাসাদপ্রাঙ্গণের একটি দ্বার মুক্ত ছিল। সেই দ্বার দিয়া একদল অস্ত্রধারী প্রাসাদপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া সোপানপথে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। সোপানের উপরিভাগে দুইজন বন্দুকধারী প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা আগন্তুকগণের প্রতি মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল, সুতরাং ক্ষণকাল যাবৎ আক্রমণকারীরা আদৌ অগ্রসর হইতে পারিল না। এই সুযোগে রাজ্ঞী স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে রাজপ্রকোষ্ঠে পলায়ন করিলেন। তথায় রাজাকে না দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিতা হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজা ঘোর কোলাহল ও পুনঃ পুনঃ অগ্নিবর্ষণের শব্দে চমকিত হইয়া দ্বারান্তর দিয়া রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় শরীররক্ষক সান্ত্রিগণ রহিয়াছে, কিন্তু রাজ্ঞী নাই। রাজপুত্র রাজকন্যা ও রাজভগিনী গৃহান্তরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপৎসমাগমে দ্রুতবেগে রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠে আসিয়া রাজার সহিত একত্রিত হইলেন। রাজ্ঞীকে তথায় না দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া রাজপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তথায় রাজ্ঞী উদ্বিগ্ন চিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সমগ্র পরিবার সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহার চিন্তা দূর হইল।

সোপানের উপরিভাগে যে দুইজন বন্দুকধারী আগন্তুকগণের আগমননিবারণকল্পে পুনঃ পুনঃ অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, তাহারা অচিরে শত্রুগণের

হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সুতরাং বাধাবিঘ্ন না পাইয়া আক্রমণকারীরা বন্দুক তরবারি বল্লম প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে ধাবমান হইল। কিন্তু তথায় পৌঁছিবামাত্র রাজার শরীররক্ষক বন্দুকধারীদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। শরীররক্ষকগণ রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। সুতরাং আক্রমণকারীরা রাজপ্রকোষ্ঠের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজপরিবারবর্গ এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে; কিন্তু আগন্তুকগণ প্রাসাদের অন্যান্য স্থান পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না। যে অপূর্ব্ব প্রাসাদ বহুশতাব্দী হইতে সমগ্র য়ুরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছিল অদ্য তাহা ইতরের কৌতুহল তৃপ্তি করিল।

প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমন করতঃ আক্রমণকারীরা পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশে প্রাসাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া গবাক্ষদ্বারসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অজস্র গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজ্ঞী অকুতোভয়ে অলিন্দপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের নিকট হইতে বন্দী পঞ্চদশ জনের জীবন ভিক্ষা করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিদ্রোহিদল রাজ্ঞীকে গবাক্ষ সন্নিধানে আসিতে বলিল। রাজ্ঞী নির্ভয়ে পুত্রকন্যাসহ গবাক্ষসন্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা বলিল, "পুত্রকন্যা স্থানান্তরে রাখিয়া আপনি একাকিনী আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইবেন।" তাহা শুনিয়া রাণী পুত্রকন্যা স্থানান্তরে রাখিয়া আসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর নির্ভীকতা দৃষ্টে ইতর সাধারণের চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা বৈরিভাব পরিহার করিয়া সহস্রকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রাজ্ঞীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

আক্রমণকারিগণের প্রাসাদ-প্রবেশ-কালে, ল্যাফাইটির অধীনস্থ জাতীয় সৈন্যগণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান ছিল। যদি তাহারা সেনাপতিপ্রবরের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক রাজভবন সংরক্ষণে যত্নবান হইত, তাহা হইলে ইতর সাধারণ রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারিত না। ল্যাফাইটি মোয়ালি ভবনে প্রাসাদ আক্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে প্রাসাদসান্নিধ্যে আগমন করিলেন। জাতীয় সৈন্যগণের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি তাহাদিগের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সৈন্যগণ লজ্জিত হইয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে বন্দী পঞ্চদশ জনের উদ্ধার সাধন করিল।

ফরাসিরাজ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না; সুতরাং ষড়যন্ত্র-কারিগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; ডিউক ডি অর্লিয়ন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না। কিন্তু সাধারণতন্ত্র শাসনের পৃষ্ঠপোষকগণ মনে করিলেন, রাজাকে প্যারিস নগরে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আয়ত্বাধীন থাকিবেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা ইতর সাধারণকে তদনুরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই আক্রমণকারিগণ রাজাকে প্যারিস নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ল্যাফাইট মনে করিলেন, ফরাসিরাজ প্যারিস নগরে গমন করিলে বিনারক্তপাতে শান্তি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য তিনি রাজা ও রাজ্ঞীকে ইতর সাধারণের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন ফরাসিরাজ প্রাসাদের অলিন্দপ্রদেশে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"সন্ততিগণ, তোমাদের ইচ্ছানুক্রমে আমি প্যারিস নগরে যাইতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু আমি একাকী যাইব না, সপরিবারে যাইব। আর একটি কথা, আমার শরীর-রক্ষকগণ সঙ্গে থাকিবে। তাহাদের প্রতি তোমরা কোন অত্যাচার করিও না।"

ইতর সাধারণ রাজার বাক্য শুনিয়া, "রাজা দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা প্যারিস নগরে গমন করিতে-ছেন শুনিয়া জাতীয় সমিতি প্যারিস নগরে সমিতির অধিবেশন হইবে, এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রচার করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। ফরাসিরাজ সপরিবারে প্যারিস যাত্রা করিলেন। রাজভবন সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া যে দুইজন প্রহরীর মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদের ছিন্ন মস্তক লইয়া দুই ব্যক্তি রাজশকটের অগ্রবর্ত্তী হইল। জাতীয় সমিতির শতাধিক সভ্য রাজা ও রাজ্ঞীর সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। যে শরীররক্ষকগণ অদ্ভুত বীরত্ব সহকারে রাজপরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা রাজা ও রাজ্ঞীকে বন্দিদশাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বিরস-বদনে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। জাতীয় সৈন্যগণ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী ইতর সাধারণ কামান-শকট টানিতে টানিতে চলিল। কামান-শকটের উপরিভাগে নিকৃষ্টা প্রকৃতি রমণীগণ তরবারি ও বল্লম হস্তে উপবিষ্টা। ক্ষণে ক্ষণে সেই লজ্জাভয়-

বিরহিতা বামাকুল সুরাপানে ও বৈপ্লাবিক সঙ্গীতে উন্মত্ত হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ইতরপ্রকৃতি মানবগণ দিগদিগন্ত নিনাদিত করিয়া জয়োল্লাস করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারবর্গের প্রতি অশ্রাব্য গালিবর্ষণে ত্রুটি হইল না। এইরূপে সাত ঘণ্টাকাল যৎপরোনাস্তি ঘৃণা লজ্জা ও অবমাননা সহ্য করিয়া ফরাসিরাজ সপরিবারে প্যারিস নগরে পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি টুইলারি নিকেতনে গমন করিলেন। সেই জগদ্বিখ্যাত প্রাসাদ অদ্য হইতে রাজপরিবারের কারাগৃহে পরিণত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

'মেঘদূতে'র সমস্যাপূরণ।*
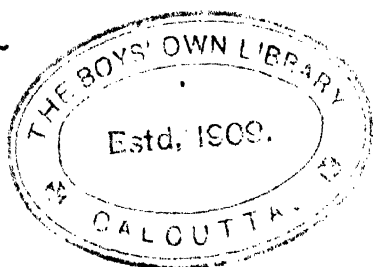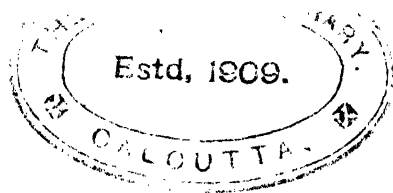
আমাদের গীর্ব্বাণ-বাণী ভাষা-জগতে অতুলনীয়া। এই সংস্কৃত ভাষায় যে কত প্রকারের কত গ্রন্থ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় যত পুস্তক আছে, বোধ করি, পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় তত গ্রন্থ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না।" †

মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও এখনও বহু পুস্তক অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে তালপত্রাদিতে লিখিত কত প্রাচীন গ্রন্থ যে কীটদষ্ট অবস্থায় বিলোপোন্মুখ হইতেছে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? জর্ম্মাণী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে তত্তদ্দেশীয় মনীষিগণের অসীম উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে শত শত প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ নীত হইতেছে। আর আমরা এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে সকলের কোনও সন্ধান রাখি না, অথবা সন্ধান রাখিলেও তাহাদের উদ্ধারের ও প্রচারের জন্য কোনও চেষ্টা করি না।

দেশের এইরূপ দুর্দ্দশার সময়ে কোনও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত দেখিলে চিত্তে স্বতঃই আনন্দ উপস্থিত হয়। অদ্য আপনাদিগকে একখানি চিত্তচমৎকারক অশ্রুতপূর্ব্ব কাব্যের পরিচয় প্রদান করিব। গ্রন্থখানির নাম,—'পার্শ্বাভ্যুদয়ম্'। মদীয় পরম বন্ধু, কাশী জৈনধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন, অল্পদিন হইল, শেঠ শ্রীযুক্ত নাথারঙ্গ গান্ধীর অর্থানুকূল্যে এই কাব্যখানি টীকার সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রকাশক অনেক চেষ্টা করিয়াও দ্বিতীয় আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া এই মুদ্রিত পুস্তকে স্থানে স্থানে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

---

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বারাণসী সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

† 'বিবিধ প্রসঙ্গ' দ্রৌপদী (দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

সংক্ষেপে কাব্য-রচনার অবতরণিকা প্রদর্শন করিয়া কাব্যের কয়েকটি শ্লোক আপনাদিগকে উপহার দিব।

পুরাকালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত পোদনপুরে অরবিন্দ নামক এক নৃপতি রাজ্যশাসন করিতেন। বিশ্বভূতি নামক এক ব্রাহ্মণের দুই পুত্র এই রাজার মন্ত্রি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম কমঠ, কনিষ্ঠের নাম মরুভূতি।

রাজা অরবিন্দ বজ্রবীর্য্য নামক কোনও দুর্জ্জয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন। সেই সঙ্গে রাজার আদেশে মন্ত্রী মরুভূতিও গমন করিলেন। এই সুযোগে দুরাচার জ্যেষ্ঠ কমঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া বসুন্ধরাকে নিগৃহীত করিল। রাজা শত্রুজয়ের পর ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাঁহারা রাজ্য ত্যাগ করিবার পর দুর্ব্বৃত্ত কমঠ এই পাপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে। রাজা, এইরূপ পাপীর প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধেয়, ইহা মন্ত্রী মরুভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে কমঠকে অপমান পুরঃসর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কমঠ ভ্রাতার প্রতি হৃদয়ে দারুণ ক্রোধ পোষণ করিয়া বনে গমন করিল এবং তথায় তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মরুভূতি জ্যেষ্ঠের দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যে প্রকারেই হউক, ভ্রাতা কমঠের অনুসন্ধান করিবেন এবং তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইবেন। মরুভূতি বহু অনুসন্ধানে জ্যেষ্ঠের উদ্দেশ পাইলেন এবং অগ্রজের নিকট গমন করিয়া যেমন তাহার চরণে অবনত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন, অমনই ক্রোধান্ধ দুর্ব্বৃত্ত কমঠ হস্তস্থ বৃহৎ শিলাখণ্ড মরুভূতির মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার বধ-সাধন করিল।

জন্মান্তরে মরুভূতি পঞ্চকল্যাণাধিপতি মহারাজ বিশ্বসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বারাণসী নগরে 'পার্শ্বনাথ' নামে ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কররূপে খ্যাত হয়েন। আর কমঠ পরজন্মে যক্ষকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শম্বর নামে পরিচিত হয়। যক্ষ শম্বর একদিন বিহারকালে ধ্যানস্তিমিত-লোচন পার্শ্বনাথকে দেখিতে পাইয়া পূর্ব্বজন্মের বৈরিভাব স্মরণ করিয়া তাহার উপর ঘোর উপদ্রব আরম্ভ করে। এই স্থান হইতেই 'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্যের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে।

এ কাব্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, মহাকবি কালিদাসকৃত 'মেঘদূতে'র সমস্ত কবিতা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া সমস্যাপূরণাকারে ইহা রচিত হইয়াছে। কোনও শ্লোকে 'মেঘদূতে'র কবিতার এক চরণ এবং কোনও শ্লোকে দুই চরণ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট চরণ গ্রন্থকার স্বয়ং সংযোজন করিয়াছেন। ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে যথাযথ 'মেঘদূতে'র শ্লোকাংশ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবি বিশৃঙ্খলভাবে শ্লোকের চরণ লইয়া এই বিচিত্র কাব্য রচনা করেন নাই।

কাব্যখানি চারি সর্গে সম্পূর্ণ। প্রথম সর্গে ১১৮ শ্লোক, দ্বিতীয় সর্গে ১১৮ শ্লোক, তৃতীয় সর্গে ৫৭ শ্লোক ও চতুর্থ সর্গে ৭১ শ্লোক। নিম্নে কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত হইল,—

সোঽসৌ জাল্মঃ কপটহৃদয়ো দৈত্যপাশো হতাশঃ
স্মৃত্বা বৈরং মুনিবপদ্মণো হন্তুকামো নিকামম্।
ক্রোধাৎ স্ফূর্জ্জন্নবজলমুচঃ কালিমানং দধান-
'স্তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতোঃ'॥
কিঞ্চিৎ পশ্যন্ মুনিপমনঘং স্বাত্মযোগে নিবিষ্টং
গাঢ়াসূয়াং মনসি নিদধৎ তদ্‌বধোপায়মিচ্ছন্।
ক্রূরো মৃত্যুঃ স্বরমিব বহন্ স্বেদবিন্দূন্ সরোষাৎ
'অন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ'॥
মেঘৈস্তাবৎ স্তনিতমুখরৈর্বিদ্যুদুদ্যোতহাসৈ-
শ্চিত্তং ক্ষোভান্ দ্বিরদসদৃশৈরস্য কুর্ব্বে নিকুর্ব্বন্।
পশ্চাচ্চৈনং প্রচলিতধৃতিং হা হনিষ্যামি চিত্রং
'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'॥

—১ম সর্গ।

আক্ষিপ্তেষু প্রিয়তমকরৈরংশুকেষু প্রমোদা-
দত্তলীলাতরলিতদৃশো যত্র বালং নবোঢ়াঃ।
শয্যোত্থায় বদনমরুতাঽপাসিতুং ধাবমানা
'অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্'॥
বস্ত্রাপায়ে জঘনমভিতো দৃষ্টিপাতং নিরোদ্ধু-
র্যূনাং কন্থা সুরভিরচিতা যত্র মুগ্ধাঙ্গনানাম্।
কম্পাধরাৎ করকিশলয়াদন্তরালে নিপত্য
'হ্রী মূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ'॥

—২য় সর্গ।

যস্যা হেতোস্তব চ মম চ প্রাগভবেহভূদ্ বিরোধ-
স্তত্রোৎপন্না নিবসতি সতী সাংধুনা কিন্নরাণাম্।
দ্রষ্টা সৌম্যং সজলনয়না ত্বাং স্মরন্তী স্মরার্ত্তা
'মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্নাভিঃ'॥

—৩য় সর্গ।

সৈষা বালা প্রথমকথিতা পূর্ব্বজন্মপ্রিয়া তে
পশ্চাদ্যাতা রহসি পরিরভ্যানুমোদং নয়েৎ ত্বাম্।
অঙ্গেনাঙ্গং তনু চ তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
'সাস্রেণাস্রদ্রবমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন'॥

—৪র্থ সর্গ।

জৈন সম্প্রদায়ের অতিমাত্র পূজনীয় কবি জিনসেনাচার্য্য এই খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। রাষ্ট্রকূটবংশের প্রাথমিক অমোঘবর্ষ নৃপতির রাজ্যশাসন-সময়ে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। কবি গ্রন্থশেষে নিজেই ইহার পরিচয় দিয়াছেন,—

"ইতি বিরচিতমেতৎ কাব্যমাবেষ্ট্য মেঘং
বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যম্।
মলিনিতপরকাব্যং তিষ্ঠতাদাশশাঙ্কং
ভুবনমবতু দেবঃ সর্ব্বদাঽমোঘবর্ষঃ॥
শ্রীবীরসেনমুনিপাদপয়োজভৃঙ্গঃ
শ্রীমানভূদ্বিনয়সেনমুনির্গরীয়ান্।
তচ্চোদিতেন জিনসেন-মুনীশ্বরেণ
কাব্যং ব্যধায়ি পরিবেষ্টিত-মেঘদূতম্॥"

জিনসেনাচার্য্য জৈন মহামুনি বীরসেনের শিষ্য ছিলেন। বিনয়সেনও বীরসেনের শিষ্য। এই বিনয়সেনের প্রেরণায় অনুরুদ্ধ হইয়া জিনসেন এই 'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে ইহাই পরিস্ফুট।

গ্রন্থকার জিনসেন অমোঘবর্ষ নৃপতির গুরু ছিলেন, তাহা এই কাব্যের প্রত্যেক সর্গ-সমাপ্তিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"ইত্যমোঘবর্ষ-পরমেশ্বর-পরমগুরু-শ্রীজিনসেনাচার্য্যবিরচিতমেঘদূতবেষ্টিতবেষ্টিতে পার্শ্বাভ্যুদয়ে ভগবৎকৈবল্য-বর্ণনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"

মহারাজ অমোঘবর্ষ রাষ্ট্রকূট (রাঠোর) বংশের একজন প্রবলপ্রতাপশালী বিখ্যাত মহীপতি ছিলেন। তিনি কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র দেশে একাধিপত্য

করিতেন। অমোঘবর্ষ যে কেবল শৌর্য্যবান্ ছিলেন, তাহা নহে,—তাঁহার বিদ্যানুরাগিতাও উল্লেখযোগ্য। তিনি কর্ণাট ভাষায় 'কবিরাজমার্গ' নামক একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ ও সংস্কৃত ভাষায় 'প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। *

জিনসেন যে বীরসেনের শিষ্য এবং অমোঘবর্ষ নৃপতির গুরু ছিলেন, তাহা গুণভদ্রাচার্য্যপ্রণীত প্রামাণিক জৈন গ্রন্থ 'উত্তর পুরাণে'র প্রশস্তির শেষে বর্ণিত আছে,—

"অজবদিহ হিমাদ্রের্দেবসিন্ধুপ্রবাহো
ধ্বনিরিব সকলজ্ঞাৎ সর্ব্বশাস্ত্রৈকমূর্ত্তিঃ।
উদয়গিরিতটাদ্বা ভাস্করো ভাসমানো
মুনিরনু জিনসেনো বীরসেনাদমুষ্মাৎ॥
যস্য প্রাংশুনখাংশুজালবিসরদ্ধারান্তরাবির্ভবৎ
পাদাম্ভোজরজঃপিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
সংস্মর্ত্তা স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোঽহমদ্যেত্যলং
স শ্রীমান্ জিনসেনপূজ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলম্॥"

গ্রন্থকার জিনসেন কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপ্রণীত জয়ধবলা টীকার প্রশস্তি-শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জিনসেনের গুরু বীরসেন জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বীরসেনীয়া নামক এক টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহার শেষাংশ জিনসেন রচনা করেন। † জিনসেন এই টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

"ইতি শ্রীবীরসেনীয়া টীকা সূত্রার্থদর্শিনী।
মটগ্রামপুরে শ্রীমদ্‌গুর্জ্জরার্য্যানুপালিতে॥
ফাল্গুনে মাসি পূর্ব্বাহ্নে দশম্যাং শুক্লপক্ষকে।
প্রবর্দ্ধমানপূজায়াং নন্দীশ্বর-মহোৎসবে॥
অমোঘবর্ষ-রাজেন্দ্রপ্রাজ্যরাজ্যগুণোদয়া।
নিষ্ঠিতপ্রচয়ং যায়াদকল্পান্তমনল্পিকা॥
ষষ্টিরেব সহস্রাণি গ্রন্থানাং পরিমাণতঃ।
শ্লোকেনানুষ্টুভেনাত্র নির্দ্দিষ্টান্যনুপূর্ব্বশঃ॥

* ১৩১৯ সালের 'শিল্প ও সাহিত্যে'র শ্রাবণ-সংখ্যায় মল্লিখিত 'অমোঘবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক।

† "* * * বীরসেনো মুনিঃ স্বর্গং যাস্যতি। তস্য শিষ্যো জিনসেনো ভবিষ্যতি, সোঽপি চত্বারিংশৎ সহস্রৈঃ কর্ম্মপ্রাভৃতং সমাপ্তিং নেষ্যতি"।—

শ্রীধরকৃত গদ্যশ্রুতাবতার।

বিভক্তিঃ প্রথমস্কন্ধো দ্বিতীয়ঃ সংক্রমোদয়ঃ।
উপযোগস্তু শেষাশ্চ তৃতীয়স্কন্ধ ইষ্যতে॥
একোনষষ্টিসমধিকসপ্তশতাব্দেষু শকনরেন্দ্রস্য।
সমতীতেষু সমাপ্তা জয়ধবলা প্রাভৃতব্যাখ্যা॥
গাথাসূত্রাণি সূত্রাণি চূর্ণিসূত্রং তু বার্ত্তিকম্।
টীকা শ্রীবীরসেনীয়াংশেষা পদ্ধতিপঞ্চিকা॥
শ্রীবীরপ্রভুভাষিতার্থঘটনা নির্লোড়িতান্যাগম-
ন্যায়া শ্রীজিনসেনসন্মুনিবরৈরাদেশিতার্থস্থিতিঃ।
টীকা শ্রীজয়চিহ্নিতোরুধবলা সূত্রার্থসম্বোধিনী
স্থেয়াদারবিচন্দ্রমুজ্জ্বলতমা শ্রীপালসম্পাদিতা॥"

ইহার ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ৭৫৯ শকাব্দে কষায় প্রাভৃতের ব্যাখ্যা এই জয়ধবলা টীকা সমাপ্ত হইয়াছে।

জিনসেনাচার্য্য 'বর্দ্ধমান পুরাণ,' 'জিনেন্দ্রগুণস্তুতি' 'জয়ধবলা টীকা', 'মহাপুরাণ' ও 'পার্শ্বাভ্যুদয়'—এই পাঁচখানি গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মহাপুরাণ' ইহাঁর রচিত নহে,—'মহাপুরাণে'র ৪৩ অধ্যায়ের ৩ শ্লোক পর্য্যন্ত জিনসেনের প্রণীত, অবশিষ্টাংশ ইহাঁর প্রধান শিষ্য গুণভদ্র প্রণয়ন করেন। জিনসেনের রচিত পূর্ব্বাংশের নাম 'আদিপুরাণ' ও গুণভদ্রের রচিত উত্তরাংশের নাম 'উত্তরপুরাণ'।—'মহাপুরাণ' গ্রন্থ এই দুই নামে পরিচিত।

পুনার প্রফেসর কাশীনাথ বাপুজী পাঠক 'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, জৈন 'হরিবংশ' পুরাণও জিনসেনের রচিত। * কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। 'জৈনহিতৈষী' নামক হিন্দী মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নাথুরাম প্রেমী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'মহাপুরাণ' 'পার্শ্বাভ্যুদয়' প্রভৃতির রচয়িতা জিনসেনাচার্য্য 'হরিবংশের' প্রণেতা নহেন।

* "Jinasena wrote his first work the Jaina Harivansa in Saka 705 when Srivallabha, the son of Krishnaraja 1., and the grandfather of Amoghavarsha 1. was the reigning sovereign. Jinasena's second work the Parshwavyadayam must have been composed shortly after Saka 736, while his third and last work the Adipurana, was left unfinished. He wrote only 45 (?) chapters."

এই কাব্যের টীকাকার পণ্ডিতাচার্য্য, মল্লিনাথরীতিতে ইহার সুন্দর টীকা লিখিয়াছেন। টীকার সূত্রের উল্লেখস্থলে পাণিনীয় সূত্রের পরিবর্ত্তে শাকটায়ন ব্যাকরণের সূত্রাবলী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

টীকাকার পণ্ডিতাচার্য্য টীকার শেষে অনুষ্টুপ্ শ্লোকাকারে একটি অতিমাত্র ভ্রান্ত মতের প্রচার করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থকার জিনসেনাচার্য্যকে মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়াছেন। টীকাকার এ সম্বন্ধে এক গল্পও রচিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, (১) কালিদাস এক দিন অমোঘবর্ষ নৃপতির সভায় স্বরচিত 'মেঘদূত' কাব্য শুনাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি সভাস্থ পণ্ডিতবর্গের প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক মহারাজ অমোঘবর্ষকে 'মেঘদূত' কাব্য শ্রবণ করাইয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। সভ্যবৃন্দের মধ্যে জিনসেনাচার্য্য কালিদাসের এই জিগীষাপরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যপ্রকটন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি শ্রবণমাত্রেই 'মেঘদূতে'র শ্লোকসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"পুরাতন ভাব অপহরণপূর্ব্বক এই কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া কালিদাস রুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"কোন্ প্রাচীন কাব্যের ভাব অপহরণ করিয়া আমি কাব্য লিখিয়াছি, তাহা সভায় প্রদর্শন করুন।" জিনসেন উত্তর করিলেন, "আপনি যে কাব্যের পদবিন্যাস ও ভাব অপহরণ করিয়া এই নবীন কাব্য লিখিয়াছেন, সেই কাব্য

(১) "কালিদাসাহ্বয়ঃ কশ্চিৎ কবিঃ কৃত্বা মহোজসা।
মেঘদূতাভিধং কাব্যং শ্রাবয়ন্ গণশো নৃপান্॥
অমোঘবর্ষরাজস্য সভামেত্য মদোদ্ধুরঃ।
বিদ্বযোঽবগণয্যোষ প্রভুমশ্রাবয়ৎ কৃতিম্॥
তদা বিনয়সেনস্য সতীর্থ্যস্যোপরোধতঃ।
তদ্বিদ্যাহঙ্কৃতিচ্যুত্যৈ সন্মার্গোদ্দীপ্তয়ে পরম্॥
জিনসেনমুনীশানস্ত্রৈবিদ্যাধীশ্বরাগ্রণীঃ।
বিংশত্যগ্রশতগ্রন্থপ্রবন্ধশ্রুতিমাত্রতঃ॥
একসন্ধিস্ততঃ সর্ব্বং গৃহীত্বা পদামর্থতঃ।
ভূভৃদ্বিদ্বৎসভামধ্যে প্রোচে পরিহসন্নিতি॥
*　　*　　*　　*
সঙ্কেতদিবসে কাব্যং বাচয়িত্বা স সংসদি।
তত্তুষ্টমুদীর্য্যাথ কালিদাসমমানয়ৎ॥"

আমার সন্ধানেই একটু দূরবর্ত্তী স্থানে আছে। আমাকে আট দিন সময় দিলে, আমি সেই কাব্য আনিয়া সভায় শুনাইব।" তখন সভাস্থ অন্যান্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। এ দিকে জিনসেনাচার্য্য 'মেঘদূতে'র সমস্ত শ্লোক সমস্যাপূরণাকারে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া পার্শ্বনাথের কথাবলম্বনে 'পার্শ্বাভ্যুদয়' নামক কাব্য রচনা পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকে অপমানিত ও লজ্জিত করিলেন।

টীকাকারের এই কল্পিত উপন্যাস যে উন্মত্তপ্রলাপবৎ ভিত্তিশূন্য, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। মহাকবি কালিদাস যে জিনসেনাচার্য্যের অতি পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বীজাপুর জিলার অন্তর্গত ঐহোলী গ্রামে 'মেগূতী' নামক জৈন মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ ৫৫৬ শকাব্দের শিলালিপিতে জৈন কবি রবিকীর্ত্তি সগৌরবে কালিদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন।*

এই রবিকীর্ত্তি চালুক্যবংশীয় মহাবীর দ্বিতীয় পুলিকেশীর (অপর নাম সত্যাশ্রয়) যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। চালুক্যবংশে দ্বিতীয় পুলিকেশীর তুল্য প্রবলপরাক্রম নরপতি আর কেহই ছিলেন না। ইনি ৫৩১ শকাব্দে রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। এই বীরশ্রেষ্ঠ সত্যাশ্রয় পুলিকেশী (২য়) কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।† সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বজ্ঞ

* "পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ। (৫৫৬)
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥
তস্যাম্বুধিত্রয়নিবারিতশাসনস্য
সত্যাশ্রয়স্য পরমাপ্তবতা প্রসাদম্।
শৈলং জিনেন্দ্রভবনং ভবনং মহিম্নাং
নির্ম্মাপিতং মতিমতা রবিকীর্ত্তিনেদম্॥
প্রশস্তের্বসতেশ্চাস্যা জিনস্য ত্রিজগদ্গুরোঃ।
কর্ত্তা কারয়িতা চাপি রবিকীর্ত্তিঃ কৃতী স্বয়ম্॥
যেনাযোজি নবেঽশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ॥"
(Indian Antiquary, Vol, V. P. 70-71.)

† "সমরসংসক্তসকলোত্তরাপথেশ্বরশ্রীহর্ষবর্দ্ধনপরাজয়োপলব্ধপরমেশ্বরশব্দালঙ্কৃতস্য সত্যাশ্রয়শ্রীপৃথিবীবল্লভমহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বরস্য প্রিয়তনয়ঃ—"
Journal of the Bambay branch the Royal Asiatic Society, Vol. Xvi. P. 234.)

ডাক্তার ফ্লিট প্রভৃতির মতে ৬১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সহিত সত্যাশ্রয় পুলিকেশীর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মহাকবি বাণভট্ট শ্রীহর্ষের সভাসদ্ ছিলেন। (১৩১৮ সালের কার্ত্তিক মাসের অর্চ্চনায় মল্লিখিত 'রত্নাবলীর প্রণেতা' ইতিশীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) তিনিও স্বরচিত 'হর্ষচরিত' নামক গদ্য কাব্যে কালিদাসকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।* সুতরাং মহাকবি কালিদাস কোনও রূপেই শকীয় অষ্টম শতাব্দীর জিনসেনের সমসাময়িক হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

টীকালেখকের তথাকথিত কাহিনী যে নিতান্তই অযৌক্তিক, তাহা এই কাব্যের উপান্ত্য শ্লোক পাঠ করিলেও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কবি লিখিয়াছেন,—

"ইতি বিরচিতমেতৎ কাব্যমাবেষ্ট্য মেঘং
বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যম্।"

যদি কালিদাসকে অপমানিত করাই গ্রন্থকার জিনসেনের উদ্দেশ্য ছিল, তবে তিনি কাব্যের শেষে কালিদাসের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার 'মেঘদূতে'র প্রশংসা করিবেন কেন? এই শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও বলা যায় না। কারণ, টীকাকার অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় এ শ্লোকেরও যথারীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'পার্শ্বাভ্যুদয়' কাব্যের রচনা-প্রণালী প্রথম শ্রেণীর না হইলেও ইহা যে অপর একখানি কাব্যের সমস্ত শ্লোককে অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাতেই এই কাব্যের অসাধারণত্ব। সম্ভবতঃ একখানি কাব্যের আদ্যোপান্ত শ্লোকাবলী গ্রহণ পূর্ব্বক এইভাবে আর কোনও কাব্য প্রণীত হয় নাই।

'মেঘদূতে'র প্রত্যেক শ্লোকের অন্তিম চরণ গ্রহণপূর্ব্বক জৈন দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সম্বন্ধীয় আংশিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সাঙ্গনপুত্র 'বিক্রম' নামক কোনও জৈন কবি 'নেমিদূত' নামক একখানি খণ্ড কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়†। পুস্তকখানি মারাঠী অনুবাদের সহিত

---

* "নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥"
—হর্ষচরিত।

† "তস্য খ্যাতং প্রবরকবিতুঃ কালিদাসস্য কাব্যা-
দন্ত্যং পাদং সুপদরচিতান্মেঘদূতাদ্গৃহীত্বা।
শ্রীমন্নেমেশ্চরিতবিশদং সাঙ্গনস্যাঙ্গজন্মা
চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ।
—নেমিদূত, ১২৬ শ্লোক।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ কাব্যখানিও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও শ্রুতিমধুর। ইহারও তিনটি শ্লোক নিম্নে উপহার দিলাম। শৈলশৃঙ্গে তপস্যা-নিরত রাজপুত্র নেমিনাথকে তাঁহার পত্নী কহিতেছেন,—

তুঙ্গং শৃঙ্গং পরিহর গিরেরেহি যাবঃ পুরীং স্বাং
রত্নশ্রেণীরচিতভবনদ্যোতিতাশান্তরালাম্।
শোভাসাম্যং কলয়তি মনাগ্‌ নালকানাথ যস্যাঃ
'বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা'॥

অলোক্যৈনং তরলতড়িদাক্রান্তনীলাব্দমালং
প্রাবৃট্‌কালং বিততবিকসদ্‌যূথিকাজাতিজালম্।
অন্তর্জ্জাগ্রদ্‌ বিরহদহনো জীবিতালম্বনেঽলং
'ন স্যাদস্তোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ'॥

এতৎ তুঙ্গং ত্যজ শিখরিণঃ শৃঙ্গমঙ্গীকুরুষ
প্রাজ্যং রাজ্যং প্রণয়মথিনং পালয়ন্ বন্ধুবর্গে।
রম্যে হর্ম্মে চিরমনুভব প্রাপ্য ভোগানখণ্ডান্
'সোৎকণ্ঠানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি'॥

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

বন্দিপ্রেমের স্বপ্নভঙ্গ।

জীবনের কুঞ্জে পশে মধুর যৌবন
অঙ্গে অঙ্গে ফুটে রূপরাশি;
সে রূপের ফাঁদে প্রেম-বিহঙ্গ প্রথম
আপনারে ধরা দেয় আসি'।

নয়নে তাহার জাগে রূপের স্বপন
রূপতৃষা হৃদয়মাঝার,
রূপের মদিরা পান করি' সে পুলকে
করে সুখে সে কুঞ্জে বিহার।

একদা যৌবন-অন্তে হেরে সে বিস্ময়ে—
কোথা রূপ! সে স্বপন গত,
গুণের পিঞ্জরে তার কাটিতেছে দিন
বন্দী হ'য়ে জনমের মত।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-চক্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবৃত্ত।

গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র পিতামহীর যে অবস্থা দেখিল, তাহাতে সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। এ কয় দিন সে কাঁদিতে পারে নাই—দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় বেদনার ভার বর্দ্ধিত হইয়া কেবল অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। আজ সে যখন পিতামহীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সে ভার যেন কিছু প্রশমিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে মনে আত্মগ্লানির আবির্ভাব হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পিতামহীর এই বেদনার জন্য যেন সে-ই দায়ী। আর পিতার মৃত্যু?—সে হৃদয়ে অজস্র বৃশ্চিকদংশনযাতনা অনুভব করিতে লাগিল। শোকে—দুঃখে হৃদয় কোমল না হইলে মানুষ আপনার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না—আপনার অপরাধ বুঝিতে পারে না। আজ শোকে দুঃখে বিপন্ন যতীশচন্দ্র বুঝিল, সে স্বাবলম্বনের নামে যে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে, তাহার ফলে সে কেবল আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু তাহার প্রতি স্নেহই যাঁহাদিগের জীবনের প্রবলতম বৃত্তি ছিল—যাঁহাদিগের সকল কার্য্যের কারণস্বরূপ ছিল, তাঁহাদিগেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার মত পাপী কে?

তখন সরোজার কথাও মনে পড়িল। এত দিন সে যে মিথ্যা অভিমানে সরোজাকে অপরাধী মনে করিত, আজ সে অভিমান আর তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; তাই আজ তাহার মনে হইল, সরোজার ত কোন অপরাধই ছিল না। সে যে অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছিল, সরোজার পক্ষে তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভবও ছিল না—সঙ্গতও হইত না। দোষ সরোজার নহে—তাহারই। আর সে তাহার কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে!

আজ অমূল্যচরণের প্রভাব হইতে দূরে আসিয়া শোকার্ত্ত—ব্যথিত যতীশচন্দ্র আপনার কৃত কর্ম্মের স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত—শঙ্কিত হইল। তাহার মনে যে বেদনা—যে যাতনা—সে বেদনা কি কখন অপনীত হইবে—সে যাতনা কি কখন জুড়াইবে? যতীশচন্দ্র কেবলই ভাবিত।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে ধরণীধরের শ্রাদ্ধের সময় আসিল। গৃহেই শুদ্ধ হইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে অমূল্য-

চরণের ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে আসিবার পূর্ব্বে অমূল্যচরণকে পত্র লিখিয়াছিল; আশা করিয়াছিল, পূর্ব্বের মত সে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত থাকিবে। কিন্তু সে আসিয়া জানিল, অমূল্যচরণ আইসে নাই। হয় ত কোন অনিবার্য্য কারণে অমূল্যচরণ আসিতে পারে নাই—ভাবিয়া সে তাহার গৃহে গেল। অমূল্যচরণ কয়জন বন্ধুর সহিত তাস খেলিতেছিল। তাহাকে সেই বন্ধুরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিল, অমূল্যচরণের আহ্বানে সে আগ্রহও নাই। অমূল্যচরণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য যতীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার বন্ধুরা সন্ধ্যার সময় উঠিলেন। যতীশচন্দ্র ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল; কিন্তু ফিরিতে পারিল না।

শেষে তাসের আড্ডা উঠিলে যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণকে পিতামহীর কথা জানাইল; জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

অমূল্যচরণ বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পাওনাদাররা বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছে। তাহাদের তাগাদায় আমি অস্থির হইয়া উঠিতেছি। তাহাদের কি করিবেন?"

যতীশচন্দ্র এতক্ষণে অমূল্যচরণের স্বভাব বুঝিল। তাহার মনে পড়িল, গৃহীত অর্থের অর্দ্ধাংশেরও অধিক অমূল্যচরণই গ্রাস করিয়াছে। আজ সে নিষ্কাসিতরস ইক্ষুদণ্ডের দশাগ্রস্ত—তাই অমূল্যচরণ তাহাকে অবহেলায় ধূলায় ফেলিয়া দিতে ব্যস্ত। শোকের মত শিক্ষক আর নাই। সে শিক্ষায় যতীশচন্দ্র সংযম শিখিয়াছিল। সে মনের ভাব চাপিয়া বলিল, "দেখি, কি করিতে পারি।"

পরদিন যতীশচন্দ্র কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিল। আসবাবগুলি বিক্রয় করিয়া সে ভৃত্যদিগের বেতন ও কতক খুচরা দেনা মিটাইয়া আবার শানগরে চলিয়া গেল। তথায় সে ভাবিয়া আপনার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিবে।

যাইবার পূর্ব্বে সে একবার নূতন শ্বশুরালয়ে দেখা করিয়া গেল। সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সে আর কাহারও নিকট কোন কথা গোপন করিবে না; সে তাহার সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে।

গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র দুশ্চিন্তার দারুণ দংশন হইতে অব্যাহতি লাভ

করিতে পারিল না সত্য; কিন্তু আর এক প্রকার যন্ত্রণার কিছু উপশম অনুভব করিল। নিশাশেষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমাগত দিবসে অনিবার্য্য ব্যয়-নির্ব্বাহের ভাবনা—পাওনাদারদিগের তাগাদা—অর্থসংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণের চিন্তা—গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র সে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির শান্তিও সে বহুদিন ভোগ করিতে পায় নাই। ভাবনা রহিল—ভবিষ্যতের, ভাবনা রহিল—ঋণের, ভাবনা রহিল—নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণীর। আর রহিল আত্মগ্লানির মুর্ম্মুরদাহ—পিতার প্রতি ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি—আর সরোজার প্রতি ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি। কিন্তু উপায় কি? যতীশ কেবল তাহাই ভাবিত। কেবল পিতামহীর অপরিমেয় অনাবিল স্নেহে যতীশচন্দ্রের মনোবেদনার যেন অর্দ্ধেক উপশম হইত।

এই ভাবে এক মাস কাটিতে না কাটিতে নিদাঘের নিরসতায় সরসতা-সঞ্চার করিয়া বর্ষা দেখা দিল। পরিপূর্ণ পল্বল ভেককলরবমুখরিত হইল—পতিত জমীতে ঘনশ্যামপত্র তৃণলতাগুল্ম দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরেরও আবির্ভাব হইল। এক দিন যতীশচন্দ্রের পিতামহীর শোকদুর্ব্বল দেহ জ্বরের তাড়নে কম্পিত হইল। জ্বর যায় আসে—একেবারে যায় না। শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অথচ তিনি কিছুতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে দিলেন না। যতীশ বিপন্ন হইয়া পড়িল। পিতামহীর শুশ্রূষার—পথ্যাদির ব্যবস্থা কি হইবে? তাহার আহারেরই বা উপায় কি? শুশ্রূষাকার্য্যে সে অনভ্যস্ত। প্রতিবেশিনীদিগের লৌকিক আত্মীয়তায় স্থায়িত্বের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না। বৃদ্ধার রোগ দুই এক দিনে সারিবার নহে বুঝিয়া তাঁহারা যে যাঁহার গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইলেন। বাস্তবিক কে দশ দিন পরের করিতে পারে? সকলেরই সংসার আছে।

শেষে বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তোরও কষ্ট হইতেছে। আমি না হয় ইচ্ছাপুরে বৌদিদিকে সংবাদ দিয়া পাঠাই। আহা—কত দিন বৌদিদিকে দেখি নাই।"

যতীশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে আর কেমন করিয়া সরোজাকে আসিতে বলিবে—কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইবে? সুদিনে সে তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া এ দুর্দ্দিনে সে তাহাকে আনিতে পারিবে না। আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠাইবেন কি?

অনেক ভাবিয়া পরদিন সে কলিকাতায় গেল এবং তাহার নূতন শ্বশুরালয়ে

সকল কথা জানাইয়া স্ত্রীকে শানগরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা দরিদ্র—দরিদ্রের দুঃখ বুঝিলেন; আরও বুঝিলেন, কন্যা কল্যাণীকে ত এই ঘরই করিতে যাইতে হইবে—বিলম্ব করিয়া ফল কি? বিশেষ এখন যদি সে যাইয়া সংসার অধিকার করে, তবে ভবিষ্যতে তাহার সপত্নীর আসিবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে।

যতীশচন্দ্র কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া শানগরে আসিল।

কল্যাণীকে দেখিয়া ঠাকুরমা একবার সরোজার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু এও যে যতীশের পত্নী! কল্যাণীর আদরযত্নের ক্রটি হইল না।

কল্যাণীও কয় দিনেই সেবায়, শুশ্রূষায় ও কার্য্যপটুতায় বৃদ্ধার স্নেহশীল হৃদয় অধিকার করিল। সে দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিল, কখনও বিলাসে বা আলস্যে অভ্যস্তা হয় নাই। গৃহকর্ম্মে তাহাকে জননীর সাহায্য করিতে হইত। তাই সে গৃহকর্ম্মে নিপুণা ছিল। ভাইভগিনীগুলিকে লালন-পালন করিয়া ও রোগে শুশ্রূষা করিয়া সে শুশ্রূষাকার্য্যেও অভ্যস্তা হইয়া উঠিয়াছিল তাই সে সেবায় ও শুশ্রূষায় কয় দিনেই বৃদ্ধার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

গৃহকর্ম্মের সকল ভারই কল্যাণী লইল এবং সকল কাযও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। বৃদ্ধার ভাগ্যে বিশ্রামসুখলাভ ঘটিল।

যতীশও কল্যাণীর সঙ্গে প্রাণপণে পিতামহীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এখন যেন তাঁহার প্রতি তাহার ভালবাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কিন্তু অক্লান্ত শুশ্রূষায় কিছুই হইল না। ঠাকুরমা'র জ্বর মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। আর যতীশচন্দ্র ও কল্যাণী অনেক জিদ করিয়াও তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইতে সম্মতা করিতে পারিল না। পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা মৃত্যুর আশায় যেন উৎফুল্লা হইতেছিলেন। হিন্দু-বিধবা পতিকে হারাইলেই মনে করেন, জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই। তাহার পর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহাকে পুত্রশোক সহিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুই কামনা করেন।

এই ভাবে প্রায় দুই মাস কাটিল। দ্বিতীয় মাসের শেষে বৃদ্ধা শয্যা লইলেন। সকলেই বুঝিল, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, দীপনির্ব্বাণ কেবল সময়-সাপেক্ষ।

তৃতীয় মাসের মধ্যভাগে এক দিন সকলেই বুঝিল, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।

"ঠাকুরদাদা" নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ মধ্যাহ্নের পর পর্য্যন্ত মেয়াদ।"

বৃদ্ধার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করা হইল। সেই গঙ্গার কূলেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার শেষ শ্বাস বাহির হইয়া গেল।

পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া যতীশ কাঁদিল। এমন করিয়া সে আর কখনও কাঁদে নাই। এ শোক যেন তাহার পক্ষে পিতামহীর ও পিতার মৃত্যুশোক। তাহার বেদনা কে বুঝিবে? তাহার শোকের কি সান্ত্বনা আছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

পিতামহীর মৃত্যুর কয় দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে যতীশ পিতামহীর শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে কল্যাণীর সহিত পরামর্শ করিতেছিল। রন্ধনগৃহে কল্যাণী হবিষ্যান্ন রাঁধিতেছিল—আর যতীশ নিকটে বসিয়া ছিল। এখন সংসারে কল্যাণীই তাহার অবলম্বন। মানুষ যখন বিপদে পড়ে—যখন ভাবনার সমুদ্রে কূল পায় না—যখন বুঝিতে পারে, সে আপনার বুদ্ধিবলে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না—যখন তাহার আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত প্রত্যয় চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে ব্যথার ব্যথীর পরামর্শ লইতে চাহে। তখন সে পত্নীর পরামর্শ লয়—কারণ, উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে একত্র সম্বদ্ধ।

যতীশচন্দ্র কল্যাণীর সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে একজন ভদ্রবেশধারী মধ্যবয়স্ক লোক একেবারে অন্দরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যতীশচন্দ্র বাহিরে আসিল। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া আগন্তুক কর্কশভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার কি ব্যবস্থা করিলেন?"

যতীশ বলিল, "আমার অবস্থা দেখিতেছেন। ঠাকুরমা'র শ্রাদ্ধটা হইয়া যাউক; তাহার পর আমি একটা ব্যবস্থা করিব।"

"আমি আপনার চাকর নহি যে, কলিকাতা হইতে কায ফেলিয়া যাতায়াত করিব। আমার পাওনা টাকা পাইব কি না, বলিয়া দিউন। তাহা বুঝিয়া আমাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। টাকা লইবার সময় সকলের এক চেহারা—আর দিবার সময় আর এক চেহারা। ভাল আপদেই পড়িয়াছি।"

যতীশ যত বিনীত ভাবে কথা কহে, আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ততই উচ্চ হয়।

যতীশ তাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গেল।

কল্যাণী ভাবিতে লাগিল।

সেই দিন আহারের পর যতীশচন্দ্র হর্ম্ম্যতলে কম্বলের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কল্যাণী কক্ষে প্রবেশ করিল। স্বামীর কাছে বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কলিকাতা হইতে যে লোকটি আসিয়াছিল, সে তোমার কাছে কত টাকা পাইবে?"

যতীশ বলিল, "দুই শত টাকা।"

"তোমার কি আরও দেনা আছে?"

"আছে।"

"মোট কত টাকা হইবে?"

"প্রায় ছয় হাজার।"

টাকার পরিমাণ শুনিয়া কল্যাণী চিন্তিতা হইল,—জিজ্ঞাসা করিল, "শোধ করিবার কি করিবে?"

যতীশ বলিল, "তাই ভাবিতেছি।"

"শোধ করিবার কি কোন উপায় নাই?"

"থাকিবার মধ্যে আছে, ঠাকুরমা'র সম্পত্তিটুকু।"

"দাম কত হইবে?"

"আট হাজার টাকা হইতে পারে।"

"ঐটা বেচিয়া ফেল।"

"তাহার পর কি খাইব?"

"এখনই বা কি করিবে? আগে তুমি খোলসা হও। সব শোধ করিয়াও হাতে কিছু টাকা থাকিবে। আর তুমি কি মাসে ২০।২৫ টাকাও আনিতে পারিবে না? তাহাতেই সুখে হউক—দুঃখে হউক, আমাদের চলিয়া যাইবে। এ অপমান—এ অস্বস্তিতে কায নাই।"

"কিন্তু সম্পত্তি বেচিব বলিলেই ত বিক্রয় হয় না। এ দিকে ইহাঁরা যে আর সময় দিতে চাহেন না।"

কল্যাণী মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "এখন কত টাকা হইলে তুমি সময় পাও?"

যতীশ বলিল, "প্রায় দুই হাজার।"

"ভাল। আমার যে গহনা আছে; তুমি কাল সেগুলি বেচিয়া ফেল—প্রায় দেড় হাজার টাকা পাইবে। আর দিদিরও ত গহনা আছে—আমি তাঁহাকে লিখিতেছি।"

যতীশচন্দ্র ঠিক বুঝিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে?"

কল্যাণী বলিল, "ইচ্ছাপুরে দিদিকে।"

"সে কি?"

"তুমি রমণীকে চিন না। তুমি যাহাই কর, তুমি তাঁহার স্বামী। তোমার বিপদ্ শুনিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না। আর আমি ঠাকুরমা'র কাছে তাঁহার কথা যাহা শুনিয়াছি—তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি সব কথা লিখিলে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দিতে দ্বিধা করিবেন না।"

যতীশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক সে রমণীকে চিনে না। রমণীর এই কল্যাণী মূর্ত্তি সে তাহার স্বার্থসঙ্কুচিত চিত্তে বুঝি ধারণাও করিতে পারে না? রমণীর এই আত্মত্যাগ বুঝি তাহার কল্পনার অতীত। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল। আর সে মনে এক অপূর্ব্ব শান্তির আনন্দ অনুভব করিল। যাহার ভাগ্যে এরূপ পত্নীলাভ ঘটে, তাহার জীবন অভিশপ্ত হইতে পারে না। যাহার জ্বালা জুড়াইবার এমন স্থান আছে, তাহার কিসের দুঃখ? তাহার অবসন্ন হৃদয়ে যেন নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল; সে যে সংসার-সংগ্রামে আপনার পরাজয় ও পতন অনিবার্য্য বোধ করিতেছিল—তাহার মনে হইতে লাগিল, সেই সংসার-সংগ্রামে তাহার জয় হইবেই। সে হৃদয়ে যে শক্তি অনুভব করিল সে শক্তি বিশ্বাসসঞ্জাত। আজ তাহার মনে হইল, রমণী সত্য সত্যই শক্তিরূপিণী। এ কথা যে না বুঝে, সে সংসারমরুভূমিতে কেবল মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিয়া শ্রান্ত—ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যে ইহা বুঝিতে পারে, সে জয়ী হয়—সুখী হয়।

কিন্তু যতীশ কিছুতেই কল্যাণীর অলঙ্কার লইতে চাহিল না; বলিল, "আমার একখানি অলঙ্কার দিবার ক্ষমতা নাই আর আমি তোমার সম্বল নষ্ট করিব? সে কিছুতেই হইবে না।"

কল্যাণী তাহাকে অনেক বুঝাইল; বলিল, "দুর্ভাবনায় তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তোমার—মনে সুখ নাই। তোমার শরীর—তোমার সুখ বড়—না আমার অলঙ্কার বড়? তুমি যদি অসুখী হও, তবে আমি

বাক্সে গহনা রাখিয়া কি সুখ পাইব? গহনা ত অসময়ের জন্যই। যখন তোমার অর্থ হইবে, আমি জিদ করিয়া গহনা লইব।"

যতীশ অনেক তর্ক করিল; কিন্তু কল্যাণীর সহিত পারিয়া উঠিল না। কেবল তাহার বিশেষ অনুরোধে কল্যাণী বলিল, সে বর্ত্তমানে সরোজাকে কোন পত্র লিখিবে না।

পরদিন পত্নীর অলঙ্কার লইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় গেল ও সেগুলি বিক্রয় করিয়া কতক ঋণ শোধ করিয়া গৃহে ফিরিল।

কলিকাতায় যাইয়া যতীশ আর একটি কায করিল; সংবাদপত্রে কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া কয় স্থানে চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া আসিল।

তাহার পর সে গ্রামের ঠাকুরদাদা হরিনাথকে বলিল, "দেখুন, বাবা ত সব টাকাই সৎকর্ম্মে দান করিয়া গিয়াছেন। আমার ত চাকরী না করিলে চলিবে না। কাযেই আমাকে বিদেশে যাইতে হইবে।"

হরিনাথ বলিলেন, "তাহা ত বটেই।"

যতীশ বলিল, "আমি চলিয়া যাইলে যে সামান্য সম্পত্তিটুকু আছে, তাহাতে কি আর কিছু হইবে?"

হরিনাথ বলিলেন, "মহাভারত! আপনি থাকিয়া আদায় করাই দুষ্কর; না থাকিলে কি কখনও আদায় হয়? বিশেষ আজকাল ঘোর কলি—লোক ফাঁকি দিতে পারিলে আর ছাড়ে না।"

"তাই ভাবিতেছি. সম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিব। আপনি সাহায্য না করিলে হইবে না।"

"আমিই ত ধরণীকে সম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছিলাম। তাহার ভাগ্যে নাই—ভোগে লাগিল না। আমি চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই বিক্রয় হইবে। গ্রামেই সম্পত্তি; অনেকেই লইতে চাহিবে।"

বাস্তবিক হরিনাথের চেষ্টায় কয় দিনেই সম্পত্তির গ্রাহক জুটিল। পিতামহীর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া যথারীতি অধিকারী হইয়া যতীশচন্দ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিল ও সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আপনার সঞ্চিত ঋণ মিটাইয়া দিল। দুঃখের মধ্যে সে যে সুখ পাইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এ দিকে সে যে কয়খানি দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানির উত্তর আসিল। দানাপুরে মাসিক ৩০্ টাকা বেতনে তাহার চাকরী জুটিল।

নূতন স্থান; তাই যতীশচন্দ্র প্রস্তাব করিল, প্রথমে সে একাই যাইবে, পরে কল্যাণীকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে। তত দিন কল্যাণী পিত্রালয়ে থাকিবে। কিন্তু কল্যাণী সে প্রস্তাবে সম্মতা হইল না। কারণ, সে পিত্রালয়ে আপনাদের দারিদ্র্য-দুঃখ জানাইতে ইচ্ছুক ছিল না; আর ঘটনা-পরম্পরায় যতীশচন্দ্র যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে যতীশচন্দ্রকে একাকী বিদেশে যাইতে দিতে তাহার মন সরিতেছিল না। সে বলিল, "তুমি সঙ্গে থাকিবে, ভয় কি? আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" যতীশ আর তাহার কথায় আপত্তি করিল না। সেও ভাবিল, কল্যাণীকে রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহাকে লইয়া যাওয়াই ভাল।

তখন যাত্রার আয়োজন হইল। গৃহের কতক জিনিস বিক্রয় করিয়া, কতক জিনিস আত্মীয়গৃহে রাখিয়া এক দিন যতীশচন্দ্র পত্নীকে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিল। গৃহে তালা পড়িল।

অদৃষ্ট-চক্রের এক আবর্ত্তন উদ্‌ভ্রান্ত যতীশচন্দ্রকে ফিরাইয়া গৃহে আনিয়াছিল, আর এক আবর্ত্তন আজ তাহাকে গৃহত্যাগী করিল। অন্য সময় হইলে এই বিদায়ে তাহার হৃদয় বিষম ব্যথিত হইত। কিন্তু আজ সে কল্যাণীর জন্য নূতন আশায়—নূতন উদ্যমে নূতন জীবনে প্রবেশ করিতেছিল; আজ তাহার নিকট সংসার নূতন শ্রীতে সমুদ্ভাসিত; আজ তাহার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি—তাই এই বিদায় আজ তাহার পক্ষে তেমন ক্লেশের কারণ হইল না। বিশেষ তাহার জীবনে কল্যাণরূপিণী পত্নী আজ তাহার সঙ্গে, তাই সে বিদায়কালে বেদনায় অভিভূত হইল না।

রামটেক্।

(২)

একটু অগ্রসর হইয়াই দেখি, পথের বামপার্শ্বে নরসিংহদেবের রক্তপ্রস্তরমূর্ত্তি সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া আছেন। আর দক্ষিণে এক বহু পুরাতন মসজেদ; শুনিলাম, আওরঙ্গজেবের জনৈক সভাসদের স্মৃতিরক্ষার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত। মসজেদ ছাড়াইয়া আর একটি তোরণদ্বারের সম্মুখে যাইতে না যাইতেই মুসলমান ফকিরের ডাক পড়িল। প্রথমে আমরা যাইতে কিছু নারাজ ছিলাম, কিন্তু যখন তাঁহারই মুখে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ "রামও যাহা রহিমও তাহাই" শুনিলাম, তখন আর না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

'রাম রহিম্ নেই জুদা করো।
দিল্‌কা সাচ্চা রাখো জী॥'

ভারতের এই মহামন্ত্র মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই যে তোরণদ্বার পাইলাম, তাহার মধ্যে এক বৃহৎ বরাহাবতারমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; উহার তলদেশ হইতে ভূমির ব্যবধান অত্যন্ত অল্প; সেই সামান্য স্থানের মধ্য দিয়া যিনি বিনা আয়াসে গলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চেষ্টা করিতেছে; আমিও শুইয়া কোনরূপে অপর দিকে আসিয়া নীরবে অন্যের মুক্তি-রহস্য দেখিতে লাগিলাম। একজন স্থূলকায় মারহাট্টার দুর্গতি দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারা গেল না। তাহাকে শেষে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল। মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, তাহার পুণ্যের কতক ভাগ নিশ্চয়ই আমার অংশে পড়িবে স্থির করিয়া লইলাম। ইহারই নিকটে ধূম্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরসম্বন্ধে একটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। পুরাকালে শম্বুক নামে এক শূদ্র কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে কোন ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। শূদ্র তপস্যার অধিকারী নহে; ইহাতেই রাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন। শম্বুক এ মৃত্যুতে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিয়া রামকে এই পর্ব্বতশিখরে চিরদিন থাকিতে অনুরোধ করেন; আর সেই সঙ্গে আপনার পূজাও প্রার্থনা করেন। শূদ্রের সেই লিঙ্গমূর্ত্তির অপর নাম ধূম্রেশ্বর মহাদেব। রাম যে সত্যই পর্ব্বতশিখরে আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইবার সময় পাণ্ডারা মন্দিরসংলগ্ন ত্রিশূলের উপর শুকতারার মত বৈদ্যুতিক আলোকের কথা বলিয়া থাকে। ইহা প্রায় মেঘাচ্ছন্ন

দিবসে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের দুই একটা রহস্যভেদ করিতে শিখিয়া এ কথায় আমার আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

এইবার আমরা সিংহপুর তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তরে যে দুইটি দুর্গ-প্রাচীর আছে, তাহার মধ্যে ভিতরের প্রাচীরটির এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; আর বাহিরেরটি এই দুর্গের নিম্ন দিয়া সোজাসুজি আম্বালা সরোবরে আসিয়া মিশিয়াছে। পশ্চিমে ও দক্ষিণে পর্ব্বতের নিরবচ্ছিন্ন উচ্চতা শত্রুপক্ষ হইতে গিরিশৃঙ্গ রক্ষা করিতেছে। বাহিরের প্রাচীরের এখন কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম, গাওয়ালীরাই নাকি ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। কিন্তু ভিতরের প্রাচীর বহু পুরাতন বলিয়া মনে হইল। সেকালে এই সিংহপুর তোরণের মধ্যেই মারহাট্টাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষিত হইত; নিদর্শনস্বরূপ দুই একটি কামানও দেখা গেল। কত শত বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কালের কঠোর স্পর্শ ইহাদের অস্তিত্ব ঘুচাইতে পারে নাই। আবার সোপানাবলী অতিক্রম করিতে লাগিলাম; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পা আর চলে না। খোকাবাবু ও ঝি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু আমার গৃহিণী একেবারে সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছেন; তিনি "আর কতটাই বা" বলিয়া উঠিতে লাগিলেন। অগত্যা আমিও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

এইবার ভৈরবদরজায় আসিলাম। বৃহদাকার দুইটি কাষ্ঠের দ্বারে লৌহের বৃহদাকার বড় পেরেক্ মারা রহিয়াছে; আর তোরণের উপর হইতে এক বিপুলায়তন ঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে পয়সা দিয়া উহা মনের সাধে বাজাইয়া লইলাম। আঙ্গিনার দুই পার্শ্বে মন্দিরভুক্ত দাসদাসীদিগের বাস; তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে, অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রায় ২০০ লোক হইবে। ভৈরবদরজার গঠনপ্রণালী দেখিবার জিনিস বটে; পাথরের উপর কি কারুকার্য্যই না রহিয়াছে! অবাক্ হইয়া দেখিলাম। মনে ঘৃণা আসিল যে, এই পুরাতন স্থাপত্য শিল্পের আদর করিবার লোক কেহ নাই। আমাদের সব থাকিয়াও বিদেশীর নিকট আমরা নিঃস্ব; হায়, এ কথা কে বুঝে? আবার চলিতে লাগিলাম।

এই বার গোকুলদরজায় আসিলাম; এ তোরণে অস্পৃশ্যজাতীয়দিগের প্রবেশ করিবার হুকুম নাই; সে জন্য খাড়া পাহারাও রহিয়াছে দেখিলাম। আমাদিগকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; সম্ভবতঃ বেশভূষায় বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। প্রথমেই বাম দিকে মন্দিরের ঢাক ঢোল রাখিবার আস্তানা

দেখিলাম; প্রকাণ্ড এক ঢাক ঘরটি জুড়িয়া রহিয়াছে, সেটি বাজাইতে ন্যূনকল্পে বিশ জন লোকের প্রয়োজন। উহারই নিম্নে কয়েকটি সন্ন্যাসীর সমাধি ও মন্দির দেখিলাম। প্রশস্ত চত্বর বাহিয়া আবার কয়েক ধাপের পর লক্ষ্মণের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখের দালানটি আটটি মোটা থামের উপর রহিয়াছে; থামগুলি কারুকার্য্যশোভিত। মন্দিরের মহারাজের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাইল যে, এগুলি প্রায় ৭০০ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। তিনি এ সম্বন্ধে এক প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত প্রমাণ আমায় দেখাইয়া দিলেন; আমিও নিঃশব্দে উহা পড়িয়া লইলাম। মন্দিরটি সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত। দেবস্থান কমিটীর পক্ষ হইতে এ পাহারা নিযুক্ত। মন্দিরের গম্বুজে ছিদ্র করিয়া এক প্রকাণ্ড ঝাড় ঝুলান। ইহার দুইটি দ্বার, প্রথমটি পিত্তলনির্ম্মিত ও দ্বিতীয়টি রৌপ্যনির্ম্মিত। রৌপ্যসিংহাসনে লক্ষ্মণ আসীন; তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি রহিয়াছে। ইহারই নিকটে বশিষ্ঠ ও দশরথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অদূরে পরার্থপরতার মূর্ত্তিমতী দেবী কৌশল্যার মন্দির। এই স্থানে কৌশল্যার যে কত আখ্যায়িকা শুনিতে লাগিলাম, তাহা বলিতে পারি না। রামায়ণে সে সমস্ত পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না; মুগ্ধ হইয়া গৃহিণী সে সব কথা শুনিতে লাগিলেন আর মাঝে মাঝে মারহাট্টি ভাষায় তাহার টিপ্পনীও করিলেন। লক্ষ্মণের মন্দিরের অব্যবহিত পশ্চাতে রাম ও সীতাদেবীর মন্দির। ইহারও দুইটি দ্বার যথাক্রমে পিত্তল ও রৌপ্যমণ্ডিত; আর সম্মুখের দালানটি লক্ষ্মণ জীউর দালানের আদর্শে নির্ম্মিত। এই স্থানেও পাহারা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি কাল পাতরের; তাহার উপর অলঙ্কারের শোভা বড়ই সুন্দর দেখাইল। প্রশস্ত দালানে কত লিপি উৎকীর্ণ! তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। এই স্থানে আসিয়া আমরা সকলে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলাম এবং পূজাও যথারীতি হইল। রামের মন্দির পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। এতক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতেছিলাম, এখন মুখে হাসি ফুটিল। খোকাবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কষ্ট না করিলে কৃষ্ণ মিলে কি?" আমরা আরও হাসিলাম। বস্তুতঃই ভগবান্ দর্শন অল্পে ঘটে কি? ইহারই দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও সে স্থান হইতে অনতিদূরে আবার দুইটি কামান দেখিলাম; উহা পিত্তলের বলিয়া মনে হইল। এইবার মন্দিরের উত্তরে লবকুশের বিগ্রহ দেখিয়া কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া উহার উপরে গিয়া পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিক্ ফাঁকা, আর উপরে কেবল এক পাথরের গম্বুজ। তথা হইতে চারিদিকের দৃশ্য কি মনোরম! বহু নিম্নে রামটেক সহর পড়িয়া আছে,—ঘরবাড়ীগুলি যেন খেলাঘরের মত বোধ হইল। আর লাল কাঁকরের

রাস্তাগুলা যেন সূতার মতন বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। দূরে অম্বালা সরোবর এক-খানি ছোট কাচের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। উপর হইতে মানুষগুলি দেখিয়া পুত্তলের মত লোক বোধ হইল। মন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি গুন্ গুন্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"রাম ঝরূকা বৈঠ্‌কো সব্‌কোমুজরোলে।
জিস্কো জেসি নক্‌রী উস্কো ঐ সি দে॥"

এই স্থান হইতে নামিয়া কয়েক পদ দক্ষিণে গিয়া সীতাকুণ্ড দেখিলাম। তাহার জল কিছু অপরিষ্কার; কিন্তু বড় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। ইহারই নিকটে দুর্গের একটি দ্বার রহিয়াছে; তথা হইতে ৫০০ শত সোপান অতিক্রম করিলে একেবারে রামটেকের বাজারে আসিয়া পৌছান যায়। ধাপগুলি কিছু বন্ধুর ও উচ্চ।

শুনিলাম, গিরিশৃঙ্গে একটি ডাকবাঙ্গলাও আছে; য়ুরোপীয়গণ শিকারে আসিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। মন্দিরের এত নিকটে ডাকবাঙ্গালা শুনিয়া মনটা কিছু খাটো হইয়া গেল।

এই তীর্থে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় আরম্ভ করিয়া পক্ষকালব্যাপী এক মেলা বসে। প্রথম দিনে ত্রিপুরাসুরবধের কীর্ত্তিস্বরূপ একখানি পীতবর্ণের রেশমী কাপড় রামের মন্দিরের উপর দগ্ধ করা হয়। গোকুলদরজায় আঙ্গিনায় ও বাহিরে হাজার হাজার দোকান বসে; এই সব দোকানে কেবলই মৃৎপাত্র, পান, স্ত্রীলোক-দিগের শাড়ী, রুদ্রাক্ষমালা এবং তাম্র ও পিত্তলের বাসন বিক্রীত হয়। এই স্থানের মাটীর হাঁড়ি আর থাপার কাপড় চির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; পান ও আতাফলের ত কথাই নাই। এ সময়ে যাত্রীর সংখ্যাও বড় কম হয় না—প্রায় দুই লক্ষ লোক তীর্থে আইসে। লোকসমাগমে মেলায় আয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে আয়োজনের ঘটাও খুব; কারণ, কার্ত্তিক পূর্ণিমার অধিক বিলম্ব নাই। এই মেলার রোজগারেই পাণ্ডাদিগের সম্বৎসর চলিয়া যায়। আপাততঃ দীপালী নিকটে বলিয়া ঘরদ্বারগুলিরও জীর্ণসংস্কার হইতেছে, দেখিলাম। নিম্নে কৃষির সুবিধার জন্ম সরকার প্রকাণ্ড এক পুষ্করিণী (Irrigation reservoir) খনন করাইয়া দিয়াছেন। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের মাঠে জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়াই আবার নামিতে লাগি-লাম। তখন বেলা আন্দাজ ৩টা হইবে; মাথার উপর হইতে সূর্য্যদেব কিছু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সমস্ত দিন খাওয়া দাওয়া হয় নাই; মেজাজ্ রুক্ষ

হইয়া গিয়াছে। মাঝে মসজেদের কাছে আসিয়া এক লাড্ডুর দোকান হইতে সকলে কিছু কিছু খাবার খাইয়া লইলাম। সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ত হইবে। দোকানের মালিক জল আনাইয়া দিল; সুখে পান করিলাম। শরীর সতেজ হইল। আবার নামিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোথাও অধিক সময় বিশ্রামের প্রয়োজন হইল না। মনে হয়, ৪।৫ বার বিশ্রাম করিয়াছি মাত্র! বেলা অবসান হইতে চলিল দেখিয়া গতি কিছু ক্ষিপ্র করিলাম। খোকাবাবু আমার সহিত আর দৌড়াইতে পারিলেন না; পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহাকে আবার সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য কিছু দেরী হইয়া গেল। একক্রমজাউর দরজা পর্য্যন্ত বেশ আসিলাম, তাহার পর আর পা চলে না,—কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, কেহ যদি ঝোড়ায় করিয়া নামাইয়া লয় ত ভাল হয়। যাহা হউক, রামজীর কৃপায় আমরা সকলেই সুস্থশরীরে বাসায় ফিরিলাম; দেখিলাম, দাওয়ার উপর খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া আমাদের পাচকদ্বয় বসিয়া আছেন। অতিথিসৎকার না করিয়া তাঁহারা খাইবেন না। বিলম্ব না করিয়া সকলে আহারে বসিলাম—এবং ক্ষুধাতাড়নায় অর্দ্ধসিদ্ধ, অর্দ্ধদগ্ধ যাহা পাইলাম, সবই উদরস্থ করিলাম। মনে মনে অবশ্য তাঁহাদের যথেষ্ট সাধুবাদও করিতে হইল. ক্ষুধার সময় থালাভরা খিচুড়ী কে যোগাইতে পারে? এমন ভাবে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ সচরাচর ঘটে না। আনন্দে পথশ্রান্তি সব ভুলিয়া গেলাম; আর সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত ও অরণ্যানীর বিপুল সৌন্দর্য্যে মন বিভোর হইয়া উঠিল। বেলা অবসান হয় হয়; সূর্য্য অনেকক্ষণ পর্ব্বতের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; আর তিমিরবসনা সন্ধ্যা গুটি গুটি পা ফেলিয়া আম্বালার তীরে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। এ অচেনা দেশে বৃথা সময় কাটান সঙ্গত নহে ভাবিয়া উঠিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র সব পুঁটুলির মধ্যে বদ্ধ করিয়া গাড়ী জুতিবার হুকুম দেওয়া গেল। ইত্যবসরে আমাদের সুদক্ষ পাচক মহাশয়রা উদর বোঝাই করিয়া রামজীর মন্দিরাভিমুখে গেলেন; যাইবার সময় গাড়োয়ানকে বলিলেন, আমাদের লইয়া বাজারের নিকট যেন গাড়ী খাড়া করিয়া রাখে; কারণ, উহাঁরা সীতাকুণ্ডের পথ দিয়া সোজাসুজি বাজারে গিয়া আমাদের ধরিবেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পাণ্ডা মহারাজের সহিত সকল সম্পর্ক কাটাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে; মোটা কাপড়গুলা গায়ে জড়াইয়া বসিলাম। আম্বালা ছাড়াইয়া আর জনমানবের

মুখ দেখিতে পাইলাম না। ক্রমশঃ গাড়ী বাজারে আসিয়া থামিল। বাজারে খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের আত্মীয় দুইটির সহিত দেখা হইয়া গেল। যথাক্রমে আমরা যে যাহার গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। এবারে সুধীশের কোন আপত্তিই টিকিল না; সে সুবোধ ছেলের মত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে; ফুল্ল জ্যোৎস্নায় পূর্ণিমার রাত্রি ঠিক করিতে পারা গেল না। কাল পাহাড়ের উপরে চাঁদ বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সুখে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম; আর চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পথশ্রান্তি সব ভুলিয়া গেলাম। পথে 'নেড়াদা' গান ধরিতেন; আমরা গাড়ীর হ্যাঁচ্‌কা টানে যতদূর সম্ভব, উহার রসাস্বাদন করিতে করিতে চলিলাম। ক্রমে রামটেক পশ্চাতে রাখিয়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন প্রায় ৮টা হইবে। জনতায় প্রথমটা ভিতরে ঢুকিতে ইচ্ছা করিল না; শেষে গাড়ী ছাড়িবার অনেক দেরী আছে শুনিয়া রেলের কোন কর্ম্মচারীর "বেওয়ারীশ" খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমাদের দল পুরু দেখিয়া বোধ হয়, কেহ উঠাইতে সাহস করিল না। সুধীশও নিশ্চেষ্ট নহে; গাড়ী আসিবার বিলম্ব দেখিয়া টিকিট-ঘরের দিকে ক্রমাগত দেখিতে লাগিল। তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া এক ক্ষুদ্র কাঠগড়ার মধ্যে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে বিপুল জনতার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা সহজ কথা নহে। আজ আর যাওয়া হইবে না বলিয়াই এক রকম আমরা সাব্যস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু কেবল সুধীশের চেষ্টায় যথাসময়ে টিকিট কাটিয়া আমরা আবার নাগপুরে রওনা হইলাম। সে রাত্রিতে যখন বাড়ী ফিরি, তখন ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা ঘা পড়িল; মনে হইল—একটা; কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইবার জন্য ঘড়ির কাছে যাইয়া দেখি, সাড়ে দশটা!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

রক্ষা-কবচ।

১

মাতাকে ভাল মনে পড়ে না, পিতা গ্রামের ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। এরূপ কার্য্যের জন্য যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, পিতার তদপেক্ষা অনেক অধিক বিদ্যা ছিল। লোক বলিত; তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উচ্চতর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু সাংসারিক উন্নতির চিন্তা তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়কে কোন দিন বিচলিত করিতে পারে নাই। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 'সীতার বনবাস' পড়াইতেন এবং 'পদ্যপাঠ' তৃতীয় ভাগের অন্বয় বুঝাইয়া দিতেন; আর বাটীতে আসিয়া সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল লইয়া বসিতেন।

আমার সঙ্গে পিতার যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইত, সে কেবল সাংখ্য, বেদান্ত ও গীতা লইয়া।

"মায়া," "অবিদ্যা," "প্রকৃতিপুরুষ," "দৈব," "পুরুষকার," "প্রাক্তনসংস্কার," "কর্ম্মফল," "প্রাণায়াম," "প্রত্যাহার," "সবিকল্প নির্ব্বিকল্প সমাধি"—কোন কথাই বাকি থাকিত না। পিতার পণ্ডশ্রম দেখিয়া খুবই হাসি পাইত; কিন্তু কথাগুলা শুনিতেও মন্দ লাগিত না।

বিষয়বুদ্ধিহীন অসহায় পিতার জন্য বাল্যকাল হইতেই খেলাধূলা ছাড়িয়াছিলাম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেহই ছিল না। পিতা যখন বিদ্যালয়ে থাকিতেন, তখন হয় ত বসিয়া বসিয়া বাটীর সম্মুখস্থ ভাগীরথীর অনন্ত ঊর্ম্মিমালা দেখিতাম, নহে ত বিহগকূজিত নির্জ্জন আম্রকাননের মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম।

এমনই করিয়া সংসার-বনবাসে বেদান্ত ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতে করিতে কবে যে নিজের অজ্ঞাতসারে আমিও একটি ছোট খাট বৈদান্তিকে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। আমার বুদ্ধিমতী প্রতিবেশিনীবৃন্দ আমার বুদ্ধিহীনতা এবং অস্বাভাবিকতা দেখিয়া সময়ে সময়ে সত্য সত্যই আমার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন।

কোমল দেহকে কঠিন স্বর্ণালঙ্কারে প্রপীড়িত করিয়া নিদারুণ গ্রীষ্মে মূল্যবান্ বডি, শাড়ী ও সেমিজের স্থূল আবরণে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পুরসুন্দরীগণ

আমার ভূষণহীনতাদর্শনে যখন সমবেদনায় আকুল হইয়া উঠিতেন, তখন হাস্য সম্বরণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিত এবং প্রাচীন গ্রাম্য শিরোমণিবৃন্দ যখন যমালয়ের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া জীবনসন্ধ্যায় সুদ-কসাকে বেদান্তচর্চ্চার উর্দ্ধে স্থান দান করিয়া পিতার বুদ্ধিহীনতার নিন্দা করিতেন, তখন আমার "চারু বিম্বাধর" কিছুতেই অন্তর্নিহিত "মুক্তাকলাপকে" গোপন করিয়া রাখিতে পারিত না।

এমনই করিয়া ভাগীরথীর স্রোতোতাড়িত কুসুমদামের মত পিতাপুত্রীতে নির্ব্বিকার চিত্তে ধীরে ধীরে সংসারস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। এমন সময়ে আমাদের পরমহিতৈষী প্রতিবেশীবৃন্দ লোষ্ট্রাহত মধুমক্ষিকার মত সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণদংশনে আমাদের ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমার বয়ঃক্রম নাকি পঞ্চদশের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাঁহাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছিল! পিতা একদিন সন্ধ্যার পর ম্লান-মুখে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুশীলা! তবে তোমার ত বিবাহের প্রয়োজন।"

শিশুপ্রকৃতি পিতা সমাজের অনুশাসন কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহার উদ্বেগ দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। কি করিয়া তাঁহার এই দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পিতার সে দিন আর বেদান্তপাঠ হইল না। বোধ হয়, তিনি আমার স্বর্গীয়া জননীর কথা ভাবিতেছিলেন। তিনি জীবিতা থাকিলে আজ বোধ হয় পিতাকে একাকী এ দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইত না।

২

পিতাকে অধিক দিন দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইল না—প্রজাপতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মুকুন্দপুরের মুখোপাধ্যায় মহাশয় ("জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী!") পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে পত্নীহীন হইয়া বিরহব্যাকুলিত-চিত্তে নবীনা গৃহলক্ষ্মীর সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শুভক্ষণে আমার পিতৃগৃহে পদধূলি প্রদান করিলেন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি অধমার প্রতি নিপতিত হইল। অতিরিক্ত মাত্রায় করুণারসার্দ্র হইয়া পরম-কুলীন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "পণ" এবং অলঙ্কারের দাবি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমাদের সৌভাগ্য-দর্শনে প্রতিবেশী-বৃন্দ নিতান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। সমবেদনাই মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! বিষয়বুদ্ধিহীন পিতা কিন্তু এই সৌভাগ্যের পরিমাণ বোধ হয় সম্যক উপলব্ধি

করিতে পারেন নাই। ভাবী জামাতার প্লীহাপীড়িত শীর্ণ মূর্ত্তি এবং শিরোদেশের শুভ্র সুষমা বোধ হয়, তাঁহাকে কিছু উদ্বিগ্ন করিয়াছিল।

যাহা হউক, আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। রূপ? রূপ কয় দিনের জন্য? আর বিবাহ যদি ধর্ম্মসম্বন্ধ হয় এবং প্রেমের সাধনা যদি সংযমের সাধনারই নামান্তর হয়, তাহা হইলে হিন্দু-বিবাহে রূপের স্থান কোথায়?

শুভদিনে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণলোচনে সরলহৃদয় পিতাকে কপিল, শঙ্কর, গৌতম ও পতঞ্জলির হস্তে সমর্পিত করিয়া বধূবেশে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলেন না। পিতার দ্বিতীয় বিবাহে ক্রুদ্ধ পুত্র মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাকে লইয়া স্বামী আমার নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার হাঁকডাকে ও ছুটাছুটিতে নীরব পল্লী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সুতরাং সহানুভূতিপরায়ণা প্রতিবেশিনীবৃন্দের নিকট বিশেষ কোন সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সলজ্জ বধূবেশ পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা আমাকেই সংসার-রথের সারথ্য গ্রহণ করিতে হইল। স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশণ করিয়া আমাকেই নামমাত্র "পাকস্পর্শকে" রীতিমত "সার্থক" করিয়া দিতে হইল।

নিমন্ত্রিতা মহিলাকুল আহারান্তে কলিকালের অপরূপ মাহাত্ম্য, নববধূর গৃহিণীপনা এবং আমার সপত্নীপুত্র অতুলের নিদারুণ দুরদৃষ্টসম্বন্ধে সুগভীর আলোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

অপরাহ্নে পল্লীর সুরসিকা যুবতীবৃন্দ আসিয়া ধরিয়া বসিল। দুই ঘণ্টাকাল তাহাদের অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া একটি "আড়ষ্ট" সুচিত্রিত পুত্তলিকায় পরিণত হইলাম।

রাত্রিতে আহারান্তে যুবতীবৃন্দ আমাকে ধরাধরি করিয়া স্বামীর শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিল। আজ আমাদের "ফুলশয্যা"!

শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, স্বামী যন্ত্রণায় শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?" স্বামী কহিলেন, "পেটে বড় যন্ত্রণা।" বুঝিলাম, পত্নীর মন রক্ষা করিতে গিয়া স্বামী উদরের প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছেন। সাজসজ্জা ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া লবণ ও যমানী আনিয়া রোগীকে সেবন করাইয়া দিলাম এবং তৈল ও জল লইয়া উদরে মালিশ করিতে বসিয়া গেলাম।

স্বামিস্ত্রীর প্রথম মিলন দেখিবার জন্য কক্ষের আশে পাশে যে সকল কুতূহলী চক্ষুশতদল থরে থরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া তাহারা সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রায় সমস্ত রাত্রি সেবার পর স্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিদ্রিত হইলেন। আমিও পরিশ্রান্ত-দেহে এক পার্শ্বে শুইয়া অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িলাম। "ফুলশয্যা" নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

প্রথম প্রথম স্বামী আমায় একেবারে প্রেমের কূলপ্লাবী প্লাবনে প্লাবিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সোহাগ করিয়া—ভালবাসিয়া—ভাল কথা বলিয়া কিছুতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না।

আমাকে পরিশ্রম করিতে দেখিলে তিনি একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং এক তিলের জন্যও আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিতেন না। তিান আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার সপত্নীর হস্তরোপিত বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোথাও তাঁহার স্মৃতির কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখেন নাই!

স্বামীর প্রেমের এই অসঙ্গত আতিশয্য দেখিয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত হাসি পাইত। সেও একদিন আমারই মত সংসারের সমস্ত চিহ্ন আবৃত করিয়া স্বামীর হৃদয়-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপনের পূর্ণ অধিকার লইয়া আসিয়াছিল। হায় "অমূল্য অবিনশ্বর" প্রেম!

স্বামীর সন্তোষের জন্য স্নেহের সকল অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিতে হইত। কিন্তু অস্বাভাবিক আতিশয্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না। এক মাস যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারিলাম, আমার রূপসূর্য্য স্বামীর হৃদয়-শতদলকে আর বিকশিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাঁহার চিরপরিচিত তাস, পাশা, দাবা এবং বন্ধুসঙ্গ ক্রমেই তাঁহার একাগ্রচিত্তকে উন্মনা করিয়া দিতেছে।

কিন্তু নিজের নিকট নিজের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, অনেক সময় সহজে স্বীকার করা চলে না। সুতরাং, আমার প্রতি আচরণের পরিবর্ত্তনব্যাপারে স্বামীকে যথেষ্ট ইতস্ততঃ করিতে হইতেছিল।

এমন সময়ে স্বামীর এক পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় এক দিন সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বামী এই অসময়ে তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং তাহাকে

আমার সন্নিরূপে রাখিয়া বহুদিন পরে বন্ধুত্বের মুক্ত বায়ুতে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ছেলেটির নাম সুধীর। এমন অদ্ভুত প্রকৃতির যুবা আমি কখনও দেখি নাই। প্রকৃতির আশ্চর্য্য নিয়মবিপর্য্যয়ে নবীন যৌবন তাহার সুগঠিত গৌর দেহের সর্ব্বত্র আপনার রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াও তাহার শিশুসুলভ সরল চিত্তকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার প্রশান্তায়ত অচঞ্চল নয়নেই যেন এ কথা ফুটিয়া বাহির হইত; এজন্য তাহার সঙ্গে বুঝি আলাপ করিবারও প্রয়োজন হইত না। সে যাহার সংস্পর্শে আসিত, তাহারই নিকট আপনার সমস্ত জীবনটুকু যেন উন্মুক্ত পুস্তকের মত ধরিত; কিছুই সে গোপন করিতে জানিত না। সুধীর এই অল্প বয়সেই অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। বাজার-সরকারি, খানসামাগিরি, যাত্রার দলের ছোকরাগিরি প্রভৃতির তীক্ষ্ণ কণ্টক-খচিত পঙ্কিল পথ বাহিয়া তাহাকে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু কোন স্থানের কিছুমাত্র ক্লেদ বা অপবিত্রতা তাহার সরল চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে যাহা কিছু শিখিয়াছিল, সে শুধু পঠিত শুকের অভ্যস্ত বুলির মত, তাহার সঙ্গে তাহার চিত্তের কোন সংযোগ ছিল না।

তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া লোক যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিত। সে কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিত না।

এই অদ্ভুত বালককে পাইয়া আমার চিত্ত সহজেই তাহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া উঠিল।

সুধীর সকল কার্য্যেই আমাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিত। তাহার সরল জীবনের বিচিত্র ইতিহাস আমাকে মুগ্ধ করিত। তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতে করিতে সে যে পুরুষ মানুষ, এ কথাও অনেক সময় মনে আসিত না।

সুধীর জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। সুতরাং বহুকাল পরে স্নেহের আস্বাদ পাইয়া সেও আমাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না।

এই জনহীন সংসারে আমরা উভয়েই উভয়ের মধ্যে একটা প্রবল অবলম্বন পাইলাম।

৪

বিবাহের ছয় মাস পরে শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রকে প্রথম দেখিলাম। অতুলচন্দ্র প্রথম আঘাতেই মহিষের মত আরক্ত বক্রদৃষ্টিতে আমার প্রতি নেত্রপাত

করিলেন। বিনা বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় হৃদয়ে কিছু ক্ষোভের সঞ্চার হইল।

"সৎ"-মা'র চিরন্তন অপবাদ ঘুচাইবার জন্য যত্ন ও ত্যাগস্বীকারে ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পুত্রবর আমার এই স্নেহ ও সৌজন্যের মধ্য হইতে কৃত্রিমতার বিষাক্ত বীজাণু আবিষ্কার করিয়া আমার প্রতি ক্রমেই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া অবশেষে বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করিলাম।

নবীন প্রেমের প্রথম কুহকের অবসানে স্বামীও পুত্রের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাহার প্রতি আচরিত অবিচারের কলঙ্ককালিমা যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষালিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। স্থির হইল, গৃহচ্যুত অতুলচন্দ্রকে পুনরায় গৃহ-প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর অভিপ্রায়ের সমর্থন করিলাম। বৈশাখের শুভতিথিতে নির্ব্বিঘ্নে অতুলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

পাত্রী বয়স্থা। "ধূলা পায়ে ঘরবসত" হইল। গৃহহারা অতুলচন্দ্র নিজ গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিবাহিত জীবনের প্রথম সঙ্কোচ ও আনন্দোচ্ছ্বাস উপশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে বধূমাতার বেশ "অশিক্ষিত পটুত্বে"র পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই বধূমাতা বধূত্বের শাসন অতিক্রম করিয়া গৃহিণীপনার প্রভুত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এ জন্য স্বামিস্ত্রীর মধ্যে নিরন্তর সুগভীর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। কে বলে, বাঙ্গালী রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার অজ্ঞাতসারে বিপুল চিন্তা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত প্রতিদিন ধীরে ধীরে আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যার ব্যূহ, ছলনার পরিখা এবং কপটতার প্রাচীর রচিত হইতেছিল, তাহা কোন চাণক্যের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত আয়োজন অপেক্ষা হীন নহে। নানা কৌশলে বিচিত্র অভিনয়ের দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূ নিরন্তর আমাকে স্বামীর নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

তাঁহাদের নিরন্তর দুশ্চিন্তাকুটিল ম্লান মুখ দেখিয়া এক দিন মনে বড় দুঃখ হইল। এক দিন বধূমাতাকে একান্তে ডাকিয়া স্পষ্ট বলিলাম, "বৌমা, তুমি এখন সেয়ানা হইয়াছ, নিজের ঘরকন্না বুঝিয়া সুঝিয়া লও না কেন? আমি দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট। গৃহিণীপণায় আমার সাধ নাই।"

কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। বধূমাতার চতুর মুখে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে সাভিমানে বলিলেন, "আমি কোথাকার কে? ঠাকুরের ঘরকন্না। তুমি ঘরের গিন্নি। আমি তোমার দাসী বই ত নই!"

ত্রয়োদশবর্ষীয়া অকালপক্কা বালিকার মুখে এই উচ্চশ্রেণীর নীতিকথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বধূমাতা ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রুতবেগে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শুনিলাম, পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েই ঘোরতর শিরঃপীড়ায় অভিভূত—শয্যাত্যাগে অক্ষম। সংবাদ লইতে গেলাম। কেহ বাক্যালাপ করিলেন না। রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া দুই থালা অন্নব্যঞ্জন কক্ষমধ্যে রাখিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে পরিচারিকা শূন্য পাত্র ফিরাইয়া আনিল। শিরঃপীড়া কিন্তু অক্ষুণ্ণই রহিল।

জটিল মনুষ্যচরিত্রের রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া সুধীরের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম।

৫

স্বামী বাটীতে ছিলেন না। রাত্রির রন্ধনাদি সমাপনান্তে নিজকক্ষে বসিয়া সুধীরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। সুধীর তাহার জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনার অদ্ভুত গল্প করিতেছিল—যাত্রার দলের "অধিকারী" প্রতিদিন কি রকম পা টিপাইয়া লইত, কি রকম করিয়া বেহালাদার ও "মোশন মাষ্টার" যষ্টির সাহায্যে সঙ্গীত ও বক্তৃতা শিক্ষা দিত, উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া দৈবাৎ ঘুমাইয়া পড়িলে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল ইত্যাদি। সুধীর মধ্যে মধ্যে আপনার দুর্দ্দশার কাহিনী অভিনয় করিয়া দেখাইতেছিল। কাযেই অনেক সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু এই নির্দ্দোষ প্রমোদের অন্তরালে আমারই গবাক্ষতলে যে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা কেমন করিয়া জানিব?

সহসা স্বামী হুঙ্কার করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার পুত্র ও পুত্রবধূ স্তম্ভিত-মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বামী প্রবেশ করিয়াই মুষ্টিবদ্ধহস্তে—আরক্তনয়নে কহিলেন, "পাপিষ্ঠা, আমার অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি? আজ যদি তোর রক্ত দর্শন না করি ত আমার নাম রামজয় মুখুয্যে নহি।" ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তুমি কি বোলছো?" স্বামী হুহুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "একেবারে এত দূর? সম্বন্ধবিচার পর্য্যন্ত ভুলে

গিয়েছিস্?" ব্যাপার বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। সরল শিশুপ্রকৃতি সুধীরের প্রতি যে কাহারও এরূপ সন্দেহ হইতে পারে, এ কথা কখনও কল্পনা করিতেও পারি নাই। শুনিয়া ব্যাপারটা এমন হাস্যকর মনে হইল, যে এরূপ অবস্থাতেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার কি মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে? কি বল্‌ছো? সুধীরের উপরেও মানুষের সন্দেহ হ'তে পারে?"

আমার ধর্ম্মনিষ্ঠা বধূমাতা আমার নির্লজ্জতাদর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কি বেহায়া মেয়েমানুষ বাবা! 'হাতে দই, পাতে দই, তবু ব'লে কই কই!'" পুত্রবর লগুড়হস্তে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বেরোও এখনিই বাড়ী থেকে, নইলে আমি রাগ সাম্‌লাতে পারব না। খামখা একটা খুনখারাবি হ'য়ে যাবে।" এতক্ষণে ব্যাপারটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বুঝেছি। কিন্তু এর জন্য এত ষড়যন্ত্র কেন? সোজা কথায় বল্‌লেই হ'ত। আমি ত আমার 'ময়ুর-সিংহাসন' আপনা হ'তেই বৌমা'কে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম।" আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং আমার আচরণ দেখিয়া স্বামী কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, এ জন্য পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

* * * * * * * *

বহুদিন পরে আবার পিতার সেই সরল, শান্ত, স্নিগ্ধ তপোবনে প্রবেশ করিলাম। পিতার সেই সাংখ্য, বেদান্ত, গীতার স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে হইল, সংসারের ক্রূরতা, খলতা, হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান, সুখ, দুঃখ—সব মিথ্যা, সব মায়া, সব অবিদ্যা।

দুই মাস না যাইতেই এক দিন স্বামী সহসা আমার পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার মুখ লজ্জায় মলিন ও চক্ষু জ্যোতিহীন। তিনি আমার প্রতি ঘোরতর অবিচারের জন্য এক সুদীর্ঘ অনুতাপসূচক বক্তৃতা প্রদান করিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম; বলিলাম, "সে জন্য অনুতাপের প্রয়োজন নাই বল, এখন কি করিতে হইবে।"

স্বামী বলিলেন, "আমি মূঢ়, তোমার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই ; হতভাগ্য পুত্র ও পুত্রবধূর কুমন্ত্রণায় তোমাকে অপমানিত করিয়াছি। চল, দয়া করিয়া আবার আমার অন্ধকার মন্দির আলোকিত কর!"

আমি বলিলাম, "আমি গেলেই আবার বেচারারা উত্যক্ত হইয়া উঠিবে। তাহাদের উত্যক্ত করিয়া কি লাভ? আমি কেন কিছুদিন এখানেই থাকি না?"

স্বামী বলিলেন, "না, সে কিছুতেই হইবে না। যাহারা তোমাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে, তাহাদের আমি কিছুতেই আমার গৃহে স্থান দিব না।"

মনুষ্যচরিত্রের অদ্ভুত অব্যবস্থিততার কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় স্বামিগৃহে প্রবেশ করিলাম।

পুত্রবর আমার দিকে চাহিয়া অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বধূমাতা আকাশের দিকে চাহিয়া "আঙ্গুল মট্‌কাইলেন!" কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পিতার ভীষণ তাড়নায় পুত্র ও পুত্রবধূকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিতে হইল।

স্বামীকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। অপরাহ্নে উচ্চ কণ্ঠে আমাকে গালি দিতে দিতে এবং পিত্রালয়ের ঐশ্বর্য্য ও অন্নবাহুল্যসম্বন্ধে সসমারোহ ঘোষণা করিতে করিতে বধূমাতা শিবিকারোহণ করিলেন।

পুত্রবরকে কিছু দুশ্চিন্তান্বিত দেখাইতেছিল। পত্নীর দুন্দুভিনিনাদ সত্ত্বেও শ্বশুরালয়ের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার অগোচর ছিল না। অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল। আমি গোপনে আমার কয়েকখানি অলঙ্কার আনিয়া অতুলের হস্তে দিয়া বলিলাম, "বাপবেটার ঝগড়া কখনও স্থায়ী হয় না। দু'দিন পরেই সব মিটিয়া যাইবে। ইহার মধ্যে যদি কষ্ট পাও, ইহা হইতে খরচ করিও।" পুত্র আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না; কিন্তু অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার "নিত্যানিত্য বিবেক" দেখিয়া সুখী হইলাম।

বধূমাতার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু অনুরোধে তাঁহাকে কিছু আহার করাইয়া দিলাম এবং দক্ষিণাসহ কিঞ্চিৎ আহার্য্য শিবিকামধ্যে দিয়া আসিলাম। স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী স্বামীর পন্থারই অনুসরণ করিলেন!

পরদিন শুনিলাম, আমার কুৎসায় সমস্ত গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আমিই যে পুত্র ও পুত্রবধূর গৃহত্যাগের একমাত্র কারণ এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং আমা হইতেই পরিণামে যে মুখোপাধ্যায় বংশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সে সম্বন্ধেও কাহারও চিত্তে অণুমাত্র সংশয় নাই।

বলা বাহুল্য, শুনিয়া নিরাশায়িনী হই নাই। পিতার উপদিষ্ট বেদান্তদর্শন সুখেদুঃখে, সম্পদেবিপদে, রক্ষা-কবচরূপে আমার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

মহেশপুরের সূর্য্যরাজা।

(প্রতিবাদ)

আমরা ১৩১৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'আর্য্যাবর্ত্তে' "মহেশপুরের সূর্য্যরাজা" প্রবন্ধ দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। বল্লালসেন তাঁহার নির্ব্বাসিত পুত্রকে যথাসময়ে আনয়ন করায় সন্তুষ্ট হইয়া জালজীবী কৈবর্ত্তদিগকে জলাচরণীয় করিয়াছিলেন, এই গল্প যে সম্পূর্ণ অলীক উপন্যাসমূলক, তাহা আমি ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্যমাঝি" শীর্ষক প্রবন্ধে 'নব্যভারতে' প্রমাণ করিয়াছি।

বল্লাল কর্ত্তৃক কোন অনাচরণীয় জাতি আচরণীয় হইতে পারে না। কোন যুগেই ব্রাহ্মণগণ এত নিস্তেজ ছিলেন না। রাজাজ্ঞায় অন্ত্যজ জাতির জল ব্রাহ্মণ পান করিবেন, ইহা অসম্ভব। যে ব্রাহ্মণগণ, বল্লালসেন চণ্ডালী উপপত্নী গ্রহণ করায় অনাচার দুষ্ট বলিয়া তাঁহার পৌরোহিত্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা বল্লালের ভয়ে অন্ত্যজ জাতির জলপান করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ঘটক মুলো পঞ্চানন মহাশয়ের কারিকায় নিবদ্ধ আছে। যথা—

"বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে, দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পিতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বুঝলে গণ্য অন্যথ তত্রত্য॥

তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য যাজন না করে।
পূর্ব্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধা মাত্র ধরে॥
* * * * *
অসৎ প্রতিগ্রহে দ্বিজ পতিত অগ্রদানী।”

বল্লাল সেন ধীবর সূর্য্য মাঝিকে ভূমি পুরস্কার দিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও নুলো পঞ্চানন মহাশয় তাহা অবগত ছিলেন। যথা—

সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লক্ষণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥
সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশ লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিবৃত॥

সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যমাঝি পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সমগ্র অংশ পুরস্কার পায় নাই। তাহার কিয়দংশ হালিকের রাজ্য ছিল। হালিকের রাজ্যের অপরাংশ লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ। সুতরাং যখন সূর্য্যমাঝি জায়গিরস্বরূপ যোগীন্দ্রদ্বীপ (সূর্য্যদ্বীপ) বা যোগিনীদহ ওরফে মহেশপুর পাইলেন, তখন মাহিষ্যগণ লাট কঙ্কদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন। মাহিষ্যগণ যে কেবল এই দুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা নহে। ইহাতে বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুক, সুজামুঠা, ময়নাগড়, তুর্কা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ স্বীয় স্বীয় গড়ে দীনভাবে জমীদারী শাসন করিতেছেন। দিনাজপুর জিলায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজা ২য় মহীপাল দেব অত্যাচারী হইলে কৈবর্ত্ত জননায়ক দিব্যক মহাপ্রতাপে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ২য় মহীপালের প্রাণসংহার করিয়া রাজশক্তি নিজবংশে স্থাপন করিয়াছিলেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে বরেন্দ্রের একচ্ছত্রী রাজা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা বল্লালের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল। (‘গৌড়রাজমালা’ দ্রষ্টব্য)। ধীবর সূর্য্যমাঝি রাজা বল্লালের অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন; কিন্তু মাহিষ্য কৈবর্ত্ত কোন দিন বল্লালের অনুগ্রহ চাহেন নাই। তাঁহারা বল্লালের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি।

অপর পক্ষে দেখুন—যখন ব্রাহ্মণগণ বল্লালের পৌত্র মাধবসেনের সভায় বসিয়া গ্রাম ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন বলিতেছেন,—

সাগর হতে উত্থিত মেদনীপুর নাম।
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম॥

এই পয়ারে দেখা গেল, মেদনীপুরে চিরকালই কৃষিব্যবসায়ী কৈবর্ত্তের বাস। সমগ্র কৈবর্ত্ত কিরূপে জাল ছাড়িয়া হালিক বা মাহিষ্য হইল?

মাহিষ্য কৈবর্ত্ত ও জালিক কৈবর্ত্ত যে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণেরই জ্ঞানে আইসে না। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও যাঁহারা সমাজের খবর রাখিতেন, তাঁহারা এই দুইটি জাতিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় তদীয় চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন—

দুই জাতি বলে দাস, মৎস্য মারে চষে ঘাষ,
তেলীরা নগরে পীড়ে ঘানি।"

মৎস্য মারা দাস ও চাষচষা দাস যে পৃথক্ জাতি, তাহা কবিকঙ্কণ জানিতেন।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

যশোহরের পত্র।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তৎকালীন জজ মিষ্টার প্রিঙ্গালের পত্নী ক্রিশ্চিয়ানা প্রিঙ্গাল কর্ত্তৃক লিখিত। পত্রগুলিতে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই; তবে ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন ইংরাজ মহিলা যশোহর সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা একটু চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, এই বিবেচনায় সেগুলিকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল।

(প্রথম পত্র)

এই পত্রখানি যশোহর হইতে ১৮৩০ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে মিসেস প্রিঙ্গাল তাঁহার ভগিনীকে লিখিয়াছিলেন।

"স্থানটি দেখিতে সুন্দর। অধিবাসীদিগের বিভিন্ন প্রকারের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি জানিবার জন্য আমি জনকে (১) প্রায়ই জিজ্ঞাসা করি এবং জানিতে পারিলে সন্তুষ্ট হই। জন এখানে জজ হইয়া আসিয়াছেন। ম্যাজ-

(১) লেখিকার স্বামী যশোহরের তৎকালীন জজ।

ওয়েল এই স্থানের কালেক্টর। সম্ভবতঃ একজন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটও প্রেরিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত একজন ডাক্তারও আছেন। মাত্র এই কয়জনই স্থায়ী বাসিন্দা (২); তবে আমরা কলিকাতা হইতে মাত্র ৮০ মাইল ও ঢাকা হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। ঢাকা একটি বৃহৎ সহর। এ স্থান আমাদের পছন্দ হইলে আমরা কিছুদিন এই স্থানে থাকিব।"

(দ্বিতীয় পত্র)

এই পত্র ১৮৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত। ইহাও তাঁহার ভগিনীকে লিখিত হইয়াছিল।

"জন প্রতি রবিবার প্রাতে তাঁহার কাছারী-ঘরে প্রার্থনা করিবেন; কেন না, এ স্থানে গির্জ্জা নাই। সেই জন্য সকল ক্রিশ্চিয়ানই প্রতি রবিবার প্রাতে ঐ কাছারীগৃহে প্রার্থনার জন্য সমবেত হইবেন। শ্রীরামপুরের মিসনারী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন এতদ্দেশীয় পাদরীও এই স্থানে থাকেন। ইনি কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেন। ইহাঁরা একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও স্থাপিত করিয়াছেন। একটি বিধবা ও তিন হইতে আট বৎসরবয়স্ক ১৬ টি বালিকা এই স্কুলে অধ্যয়ন করে।

"ইহারা ইংরাজী জানে না, বঙ্গভাষাতেই উত্তরপ্রত্যুত্তর করে। এই বালিকা-বিদ্যালয় আমরা অনেক সময় পরিদর্শন করি। পাদরীটি আমাকে বলিলেন যে, বালিকাদিগকে শেলাই শিক্ষা দিবার লোকের অত্যন্ত অভাব। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, যদি তাহারা প্রত্যহ আমার গৃহে যায়, তাহা হইলে আমি এই অভাব পূরণ করিতে পারি। এতদুদ্দেশ্যে আমি কলিকাতায় কাঁচি, সূচ ও অঙ্গুস্তানা পাঠাইতে লিখিয়াছি। এই সামান্য অভাবটুকু মোচন করিতে পারিব মনে করিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

"শৃগালগণ অত্যন্ত উৎপাত করে এবং তাহাদের স্বর অত্যন্ত কর্কশ। গৃহমধ্যে চর্ম্মচটিকাও অত্যন্ত বিরক্ত করে। দেশবাসীদের বিবাহাদি এই সময়েই হয় এবং দিবারাত্রি তাহাদের ঢোলের বাদ্য শুনিতেছি। সে দিন একটি বৃদ্ধ কালা আদমীর (৩) সহিত অনেকক্ষণ আলাপ হইয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার মৃতদেহ গঙ্গার সংকারের

(২) বাসিন্দা অর্থে য়ুরোপীয় বাসিন্দা।

(৩) Black native

জন্য লওয়া হইয়াছিল। তাহার তিনটি পুত্র আছে—তিনটিই বিবাহিত; কিন্তু সে একদিনও পুত্রবধূদের মুখ দেখে নাই; কেন না বাঙ্গালীদের মধ্যে পুত্রবধূর মুখদর্শন নিষিদ্ধ। সে, তাহার তিন ভ্রাতা, তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, পৌত্রগণ ও তাহার বৃদ্ধা মাতা একই বাড়ীতে বাস করে।"

(তৃতীয় পত্র)

এই পত্র ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত হইয়াছিল।

"গত কল্য সন্ধ্যার সময় আমরা যখন গাড়ী করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন বিক্রয়ার্থ অনেকগুলি হস্তী দেখিতে পাইলাম। ঐ সময়ে রাজাকেও দেখিলাম। (৪) রাজার বয়স আন্দাজ উনিশ বৎসর হইবে; দেখিতে সুন্দর এবং ব্যবহার বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ন্যায়। তাঁহার চক্ষু দুইটি বৃহৎ; তাঁহার হস্তদ্বয় কৃশ এবং তিনি কৃশকায়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রাসাদে যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তখন আমাদের সময় হইবে না—বারান্তরে যাইব বলিলাম।

"দুঃখের বিষয়, এ স্থানে দেখিবার কোন জিনিষ নাই, অথবা এমন কিছু নাই, যাহা তোমাদের পাঠাইতে পারি।"

(চতুর্থ পত্র)

এই পত্রখানি ক্রিশ্চিয়ানা তাঁহার পিতামাতাকে লিখিয়াছিলেন। পত্রের তারিখ ১৯শে এপ্রিল।

"গত রবিবারে হিন্দুদের একটি পর্ব্ব-দিন ছিল। আমরা চড়ক দেখিতে গিয়াছিলাম। হিন্দুগণ পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই দিন প্রায়শ্চিত্ত করে। প্রত্যেক বাজারে বা গ্রামে একটি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডের উর্দ্ধদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ড আছে; এই সকল দণ্ড হইতে ৪।৬।৮ গাছি করিয়া রজ্জু ঝুলিতে থাকে। প্রায়শ্চিত্তাভিলাষী হিন্দু নিজ পৃষ্ঠদেশে আংটা বিদ্ধ করিলে এই সকল দড়ীর সহিত ঐ আংটা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এই অবস্থায় তাহারা ৫ মিনিট করিয়া ঝুলিতে থাকে। আমার বিশ্বাস, কেবল নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণই এরূপ করিয়া থাকে। অবশ্যই ইহাতে ইহারা যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ পায়; কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, ইহারা অতিরিক্ত পরিমাণ

(৪) চাচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠ রায়

অহিফেন-সেবনে জ্ঞানশূন্য হইয়া এরূপ করিয়া থাকে। এ দৃশ্যে অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট হই নাই। তত্রাচ এই দেশে বাস করিয়া দেখিতে না যাওয়াও বোকামী মাত্র। অনেক জনসমাগম হইয়াছিল এবং অবশ্যই হিন্দুদের একঘেয়ে বাস্তও ছিল।"

(পঞ্চম পত্র)

৫ই মে লিখিত।

"সহরের প্রত্যেক পুষ্করিণী ও নালা মৎস্যে পরিপূর্ণ। আজ যে সকল নালায় বিন্দুমাত্র জল নাই, কালে বর্ষা হইয়া সেগুলি জলপরিপূর্ণ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যে ভরিয়া যাইবে। সে দিন নিকটবর্ত্তী বাগানেই প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরা গিয়াছিল। (৫) আজকাল এ স্থানে এত মশা যে, তাহারা অনবরত হস্তপদাদি দংশন করিতেছে। (৬) এ স্থানে না আসিলে ইহার সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না।"

(ষষ্ঠ পত্র)

২৩শে মে লিখিত।

"কাছারী-গৃহে প্রতি রবিবার প্রার্থনার সময় প্রত্যেকেই সমবেত হয়েন। এমন কি, কাজকর্ম্ম উপলক্ষে যে সকল নীলকর সহরে আসিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই প্রার্থনায় যোগদান করেন। আমাদের স্কুলের কাজও বেশ চলিতেছে। স্কুলে আরও ২টি বিধবা ভর্ত্তি হইয়াছে এবং মোজা বুনিতে শিখিয়াছে।

"১লা জুন হিন্দুদের একটি পর্ব্বদিন। এই দিবসে তাহারা পাপমুক্ত হইবার জন্য গঙ্গাস্নান করে। গত ২।১ দিনের মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু এই পথে গঙ্গায় স্নানার্থ গিয়াছে। গঙ্গা এই স্থান হইতে ৬০ মাইল দূর।* অনেক যাত্রী ২।৩ শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাইতেছে। রাজপথ স্নানযাত্রিপূর্ণ। গতকল্য সন্ধ্যার সময় যখন আমরা বেড়াইতেছিলাম, তখন মনে হইতেছিল যে, ইংলণ্ডের কোন প্রধান মেলা বা মহাসভার নির্ব্বাচন হইতেছে। প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গেই খাদ্য আছে এবং অনেকের সঙ্গেই নিজ নিজ সন্তান আছে।

(৫) এখন যশোহরে মৎস্য সুলভ নহে—একান্ত দুর্ল্ভ

(৬) মশকের উৎপাত আজও আছে।

* চাকদহে।

অনেকগুলি যাত্রী বৃদ্ধ; এক মাইলও হাটিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। ক্লান্ত হইলে, একজন অপরকে সাহায্য করে। রাত্রিতে এক এক গ্রামের লোক একত্র হইয়া উন্মুক্ত ময়দানে রাত্রিযাপন করে। এ দৃশ্য সুন্দর ও অত্যাশ্চর্য্য। আমার বোধ হইতেছিল, যেন প্রাচীন কালের ইহুদীগণ নিজ নিজ পরিবারবর্গসহ দেশদেশান্তর হইতে জেরুজালেমে সমবেত হইতেছে।

"অধিবাসীরা মাত্র একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করে। ইহার অধিকাংশ 'কোমরবন্ধের' ন্যায় জড়ান থাকে। বাইবেলে যেমন 'স্কেপগোট' আছে, হিন্দুদের মধ্যেও সেই প্রথা প্রচলিত। দেশে যখন কোন হিন্দু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, * তখন একটি ষণ্ডকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র ভ্রমণ করে; অপরের ক্ষেত্রের শস্য ধ্বংস করিলেও কেহ কিছু বলে না, কেন না, ইহা পবিত্র বলিয়া পরিগণিত।

"আগামী মঙ্গলবার মুসলমানদিগের একটি পর্ব্বদিন এবং উহারা এই দিবস সেই ভাবেই অতিবাহিত করে।

"তুমি কি মনে করিবে, জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, হিন্দু স্ত্রীলোক-গণ ১লা জুনকে † খুব পছন্দ করে। কেন না, গঙ্গাস্নান ব্যতীত উহারা ঐ দিনে তাহাদের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে। অন্য সময়ে তাহারা তাহাদের গৃহের বহির্দ্দেশে বাহির হইতে পারে না।"

(সপ্তম পত্র)

১৯শে জুন।

"বাঙ্গালীরা ভয়ঙ্কর বাচাল; অনবরত বকে। যখন কেহ কাহারও প্রতি ক্রোধান্বিত হয়, তখন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাকে গালাগালি করে; তৎপরদিন আবার এই কোন্দল আরম্ভ হয়; এমন কি, ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। কেহই ছাড়িবার পাত্র নহে।

(এ পত্রেই ২২শে জুন নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি লিখিত)

"আজ আমরা জগন্নাথের সম্মানার্থ রথ দেখিলাম। দলে দলে লোক রথ দেখিতে আসিয়াছিল। একজন বলিতে লাগিল, 'ঐ আমার ঈশ্বর।' মন্দিরের ন্যায় যে জিনিষটি তাহারা টানিয়া লইতেছিল, তাহা কাষ্ঠপুত্তলিকাপূর্ণ;

* শ্রাদ্ধকালে।

† দশহরা?

অনেকগুলি পুত্তলিকা বস্ত্রে সজ্জিত। প্রধান দুইটি পুত্তলিকার সহিত রজ্জু থাকাতে পুরোহিতগণ সেই রজ্জু ধরিয়া টানিলে পুত্তলিকা দুইটির হস্ত নড়িতে থাকে। কাষ্ঠনির্ম্মিত হংস অশ্বও আছে। দুষ্ট পুরোহিতগণ পুত্তলিকাগুলির ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য বাতাস করিতেছে!"

সেপ্টেম্বর মাসে ক্রিশ্চিয়ানা প্রিঙ্গল অসুস্থা হইয়া যশোহর পরিত্যাগ করেন। তিনি আর যশোহরে ফিরিয়া আইসেন নাই। পরবর্ত্তী বৎসরের ২৭শে মার্চ্চ ক্রিশ্চিয়ানা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার স্বামী জন প্রিঙ্গল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ক্রিশ্চিয়ানা কলিকাতা পরিত্যাগকালে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "I think all India is like the description Mamma used to give us of the Black Hole in Calcutta!"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

উপহার।

প্রকৃতির সুরম্য উদ্যানে
উঠে নিত্য ফুটি' যেই ফুল,
মনোহর মধুর সৌরভে
সুষমায় অনিন্দ্য অতুল।
সেই পুষ্প করিয়া চয়ন
ভাবসূত্রে কবিতার হার,
গাঁথি কবি আপনার মনে,
দেন নরে প্রীতিউপহার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস।

নবম অধ্যায়।

(রাজপরিবারবর্গের প্যারিস নগর হইতে পলায়ন)

সিদ্ধকাম পুরুষ সংসারের উপাস্য দেবতা। কিন্তু যিনি কার্য্যে ব্রতী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, সমগ্র বিশ্ব-সংসারে কুত্রাপি তাঁহার স্থান হয় না। ডিউক ডি অলিয়ন্ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাবান্ পুরুষ বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তিনি স্বজন-বান্ধবগণেরও ঘৃণাস্পদ হইলেন। রাজা প্রথমাবধি তাঁহার দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত ছিলেন। ল্যাফাইট অকাট্য প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, ডিউকই ভার্সেলিস আক্রমণের মূলীভূত কারণ। হতভাগ্য ডিউক সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইলেন। তিনি অচিরে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে অতলস্পর্শ গহ্বরের গভীরতম প্রদেশে নিপতিত হইলেন। সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ফরাসিরাজ জাতীয় সমিতির সম্মতিক্রমে তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ডিউক নির্ব্বাসিত হইলেন। শান্তিপথ কণ্টকবিমুক্ত হইল। শান্তি-অভিলাষী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। ইতর সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে অসমর্থ হইয়া জাতীয় সমিতির উদারপ্রকৃতি সভ্যগণ একে একে পদত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, স্বার্থপর, হৃদয়বিহীন, চরিত্রবিহীন ব্যক্তিগণ ফরাসী দেশের অদৃষ্টগগনে তুঙ্গস্থান অধিকার করিল। সুতরাং শোণিতপ্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শান্তিসংস্থাপন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল ; যদৃচ্ছাচার স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল।

প্যারিসের ইতর-সাধারণ অতি দুর্দ্দান্ত। তাহারা শার্দ্দূলভল্লুকের ন্যায় রক্তপিপাসু। ভার্সেলিস বিদ্রোহের পর জাতীয় সৈনিকগণের প্রযত্নে তাহারা কিয়ৎকাল যাবৎ প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল ; কিন্তু অল্পকালমধ্যেই পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ভার্সেলিস আক্রমণকালে তাহারা শুনিয়াছিল যে, রাজা প্যারিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেই খাদ্য-সামগ্রী সুলভ হইবে। এইক্ষণে রাজা সপরিবারে প্যারিস নগরে আসিয়াছেন ; তথাপি খাদ্য-সামগ্রী মহার্ঘ্যদৃষ্টে

তাহাদের ক্রোধানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া খাদ্যসামগ্রী বিক্রেতৃগণের প্রতি অশেষবিধ নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ফ্রাঙ্কর নামক রুটি বিক্রেতার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক সেই ছিন্নমুণ্ড প্যারিসের প্রত্যেক রুটী বিক্রেতাকে চুম্বন করিতে বলিল। রুটীবিক্রেতারা দস্যুহস্তে পতিত হইয়া পাপাত্মগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইল। ফ্রাঙ্করের গর্ভবতী পত্নী এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকনে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হৃদয়বিহীন পিশাচগণ সেই ছিন্ন মস্তক ফ্রাঙ্কর-পত্নীর বদনমণ্ডলে সংঘর্ষণ করিতে লাগিল। অনতি-বিলম্বে সেনাপতি ল্যাফাইটি জাতীয় সৈনিকগণের সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণকে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদের দলপতির প্রাণদণ্ড করিলেন। ল্যাফাইটির শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা দেখিয়া ইতর সাধারণ তৎপ্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইল। কয়েক ব্যক্তি সেনাপতিপ্রবরকে বলিল, "যদি আমরা ইচ্ছানুসারে কাহাকেও ফাঁসী দিতে না পারি, তবে কিরূপ স্বাধীনতা লাভ করিলাম?" তাহাদের বিশ্বাস যে, স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ নরহত্যা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, তজ্জন্য বিচারালয় বা বিচারপতির প্রয়োজন কি? এ সমস্ত বৃথা আড়ম্বর কেন? এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তিটি যদি তাহারা পরিচালন করিতে না পারিবে, তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহাদের কি লাভ হইয়াছে?

ফ্রাঙ্করের হত্যাকারিদল যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু তথাপি ইতর-সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হইল না। বিচারালয়সমূহের মৃদুমন্দগতি বিচারনিবন্ধন দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে, অতএব অপরাধীদিগের প্রতি সত্বর দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাহারা তিন জন দস্যুকে বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে দুই জনের প্রাণ সংহার করিল। তাহারা তৃতীয় ব্যক্তির ফাঁসী দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সেনাপতিপ্রবর ল্যাফাইটি জাতীয় সৈন্যগণসহ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে এরূপ গুরুতর শাস্তি প্রদান করিলেন যে, তাহারা কিয়ৎকাল যাবৎ মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না।

ভার্সেলিস হইতে প্যারিস নগরে আগমন পূর্ব্বক রাজপরিবারবর্গ টুইলারি প্রাসাদে বন্দীদিগের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। বিপ্লব সমুদ্ভূত জাতীয় সৈন্যগণ এবং রাজদ্রোহী গার্ড ডি ফ্রান্স প্রাসাদের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

তাহারা রাজপরিবারবর্গকে বন্দিজ্ঞানে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আর সেই বিপ্লবশক্তিসঞ্চারিণী কামিনীগণ লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজ্ঞীর প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া অহোর্নিশি তৎপ্রতি অশ্রাব্য ভাষাপ্রয়োগে গালি বর্ষণ করিতেছে। রাজ্ঞী অদৃষ্টসন্নিধানে শির নত করিয়া মধুরসম্ভাষণে সেই নারীরূপধারিণী বাঘিনীগণকে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'রাজা বা রাজ্ঞীর প্রাসাদের বহির্দ্দেশে আগমন করিবার সাধ্য নাই। তাঁহারা 'প্রাসাদপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই সংখ্যাতীত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে।

রাজপরিবারবর্গের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে তাঁহাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ রাজ্ঞীকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী বলিলেন, "আমি আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি রাজার সঙ্গ কোন ক্রমে ত্যাগ করিতে পারিব না। তাঁহার জন্য-যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তজ্জন্যও প্রস্তুত। রাজ সিংহাসন উৎপাটন করাই বিপ্লবকারিগণের উদ্দেশ্য। আমি স্থানান্তরে গমন করিলে, তদ্দ্বারা রাজা কোন ক্রমে উপকৃত হইবেন না। লাভের মধ্যে ভীরু রমণী বলিয়া জগতে আমার অখ্যাতি প্রচারিত হইবে।" প্রলয়কারিণীগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত রাজ্ঞী গবাক্ষ সন্নিধান ত্যাগ করিয়া পুত্র ও কন্যার শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র অতি তরুণ-বয়স্ক। তিনি জনক-জননীর অবস্থান্তর দৃষ্টি করিতেছেন; অথচ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। প্রাসাদ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। রাজপরিবারবর্গের ব্যবহারোপযোগী রত্নরাজি বিমণ্ডিত, সুবর্ণ নির্ম্মিত আসনাদির পরিবর্ত্তে কতকগুলি জরাজীর্ণ ভগ্নপদ কাষ্ঠাসন বিরাজ করিতেছে। রাজভক্ত শরীররক্ষকগণের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক অপরিচিত অস্ত্রধারী রাজ-পরিবার বর্গের প্রতি অহর্নিশি ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে। অকস্মাৎ অবস্থান্তর সংঘটিত হইতে দৃষ্টি করিয়া রাজপুত্র জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতার শরীর-রক্ষক শান্ত্রিগণ কোথায়?" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "এইক্ষণ ফরাসী জাতির হৃদয় ভিন্ন রাজার অন্য কোন শরীর-রক্ষক নাই।" একদা রাজপুত্র সমক্ষে জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা অপর কোন মহিলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "তিনি রাণীর ন্যায় সুখী।" তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "আপনি কি তাঁহাকে আমার জননীর সহিত তুলনা করিতেছেন?" মহিলা

বলিলেন, "কেন, আপনার মাতা কি সুখী নহেন?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার মাতা সারা রাত্রি ক্রন্দন করেন।"

জাতীয় সমিতি ভার্সেলিস হইতে প্যারিস নগরে স্থানান্তরিত হইয়া অভিনব প্রকারে দেশের শাসন-প্রণালী সংগঠিত করিলেন। সমগ্র দেশ ৮৪ বিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন জিলায় এবং প্রত্যেক জিলা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাণ্টনে বিভক্ত হইল। কয়েকটি "প্যারিস" লইয়া একটি ক্যাণ্টন সংগঠিত হইল। প্রত্যেক বিভাগে একটি শাসন-সমিতি এবং একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংস্থাপিত হইল। শ্রমজীবিগণের তিন দিবসের পারিশ্রমিকপরিমিত করদাতৃগণ ক্যাণ্টনে সমবেত হইয়া প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইল। ক্যাণ্টন-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ জাতীয় সমিতি, শাসন-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণকে এবং বিচারালয়সমূহের বিচারপতিগণকে নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। জাতীয় সৈনিকগণের কর্ম্মচারীদিগকে মনোনীত করিবার ভারও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইল। প্রত্যেক প্রধান নগরে একটি মিউনিসিপালিটি ও একটি শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। বিচার-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বিচারালয়সমূহ অভিনব প্রকারে সংগঠিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পার্লিয়ামেণ্টগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল।

কিয়ৎকাল পরে জাতীয় সমিতি যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধিসংস্থাপনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করায় ফরাসিরাজ সর্ব্বশক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন। রাজসিংহাসন সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম দৃষ্টে মহামতি মিরাবোর চৈতন্য হইল। তিনি রাজ-শক্তিসংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন সুতরাং রাজ-পরিবারবর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজা ও রাজ্ঞীর বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহারা মর্য্যাদাভ্রষ্ট ও হৃতশক্তি হইয়া বিপ্লবসমাকীর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। সেই বিশাল রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় কেহই নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় মিরাবোর ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। মিরাবোর ন্যায় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি কার্য্যভার গ্রহণ করিলে কার্য্যোদ্ধারবিষয়ে আর সংশয় থাকে না। তিনি ধর্ম্মবিহীন ও চরিত্রবিহীন হইলেও তত্তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এইক্ষণ ফরাসিদেশে নাই। সুতরাং রাজা ও রাজ্ঞী উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজসিংহাসন-সংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়া মহামতি মিবারো যদৃচ্ছা শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করেন নাই। তিনি জাতীয় সমিতির ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক ইংলণ্ডদেশীয় শাসনপ্রণালীর আদর্শে এক শক্তির স্থলে ত্রিশক্তি-প্রবর্ত্তনে অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু বিপ্লব বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে কৌশল ভিন্ন কার্য্যোদ্ধার সম্ভবপর নহে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি রাজাকে সপরিবারে প্যারিস নগর হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তিনিও পলায়নের সাহায্যকল্পে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, রাজা পলায়ন করিলে সেনাপতিপ্রবর বৌলি পাশব শক্তির সাহায্যে বিপ্লব দমন করিবেন। তখন মিবারো রাজা এবং ফরাসী জাতির মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া দিবেন।

কিন্তু বিধাতা বিমুখ হইলে মানবের কোন যুক্তিই ফলপ্রদ হয় না। অকস্মাৎ রাজা ও রাজ্ঞীর আশাদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া ফরাসী শক্তির গৌরব, রাজা ও রাজ্ঞীর একমাত্র ভরসাস্থল সেই মানব কুলতিলক মিরাবো সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে চিরদিনের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মবিহীন মিরাবোর মৃত্যুকালীন অবস্থা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভ্রূকুটি করিতে করিতে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান। কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিবে, সেই চিন্তায় তাঁহার বদন প্রফুল্ল। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি তোপধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "গ্রীক বীর এচিলিসের মৃত্যুকালীন সম্মানসূচক ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। আমার মৃত্যুর পর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়বর্গ রাজসিংহাসন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। যে বিপদ্ হইতে এ যাবৎ আমি দেশ রক্ষা করিলাম, আমার মৃত্যুর পর সেই বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি হইবে না। আমার মৃত্যুর পর ফরাসী জাতি আমার মূল্য বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া নয়নযুগল মুদিত করিয়া তিনি অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

মিরাবোর মৃত্যু হইলে সমগ্র প্যারিস শোকচিহ্ন ধারণ করিল। ধর্ম্মমন্দির-সমূহের শৃঙ্গদেশে কৃষ্ণপতাকা উড্ডীয়মান হইল। শবদেহ অতি সমারোহের সহিত সসম্ভ্রমে সমাধিস্থলে আনীত হইল। অতি মহৎ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। বিংশতি সহস্র জাতীয় সৈন্য সমবেত হইয়া শবদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে মৃতদেহ সমাধিগর্ভে নিহিত হইল। তৎক্ষণাৎ বিংশতি সহস্র বন্দুক গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক সেই লোকান্তরিত মহাপুরুষের পূজা করিল। বিপ্লবসমাগমবিকৃতমনা হইলেও ফরাসী জাতি বীরপূজা বিস্মৃত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নলডাঙ্গার প্রাচীন কীর্ত্তি।

যশোহরের দশ ক্রোশ উত্তরে বেগবতী নদীর তীরে নলডাঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র হউক, প্রাচীনত্বে ও ঐতিহাসিক সম্পদে এই স্থান বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। নলডাঙ্গা যে বহু প্রাচীন স্থান তাহা তত্রত্য ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বহুদিনপূর্ব্বে এই স্থানের দেবরায় বংশীয় রাজগণ সমগ্র বঙ্গদেশে যশঃ-সৌরভ বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহাদের আধিপত্যে নলডাঙ্গা সমৃদ্ধির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। নলডাঙ্গার রাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও সমুজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের অশেষ গুণরাশির পরিচয় দিতেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা সেই সকল কীর্ত্তিচিহ্নের বিবরণ সাধারণে উপস্থিত করিব। তাহাদের ইতিহাস যে বঙ্গদেশের ইতিহাসকে আংশিকভাবে সমৃদ্ধ করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

যশোহর হইতে যে রাজপথ কালীগঞ্জ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে নলডাঙ্গা অবস্থিত। কালীগঞ্জ হইতে এক ক্রোশ দূরে "গুঞ্জনগর" নামক স্থানে নলডাঙ্গা রাজার বর্ত্তমান আবাসবাটী। গুঞ্জনগরের প্রাসাদমূল ধৌত করিয়া ক্ষীণস্রোতা "বেগবতী" নদী প্রবাহিতা। এই গুঞ্জনগরের পরপারে তৈলকূপ গ্রামে বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় আশ্রয়

গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত মন্দির ও গড় সেই সুদূর অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।*

গুপ্ত নগরের রাজবাটী অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর পথ ধরিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত গমন করিলে একটি বাঁশের সাঁকো দৃষ্টিগোচর হয়। এই সাঁকোর ঠিক সম্মুখে নলডাঙ্গার রাজগণের পুরাতন প্রাসাদ "রঙমহাল" দৃষ্ট হয়। রাজবংশের শশিভূষণ দেবরায় এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন একণে তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান। রঙমহালের পার্শ্ব দিয়া একটি পথ বক্রভাবে নলডাঙ্গার "মঠবাড়ী" পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই মঠবাড়ীতে নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি কালের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও বিরাজমান রহিয়াছে—

১। রামেশ্বরী।
২। সিদ্ধীশ্বরী।
৩। রাজরাজেশ্বর।
৪। তারানাথ।

রামেশ্বরী মন্দিরে দশভুজা দুর্গার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির-গাত্রস্থ ইষ্টকের কারুকার্য্য দেখিয়া বঙ্গের তৎকালীন শিল্পীর শিল্পকুশলতার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল মন্দিরের ভাস্কর-কার্য্য দেখিয়া যথার্থই মনে হয়, "In art, as in religion, India once led the whole East and influenced and stimulated the development of architecture and sculpture * * * * in China, Korea and Japan. * * * * *"†

রামেশ্বরী মন্দির নলডাঙ্গার রাজা রামদেব দেবরায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণকাল অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই। রামদেব ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে নলডাঙ্গায় আবির্ভূত হয়েন। তিনি দানশীলতার জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়েষ্টল্যাণ্ড্ নলডাঙ্গার রাজবংশ বর্ণনাকালে তাঁহার দানশীলতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "Mindful of their Brahmanical origin, this family has always been distinguished for its liberality in erecting and

* 'প্রতিভায়' মল্লিখিত "রাজা চিত্রসেন রায়" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

† H. P. Ghose's pamphlet on "Archaeologyin India."

endowing idols and in making grants of lands to Brahmans, and even to Mahammadan saints. Ram Deb Ray was * * * especially celebrated for these virtuous acts."* "দেবদ্বিজে" তাঁহার অশেষ ভক্তি ছিল। রামেশ্বরী মন্দির তাঁহার দেবভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রামদেবের সময় নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের 'তখ্‌ততৌস' উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অধীনে সৈয়দ রেজা খাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। করপ্রদানে বিলম্ব হইলে জমীদারগণের রক্ষা থাকিত না। রাজা রামদেব কয়েক বৎসর কর বাকি রাখিয়াছিলেন, এই অপরাধে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ রামদেবকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ১৭২১ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রামদেব নবাব-সৈন্যের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ভীতচিত্তে নলডাঙ্গা হইতে পলায়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাবসৈন্য পনর দিবস নলডাঙ্গায় অবস্থান করিয়া হতাশচিত্তে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিল।

নবাবের সৈন্য মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই রামদেব স্বয়ং নবাবসকাশে গমন করিয়া জমীদারীত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবাব স্বীকৃত হইলে রামদেব তদনুযায়ী দলিল লিখিয়া দিলেন। তাঁহার আমমোক্তার শ্রীকৃষ্ণদাস সে দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া এই দারুণ ঘটনা আমূল শ্রবণ করিলেন; তৎপরে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট গমন করিয়া দলিল দেখিবার প্রার্থনা করিলেন। দলিল হস্তগত করিয়া কৃষ্ণদাস ভাবিলেন, যদি কোনও উপায়ে দলিলখানি নষ্ট করা যায়, তবে প্রভু রামদেবের জমীদারী রক্ষা হইলেও হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া প্রভুভক্ত শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ দলিলখানা গিলিয়া ফেলিলেন। নবাবের লোকরা তাঁহাকে বিষম প্রহার করিল এবং অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গঙ্গাগর্ভে ভাসাইয়া দিল। রামদেব সে সময় গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাসের মৃতপ্রায় দেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া রামদেবের অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তীরে আনয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যলাভ করিলেন। রাজা রামদেব কৃষ্ণদাসের এই অলৌকিক প্রভুভক্তিদর্শনে একান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেবসেবার নিমিত্ত এক ক্ষুদ্র জমীদারী প্রদান করেন এবং অবাসভূমি

* J. Westland's "Report on the District of Jessove"—PP. 43-44.

নান্দোয়ালীতে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ "নান্দোয়ালীর ইস্তফাগেলা দাস" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

রামদেব অশেষ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেও একটি দোষ তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে। তিনি যে সময়ে নলডাঙ্গার রাজগদীতে উপবিষ্ট ছিলেন, সে সময় বঙ্গগৌরব বীরাগ্রগণ্য সীতারাম রায় মহম্মদপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় যশোহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বীরত্বের উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সকলেই সীতারামের বীরত্ব ও গুণরাশির পক্ষপাতী হইয়াছিল—হন নাই কেবল নলডাঙ্গার রামদেব দেব-রায় ও চাঁচড়ার মনোহর রায়। রামদেব ও মনোহর সীতারামের উন্নতির পথে কণ্টক হইলেন। কিন্তু পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মহামতি সীতারাম কণ্টকসমূহ সমূল উৎপাটন করিয়া আপনার স্বাধীনতার পথ মুক্ত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

একসময় সীতারাম রামপাল জয় করিতে গিয়াছেন শুনিয়া মনোহর রায় মহম্মদপুর অধিকার করিবার বাসনায় মহম্মদপুরে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার তাঁহার কার্য্যে এরূপ বাধা দিলেন যে, মনোহর রায় অচিরে স্বীয় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাঁচড়ায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রামদেব দেবরায় একদিন শুনিলেন যে, নন্দোয়ালীর শচীপতি রায় সীতারামের উৎসাহে বিদ্রোহী হইয়াছেন। অবিলম্বে তিনি সসৈন্যে শচীপতিকে দমন করিতে গমন করিলেন।* যুদ্ধের ফলাফল কি হয়, ইতিহাস তাহা বলে না। শুনা যায়, রামদেব বিবিধ উপায়ে সীতারামের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। রামদেব ও মনোহর মধ্যে মধ্যে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন।

রাজা রামদেব ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহম্মদশাহী পরগণার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া উনত্রিংশবর্ষ জমীদারী ভোগ করিবার পর ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

---

* শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "রাজা সীতারাম"—৮পৃষ্ঠা।

নিম্নে রামদেব পর্য্যন্ত নলডাঙ্গা রাজবংশের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।*

বিষ্ণুদাস হাজরা (রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—১৫৯০ খৃঃ অঃ)

|

শ্রীমন্তদেব রায় (রণবীর খাঁ)

|

গোপী দেবরায় — গন্ধর্ব্ব দেবরায়

গোপী দেবরায়

|

রামদেব রায় — রাঘব — রতিনাথ

রামদেব রায়

|

চণ্ডীচরণ (১৬৪৩ খৃঃ অঃ) — রাধাকান্ত — লক্ষ্মীকান্ত

রাধাকান্ত

|

ইন্দ্রনারায়ণ — জানকীবল্লভ — কালীচরণ — বিশ্বেশ্বর

ইন্দ্রনারায়ণ

|

ভূমনারায়ণ — রুদ্রনারায়ণ — রামনারায়ণ — কৃষ্ণরাম

ভূমনারায়ণ

|

উদয়নারায়ণ — রামদেব (১৬৯৮ খৃঃ অঃ) — ঘনশ্যাম — নরনারায়ণ — রামকৃষ্ণ — রাজারাম

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

---
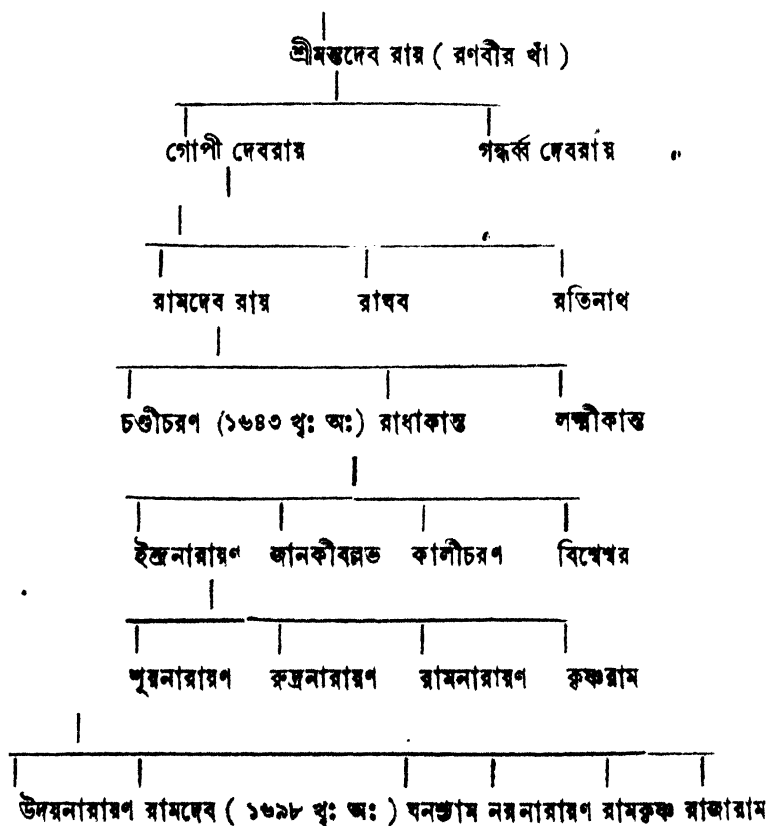
* নলডাঙ্গা রাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন দর্শন করিতে আমরা নলডাঙ্গায় গমন করি। নলডাঙ্গার বর্ত্তমান রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেবরায়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নলডাঙ্গা রাজবংশের "পারিবারিক ইতিহাসের" একখণ্ড আমাকে অর্পণ করেন। সেই গ্রন্থ অনুসারে রামদেবের বংশাবলী লিখিত হইল—লেখক।

সংগ্রহ।

বিবিধ

—×—

দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি সাহিত্যসম্বন্ধীয়

গল্প।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত গল্প ও কথার মধ্যে যে একটা অভিনব প্রাণের সঞ্চার দৃষ্ট হয়,—এই কথাটি আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র এবার চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

আমাদের বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের প্রচলিত গল্পগুলি স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে "Folk tales of Bengal" নামে বৃহৎ পুস্তিকায় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন বলিয়াই আজ সমগ্র ভারতবাসী—শুধু ভারতবাসী কেন, সমগ্র জগদ্‌বাসী বঙ্গপল্লীর প্রচলিত গল্পগুলি পাঠ করিয়া হৃদয়ে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ Antiquarian নামক মাসিক পত্রিকায় জনৈক লেখক দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত সাহিত্যসম্বন্ধীয় কয়েকটি গল্প লিখিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কয়েকটি ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। দক্ষিণ-ভারতবাসীরা যে গল্প বলিয়া বা শুনিয়া হৃদয়ে বিপুল আনন্দ পায়েন, আমরা তাহার অংশ গ্রহণ করিব না কেন?

প্রথম গল্প।

একদা এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভোজরাজের সভায় কিঞ্চিৎ দানপ্রাপ্তির আশায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজার কাছে রিক্তহস্তে যাওয়া যুক্তিযুক্ত অবিধেয় বলিয়া তিনি পথিমধ্যস্থ একটি দোকান হইতে কয়েক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড কিনিয়া তাহা আপন বস্ত্রাভ্যন্তরে করিয়া সন্ধ্যাকালে রাজ-বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-সভা তখন সেদিনের মত বন্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন যে, তিনি সে রাত্রি প্রাসাদের কোন স্থানে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে রাজ-সভায় উপস্থিত হইবেন।

তখন ব্রাহ্মণ ইক্ষুদণ্ডপূর্ণ বস্ত্রখণ্ড উপাধানের আকারে মস্তকের নিম্নে রাখিয়া প্রাসাদের সিঁড়ির উপর শয়ন করিল। ব্রাহ্মণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে রাজ-বাটীর জনৈক পরিচারক সেই ইক্ষুদণ্ডগুলি অপহরণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কয়েক খণ্ড ভস্মীভূত কাঠ রাখিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ প্রভাতকালে ইক্ষুদণ্ড সম্বন্ধে তিল মাত্র সন্দেহ না করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি বস্ত্র উন্মোচন করিয়াই দেখেন, তন্মধ্যে ইক্ষুদণ্ড নাই—কয়েক খণ্ড পোড়া কাষ্ঠ মাত্র আছে!

রাজার চক্ষু ইহা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল—সভাসদ্ পণ্ডিতরা সকলে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল, তিনি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন,—

দগ্ধং খাণ্ডবমর্জ্জুনেন হি বৃথা দেবদ্রুমৈর্মণ্ডিতং,
দগ্ধা বায়ুসুতেন হেমনগরী লঙ্কাপুরী স্বর্ণভূঃ।
দগ্ধং সর্ব্বসুখো হরেণ মদনঃ কিং তৈরযুক্তং কৃতং,
দারিদ্র্যং জনদুঃখকারকমিদং কেনাপি দগ্ধং ন হি॥

অর্থাৎ অর্জ্জুন খাণ্ডব-বন দাহন করিয়াছিলেন, হনুমান্ লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন, হর-কোপানলে মদন ভস্ম হইয়াছিলেন ইহা তাঁহারা ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের একমাত্র নিদান এই দারিদ্র্যকে কেহ ভস্ম করে না কেন?

রাজা ভোজ ব্রাহ্মণের এই শ্লোকাবৃত্তি শ্রবণে এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

দ্বিতীয় গল্প।

একদিন ভোজনদাশরথি নামে একজন ব্রাহ্মণ কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ত রাজার দক্ষিণ হস্ত, আমি নিতান্ত দরিদ্র, রাজার নিকট হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ দান দেওয়াইবার ব্যবস্থা করুন না কেন?"

কালিদাস বলিলেন, "আচ্ছা ভাল, আপনি 'ত্রয়োকারক সুখবাপ্তিরস্তু' বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিবেন ত? এই সামান্য বাক্যটি আপনার কণ্ঠস্থ হইবে ত?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "একমাস চেষ্টা করিয়া দেখি।"

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া কালিদাসকে বলিলেন, "এখন চলুন, রাজ-সভায় যাওয়া যাউক।"

যথাসময়ে উভয়ে রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিবার সময় ব্রাহ্মণ "ত্রয়কারকোঽস্তথবাপ্তিরস্তু" স্থানে "ত্রয়োকারকোপীড়াবাপ্তিরস্তু" বলিয়া ফেলিলেন।

রাজা ও রাজপণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের ধারা দেখিয়া আরক্ত-লোচন হইলেন। কালিদাস দেখিলেন, মহা বিপদ্; তখন তিনি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ আপনাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন যে;—

আসনে বিপ্রপীড়া চ সুতপীড়া চ ভোজনে।
শয়নে দারপীড়া চ তিস্রঃ পীড়া দিনে দিনে॥

অর্থাৎ আপনি যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন যেন ব্রাহ্মণরা আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করে, আপনি যখন ভোজন করিতে বসেন, তখন পুত্ররা যেন আপনাকে বিরক্ত করে আর শয়ন করিলে আপনার স্ত্রী যেন আপনাকে প্রেমের খাতিরে বিরক্ত করে—এই তিনটি পীড়ায় যেন আপনি দিন দিন পীড়িত হন।

রাজা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ সহস্রাধিক মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

তৃতীয় গল্প।

একদিন ভুকুন্দ নামে একজন লোককে রাজসমীপে দণ্ড-প্রদানের জন্য নীত হইলে সে বলিল—

"ভট্টির্নষ্টো ভারবিশ্চৈব নষ্টঃ,
ভিক্ষুর্নষ্টো, ভীমসেনশ্চ নষ্টঃ।
ভুকুন্দোঽহং ভূপতিস্ত্বং হি রাজন্।
ভবাবল্যামন্তকস্থাং প্রবিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ ভট্টি গিয়াছেন, ভারবিও গিয়াছেন, ভিক্ষু গিয়াছেন, আবার ভীমসেনও গিয়াছেন, এখন ভাদিগনীয়ের মধ্যে আমি ভুকুন্দ ও আপনি ভূপতি মাত্র অবশিষ্ট আছি। আমার বোধ হয়, যমরাজ ভ, ভি, ভা, ভু, ভূ, প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছেন; অতএব আমার মৃত্যুর পরই মহারাজের পালা। এই বুঝিয়া মহারাজ আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হয় দিউন।"

ভুকুন্দের কথা শুনিয়া রাজার মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিলেন।

চতুর্থ গল্প।

একটি বালক একদা মহাকবি কালিদাসের নিকট আসিয়া রাজসন্দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, "বল দেখি, তুমি কি বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবে?" বালকটি বলিল যে, তাহার গুরুদেব তাহাকে "কবিঃ কবী কবয়ঃ" এই তিনটি কথা শিখাইয়াছেন।

কালিদাস বলিলেন, "আচ্ছা, কাল তুমি আমার সহিত রাজসভায় গমন করত এই কথা তিনটি আবৃত্তি করিয়া সভাসদ্‌গণকে এই কথা তিনটি অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিতে বলিবে।

পরদিন বালক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এই কথা তিনটি করিল এবং সভাসদ্ পণ্ডিতগণকে ইহা অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিতে বলিল। কিন্তু তন্মধ্যে কেহই তাহা করিতে পারিলেন না।

তখন কালিদাস উঠিয়া বলিলেন—

জাতে জগতি বাল্মীকি শব্দঃ কবিরেতি শ্রুতঃ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥

অর্থাৎ যখন বাল্মীকি জন্মিলেন, তখন "কবি" এই কথাটা উৎপন্ন হইল; তার পর ব্যাস জন্মিলে "কবী" এই কথাটার উৎপত্তি হইল; কিন্তু আপনার রাজত্বকালে "কবয়ঃ" এই কথাটার উৎপত্তি হইয়াছে—আজ সমগ্র জগৎ কবিপূর্ণ।

রাজা বালকের কথা শুনিয়া তাহাকে ধনদানে তৃপ্ত করিলেন।

শ্রীশ্যামালাল গোস্বামী।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ আপনাদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি শুধু জ্ঞানবীর ছিলেন না, তিনি একজন কর্ম্মবীরও ছিলেন। তিনি শুধু সাহিত্য-সেবা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গতানুগতিক সাহিত্য-স্রোতের প্রবাহ-পন্থা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য-সেবায় কর্ম্মের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ স্বর্গগত; কিন্তু তাঁহার শক্তি আজ বঙ্গের সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কর্ম্মশীল রহিয়া তাহাদিগকে আজিও সঞ্জীবনী সুধা দান করিতেছে। প্রতি বৎসর স্মৃতিসভায় এই পুরুষ-সিংহের বিষয় আলোচিত হইলেও তাঁহার জীবন-কথা কখনও নবীনতা ও সৌন্দর্য্য হারায় নাই; পরন্তু পাষাণ-ফলকে চন্দন-দারুর ঘর্ষণের ন্যায়, যতই আলোচিত ও বিবৃত্ত হইয়াছে, ততই সরস, মৃদু ও সদ্য মধুর গন্ধে অন্তরাত্মা পুলকিত করিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি চুঁচুড়ায় 'সাধারণী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহকারিরূপে সংবাদপত্র-সম্পাদন শিক্ষা করিতে থাকেন।

'বঙ্গবাসী'ই তাঁহার কীর্ত্তিকেতু। রথী আজ স্বর্গত হইলেও আজিও তাঁহার সাহিত্য-রথের রম্য কেতন তাঁহার জয়-পরিচয় দিতেছে। ১২৮৮ সালের ২৬ শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভক্ষণে 'বঙ্গবাসী'র জন্ম। তাৎকালিক সংবাদপত্রের সর্ব্ববিধ গ্লানি বিদূরিত করিয়া নবীন আদর্শে, বঙ্গের জনসাধারণের প্রতিনিধির কার্য্য ও দায়িত্বভার দিয়া, যোগেন্দ্র বাবু 'বঙ্গবাসীকে' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। আজিও সকল সংবাদপত্রই সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

যোগেন্দ্রবাবু 'বঙ্গবাসীকে' বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বীয় হৃদয়ের রস-সৌন্দর্য্যে আপনার বিশাল তেজস্বী অথচ মধুর ও সুকুমার হৃদয়কে বিকসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার 'বঙ্গবাসী' শুধু নির্জীব সংবাদপত্রমাত্র ছিল না—তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সাধারণ সংবাদপত্র অপেক্ষা গুরুতর ছিল। তাঁহার 'বঙ্গবাসী' জীবনময় সংস্কারকের বেশে বাঙ্গালার সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল। এই 'বঙ্গবাসী'র অঙ্ক তাঁহার সময়ের দেশের অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্যার সমরক্ষেত্রের কার্য্য করিয়াছিল।

সাহিত্যে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা দূর করিয়া নবীন আদর্শ দিয়াছিল, সমাজে তাঁহার 'বঙ্গবাসী' সর্ব্ববিধ নীচতা, সংকীর্ণতা, গ্লানি ও ভণ্ডতার উপর তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কশাঘাত প্রযুক্ত করিয়া ভ্রষ্টাচার ও ভণ্ডগণকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিয়াছিল, ধর্ম্মজগতে হিন্দুর সদাচার, নিষ্ঠা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, ভারতের অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম-ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে যথায় উচ্চশিক্ষার অভাব, তথায় 'বঙ্গবাসী' শিক্ষক ও গুরুর কার্য্য করিয়াছে। পল্লীবণিকের বিপণি হইতে ভূম্যধিকারীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত কঞ্চুকীর ন্যায় সর্ব্বত্র 'বঙ্গবাসী'র প্রবেশাধিকার ছিল। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা ও দেশের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া তাঁহার 'বঙ্গবাসী' পল্লীগ্রামে গমন করিত, আবার তাহাদের দুঃখ, যাতনা, অভিযোগ ও আবেদন বহন করিয়া রাজদ্বারে উপনীত হইত; অনুনয়, বিনয় প্রয়োজন হইলে বিতর্ক পর্য্যন্ত করিয়া রাজপুরুষের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছে। এক কথায় 'বঙ্গবাসী' তখন দেশের একাধারে সচিব, বন্ধু ও নেতার কায করিয়াছে। দেশের বাসনা ও সাধনা, সমগ্র জাতির অনুভূতি ও বেদনা জ্ঞান, গৌরব সমস্তই গোমুখীর মধ্য দিয়া জাহ্নবীধারার ন্যায় 'বঙ্গবাসী'র মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে। যবনিকার অন্তরালে একা আড়ম্বরশূন্য নিভৃত-কর্ম্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র যন্ত্রচালনায় সমস্ত কার্য্য সাধন করিতেন।

তাঁহার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, সুলভে শাস্ত্রপ্রকাশ। আজ যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে নিত্য ধর্ম্মচর্য্যার সাহায্য করিতেছে, নিঃস্ব চতুষ্পাঠীর শিক্ষাবিস্তারে অনুকূলতা করিতেছে, সে সকল গ্রন্থ যোগেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহেই মুদ্রিতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দরিদ্র গৃহস্থ, ভিখারী ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব ছাত্রগণ এই সকল গ্রন্থ সুলভে প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত কৃতজ্ঞতাশ্রুজলে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির অভিষেক করিতেছে। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ নহে, 'বঙ্গবাসী'র উপহারচ্ছলে একরূপ বিনা মূল্যেই তিনি পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্য আমাদের গৃহে গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন—যাহার প্রসাদে দেশে এত সাহিত্যচর্চ্চা, এত সাহিত্যিকের সৃষ্টি;—আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত সম্পদ্ এত ঐশ্বর্য্য! যোগেন্দ্র বাবু নিজ হস্তে ভাণ্ডার-দ্বার না খুলিলে আমাদের সে ঐশ্বর্য্যের উপভোগ ঘটিয়া উঠিত না। এক কথায় তিনি আমাদের ধর্ম্মচর্য্যায় ও বাণী-বন্দনায় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বঙ্গ-ভাষায় অতুল সম্পত্তি—বাণীচরণে অম্লান কুসুমস্তবক। তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি, ভাষাবিন্যাস ও বর্ণনা-চাতুর্য্য, কিসের

কথা বলিব? সবই প্রশংসার অতীত। 'মডেল ভগিনী'তে তিনি পাশাপাশি পুণ্য ও পাপের চিত্র আঁকিয়াছেন। একদিকে বিলাস-গর্ব্বিত বিদেশীয় কুশিক্ষার কুফল, অন্যদিকে অকপট ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুত্বের অম্লান পুণ্য-জ্যোতিঃ। 'মডেল ভগিনী' সমাজের বিকৃতপুরুষ-হৃদয়ে নির্দ্দয় আঘাত করিয়াছে। তাঁহার 'রাজলক্ষ্মী' সর্ব্বরসের সমন্বয়। কাত্যায়নী অন্নপূর্ণায় করুণ-রস, প্রভুভক্ত রঘুদয়ালে বীররস, ভক্ত রাধাশ্যাম ও দীনদয়ালের চরিত্রে শান্তরস আর রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে সতীজন-সুলভ রৌদ্ররস পরিস্ফুট হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু 'চিনিবাস-চরিতামৃত' ও 'বাঙ্গালী-চরিত্রে' নব্য কুশিক্ষায় বিকৃতরুচি যুবকগণের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যর্থ ও অন্ধ উত্তেজনাকে যাঁহারা দেশহিতৈষিতা ও অসার বাকপটুতাকে যাঁহারা বীরত্ব বলেন, যোগেন্দ্রবাবু তাঁহাদের প্রতি কশাঘাত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা কিছু মৌখিক, আড়ম্বরময়, বাগ্‌বহুল ও কর্ম্মহীন, তাহাই তাঁহার ঘৃণার বস্তু ছিল। তাই তিনি নীরবে কর্ম্মের সেবা করিতেন, তিনি সাহিত্য-মন্দিরে ফুল-লতা-পাতা আঁকিতে আইসেন নাই,—তিনি তাহার স্তম্ভ-প্রাচীর তুলিতে আসিয়াছিলেন।

শুধু বিদেশাগত কুশিক্ষায় বিকৃত সমাজের মলিনতা ও গ্লানির প্রতি নহে—স্বদেশজ সামাজিক চরিত্রের অধঃপতিত ও ঘৃণিত পরিণতির প্রতি তাঁহার কঠোরতর শাস্তির বিধান ছিল। ইহা তাঁহার 'বাঙ্গালী চরিত' ও 'নেড়া হরিদাসে' ব্যক্ত হইয়াছে। কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালীর বিবাহ-রহস্যে ও অধঃপতিত বিকৃত বৈষ্ণব-সমাজের উদাহরণে তিনি আমাদের গৃহছিদ্রগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে দিবালোকে প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মভাব, সরলতা, স্বদেশপ্রিয়তা, সৎপ্রবৃত্তি ও সাধু-উদ্দেশ্যের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তাঁহার পরিচালনায় 'জন্মভূমি' পত্রিকা তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রগণের অন্যতম হইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত 'হিন্দী বঙ্গবাসী' হিন্দীভাষী জনগণের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতিভা, সাহিত্য-সেবা ও শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিল—অপর জাতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া দিবার জন্য একটা বন্ধন-শৃঙ্খলের কাজ করিয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা 'টেলিগ্রাফ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি সুলভে তিনি এই পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ইহাতে লিখিতেন না, পরে তিনি ইহার জন্য অবিরত শ্রম করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হন। রুষ ও জাপানীর যুদ্ধের সময় এই পত্রিকার

অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই পত্রিকা সাপ্তাহিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যোগেন্দ্রবাবুর পুরুষকার, অনন্যনির্ভরতা, ব্যবসায়-বুদ্ধি, সকল কার্য্যে আন্তরিকতা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়, স্বজন ও সাহিত্যিকগণের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, ত্যাগশীলতা, একাগ্রতা, অকপটতা ও নির্ভীকতা তাঁহাকে মহীয়ান্ করিয়াছিল—আজও উহা তাঁহার স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অশেষ গুণের আধার তিনি, তাঁহার কোন্ গুণের কথা বলিব? চারিদিকেই তাঁহার অশ্রান্ত সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্যসেবিগণকে সাহায্য করিতেন, অনেককে 'বঙ্গবাসী' আফিসে ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারে কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিতেন। বহু বিহঙ্গকে নিরাশ্রয় করিয়া আজি আশ্রয়-তরু অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান বেড়ুগ্রামে তাঁহার পল্লী-নিবাস। তথায় তাঁহার খাত পুষ্করিণী, স্থাপিত বিদ্যালয় ও ডাকঘর, প্রতিষ্ঠিত হাট, বাঁধান ঘাট ইত্যাদি বহু জন-হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে।

এই সকল মহাত্মগণের স্মৃতি-পূজার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু তাঁহাকে শ্রদ্ধা বলিয়া নহে, তদ্দ্বারা আমরা আমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করি, আদর্শ আলোকে তমোময় হৃদয়-গুহা আলোকিত করি, সাহস, ভরসা উৎসাহ ও অনুপ্রাণনায় আমাদেরই হৃদয় ভরিয়া যায়। যে আলোক-পথ বাহিয়া এই সকল জ্যোতিষ্কগণ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা আমাদের কর্ম্মবর্ত্ম দেখিয়া লইতে পারি। তাঁহাদের স্মৃতি তাঁহারা নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের মনোময় অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভে তাঁহাদের জয়-গাথা উৎকীর্ণ। বাহিরের ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি তাহার কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীকালিদাস রায়।

বৈদিক সমাজ।

অতি প্রাচীন কালে—কত প্রাচীন, ইতিহাস তাহা বলিতে পারে না; কল্পনাও তাহার ধারণা করিতে পারে না—ভারতের আর্য্যগণ সিন্ধুর উপকূলে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের তৎকালীন চিন্তা, ধারণা ও জ্ঞানের একমাত্র ইতিহাস বেদ। চারিখানি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সমধিক প্রাচীন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাৎকালীন আর্য্য-সমাজ কিরূপ ছিল, তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কৃষিকার্য্য।

আর্য্যগণ কৃষিজীবী ছিলেন। ঋগ্বেদ হইতে এ বিষয়ের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মোক্ষমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, আর্য্য অর্থে "কৃষিব্যবসায়ী", ঋ ধাতুর অর্থ "চাষ করা"। অতএব আর্য্যশব্দের প্রকৃত অর্থ "কৃষক"। কৃষিরত প্রাচীন হিন্দুগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া স্ত্রী-পুত্র সহ একত্র বাস করিতেন। ইহা হইতেই সমাজের উৎপত্তি। সভ্যতা-বর্জ্জিত অনার্য্যগণ সমাজ মানিত না, পরন্তু সমাজ-ধ্বংসেরই চেষ্টা করিত বলিয়া, তাহারা "অনার্য্য" বা "দস্যু" নামে অভিহিত হইত। ১ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে ৭ম ঋকে "কৃষ্টয়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"মনষ্যা অগ্নিমিত্রভৃতাঃ"। প্রকৃত পক্ষে কৃষিকার্য্যের উপর আদিম মনুষ্য-সমাজ কেন, সর্ব্বকালীন সামাজিক সভ্যতা নির্ভর করিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায়ও "Ruralize" করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। আর্য্যগণ কৃষি-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনাদিগকে "কর্ষণশীল" (মনুষ্য) "কৃষক" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ না করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন।

অনার্য্য-সংঘর্ষ।

আর্য্যগণ কৃষি-কার্য্য করিয়া ও প্রাকৃতিক দেবতাগণের তুষ্টিসম্পাদনের জন্য যজ্ঞাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। যজ্ঞবিদ্বেষী আদিম অধিবাসিগণ সর্ব্বদা তাঁহাদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইত। তাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার চিহ্নমাত্র ছিল না। এই জন্য (১০।২২।৮) তাহাদিগকে "অকর্ম্মা অমণ্ডঃ অন্যব্রতঃ অমানুষঃ" বলা হইয়াছে। তাহারা আর্য্যদিগের হিংসা করিত। কৃষ্ণনামক

এক অনার্য্যপতির দশ সহস্র অনুচর ছিল। তাহারা এক সময়ে এক ঋষিকে কূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র কৃষ্ণ অসুরকে বধ করিয়া, যাহাতে তাহার পুত্র না হয়, এজন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছিলেন। এই অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যগণের বহুকাল ধরিয়া সংগ্রাম হইয়াছিল। ১।১২১।১৩ ঋকে দেখিতে পাই, অবশেষে আর্য্যগণই জয়ী হয়েন।

বিবাহ।

সমাজরক্ষার পক্ষে বিবাহ অতীব প্রয়োজনীয়। এই জন্য আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীন কালে বিবাহ-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বিবাহের সময় বর চন্দনাদিতে ও সুবর্ণ-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইতেন (৫।৬০।৪)। তৎকালে ব্যাভিচারিণীর অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহারা যে সমাজের মধ্যে ঘৃণ্য ও নিন্দিত ছিল, এ কথা ২।২৯।১ ঋকে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তথায় আমরা দেখিতে পাই, গৃৎসমদ ঋষি আদিত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

"ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরেমৎকর্ত্ত রহসূরিবাগঃ।
শৃন্বতো বো বরুণ মিত্রদেবা ভদ্রস্য বিদ্বান্ অবসে হুবে বঃ॥"

"হে ব্রতকারী শীঘ্রগমনশাল সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ! গুপ্ত-প্রসবিণীর (গর্ভের ন্যায়) আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ কর। মূলে "রহসূঃ ইব" আছে। সায়ন ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—"রহসি অন্যৈরজ্ঞাতে প্রদেশে সূয়তে ইতি রহসূঃ, সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।" লোক-নিন্দা ব্যতীত গোপনে গর্ভপাতের আর কি হেতু থাকিতে পারে?

পূর্ব্বকালে পিতা কন্যাকে সুসজ্জিতা করিয়া বিবাহস্থলে আনয়ন করিতেন। সেই প্রাচীন কালেও "সালঙ্কৃতা" কন্যা দান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কারণ, ১০।৪৯।১৪ ঋকে জামাতার হস্তে সালঙ্কৃতা কন্যা অর্পণের কথা দেখা যায়।

বৈদিক যুগে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। সে সময়ে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। স্ত্রীলোকগণ অবাধে সকল স্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেন। ভদ্রা ও সুগঠনা কন্যা অনায়াসে স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। (১০।২৭।১২) তৎকালে দম্পতিগণ যজ্ঞভূমিতে একত্র যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ আছে। "সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করিবে," সে যুগে যথার্থই পালিত হইত বলিয়া মনে হয়।

আর্য্যগণ সোমরস পান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। কেবল ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে নহে, পরন্তু সমস্ত প্রাচীন আর্য্যসমাজেই সোমরসের সমধিক ব্যবহার ছিল। এই আর্য্যজাতির এক শাখা; ইরাণীয়দিগের মধ্যে সোমরসের ব্যবহার ও উপাসনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সোমকে "হাওমা" কহিতেন। ঋগ্বেদের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র "আবেস্তার" অনেক স্থলে "হাওমার" প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণের জন্য একটি অংশের অনুবাদ দিতেছি:—"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হাওমাকে যজ্ঞদান করি। তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন, তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন।" ৯।৬৩ সূক্তে সোমরস-প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত আছে। আর্য্য-রমণীগণ প্রস্তর দ্বারা সোমলতা নিষ্পীড়িত করিয়া ও তৎপরে অঙ্গুলিদ্বারা পেষণ করিয়া রস বাহির করিতেন। পরে সেই রসকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মেষ-লোমনির্ম্মিত ছাঁকনির দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হইত। আর্য্যগণ সেই শোধিত রসের সহিত ক্ষীর অথবা দধি মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। ক্ষরণশীল সোমের বর্ণ শুভ্র। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইবিড়বর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে মদ্যপান।

সভ্যতার উন্নতির সহিত জাতীয় সম্পদ্‌ও বর্দ্ধিত হয়। ভূমি ও পশুই প্রাচীন ভারতের প্রধান সম্পত্তি ছিল। ঋগ্বেদে পালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুর উল্লেখও স্থানে স্থানে আছে। ৮।৫।৩ ঋকে অগ্নিদেবের নিকট একশত দাসের প্রার্থনা দেখা যায়। ৮।৪২।৩২ সূক্তে পুনঃ "শতং দাসম্" শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অধ্যাপক রথ (Roth) অনুমান করেন যে, উন্নতির সহিত মেষের ন্যায় প্রাচীন ভারতে দাসও বিনিময়ার্থ ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন ভারতের সম্পদ্।

প্রাচীন ভারতে নিষ্ক নামক এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। বেদে বহুবার এই নিষ্কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রার প্রচলন ব্যতীত সামাজিক উন্নতি সমধিক সাধিত হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতে নিষ্কের প্রচলন আরম্ভ হইলে, সম্পদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ঋক্ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।—৮।৪৭ সূক্তে জানিতে পারা যায় যে, সমাজে ধনবানের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ততই যজ্ঞের আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্রমে

ধনবান্‌গণ ঋত্বিক্ ডাকাইয়া বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। ইহা সমাজের আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক।

বর্ত্তমান ইংরাজি অর্থশাস্ত্রের মত মুদ্রার দ্বারাই Territorial distribution of wealth সম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে যেমন এক দেশের পণ্যদ্রব্য অপর দেশে নীত হইতেছে, বৈদিকযুগেও তেমনই ভারতীয় বণিকৃদল ব্যবসায় ব্যপদেশে এক দেশের পণ্য অপর দেশে বহন করিয়া বেড়াইত। এ কার্য্যের জন্য যে মুদ্রার একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাণিজ্য।

৭।৮৮।৩ ঋকে বশিষ্ঠ বলিতেছেন, "যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।" ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বশিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। এই সমুদ্র গমনের কারণ কি? এক দেশের সহিত অন্য দেশের নৈকট্যসাধনের জন্যই যে এই ঋকে উল্লিখিত জল-যানের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জলযান আবিষ্কৃত হইবার পর ভারতীয় আর্য্যগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন, ঋগ্বেদ হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। (৪।৫৫।৬) অধিকন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে ঐতিহাসিকগণ এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। জর্জ্জ রলিন্‌সন প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে ভারতের স্বর্ণ ভারতীয় যানে কালডিয়া প্রভৃতি সুপ্রাচীন জনপদে প্রেরিত হইত।

শ্রেণী-বিভাগ।

প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ ছিল না। তখন কেবল মাত্র আর্য্য ও অনার্য্য বা দস্যু, এই দুইটি জাতি ছিল। ১।৭।৯ ঋকে লিখিত আছে যে, "ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদিগের ধনসমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির উপর শাসন করেন।" এই "পঞ্চক্ষিতি" শব্দ লইয়া কিছু গোল হইয়াছে। সায়ন বলেন, পঞ্চক্ষিতি অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ ও নিষাদ। কিন্তু সায়নের এই ব্যাখ্যা সকলে গ্রাহ্য করেন না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ের বাদানুবাদ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে মুয়র-কৃত Sanskrit Texts দেখিতে অনুরোধ করি। মোক্ষমূলরও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন বৈদিকযুগে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারিত, তখন বেদে যে জাতি-বিচারের কথা আছে, ইহা স্বীকার করিব কেন? পণ্ডিত

রমানাথ সরস্বতীরও এই মত। তিনি বলেন, "প্রাচীনকালে ইদানীন্তন জাতি-বিভাগের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষিতি অর্থে কি প্রকারে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে?" বোধ হয়, পঞ্চক্ষিতি অর্থে পঞ্চনদ অন্তর্গত পঞ্চভূভাগ হইবে। এইরূপে ১।১০।১ ঋকে "ব্রাহ্মণঃ" শব্দ থাকাতেও গোল হইয়াছে। সায়ন "ব্রাহ্মণঃ" অর্থে ব্রাহ্মণ জাতি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি। ব্রহ্মা একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত। "ব্রাহ্মণঃ" অর্থে স্তুতিবাদকগণ। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় বলেন, "ব্রাহ্মণঃ অর্থে ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকরা।"

সায়নাচার্য্য বলেন, একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া ৫ম মণ্ডলের ৩১ সূক্ত রচিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আগম-পরিদর্শকরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অবর্ণনাকে যজ্ঞে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র শ্যাবশ্বের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। রাজা ইহাতে সম্মত হয়েন। কিন্তু মহিষী, শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, এই আপত্তি করায় তিনি তপস্যা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মরুতের সাক্ষাৎ পায়েন। মরুৎ তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করায়, তাঁহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হয়।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকাল ঋষি ও ঋত্বিক্‌গণকে লইয়া একটি জাতি গঠিত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগ না থাকিলেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। এক ব্যক্তির দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন। শ্রেণী-বিভাগ উন্নত সমাজের পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতে ক্ষৌরকার কর্ম্মকার বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সূত্রধর, বৈদ্য, শিল্পী প্রভৃতির উল্লেখও দেখা যায়। ইহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালে এক পরিবারস্থ ভিন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধি ও কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। ১০।৯০।১২ ঋকে ব্রহ্মার শরীর হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে। কিন্তু পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহা ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে রচিত হইয়া ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। ব্যাকরণবিৎগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে, ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

রাজাই সমাজের মেরুদণ্ড। রাজাকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন ভারতে রাজা।

যে দেশে রাজা নাই, সে দেশে রাজশক্তির ন্যায় অন্যশক্তি বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিল কি না, ইহা যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, ঋগ্বেদের সময় হইতেই ভারতে রাজন্যবর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় বলিতে "বলবান" ব্যক্তিকে বুঝায়। অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষা করিবার জন্য সুরক্ষিত নগরের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদের নানা স্থানে (৭।৩।৭, ৭।১৫।১০, ৭।৯৫।১) "আয়ো" নির্ম্মিত পুরীর উল্লেখ দেখা যায়। সায়ণ আয়সাভি অর্থে হিরণ্ময়ীভিঃ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যে নিরাপদ স্থান বুঝাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪।৩০।২০ঋকে "অশ্মময়ীনাম্ পুরাম্"—প্রস্তর নির্ম্মিত নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। ফল কথা এই ঋগ্বেদের সময়েই আর্য্যগণ ক্রমে সরস্বতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ ব্যতীত আপনাদিগের মধ্যেও পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিবাদ হইত। ঋগ্বেদ (৪।৩০।১৮) হইতে জানিতে পারা যায় যে, সরযূর পূর্ব্বপারস্থ দুইজন আর্য্যরাজা এইরূপ যুদ্ধে হত হয়েন।

১০।১৭৩ সূক্তে রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ইংলণ্ডেশ্বরের মস্তকে আর্ক বিসপ মুকুট অর্পণ করিয়া অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন, সেইরূপ প্রাচীন ভারতে ঋষিগণ উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রাজার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

পূর্ব্বে রাজা অমাত্যবেষ্টিত হইয়া গজস্কন্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪।৪।১) তাঁহাকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিবার কালে, বর্ম্ম দেবতা ধনুঃ ও জ্যার, সারথী ও অশ্বের স্তুতিসূচক মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাহার অঙ্গে বর্ম্ম; হস্তে ধনুঃ ও জ্যা প্রদান করা হইত। (৬।৭৫) সুতরাং যাঁহারা বলেন প্রাচীন ভারতে রাজার অস্তিত্ব ছিলনা, তাঁহাদের কথা কত দূর গ্রহণীয়, তাহা বিবেচ্য।

এইবার আমরা দুই একটি সামাজিক প্রথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।—

চির কুমারী।

প্রাচীন কালে অনেক কন্যা এদেশে চির কুমারী থাকিতেন। তাঁহারা পিতৃধনের অধিকারিণী হইতেন। ঋগ্বেদে এরূপ প্রমান পাওয়া যায়; যথা;—

অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদাসদসম্ভামিয়েভ্যাং।

কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভরদদ্ধি ভাগং তন্বোহ যেন মামহং ॥

সায়ণভাষ্যের অনুযায়ী ইহার অনুবাদ এইরূপ।—

"হে ইন্দ্র পতি-অভিমানী হইয়া যাবজ্জীবন পিতা-মাতার সহিত অবহিতা, পিতামাতার শুশ্রূষাপরায়ণা দুহিতা যেমন পিতৃগৃহের ধনভাগ প্রার্থনা করে ইত্যাদি।—

স্বামীরমৃত্যুর পর, বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়া অবস্থান করিতেন, মনুর এই নীতি প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়না। ১০।১৮।৮ শ্মশানগামিনী বিধবার প্রতি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রথ (Roth) বলেন ঋগ্বেদের সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিতেন। রামায়ণ যুগেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তখন ইহা অনার্য্যদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

বিধবা বিবাহ।

ভারতবর্ষে চিরদিনই বহুপত্নীকতা প্রচলিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদেও বহুপত্নীকতায় যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূত্রকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে গমন কালে পথিপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন এবং তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া যাইয়া, দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। আবার এই কক্ষীবান্ যখন বৃদ্ধ হয়েন, তখন ইন্দ্র বৃচা নামে এক যুবতীকে ইঁহার হস্তে দান করেন। বেদে লিখিত আছে।—

বহুপত্নীকতা।

"যদেকস্মিন যুপে দ্বে রশনে পরিব্যচতি তস্মদেকো জায়ে বিন্দেত"—অর্থাৎ যেমন যজ্ঞ কালে এক যুগে দুই রজ্জু বেষ্টন করা হয়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিজ্ঞান ও হিন্দুব্যবস্থা।

কোনও কার্য্য করা অন্যায় বিবেচিত হইলে, তৎসম্বন্ধে শিশুদিগের ভীতি উৎপাদন করাই অধিকাংশ স্থলে ন্যায্য হয়। কিন্তু সেই শিশু যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাহাকে সামান্য ভাবে নিষেধ করিলেই সম্যক ফল পাওয়া যায়। আবার, সেই যুবক প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তখন তাহাকে তৎকর্ম্মের দোষ দর্শাইলেই যথেষ্ট হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তিসম্বন্ধে শিশুকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া তবে শিশুকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা সম্ভবপর হয়; যৌবনের উন্মেষকালে, অসাবধানতার সহিত সংযোগ সম্বন্ধে নিষেধই যথেষ্ট, এবং প্রাপ্তযৌবন লোককে অগ্নিদাহের বিষমফল হৃদয়ঙ্গম করানই যৌক্তিক।

শিশুর পক্ষে যে নিয়ম খাটে, সমাজের শৈববাবস্থায়ও তাহাই খাটে। কোনও অতীতযুগে, হিন্দুসমাজ সমুন্নত হইয়া থাকিলেও, বৌদ্ধ ও মুসলমান-প্রভাব-কালে, হিন্দুসমাজের অবস্থা ক্ষুদ্র শিশুর মনোবৃত্তির সহিত তুলনীয়। শিশুর জন্মকালীন মনোবৃত্তি একেবারেই থাকে না। ক্রমশঃই পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। সমাজের এইরূপ মানসিক-শৈশবাস্থায় যে সকল অনুশাসন প্রবর্ত্তিত থাকে, তাহা বেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সমাজের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শোচনীয়।

হিন্দুর মরণ-অশৌচ গ্রহণের সময়ে, ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। অশুচি ব্যক্তি রজককে বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দিতে পারেন না। অশৌচকালে, আসনে ব্যতীত বসিতে নাই, ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ, মৃন্ময় পাত্র ব্যতীত অপর পাত্র অব্যবহার্য্য, নারিকেল পত্রের উত্তাপে সিদ্ধ হবিষ্যান্ন মাত্র ভক্ষ্য। যাঁহারা এই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আজ আমরা ভুলিয়া গিয়া, শুধু কর্ম্মের বোঝা এবং তৎসঙ্গে বোঝার "খুঁটি-নাটি" লইয়াই মহা ব্যস্ত। এমন কি, সেই সকল সঙ্কীর্ণ খুটি-নাটির উপরেই আমরা-উদার হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি বসাইতে চাহি।

যাঁহারা ইংরাজী জানেন, বা যে সকল বাঙ্গালা ভাষাবিৎ মহাশয়রা রীতিমত মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা "অ্যান্টি-সেপ্টিক" কথাটি শুনিয়াছেন। ঐ কথাটির অর্থ, "পচন-নিবারক।" এই কথাটি লইয়াই, আমাদের এক্ষণে কার্য্য, অতএব অতি সংক্ষেপে, এইটি সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলিয়া লই।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই নানা প্রকারের জীবাণু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহারা, জমী হইতে উর্দ্ধে আধক্রোশ, এবং জমির তলে ছয় সাত ফিট পর্য্যন্ত বিরাজ করে। তবে, জমী হইতে যত উর্দ্ধে বা নিম্নে যাওয়া যায়, ততই ইহারা সংখ্যায় ও ক্ষমতায় হীন হইয়া পড়ে। জীবাণুগণ সাধারণ চক্ষুর অগোচর; অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহারা অলক্ষ্য। এই সকল জীবাণু, সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—একশ্রেণীর জীবাণু রোগোৎপাদক। অপর-গুলি রোগের কারণ নহে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কতকগুলি জীবাণু পচন উৎপাদক। যদি কোথাও একটি পাত্রে অন্নে জল মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই অন্ন আর সুস্বাদু থাকে না, অম্লরসাত্মক হইয়া পড়ে; ক্রমশঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে তণ্ডুলের প্রত্যেক দানাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হইয়াছে; তাহার আরও কিছুকাল পরে দেখা যায় যে তণ্ডুলের কণাগুলি ক্রমশঃই ক্ষুদ্রতর আকার ও ভিন্নবর্ণাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে; কিছু দিন পরে আর তণ্ডুলের চিহ্নও বর্ত্তমান থাকে না—সকলই জলের মত তরল হইয়া গিয়াছে; আরও কিছু কাল পরে, সেই তরল পদার্থটির উৎসেচনা (fermentation) হইয়া বুদ্বুদ নির্গত হয়। ইহাই পচন ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত এবং ইহা পচনকারক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। এই পচন-কারক জীবাণু না থাকিলে আজ আবর্জ্জনায় পৃথিবী পরিপূরিত হইত, আজ জমীর সার হইত না। কিন্তু অপর যে কোনও বিধায়ে পচনকারক জীবাণুগুলি মানব জাতির পক্ষে হিতকর হইলেও, পচনকারক জীবাণুগুলি, পরোক্ষে মানবজাতির বিষম শত্রু। যেখানেই পচনক্রিয়া সংসাধিত হয়, সেই খানেই জলের ও উত্তাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে গলিত পদার্থ হইতে সার-নামক জীবাণুগণের ভোজ্যেরও সৃষ্টি হইতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, যে, যে স্থানে পচনক্রিয়া হয়, সেই স্থানেই রোগজীবাণুগণের নিমন্ত্রণ হয়। আবার যে স্থানে রোগজীবাণুগণের কার্য্য চলিতে থাকে, সেই স্থানেই পচনকারক জীবাণুগণের সমাদর। পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জীবাণু সম্বন্ধে কতক আভাস লাভ করা গেল। অধুনাতন চিকিৎসকমণ্ডলী জীবাণুগণকে অনেক রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই জীবাণুগণ বড়ই সংক্রামক। এই জীবাণুগণের রোগোৎপাদিকা শক্তির বাহ্য বিকাশ হইতে, সাধারণতঃ, দশ দিবস কাল লাগে। এই কথাগুলি যদি মনোযোগ সহকারে প্রণিধান করিয়া থাকেন, তবে পাঠক মহাশয় হিন্দুর অশৌচ-ব্যবস্থার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ, অশৌচের কাল অন্যূন দশ দিবস হইতে এক মাস কালাবধি। ব্রাহ্মণরা কি স্বার্থান্ধ হইয়া, নিজেদের পক্ষে, অশৌচের কাল দশ দিবসমাত্র নির্দ্দেশ করিলেন, এবং শূদ্রাদির জন্য এক মাস কাল স্থির করিলেন? আমার ধারণা যে, এই কালনির্দ্দেশ স্বার্থপরতাসম্ভূত নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যথার্থই অতি শুচি ভাবে থাকিতেন; সেরূপ পরিষ্কার ("Surgicallyclean" কতকটা) বর্ণের পক্ষে দশ দিনের quarantineই যথেষ্ট। কিন্তু যাবতীয় অপরিচ্ছন্ন জাতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। তাহাদের পক্ষে এক মাসের quarantine বা Segregation এর ব্যবস্থা করা কিছুই স্বাস্থ্যনিয়মবিগর্হিত কার্য্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, Rigid quarantine বা অতি সন্তর্পণের সহিত রোগ সংক্রামিত ব্যক্তিগণের স্বতন্ত্রীকরণই যদি মরণাশৌচের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায়, তবে ক্ষৌরকর্ম্মের নিষেধ, বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়া বা ভিক্ষাদেওয়ার নিষেধের কারণ অতি সহজেই বোধগম্য হয়। মৃণ্ময় পাত্রের মূল্য অতি সামান্য বিধায়. উচ্ছিষ্ট পাত্র অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য পাত্র ব্যবহার করিলে বা অপরের বিছানায় বসিলে, সংক্রামক রোগের বীজ অনায়াসে চতুর্দ্দিকে ছড়ান যাইতে পারে—বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই, মৃণ্ময় পাত্রের ও স্বতন্ত্র আসন ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই পরিধেয় ও অতি যৎসামান্য বস্ত্র ও উত্তরীয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং শয়নের জন্য কম্বল প্রভৃতি স্বতন্ত্র শয্যাব ব্যবস্থা হইয়াছে।

আহার্য্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, হবিষ্যান্ন বিজ্ঞানসম্মত Complete food. মটর ডালে ও দুগ্ধে অপর্য্যাপ্ত প্রোটীড্ বা অণ্ডলাল জাতীয় পদার্থ আছে; আতপতণ্ডুলে ফলমূলে ও কদলীতে যথেষ্ট শ্বেতসার আছে; এবং আতপ চাউলের সহিত অনেক পরিমাণে ঘৃত বেশ সহ্য হয়। অন্যান্য সময়ে কয়লা বা কাঠের জ্বালে অন্ন সিদ্ধ করিবার কোনও অন্তর; নাই; কিন্তু হবিষ্যান্ন পাককালে নারিকেল বা তাল পত্রের অগ্নির প্রয়োজন। এত প্রকারের ইন্ধন থাকিতে তাল পত্রের অগ্নির ব্যবস্থা করা হইল, বলা বড় শক্ত। বোধ হয়, তাল পত্রের অগ্নির উত্তাপ তাদৃশ প্রখর নহে অর্থাৎ, হয় ত তাল পত্রে রাঁধিলে, অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে অন্ন সিদ্ধ হইতে থাকে। আজকাল থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক চুল্লির উত্তাপ বুঝিতে পারা যায়; তখনকার কালে, ঘুঁটার অগ্নি, তাল পত্রের অগ্নি প্রভৃতি নানারূপে ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপ সৃষ্টিকারী ইন্ধনের ব্যবস্থা ছিল।

হবিষ্যান্ন যে সুধু চিকিৎসা-সম্মত সম্পূর্ণ খাদ্য, তাঁহা নহে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণ-প্রপীড়িত বঙ্গদেশের পক্ষে হবিষ্যান্ন একটি পরম উপাদেয় খাদ্য। আমি অনেক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগীর রোগ মাত্র ঐ হবিষ্যান্নের সাহায্যে আরোগ্য করিয়াছি। সাত্বিক আহার, ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষে উৎকৃষ্ট আহার, এবং পরিপাক করার পক্ষে সুপাচ্য আহার—অতএব হবিষ্যান্ন যে ব্যবস্থিত হইবে তাহার বিচিত্রতা কি?

অশৌচান্ত করিবার কালে ক্ষৌরি করিয়া, বস্ত্রত্যাগ করিয়া, স্নান করিয়া, হোম (শ্রাদ্ধ) করিয়া, তবে হিন্দু শুচি হয়েন। এই সকল গুলিরই উদ্দেশ্য quarantine এর উদ্দেশ্যের সমান।

কিন্তু কতক বিষয়ে, হিন্দুদের ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। শোক বা দীনতা জ্ঞাপন করিবার জন্য নগ্ন পদ হওয়া যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, যে শাস্ত্রের মূল মন্ত্র "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" সেই শাস্ত্রকারেরা নগ্ন পদে ভ্রমণের বিপদ কি জানিতে পারেন নাই? যদি জানিয়া থাকেন, তবে কেন তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন? বোধ হয় যাঁহারা আজন্মকাল নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের পদতলের চর্ম্ম এরূপ স্থুল ও কঠিন হয় যে তাঁহাদের পক্ষে নগ্নপদে বিচরণ করায় দোষ হয় না।

তৈলাভ্যঙ্গের নিষেধও বিজ্ঞান অনুমোদিত। তৈলাক্তগাত্রে জীবাণু সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যদি ঘৃত ভোজনে বাধা না থাকে, তবে তৈলাভ্যঙ্গের নিষেধের কোনও যৌক্তিক হেতু থাকিতে পারে না।

হিন্দুরা যে অতীব সুসভ্য জাতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ আমরা মনোবৃত্তি সম্বন্ধে শিশু আছি বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসন ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলি; কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা বেশ বুঝিবেন যে কি দূরদর্শিতা, কি স্বাস্থ্যশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা, কি অমূল্য ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক কথায়, বিজ্ঞানের দোহাই দিই—কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রে, বর্ণে বর্ণে বিজ্ঞানের আভাস আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

অলবেরুণীর ভারত-বিবরণ।
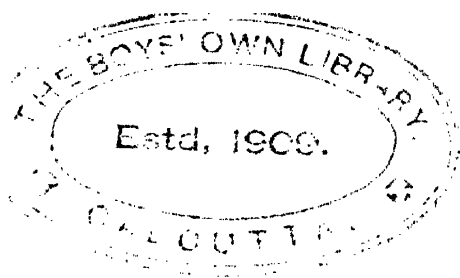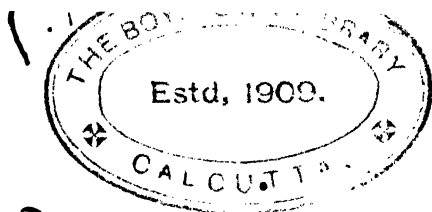
অলবেরুণী তাঁহার ভারত-বিবরণ-বিষয়ক গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচারব্যবহারসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই সকল আচারব্যবহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। আমরা নিম্নে তাঁহার মত লিপিবদ্ধ করিলাম।

যদি কোন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে (সম্পন্ন হয়) এবং তাহা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ অতি বিরল হয়, তাহা হইলে আমরা সেই ঘটনাকে আশ্চর্য্যজনক বলিতে পারি। যদি এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হয় তবে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক এমন কি অলৌকিক বলিয়া গণ্য হয়; কারণ, তাহা আর প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা পরিচালিত হয় না এবং যতক্ষণ অপ্রত্যক্ষীভূত থাকে ততক্ষণ কল্পনাসৃষ্টরূপে গৃহীত হয়। অলবেরুণী বলিয়াছেন যে, অনেক হিন্দু আচার তাঁহাদের দেশের আচার হইতে এত বিভিন্ন যে, সেগুলি তাঁহাদের নিকট ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদিগের আচার দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহাদের (মুসলমানদিগের) নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া বিপরীত নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন; কারণ তাঁহাদের আচারব্যবহারের সহিত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের কোন সৌসাদৃশ্য নাই এবং একের আচারব্যবহার অপরের আচারব্যবহারের বিপরীত। যদি কখনও তাঁহাদের রীতিনীতির সহিত হিন্দুদিগের রীতিনীতির কোন সাদৃশ্য থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার ঠিক বিপরীত অর্থ আছে বুঝিতে হইবে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অলবেরুণী হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের নিম্নলিখিত মত বর্ণনা করিয়াছেন।

হিন্দুগণ তাহাদের শরীরের কেশ কর্ত্তন করে না। পুরাকালে উত্তাপহেতু তাহারা নগ্নাবস্থায় থাকিত এবং সর্দ্দিগর্ম্মি নিবারণ করিবার জন্য মস্তকের কেশ অকর্ত্তিত রাখিত।

আলস্যপরায়ণ হইয়া তাহারা দীর্ঘ নখ রাখিত; কারণ, তাহারা সেগুলিকে কোন কার্য্যে ব্যবহার করিত না, কেবল তাহাদের সুখপ্রদ কর্ম্মহীন জীবনে সেগুলির দ্বারা মস্তক চুলকাইত এবং উকুন অন্বেষণজন্য চুল পরীক্ষা করিত।

হিন্দুগণ নিঃসঙ্গে একে একে গোময়লিপ্ত আস্তরণের (গোময় লপ্ত ভূমির)

উপর আহার করে। তাহারা ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য ব্যবহার করে না এবং যে পাত্রে ভক্ষণ করে তাহা মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলে ফেলিয়া দেয়।

তাহাদের দন্তগুলি পান গুপারি খড়ি (চূণ) ও খদির চর্ব্বণহেতু রক্তবর্ণ থাকে।

আহার করিবার পূর্ব্বে তাহারা মদ্যপান করিয়া তৎপরে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। * * * তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না।

তাহারা পাগড়ী ব্যবহার করে। তাহারা সামান্য পোষাকে সন্তুষ্ট, তাহারা দুই আঙ্গুল চওড়া ন্যাকড়া পরিধান করে এবং দুইটি সূত্রদ্বারা উহা কোমরের পশ্চাদ্ভাগে বদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু যাঁহারা বহু পরিচ্ছদ পছন্দ করেন তাঁহারা পাজামা ব্যবহার করেন। যে দড়ির দ্বারা ইহা বাঁধা হয় তাহা পশ্চাতে থাকে। তাহাদের 'সিদার' (মস্তক, বক্ষের উপরিভাগ এবং গলদেশ আচ্ছাদিত করিবার জন্য এক প্রকার পোষাক) পা'জামারই ন্যায় পশ্চাদ্দিকে বোতামদ্বারা বাঁধা থাকে।

তাহাদের কুর্ত্তাকারের (কোর্ত্তা, গ্রীবযুক্ত স্কন্ধদেশ হইতে শরীরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত খাটো সার্ট, ইহা একটি মেয়েলী পোষাক) ভাঁজে ভাঁজে দক্ষিণ ও বাম উভয় দিকে লেস আছে।

প্রক্ষালণ করিবার সময় তাহারা পা হইতে আরম্ভ করে এবং পরে মুখ ধৌত করে।

পর্ব্বদিনে সুগন্ধিদ্রব্যের পরিবর্ত্তে তাহারা গোময়দ্বারা শরীর লেপন করে।

পুরুষগণ মেয়েলী পরিচ্ছদের জিনিসগুলি ব্যবহার করে। তাহারা কর্ণাভরণ ও হস্তে বলয় পরিধান করে এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করে।

গদী ব্যতীত তাহারা অশ্বারোহণ করে কিন্তু গদী থাকিলে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরোহণ করিয়া থাকে। তাহারা অশ্বে ভ্রমণকালে পশ্চাতে কাহাকেও লইতে ভালবাসে।

তাহারা কটীদেশের দক্ষিণ ভাগে কুঠার দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে এবং যজ্ঞোপবীত নামীয় বন্ধনী পরিধান করে। উহা বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কোমর পর্য্যন্ত লম্বমান।

পরামর্শকালে ও বিপদের সময় হিন্দুগণ স্ত্রীলোকদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে হিন্দুগণ পুত্রের প্রতি বিশেষ মনযোগ প্রদর্শন করে ; কিন্তু কন্যার প্রতি করে না। সন্তানের মধ্যে তাহারা, বিশেষতঃ দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকরা, পুত্রকে অধিক আদর করে।

করমর্দ্দনের সময় তাহারা হস্তের পশ্চাদ্দিক ধারণ করে।

হিন্দুগণ গৃহ প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা করে না, কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ-কালে অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

সভাসমিতিতে তাহারা এড়োএড়ি ভাবে পা রাখিয়া উপবেশন করে। তাহারা উপস্থিত গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন না করিয়া নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে ও নাসিকা ঝাড়ে।

তাহারা তন্তুবায়দিগকে অপবিত্র মনে করে, কিন্তু যে চর্ম্মকারগণ অর্থের জন্য মরণোন্মুখ জন্তুদিগকে জলে নিমগ্ন করিয়া অথবা দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করে—তাহাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করে।

বিদ্যালয়ে বালকদিগের জন্য কৃষ্ণবর্ণ লিখিবার পাত্র ব্যবহৃত হয় এবং তাহার উপর বালকগণ এক প্রকার শাদা পদার্থ দ্বারা লিখিয়া যায়। তাহারা পুস্তকের নাম শেষে লিখে—প্রথমে নহে।

অলবেরুণী তৎপরে হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত "বিকৃত-স্বভাবের" কথার আলোচনা করিয়াছেন। অলবেরুণী বলিয়াছেন যে, মুসলমানাধিকৃত প্রদেশে সদ্য আগত এমন একটিও হিন্দু বালককে তিনি দেখেন নাই যে অধিবাসীদিগের আচারব্যবহারসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ নহে ; কিন্তু তথাপি গুরুর সম্মুখে পাদুকাস্থাপনের সময় সে উল্টা পাল্টা করিয়া রাখে—বাম পদের সম্মুখে দক্ষিণ পদের ও দক্ষিণ পদের সম্মুখে বামপদের জুতা রক্ষা করিয়া থাকে। গুরুর পরিচ্ছদ ভাঁজ করিয়া রাখিবার সময় সে ভিতর দিকটা বাহির করিয়া রাখে এবং গালিচা এরূপভাবে বিস্তৃত করে যে, নিম্নভাগটা উপরের দিকে রক্ষিত হয়। এইরূপ অন্যান্য কার্য্যও সে করিয়া থাকে। এ সমস্তই হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত "বিকৃত স্বভাবের" পরিচায়ক। অলবেরুণী বলেন যে, শুধু যে হিন্দুগণের এইরূপ স্বভাব তাহা নহে ; পরন্তু অসভ্য আরবদিগের মধ্যেও এইরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয়।

অলবেরুণী মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কালে মৃতদেহ নগ্নাবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে বাতাসে নিক্ষিপ্ত হইত। রুগ্ন ব্যক্তিগণও প্রান্তরে এবং পর্ব্বতে নীত হইয়া তথায় পরিত্যক্ত

হইত। তথায় রুগ্নের জীবলীলার অবসান হইলে উপরের উল্লিখিত অবস্থা ঘটিত; আরোগ্যলাভ করিলে তাহারা বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

এই সময়ে একজন বিধান-কর্ত্তার অবির্ভাব হইল। তিনি লোকসমূহকে মৃতদেহ বাতাসে রক্ষা করিতে অদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহারা এরূপ রেলিং ও ছাদযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল যে, মৃতদেহের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতে পারে। ইহা সূর্য্যোপাসকদিগের (জোরাষ্ট্রিয়ানদের) সমাধিচূড়ার অনুরূপ

এই আচার বহুদিন পালিত হওয়ার পর নারায়ণ মৃতদেহ অগ্নিতে সমর্পণ করিবার বিধান দিলেন। সেই অবধি যাহাতে মৃতদেহের কোন অবশেষ না থাকে এবং সমস্ত আবর্জ্জনা, ময়লা ও গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত ও তাহার সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায় সেইজন্য তাহারা শবদাহ করিয়া আসিতেছে।

আধুনিক কালে শ্লাভনিয়ানগণও তাহাদের মৃতদেহ দাহ করে, যেমন প্রাচীন গ্রীকগণ শবদাহ ও কবর দেওয়া উভয় প্রথাই পালন করিতেন। এই স্থলে অলবেরুণী সক্রেটীস, গ্যালেনাস প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গ্রীকদিগের মধ্যে শবদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই প্রথা সমাজের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ ছিল।

অলবেরুণী তৎপরে সূর্য্যরশ্মি ও অগ্নিই যে হিন্দুগণের ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত হইবার সরল পথ বলিয়া বিবেচিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অবিনশ্বর আত্মার ঈশ্বর সমীপে প্রত্যাগমনসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা এই যে, ইহা কতকটা সূর্য্যরশ্মির দ্বারা (আত্মা সূর্য্যরশ্মির সহিত যুক্ত হইয়া তৎসহ আরোহণ করে) ও কতকটা অগ্নির স্ফুলিঙ্গদ্বারা (কারণ ইহা আত্মাকে ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত করে) সম্পাদিত হয়। কোন কোন হিন্দু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি তাঁহার নিকট যাইবার পথ যেন খুব সরল করিয়া দেন।

জলমগ্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে গাজ তুরস্কদিগের ব্যবহারও ইহার অনুরূপ। কারণ, তাহারা মৃতদেহ নদীতে একটি শবাধারে রক্ষিত করে এবং একগাছি রজ্জু তাহার পদ হইতে ঝুলাইয়া তাহার প্রান্তভাগ জলে নিক্ষেপ করে; এই রজ্জুর সাহায্যে মৃত ব্যক্তির আত্মা আপনাকে মুক্তির জন্য উন্নীত করে।

এ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিশ্বাস বাসুদেবের উক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। অনুরূপ মত মানীর নিম্নলিখিত বচনদ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। "অন্যান্য

ধর্ম্মসম্প্রদায় আমাদিগকে নিন্দা করে; কারণ, আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা ও তাঁহাদের মূর্ত্তিগঠন করি। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে। তাহারা জানে না যে, সূর্য্য ও চন্দ্রই আমাদের পথ, আমাদের দ্বার, যাহার দ্বারা আমরা আমাদের স্বর্গে যাত্রা করিতে পারি।"

লোকে বলে যে, বুদ্ধ মৃতদেহ স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহার শিষ্য শ্রমণগণ তাহাদের মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করে।

হিন্দুগণের মতে উত্তরাধিকারিগণের উপর মৃতদেহের দাবী আছে। তদ্ধেতু তাহাদিগকে মৃতদেহ ধৌত করিতে, সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা লেপন করিতে, বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে এবং পরে সাধ্যানুসারে চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ও অন্যান্য কাষ্ঠদ্বারা শব দাহ করিতে হয়। দগ্ধাস্থির কিয়দংশ গঙ্গায় নীত হইয়া এরূপ ভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যাহাতে গঙ্গা উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে। গঙ্গা এইরূপে সগরের সন্তানগণের দগ্ধাস্থির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ও তাহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে উন্নীত করিয়াছিল। ভস্ম কোনও স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। যে স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেই স্থানে তাহারা একটি স্মরণচিহ্ন স্থাপন করে। তিন বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগের শরীর দাহ করা হয় না।

যাহারা মৃতদেহসম্বন্ধে এই সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করে তাহারা তৎপরে আপনাদিগকে ও তাহাদের বস্ত্রসমূহ দুই দিন ধৌত করে; কারণ, তাহারা মৃতদেহ স্পর্শজন্য অপবিত্র হয়।

যাহারা মৃতদেহ দাহ করিতে অসমর্থ হয় তাহারা উহা কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা কোন স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষিপ্ত করে।

বিধবাগণের যাহারা স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমনে ইচ্ছুক অথবা যে সকল ব্যক্তি জীবনে নিরাশ হইয়াছে, যাহারা শরীরের কোনরূপ অনারোগ্য ব্যাধি, স্থায়ী শারীরিক বিকৃতি বা জরাদ্বারা ক্লিষ্ট, তাহাদের শরীর ব্যতিত অপর কোন জীবিত ব্যক্তির দেহ দাহন করার কল্পনাও হিন্দুগণ করিতে পারে না। ইহা কোনও সম্মানার্হ ব্যক্তি সম্পাদন করেন না; কেবল বৈশ্য ও শূদ্রগণ করে।

আত্মশরীর দাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ নিয়মদ্বারা নিষিদ্ধ। সেই হেতু ইহারা যদি আত্মহত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে তাহা হইলে

বিস্ময়কর উপায় অবলম্বন করে। তাহারা কোন ব্যক্তিকে তাহাদিগকে গঙ্গায় মগ্ন করিয়া মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত জলের নীচে রাখিবার জন্য নিযুক্ত করে (ভাড়া করে)।

অলবেরুণী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আত্মহত্যা করিবার অন্যবিধ উপায়েরও বর্ণনা করিয়াছেন।

যমুনা ও গঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে বটজাতীয় "প্রয়াগ" নামে একটি বৃক্ষ আছে, এই জাতীয় বৃক্ষের বিশেষত্ব এই যে, ইহার শাখাগুলি দুই প্রকার প্রশাখা বিস্তার করে—কতকগুলি উর্দ্ধদিকে অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় প্রসারিত হয় এবং কতকগুলি শিকড়ের ন্যায় নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়; শেষোক্ত গুলি পত্রহীন। যদি এই প্রকারের কোন প্রশাখা মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে যে শাখা হইতে উহার উৎপত্তি সেই শাখা ধারণ করিবার স্তম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতি এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই করিয়াছেন; কারণ, এই বৃক্ষের শাখাগুলি অতি বিশাল। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া আত্ম-হত্যা করিয়া থাকে।

প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। জোহানেস গ্র্যামাটিকাস বলিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীসে কতকগুলি লোক (যাহাদিগকে তিনি ভূত প্রেতের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) নিজ অঙ্গে তরবারিদ্বারা আঘাত করিয়া ও তদ্ধেতু কোন প্রকার কষ্টানুভব না করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিত।

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল।

চন্দ্রবংশ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ ৫—১৫ অধ্যায়।)

১। সোম
|
২। বুধ
|
৩। পুরূরবস্
|
৪। আয়ুস্, ধীমৎ, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুস্, শ্রুতায়ুস্

(অমাবসু →)
ভীম ৫
|
কাঞ্চন ৬
|
সুহোত্র ৭
|
জহ্নু ৮
|
সুজন্তু ৯
|
অজক ১০
|
বলাকাশ্ব ১১
|
কুশ ১২
|
১৩ কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয, অমাবসু,
|
গাধি ১৪
|
১৫ বিশ্বামিত্র, সত্যবতী (কন্যা,)

(আয়ুস্ →)
৫। নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি, অনেনস্,

৬। যযাতি, (নহুষ →) সুনহোত্র, (ক্ষত্রবৃদ্ধ →)

৭। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, পুরু, (যযাতি →) কাশ, লেশ, গৃৎসমদ, (সুনহোত্র →)

৮। কাশিরাজ (কাশ →) শৌনক (গৃৎসমদ →)
|
৯। দীর্ঘতমস্
|

১০। ধন্বন্তরি
|
১১। কেতুমৎ
|
১২। ভীমরথ
|
১৩। দিবোদাস
|
১৪। প্রতর্দ্দন
|
১৫। বৎস বা ঋতধ্বজ
|
১৬। অলর্ক
|
১৭। সন্নতি
|
১৮। সুনীথ
|
১৯ সুকেতু
|
২০। ধর্ম্মকেতু
|
২১। সত্যকেতু
|
২২। বিভু
|
২৩। সুবিভু
|
২৪। সুকুমার
|
২৫। ধৃষ্টকেতু
|
২৬। বৈনহোত্র
|
২৭। ভার্গ
|
২৮। ভার্গভু

বুধের ঔরসে পুরুরবার জন্ম সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পটি এই ;—বিবস্বৎপুত্র মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণদ্বারা একটি যজ্ঞ করান। যজ্ঞ কোন মতে পণ্ড হওয়ায় যজ্ঞফলে পুত্র না হইয়া মনুর এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। কন্যার নাম রাখা হইল ইলা। কিন্তু মিত্রাবরুণ মন্ত্রবলে কন্যাটিকে পুত্র করিয়া দিলেন ; তখন তাহার নাম হইল সুদ্যুম্ন। সুদ্যুম্ন এক সময়ে হিমালয়ের জঙ্গলে শীকার করিতে গিয়া জঙ্গলের এমন এক

স্থানে একাকী উপস্থিত হইয়া পড়েন যে, সেস্থানে যাইলে মহাদেবকৃত নিয়ম অনুসারে পুরুষকে স্ত্রী লইয়া যাইতে হয়। তাঁহাকেও তাহাই হইতে হইল। সুদ্যুম্ন যে স্ত্রীজাতি ছিলেন আবার তাহাই হইলেন। ইত্যবসরে বুধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও ক্রমে তিনি সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্ব পরিণয়ে পরিণীত হইয়া পুরুরবা নামক পুত্রোৎপাদন করেন। পুরুরবার পর সুদ্যুম্নকে আর গর্ভধারণ করিতে হয় নাই। মনুর অনুরোধে ঋষিগণ মিলিয়া যজ্ঞ-পুরুষের নিকট আবেদন করেন; তাহাতে বুধপত্নীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সুদ্যুম্ন পুনরায় পুরুষ হয়েন ও তাঁহার উৎকল, গয় ও বিনত নামে তিন পুত্র হয়। সুদ্যুম্ন মূলতঃ মনুর কন্যা বলিয়া পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই; তবে পিতা কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠান নামক নগরী তাঁহাকে প্রদান করেন। সুদ্যুম্ন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুত্র পুরুরবাকে আবার তাহা দিয়া দেন। নহুষের ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্রের বংশে এই কয়জন রাজার নাম পাওয়া যায় ও ইহারা "কাশ্যপ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

পুরুরবার তৃতীয় পুত্র অমাবসুর অধস্তন অষ্টম নৃপতি জহ্নুই গঙ্গাকে উদরসাৎ ও পুনরুদ্গীরণ করেন। তদবধি গঙ্গার অপর একটি নাম জাহ্নবী।

এই ধারাতেই প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্রের জন্ম। ইনি ব্রাহ্মণ হওয়ায় ইঁহার ধারা ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। ইঁহার ভগিনী সত্যবতী ভৃগুবংশীয় সচীকের পত্নী ছিলেন।

অমাবসুর জ্যেষ্ঠ আয়ু রাহুর কন্যাকে বিবাহ করেন ও নহুষ প্রভৃতি পাঁচ সহোদর সেই রাহুকন্যারই গর্ভজাত।

নহুষের যযাতি ব্যতীত আরও পাঁচটি পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম যতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি। যতি জ্যেষ্ঠ, সংযাতি তৃতীয়, যযাতি ছিলেন দ্বিতীয়।

সুনহোত্রের তৃতীয় পুত্র গৃৎসমদের পুত্র শৌনকই নাকি চাতুর্বর্ণ্য সমাজের সৃষ্টি করেন।

সুনহোত্রবংশীয় ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন।

এই বংশীয় প্রতর্দ্দন ভদ্রশ্রেণ্য নামক একটি তাঁহার শত্রুস্থানীয় জাতিকে নির্ম্মূল করেন ও তাহা হইতেই—শত্রুজিৎ নাম পায়েন। তাঁহার পুত্র বৎস বা ঋতধ্বজ কুবলয় নামক অশ্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত।

এই বংশের শেষরাজা ভার্গভূও চাতুর্বর্ণ্য সমাজের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

চন্দ্রবংশে যদুবংশ।

৭। যদু
|
৮। সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল, রঘু
|
৯। বৃজিনীবৎ
|
১০। স্বাহি
|
১১। রুষদ্রু
|
১২। চিত্ররথ
|
১৩। শশবিন্দু
|
১৪। পৃথুযশস্, পৃথুকর্ম্মন্, পৃথুজয়, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুদান, পৃথুশ্রবস
|
১৫। তমস্
|
১৬। উশনস্
|
১৭। শিতেয়ু
|
১৮। রুক্মকবচ
|
১৯। পরাবৃৎ
|
২০। রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত, হারিত
|
২১। বিদর্ভ
|
২২। ক্রথ, কৌশিক, রোমপাদ
|
২৩। কুন্তি চেদি বভ্রু
|
২৪। বৃষ্ণি ধৃতি
|
২৫। নির্বৃতি
|
২৬। দশার্হ

২৭। ব্যোমন্

২৮। জীমূত

২৯। বংশকৃতি

৩০। ভীমরথ

৩১। নবরথ

৩২। দশরথ

৩৩। শকুনি

৩৪। করন্তি

৩৫। দেবরাত

৩৬। দেবক্ষেত্র

৩৭। মধু

৩৮। অনবরথ

৩৯। কুরুবৎস

৪০। অনুরথ

৪১। পুরুহোত্র

৪২। অংশ

৪৩। সত্বত

৪৪। ভজিম, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ * বৃষ্ণি

৪৫। বিদূরথ, নিমি, বৃকণ, বৃষ্ণি, শত্রাজিৎ, সহস্রজিৎ, অযুতাজিৎ (অপর পত্নী গর্ভে)

৪৬। শূর

৪৭। শমিন্

৪৮। প্রতিক্ষত্র

* মহাভোজের ধারার নাম মার্ত্তিকবতভোজ; ইঁহাদের রাজধানী মৃত্তিকবাতের নামানুসারে ইঁহাদিগের এই নাম।

৪৯। স্বয়ংভোজ
|
৫০। হৃদিক
|
৫১। কৃতবর্ম্মন্, শতধনু, দেবমীঢ়ুষ
|
৫২। শূর
|
৫৩। বসুদেব
|
৫৪। বলভদ্র, কৃষ্ণ
|
৫৫। প্রদ্যুম্ন
|
৫৬। অনিরুদ্ধ
|
৫৭। বজ্র
|
৫৮। প্রতিবাহু
|
৫৯। সুচারু

ভজমানের (৪৪) ভ্রাতা অন্ধকের পুত্র
কুকুর, ভজমান, শুচিকল, বর্হিষ
|
ধৃষ্ট
|
কপোতরোমন্
|
বিলোমন্
|
ভবসংজ্ঞ (বা চন্দলোদক দুন্দুভি)
|
অভিজিৎ
|
পুনর্বসু
|
দেবক, উগ্রসেন
|
দেববৎ, উপদেব, সুদেব, দেবরক্ষিত

বসুদেবের আরও নয়জন সহোদর ছিলেন তাঁহাদের নাম দেবভাগ, দেবশ্রবস্, অনাধৃষ্টি, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ।

তাঁহার ভগিনীও ছিলেন পাঁচটি। তাঁহাদের নাম পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, ও রাজদেবী। বসুদেবের পিতা শূর পৃথাকে কুন্তিভোজ নামক তাঁহার এক বন্ধু রাজাকে দত্তক কন্যারূপে প্রদান করেন। পাণ্ডুর সহিত এই পৃথারই বিবাহ হয়। অর্জ্জুন প্রভৃতি ইঁহার সন্তান। শ্রুতকীর্ত্তির পুত্র শিশুপাল ও শ্রুতদেবার পুত্র দন্তবক্র। ইঁহারা সম্বন্ধে কৃষ্ণের পিস্তুতো ভাই।

বসুদেবের অনেক পত্নী। তাঁহাদের মধ্যে পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা, বৈশাখী ও দেবকী এই ছয় জনই প্রধানা। রোহিণীর গর্ব্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্ম্মদ, ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, ও দুর্গমসুত এই সাত; মদিরার গর্ব্ভে নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক এই তিন; ভদ্রার গর্ব্ভে উপনিধি ও গদ এই দুই; বৈশালীর গর্ব্ভে কৌশিক ও দেবকীর গর্ব্ভে কৃষ্ণ বসুদেবের এই চতুর্দ্দশ পুত্র। দেবকীর গর্ভে বসুদেবের আরও ছয়টি পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের নাম সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋতুদাস, ভদ্র ও দেহ। ইহারা কংসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে বসুদেবের সুভদ্রানাম্নী কোন কন্যার উল্লেখ দেখিলাম না।

বসুদেবের আর এক নাম আনকদুন্দুভি। বিষ্ণু ইহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন বলিয়া বসুদেবের ভূমিষ্ঠ হওনকালে স্বর্গে দেবতারা তাঁহাদের আনক দুন্দুভি বাজাইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন তাই বসুদেবের নাম, আনকদুন্দুভি।

দেবকের চারি পুত্র ব্যতীত বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, মহাদেবা ও দেবকী এই সাত কন্যা। এই সাতটিই বসুদেবের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এই দেবকীই কৃষ্ণের মাতা।

দেবকের ভ্রাতা উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধপাল, যুদ্ধমুষ্টি, তুষ্টিমৎ এই দশ পুত্র ও কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা এ৹ পাঁচ কন্যা। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে মাতুল ও মাসী।

বলভদ্রের দুই পুত্র; নাম নিশঠ ও উলমুক। বলভদ্রসহোদর শারণের মার্ষ্টি, মার্ষ্টিমৎ, শিশু ও সত্যধৃতি এই চার পুত্র।

অক্রূর, অদ্রাজিৎ, সাত্যকি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ ভজমানের ভ্রাতা দেবাবৃধের সন্তান। মূলতঃ ইঁহারাও যদুবংশীয়।
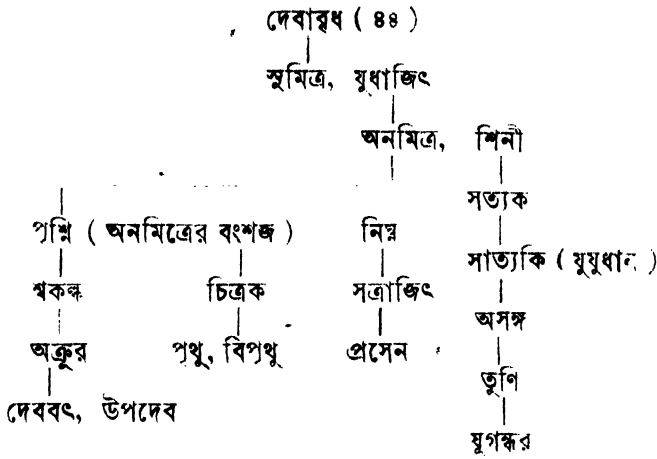
শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

অদৃষ্ট-চক্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভূতি।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারে নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। নদীর পাহাড়ে ভাঙ্গন ধরিলে যেমন ধ্বংশনিবারণ অসম্ভব—সংসারে ভাঙ্গন ধরিলেও তেমনই ধ্বংশনিবারণ অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া শেষে যাহা রক্ষা করা সম্ভব তাহাই রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। দেবীচরণ এফ, এ, পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইল সে সংবাদ প্রকাশিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন দেবীচরণকে ডাকিয়া তাহাকে সংসারের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। দেবীচরণ পিতার কথা শুনিল। তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমি মরিলেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর আমারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তোমার বড়দাদা যে তোমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিবেন না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। রাধাচরণও গৃহে থাকিবে না। রহিল এক পার্ব্বতীচরণ। আমাদের যে সমস্ত

শিষ্য আছেন, তাঁহাদের দেখিতেই পার্ব্বতীচরণের সময় কাটিয়া যাইবে। গৃহে কে থাকিবে? অথচ না দেখিলে গৃহ ও যে সামান্য সম্পত্তি আছে, তাহার কিছুই থাকিবে না। শুধু তাহাই নহে। গৃহে একজন না থাকিলে চলিবে না। গৃহে তোমার কাকিমা উন্মাদিনী, এক ভগিনী বিধবা, আর একজন—।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ইহাদের জন্যই আমার ভাবনা। ভগবান আমাকে যে দুঃখ দিয়াছেন, আমি আপনি সব সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর কে এই সংসারের ভার বহিবে; কে ইহাদের ভাবনা ভাবিবে? সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়াছি।"

দেবীচরণ বলিল, "আপনি আমাকে যে আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।"

"তোমাদের অন্নকষ্ট নাই। যদি বুঝিয়া চলিতে পার, দুই পুরুষ অন্নকষ্ট ভোগ করিবে না। তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা আমি একরূপ করিয়া যাইব। কিন্তু সংসারের কি হইবে? দিন কাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে বি, এ, এম্, এ, পাশ করিলেই উপার্জ্জনের পথ মুক্ত হয় না। আমার ইচ্ছা তুমি গৃহে আসিয়া বাস কর।"

"আপনি অনুমতি করিলে আমি তাহাই করিব।"

"আমার শরীর আর বহিতেছে না। এখন পার্ব্বতীচরণই যজমান রাখুক। আমি তাহাকে সে কায শিখাইয়াছি। তুমি সংসারের ভার বহিতে শিখ। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি, তোমাকে সে কায শিখাইব। সব কাযই শিক্ষাসাপেক্ষ। তবে যতদিন আমি আছি, ততদিন তুমি অন্য কাযও করিতে পারিবে। গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে। তুমি এখন সে কায করিতে পার।"

দেবীচরণ আর কোন কথা বলিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেষ্টায় দেবীচরণ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য পাইল।

এ ব্যবস্থায় বামাচরণ বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিল। সে তাহার পত্নীকে বলিল, "দেখিতেছি বুড়া হইয়া বাবার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। ছেলেদের লিখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার যত্নের অবধি ছিল না; আর তিনি অনায়াসে দেবীকে বাড়ীতে বসাইয়া রাখিলেন!"

বড় বধূ বলিলেন, "আমার গতজন্মের পুণ্য ছিল, তাই তুমি তারাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলে। মেজ বৌ তখন কত কথা বলিয়াছিল। আমিও বলিয়াছিলাম,—আখেরে কি হইবে? আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।"

বামাচরণ বলিল, "বাবা কি ভাবিতেছেন? পার্ব্বতীকে যজমানের কাযে রাখিয়াছেন; তাহাই যথেষ্ট। আবার দেবীর 'পরকাল' নষ্ট করা কেন?"

বড় বধূ অধর উল্টাইয়া বলিলেন, "কি জানি!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে আখেরের ভাবনা ভাবিয়াই এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বামাচরণ তাহা বুঝিতে পারিল না। বড় বধূ স্বামীর মতে মত দিলেন। তাঁহাকে ইচ্ছাপুরে না যাইতে হইলেই তিনি তুষ্ট। তিনি কাহারও ধেঁস সহিতে পারেন না।

বামাচরণ দেবীচরণকে বলিল, "তুমি বড় হইয়াছ, আপনার হিতাহিত বুঝিতে পার। এখন লিখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়া কি ভাল বিবেচনা কর? গ্রামের বিদ্যালয়ে চাকরীতে উন্নতির কোনও আশাই নাই। ভিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য কি ভবিষ্যৎ উন্নতির সব আশা পরিত্যাগ করিবে?"

দেবীচরণ বলিল, "বাবার ইচ্ছা, আমি বাড়ী যাই। কাযেই আমি বাড়ী যাইব। যদি কপালে না থাকে, কিছুতেই উন্নতি হইবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে,—আশার গণ্ডী না বাড়াইয়া অল্পেই তুষ্ট থাকিব। বাবা যাহা বলিতেছেন, তাহা ত করিতেই হইবে।"

বড় বধূ বলিলেন, "ঠাকুর পো, বিবাহটি করিয়াছ; দুই দিন পরে ছেলে হইবে। খরচ ত দিন দিনই বাড়িবে। ঘরে কতই আছে?"

দেবীচরণ হাসিয়া বলিল, "বড় বৌদিদি, বাবা ত ঐ যাহা কিছু আছে তাহা হইতেই আমাদের চার ভাইকে 'মানুষ' করিয়াছেন; চার ভগিনীর বিবাহও দিয়াছেন। কপালে যাহা থাকে হইবে। আমরা কেবল মন বুঝে না বলিয়া ব্যস্ত হই।"

দেবীচরণ চলিয়া যাইলে বামাচরণ পত্নীকে বলিল, "আজকালের ছেলে-গুলা বড়ই 'ডেঁপো'; কথা কহে, যেন শাস্ত্র পড়াইতেছে। কত বিজ্ঞ! সংসারের চাপ ঘাড়ে চাপুক, তখন বুঝিবেন—কত ধানে কত চাউল। তখন বুঝিবেন,অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। তখন বুঝিবেন,দাদার কথা আপাততঃ তিক্ত হইলেও পরে মিষ্ট।"

বড় বধূ স্বামীকে বলিলেন, "তোমার যেমন 'ভাই-অন্ত' প্রাণ; উহাদের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া দেহপাত কর! উহারা অন্যরূপ ভাবে।"

বামাচরণ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার কায আমি করি; কেহ শুনুন আর না-ই শুনুন আমার তাহাতে কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই।"

বড় বধূ বলিলেন, "তাহা ত বটেই।"

বামাচরণ ভাবিল, তাহার পত্নী সত্য সত্যই তাহাকে স্বার্থত্যাগী মনে করে। বড় বধূ মনে মনে হাসিলেন, তিনি স্বামীকে বিশ্বাস করাইয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রকৃতির স্বরূপ জানেন না।

দেবীচরণ গৃহে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে সংসারের কায শিখাইতে লাগিলেন। যজমানগৃহে তাঁহার গতায়াত ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। এসকল ব্যবস্থার কারণ বিরজা বুঝিল। দুঃখের মত শিক্ষক আর নাই। তাহারই শিক্ষকতায় বিরজা সংসার চিনিয়াছিল; সে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অগ্রে দেখিত। সে দেখিতেছিল, জরায় ও দুর্ভাবনায় পিতার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছিল। সে বুঝিতেছিল, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইতেছিল। সে আশঙ্কা তাহার আপনার জন্য নহে; সে ভাবনা অপরের জন্য। সে জানিত, পিতৃবক্ষচ্যুত হইলেও তাহার আর এক আশ্রয় আছে। সে আশ্রয়ও স্নেহস্নিগ্ধ। পিতৃবক্ষে থাকিয়াও তাহার মন মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর জন্য ব্যাকুল হইত। জীবনের সায়াহ্নে তিনি নিঃসঙ্গ প্রবাসে রহিয়াছেন। সে কেন তাঁহার নিকট থাকে না? বিশেষ বারাণসীবাস—সে-ইত তাহার পক্ষে স্পৃহনীয়। সে ভাবিত পিতার সংসারের জন্য; সে কাঁদিত সরোজার জন্য। সে বুঝিত, পিতার অবর্ত্তমানে সে সরোজাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবে না—মাতৃহীনা ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে তাহার। মানুষের হৃদয় একটা অবলম্বন নহিলে থাকিতে পারে না—সে একটা কিছু আঁকড়িয়া ধরিয়া হৃদয়ের শূন্যভাব দূর করিতে চাহে। প্রেম ও স্নেহ রমণীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। পতিপ্রেমবঞ্চিতা—অপত্যস্নেহ-স্বাদ-সুখহীনা বিরজার হৃদয় দুঃখিনী ভগিনীকেই জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে জননীর ভালবাসা ও জননীর স্নেহ—সবই সরোজাকে দিয়াছিল। আর সে যতই তাহার বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছিল, তাহার হৃদয় যেন ততই তাহাকে সাগ্রহে নিবিড় ভাবে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সকল বিপদ হইতে

রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। কত নিশায় সে বিনিদ্র হইয়া সুপ্তা ভগিনীর মুখে চাহিয়া কাঁদিয়াছে; কিন্তু পাছে সে জানিতে পারে এই আশঙ্কায় তাহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিলেই নয়ন মুছিয়াছে—সে জাগিলেই তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে। কিন্তু ভগিনীর জন্য দুশ্চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভারের মত চাপিয়া ছিল।

বিরজা ভগিনীকে কিছু বলিত না বটে; কিন্তু সরোজাও যে কিছু কিছু বুঝিত না, এমন নহে। যে অনুভূতি সময়সাপেক্ষ তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সেই অনুভূতি হইতেছিল। সেও অপনার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেছিল। তাহারও মুখে চিন্তার ছায়া।

সরোজা ভাবিত—কাঁদিত; কিন্তু কিছুতেই যতীশচন্দ্রকে অপরাধী মনে করিতে পারিত না। বরং কেহ যতীশচন্দ্রের নিন্দা করিলে—তাহার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। কিশোরীর অনাবিল প্রেম ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। হৃদয়ে স্বার্থপরতা স্থায়ী স্থানলাভ করিবার পূর্ব্বে—প্রেমের পার্থিবভাবের অনুভূতিলাভের পূর্ব্বে—প্রেমে কামনা সঞ্চারের পূর্ব্বে কিশোরীর প্রেম ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবির ও সাধকের ভাব ব্যতীত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই প্রেম বাস্তবের মধ্যে মানব-হৃদয়ের ঈপ্সিত আদর্শের আভাস দান করে। এ প্রেম প্রবঞ্চিত করা মহাপাপ। ইহার ক্রমবিকাশ-সন্দর্শন হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ প্রদান করে। যখন আমাদের কণ্ঠে কৈশোরের কুসুমহার কালবশে শুকাইয়া যায়- তখনও কৈশোরের প্রেমস্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিতে পারিলে আমরা ধন্য হইব। তাই সরোজা স্বামীর দোষ দেখিতে পাইত না। উপাসিকা কি কখনও দেবতার ক্রটি কল্পনা করিতে পারে? সে কল্পনাই যে দেবতার দেবত্ব-বিশ্বাসের বিরোধী! যতীশচন্দ্র তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সে আবার বিবাহ করিয়াছে—কিন্তু সরোজা তাহার দোষ দেখিতে পাইত না। লোক কেন যতীশচন্দ্রের নিন্দা করে— সে বুঝিতে পারিত না। সে ভাবিত, তিনি যদি আর একজনকে বিবাহ করিয়া থাকেন—আমার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন—তাহাতেই বা তাঁহার দোষ কি? তাহার নিকট যতীশচন্দ্র দেবতা! যতীশ যে কারণেই হউক তাহার সংবাদ লইতে কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু তাহার সংবাদ না পাইলে সরোজা স্থির থাকিতে পারিত না। সেই জন্য বিরজার উপদেশে দেবীচরণ যতীশের সংবাদ

লইত। সে কথা দেবীচরণ, বিরজা ও সরোজা, ব্যতীত গৃহে আর কেহ জানিতেন না।

দেবীচরণের সহিত যতীশের এই পত্রব্যবহারে দুই পরিবারের মধ্যে—এবং পরোক্ষভাবে পতিপত্নীর মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইতে পায় নাই। তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পতিপত্নীর হৃদয়ের যোগ বিনষ্ট হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ।

আশ্বিনের শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইল। তিনি সে দিকে মন দিলেন না শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ তাহা লক্ষ্য করিল; স্বয়ং কিছু বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু বিরজাকে সে কথা বলিল। বিরজাও পিতার দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিতেছিল। আলস্য কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না; কিন্তু এখন তাঁহার দেহে জড়তার চিহ্ন সপ্রকাশ। আর নিত্য বাগানে যাওয়া ঘটে না—ঘরে আর রোয়াকেই সময় কাটে বিরজা পিতাকে বলিল, "বাবা, আপনার শরীর খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত কোন অসুখ নাই।" বিরজা বলিল, "আপনি দুর্ব্বল হইতেছেন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "চিরকালই কি দেহে সমান বল থাকে? তোর বাবার বয়স কি বাড়ে না?" বিরজা বলিল, "কিন্তু তাই বলিয়া কোন অসুখ না হইলে দুই চারি মাসে মানুষ এত দুর্ব্বল হয় না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "দেখ্, বিরজা, এ সংসারে আমাদের কেহই মৌরশীপাট্টা লইয়া আইসে না; সকলেরই মেয়াদী বন্দোবস্ত; মেয়াদ ফুরাইলে কাহারও থাকিবার উপায় নাই।" বিরজা তবুও জিদ্ করিল—ডাক্তার দেখাইতেই হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিরজা, আমার উপর দিয়া শোকের—দুঃখের অনেক আঘাত গিয়াছে; বুড়া মানুষের পাকা হাড়—তাই এত দিন টিকিয়া ছিল। কিন্তু আর কত দিন টিকিবে? যখন তোর কাকীমা'র কথা, তোর কথা, আর সরোজার কথা ভাবি, তখন এক এক বার মনে হয়, এ জীর্ণ তরী যদি আরও কিছু দিন থাকে, তবে হয় ত

ভাল হয়। কিন্তু সে কেবল মায়া। সংসারে যে যাহার অদৃষ্ট লইয়া আইসে। আমরা কেবল মোহে মত্ত হইয়া মনে করি, আমরা অদৃষ্টের কায নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। যাহারা ভাবে, সব গুছাইয়া রাখিয়া—কায সারিয়া তবে পার-ঘাটে উপস্থিত হইবে, তাহাদের গুছান শেষ হয় না—কায থাকিয়াই যায়। যখন পারে যাইবার ডাক পড়ে তখন সব ফেলিয়াই যাইতে হয়। আমার ডাক পড়িয়াছে। এবার যাইতে হইবে। কাহারও বাপ চিরস্থায়ী হয় না।"

বিরজা তবুও জিদ্ করিতে লাগিল। স্নেহশীল পিতা শেষে বলিলেন, "তোর তৃপ্তি হয় ডাক্তার দেখাইব কিন্তু জানিস্ 'ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যে নাহি পায় বিধি।' এই সেই অসাধ্য ব্যাধি।"

রাধাচরণ বামাচরণের কথায় তাহার ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিল। বামাচরণ তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার বাটীতে আসিতে পত্র লিখিলেন।

রাধাচরণ গৃহে আসিল। সন্ধ্যার পর রাধাচরণকে ডাকিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন, ভৃত্যকে তাঁহার হাত বাক্স আনিতে বলিলেন। রাধাচরণ আসিলে তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন। ফরাসের উপর লণ্ঠনের মধ্যে গেলাসে নারিকেল তৈলে পলিতা জ্বলিতেছিল। রাধাচরণ উঠিয়া ফরাসে বসিল। ভৃত্য বাক্স দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক আনিব কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "না। তুই বাহিরে যা'।"

ভৃত্য চলিয়া যাইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাধাচরণকে বলিলেন, "কয়টা কথা বলিবার জন্য আজ তোমাকে ডাকিয়াছি।"

রাধাচরণ বিস্মিত ভাবে জ্যেষ্ঠতাতের দিকে চাহিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার বয়স অনেক হইয়াছে; আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। কিন্তু আমি মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে কয়টা কথা বলিবার আছে। আমার ভূমিসম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সবই আমি তোমার ও আমার নামে নাম-পত্তন করাইয়াছি। তাহার অর্দ্ধাংশ তোমার। আর তোমার পিতার উপার্জ্জিত টাকা খাটাইয়া যাহা হইয়াছে তাহা এই তোমাকে দিতেছি।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাতবাক্স খুলিয়া কয়খানা কোম্পানীর কাগজ রাধাচরণকে দিলেন।

রাধাচরণ বলিল, "ও টাকাও ত আপনার। আমি একা পাইব কেন?"

ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় পিতৃব্যের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ, ও টাকাও আমার। আমি তোমাকে দিতেছি।"

"আপনি আমাদের কয় ভ্রাতাকে সব সমান ভাগ করিয়া দিউন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্নেহে পুত্রাধিক স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তকে দক্ষিণ করতল রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, "দেবী যদি বেতনের টাকা তোমার কাছে রাখে, তুমি কি প্রাণ ধরিয়া সে টাকা তহবিলে লইতে পার?"

রাধাচরণ তবুও বলিল, "আমি টাকা লইব না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কেন লইবে না? বামাচরণকে ব্যবসা করিতে আমিই ত টাকা দিয়াছি। জামিন দিলে তোমার ভাল চাকরী হইতে পারে; এ টাকা লইয়া তুমি ব্যবসাও করিতে পার। আমি তোমাকে টাকা দিতেছি। তুমি অবশ্যই লইবে।"

রাধাচরণ আর কোন কথা বলিল না। সে পূর্ব্বে কখনও জ্যেষ্ঠতাতের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারে নাই; আজ যে পারিয়াছিল, সে আত্মবিস্মৃতি বশতঃ। সে ভাবিল, ইহার পর বামাচরণের সহিত পরামর্শ করিয়া টাকাটা কয় ভ্রাতায় ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "রবিবারে তারাকে একবার পাঠাইয়া দিও।"

"আমি লইয়া আসিব" বলিয়া রাধাচরণ উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাগজ কয়খানি তাহার হস্তে দিলেন।

রাধাচরণ কলিকাতায় যাইয়া বামাচরণকে সব কথা বলিল। বামাচরণ তাহাদিগকে বঞ্চিত করায় পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। সে কথাও ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানিতে পারিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে তিনি যেমন প্রীত হইয়াছিলেন, পুত্রের ব্যবহারে তেমনই ব্যথিত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল শেষে মাঘ মাসে তিনি শয্যা লইলেন। এই সময় এক দিন তিনি বিরজাকে বলিলেন, "বিরজা, অনেক দিন শৈলজাকে দেখি নাই। একবার আসিতে পারে না? মরিবার পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখিতে পাইব না?"

বিরজা শৈলজাকে পত্র লিখিল। সে পত্র পাইয়াই শৈলজা পিত্রালয়ে আসিল।

পিত্রালয়ে আসিয়া শৈলজা রাধাচরণকে কলিকাতা হইতে আনাইল; বলিল, "এ সময় সেজবৌ কলিকাতায় কেন?"

পত্নীর সন্তানসম্ভাবনাহেতু রাধাচরণ তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। সে বলিল, "সেজবৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে হইবে।"

শৈলজা রাগিয়া উঠিল; বলিল, "এখন তাহারও বাপের বাড়ী যাইবার সময় নহে; তোমারও কলিকাতায় থাকিবার সময় নহে। বুঝিতে পারিতেছ না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত? তোমার এমন বুদ্ধি হইল কেন? কাহাকে হারাইতে বসিয়াছ তাহা কি বুঝিতেও পারিতেছ না?" সে জানিত, জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুতে পিতৃগৃহে তাহার সকল অধিকারের শেষ হইবে।

তিরস্কৃত রাধাচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল এবং পত্নীকে গৃহে লইয়া আসিল। পিসীমা সেই সঙ্গে আসিলেন। তখন লোকলজ্জাভয়ে বড় বধূও ইচ্ছাপুরে আসিলেন।

নীরজা অল্পদিনপূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে এত শীঘ্র পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। তাই পার্ব্বতীচরণ তাহাকে আনিতে দানাপুরে গেল। সে বহু অনুনয় বিনয়ের ফলে ভগিনীকে লইয়া আসিতে পারিল বটে; কিন্তু ভগিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। তাহার শ্বাশুড়ী গৃহের গৃহিণী। তাঁহার পুত্রগণ বিদেশে চাকরী করে, কেহ পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইতে পায় না। সকলকেই গ্রাসাচ্ছাদনের অনিবার্য্য অর্থ ব্যতীত সব টাকা মা'কে পাঠাইয়া দিতে হয়। তিনি সেই অর্থ সঞ্চিত করেন। তাঁহার অর্থলালসা এমনই প্রবল যে, বধূরা পত্র লিখিবার জন্য একখানা খাম প্রয়োজন হইলেও সকল সময় পায় না। বিবাহিতা পৌত্রীরা পিতৃগৃহে আসিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন—খরচ বাড়িবে। তিনি রুক্ষপ্রকৃতি। তাঁহার দেহ স্বভাবতঃ শীর্ণ—অস্থিচর্ম্মসার; তাহার উপর অম্লরোগে জীর্ণ। কাযেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে বিলম্ব ঘটে না। পার্ব্বতীচরণ এক দিনেই তাঁহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইল। তাহাতে সে শঙ্কিত হইল।

ফাল্গুনের মধ্যভাগে এক দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিবারের সকলকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিলেন। সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, "বামাচরণ, পার্ব্বতীচরণ, রাধাচরণ, দেবীচরণ—তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ

আছে। আমার গৃহে আছেন গৃহবিগ্রহ, আর আছেন বিধবা ভগিনী ও বায়ু-রোগগ্রস্তা ভ্রাতৃবধূ। ইঁহাদের আর আমার এই চারি কন্যার যেন অযত্ন না হয়। আমি কন্যাদের বিবাহ দিয়াছি। তাহাদের অদৃষ্টে সুখই থাকুক আর দুঃখই থাকুক তাহারা তোমাদের যত্নের—স্নেহের প্রত্যাশী,—অন্নের প্রত্যাশী নহে। বিরজার অর্থ ভোগ করিবার লোক নাই। সরোজার শ্বশুর তাহাকে তাহার চলাচলের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে সব কাগজ বাক্সে পাইবে। ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সৎপথে চলিও—কষ্ট পাইবে না। আর সব ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।"

শৈলজা জ্যেষ্ঠতাতের পদসেবা করিতে করিতে কান্দিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কাঁদিস্ কেন, মা? আমার জন্য আনন্দ কর—তোদের সকলকে দেখিতে দেখিতে মরিতেছি; এমন সুখভোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?"

শৈলজা আরও কান্দিতে লাগিল। তাহার পক্ষে এ বেদনা পিতৃশোকের সঙ্গে মিশিয়া অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল।

আরও দুই দিন গেল, তৃতীয় দিন প্রাতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভগিনীকে বলিলেন, ছেলেদের আহারের উদ্যোগ করিয়া দাও। আমার অবস্থা ভাল নহে।"

তিনি প্রতিবেশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন। তাঁহার নাড়ীজ্ঞানের কথা গ্রামে সকলেই জানিত। তিনি আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ছেলেদের কিছু বলিবেন কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন," এতদিন কথায় ও কাযে যাহা বলিয়াছি তাহা যদি না বুঝিয়া থাকে তবে আজ বলিলেই কি বুঝিবে? এখন আমার আর উহাদের কিছু বলিবার নাই, আমাকে তীরস্থ করিবার ব্যবস্থা করুন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেবতার নাম স্মরণ করিলেন—যুক্ত করে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রি হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাকরোধ হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে ভগিনী পুত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রীর রোদননিনাদের মধ্যে তাঁহার প্রাণ দেহ ত্যাগ করিল। ভট্টাচার্য্য পরিবারের উচ্চ চূড়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল—স্বার্থত্যাগী গৃহকর্ত্তার আদর্শ লুপ্ত হইল।

রাধারাণী।

(১)

হাসিমপুরের রামরতন মণ্ডল নিজের দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সংসারের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। সে জাতিতে সৎগোপ। তাহার অন্তঃকরণ উচ্চ আশায় পরিপূর্ণ ছিল এবং সে চরিত্রবলে অনেক লোকের আদর্শস্থানীয় হইতে পারিয়াছিল। গ্রামের দশজন রামরতনের এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের অন্যরূপ কারণনির্দ্দেশ করিত। তাহারা প্রায়ই বলাবলি করিত যে, রামসদয় ঘোষের পুরাতন ভিটা হইতে এক ঘড়া টাকাপ্রাপ্তি রতন মণ্ডলের সৌভাগ্যের কারণ। টাকায় কি না হইতে পারে? টাকায় মানুষের বুদ্ধি খুলিয়া যায়—মূর্খও পণ্ডিত হয়! সদয় ঘোষ রামরতনের বন্ধু ছিল। সংসারে তাহার কেহ না থাকায় মৃত্যুকালে সে রামরতনকে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা ও কয়েক বিঘা দেবোত্তর জমী দিয়া যায়. এককালে উক্ত সদয় ঘোষরা খুব সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল—বনিয়াদী বংশ সুতরাং সেই ভিটা হইতে এক ঘড়া টাকাপ্রাপ্তির কথায় কেহ বড় সন্দেহ করিত না।

রামরতন মণ্ডল কথাটা যে না শুনিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সে ইহার কোন প্রতিবাদ করিত না; বরং দুই এক জন লোককে বলিত, "আমার পরিশ্রমই আমার উন্নতির কারণ—পরের টাকা পাইয়া তাহার দ্বারা (অদৃষ্টে না থাকিলে) কি সুখ সৌভাগ্য ক্রয় করা যায়?" রামরতন তাহার দাদাঠাকুর বা পুরোহিতের নিকট সন্ধ্যাকালে প্রায়ই বটতলার রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ শ্রবণ করিত এবং তাহার অনেকাংশ সে আয়ত্ত করিতেও পারিয়াছিল। তাহারই ফলে সে কোন কোন ঘটনায় ঐ সকল গ্রন্থের উপমা প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

সংসারে রামরতন মণ্ডলের স্ত্রী, তাহার বৃদ্ধা মাতা এবং পাঁচ বৎসরের একটি কন্যা ছিল। ইহা ব্যতীত গৃহে কৃষিকার্য্যের জন্য দুইজন তাহারই স্বজাতীয় কৃষাণ এবং গরুগুলির তত্ত্বাবধানজন্য একজন রাখাল ছিল। অনেক বয়স পর্য্যন্ত রামরতনের সন্তান হইল না দেখিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা খুবই দুঃখিতা ছিলেন এবং স্থানীয় কোন ভদ্র পরিবার বৃন্দাবনে দেবদর্শনে যখন গমন করেন, সেই সময়ে বৃদ্ধা তাঁহাদের হস্তে দশটি টাকা দিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন, ইহাতে যেন শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দেওয়া হয়—উদ্দেশ্য

রামরতনের একটি সন্তানলাভ। তাহারই তুই বৎসরমধ্যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাই বৃদ্ধা সাধ করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—রাধারাণী।

রাধারাণী চাষার মেয়ে, তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনা গিয়াছে। রাধারাণী যখন রক্তাভ মাংসল গণ্ড লইয়া একগাল হাসিতে হাসিতে পাড়ার ডাক্তার বাবুর বাড়ী ছুটিয়া যাইত, তখন ডাক্তার বাবুও তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। রাধারাণীর একটা বিশেষত্ব ছিল, সে প্রায়ই বাড়ী থাকিত না—আহারের সময় তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা বা পিতা তাহাকে পাড়ার ভিতর হইতে খুঁজিয়া আনিতেন। রাধারাণীর অল্পবয়সের এই কু-অভ্যাসের জন্য তাহার বৃদ্ধা ঠাকুর-মা যথেষ্ট চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাহার জন্য দুঃখও করিতেন। কিন্তু বৃদ্ধা একমাত্র নাতিনীর বিরাট স্নেহনীরে যখন অবগাহন করিতেন, তখন সকলই ভুলিয়া গিয়া দেবতার নিকট তাহার অক্ষয় পরমায়ু ও একটি ভাল "বরে"র প্রার্থনা মাত্র করিয়া বসিতেন—উপরে উক্ত কু-অভ্যাসের কথা তাঁহার আর সে সময়ে মনে আসিত না।

দেখিতে দেখিতে রাধারাণী দশমবর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল। বর্ষার নববারিসম্পাতে ক্ষীণপ্রাণা লতিকার অঙ্গসমূহ সরস হইয়া যেমন নয়নবিমোহন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ রাধারাণীর প্রতি অঙ্গের মধ্য হইতে একটা সুখকর সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়া সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া দিত। সে দিন দিনই সঙ্কোচের পথ পরিত্যাগ করিয়া যেন বিকাশের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাড়ার সকলেই বলিত—রাধারাণী যেন প্রকৃতই "রাধারাণী"। বৃদ্ধা তখন মনে মনে যে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা নরলোকের অদৃশ্য হইলেও, বৃদ্ধাকে এক দিন বলিতে শুনা গিয়াছিল যে, রাণীকে আর কোথাও বেড়াইতে যাইতে দেওয়া হইবে না—পাছে মেয়ের উপর উপদেবতার দৃষ্টি পড়ে।

(২)

সন ১৩১৪ সাল। এবার গ্রামে ম্যালেরিয়া সর্ব্বসংহারক করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। এমন গৃহ নাই, যথায় রুগ্নের আর্ত্তনাদ না শ্রবণগোচর হইতেছে। লোকের পেটজোড়া প্লীহা, হস্তদ্বয় ক্ষীণ—পঞ্জরের অস্থিগুলি গণনা করা যাইতেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! কোটরগত চক্ষু, মস্তকে কেশরাশি বিবর্ণ ও দলিত ক্ষেত্রের ন্যায়—দেখিলে হৃদয়ে শঙ্কা হয়। রোগের

যখন পূর্ণ প্রকোপ উপস্থিত হইল, তখনকার সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কে কাহাকে জল দেয়, তাহার ঠিক নাই। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী— সকলেই যেন স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। এ যেন মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র। ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ— ঘরে ঘরে হাহাকার—ঘরে ঘরে অভাবের বিকট নৃত্য।

রামরতন মণ্ডলও এই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়াজ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা স্বামিস্ত্রীতে আজ ছয় মাস কাল অনবরত জ্বরভোগ করিয়াছে। এখন রাধারাণীর বয়স ১২ বৎসর। সে পিতা-মাতার কাছছাড়া হয় নাই। পূর্ব্বে যে রাধারাণী কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! সে নিজহস্তে পিতামাতার পথ্য প্রস্তুত করে, ঠাকুরমা'কে রন্ধনে সাহায্য করে এবং সময়মত ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া আইসে। আজ কাল তাহার তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। তাহার ঠাকুরমা'র হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত—কম্পিত-কলেবরে বৃদ্ধা অগ্রে তাঁহার পৌত্রীর মঙ্গলকামনা করিয়া তবে পুত্রপুত্রবধূর মঙ্গলকামনা করিতেন। স্নেহের কি নিম্নগতি!

(৩)

দিন যায়, থাকে না। এইরূপে গ্রামের কত ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ যে ভাগীরথীর বালুকাপূর্ণ বেলাভূমিতে ভস্মসাৎ হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে? রামরতন ও তাহার স্ত্রী বৃদ্ধা মাতার ও কিশোরী কন্যার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিল। আজ বৃদ্ধার বুকে যেন একটা পর্ব্বতের চাপ—যাঁহার মুখে আমরা কত রহস্য-কথা শুনিয়াছিলাম, আজ তাঁহার যেন কিছুই নাই! বৃদ্ধা একটা ভীষণ বিভীষিকায় নিতান্ত অবসন্নহৃদয়ে যেন কিসের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন! তাঁহার শুষ্ক—ম্লান ওষ্ঠদ্বয় শীতের অস্তোন্মুখ পাণ্ডুর চন্দ্রের ন্যায় রাধারাণীর সন্তোষবিধানজন্য কদাচিৎ কম্পিত হইত মাত্র।

আজ রাধারাণীর সকলই গিয়াছে। সে নিঃসহায়া বনহরিণীর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয়ে কেবলই হা-হুতাস করিতেছে। তাহার স্নেহময়ী মাতা, স্নেহশীল পিতা অনন্ত কালের কোন্ অজ্ঞাত ভবনে চলিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গোলা-ভরা ধান্য প্রভৃতি, পল্লীবাসীরা যাহা লক্ষ্মীর কৃপা মনে করে, তাহাও নষ্ট হইয়াছে! এখন রাধারাণীর একমাত্র অবলম্বন, তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা। সে এখনও বালিকা। তথাপি তাহার বালিকা-হৃদয়ে বল ছিল—বিশ্বাস ছিল। সে বুঝিয়াছিল যে, রামরতন মণ্ডলের কন্যাকে

গ্রামের দশজন উপেক্ষা করিবে না। তাহার পিতা গ্রামের লোকের কি না করিয়াছিলেন? গ্রামে যখনই যাহার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পিতা তখনই তাহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। আর আজ তাহারা কি সেই সকল উপকারের কথা এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া যাইবে? সেই উজ্জ্বল আলোক কি অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইবে? সন্ধ্যায় যখন পল্লীখানি নিতান্ত নিস্তব্ধভাব ধারণ করিত, তখন রাধারাণী তাহার বৃদ্ধা ঠাকুমা'র অস্থিকঠোর বুকে আপনার মুখখানি রক্ষা করিয়া নিতান্ত অধীরভাবে এই সকল কথা কহিত। আর বৃদ্ধা একটা একটা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন—কদাচিৎ বা তাহার সন্তোষ উৎপাদন জন্য "হুঁ" কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ নানা কথার পর সে ঘুমাইয়া পড়িত। আর বৃদ্ধা অনন্ত শূন্য হৃদয় লইয়া শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেন। এইরূপে তাহাদের দুঃখের দিনগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল।

(৪)

বাঞ্ছারাম ঘোষ রাধারাণীর পিতার জীবিতকালে তাহাদের বাড়ীতে কৃষাণের কার্য্য করিত। গ্রামে যখন ম্যালেরিয়া জ্বরের লেলিহান শিখা গৃহে গৃহে ফিরিতেছিল, বাঞ্ছারাম তখন কলিকাতায় পলাইয়া গিয়া বড় বাজারের একটা দোকানে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। দেড় বৎসরপরে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম হইয়া আসিল, বাঞ্ছারাম তখন গ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং তাহার অবস্থাপরিবর্ত্তনের জন্য নানা প্রকার ফন্দী আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাঞ্ছারামের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বৃহৎ মস্তক, রক্তবর্ণ চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া রাধারাণী শৈশব হইতেই তাহাকে ভয় করিত। এখন কলিকাতায় থাকিয়া তাহার দেহ আরও স্ফীত হইয়াছে; আর তাহার কৃষ্ণবর্ণের উপর বার্নিসের ন্যায় একটা জ্যোতি দেখিয়া রাধারাণীর পূর্ব্বভয় যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। বাঞ্ছারাম বাড়ী আসিয়াই নায়েবের সঙ্গে যোগ করিয়া রাধারাণীর ৫০ বিঘা উৎকৃষ্ট জোতজমী বন্দোবস্ত করিয়া লইল। নায়েব জমীদারকে বুঝাইয়া দিল, রাধারাণী বালিকা, তাহার ঠাকুরমা বৃদ্ধা—তাহারা এ জোত রক্ষা করিতে পারিবে না; খাজনার টাকার অভাবে এক দিন নীলামে চড়িবে—তাঁহারও অনর্থক ব্যয়বৃদ্ধি। জমীদার নগদ নজরের টাকা ও খাজনাবৃদ্ধি পাইয়া বাঞ্ছারামকে উৎকৃষ্ট ৫০ বিঘা জোত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

রাধারাণীর ঠাকুরমা ও রাধারাণী এ কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাতে

তাহাদের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। বৃদ্ধা তাঁহার শালগ্রাম শিলার মন্দিরে যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তোমার মর্য্যাদা তুমি যদি রক্ষা করিতে না পার, নিঃসহায় আমি—তাহার কি করিতে পারি? তবে দেখিও, ঠাকুর! রাণীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

বাঞ্ছারামের একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম কৈলাস। কৈলাসের সঙ্গে রাধারাণী শৈশবে অনেক খেলা করিয়াছে। তাহার প্রকৃতি তাহার পিতার প্রকৃতির বিপরীত। সে গ্রাম্য পাঠশালায় যতটুকু লিখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের একটা সাকার মূর্ত্তি না থাকিলেও মানবের হৃদয়ে সে মূর্ত্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট—"কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না", "কাহারও অনিষ্ট করিবে না"—ইত্যাদি নীতি-বাক্যের মর্ম্ম বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনার অন্তঃকরণে অঙ্কিত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিল; সুতরাং তাহার ফলে সে তাহার পিতার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। তাহার পিতা যখন রাধারাণীর ৫০ বিঘা জোত আত্মসাৎ করিয়াছিল, তখন কৈলাস নিতান্ত অধীর-হৃদয়ে রাধারাণীদের বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহাকে ও তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা'কে সান্ত্বনা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু রাধারাণীর বৃদ্ধা ঠাকুরমা তাহার প্রতি রুষ্ট না হইলেও তাহারই পিতার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে বাঞ্ছারাম তাঁহার বাড়ীতে—তাঁহার পুত্রের আমল হইতে ৩০ বৎসর যাবৎ সামান্য কৃষাণের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, যে একমুষ্টি অন্ন ও পরিবারবর্গের বস্ত্রাদির জন্য কত দিন বৃদ্ধার পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, কালমাহাত্ম্যে তাহার আজ এ কি ব্যবহার! বৃদ্ধা কোন-রূপেই ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তার পর শেষে তিনি "অদৃষ্টে"র দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

(৫)

এখন রাধারাণীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। যৌবন তাহার সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। ঠাকুরমা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। সে এখন বড় হইয়াছে। রাধারাণী নির্ভয়ে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা'কে বলিয়াছে, "তুমি জীবিত থাকিতে আমি বিবাহ করিব না।" এই বৃদ্ধ বয়সে রামরতন মণ্ডলের মা যে তাঁহার নাতিনী-জামাই-ঘরে গিয়া

একমুষ্টি অন্নের জন্য বাস করিবেন, এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহনীয়। বৃদ্ধা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কত দৃষ্টান্ত দিলেন। কিন্তু রাধারাণী অটল। সে যে পণ করিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভঙ্গ হইবে না। এ সংসারে রাধারাণীর ভালবাসার পাত্র কেহ ছিল না। সে তাহার সরল হৃদয়ে সকলকেই ভালবাসে; কিন্তু যৌবনের প্রেম কাহাকে বলে, রাধারাণী তাহা কখনও উপলব্ধি করে নাই। সে কৈলাসের ব্যবহারে যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করিত—কৈলাসকে স্নেহ করিত। সে শৈশব হইতে কৈলাসকে খেলার সাথী জ্ঞানে স্নেহ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনও দিন তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের কোন অভিনয় হইতে দেখা যায় নাই—কেবল একটা প্রীতির ভাব ছিল, এই পর্য্যন্ত। কৈলাসের পিতা যখন তাহাদের এইরূপে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল, তখনও রাধারাণী কৈলাসের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। কৈলাসও তাহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিল; তাহার পিতা যে রাধারাণীর পিতার কৃপাতেই গ্রামে বাস করিতে পারিয়াছিল, তাহা সে ভুলে নাই।

যাহা হউক, এক দিন বাঞ্ছারাম রাধারাণীর ঠাকুরমা'র নিকট উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার মিষ্টকথার পর তাহার পুত্রের সহিত রাধারাণীর বিবাহের কথা উত্থাপিত করিল। বৃদ্ধা ঘৃণায় তাহার মুখ হইতে স্বীয় দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। বাঞ্ছারাম অপমানিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইবে। বাঞ্ছারাম জমীর ফসলে ও পাটের চাষে যথেষ্ট লাভবান্ হইয়া উঠিতেছিল। পাটের দর খুবই চড়া, তাই বাঞ্ছারাম ধনমদে এতদূর দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রামের কাহাকেও মনুষ্য বলিয়া সে মনে করিত না।

(৬)

কৈলাস ও পাড়ার ডাক্তার বাবু দুর্দ্দিনে বৃদ্ধার সাহায্য করিতেছিলেন। তাহাদের যখনই অন্ন-বস্ত্রের ও ঠাকুরের সেবার অভাব হইত, তখনই কৈলাস ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গোপনে সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিত। একদিন রাধারাণী ঠাকুর-ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে ভাবিতেছে, এ কি? কৈলাস আমার কে? সে তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করে কেন?—এমন সময়ে কৈলাস আসিয়া উপস্থিত। রাধারাণী তাহার প্রশান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি কৈলাসের মুখে স্থাপিত

করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "কৈলাস! তোমার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।" কৈলাস কোন উত্তর দিতে পারিল না; সেও তাহার সঙ্গে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

এই দিন একটা নূতন ভাব তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া একটু বসিবার স্থান অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। কৈলাসের পিতার অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন যাহা করিতে পারে নাই, কৈলাসের ব্যবহারে তাহাই যেন সম্পাদিত হইতে চলিল। কিন্তু রাধারাণীর প্রতিজ্ঞা, সে বিবাহ করিবে না। সে বিবাহ করিলে পিতামহীর কি হইবে? আবশ্যক হইলে সে গ্রাম ত্যাগ করিতে প্রস্তত ছিল কিন্তু কৈলাস তাহাকে অভয় দিয়াছিল।

কৈলাসের সেই কথায় রাধারাণীর হৃদয়ে একটা পরিবর্ত্তনের সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। রাধারাণী কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, পিতার ব্যবহার নিষ্ঠুর হইলেও, পুত্রের মন এমন সহানুভূতিপূর্ণ কেন? মানবচরিত্রের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটনের ক্ষমতা তাহার ছিল না, কিন্তু কৈলাসের প্রতি অনুরাগে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

(৭)

দিন যায়—থাকে না। অতি দুঃখের রাত্রিও প্রভাত হয়—সুতরাং রাধারাণীদের দুঃখের দিনগুলিও কাটিতে লাগিল। একদিন রাধারাণী নীরবে বসিয়া ভাবিতেছে, এ কি হইল? তাহাদের বড় বড় ঘরগুলির চালে খড় নাই; বাড়ীর উঠান তৃণে পরিপূর্ণ, বিষ্ণুমন্দিরের বারান্দায় রাশীকৃত আবর্জ্জনা। এ কি হইল! সে এক দিনও ইহার জন্য অশ্রুপাত করে নাই। কিন্তু আজ সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় চঞ্চল। তাহার উপর তাহার ঠাকুরমা শয্যাশায়ী। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। এমন সময়ে কৈলাস ঔষধ লইয়া আসিল। সে বৃদ্ধার জন্য দূর গ্রামে কবিরাজের নিকট ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। আবার সন্ধ্যায় কবিরাজের নিকট যাইতে হইবে। কৈলাস জিজ্ঞাসা করিল, "রাধারাণি, ঠাকুরমা কেমন আছেন? কি করিয়া তোমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব!" রাধারাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া কৈলাসও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল!

তাহার পর? তাহার পর সেই দিন রাত্রিকালে রাধারাণীদিগের তিন

মহাল বাড়ীর সাতখানি খড়ের চালে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিদেব তাঁহার সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য, সেই অগ্নিকুণ্ড ভেদ করিয়া রাধারাণী ও তাহার শয্যাশায়ী পিতামহীর উদ্ধার সাধন করে? সকলেই হায়! হায়! করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন বিপন্ন করিতে চাহিল না।

এই সময় কৈলাস একখানি সিক্ত কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া রাধারাণীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। রাধারাণী তখন তরঙ্গ-তাড়িত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবলই ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কি উপায়ে বৃদ্ধাকে গৃহ হইতে বাহির করিবে, বুঝিতে না পারিয়া রাধারাণী যেমন পিতা-মহীর গৃহে প্রবেশ করিবে, অমনই বংশনির্ম্মিত চাল খসিয়া পড়িল—রাধারাণী তীব্র যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া "মা গো" বলিয়া একবার আর্ত্তনাদ করিল মাত্র। রাধারাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে—এমন সময়ে কৈলাস আসিয়া তাহাকে বাহুযুগলে বেষ্টিত করিয়া ধরিল। কৈলাস তাহাকে বাহিরে আনিবে, এমন সময় একখানা বড় চাল তাহাদের নিকট পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—রাধারাণী কৈলাসের স্কন্ধে তাহার মস্তক রাখিয়াছিল—সে মস্তক আর সে তুলিবার অবসর পাইল না। তাহারা উভয়ে সেই অবস্থায় সেই প্রবল অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

* * * *

আর বাঞ্ছারাম? সে এখন উন্মাদ হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী দশখানা গ্রামের লোক তাহাকে দেখিলে তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকে—বাঞ্ছারাম! যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল!

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস।

নবম অধ্যায়।

(২)

মহামতি মিরাবো লোকান্তরিত হইলে ফরাসীরাজ নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই সসাগরা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও অহর্নিশি লাঞ্ছিত হইতেছেন—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও দীনহীন দরিদ্রের ন্যায় অর্থকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। টুইলারি-প্রাসাদ তাঁহার কারাগৃহ। তিনি সপরিবারে রাজনৈতিক বন্দীর ন্যায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন। অবশেষে দুঃখের প্রবল পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি পলায়নের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অহর্নিশি প্রহরিবেষ্টিত টুইলারি-প্রাসাদ হইতে পলায়ন সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি বন্দীর ন্যায় জীবন ধারণ অপেক্ষা পুরুষকারের সাহায্য গ্রহণে অন্ততঃ একবার দুঃখদশা বিমোচনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সেনাপতিপ্রবর বৌলির সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৌলি ফরাসীরাজের নিতান্ত অনুগত। তিনি যুদ্ধ-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত। ফরাসীরাজের সর্ব্বশক্তি বিলুপ্ত হইবার পর হইতে তিনি জাতীয় সমিতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু রাজপরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ। তিনি ইত্যগ্রে ন্যান্সি নগরের বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে রাজার অনন্ত দুঃখ দৃষ্টে ব্যথিত হইয়া তিনি রাজপরিবারবর্গের পলায়নে সাহায্যের নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিদেশীয় শত্রুগণের আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত তিনি প্রদেশে সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক মণ্টমেডি নগরে তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যগণকে সমবেত করিলেন; প্যারিস হইতে মণ্টমেডি গমন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বণ্ডি, তৎপরে চ্যালন্স, তৎপরে সমভিলি নগরে যাইতে হয়। সমভিলি হইতে কিয়দ্দূরে মণিহোল্ড নগর অবস্থিত। মণিহোল্ড অতিক্রম করিয়া অগ্রে ক্লারমেণ্ট, তৎপরে ভেরিনিছ নগরে গমন করিতে হয়। মণ্টমেডি নগর ভেরিনিছের অনতিদূরে অবস্থিত। প্যারিস নগর

হইতে সীমান্ত প্রদেশের সৈনিকগণের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে প্রচুর অর্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সমগ্র রাজবর্ত্ম সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ ছলনা করিয়া বৌলি প্রাগুক্ত নগরসমূহে কিয়ৎপরিমাণে সৈন্য সংস্থাপিত করিলেন। রাজপরিবারবর্গ প্যারিস হইতে যে শকটে বণ্ডিনগর পর্য্যন্ত গমন করিবেন, ফারছন নামক জনৈক সুইটজারল্যাণ্ডদেশীয় যুবক সেই শকটপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। বুডো নামক রাজভক্ত সেনাপতি চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে বণ্ডি হইতে সমভিলি নগর পর্য্যন্ত রাজশকটের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পলায়নের নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমভিলি নগরের সেতুপথে জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল। সেনাপতিপ্রবর ড্যাণ্ডস মণিহোল্ড হইতে ফ্লারমাট নগর পর্য্যন্ত একদল অশ্বারোহী সহভিব্যাহারে রাজপরিবারবর্গের শরীর রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। ফ্লারমাট নগরে একদল এবং ভেরিনিছ নগরে একদল অশ্বারোহী সংস্থাপিত হইল।

য়ুরোপের এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে হইলে উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র গ্রহণ করা আবশ্যক। রাজপরিবারবর্গ কতকগুলি কাল্পনিক নামে পরিচিত হইয়া অনুমতি-পত্র সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যার শিক্ষয়িত্রী ম্যাডাম্ ডি টুর্জ্জেল ব্যারন ডি কর্ফ নাম্নী সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া পরিচিতা হইলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যা কর্ফের কন্যাদ্বয়ের এবং রাজ্ঞী তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রীর স্থান অধিকার করিলেন। রাজভগিনী ব্যারন ডি কর্ফের আশ্রিতা মহিলা এবং রাজা তাঁহার ভৃত্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে রাজ পরিবারস্থ সকলে ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। অচিরে মহানাট্যের অভিনয় হইবে। অচিরে তাঁহারা পার্থিব সুখ অথবা পার্থিব দুঃখের চরম সীমা দৃষ্টি করিবেন। তাঁহারা শঙ্কটময় ভীষণ পরীক্ষাস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁহারা সুখ ও দুঃখসাগরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। পাদবিক্ষেপনকালে পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ।

২০শে জুন (১৭৯১ খৃঃ) রাত্রি একাদশ ঘটিকাকালে আহারান্তে রাজপরিবারবর্গ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা, রাজপুত্র, রাজকুমারী, রাজভগিনী ও ম্যাডাম ডি টুর্জ্জেল প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক থিয়েটার বন্দর নামক প্যারিস নগরের সুপ্রসিদ্ধ বন্দরসান্নিধ্যে আগমন করিলেন।

তথায় এম্ ডি ফারছুন শকটসমভিব্যাহারে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা শকটারোহণ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার সহিত একত্র প্রাসাদের বহির্দ্দেশে আগমন করিলে প্রহরিগণের মনে পাছে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া রাজ্ঞী জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য সমভিব্যাহারে প্রসাদত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র পথে গমন করিলেন। কিন্তু নগরের রাজবর্ত্ম সমূহ রাজ্ঞী এবং তাঁহার ভৃত্য উভয়েরই অপরিচিত। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ কর্ত্তৃক পথ প্রদর্শিত হইলে যদ্রূপ ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। তাঁহারা দুইজন বহুক্ষণ যাবৎ বহু দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে এক স্থানে সেনানেতৃবর ল্যাফাইট শকটারোহণে আগমন করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞীর হৃৎকম্প হইল। তিনি তখন শশব্যস্ত হইয়া একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার স্তম্ভ শ্রেণীর অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দিশাহারা হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাঁহারা ফরাসি-রাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

রাজ্ঞী শকটারোহণ করিবামাত্র শকট প্যারিস নগর হইতে যাত্রা করিয়া কয়েকঘণ্টাকালমধ্যেই বণ্ডি নগরে উপনীত হইল। বণ্ডি নগরে আগমন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞী এক শকটে এবং রাজপুত্রকন্যা,রাজভগিনী ও শিক্ষয়িত্রী দ্বিতীয় শকটে আরোহণ করিলেন। অনন্তর শকট চ্যালন্স নগরে উপস্থিত হইল। তখন রাজ্ঞীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অপর প্রান্তে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন মনে করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর ভয় নাই আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি।" অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংসারের জটিলতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। চক্রান্তনিহিত অনন্ত চক্রের সমন্বয়ে যে বিশ্ব সংসার রচিত তাহা সরল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। যিনি বাহুবলে ব্যূহভেদের ন্যায়,বুদ্ধিবলে সেই চক্রসমষ্টি ভেদ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু সেই ব্যূহ, সেই চক্রান্ত-নিহিত চক্র ভেদ করা রাজপরিবারবর্গের সাধ্যাতীত। রাজাও রাজ্ঞীর ন্যায় অনভিজ্ঞ। চ্যালন্স নগরে আগমন করিয়া বিপজ্জালমুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি সেই নগরে প্রকাশ্যভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বহু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাহাদের দুরভিসন্ধি থাকিলে রাজপরিবারবর্গ এই স্থানেই বিপদগ্রস্ত হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা

কোন প্রকার শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল না। চালন্স নগর হইতে যাত্রা করিয়া রাজপরিবারবর্গ সমভিলি নগরে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিলেন। সমভিলির সেতুসন্নিধানে সোনানায়ক বুডো অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত থাকিবেন এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু সেতুসন্নিধানে অশ্বারোহী না দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দে নিরানন্দ হইল। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া অরক্ষিতভাবে মণিহোল্ড নগরে যাত্রা করিলেন। মণিহোল্ড নগরে উপনীত হইলেই তাঁহাদের বিপদের সূত্রপাত হইল।

বিধাতা বিমুখ হইলে অভাবনীয় কারণ হইতে বিষম বিপত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। বক্ষ্যমাণকালে ফরাসিদেশে জাতীয় সমিতির আদেশে ধাতু-মুদ্রার ন্যায় কাগজ-মুদ্রাও প্রচলিত হইয়াছিল। কাগজ-মুদ্রার উপরিভাগে ফরাসিরাজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। রাজপরিবারবর্গ মণিহোল্ড নগরে আগমন করিলে, ড্রুয়েট নামক ডাকঘরের কর্ম্মচারী কাগজে মুদ্রাঙ্কিত রাজ-মূর্ত্তির সহিত আগন্তুকগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির সৌসাদৃশ্য অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শকটদ্বয় মণিহোল্ড হইতে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ফরাসিরাজ সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ করিয়া ড্রুয়েট তাঁহাদের অনুসরণের নিমিত্ত জনৈক দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের শরীররক্ষণকল্পে মণিহোল্ড নগরে যে সমস্ত অশ্বারোহী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের সেনাপতি ড্রুয়েটের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে সন্দিহান হইয়া অশ্বারোহিগণকে অবিলম্বে রাজশকট-সন্নিধানে ধাবমান হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ড্রুয়েট রাজপরিবারবর্গের পলায়নবৃত্তান্ত মণিহোল্ড নগরের জাতীয় সৈন্যগণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। জাতীয় সৈন্যগণ শরীর-রক্ষক অশ্বারোহি-গণের অশ্বশালা বেষ্টন পূর্ব্বক সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইল। সুতরাং, শরীর-রক্ষকগণ অশ্বারোহণে সমর্থ হইল না। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া অশ্বারোহিদলের নেতৃপ্রবর ড্রুয়েট-প্রেরিত অশ্বারোহীর প্রাণ সংহারের নিমিত্ত একটি দ্রুতগামী অশ্বে জনৈক রাজভক্ত সৈনিক পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। রাজভক্ত সৈনিক অত্যল্প কালমধ্যেই ড্রুয়েটপ্রেরিত অশ্বারোহীর সমীপ-বর্ত্তী হইল। কিন্তু ড্রুয়েটদূত অচিরে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসরণকারী সৈনিকের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

অনন্তর রাজশকটদ্বয় ক্লারমণ্ট নগরে উপনীত হইত। এই স্থানে বৌলির

আদেশক্রমে রাজপরিবারবর্গের সাহায্যের নিমিত্ত কতকগুলি অশ্বারোহী সৈনিক সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই সৈনিকগণের নায়ক তাহাদিগকে রাজশকট সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বিপ্লবসমাগমে রাজার বিশ্বস্ত সৈনিকগণেরও চলচিত্ততা উপস্থিত হইয়াছে। অশ্বারোহিগণ রাজপরিবারবর্গ পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইল। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া রাজ-পরিবারবর্গ প্রহরিবিহীন হইয়া ভেরিনিছ নগরে যাত্রা করিলেন।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির পদে পদে বিপদ। ভেরিনিছ নগরে পৌঁছিবামাত্র শকটদ্বয়ের অশ্ব পারিবর্ত্তিত হইলে, রাজপরিবারবর্গ নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেও এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অশ্ব পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বৌলি এই স্থানে স্বীয় পুত্রের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বৌলিপুত্র নিরূপিত স্থানে উপস্থিত না থাকিয়া নগরের অপর প্রান্তে অশ্বসহ রাজপরিবারবর্গের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; অথচ ভ্রমবশতঃ স্থানপরিবর্ত্তনের সংবাদ ফরাসিরাজকে প্রদান করেন নাই। নিরূপিত স্থানে অশ্ব দেখিতে না পাইয়া রাজপরিবারবর্গ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া রাজ্ঞী পদব্রজে দ্বারে দ্বারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৌলির পুত্রের সন্ধান পাইলেন না। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া রাজা শকট-চালককে অশ্বপরিবর্ত্তন না করিয়াই শকট চালনা করিতে বলিলেন। কিন্তু শকটচালক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক ঘণ্টাকাল বৃথা অতিবাহিত হইতে বৌলিপুত্র অশ্বসহ রাজপরিবারসমীপে আগমন করি-লেন। তখন অশ্ব পরিবর্ত্তনের পর শকট চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইত্যবসরে ভেরিনিছ নগরে ড্রুয়েট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তৎ-প্রেরিত অশ্বারোহীর কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি স্বয়ং ভেরিনিছ নগরে আসিয়া নগরস্থ জাতীয় সৈন্যগণের নিকট রাজপরিবারবর্গের পলায়নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। রাজশকটদ্বয় নগরের সেতুসন্নিধানে আগমন করিলে রাজা দেখিলেন যে, জাতীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সেতুপথ অবরুদ্ধ; সুতরাং বল-প্রয়োগ ভিন্ন পলায়নের সম্ভাবনা নাই। রাজশকটে দুইজন মাত্র বন্দুকধারী ছিল। তাহারা শত্রুগণের ব্যূহভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বন্দুক উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তদ্দৃষ্টে জাতীয় সৈন্যগণ শকটের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া শতাধিক বন্দুক যুগপৎ উত্তোলিত করিল। রাজা অবরোধকারিগণের বলাধিক্য দৃষ্টে সান্ত্রিদ্বয়কে বলপ্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গ্রন্থ-পরিচয়।

নির্ব্বাসন-কাহিনী।*

এই গ্রন্থের লেখক মহাশয় বঙ্গদেশে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মপ্রচারক ও বক্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শেষে তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক কারণে নির্ব্বাসিত হয়েন। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার নির্ব্বাসনের কথায় পূর্ণ। যে সরলতা ও সরসতাগুণে মনোরঞ্জন বাবুর বক্তৃতা শুনিতে চ্যুতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরের মত দলে দলে শ্রোতার সমাগম হইত, আলোচ্য পুস্তকে সেই দুই গুণই বর্ত্তমান। স্বজনবিরহিত অবস্থায় কারাগারে মনোরঞ্জন বাবু যেরূপ শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন—কারাবাসকে যেরূপ সাধনসহায় করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কারাগৃহে তিনি এমনই শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন যে, মুক্তিসংবাদ পাইবার কথায় লিখিয়াছেন,—"চৌদ্দ মাস কাল যে ঘরে বাস করিয়াছি, যে উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি, আজ তাহা ছাড়িয়া যাইব ভাবিয়া মনে সত্যই কিছু ক্লেশ হইল। আমার রান্নাঘরের কাছে আমি ক্ষুদ্র একটি ধনিয়া-ক্ষেত করিয়াছিলাম, পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষেতের কাছে গিয়া ধনে গাছগুলিকে স্পর্শ করিতে ও সেগুলির আঘ্রাণ লইতে লাগিলাম। যেখানে যেখানে রোজ বেড়াই, সেই সব স্থানে বেড়াইতে লাগিলাম। আরাম-কেদারায় বসিয়া নীল আকাশ ও সবুজ বৃক্ষ দেখিয়া লইলাম। আর আমার সেই মার্জ্জার-

---

* নির্ব্বাসন-কাহিনী—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—গিরিডি। মূল্য আট আনা মাত্র।

পরিবার, তাহারা সংখ্যায় এখন আটটী; তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মনে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহারা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই যে, এতদিন যে ব্যক্তি তাহাদের আশ্রয় ও প্রতিপালক ছিল, সে আজ হঠাৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। আদুরী আমার বড়ই আদরের ছিল। রাত্রিতে আমি কখনও কখনও আহারের পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আদুরী সম্মুখের দুইটী পা আমার খাটের উপর তুলিয়া দিয়া আমাকে ঠেলিয়া জাগাইত, কিন্তু আমার গায়ে নখর লাগিত না; মকমলের ন্যায় কোমল ক্ষুদ্র পায়ের মৃদু আঘাতে আমি জাগিয়া দেখিতাম, আদুরী আমাকে ঠেলিতেছে, অমনি আমি বুঝিতাম যে, ৯টা বাজিয়াছে, আমার রাত্রির আহারের সময় হইয়াছে। আহারের পর বিড়াল-পরিবার প্রসাদ পাইবে, তাই আমাকে জাগাইতেছে। আদুরীর অনেক কথা এখনও মনে পড়িতেছে,তাহার ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি তাহার যে অতুল অনুরাগ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখিয়াছি, মনুষ্যের মধ্যেও সেরূপ বিরল। * * * সে আপন সন্তানগণকে স্তন্যপান করাইতেছে, এমন সময়ে অদূরে ভাই-বোন কেহ কোনও কারণে কাঁদিলে আপন সন্তান ছাড়িয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইত। অনেক সময়ই দেখা যাইত, সে আপন তিনটী সন্তান ও তিনটী ভাই-বোনকে এক সঙ্গে স্তন্যদান করিতেছে; ইহাতে তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি অনেক সময় উহার ভাই-বোনকে স্তন্যদানে বাধা দিয়াছি; কেন না, তাহারা তখন বড় হইয়াছে, কিন্তু আদুরী গোপনে তাহাদিগকে স্তন্যপান করাইত। একদিন একটি ভগিনীকে পাওয়া গেল না, তজ্জন্য আদুরী সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াছিল। আজ এই বিড়াল-পরিবারকে ছাড়িয়া যাইব ভাবিয়া আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলাম।"

মনোরঞ্জন বাবু যেরূপভাবে বিড়াল-পরিবারের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেরূপ ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে এক সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা ব্যতীত আর কোথাও দেখিয়াছি, মনে হয় না।

গ্রন্থখানির ভাষা যেমন মধুর, ভাব তেমনই নির্ম্মল। আর গ্রন্থে নানা রূপ বর্ণনা এমনই সরস যে পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। গ্রন্থে গ্রন্থকারের সদানন্দ হৃদয়ের পরিচয় সর্ব্বত্রে সপ্রকাশ।

নারীধর্ম্ম *

এই গ্রন্থখানি হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীগণের উদ্দেশে লিখিত। ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'সন্ধ্যা' ও 'প্রতিবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থকার হিন্দু ব্রাহ্মণ, হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং হিন্দুত্বের গৌরবে উৎফুল্ল। তিনি নানা শাস্ত্র-রত্নাকর মন্থন করিয়া হিন্দু-আদর্শের কয়েকটি মূল্যবান্ রত্ন বঙ্গীয় হিন্দুগৃহস্থের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কুললক্ষ্মীদিগের কৃপাকটাক্ষে এই রত্নাভরণগুলির উজ্জ্বল মহিমা বিকীর্ণ হইয়া বঙ্গের গৃহ সুন্দর, শান্তিময় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব সুখের মঙ্গল-নিকেতনে পরিণত করুক।

কার্য্যক্ষেত্র হইতে শ্রান্ত-ক্লান্ত-হৃদয়ে যখন আমরা গৃহে ফিরি, তখন গৃহপ্রান্তের স্নিগ্ধছায়ায় যে কত সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত আছে, তাহা আমাদের বুঝিবার অবকাশ হয়। যে অন্তঃপুর আমাদের আলয়, কর্ম্মস্রোতের জন্মস্থান, শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, জাতীয় জীবনের ধাত্রীগৃহ,—যে অন্তঃপুর আমাদের লীলার কুঞ্জবন, ধর্ম্মাপবর্গের নিলয়, চিন্তা ও সাধনার আশ্রয়, সন্তানের চরিত্রভূমি সেই অন্তঃপুরে সতীত্বের আদর্শ, ধর্ম্মের গৌরব, সরলতাপবিত্রতার মূর্ত্তি দেখিতে কে না ইচ্ছা করেন? কিন্তু সে কাল গিয়াছে, যখন পুরমহিলারা গৃহকর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে আনন্দ পাইতেন, ব্রতচর্য্যায় যখন প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার ও বিধবার সময় সুখে কাটিয়া যাইত, স্বামীর পরিচর্য্যায়, সন্তান-পালনে এবং রোগীর শুশ্রূষায় যাঁহাদের হোমশিখার ন্যায় পবিত্রমূর্ত্তি অমিত দীপ্তিতে প্রতিভাত হইত! সে কালের সে আদর্শ এখন স্মরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। আজকাল রঙ্গমঞ্চ কুন্দনন্দিনী ও শৈবলিনী, রোহিণী ও বিনোদিনী বা তাঁহাদের প্রতিবেশিনীগণের চটুল চপলতায় মুখরিত, যাত্রাগানে সীতা-সাবিত্রীর স্থলে রসে ভরপূর নূতন নূতন চরিত্রের আমদানী হইতেছে, এবং কথক ঠাকুর যখন কদাচিৎ কখনও দেখা দেন, তখন তিনি এই নূতন রুচির সহিত সুর মিলাইয়া, পুরাতনের সাঁচ্চার উপর হালের চুম্‌কি বসাইয়া নিজের "সিধা ও বিদায়ের" পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সুযোগ

* নারীধর্ম্ম—শ্রীগিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। কলিকাতা ৩নং মিরজাপুর ষ্ট্রীট হইতে সেন, রায় কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

করিতেই ব্যস্ত। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, পুরাতন আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি এইজন্য সমাদরলাভের অধিকারী। ইহাতে অনেক শিখিবার ও শিখাইবার আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে শাস্ত্রীয় নীতিগুলির একটি নীরস শুষ্ক সংস্করণ করিয়া তুলেন নাই, পরন্তু উদাহরণ ও লিপিকৌশলের গুণে সেগুলিকে যথেষ্ট সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে পাতিব্রত্য, সন্তান-লালন, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সংসার-ধর্ম্মের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সুচারুরূপে ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে অথচ সীতা, পার্ব্বতী, মহাশ্বেতা, কাদম্বরী, দেবী চৌধুরাণী ও রাণী শরৎসুন্দরীর উপন্যাস ও আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় অতি উপাদেয় ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রচার সফল হউক, বঙ্গরমণী আর্য্যনারীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হউন, মানবজাতির ইতিহাসে আর্য্যনারীর মাতৃমূর্ত্তি ও পত্নীমূর্ত্তি অক্ষয়, উজ্জ্বল ও চিরগৌরবান্বিত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

গ্রন্থখানির আকারের তুলনায় মূল্য (এক টাকা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়, এবং মুদ্রাকর-প্রমাদও ততোঽধিক। আশা করি, এই দুইটি বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকার পরবর্ত্তী সংস্করণে মনোযোগী হইবেন।

আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম *

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থখানির ন্যায় এ পুস্তিকাখানিও নারীধর্ম্মের প্রতিপাদনকল্পে রচিত। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সচরাচর যেরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বক্তৃতার দ্বারাই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির কলেবর পুষ্ট। সুতরাং আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই। হিন্দুললনাদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে কেবল কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া, পতিস্তোত্র পাঠ, পতিপদপ্রক্ষালন ও পতিপাদোদকপানের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। উপদেশ যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয়, উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে একটি দিব্য আদর্শ হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া যায়, স্বভাব-কোমলা গৃহপিঞ্জরকোকিলাগণের মনোবৃত্তিগুলি সহজে স্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহা না করিতে পারিলে,

* আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম—শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্য-সিন্ধু-প্রণীত। কলিকাতা ৬১ কলেজষ্ট্রীট ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য চারি আনা।

এ সকল পুস্তকের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলেও সৎকথার প্রসঙ্গমাত্রই উপাদেয়। গ্রন্থকার সেজন্য সমাজের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা ও ভাষার বিশুদ্ধিও প্রশংসার্হ।

আফগান-আমির-চরিত।*

গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত আবুনাসের সইহুল্লা-প্রণীত। "প্রণীত" না বলিয়া "অনূদিত" বলিলে বোধ হয় সুসঙ্গত হইত। কেন না, এখানি আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমির আবদুর রহমানের স্বহস্তলিখিত আত্মচরিত। মূলগ্রন্থ পার্শীভাষায় লিখিত; গ্রন্থকার তাহার অনুবাদক মাত্র। অনুবাদকার্য্য অনেক সময়ে বড়ই দুরূহ ব্যাপার; তিনি সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা পার্শীপাঠকগণ বিচার করিবেন। তবে অনুবাদ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের বঙ্গভাষার উপর যে প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র ভ্রমপ্রমাদশূন্য না হইলেও প্রাঞ্জল, গতিবিশিষ্ট ও সরস।

আমির আবদুর রহমানের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ ও ষড়্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। কখনও তিনি পলাতক, কখনও সেনানীপ্রিয়, যুদ্ধজয়ী বীর সেনাপতি, কখনও নিজরাজ্যে নজরবন্দী, কখনও পররাজ্যে স্বাগত অতিথি, কখনও মরুভূমির মধ্যে পিপাসায় ম্রিয়মাণ, কখনও স্বেচ্ছাচারী পিতৃব্যের রোগশয্যাপার্শ্বে সেবাতৎপর। এই সকল কারণে আবদুর রহমানের আত্মচরিত উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলপ্রদ। তাঁহার অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনগুলি সেইজন্য আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়। রুস ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থলে পড়িয়া পরলোকগত আমির কিরূপে আফগানিস্থানের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের বিবরণ হইতে জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়? এই আত্মচরিতে আমির তাঁহার নিজের দুন্দুভি নিজে বাজাইতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার বর্ণনার মধ্যে সরলতা, সত্যের মর্য্যাদা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস বেশ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। আবদুর রহমানের জীবন অধ্যবসায়ের একটি সুন্দর

* আফগান-আমির-চরিত (প্রথম ভাগ)—শ্রীআবুনাসের সইহুল্লা-প্রণীত। ঢাকা, ঘোড়াশাল, ইস্‌লামিয়া পাবলিসিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

দৃষ্টান্ত। কৈশোর হইতেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু শিবাজী ও হায়দার আলির ন্যায় বাল্যকালে লিখা-পড়া শিক্ষার দিকে মনোযোগ করেন নাই। পরে একজন প্রণয়ার্থিনী মহিলার পত্রের প্রত্যুত্তর স্বহস্তে লিখিয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া সাতিশয় লজ্জা অনুভব করেন এবং তদবধি লিখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। দৈবের অনুগ্রহে যে তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবন কাহিনীর লিপি-চাতুর্য্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

গ্রন্থকার আবুনাসের সইদুল্লা সাহেব 'বঙ্গভাষায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়া যে অদম্য উৎসাহ ও সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যের হিতকারী ব্যক্তি-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকখানিকে ভ্রমপ্রমাদবিরহিত করিবার জন্য গ্রন্থকারকে মনোযোগী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। অনুবাদের ভাষা প্রায়ই স্থানে স্থানে আড়ষ্ট হইয়া যায়; আলোচ্য গ্রন্থেও সে দোষ একান্ত বিরল নহে। সেগুলির পরিহারও বাঞ্ছনীয়।

সংগ্রহ।

ইতিহাস।

ঝাঁন্সির লক্ষ্মীবাই।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁন্সিতে যে বীর-রমণীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার কথা অনেক পাঠকই শুনিয়াছেন। এই রমণী ইংরেজরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; বিচার-বুদ্ধির অভাবে আপনার অসাধারণ শক্তির অপপ্রয়োগ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বের যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে। য়ুরোপীয় মনীষাসম্পন্ন লেখকগণ লক্ষ্মীবাইয়ের নাম করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। তাঁহারা বীরের জাতি, তাই রমণী-হৃদয়ে এই বীরত্বদর্শনে তাঁহারা বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। লক্ষ্মীবাইয়ের নাম কেবল রাজ-দ্রোহের অভিযোগে কলঙ্কিত হয় নাই, পরন্তু বিশ্বাসঘাতকতার মহাপাপেও কলুষিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই কলঙ্ক বাদ দিয়া যদি আমরা তাঁহার চরিত-কথার আলোচনা করি, তাহা হইলে তাঁহাতে অনেক অসাধারণ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফে' অনৈক লেখক লক্ষ্মীবাইয়ের চরিতাখ্যান অবলম্বনে একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই সুন্দর সন্দর্ভের সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভারতের ইতিহাসে ঝাঁন্সির রাণীর যে চরিত-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সাহসে ও শৌর্য্যে তাহা ফ্রান্স দেশের বীর-রমণী জোয়ান অব আর্কের চরিতাখ্যান অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। উহা চিরকালই মানবমণ্ডলীর সহানুভূতি সন্ধুক্ষিত করিতে থাকিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত ঘটনার সমসাময়িক লোক এখনও অনেকে জীবিত আছেন। পুরাতন যুগের জ্বালামালামণ্ডিত এরূপ গৌরবময় ব্যাপার ইদানীন্তন যুগে আর কোথায়ও সংঘটিত হয় নাই। যে সময় এই মহারাষ্ট্রীয় রমণী তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সময় প্রতিহিংসার প্রণোদনে তাঁহার কার্য্যাবলী নির্ম্মমতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় লাঞ্ছিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু রমণী আমাদের শত্রুদিগের মধ্যে প্রধানা ও বিদ্রোহীদলের প্রধানা নেত্রী ছিলেন, আমাদের তাঁহাকে সম্মান করাই কর্ত্তব্য।

বীরত্বের সম্মান।

সিপাহী-বিদ্রোহের আবির্ভাবকালে ঝাঁন্সি অঞ্চল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত হয়। বিস্তারে ঐ অঞ্চল ইংলণ্ডের দুইটি বৃহৎ শায়ার বা জেলার তুল্য। ইহার অধিবাসি-সংখ্যা আড়াই লক্ষ। বিদ্রোহাবির্ভাবের অল্প দিন পূর্ব্বেই ঝাঁন্সির লোকনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন; তৎপরে ঐ রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ রাজার অল্পবয়সী বিধবা ভার্য্যার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, সুতরাং

বিদ্রোহের কারণ।

রাণীর অন্তরে ক্রোধানল লোল-রসনা বিস্তৃত করিয়া জ্বলিতেছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সংবাদ শিলাময় দুর্গবাসিনী রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নিকট পৌঁছিল। রাণী মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত কামানগুলি তুলাইয়া লইলেন। কোম্পানীর এজেন্টকে বুঝাইলেন যে, তিনি বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছেন। এজেন্ট তাহাই বুঝিলেন। রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং গোপনে বিদ্রোহীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। যখন তিনি যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন, তখনই আচম্বিতে ব্যাঘ্রীর ন্যায় ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন।

রাণীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দুর্গস্থিত মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টান পর্ব্বতশিখরস্থ একটি সুদৃঢ় দুর্গে সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেকগুলি শিশু ও ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীও ছিলেন। রাণী সেই দুর্গের উপর কামানের

রাণীর বিশ্বাসঘাতকতা।

গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গস্থ ব্যক্তিবর্গ সাহসে ভর করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জল, খাদ্য, গোলা বারুদ ফুরাইয়া আসিল। তাঁহারা সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য রাণীর নিকট দূত পাঠাইলেন। রাণী দূতদিগকে হত্যা করিয়া পুনরায় প্রচণ্ডবেগে উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রাণীর দুর্গাধিকার-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন রাণী ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতায় আপনার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিলেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার নিশান প্রেরণ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি উক্ত দুর্গে অবরুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে কোনও ইংরেজাধ্যুষিত স্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। বিপন্ন দুর্গবাসীরা রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু যখন অবরুদ্ধ খৃষ্টানগণ সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নিরস্ত্র অবস্থায় দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, অমনই রাণীর সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে অত্যন্ত নির্ম্মম হইয়া হত্যা করিল। এই কাপুরুষোচিত, পরুষ ও অধর্ম্মের কার্য্য রাণীকে ভীষণ কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত করিল।

অবরুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে নিহত করিবার পর রাণী লক্ষ্মীবাই দুর্গ ও দুর্গের সন্নিহিত জনপদের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী অত্যন্ত দূরদর্শিনী ছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহীরা পরিণামে জয়যুক্ত

বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপিণী।

না হইলে, তাঁহার সেই আপাততঃ সুবিধা, সুবিধা বলিয়াই গণ্য হইবে না। সুতরাং বিদ্রোহীরা যাহাতে জয়লাভে সমর্থ হয়, সে জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ—চৈতন্যস্বরূপ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার নিজের রাজকোষ আপনার প্রস্তুত মুদ্রায় পূর্ণ, দুর্গাদি সুদৃঢ় ও সেনাসমূহ জনবলে পুষ্ট করিতে লাগিলেন। সেনাদল শিক্ষিত হইলে রাণীই তাহাদের নেত্রীস্বরূপিণী হইয়া উঠিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া রাণীর দলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল এবং ঐ সমস্ত লোক অদম্য উন্মত্ত উৎসাহে দুর্গের প্রাকার-পরিখাদি সুদৃঢ় করিতে আত্মনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। রাণীকে তাহারা দেবী বলিয়া মনে করিত।

কিছুকাল ঝাঁন্সি এরূপ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোম্পানীর সৈন্য উহা অধিকৃত করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিল।

সার হিউ রোজ সসৈন্যে ঝাঁন্সি অবরুদ্ধ করিলেন। তত্রত্য বিদ্রোহী সৈন্যের তুলনায় রোজের সৈন্যসংখ্যা অনেক অল্প ছিল। ঝাঁন্সি সহরের পরিধি দুই ক্রোশ। ইহার জনসংখ্যা ত্রিশ হাজার। দুর্গসম্মুখ হইতে চতুর্দ্দিক্‌ লক্ষিত হইত এবং সন্নিহিত স্থানে গোলা নিক্ষিপ্ত করা যাইত। ইতোমধ্যে তান্তিয়া-তোপী বাইশ হাজার সৈন্য ও আটাশটি কামান লইয়া অবরোধ-কারী বৃটিশ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। সার হিউ রোজ প্রতিভাশালী সেনানী ছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার শৌর্য্য-কাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল। অসাধারণ মনীষাপ্রভাবে তিনি প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধ জয় করিবার রহস্য উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই রহস্যটি এই,—"শত্রুগণ যখন অনাবৃত প্রান্তরে থাকিবে, তখন ক্ষিপ্রতার সহিত উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে চঞ্চল করিয়া দিবে, যখন উহারা প্রাকারাদির অন্তরালে অবস্থিতি করিবে, তখনও ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুর সম্মুখীন হইয়া উহাদের পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া দিবে ; আর যদি তাহারা পলায়ন করিতে থাকে বা পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের অনুসরণ করিবে।" শত বর্ষের ভূয়োদর্শনে এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরেজ এই অভিজ্ঞতা অনুসারেই কার্য্য করিত। তান্তিয়া তোপীর যত সৈন্য ছিল, তাহার দ্বাদশাংশের একাংশ মাত্র সৈন্য লইয়া সার হিউ রোজ প্রচণ্ড বিক্রমে ও অদম্য বেগে তান্তিয়াকে আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণের বেগে বিদ্রোহীদিগের ব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল, উহাদের সেনাসংস্থান-কৌশল একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। যে সেনাদল ঝাঁন্সির অবরোধ নষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তাহারা পরাজিত হইয়া প্রান্তরপারে পলায়ন করিল। তখন সার হিউ রোজ যেন বজ্রবন্ধনে দুর্গটিকে বেড়িয়া ধরিলেন। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই যতক্ষণ ও যতদূর সম্ভব নগর রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন এবং যাহাতে তিনি শত্রুহস্তে বন্দিনী না হয়েন, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ঝাঁন্সির রমণীগণ এই কার্য্যে পুরুষের সহকারিণী ও উৎসাহদায়িনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রমণীগণ গোলাগুলী ও বারুদ প্রভৃতি পুরুষদিগকে যোগাইয়া দিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দৃষ্ট হইত। রাণী ও তাঁহার সখীগণ মণিমাণিক্য-খচিত পোষাক পরিধান করিয়া সন্ধ্যায় শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে অস্ফুট আলোকে কৃষ্ণ কোট্টাট্টালকে (Black Tower) গমন করিতেছেন, দেখা যাইত। একজন ইংরেজ গোলন্দাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুঁড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিল। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যে ক্ষেত্রে রমণী বিদ্রোহের বুদ্ধিস্বরূপিণী হয়েন, সে ক্ষেত্রেও ইংরেজ জাতি রমণীর প্রাণ সংহার করিতে সম্মত নহেন। ইংরেজ-চরিত্রের ইহাই মহত্ত্ব।

সার হিউ রোজ।

অতি বিস্ময়জনক ভাবেই রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ কয় সপ্তাহ

কালমধ্যে যত বিস্ময়কর ঘটনা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে তাঁহার জীবনে আর কখনই সেরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটে নাই। সার হিউ রোজ ঝাঁন্সি সহর অধিকৃত করেন। নগরবাসীরা যেন কোনও অতিমানুষী শক্তি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। রাজপ্রাসাদের প্রতি প্রকোষ্ঠেই তুমুল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। বিদ্রোহীরা প্রাসাদপ্রকোষ্ঠের নিম্নতলে বারুদ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে। প্রখর রবিকরে তের ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিবার পর দেখা গেল যে, বন্দীদিগের মধ্যে রাণী নাই। রাণী সমস্ত দিন যুদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, বিজয়লাভের আর কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন তিনি যেরূপ বিস্ময়জনক ভাবে পলায়ন করেন, তাহার নিকট উপন্যাসবর্ণিত অতি বিস্ময়জনক ঘটনাও পরাজয় মানে। সমুন্নত দুর্গচূড়ার গবাক্ষ হইতে রাণীকে নিম্নে একটি অশ্বপৃষ্ঠে অবতরণ করাইয়া দেওয়া হয়। কয়েক শত মাত্র সৈন্যসমভিব্যাহারে তাঁহার সপত্নীপুত্রকে কোলে লইয়া রাণী তথা হইতে অশ্বারোহণে কল্পি দুর্গে পলায়ন করেন। কল্পি ঝাঁন্সি হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

বিস্ময়জনক পলায়ন।

রাণী কল্পিতে পলায়ন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সার হিউ রোজ অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি রাত্রিযোগে দ্রুতবেগে রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং প্রচণ্ড আক্রমণে বিদ্রোহীদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। কিন্তু এই কার্য্য করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। প্রখর আতপ-তাপে অনেক ইংরেজ সেনানায়ক ও সৈন্য মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। অনেকে প্রলাপে হাসিতেছিল ও কাঁদিতেছিল। সে কালের সেই হাতাহাতি যুদ্ধ অত্যন্ত ভীষণ। জনৈক আইরিশ গোরা শরীরের উনিশটি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহাকে যখন ডুলিতে তোলা হয়, তখন সে বলিয়াছিল,—"ভাই সকল! সাবধান, যেন আমার মাথা না নড়ে; নড়িলেই মাথাটি পড়িয়া যাইবে।" কল্পি দুর্গটি একটি গিরিশীর্ষে সংস্থাপিত। গিরিটি যমুনা-জল হইতে উত্থিত। উহার চারি-পার্শ্বে অনেক খাত। এই দুর্গে রাণী স্বয়ং যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সার হিউ রোজকে পরাভূত করা অসম্ভব। সর্দ্দিগর্ম্মিতে বারংবার অবসন্ন হইয়াও তিনি উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে কল্পি দুর্গ অধিকৃত করিতে সমর্থ হয়েন।

কল্পি অধিকার।

কিন্তু ইহাতেও লক্ষ্মীবাই ক্ষান্ত হইলেন না। শত্রুর নিকট পরাজয় মানিবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প। এইবার তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও বিস্ময়জনকত্বে তাহা অদ্ভুতকর্ম্মা নেপোলিয়নের ক্ষিপ্রতা ও বিস্ময়জনক কার্য্যের তুল্য। রাণী সমস্ত বিদ্রোহী সেনা লইয়া আবর্ত্তনপূর্ব্বক চম্বল নদী পার হইয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় চলিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত প্রবলবেগে গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ইংরেজরাজের বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের দলে যোগ দেন নাই। রাণীর সৈন্য সিন্ধিয়ার সেনাকে আক্রান্ত ও পরাভূত করিল। রাণী তথায় উপনীতা হইলে সিন্ধিয়া-সেনা রাণীর দলেই

রাণীর বীরত্ব।

যোগ দিল। মহারাষ্ট্রের প্রধান নরপাল সিন্ধিয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন। প্রাসাদ রাণীর হস্তগত হইল। সিন্ধিয়ার রাজকোষ ও অস্ত্রাগার রাণীর অধিকারে আসিল। যে দিন উপর্য্যুপরি দুই যুদ্ধে রাণী পরাজিতা, সেই দিনই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৈন্যের— অধিক ধনের ও অধিক অস্ত্রের অধীশ্বরী হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। অনেকের মনেই আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

যাহা হউক, সার হিউ রোজ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিলাত হইতে তাঁহার ছুটীও মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছিল। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া পুনশ্চ রাণীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গোয়ালীয়র দুর্গের সান্নিধ্যে তাঁহার সহিত বিদ্রোহীদিগের হাতাহাতি যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সেনা কর্ত্তৃক দুর্গাধিকারের পূর্ব্বেই রাণী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাণী সেনাদলে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আট হাজার সৈন্য তখন প্রচণ্ডপরাক্রমে বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। জনৈক সেনা দেখিল, রক্তপরিচ্ছদমণ্ডিত, শ্বেত পাগড়ী-শোভিত জনৈক যুবক প্রচণ্ডবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল। যখন বিদ্রোহী সেনা হটিয়া আসিতেছিল, তখন উক্ত ইংরেজ সেনা সেই শ্বেতাম্বরা শ্বেত পাগড়ী-শোভিতা পুরুষবেশা রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মস্তক এক কোপে দেহচ্যুত করে। গোয়ালীয়র দুর্গ তখন অনধিকৃত, রাণীর দেহ তখন ধূলাবলুণ্ঠিত। তাঁহার গলায় সিন্ধিয়ার কোষাগার হইতে লুণ্ঠিত সুন্দর মতির মালা দোদুল্যমান। এক সময় উহা পর্ত্তুগীজ-রাজের ভূষণ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। উক্ত ইংরেজ লেখকই লিখিয়াছেন যে, বহু দোষ সত্ত্বেও রাণী অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

শেষ।

মেলা।

১

উষা ও সন্ধ্যার হাসি
বিচিত্র মেঘের খেলা,
লয়ে রবি শশী তারা
গগন পেতেছে মেলা।

২

ফুটাইয়ে ফুলদল
মাতা'য়ে মধুপগণ,
কানন রচেছে মেলা
লয়ে তরু লতা বন।

৩

গভীর নির্ঘোষে মাতি
রঙ্গে ভঙ্গে দুলি' দুলি',
সাগর পেতেছে মেলা
অগণিত ঢেউ তুলি'।

৪

ভাই ভগ্নী দারা সুত
লয়ে প্রেম ভক্তি স্নেহ,
মানব রচেছে মেলা
বাঁধি মধুময় গেহ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়